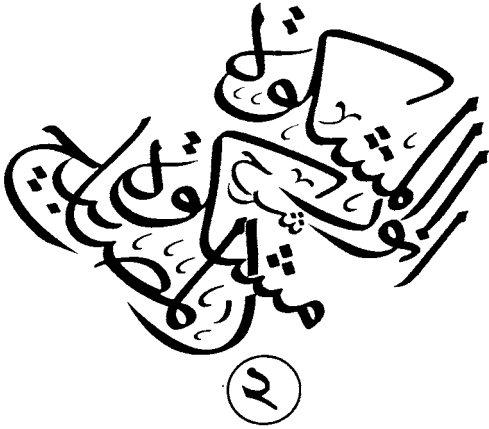


আনওয়ারুল মিশকাত শরহে
মিশকাতুল মাসাবীহ
আরবি-বাংলা



অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মুন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা আব্দুস সালাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বালোবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamijindegi.com

আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মুন
মুফতি আব্দুস সালাম

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমুদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমুদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৫৫০.০০ [পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
كتاب الصلاة — অধ্যায় : নামাজ	৫
باب المواقيت — পরিচ্ছেদ : নামাজের সময়	২৫
باب تمجيد الصلاة — পরিচ্ছেদ : ওয়াক্তের শুরুতে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়া	৩৯
باب فضائل الصلاة — পরিচ্ছেদ : নামাজের ফজিলত	৭৬
باب الاذان — পরিচ্ছেদ : আযান	৮৭
باب فضل الاذان واجابة المؤذن — পরিচ্ছেদ : আযানের মাহাত্ম্য ও মুয়াজ্জিনের উত্তর দান	১০৭
باب فيه فصلان — পরিচ্ছেদ : আযান এতে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে	১২৬
باب المساجد ومواضع الصلاة — পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও নামাজের স্থানসমূহ	১৩৫
باب الستر — পরিচ্ছেদ : আচ্ছাদন	১৭৬
باب السترة — পরিচ্ছেদ : সুতরা	১৮৭
باب صفة الصلاة — পরিচ্ছেদ : নামাজের নিয়ম-কানুন	১৯৬
باب ما يقرأ بعد التكبير — পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পর যা পড়তে হয়	২১২
باب القراءة في الصلاة — পরিচ্ছেদ : নামাজে কেবরাত পাঠ	২২০
باب الركوع — পরিচ্ছেদ : রুকু'	৩৪৩
باب السجود و فضله — পরিচ্ছেদ : সেজদা ও তার মাহাত্ম্য	২৫২
باب التشهد — পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদ	২৬১
باب الصلاة على النبي ﷺ وفضلها — পরিচ্ছেদ : নবী করীম (সা.)-এর উপর দরুদ পাঠ ও তার মাহাত্ম্য	২৬৮
باب الدعاء في التشهد — পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদের মধ্যে দোয়া	২৮০
باب الذكر بعد الصلاة — পরিচ্ছেদ : নামাজের শেষের দোয়া	২৮৯
باب مايجوز من العمل في الصلاة وما يباح له — পরিচ্ছেদ : নামাজের মধ্যে যা করা জায়েজ নয় এবং যা করা জায়েজ	৩০০
باب السهر — পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে সাহু	৩২০
باب سجود القران — পরিচ্ছেদ : কুরআনের সেজদা	৩২৯
باب اوقات النهي — পরিচ্ছেদ : নিষিদ্ধ সময়সমূহ	৩৩৯
باب الجماعة وفضلها — পরিচ্ছেদ : জামাত ও তার ফজিলত	৩৫০
باب تسوية الصف — পরিচ্ছেদ : সফ বা কাতার সোজা করা	৩৬৯
باب الموقف — পরিচ্ছেদ : ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান	৩৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
باب الامامة	— পরিচ্ছেদ: ইমামতি করা ৩৮৮
باب ماعلى الامام	— পরিচ্ছেদ: ইমামের কর্তব্য ৩৯৭
باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق	— পরিচ্ছেদ: মুক্তাদির আনুগত্যের অপরিহার্যতা ও মাসবুকের বিধান সম্পর্কীয় ৪০২
باب من صلى صلاة مرتين	— পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি এক নামাজ দু'বার পড়ল ৪১৪
باب السنن وفضائلها	— পরিচ্ছেদ: সুন্নত নামাজ ও তার ফজিলত ৪২১
باب صلاة الليل	— পরিচ্ছেদ: রাতের নামাজ ৪৩৮
باب مايقول اذا قام من الليل	— পরিচ্ছেদ: নবী করীম ﷺ রাতে উঠলে যে দোয়া পাঠ করতেন ৪৫৩
باب التحريض على قيام الليل	— পরিচ্ছেদ: রাতের বেলায় ইবাদতের জন্য উৎসাহ প্রদান ৪৫৯
باب القصد فى العمل	— পরিচ্ছেদ: কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ৪৭১
باب الوتر	— পরিচ্ছেদ: বিতর নামাজ ৪৭৮
باب القنوت	— পরিচ্ছেদ: দোয়ায় কুনূত ৪৯৬
باب قيام شهر رمضان	— পরিচ্ছেদ: রমজান মাসে (তারাবীহের নামাজ) আদায় ৫০৩
باب صلاة الضحى	— পরিচ্ছেদ: সালাতুয যোহা ৫১৪
باب التطوع	— পরিচ্ছেদ: নফল নামাজ ৫২১
باب صلاة التيسيع	— পরিচ্ছেদ: সালাতুত তাসবীহ ৫২৫
باب صلاة السفر	— পরিচ্ছেদ: সফরের নামাজ ৫২৮
باب الجمعة	— পরিচ্ছেদ: জুমার ফজিলত ৫৪৩
باب وجوبها	— পরিচ্ছেদ: জুমার নামাজ ফরজ হওয়া ৫৫৪
باب التنظيف والتكبير	— পরিচ্ছেদ: পবিত্রতা, অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে গমন ৫৫৯
باب الخطبة والصلاة	— পরিচ্ছেদ: খোতবা ও নামাজ ৫৬৭
باب صلاة الخوف	— পরিচ্ছেদ: ভয়-ভীতিকালীন নামাজ ৫৭৮
باب صلاة العيدين	— পরিচ্ছেদ: দুই ঈদের নামাজ ৫৮৫
باب فى الاضحية	— পরিচ্ছেদ: কুরবানি ৬০০
باب العتيرة	— পরিচ্ছেদ: রজব মাসের কুরবানি ৬১১
باب صلاة الخسوف	— পরিচ্ছেদ: সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ ৬১৩
باب فى سجود الشكر	— পরিচ্ছেদ: কৃতজ্ঞতার সিজদা ৬২৩
باب الامستقاء	— পরিচ্ছেদ: বৃষ্টি প্রার্থনা করা ৬২৫
باب فى الرياح	— পরিচ্ছেদ: ঝড় তুফানে করণীয় ৬৩১

كِتَابُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় : নামাজ

ইসলামের মূল রোকন বা স্তম্ভ পাঁচটি। এর মধ্যে ঈমানের পরই সালাতের স্থান। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কোনো ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ ও প্রাণবয়স্ক হওয়ার পর যে কাজটি সর্বপ্রথমে বর্তায় তা হলো নামাজ। এটা সর্বসম্মতভাবে ফরজ। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে এর ফরযিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন—

۱. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ . (الْبَيِّنَاتِ)

অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে সকল দিক হতে নির্পিণ্ড হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে, আর এটাই হলো সঠিক জীবন ব্যবস্থা।—[সূরা বায়্যিনা, আয়াত : ৫]

۲. فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ . (التَّحَجُّجِ)

অর্থাৎ, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর; যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই হলেন তোমাদের মালিক।—[সূরা হাজ, আয়াত : ৭৮] (الْبُرَاهِمِ) .

অর্থাৎ, বলুন আমার বান্দাদেরকে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা তাদেরকে দান করেছি তা হতে বায় করে।—[সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩১]

এমনিভাবে হাদীসে এসেছে যে,

۱. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَيْ إِسْلَامٍ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ .

۲. حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَادْعُهُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَيْلَةَ الْخِ . (وغيره)

ও দু' উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নামাজ ফরজ তা নয়; বরং পূর্ববর্তী নবী রাসুলদের উম্মতের উপরও নামাজ আবশ্যিক ছিল। তবে তাদের জন্য ওয়াক্তের কমবেশির ভারতম্য ছিল। যেমন সূরা বাইয়েনায় আহলে কিতাব ইহুদি ও নাসারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ الْخِ .

অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে সকল দিক হতে নির্পিণ্ড হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং সালাত কায়মে করবে।

অপর স্থানে হযরত আদম, হুদরাস, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.) সহ প্রভৃতি নবীগণের উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেন— فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ تَسْرِوًا يَلْفُتُونَ عَنَّا .

অর্থাৎ অতঃপর তাদের পর স্থলাভিষিক্ত হলো এমন লোকেরা যারা সালাতকে নষ্ট করে দিল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল ফলে তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। [সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯]

বহুত হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী রাসুলের যুগে তাদের উম্মতের উপর সালাত ফরজ ছিল, কোনো নবীর উম্মতই এ থেকে দায়িত্বমুক্ত ছিল না।

সমাজ জীবনে সালাতের প্রভাব : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে তাকে বসবাস করতে হয়। নামাজ মানুষের উপর একটি আবশ্যকীয় দৈনন্দিন পালনীয় একটি ইবাদত হলেও সমাজ জীবনে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী।

১. অশ্রীলাত ও অন্যান্য দূরীকরণ : নামাজ কায়েমের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন হতে বিবেক বর্জিত কাজ বিদূরিত হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন— وَالصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنُّكْرِ অর্থাৎ, অবশ্যই সালাত অশ্রীলাত ও অন্যান্য কাজ থেকে বিরত রাখে।
২. সাম্য : জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার মাধ্যমেই উচ্চ-নিচু, ধনী-নির্ধনের, আশরাফ-আতরাফের দূরত্ব-হ্রাস পেয়ে সাম্যগুণের সৃষ্টি হয়।
৩. ঐক্য : জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।
৪. দায়িত্ববোধ ও সময়ানুবর্তিতা : প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে এই গুণের প্রতিফলন ঘটতে পারে।
৫. সমাজনেতা নির্বাচনের শিক্ষা : জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে যেভাবে ইমাম নির্বাচন করা হয় তেমনি একইভাবে সমাজ নেতা নির্বাচনেও এটা শিক্ষা দিয়ে থাকে।
৬. নেতৃত্বের দায়িত্ববোধ : ইমাম তাঁর ইমামতের মাধ্যমে নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।
৭. শ্রবণ ও আনুগত্য : ইমামের যথাযথ অনুসরণ ও অনুগমনের মাধ্যমেই মুক্তাদির এ শিক্ষা অর্জিত হয়।
৮. পারস্পরিক সহযোগিতা : মসজিদ তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে এ সামাজিক গুণটি সৃষ্টি হয়।
৯. নিষ্ঠা ও একাগ্রতা : শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায়ের মন-মানসিকতা থেকেই এই গুণ অর্জন করা যায়।
১০. আত্মনিয়ন্ত্রণ : সর্বদা সালাত আদায় এবং সালাতের নিয়ম-পদ্ধতি সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ সংগুণের সৃষ্টি হয়।
১১. চরিত্র গঠন : নামাজের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার তাওহীদ, রিসালাত ও আবিরাতেতের স্মরণের ফলে চরিত্রের মন্দ-দিকগুলো দূরীভূত হয়ে যায়।
১২. নিয়মানুবর্তিতা : দৈনিক পাঁচবার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধসম্পন্ন হয়ে যায়।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٨
 رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ
 وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ اِلَى
 رَمَضَانَ مَكْفِرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتْ
 الْكِبَايْرُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমার নামাজ হতে অপর জুমার নামাজ এবং এক রমজানের রোজা হতে অপর রমজানের রোজা কাফফারা হয় সে সব গুনাহের, যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয়; যখন কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকা হয়।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

التَّغْرِيْبُ بِالرَّأْيِ : মাঝী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মূল নাম নিয়ে এত অধিক বিতর্ক যে, এরূপ মতানৈক্য আর কারো ব্যাপারে ঘটেনি। সর্বাধিক ১৯/৩৫ পর্যন্ত মতামত পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো—

ঃ ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল— (ক) আবদুল শামস, (খ) আব্দু আমর, (গ) আব্দুল লাভ, (ঘ) আব্দুল ওজ্জা ইত্যাদি।

ঃ ইসলাম পরবর্তী নাম হলো— (ক) আব্দুল্লাহ ইবনে সখর, (খ) আব্দুর রহমান ইবনে সখর, (গ) ওয়ায়েজ ইবনে আমের।

উপনাম : আবু হুরায়রা । এই উপনামেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন ।

পিতার নাম : সখর ।

মাতার নাম : উম্মিয়া বিনতে সাকীহ বা মাইমূনা ।

নিসবতী নাম : তাকে দাউসী বলা হয় । সম্ভবত তাঁর পূর্ব পুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হয় । তাকে আবার আযদীও বলে । কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের 'আযদ' গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহুম বংশোদ্ভূত ।

২. আবু হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ : বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) জামার আন্ত্রিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন । হঠাৎ বিড়াল ছানাটি সকলের সামনে বের হয়ে পড়ে । এ অবস্থা দেখে রাসূলে কারীম ﷺ রসিকতা করে তাকে "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" বা 'হে বিড়াল ছানার পিতা' বলে ডাকেন । তখন থেকেই তিনি এ নামটি নিজের জন্য পছন্দ করে নেন । আর সে থেকেই তিনি আবু হুরায়রা নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।

ঃ শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মদে সাইদেহলবী (র.) সংক্ষেপে এভাবে বলেন যে,

إِنَّمَا سُمِّيَ أَبَا هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ فَرَّةٌ صَغِيرَةٌ يَحْمِلُهَا مَعَهُ .

৩. ইসলাম গ্রহণ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন । প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তুফায়েল ইবনে আমের আদ-দাওসীর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন ।

৪. রাসূলের সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হননি ।

ঃ আল্লামা ইবনুল আসীর (র.) বলেন— فَتَهَذَّ الْمَسَافِدُ كُلُّهَا مَعَ الرَّسُولِ ﷺ

ঃ আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) বলেন—

وَأَطَبَ عَلَيْهِ رَأْيًا فِي الْعِلْمِ رَاضِيًا يَسْتَبَعُ بَطْنِهِ وَكَانَ يُدْرُسُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ وَحَضْرًا مَا لَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَسْلُزِمَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَلِذَلِكَ كَثُرَ حَدِيثُهُ .

৫. তাঁর স্বরণশক্তি বৃদ্ধিতে রাসূল ﷺ-এর দোয়া : তিনি প্রথম অবস্থায় হাদীস শুনে মুখস্থ রাখতে পারতেন না । এ ব্যাপারে হুজুর ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন، اُبْسَطْ رِوَايَكَ، অর্থাৎ 'তোমার চাদর বিছিয়ে ধরে' । তিনি তা করলেন, হুজুর ﷺ তাতে বরকত দান করলেন । সে বরকত লাভ করার পর হতে তিনি আর একটি হাদীসও ভুলেননি ।

৬. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.)-এর মতে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি । ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৩২৫টি হাদীস বর্ণনা করেন । এককভাবে ইমাম বুখারী ৭৯টি আর মুসলিম ৭৩/৯৩ টি হাদীস বর্ণনা করেন ।

ঃ কারো মতে বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ৮২২টি আর ইমাম বুখারী এককভাবে ৪০৪টি ও মুসলিম ৪১৮টি হাদীস বর্ণনা করেন ।

৭. তাঁর নিকট হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন : ইমাম বুখারী ও আইনী বলেন, আট শতেরও বেশি সাহাবী ও তাবেরী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন ।

৮. ইন্তেকাল : তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ থাকলেও মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর । মৃত্যু সন ৫৭/৫৮/৫৯ হিজরি । মদীনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন ।

৯. তাঁর জানাযার নামাজ : হযরত ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন । সাহাবীদের মধ্যে আন্দ্রুহা ইবনে ওমর ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁর জানাযার শরিক হন । তাকে মদীনার জন্মভূমি বাকী'তে সমাহিত করা হয়

سَلَاةٌ رَا مَعْنَى الصَّلَاةِ لَعْنَةً وَأَسْطَلَامًا

وَعَالَ شَدَدَتْ صَلَاةٌ مَعْنَى الصَّلَاةِ لَعْنَةً -এর ওয়ানে বাবে تَعَيَّلَ -এর মাসদার । স্থান বিশেষে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন কবির ভাষায়—

صَلَاةٌ رَا مَعْنَى دَرَلْتُ حَاز * دُعَاةٌ وَ دُرُودٌ وَ رَحْمَتٌ وَاسْتِغْفَارٌ

১. রহমত অর্থে : যখন صَلَاة শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন কুরআনের বাণী—
وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
২. দোয়া অর্থে : যখন صَلَاة শব্দটি সাধারণ মানুষ থেকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন কুরআনের বাণী—
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ .
৩. দরদর অর্থে : যখন صَلَاة শব্দটি উম্মত থেকে রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন কুরআনের বাণী—
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
৪. ক্ষমা প্রার্থনা অর্থে : যখন ফেরেশতার দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন আল্লাহর বাণী—

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

বহুত صَلَاة-এর স্থানভেদে অনেকগুলো অর্থ রয়েছে, পবিত্র কুরআনেই এ শব্দটি ১০টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

الصَّلَاةُ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমগণ নিম্নোক্ত মতামত পোষণ করেন—

১. ফাতহুল মুশহিম শ্রংগেতার মতে—مَخْصُوصَةٌ فِي أَوْقَاتٍ مَّخْصُوصَةٍ—এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমগণ নিম্নোক্ত মতামত পোষণ করেন—
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আরকান এবং আফয়াল সম্পন্ন করাকে صَلَاة বলে।
২. কেউ কেউ বলেন—مِنَ الْعِبَادَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقُرْبَانِ—অর্থাৎ, শরিয়ত নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাকে صَلَاة বলে।
৩. কারো কারো মতে—مِنْ أَدَاءِ أَرْكَانِ مَخْصُوصَةٍ بِطَرِيقَةٍ مَّخْصُوصَةٍ—অর্থাৎ, শরিয়ত নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাকে صَلَاة বলে।
৪. কেউ কেউ বলেন—مِنْ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَوَدَّى بِطَرِيقٍ مَّخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَّخْصُوصٍ—অর্থাৎ, শরিয়ত নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাকে صَلَاة বলে।
৫. কেউ কেউ বলেন—مِنْ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَوَدَّى بِطَرِيقٍ مَّخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَّخْصُوصٍ—অর্থাৎ, শরিয়ত নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাকে صَلَاة বলে।

الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ أَقْرَابًا وَأَعْمَالًا مَّخْصُوصَةً مُفْتَحَةً بِتَكْوِينِ اللَّهِ تَعَالَى مُخْتِمَةً بِالتَّسْلِيمِ .

মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম হচ্ছে—صَلَاة যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর ফরজ করেছেন, যার গুরুত্ব রয়েছে তাকবীর, আর শেষে রয়েছে তাসলীম।

أَقْرَابُ الْإِيمَةِ فِي أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَكْفُرَاتٍ لِلذُّنُوبِ

ইবাদত পাপ কাজের কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত : ইবাদত বা নেক কর্ম বান্দার পাপ কর্মের কাফফারা কি না এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মু'তাযিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা—

১. مَذْهَبُ الْمُتَزَلِّيَّةِ : মু'তাযিলিদের মতে সংকর্ম দ্বারা কবীরা গুনাহের ক্ষমা হয় না। কেননা, কবীরার জন্য তওবা শর্ত। তদ্রূপ সগীরা গুনাহের ক্ষমা হওয়ার জন্য কবীরা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা শর্ত।

তাদের দলিল :

١. قَالَ تَعَالَى : إِنْ تَجَنَّبْتُمْ كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ رِجْسٍ (النَّاسُ : ٣١)

٢. قَالَ تَعَالَى : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِيمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّعْمَ - (سُورَةُ النَّجْمِ : ٤٢)

٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَفَّرَ رِجْسًا بَيْنَهُمْ إِذَا اجْتَنَبَتِ الْكِبَائِرَ .

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাভের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাভের মতে কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা মাফ করেন না। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে তওবা ছাড়াই মাফ করতে পারেন, যেহেতু তিনি হলেন—مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ—আর সগীরা গুনাহের ক্ষমা হওয়ার জন্য কবীরা থেকে বিরত থাকা শর্ত নয়।

তাদের দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ بِئِهِنَّ السَّيِّئَاتِ .

۲. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ الآية .

۳. عَسَىٰ سَلْوَاتٌ اقْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ، مِن أَحْسَنَ رُضْوَةٍ مَّن ... كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ الْخِ ... (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

الْحَوَابُ عَنِ دَلِيلِ الْمُخَالِفِينَ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে মু'তামিলাদের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত অয়াত ও হাদীসে কَبَائِرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ .

আর অয়াত ও হাদীসের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন, যেগুলো কবীরা গুনাহের জন্য কার্যকর হয়েছিল; যদি বান্দা কবীরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে যায় এবং ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যখন দৈনন্দিনের গুনাহ মোচন করে, তখন এমন আর কোনো পাপ অবশিষ্ট থাকে না, যা জুম্মা মোচন করবে। এরপর আবার এমন কোনো গুনাহ থাকে না, যা রমজান মোচন করতে পারে। কেননা, সকল গুনাহ মোচনের জন্য তো নামাজই যথেষ্ট। ফলে হাদীসে জুম্মা এবং রমজানের উল্লেখ অতিরিক্ত নয় কি?

এর জবাবে বলা যায় যে, নামাজ আদায় করতে গিয়ে যদি কোনো রকম ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তবে জুম্মা ঐ ক্রটিসমূহ মোচন করে থাকে। আর জুম্মা আদায় করতে গিয়ে যে সব তুল-ক্রটি হয়, তার মোচনের জন্য রমজানের রোজা। কাজেই বুঝা গেল যে, হাদীসে জুম্মা ও রমজানের উল্লেখ অতিরিক্ত নয়।

এ ছাড়া জুম্মা এবং রমজান উল্লেখ করে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং জুম্মার নামাজ ও রমজানের রোজার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ تَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ
فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ
شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ
فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمِيسِ بِمَحْوِ
اللَّهِ بِهِنَّ الْخَطَايَا . (مَتَّقٍ عَلَيْهِ)

৫১৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমরা আমাকে বল তো যে, যদি তোমাদের কারো দরজার নিকট একটি নহর থাকে আর তাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে কী কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে? তাঁরা [সাহাবীরা] বলল, না তার শরীরের কোনো ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণও এরপই। এগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ তার অপরাধসমূহ মুছে দেন।
- [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গোসলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তুলনা করার কারণ : পাঁচবার গোসল করাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ উচিত ছিল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে দৈনিক পাঁচবার গোসলের সাথে তুলনা করা। এরূপ বাস্তবিক করার কারণ কি?

এর জবাবে বলা যায় যে, একপ তাশবীহ হলো— تَقْيِينُهُ مَقْلُوبٌ এবং تَقْيِينُهُ بِالْمَقْلُوبِ - এর অর্থ উল্টো। এ-এর জন্য একপ বলা হয়েছে যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে، اِنَّمَا التَّيْبَعُ مِنَ التَّيْبَعِ وَنَشَأَ التَّبَعُ مِثْلَ الرَّبِّهَا . এর সাথে তুলনা করা হয়েছে হুবালীগারের জন্য। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শোতাদেরকে সতর্ক করা। বস্তৃত এখানে
تَطَهَّرُوا وَتَقْيِينُهُ هَلَاكَ وَتَقْيِينُهُ هَلَاكَ وَتَقْيِينُهُ هَلَاكَ . এর সাথে তুলনা করা হয়েছে হুবালীগারের জন্য। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শোতাদেরকে সতর্ক করা। বস্তৃত এখানে

مَا وَهَىٰ قَائِدَةُ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ لَا سَيِّئَاتَ لَهُ :

যার ওনাহ নেই তার নেক কাজের উপকার কি হবে? হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সংকর্ম তথা অজ্ঞ, নামাজ, জুমা, রমজান ইত্যাদি দ্বারা তার সগীরা ওনাহ ধরে যায়। আর তার সাথে তওবা থাকলে কবীরা ওনাহও মাফ হয়ে যায়। যদি তার সগীরা বা কবীরা কোনো ওনাহই না থাকে তবে তার ভালো কর্ম দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং নেকী বেড়ে যায়।

وَعَنْ ٥٢٠ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَخَبَّرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُكُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هَذَا؟ قَالَ لَجَمِينٍ أُمَّتِي كُلُّهُمْ وَفِي رَوَايَةٍ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জ্ঞানেক মহিলাকে চুষন করেছিল। অতঃপর সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে তা তাঁকে জানাল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন যে, أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُكُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ, 'দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূরীভূত করে দেয়।' তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমার জন্য? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার সকল উম্মতের জন্যই।' অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমার উম্মতের যে কেউই এ আমল করবে। অর্থাৎ, কোনো পাপ কাজ করার পর পুণ্য কাজ করবে।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَانَ رُوُؤُو الْحَبِيبَاتِ হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানেক ব্যক্তি বাজারে খেজুর বিক্রয় করতে গিয়েছিল। যার নাম আবুল ইয়াসার। একদা এক অপরিচিতা মহিলা তার নিকট খেজুর ক্রয় করতে আসল। তখন সে বলল, ঘরের ভিতরে ভালো খেজুর আছে। অতঃপর শ্রীলোকটি ভিতরে প্রবেশ করলে খেজুর বিক্রয় তাতে চুষন করে বসল। শ্রীলোকটি ছিল অত্যন্ত ধার্মিক। ফলে সে খেজুর বিক্রয়তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ 'আল্লাহকে ভয় কর'। এ কথা শোনামাত্র লোকটি ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং বুঝতে পারল যে, সে অপরাধ করে ফেলেছে। অতএব সে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বিস্তারিত খুলে বলল। রাসূল ﷺ কোনো ফয়সালা না দিয়ে ওহীর অপেক্ষায় থাকলেন। অবশেষে আসনের নামাজের পর উল্লিখিত হাদীসের মধ্যস্থিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُكُفًا مِنَ اللَّيْلِ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।' দিনের প্রথমার্শে ফজর নামাজ দ্বিতীয়ার্শে জোহর ও আসরের নামাজ এবং রাতের কিছু অংশে অর্থাৎ প্রথমার্শে মাগরিব ও এশার নামাজ এই পাঁচ ওয়াজ নামাজের প্রতি ইস্তিত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারক এ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

ঃ আর কিছু সংখ্যক বলেন, দিনের একাংশে ফজরের নামাজ ও জোহরের নামাজ আর অপরাংশে আসর ও মাগরিবের নামাজ এবং রাতের কিছু অংশে এশার নামাজ। এভাবে পাঁচ ওয়াজ নামাজের প্রতি ইস্তিত করা হয়েছে।

نَبِيَّةٌ مِنْ حَيَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জীবনী :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম- আব্দু আব্দুর রহমান আল-হুজালী। দাদার নাম- জাকির ইবনে হাবীব।

২. ইসলাম গ্রহণ : ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, মহানবী ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ইবনে মাসউদ নিজেই বলতেন, আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

৩. মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ : তিনি রাসূল ﷺ এর সফরসঙ্গী হতেন। হযরের অজুর পানি মিসওয়াব ও জুতা বহন করতেন।
৪. হিজরত : ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফলে কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখান থেকে পরে মদীনায়ে হিজরত করেন।
৫. জিহাদে যোগদান : তিনি ইসলামের সকল জিহাদে অসীম শৌর্ধবীর্য নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।
৬. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : ৬৪০ খ্রি: মোতাবেক ২০ হিজরি সনে কুফায় কাজ নিযুক্ত হন।
৭. দৈনিক গঠন : দৈনিক দিক থেকে তিনি একেবারে হালকা-পাতলা স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি এত লম্বা ছিলেন যে, বসলেও সবার উপর তার মাথা দেখা যেত।
৮. বর্ণিত হাদীস : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সর্বমোট ৮৪৮ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬৪/৬৮টি ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে আর বুখারী ২১ খানা ও মুসলিম ৩৫ খানা এককভাবে উল্লেখ করেছেন।
৯. ইন্তেকাল : তিনি ৩২/৩৩ হিজরিতে ৯/৮-ই রমজান ৬০ বছরের কিছু বেশি বয়সে মদীনায়ে ইন্তেকাল করেন।
১০. দাফন : হযরত উসমান (রা.) মতান্তরে যোবায়ের বা আযার (রা.) তাঁর জানাঘার ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকীতে উসমান ইবনে মাযউনের কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٥٢١ أَنَسِ (رَضًا) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا
فَأَقِمَهُ عَلَيَّ قَالَ وَتَمَّ يَسْتَنْلُهُ عَنْهُ
وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ
الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ
حَدًّا فَأَقِمْ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ
صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২১. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি। অতএব আমার উপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। ইত্যবসরে নামাজের সময় হয়ে গেল। তখন লোকটি নবী করীম ﷺ এর সাথে নামাজ পড়ল। যখন নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন, তখন সে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শরয়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি। সুতরাং আমার উপর আল্লাহর কিভাবে নির্ধারিত বিধান প্রয়োগ করুন। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামাজ পড়নি? সে বলল, হ্যাঁ, পড়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহ বা দণ্ড মাফ করে দিয়েছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْكَيْبَرَةُ لَا تُغْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ فَكَيْفَ غُفِرَتْ بِالصَّلَاةِ :

কবীর গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না নামাজ দ্বারা তা কিভাবে মাফ হলো? আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ পুণ্য কাজের দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায়, কিন্তু কবীর গুনাহ তওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। অথচ উল্লিখিত হাদীসে আগত্বকের কথানুযায়ী বুখা যায় যে, সে কবীর গুনাহ করেছে। এটা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ কিভাবে বললেন যে, তোমার দণ্ড বা গুনাহ নামাজের দ্বারা মাফ হয়ে গেছে। হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেছেন—

১. আগতুক লোকটি মূলত কবীরা ওনাহ করেনি। যদিও সে নিজের ধারণা মতে তার কৃত ওনাহকে কবীরা ওনাহ মনে করেছিল। তার পরবর্তী বাক্য **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ** দ্বারা বুঝা যায়, তার কৃত অপরাধ শান্তিযোগ্য কি না? এ বিষয়ে সে নিজেই নিশ্চিত ছিল না।
২. অথবা যদিও আগতুক ব্যক্তি কবীরা ওনাহ করেছে বলে মনে করেছে, কিন্তু রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, সে কবীরা ওনাহ করেনি। এ জন্যই নামাজ দ্বারা তা মাফ হয়ে গেছে।
৩. অথবা আগতুক ব্যক্তি **حُدِّ** দ্বারা তাযীর বুঝিয়েছেন। আর তা সঙ্গীরা ওনাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।
৪. অথবা আগতুক ব্যক্তি কবীরা ওনাহই করেছিল। কিন্তু সে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে রাসূল ﷺ-কে তার উপর শান্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেছিল, এতেই তার তওবা হয়ে গেছে।
৫. অথবা কবীরা ওনাহ মার্ফের ব্যাপারটি শুধুমাত্র এ ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, অন্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।
৬. অথবা সে কবীরা ওনাহই করেছিল, তবে রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ার বরকতে এবং তাঁর সঙ্গ দানের বিশেষত্বের কারণে তার ওনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ব্যাপারটি একান্তই স্বভাবতঃ সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য নয়।

الْفَرْقُ بَيْنَ مَعْنَى "عَلَى" وَ "فِي"

عَلَى -এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য: আলোচ্য হাদীসে আগতুক ব্যক্তির প্রথম বক্তব্য হলো **عَلَى** আর অপর বক্তব্য হলো **فِي** **كِتَابِ اللَّهِ** এ উভয় বাক্যাংশের **عَلَى** ও **فِي** -এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ: **عَلَى** দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো হদ বা শান্তি বুঝা যায়, আর **فِي** নির্দিষ্ট **حُدِّ** বুঝা যায় না; বরং হদ হোক বা অন্য কোনো শান্তি হোক তাই বুঝা যায়। এর ব্যাখ্যা হলো, আগতুক ব্যক্তি প্রথমে বুঝেছিল যে নিঃসন্দেহে তা শান্তিযোগ্য অপরাধ হয়েছে। এ জন্য সে **عَلَى** তথা আমার উপর হদ জারি করুন। এটা বলার পরও যখন দেখল যে, রাসূল ﷺ নীরব রয়েছেন— হদ প্রয়োগ করার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না, তখন তার সন্দেহ হলো যে, তার কৃত পাপ শান্তিযোগ্য কি না? এই দ্বিধার কারণে পরবর্তীকালে সে বলেছে যে— **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ** অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমার উপর যে শান্তি রয়েছে তা প্রয়োগ করুন।

عَلَى -এর জবাব **بَلَى** দ্বারা **لَمْ يَجِبْ** **بَلَى** **فِي** **جَوَابِ** **الِاسْتِفْهَامِ** **الْإِنْكَارِيِّ** -এর জবাব **بَلَى** দ্বারা দেওয়া হয় **نعم** দ্বারা নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে— **الْكُفْرُ** **نعم** **لَيْسَ** **صَلَّيْتَ** **مَعَكَ** অর্থাৎ হাঁ, তুমি আমাদের প্রতিপালক নও। এমনিভাবে এখানেও **نعم** বললে অর্থ দাঁড়ায়— **نعم** **لَيْسَ** **صَلَّيْتَ** **مَعَكَ** অর্থাৎ হাঁ, আমি আপনার সাথে নামাজ পড়িনি।

সমাধান: এর সমাধানকল্পে বলা যায় যে, **وَرَأَيْتَ وَرَأَيْتَ** -এর মধ্যে গরমিল দেখা দিলে সভাবতই **وَرَأَيْتَ** -এর অধাধিকার হয় **وَرَأَيْتَ** -এর নয়। আর এখানেও **وَرَأَيْتَ** -এরই অধাধিকার হবে। আলোচ্য হাদীসে **وَرَأَيْتَ** -এর দৃষ্টিতে **بَلَى** হওয়া যুক্তিযুক্ত হলেও **وَرَأَيْتَ** -এর দৃষ্টিতে **نعم** হওয়াই হলো অধিক অগ্রগণ্য। তাই এখানে **بَلَى** না হয়ে **نعم** হয়েছে। কেননা, এখানে যদি **نعم** দ্বারা জবাব দেওয়া হতো তা হলে অর্থ হতো **نعم** **لَيْسَ** **صَلَّيْتَ** **مَعَكَ** অর্থাৎ হাঁ, তুমি আমাদের প্রতিপালক নও। এমনিভাবে এখানেও **نعم** বললে অর্থ দাঁড়ায়— **نعم** **لَيْسَ** **صَلَّيْتَ** **مَعَكَ** অর্থাৎ হাঁ, আমি আপনার সাথে নামাজ পড়িনি।

অথবা লোকটি তার ওজর নিজেই পেশ করেছিল, যার কারণে রাসূল ﷺ আর কিছু জানতে চাননি।

أَيَّةُ صَلَوةٍ صَلَّى الرَّجُلُ مَعَ الرَّسُولِ

লোকটি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোন নামাজ পড়েছিল? লোকটি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোন নামাজ পড়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। ফলে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো ওয়াক্তের নামাজ উদ্দেশ্য হতে পারে তবে কিছু সংখ্যকের মতে উক্ত নামাজ ছিল আসরের নামাজ।

লোকটির নাম কি? কারো মতে ইবনে মাসউদ ও হযরত আনাসের হাদীসের ঘটনা একই তাই আগত ব্যক্তির নাম হলো আবুল ইয়াসার।

আর কেউ বলেন, উভয়টি পৃথক পৃথক ঘটনা। আর হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসের ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। কেননা, এরপ মন্দ কর্মে জড়িত একজন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করাই যুক্তিযুক্ত।

لِكَيْ يُحْيِيَ بِنُحَيْدٍ مِنْ حَيَاةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম- আনাস; উপনাম- আবু হামযা, আবু উমাইয়া, আবু উমায়্যা এবং আবু উমায়মা। উপাধি- খাদেমু রাসূলুল্লাহ ﷺ। পিতার নাম- মালেক ইবনে নযর, আর মাতার নাম-উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহাম।
২. রাসূলের খেদমতে নীত : রাসূল ﷺ মদীনায়া হিজরত করলে হযরত আনাসের মাতা তাকে রাসূলের খেদমতে পেশ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিনি একটানা দশ বছর যাবৎ রাসূল ﷺ-এর খেদমত করার সুযোগ লাভ করেন।
৩. যুদ্ধে অংশ গ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে হযরত আনাস (রা.) বদর ও ওহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কেননা, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। পরবর্তীতে খায়বারসহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।
৪. সরকারি দায়িত্ব পালন : হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে তিনি বাহরাইনের আমেল ও গভর্নর নিযুক্ত হন। হযরত ওমর-এর খিলাফতকালে বসরার মুফতি নিযুক্ত হন। তবে হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফিতনার সময় নীরবতা পালন করেন।
৫. রাসূলের দোয়া : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক ধন-সম্পদ, দীর্ঘ হায়াত, সন্তানাদি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলেন। আল্লামা আইনীর্ বর্ণনা মতে হযরত আনাসের মা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এনে বলেন- يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا حَوْدِيدُكَ أَنْسُ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ فَعَالَ اللَّهُ بِكَ فِي سَالِهِ وَوَلَدِهِ وَأَطْلُ عَمْرَهُ وَأَعِزُّ ذَنْبَهُ । ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আনাস (রা.)-কে ১০০/৮০ সন্তান প্রদান করেন। এর মধ্যে ২ জন কন্যা সন্তান।
৬. হাদীস বর্ণনা : হযরত আনাস (রা.) সর্বমোট ১২৮৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুনলিম যৌথভাবে ১৬৮ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। আর এককভাবে ইমাম বুখারী ৮৩ খানা এবং ইমাম মুসলিম ৯১ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
৭. ইন্তেকাল ও দাফন : এই মহামানব ৯০/৯২/৯৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩/১০০/১০৭; বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন তিনি। প্রখ্যাত তাবেরী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাকে গোসল করান। কাতান ইবনে মুদরাক তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। বসরায় তাঁর বাসভবনের পাশে 'তেক' অথবা 'কহর' নামক মহল্লায় তাকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٥٢٢ رَضِيَ
قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ
أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الصَّلَاةُ
لَوْ قَتَبْتُهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ
قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدَّتْهُ
لَرَادَنِي . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়? জবাবে তিনি বললেন, ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্‌বাহার করা। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোন কাজ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে এগুলো বললেন, যদি আমি আরো বেশি জিজ্ঞাসা করতাম তবে তিনি আমাকে আরো বেশি বলতেন। —বুখারী ও মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْتَعَارُضُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فِي تَعْيِينِ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ :

উত্তম কাজ নির্ধারণের ব্যাপারে হাদীসসমূহের মধ্যকার ঘন্ট : 'কোন কাজ করা উত্তম?' এরপ প্রশ্নের জবাবে মহানবী ﷺ বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্মের কথা বলেছেন। যেমন-হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসে বলেছেন যে, খণ্ডাসময়ে নামাজ

পড়া, পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার হযরত আবু য়ার (রা.)-এর হাদীসে দেখা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকে উত্তম কাজ বলেছেন। আবার অন্য হাদীসে বলেছেন যে, অপরকে খাদ্য দান করা ও সালাম করা উত্তম। ফলে হাদীসসমূহের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এ দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন।

১. হাদীস সমূহের মধ্যে **أَنْضَلَ** তথা **تَنْضِيلُ** -এর সীপাটি তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ, এর দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, এ আমলটিই সর্বোত্তম। বরং এর দ্বারা শুধুমাত্র আমলটির ফজিলত বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।
২. অথবা প্রশংসারী অবস্থানুযায়ী রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে উত্তম বলেছেন, অর্থাৎ যার মধ্যে যে আলেলের ক্রটি দেখেছেন তাকে সে আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য রাসূল ﷺ এরূপ বলেছেন।
৩. অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, এক স্থানে একটি জিনিস উত্তম, যেমন নামাজের মধ্যে সময় মতো নামাজ পড়া উত্তম, নম্রতার মধ্যে সালাম দেওয়া উত্তম, সমস্ত আমল হতে ঈমান উত্তম ইত্যাদি।

وَعَنْ جَابِرِ (رَضَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দা ও কুফরির মধ্যে যোগসূত্র হলো নামাজ পরিত্যাগ করা। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَخْبَلَانِ الْأَيْمَةِ نَامَاةً পরিভ্যাগকারীকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : বেহুদায় নামাজ ত্যাগকারীকে কাফির বলা যাবে কি না? এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. হযরত ওমর (রা.)-এর মতে যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।
 ২. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন—**كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ** অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ নামাজ ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরি কাজ বলে মনে করতেন না; শুধুমাত্র নামাজ ত্যাগ করাকেই তারা কুফরি কাজ বলে মনে করতেন।
 ৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, **تَرَكُ الصَّلَاةَ كُفْرٌ** নামাজ ত্যাগ করা কুফরি।
 ৪. ইমাম মালেক, শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্যদের মতে—**بَيْنَ الدِّينِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْكَفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةَ** অর্থাৎ, নামাজ ত্যাগকারী ধর্মত্যাগকারীই অনুরূপ, তবে সে দীন হতে বের হয়ে যায় না।
 ৫. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে—**لَا يَفْتَلُ بَلْ يُعْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ** নামাজ ত্যাগকারীকে হত্যা করা যাবে না, বরং নামাজে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখতে হবে।
- بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةَ** -এর ব্যাখ্যা : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কোনো আমল ত্যাগকারী কাফির হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকে ত্যাগ করা বৈধ মনে করে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা বাহ্যেত বুঝা যায় যে, নামাজ ত্যাগকারী কাফির। ওলামাগণ তার নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন— (১) যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করাকে বৈধ মনে করে নামাজ পরিত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যাবে। (২) অথবা যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করে সে ঈমানের সাথে মুতাবরন করতে পারবে না। সুতরাং পরকালের দৃষ্টিতে তাকে কাফির বলা হয়েছে। (৩) অথবা নামাজ ত্যাগকারী কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়। নামাজ হলো ঈমান ও কুফরির মধ্যে প্রান্তির স্বরূপ। (৪) অথবা যে ব্যক্তি নামাজের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে তা ত্যাগ করে সে কাফির। (৫) কিংবা যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল সে কাফিরের ন্যায় কাজ করল। (৬) অথবা কুফরির নিকটবর্তী হয়ে গেল। (৭) অথবা এ সকল হাদীস দ্বারা নামাজ ত্যাগকারীর প্রতি শাস্তির হুকুম প্রদান করাই উদ্দেশ্য।

الَّتَعْرِيفُ بِالرَّوَى :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম- জাবের, উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ ও আবু আব্দুর রহমান, পিতার নাম- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, মাতার নাম- নাসীবাহ।
২. জন্ম : তিনি খায়রাজ গোত্রের সলম শাখায় হিজরতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. ইসলাম গ্রহণ : হযরত জাবের (রা.) তাঁর ১৮ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর পিতাসহ দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো মতে প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪. জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি বদর ও ওহুদে বয়সের স্বল্পতার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এরপর তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
৫. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি সর্বমোট ১৫৪০টি হাদীস বর্ণনা করেন। সম্মিলিতভাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ৬০টি, আর এককভাবে বুখারী ২৬টি এবং মুসলিম ২৬টি হাদীস উল্লেখ করেন।
৬. ইস্তেকাল : তিনি ৭৪/৭৭ হিজরিতে ৯৪ বছর বয়সে ইস্তেকাল করেন। হযরত আব্বাস ইবনে ওসমান (রা.) তাঁর জানাযায় ইমামত করেন। মদীনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٤
عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رَضِيَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ
إِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وَضُوءٍ
هِنَّ وَصَلَاهُنَّ لَوْ قَتِيهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ
وَحُشْرُوهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ
لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ
إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالِكٌ وَالتَّيْمِيُّ نَحْوَهُ)

৫২৪. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি সেগুলোর অজু ভালভাবে করে এবং যথাসময়ে পড়ে আর রুকু' সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে এরূপ করে না তার জন্য আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। -[আহমদ, আবু দাউদ, মালেক ও নাসায়ী-এর মতোই বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٢٤ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীন বান্দার উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করবে না তার বিষয়ে আল্লাহর কোনো জিহাদারী নেই। আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। তবে ইবাদতকারীকে ক্ষমা করা বা ছুঁয়াব প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। তিনি ইচ্ছা করলে ইবাদতকারীকেও শাস্তি প্রদান করতে পারেন, আবার ফাসিককেও ছুঁয়াব দিতে পারেন। তিনি কোনো কাজ করতে বাধ্য নন। তবে মহা ইনসাফগার হওয়ার কারণে অন্যায়কারীকে শাস্তি এবং ন্যায়কারীকে ছুঁয়াব দিয়ে থাকেন।

وَعَنْتُ بِالرَّأْيِ পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম- উবাদা, উপনাম- আবুল ওয়ালীদ। পিতার নাম- সামিত, মাতার নাম- কুররাতুল আ'ইন বিনতে উবাদা ইবনে নাযলা, মাতামহের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় উবাদা। হিজরতের ৩৮ বছর পূর্বে মদীনাতে জন্ম গ্রহণ করেন।
২. বংশধারা : উবাদা ইবনে সামিত ইবনে কায়িস ইবনে আসরাম ইবনে ফিহর ইবনে কায়স ইবনে ছা'লাবা ইবনে গানাম ইবনে সালেম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে খায়রাজ।
৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি আকাবার প্রথম শপথে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী আকাবায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১২জন নকীবের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।
৪. যুদ্ধে অংশ গ্রহণ : তিনি বদরসহ সকল যুদ্ধে শরিক ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে সিরিয়ার অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। সিরিয়ার কাজি ও মুয়াল্লিমের দায়িত্বও পালন করেন। ওমরের যুগে মিশর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ফিলিস্তিনের প্রথম ও প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।
৫. হাদীসশাস্ত্রে অবদান : রাসূল ﷺ থেকে তিনি সর্বমোট ১৮১ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ৬ খানা আর এককভাবে ইমাম বুখারী ২ খানা এবং মুসলিম ২ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
৬. ইন্তেকাল : তিনি ৭২ বছর বয়সে ৩৪ হিজরিতে ফিলিস্তিনের রামাল্লা নামক শহরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْتُ ٥٢٥
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا حَسَنَكُمْ
وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ
وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدَخَّلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫২৫. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা আল- বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমরা [তোমাদের প্রতি নির্ধারিত] পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর। [তোমাদের জন্য নির্ধারিত] মাসটির রোজা রাখ। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের কর্মকর্তার [শাসকের] আনুগত্য কর। তা হলে তোমরা তোমাদের প্রভুর [তির] বেহেশতে প্রবেশ করবে।
-[আহমদ ও তিরমিধী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَكْتُمْ - শব্দটির মধ্যে নবী করীম ﷺ কেন شَرَكْتُمْ-কে তাদের প্রতি إِصَانَت করেছেন; আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিনিময় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং مَعَلَّ شَرَكْتُمْ-এর মোকাবিলায় দেখানোর জন্য রাসূল ﷺ شَرَكْتُمْ শব্দকে তরুণ صَوْم শব্দকে বান্দার প্রতি إِصَانَت করেছেন। যেমনি কুরআনে এসেছে- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - أَنْفُسَكُمْ الْحِ
আল্লামা জীবী (র.) বলেন, شَرَكْتُمْ শব্দ এবং তার পরবর্তী صَوْم শব্দকে বান্দার প্রতি إِصَانَت করার দ্বারা এ কথার অবগতি প্রদান উদ্দেশ্যে যে, বিশেষ পরনের এ সকল আমল এই উখতের বৈশিষ্ট্য, যা দ্বারা এ উখতকে অন্যান্য সকল উখত হতে বৈশিষ্ট্যবান করা হয়েছে, তা ছাড়া তাদেরকে সন্তোষনোর দ্বারা এ সকল আমলের প্রতি আগ্রহী করা ও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা যে, তোমাদের এ সকল আমলের বিনিময়ে তোমাদেরকে যা প্রদান করা হবে তা তোমাদের আমল হতে অনেক উত্তম, আর তা হলো জান্নাত।

أَمْرًا يَدًا أَمْرَكُمْ -এর মর্মার্থ : إِذَا أَمَرَكُمْ বলতে এখানে শাসনকর্তা বা উপরস্থ পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরস্থকে মান্য না করলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয়; ন্যূনতম জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে

طَائِفَةً الْأَيْمِيرِ لَيْسَ بِسَطْلَيْنِ শাসকের আনুগত্য শর্তহীন নয় : শাসক বা উপরস্থ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তার আদেশ শুধু ততটুকুই মানতে হবে যতটুকু পর্যন্ত তারা শরিয়ত বিরোধী আদেশ না করেন। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- طَائِفَةً لَا يَخْلُقُونَ بِنِمْصِيَةِ الْغَالِبِينَ অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না।

وَعَنْ ٥٢٦ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِبِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنْ سِبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ .

৫২৬. অনুবাদ : [তারেবী] হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের জন্য আদেশ কর, যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌঁছে। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন [নামাজের জন্য] তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের শোবার স্থান পৃথক করে দাও। -[আবু দাউদ, শরহে সুন্নাহেও [তার লেখক] এরূপ বর্ণনা করেছেন, আর মাসাবীহ গ্রন্থে, হাদীসটি হযরত সাবুরাহ ইবনে মা'বদ হতে বর্ণিত আছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ -এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ বলেছেন যে, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হবে তখন তাদেরকে নামাজ পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে। শিশুকে প্রথম হতেই নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এবং নামাজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করতে আদেশ প্রদান করেছেন। যাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নামাজে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে এবং নামাজ যাতে কাজ না হয়। এমনিভাবে ১০ বছর বয়স হলে নামাজ না পড়লে প্রহার করতে আদেশ প্রদান করেছেন। কেননা, এর থেকে বেশি বয়স হলে তখন আর অভিভাবকের কথা গনবে না, এরপভাবে রাজা রাখার ক্ষেত্রে বালক-বালিকাদের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي تَفْرِيقِ الْمَصَابِيحِ :

বিছানা পৃথক করার ব্যাপারে আলিমগণের মতামত : বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বালক-বালিকাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। এটাই এ হাদীসের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। যেন তাদের মাঝে অবাঞ্ছনীয় কোনো ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে। কেননা, দশ বছর বয়সে কামস্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যায়।

কিছু সংখ্যক বলেন, দু'জন পুরুষ বা দু'জন মহিলা একই বিছানায় শুতে পারে, যদি তাদের সতর ঢাকা থাকে এবং কোনো অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটান আশঙ্কা না থাকে। তবে অসতর্ক অবস্থায় দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারী একই বিছানায় শোয়া হারাম। এমনিভাবে মা-ছেলেকেও এক বিছানায় থাকতে দেওয়া নিষেধ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে আমাদের ইমামগণ বলেছেন যে, ভাই-বোনদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দেওয়া ওয়াজিব।

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ مَعْبُدٍ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত আমর ইবনে শোয়াইবের বংশ পরিচয় হলো- بِنِمْصِيَةِ الْغَالِبِينَ -এর "•" সর্বনামটির মর্জ'ে হাফ্জ- عَمْرٌ অর্থাৎ আমর তার পিতা শোয়াইব হতে বর্ণনা করেছেন। আর عَمْرٌ -এর মধ্যকার "•" সর্বনামটির মর্জ'ে সন্দেহে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে-

১. এর **مَرْجِعٌ** হলো **عَسْرُو** এ ক্বেরে **جَدُّ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **مُعْتَدٌ** কেননা, মুহাম্মদ আমরের দাদা। এ অবস্থায় হাদীসটি মুরসাল হবে। কেননা, নবী করীম **ﷺ** এর সাথে মুহাম্মদের সাক্ষাৎ হয়নি।
২. অথবা **جَدِّ** এর **جَدُّ** সর্বনামটির **مَرْجِعٌ** হলো- **شُعَيْبٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য হবে (রুহ) **عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو** (রুহ) কেননা, **عَبْدُ اللَّهِ** শোয়াইবের দাদা। এমতাবস্থায় হাদীসটি **مُنْفِطِعٌ** হিসেবে সাবাস্ত হবে। যেহেতু শোয়াইব তাঁর দাদা আব্দুল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

وَعَنْ ٥٢٧ **بُرَيْدَةَ** (رَض) **قَالَ قَالَ**
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا**
وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

৫২৭. অনুবাদ : হযরত বুরইদা (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** ইরশাদ করেছেন- আমাদের ও তাদের [মুনাফিকদের] মধ্যে যে ওয়াদা রয়েছে তা হলো নামাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করবে সে [আপাত দৃষ্টিতে] কাফির হয়ে যাবে।-[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হলো নামাজ। যে নামাজ পড়ে না সে মুসলিম রূপে গণ্য নয়, আর যে নামাজ পড়ে সে মুসলমান হিসেবে গণ্য। এ কারণেই মহানবী **ﷺ** ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের নিকট হতে যথা সময়ে নামাজ পড়ার এবং তা ত্যাগ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন। লোকদের সাথে যে চুক্তি ছিল নামাজ। কেননা, নামাজ পড়াই হলো ঈমানের ও মুসলমান হওয়ার বাস্তব প্রমাণ। এটাই হলো ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ -এর অর্থ : মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল **ﷺ** নামাজ পড়ার জন্য অসংখ্যবার তাকিদ দিয়েছেন। ইসলামে অন্যান্য পালনীয় কর্মসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একে মহানবী **ﷺ** মুমিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্যকারী নিদর্শন হিসেবে সাবাস্ত করেছেন। বস্তুত কেউ যদি অহঙ্কারবশত বা অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে নামাজ পরিত্যাগ করে তা হলে তার কাফির হয়ে যাওয়া অবধারিত। এরূপ ব্যক্তি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য কেউ যদি নিছক গাফিলতির কারণে নামাজ না পড়ে, কিন্তু তা ফরজ হিসেবে মেনে নেয় তবে এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে ঈমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ফিকহবিদদের মতে সে কাফির নয়; বরং ফাসিক। তার তওবা করে নামাজ পড়া আবশ্যিক। যদি সে তওবা না করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামদের মতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না; বরং অন্যান্য শাস্তি দেওয়া হবে।

الْأَعْرَابُ বর্ণনাকারীর পরিচয় :

- নাম ও পরিচিতি : নাম বুরায়দা, পিতার নাম- হোসাইব, গোত্র আসলাম; আসলাম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছেন বিধায় তাকে আসলামী বলা হয়।
- ইসলাম গ্রহণ : বদর যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
- জিহাদে যোগদান : বদর বাতীত প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন।
- ইত্তেকাল : ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়ার শাসনামলে হিজরি ৬২ সনে 'মার্ব' নামক স্থানে তিনি ইত্তেকাল করেন। সাহাবী ও তাবয়ীনের একদল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

أَلْفُضْلُ التَّالِثِ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٨ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فَمِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا فَنَأَا هَذَا فَاقْضِ فِيمَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَرِدْ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا وَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ التَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلدَّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَأُمَّةٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মদীনার অপর প্রান্তে একজন মহিলার সাথে শৃংগার [যৌনকেন্দ্রী] করেছি এবং আমি তার সাথে সঙ্গম ব্যতীত সবকিছু করেছি। আন এই যে, আমি স্বয়ং উপস্থিত রয়েছি। অতএব আপনি আমার উপর যা ইচ্ছা হুকুম জারি করুন। এমন সময় হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধকে ঢেকে রাখতেন যদি তুমি নিজেকে নিজে ঢেকে রাখতে। রাবী আব্দুল্লাহ বলেন, নবী করীম ﷺ তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। অতঃপর লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং চলে গেল। অতঃপর নবী করীম ﷺ তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডাকলেন এবং এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন—
طَرَفَيْ التَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلدَّاكِرِينَ
এর্থঃ দিনের দু' অংশ এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূর করে দেয়। এটা হলো উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। [সূরা হুদ, আয়াত : ১১৪] এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর নবী! এ বিধান কি তার জন্য সুনির্দিষ্ট? তিনি বললেন, (না:) বরং সমস্ত মানুষের জন্যই।
-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٢٨ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ লোকটির পাপের কথা শ্রবণ করেও তার কোনো জবাব দেননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা লোকটির শাস্তির ব্যাপারে কিছু সহজ হুকুম অবতীর্ণ করতে পারেন। আর এ অপেক্ষায়ই রাসূল ﷺ কোনো সঃ প্রদান করেননি।

عَنْ ٥٢٨ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ এর অনুমতি ব্যতিরেকেই লোকটি মহানবী ﷺ এর দরবার ত্যাগ করল। এটা তার বেআদবির প্রতি ইঙ্গিত করে না। কেননা, রাসূল ﷺ তার কথার কোনো জবাব দেননি। তাই সে ধারণা করেছিল যে, নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে কোনো আদেশ অবতীর্ণ হবে এবং রাসূল ﷺ পরবর্তীতে তাকে তা অবহিত করবেন। ক্ষমার হুকুম আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর শাস্তির হুকুম আসলে তা সর্বাঙ্গকরণে মেনে নেবে। কাজেই قَامَ দ্বারা পালিয়ে যাওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কেননা, দোষ স্বীকার করার পর পালিয়ে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

عَنْ ٥٢٨ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -এর ব্যাখ্যা : বাকো رَجُلٌ দ্বারা হযরত ওমর (রা.) অথবা হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ۲۹۱ أَبِي ذَرٍّ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَجَ زَمَنَ الشَّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَاقَتُ فَاخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَاقَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمَسْلِمَ لَيَصِلَى الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَاقَتُ عَنْهُ دُثْرُوهُ كَمَا تَهَاقَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৫২৯. অনুবাদ : হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম ﷺ শীতকালে বের হলেন, তখন গাছের পাতা ঝরছিল। [তখন] তিনি গাছ হতে দু'টি ডাল জোরে ঝাকালেন, বর্ণনাকারী বলেন, এতে সে পাতা [আরো বেশি] ঝরতে লাগল। হযরত আবু যার (রা.) বলেন, তখন রাসূল ﷺ আমাকে ডাকলেন যে, হে আবু যার ! আমি জবাবে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল ! আমি উপস্থিত আছি। রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই মুসলমান বান্দা যখন নামাজ পড়ে, আর এর দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তখন তার [শরীর] থেকে তার পাপসমূহ ঝরে যায়, যেভাবে এই গাছ হতে পাতাসমূহ ঝরছে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اللَّهُ مُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ-এর ব্যাখ্যা : মুসলমান বান্দার নামাজ বা যে কোনো ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই। ইবাদতে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যিক। লোক দেখানো বা লোক শুনানো ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। একপ ইবাদতের ফলে সে আল্লাহর নিকট কিছুই আশা করতে পারে না।

التَّعَرُّفُ بِالرُّبُوبِيَّةِ রাব্বী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম- জুনদুব, কারো মতে জানদাব, আবার কারো মতে আল-জেন্দাবে যার অর্থ-পাখি; কিছু সংখ্যকের মতে বুরাইদা ইবনে জুনদুব। তবে প্রথম মতটি সর্বাধিক গৃহীত। উপনাম- আবু যার। এ নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। উপাধি শায়খুল ইসলাম, পিতার নাম- জুনাদা। গিফার গোত্রের লোক হিসেবে তাঁকে আল-গিফারী বলা হয়।
২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি মক্কাতেই রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুনাযির আহসান গিলানী (র.) তাঁকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ্যে শাহাদাতাভিন উচ্চারণ করার কারণে তিনি অনেক নির্যাতন ভোগ করেন।
৩. রাসূলের সাহচর্য : তিনি সর্বক্ষণ রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। মদীনায় রাসূল ﷺ তাকে মুনাযির ইবনে আমরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়ে দেন। 'যাতুররিকা' (ذَاتُ الرِّقَاعِ) যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল ﷺ তাকে মদীনার অশ্বীর নিযুক্ত করে যান।
৪. ইসলামের খেদমত : তিনি একজন পণ্ডিত, সাধক, কোমলমতি ও শরীফ লোক ছিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করাকে হারাম মনে করতেন।
৫. হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি রাসূল ﷺ হতে সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৩১টি বুখারী ও মুসলিমে মৌখিকভাবে, আর বুখারী ২টি ও মুসলিম ১৭টি হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন।
৬. ইন্তেকাল : তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফত আমলে ৩২ হিজরী ৮ই জিলহজ মদীনায় হতে ৪০ মাইল দূরে রবায়ত পল্লীতে ইন্তেকাল করেন; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান।

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا عَفَرُ اللَّهِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৫৩০. অনুবাদ : হযরত য়ায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাসুল্লাহ ﷺ ইশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি দু' রাকাত নামাজ পড়ে, আর তাতে ভুল করে না, [এর দ্বারা] আল্লাহ তা'আলা তার অতীত ওনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।-[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ لَا يَسْهُو فِيهِمَا -এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে لَا يَسْهُو فِيهِمَا শব্দটি لَا يَسْهُو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ অমনোযোগিতার সপক্ষে নামাজ পড়ে না। কেননা, অমনোযোগিতা ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তাই لَا يَسْهُو শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; বস্তুত এখানে সর্ব উল্লেখ করে মুসাব্বাব উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম য়ায়েদ, উপনাম আবু তালহা, আবার কারো মতে, আবু আব্দুর রহমান বা আবু যুর'আ, পিতার নাম খালেদ। তাঁর বংশের জনৈক ব্যক্তির নামের দিকে নিসবত করে তাঁকে জুহানীও বলা হয়।
২. তাঁর বংশ পরিচয় : তিনি হলেন জুহাইনা ইবনে য়ায়দ ইবনে লাইছ ইবনে সূউদ ইবনে আসলুম ইবনে আলহাফ ইবনে কুজাআ-এর বংশোদ্ভূত।
৩. ইসলাম গ্রহণ : সম্ভবত মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪. ইলমে হাদীসের খেদমত : তিনি সর্বমোট ৮১ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) বীয গ্রন্থে ছয়খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
৫. ইত্তেকাল : তিনি ৭৮ হিজরিতে ৮৫ বৎসর বয়সে কূফা নগরীতে ইত্তেকাল করেন। কারো মতে মদীনা বা মিসরে ইত্তেকাল করেন।

وَعَنْ ۵۳۱ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ تَوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ تَوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৫৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী করীম ﷺ নামাজের প্রশংসা আলোচনা করে বললেন, যে নামাজের প্রতি যত্নশীল হয় তার জন্য নামাজ কিয়ামতের দিন আলোকবর্তিকা, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে নামাজের প্রতি যত্নশীল হয় না, নামাজ তার জন্য আলোকবর্তিকা, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে না; বরং কিয়ামতের দিন সে কাফর, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে উঠবে।-[আহমদ, দারেমী, বায়হাকী-ও আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۵۳۱ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ -এর অর্থার্থ : নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকার অর্থ হলো, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়া এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সঠিক সময়ে ও যথা নিয়মে আদায় করা, কোনো অপ্রস্তুতেরই এক ওয়াক্ত নামাজও যেমন কাজ না হয়। যে ব্যক্তি এরপভাবে নামাজের সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন এ নামাজ

তার জন্য নূর হয়ে দেখা দেবে। কিয়ামতের দিন অন্ধকারের মধ্যে সে এই আলো দ্বারা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌছে যাবে। আর হিসাব-নিকাশের সময় এটা তার জন্য অকাটা প্রমাণ হিসেবে দণ্ডায়মান হবে। এর ফলেই সে জাহান্নাম হতে মুক্ত হয়ে জান্নাতে যেতে সক্ষম হবে।

وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ السَّحَابِ -এর মর্মার্থ : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকে না, তার নিকট পরিণতির কথা বুঝাবার জন্য মহানবী ﷺ পৃথিবীর সর্বনিকট চারজন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এ চার ব্যক্তির সঙ্গী হবে। এ চার ব্যক্তির সাথে হাশরে উঠার কারণ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কায়েম বলেছেন— (১) হয় সে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেশি মাশগুল হওয়ার কারণে নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকবে না তাই সে এর পরিণতিতে কান্দনের সাথে থাকবে। (২) অথবা দেশ-শাসনের রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামাজে গাফিলতি করবে ফলে তার পরিণতি ফিরাউনের সাথে হবে। (৩) কিংবা ওজারতী ও সরকারি-বেসরকারি চাকরিজনিত ব্যস্ততার কারণে সে যথাযথভাবে নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকবে না; তাই তার পরিণতি হবে হামানের সাথে। (৪) অথবা ফিবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ততার দরুন নামাজে গাফিলতি করলে সে উবাই ইবনে সখফের সাহচর্যে শাস্তিভোগ করবে।

উল্লেখ্য যে, এ সব নিকট ব্যক্তিদের সহচর হওয়ার অর্থ হলো, যদি কোনো মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ বলে বিশ্বাস না করে, তবে তাকে এ সব কুলাঙ্গারদের সাথে চিরকালই জাহান্নামে থাকতে হবে। তবে যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ হিসেবে বিশ্বাস করেও আদায় করতে ত্রুটি করে, তবে সে এদের সাথে জাহান্নামী হবে, আজাবের পরিমাণ সমান হবে না এবং সে তার অপরাধ পরিমাণ আজাব ভোগ করার পর মুক্তি পাবে।

الْتَّعْرِيْفُ بِقَارُونَ وَفَرْمَانَ وَهَامَانَ وَأَبِي بِنِي خَلِيفٍ - কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের পরিচিতি : কারুন : হযরত মুসা (আ.)-এর যুগের এক খোদোদ্রোহী ধনকুবের নাম কারুন। সে ছিল অগাধ সম্পদের মালিক। হযরত মুসা (আ.)-এর উপর তো ঈমান আনেইনি, উপরন্তু বনী ইসরাঈলীদের প্রতি ছিল চরম অত্যাচারী। আল্লাহর পথে সে এক কপর্দকও ব্যায় করত না। অবশেষে মহান আল্লাহর নির্দেশে তার সমস্ত অর্থ সম্পদসহ ভূমি তাকে গ্রাস করে নেয়।

ফিরাউন : খোদায়ীর দাবিদার মিসরের শাসনকর্তা। তার প্রকৃত নাম ছিল লৌদ ইবনে মুসআব। সে অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক ছিল। যারা তার বশ্যতা স্বীকার করত না তাদেরকে নির্মম অত্যাচারে নিঃশেষ করে দিত। সে হযরত মুসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে। এমনকি বনী ইসরাঈলীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। অবশেষে সে তার দলবলসহ নীল দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়।

হামান : এ ব্যক্তি ফিরাউনের রাজসভার সদস্য ছিল। সকল কু-কর্মের উপদেষ্টা ছিল সে। প্রধানমন্ত্রী থাকার সুবাদে সে বনী ইসরাঈলীদের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালায়। ফিরাউনের সাথে সেও নীল দরিয়ায় ডুবে মারা যায়।

উবাই ইবনে খালফ : উবাই ইবনে খালফ ছিল জাহিলিয়া যুগের অন্যতম ব্যবসায়ী ধনশালী ব্যক্তি। সে ছিল ইসলামের জঘন্যতম শত্রু। অনেক নওমুসলিমকে সে কষ্ট দিয়েছে। অবশেষে উচ্চদের যুদ্ধে এই পাপিষ্ট নিহত হয়।

وَعَنْ رِوَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَةَ (رَحْمَةً) قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُوهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ নীনি আমলসমূহের মধ্যে নামাজ ব্যতীত কোনো কর্ম পরিত্যাগ করাকেই কুফরি মনে করতেন না। [তিবমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ رِوَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَةَ বর্ণনাকারী পরিচিতি : তিনি ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ী। নাম- আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক, উপনাম- আবু আব্দুর রহমান বা আবু মুহাম্মদ। তিনি হযরত ওমর, ওসমান, আলী, আয়েশা (রা.)-সহ প্রমুখ সাহাবীদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। কাতাদা, আইয়ুব সাখতিয়ানী ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১০৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تَشْرِكَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَإِنْ قَطَعْتَ وَحَرَّقْتَ وَلَا تَشْرِكْ
صَلْوَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا
مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَعَ مِنْهُ الدِّينَ وَلَا
تَشْرِبِ الخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كَيْلٍ سَرِّ -
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৩৩. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু [অর্থাৎ, রাসূলে করীম
ﷺ] আমাকে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, (১) আল্লাহর
সাথে কাউকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে কেটে
টুকরো টুকরো করে ফেলে বা পুড়িয়ে ফেলে; (২)
স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করো না, যে ইচ্ছা করে
তা ত্যাগ করে তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা উঠে যায়।
(৩) এবং শরাব পান করে না। কেননা তা সমস্ত মন্দ
কাজের চাবিকাঠি স্বরূপ। -[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আশোচনা

عَنْ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর সেগুলো হলো, প্রথমত আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, এমনকি এ জন্য যদি নিহত হতে হয় বা ছিন্নভিন্ন হতে হয় কিংবা অগ্নিকূলে নিক্ষিপ্ত হতে হয় তারপরও শিরকে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত কোনো ঈমানদার ব্যক্তি কখনো এরূপ করতে পারে না। ঈমান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হলেও সে আকৃষ্ট চিত্তে তা দিতে প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু শিরকে লিপ্ত হবে না। দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছায় কখনো ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করবে না; কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামাজ পরিত্যাগ করে সে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হতে বের হয়ে যায়; বরং এরূপ ব্যক্তিকে অন্য হাদীসে কাফিরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত মদ পান না করা। কেননা, এটা হলো সকল পাপ কর্মের চাবিকাঠি। যেহেতু মদপানের ফলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তাই সে যে কোনো রকমের পাপ ও মন্দ কর্ম করতে কুষ্ঠিত হয় না।

আয়াত ও হাদীসের মধ্যে ষম্বু : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কাউকে যদি আল্লাহর সাথে শরিক করার জন্য জবরদস্তি করা হয়, এমনকি জীবন-হুমকির সম্মুখীনও হয় তবু শিরক করা যাবে না। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْإِيمَانِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَكْرَى وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَكْرَى وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَكْرَى وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَكْرَى

যাদের মুখে শিরক করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

ঘন্থের সমাধান : উল্লিখিত হাদীস ও আয়াতের মধ্যকার ঘন্থের সমাধান হলো, আয়াতের হুকুম বা ঐচ্ছিকতার উপর প্রয়োগ হবে, আর হাদীসের হুকুম তথা দৃঢ়তার উপর প্রয়োগ করা হবে।

অথবা হাদীসের বক্তব্য শুধু আবুদ দারদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর কুরআনের বক্তব্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

একই হাদীসের বক্তব্য শুধু আবুদ দারদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর কুরআনের বক্তব্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

একই হাদীসের বক্তব্য শুধু আবুদ দারদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর কুরআনের বক্তব্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

একই হাদীসের বক্তব্য শুধু আবুদ দারদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর কুরআনের বক্তব্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

যদি তাকে হত্যাও করা হয়। ঈমান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হলেও তা করবে, কিন্তু ঈমান পরিত্যাগ করবে না। তবে অনুরূপ অবস্থায় পড়ে যদি কেউ কেবলমাত্র মুখে কুফরি বা শিরকি কথা উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তরে দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে মানে, তবে এতে সে কাফির বা মুশরিক হয়ে যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ
مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (النَّحْلُ : ١٠٦)

উক্ত আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে, প্রথমত ঈমানের পরে যারা কুফরি গ্রহণ করে এবং তাতেই তাদের অন্তর সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর গজব তাদের উপরই পড়বে এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত যাদেরকে কুফরি বা শিরক করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাদের হৃদয়-মন যদি ঈমানে পরিপূর্ণ, নিশ্চিত ও আশ্বস্ত থাকে তবে তারা আল্লাহর গজব ও আজাব হতে নিষ্কৃতি পাবে।

فَاتَّهَا مِفْتَاحُ كَلِّ شَرِّ -এর মর্মার্থ : যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাভিচার, মানুষ হত্যা, চুরি করার অপরাধ ও শাস্তি মদ্য পানের তুলনায় জঘন্য, তবু আলোচ্য হাদীসে মদ্য পানকে সকল মন্দ কর্মের চাবিকাঠি ও উৎস বলার কারণ হলো, মদ্য পান এমন এক স্বভাব, যা ব্যক্তিকে ব্যাভিচার, হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক অপরাধে উদ্বুদ্ধ করে। মদ্যপায়ী মদের নেশায় মগ্ন হয়ে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় বা কাউকে হত্যা করে, সে বিবেকের দংশন অনুভব করে না। তার মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান না থাকার কারণে পর সম্পদ আত্মসাৎ ও ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি লজ্জা-শরম মানববিকতা বলতে তার কাছে কিছুই থাকে না; বরং তার মধ্যে শুরু হয় চরম পাশবিকতা, কদর্যতা, নির্ভরতা ও জুর হিংস্রতা। এ সকল কারণেই মহানবী ﷺ মদ্যপানকে সকল মন্দ কর্মের চাবিকাঠি রূপে চিহ্নিত করেছেন।

মদ পান করা সকল মন্দ কর্মের চাবিকাঠি এ কথা আজ পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একে নানা ব্যাধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। খাদ্য বিজ্ঞান তাকে খাদ্যবস্তু বলে স্বীকার করে না। আর সমাজ বিজ্ঞানও একে অপরাধের উৎস বলেছে। এসব কারণে পাশ্চাত্য জাতিসমূহও একে পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তা পরিহারের আন্দোলনে নেমেছে। বস্তুত বিবেক বর্জিত সকল কর্মের মূল উৎস এই মদের মধ্যেই নিহিত। তাই একে পরিহার করা সকলের উচিত।

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের সময়

اَلْمَوَاقِيْتِ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো- اَلْمَوَاقِيْتِ। শাব্দিক অর্থ হলো- [নির্দিষ্ট সময়]। এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও দেখা যায়। যেমন- اَلْمَوَاقِيْتِ كُنَّ عَلَىٰ رِجَالِكُمْ يَوْمَئِذٍ لِّتَأْتِيَ بِالنَّاسِ اَلْحِجَابَ وَالْحِجَابَ رِجَالًا مِّنْ دُونِ اَلْحِجَابِ مَأْمُورًا لِّقَوْلِ لَوْلَا اَلْحِجَابُ لَخَرَّ لَوْنًا مِّنْ دُونِ اَلْحِجَابِ (النَّجْم: ١٧)। এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও দেখা যায়। যেমন- اَلْمَوَاقِيْتِ كُنَّ عَلَىٰ رِجَالِكُمْ يَوْمَئِذٍ لِّتَأْتِيَ بِالنَّاسِ اَلْحِجَابَ وَالْحِجَابَ رِجَالًا مِّنْ دُونِ اَلْحِجَابِ مَأْمُورًا لِّقَوْلِ لَوْلَا اَلْحِجَابُ لَخَرَّ لَوْنًا مِّنْ دُونِ اَلْحِجَابِ (النَّجْم: ١٧)।

١. اَيُّمُ الصَّلَاةِ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُفَا مِّنَ اللَّيْلِ - (هُؤَد : ١١٤)

٢. اَيُّمُ الصَّلَاةِ لِيُدْرِكَ الشَّمْسُ اِلَىٰ عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ - (الْاَنْرَاُ : ٧٨)

٣. وَسَيَبْحُ بِحَيْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاطَّرَافَ النَّهَارِ - (طه : ١٣٠)

٤. فَسَبِّحْ لِلّٰهِ حِينَ تُمْسِرُ وَحِينَ تُصْبِحُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ - (الرُّؤْم : ١٨ - ١٧)

এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর কথা ও কাজের মাধ্যমেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَخْضِرْ العَصْرَ وَ وَقَتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَ وَقَتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ وَ وَقَتُ صَلَاةِ العِشَاءِ اِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَ وَقَتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ اَلْح -

আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসসমূহে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

الْفَضْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٣٤
عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتْ
الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَخْضِرْ
العَصْرَ وَ وَقَتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَ
وَقَتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ وَ
وَقَتُ صَلَاةِ العِشَاءِ اِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ
الْاَوْسَطِ وَ وَقَتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ
الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ
الشَّمْسُ فَامْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ
بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে, আর শেষ হয় যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয় তথা যে পর্যন্ত না আসরের সময় উপস্থিত হয়। আসরের সময় [তার পর হতে শুরু করে] সূর্য হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত থাকে। মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত [সূর্যস্ত হতে আরম্ভ করে] শফক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত থাকে। আর ইশার নামাজের ওয়াক্ত [এরপর হতে শুরু করে] মধ্য রাত পর্যন্ত থাকে এবং ফজরের নামাজের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ করে সূর্যোদয় শুরু না হওয়া পর্যন্ত থাকে। যখন সূর্যোদয় শুরু হয় তখন নামাজ হতে বিরত থাক। কেননা, সূর্য উদিত হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافٌ أَلِيمٌ نِمَى أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ :

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

وَقْتُ الظُّهْرِ : জোহরের নামাজের ওয়াক্ত : জোহরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢালে যাওয়ার পর হতেই জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। কেননা, আত্মাহ তা'আলা বলেছেন যে, أَمِ الصَّلَاةُ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ তবে এর শেষ সময় নিয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالصَّاحِبِينَ وَزُكْرَ وَنَفْسَانَ الشُّوْبَرِيِّ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে ছায়ায় আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, এরপর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

ভাঁদের দলিল :

۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَسْرَةَ (رض) مَرْفُوعًا وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ مَأْتَمٌ بِخَصْرِ العَصْرِ .

۲. عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (رض) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَايَةَ أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ .
(رح) مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكِ (رح) : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ছায়ায় আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়ার পর চার রাকাত নামাজের সময় হচ্ছে- وَقْتُ مُشْرِكَ تاতে জোহর ও আসর উভয়টি পড়া যায়। এরপর জোহরের সময় শেষ হয়ে যায়।

مَذْهَبُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ছায়ায় আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের শেষ সময় থাকে। এটাই ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মত। তার দলিল-

۱. عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ العَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضًا. نَبِيَّهُ . (أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

۲. عَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ قَدَرًا مَا يَسْتَبْرُ الرَّاكِبُ إِلَى ذِي الْحَلِيفَةِ . (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ)

۳. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهُنَّ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّدَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهُنَّ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّدَ فَقَالَ لَهُ أَيُّهُنَّ حَتَّى سَارَى الظِّلُّ الظِّلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ نَبِيْعِ جَهَنَّمَ . (بُخَارِيُّ)

শেষোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একগুণ ছায়ার পরও জোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

أَنْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ الخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ প্রমুখ ইমামগণের দলিলের জবাব নিম্নরূপ-

১. তাদের প্রথম হাদীসের كَطَوِيلِهِ الرَّجُلِ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ অংশটি الشَّمْسُ إِذَا زَالَتِ-এর উপর এপটে হয়েছে। তাই এ হাদীসে প্রথম সময়ের কথা বলা হয়েছে।
 ২. সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় হযরত ওমর (রা.)-এর কথা গ্রহণীয় হতে পারে না।
 ৩. অথবা বলা যায় যে, إِنَّ الْمِثْلَ الأوَّلُ أفضَلُ الوَقْتِ
 ৪. আত্মাহ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন-
- إِنَّ الْمِثْلَ الأوَّلَ مَحْضَرٌ لِلظُّهْرِ وَالْمِثْلَ الثَّلَاثَ مَحْضَرٌ لِلْعَصْرِ وَالْمِثْلَ الخَامِسَ مُشْتَرِكٌ لهُمَا وَلَكِنْ لَا يَحْمُزُ جَمْعُهُمَا فِيهِ .

رَفَّتِ الْمَصْرُ আসরের নামাজের ওয়াক্ত :

আসরের সময় নিয়ে ইমামদের মতভেদের বিবরণ : ইমামদের মতভেদের ভিত্তিতে জোহরের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর আসর নামাজের সময় শুরু হয়। তবে এর শেষে সময়সীমা নিয়ে ফিকহবিদগণের মতভেদ নিয়ে উপস্থাপিত হলো:—

- ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, মালিক, আহমাদ (র.) তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের অভিমত হলো, সূর্যাস্ত পৰ্যন্ত আসরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে :

তাদের দলিল—

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

۲. وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

- সুফিয়ান ছাওরী, হাসান ইবনে যিয়াদ, আবু ছওর (র.) প্রমুখের অভিমত হলো, সূর্য হ্রদ বর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

তাদের দলিল—

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَأُخِّرَ وَقْتُ الْعَصْرِ حِينَ تَصْفُرُ الشَّمْسُ .

۲. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ . (رَوَاهُمَا الطَّعَاوَنِيُّ)

الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُحَلِّينَ : তাদের হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, যে সব হাদীসে আসরের ওয়াক্ত সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে বলা হয়েছে তা দ্বারা আসরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা করা ই উদ্দেশ্য। ওয়াক্তের শেষ সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

رَفَّتِ الْمَصْرُ মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত : ইসলামি ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিব নামাজের সময় আরম্ভ হয়। তবে তার সর্বশেষ সময় নিয়ে ইমামগণের নিম্নোক্ত মতামত রয়েছে।

- ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মতে মাগরিবের নামাজের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। সূর্যাস্ত হওয়ার পর পরিভ্রতা অর্জন করে আযান একমত সম্পন্ন করে পাঁচ রাকাত নামাজ আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। তাদের দলিল—

۱. إِنْ جَبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .

- ইমাম আবু হানীফা (র.), আহমাদ (র.) প্রমুখের মতে شَفَقُ অন্তিমিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। দলিল—

۱. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ . (مُسْلِمٌ)

۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَوْلَى وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَأُخِّرَهُ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ . (مُسْلِمٌ)

۳. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ . (مُسْلِمٌ)

الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُحَلِّينَ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র.) প্রমুখ ইমামগণ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত যে হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এর জবাব নিম্নরূপ—

- হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে গেছে।
- অথবা মাগরিবের নামাজ সব সময় প্রথম ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব এ কথা বুঝানোর জন্য উভয় দিন প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়িয়েছেন।
- অথবা, এর দ্বারা মাকরুহ হতে বেঁচে থাকার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, মাগরিবের নামাজ শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেহি করে পড়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ।
- অথবা উত্তর এই যে, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা মাগরিবের ওয়াক্তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রমাণিত হয় সনদের দিক দিয়ে তা বিশ্বস্ত নয়।

شَقُّقُ শব্দের আভিধানিক অর্থ শফকের অর্থ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদে : شَقُّقُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- লাগিমা, তবে এর পারিভাষিক অর্থ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদকা রয়েছে। যেমন-

- ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সূর্য ছোবার পর পশ্চিমাকাশে যে লাগিমা দৃশ্যমান হয়, তা অন্তিমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে যে সাদা রেখা প্রকাশিত হয় তাই شَقُّقُ। যেমন- মহানবী ﷺ-এর বাণী إِذَا سَوَدَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَوَدَ الْأَمُّقُ
- ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদসহ প্রমুখ ইমামের মতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে লাগিমা দেখা যায় তাকে শফক বলা হয়, তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন যে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّسْفَقُ الْخَمْرَةُ

ইশার নামাজের ওয়াক্ত : শফক অন্তিমিত হওয়ার পর হতেই ইশার নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে ইশার শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

إِيْمَامُ أَبُو هَانِيْفَا، شَاْفَهِي، مَالِك، آهْمَدَسْه سَهْ لَآغِيْمَا دُرُشْمَانْ هِي، تَا اَنْتِمِيْتْ هِيْوََارْ پَر پشِئِمَاكَاشَهْ يَهْ سَادَا رَهْخَا پْرَكَاشِيْتْ هِيْ تَايْ شَقُّقُ। يَهْمَنْ- مَهَانَبِي ﷺ-ءَر بَاণِي إِذَا سَوَدَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَوَدَ الْأَمُّقُ

ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ.
 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَرَلَّ وَقْتُ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَأَخْرَجَهُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
- ইমাম ইবনুল মোবারক, সুফিয়ান ছাওবী, ইসহাক (র.) প্রমুখ ওলামার মত রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। তাঁদের দলিল হলো—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . (مُسْلِمٌ)

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর মতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। তাঁর দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস—

فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ صَلَّى يَمِي الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . (أَبُو دَاوُدَ)

عَنْ عُرَابٍ عَنْ ذَيْلِ الْمَغَالِيقِينَ : يَهْ سَبْ হাদীসে অর্ধরাত্রি বা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে জমহুরের বক্তব্য হলো এই যে, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হলো মোস্তাহাব ওয়াক্ত, অর্ধরাত পর্যন্ত জায়েজ ওয়াক্ত, আর তার পর হতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত হলো মাকরুহ ওয়াক্ত।

ওলামায়ে কেহাম এ কথার উপর একমত যে, সুবহে সাদেক হতে ফজরের নামাজের সময় শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এর সময় বিদ্যমান থাকে। আর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এর সময় শেষ হয়ে যায়। তাঁদের দলিল—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَالِمَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ . (أَبُو دَاوُدَ)

قُرْلَهُ تَعَالَى " تَسْبَعُ عِمْدُ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " .

عَنْ فَاتِمَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ -এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ-এর বাণী- فَاتِمَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ -এর অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে সূর্যোদয় হয়। এ কথার ব্যাখ্যা হাদীস বিশারদগণ বলেন—

- শয়তান দু'দলে বিভক্ত : একদল রাতে, আর অপর দল দিনে দায়িত্ব পালন করে, আর সূর্যোদয়ের সময়টা উভয় দলের মিলনকাল। তাই বলা হয়েছে— فَاتِمَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ
- কেউ কেউ বলেন, মানুষকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে শয়তান এ সময় দু'দল অনুসারী প্রেরণ করে। হাদীসে শিং বলে শয়তানের এ দু'দল অনুসারীকে বুঝানো হয়েছে।
- কেউ কেউ বলেন, শিং দ্বারা কাল্পনিক শিং বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জম্বু যেরূপ শিং দ্বারা অপরকে ঘোঁচা মারে, অতিশয় শয়তানও অদ্রুপ তার শিংরূপী প্রভারণা দ্বারা সত্যের মোকাবেলায় ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।
- আবার কেউ কেউ বলেন, শয়তান সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকে। উদয়কালে সূর্য পূজারীরা যখন সূর্যের পূজায় লিপ্ত হয়, শয়তান ডবন সূর্যের সামনে এসে দাঁড়ায় আর আল্লাহর নামে দেওয়া সেজদা নিজের নামে গ্রহণ করে।

يُؤْتِيهِمُ الْبَرَكَاتِ بِأَرْبَعِينَ

১. নাম ও পরিচিতি: নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু মুহাম্মদ, আবু আব্দুর রহমান ও আবু নুসাইর, পিতার নাম আমার ইবনুল আন, মাতার নাম রাইতা বিনতুল মুনাবিহ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আস বা পাপী।
২. ইসলাম গ্রহণ: হযরত আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা আমার ইবনুল আসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ৫ম অথবা ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার সাথে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল এক বর্ণনা মতে ১২/ ১৩ বছর আর অপর এক বর্ণনা মতে ২০ বছর। এ প্রসঙ্গে **صَاحِبُ الْإِكْمَالِ** বলেন-

أَسْلَمَ قَبْلَ أَبِيهِ وَكَانَ أُمُّهُ أَكْبَرَ مِنْهُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ سَنَةً وَقَبْلَ يَأْتِي عَشْرَةَ سَنَةً - وَنِسِ الْأَصَابَةِ - وَجَزَمَ إِبْنُ يُونُسَ بِأَنَّ بَيْتَهُمَا عَشْرَتَيْنِ سَنَةً -

৩. হিজরত: পিতা-পুত্র উভয়ের মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করেন।
৪. জিহাদে যোগদান: রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ যুদ্ধে পিতা আমার ইবনুল আস তাঁর নেতৃত্বের ঝাণ্ডা পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন। আব্দুল্লাহ পিতার চাপে সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুআবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। এ কারণে তিনি আমার অনুশোচনায় জর্জরিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'হায়! আমি যদি এই যুদ্ধের দশ বছর পূর্বে ইত্তেকাল করতাম।'
৫. তাঁর জ্ঞানগত অবস্থান: তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন। আরবি ও হিব্রু ভাষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাওরাত ও ইনজীলের উপরও দক্ষতা ছিল। হাদীস লেখার ব্যাপারে রাসূল ﷺ একমাত্র তাকেই অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে **صَاحِبُ الْإِكْمَالِ** বলেন,

إِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فَمِنْ أَنْ يَكْتُبَ حَدِيثَهُ فَإِذَنْ لَهُ

৬. হাদীসশাস্ত্রে অবদান: তিনি সর্বমোট ৭০০ হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ১৭টি মুত্তাফাকুন আলাইহি, ৮টি ইমাম বুখারী আর ২০টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন। তিনি **صَادِقٌ** নামক একটি হাদীসগ্রন্থও লেখেন।
৭. চরিত্র: তিনি অত্যন্ত পরহেজগার, আবেদ ছিলেন। ইতিহাসে তিনি প্রার্থনাকারী ও তওবাকারী হিসেবে ভূমিত ছিলেন। অধিক রোজা রাখতেন। রাতের আঁধারে বাতি নিভিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন, এতে তার দু'চোখের পাতা নষ্ট হয়ে যায়।
- ইত্তেকাল: বিগত মতে তিনি ৩৫ হিজরিতে ৭২ বছর বয়সে মিশরের 'ফুসতাত' নগরীতে ইত্তেকাল করেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম ও ইবনে যোবায়েরের মধ্যে সংঘর্ষ বোধার কারণে তাঁকে গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর নিজ আবাস স্থলেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٥٣٥ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى مَعَنَا هَذَيْنِ يَغْنَى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمْرًا بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَبِعَةً بَيْنَآءَ نَوْبَةٍ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ

৫৩৫. অনুবাদ: হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাদের সাথে এ দু'দিন নামাজ পড়ো, [প্রথম দিন] যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন বেলালকে আদেশ করলেন, বেলাল আযান দিলেন। অতঃপর তিনি আদেশ করলেন এবং বেলাল জোহরের একামত দিলেন। এরপর তিনি হুকুম করলেন, আর বেলাল আসরের একামত দিলেন, অথচ তখনও সূর্য উঁচুতে অবস্থিত এবং পরিষ্কার সাদা। অতঃপর তিনি হুকুম করলেন, ফলে বেলাল মাগরিবের একামত দিলেন, যখন সূর্য অস্তমিত হলো। তারপর তিনি আদেশ করলেন, বেলাল (রা.) ইশার

الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ
فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ
كَانَ النَّوْمُ الْقَائِمِ أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ
فَأَبْرَدَ بِهَا فَنَعِمَ أَنْ يَبْرَدَ بِهَا وَصَلَّى
الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً آخِرَهَا فَنَوَّوْا
الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ
يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا
ذَهَبَ ثَلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسْتَفَرَّ
بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلِ عَنَّ وَنَتِ
الصَّلَاةُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ وَنَتِ صَلَّوْتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ -
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

নামাজের একামত বললেন, যখন শফক অদৃশ্য হয়ে
গেল। অবশেষে নির্দেশ দিলেন হযরত বেলাল ফজরের
একামত দিলেন যখন সুবহে সাদেক উদ্দিত হলো।
অতঃপর যখন দ্বিতীয় দিন হলো রাসূলে কারীম ﷺ হযরত
বেলাল (রা.)-কে হুকুম করলেন যে, জোহরকে শীতল
হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে, তিনি বিলম্ব করলেন এবং
শীতল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। আর আসরের নামাজ
পড়লেন সূর্য যখন উঁচুতে অবস্থিত তিনি পূর্ব দিনের তুলনায়
তাতে বিলম্ব করলেন এবং মাগরিব পড়লেন শফক অদৃশ্য
হওয়ার কিছু পূর্বে আর ইশার নামাজ পড়লেন রাত
এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। এরপর ফজর
পড়লেন এবং তাতে ফর্সা করে পড়লেন, অতঃপর রাসূল
ﷺ বললেন, নামাজের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি
কোথায়? জবাবে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি
হাজির আছি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের নামাজের
সময় হলো তোমরা যা [এ দুই দিনে] দেখলে তার মধ্যবর্তী
সময়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উইট হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দুই দিনে দুই সময়ে নামাজ পড়ে নামাজের ওয়াক্তের সূচনা
ও শেষ সীমা জানিয়ে দিয়েছেন, তবে উক্ত হাদীসে যে সময় সীমা বর্ণনা করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ সীমা নয়। কেননা, অধিকাংশ
ওলামা এ কথার উপর একমত যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময় বিদ্যমান থাকে, যেমন নবী করীম (স.) বলেছেন-

(۱) مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

(۲) مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

এর অর্থ হলো, যদি কেউ যথা সময়ে আসরের নামাজ পড়তে না পারে তা হলে সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেলেও আসরের
নামাজ পড়তে হবে এর ফলে সে ঐ দিনের আসরের নামাজ পড়েছে বলে পরিগণিত হবে।

এমনিভাবে যদি কেউ রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরও ইশার নামাজ আদায় না করে থাকে তা হলে সুবহে
সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পড়ার তার সুযোগ রয়েছে। আর তখন পড়লেও তা মাকরুহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে
হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন- لَا يَنْتَزِعُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ.

উইট হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত বেলাল (রা.)-কে নবী করীম ﷺ শুধু জোহরের আযান
দিতে আদেশ দিয়েছেন, আর অবশিষ্ট চার ওয়াক্তের জন্য একামত বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায়
যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্যই আযান, একামত ও জামাত অপরিহার্য।

উইট হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত বেলাল (রা.)-কে নবী করীম ﷺ শুধু জোহরের আযান
দিতে আদেশ দিয়েছেন, আর অবশিষ্ট চার ওয়াক্তের জন্য একামত বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায়
যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্যই আযান, একামত ও জামাত অপরিহার্য।

الإفكاح সমস্যা : হাদীসে উল্লিখিত **رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ** দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নকারী ছিল একজন, এতদসঙ্গেও রাসূল **ﷺ** -এর মধ্যে বহুবচনের ঘমীর এবং **رَأَيْتُمْ** ক্রিয়া পদটি বহুবচন হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করলেন?

الإفكاح সমস্যার সমাধান : যদিও প্রশ্নকারী ছিলেন একজন, কিন্তু রাসূলে কারীম **ﷺ** ঘমীরটি এবং **رَأَيْتُمْ** ক্রিয়া পদটি বহুবচন ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, উপরে বর্ণিত নামাজের ওয়াক্তসমূহ প্রশ্নকারী ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র উম্মতে মুহাম্মাদী এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٦
عَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّمِنِي جِبْرِئِيلُ عِنْدَ
الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ
زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشَّرَاكِ
وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ
شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ
أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ
غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ
حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ
فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ
كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ
كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ
حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ
إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ
فَأَسْفَرَ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ
هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৩৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন- বায়তুল্লাহর পাশে হযরত জিবরাঈল (আ.) দু'বার আমার ইমামতি করেছেন। একবার তিনি আমাকে সাথে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছিল। আর তা ছিল মাধ্যাকাশ থেকে জুতার ফিতার প্রস্থের সমান। আর যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার অনুরূপ হয়েছিল, তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। আর যখন রোজাদার ইফতার করে [অর্থাৎ সূর্যাস্ত হয়] তখন তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। আর যখন শফক তথা লালিমা বিদূরিত হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ইশার নামাজ আদায় করেন। যখন রোজাদারের উপর পানাহার হারাম হয়ে যায়, তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর যখন আগামীকাল হলো, তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ঠিক সে সময় জোহর নামাজ আদায় করেন, যখন যে কোনো বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে গেল। যখন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হলো, তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসর নামাজ পড়লেন। যখন রোজাদার ইফতার করল, তখন তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামাজ পড়লেন। আর উষা উদ্ভাসিত হওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে ফজর নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! এটা হচ্ছে তোমার পূর্ববর্তী নবীদের নামাজের সময়। এ দু'ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাজের সময়। -[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الإفكاح -এর অর্থ : মহানবী **ﷺ** -এর বাণী- **أَنَّمِنِي جِبْرِئِيلُ** বাবকে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যথা- প্রথমত মহানবী **ﷺ** সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিবরাঈল (আ.) কিভাবে তাঁর ইমামতি করলেন?

জবাব :

১. **أَمْسَى جَبْرَائِيلُ** বাক্যের অর্থ হলো হযরত জিব্রাইল (আ.) আমাকে ইমাম বানিয়েছে, তিনি ইমামতি করেছেন এটা নয়; অর্থাৎ তিনি মুক্তাদী হয়ে লোকমা দিয়ে নামাজের শিক্ষা দিয়েছেন, আর নামাজের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তো রাসূল ﷺ পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন :
 ২. অথবা, এর অর্থ হলো হযরত জিব্রাইল আমার ইমামতি করেছেন, এর দ্বারা তার আংশিক মর্যাদা প্রমাণিত হয়, কিন্তু সামগ্রিক মর্যাদা প্রমাণিত হয় না।
 ৩. অথবা কমযোগ্য ব্যক্তির পিছনেও অধিকযোগ্য ব্যক্তির একতেনা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। যেহেতু রাসূল ﷺ ও প্রয়োজনে হযরত আবু বকর ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর একতেনা করেছেন।
- দ্বিতীয়ত : দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, হযরত জিব্রাইল (আ.) হলেন **غَيْرُ مَكْتَبٌ** আর রাসূল ﷺ হলেন **مَكْتَبٌ** তাই হযরত জিব্রাইল (আ.) কিভাবে রাসূলের ইমামতি করেছেন। রাসূল হলেন ফরজ আদায়কারী, আর হযরত জিব্রাইল হলেন নফল আদায়কারী।

জবাব :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য **غَيْرُ مَكْتَبٌ** হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিব্রাইল (আ.) ইমামতি করেছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হয়েছে।
 ২. আল্লাহ সে নির্ধারিত সময়ের জন্য হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে নামাজের **مَكْتَبٌ** বানানো হয়েছে। আর সে মুহূর্তে তাঁর উপরও সালাত ফরজ ছিল।
 ৩. অথবা বলা যায় হযরত জিব্রাইল (আ.) **مَكْتَبٌ** ছিলেন না বিধায় তাঁর সালাত ছিল নফল। আর সালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার আগে রাসূল ﷺ-এর উপরও সালাত ফরজ ছিল না; বরং নফল ছিল। তাই **مَكْتَبٌ**-এর নামাজই হয়েছে।
 ৪. অথবা বলা যেতে পারে যে, **أَمْسَى جَبْرَائِيلُ**-এর অর্থ হলো, **جَعَلَنِي إِمَامًا** হযরত জিব্রাইল (আ.) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন, অর্থাৎ রাসূল ﷺ ইমাম হয়েছেন আর হযরত জিব্রাইল (আ.) মুক্তাদী। এতে হাদীসের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।
 ৫. অথবা তখন নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেনা জায়েজ ছিল। আর এ কারণেই রাসূল ﷺ ফরজ আদায়কারী হওয়া সত্ত্বেও নফল আদায়কারী হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর পিছনে একতেনা করেছেন।
- هَذَا وَتَمَّتِ الْأَجْسَاءُ مِنْ قَبْلِكَ** নামাজের সূত্রপাতের ঘটনা : হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর উক্তি **هَذَا وَتَمَّتِ الْأَجْسَاءُ مِنْ قَبْلِكَ** 'এটাই পূর্বকার নবীগণের (নামাজের) সময়' দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বকার নবীগণের উপরও নামাজ ফরজ ছিল। এ সম্পর্কে ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী ওয়ায়িদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ-
১. হযরত আদাম (আ.)-এর তওবা ফজরের সময় কবুল হয়েছে। তখন তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়েছেন। ঐ সময় হতেই ফজর নামাজের প্রচলন শুরু হয়।
 ২. হযরত ইসমাইল (আ.) কুরবানি হতে দুধার বিনিময়ে রক্ষা পেয়েছেন জোহরের সময়, তখন তিনি চার রাকাত নামাজ পড়েছেন। এটাই 'জোহর নামাজ' নামে পরিচিত হয়।
 ৩. হযরত উযায়ের (আ.) এক বৎসর মৃত অবস্থায় থাকার পর একদিন আসরের সময় পুনর্জীবন লাভ করেন। তখন তিনি চার রাকাত নামাজ পড়েন। এটাই আসরের নামাজ নামে অভিহিত হয়।
 ৪. হযরত দাউদ (আ.)-এর অপরাধ ক্ষমা হয়েছে মাগরিবের সময়। তখন তিনি চার রাকাতের নিয়ত করে নামাজ আরম্ভ করেন; কিন্তু অধিক পরিমাণে কান্না-কাটি করার ফলে তৃতীয় রাকাতে বসে পড়েন। বাকি এক রাকাত আদায় করা আর সম্ভব হয়নি। সে হতে মাগরিব তিন রাকাত।
 ৫. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বপ্রথম এশার নামাজ পড়েন। এ হিসেবে প্রত্যেক নামাজের রাকাত ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

فَتَمَّ النَّعْمَازِضُ ۝ د্বন্দ্ব নিয়সন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা বর্ণনা করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, مَطَّأُ ۝ مَطَّأُ এটা আপনার পূর্বকার নবীদের (নামাজের) সময়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ফরজ ছিল। অথচ হযরত মু'আয (রা.) বর্ণিত হাদীস—

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِعْتَمُوا بِهِنَّ السَّلْوةَ فَإِنَّكُمْ فُطِنْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَتَمَّ تَصْلِيهَا أَنَّ تَبَلَّغُ . (أَبُو دَاوُدَ وَ بَيْهَقِيُّ)

অনুরূপভাবে উপরোল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নির্দিষ্ট; সুতরাং উভয় পক্ষের হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

১. উক্ত দ্বন্দ্ব সমাধানে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এখানে وَقْتُ الْوُضُوءِ বলে ওয়াক্তের সম্পূর্ণ সমাপ্তিগতভাবে নবীদের সাথে করা হয়েছে, পৃথক পৃথকভাবে নয়। আর নামাজ তো সমাপ্তিগতভাবেই নবীদের জন্য ছিল, যদিও ইশার নামাজ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নির্দিষ্ট।
২. কাজি বায়যাবী (র.) বলেন, ইশার নামাজ পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ ছিল না, নফল হিসাবে ছিল। সুতরাং নবীগণ নফল হিসেবে এ নামাজ আদায় করতেন। এখন ফরজ হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নির্দিষ্ট। তাই নফল হিসেবে হলেও পূর্ববর্তী নবীদের উপর এশার নামাজ ধার্য ছিল, তাই পূর্ববর্তী নবীদের দিকে ওয়াক্তের নিসবত করে وَقْتُ الْوُضُوءِ বলা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন—**وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَقَّ مِنَ الْفَاضِي**—
৩. অথবা এখানে هَذَا -এর দ্বারা وَأَوَّلَاتِ حَسْبُهُ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি; বরং এর পূর্বে উল্লিখিত إِشْرَارٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীদেরও নামাজের সময় ছিল।

هُدَيْنِ الرَّؤْفَتَيْنِ -এর মর্মার্থ : هُدَيْنِ الرَّؤْفَتَيْنِ -এই উভয় ওয়াক্ত দ্বারা হাদীসে উল্লিখিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রথম ও শেষ সীমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাদীসে উল্লিখিত প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের উভয় সীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগ, মধ্যভাগ বা শেষ ভাগে নামাজ আদায় করা যেতে পারে।

قَدَّرَ الشَّرَائِكُ -এর মর্মার্থ : জুতার ফিতাকে অরবিতে الْقَدَّرَ قَالَ বলা হয়। আর قَدَّرَ -এর অর্থ হলো পরিমাণ; অতএব قَدَّرَ الشَّرَائِكُ -এর অর্থ— জুতার ফিতার প্রস্থের পরিমাণ। আরবরা ক্ষুদ্র বা সামান্য পরিমাণ বস্তু বুঝাতে জুতার ফিতার সাথে তুলনা করে থাকে। অর্থাৎ সূর্য খুব সামান্য পরিমাণ পশ্চিম দিকে ঢললেই জোহরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়।

التَّعْرِيْفُ بِالسَّرَائِكِ :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম-আবুল আকবাস, মাতার নাম সুবাবাহ বিনতুল হারেজ। তাঁর উপনাম উম্মুল ফজল। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনার বোন। হযরত ইবনে আকবাস রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই ছিলেন।
২. বংশ পরিচয় : তাঁর বংশ ইয়দ্বাহ আলো আব্দুল্লাহ ইবনে আকবাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মনানাম।
৩. তাঁর জন্ম : রাসূলে কারীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ নবুত্তের দশম বছর তিনি মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন রাসূলে কারীম ﷺ ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ বৎসর। কারও মতে পনেরো, আবার কারো মতে দশ বৎসর। তবে ১৩ বৎসর হওয়াটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।
৪. তাঁর ফকিরত : উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উত্তম ব্যক্তি তিনি এবং বিজ্ঞ আলিম। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ফিক-হশাফ্র, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জ্ঞান দানের জন্য দোয়া করেছেন। তিনি বিজ্ঞ মুফাসসিরে কুরআন ছিলেন। দু'বার হযরত জিবরাঈল আমীনকে দেখেছেন। নবী কারীম ﷺ হযরত ইবনে আকবাসের জন্য দোয়া করেন—**اللَّهُمَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفَكِّهِ** অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ইবনে আকবাসকে হিকমত দান করুন।
৫. ইমাম হাদীসে তাঁর অবদান : হযরত ইমাম আহমদ বলেন, সাহাবায়ে কেহায়েদের মধ্য হতে সর্বমোট ছয়জন ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আকবাস (রা.) একজন। তিনি (১৬৬০) এক হাজার ৬ শত ৬০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে তাঁর বর্ণিত ৯৫ খানা হাদীস এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ১২০ খানা এবং ইমাম মুসলিম ৪৯ খানা স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও অসংখ্য তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬. তাঁর দৈহিক আকৃতি : তিনি অত্যন্ত সুন্দর এবং লম্বা ছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর মুখমণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। পৃষ্ঠা: ৫০১
ছিল। তিনি তাঁর দাঁড়িতে মেহেন্দির রং ব্যবহার করতেন।
৭. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষ দিকে চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ [আটশষটি] হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবাহর খেলাফতকালে তারোফে ইন্তেকাল করেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ তাঁর নামাজে জানাযায় ইমামাত করেন। জানাযা শেষে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ তাঁর শানে বলেন, **وَاللَّهِ مَا تَلَوْتُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا وَرَأَيْتُ رَسُوْلَهُ** এবং তথায় তাকে সমাহিত করা হয়।

التَّالِيَةُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٣٧
عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْعَاصِمِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ قَدْ نَزَلَ
فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ
إِعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُمَرُ فَقَالَ سَمِعْتُ
بَشِيْرَ بْنِ أَبِي مَسْعُوْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا
مَسْعُوْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ
ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ
صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بِخَسْبٍ
بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭. অনুবাদ : প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত। একদিন [তাবেয়ী] হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) আসরের নামাজ কিছু বিলম্বে আদায় করলেন। তখন হযরত উরওয়া (র.) তাঁকে বলেন, জেনে রাখুন, হযরত জিবরাঈল (আ.) একদা অবতরণ করলেন এবং রাসূল ﷺ কে নিয়ে ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন। তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলছ তা ভালোভাবে জেনে নাও। তখন উরওয়া (র.) বললেন, আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন। অতঃপর তিনি আমার ইমামতি করলেন, আমি তাঁর সাথে [জোহর] নামাজ পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [আসর] পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [মাগরিব] পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [ইশা] পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [ফজর] নামাজ পড়লাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি স্বীয় অঙ্গুলিতে হিসাব করে দেখান। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উরওয়া (রা.)-কে **إِعْلَمْ مَا تَقُولُ** বলার কারণ :

- হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) হযরত উরওয়া (রা.)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামতির কথা শুনে প্রথমে অভাবিত ও অকল্পনীয় মনে করেছিলেন, আর এ জন্যই তিনি উরওয়াকে লক্ষ্য করে বলেছেন **إِعْلَمْ مَا تَقُولُ** অর্থ, তুমি বুঝে-তনে বল। মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালিক (র.)-এর একটি হাদীসে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, তাতে রয়েছে-
إِعْلَمَ مَا تَحَدَّثُ بِهِ يَا عُمَرُ أَوْ أَنَّ جِبْرَائِيْلَ هُوَ الَّذِي أَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَوَقَّتَ الصَّلَاةَ
- অথবা, উরওয়া (র.) বিনা সন্দেহে রাসূল ﷺ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করার কারণেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) আশ্চর্য করেছেন এবং সন্দেহই হাদীস বর্ণনার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন।

৩. অথবা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁর উক্ত কথার মাধ্যমে সনদবিহীনভাবে হাদীস বর্ণনা না করার জন্য সকলের প্রতি কাঠার ঈশিয়ারী উক্তারণ করেছেন। যাতে কোনো প্রকার জাল হাদীস রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

أَشْرَفَ الْمَخْلُوقَاتِ ﷺ-এর ইমামতি করার স্বায়ণ : রাসূলে কারীম ﷺ তথা সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিব্বরাঈল (আ.) কর্তৃক মহানবী ﷺ-এর ইমামতি করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে হাদীস বিশদরণ নিম্নরূপ মতামত পোষণ করেন—

১. أَنَسِي -এর অর্থ হচ্ছে - جَمَلْنِي إِمَامًا وَكَانَ جِبْرَائِيلُ مُقْتَدِيًا অর্থাৎ হযরত জিব্বরাঈল (আ.) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন, আর তিনি মুক্তাদি হয়েছেন এবং পেছন থেকে আমাকে নামাজের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

২. আত্মমা আইনী (র.) বলেন, مَنْضُول -এর ইমামতি বৈধ, এর جَوَازُ -এর জন্য জিব্বরাঈল (আ.) রাসূলের ইমামতি করেন।

৩. অথবা বলা যায়, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হযরত জিব্বরাঈল (আ.) ইমামতি করেছেন। সে সময় নামাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে হযরত জিব্বরাঈল (আ.) অধিক অবহিত ছিলেন : (فَلَا تَلْزَمُ إِمَامَةَ مَنْضُولٍ عَلَى الْأَنْضَلِ)

বর্ণনাকারীর পরিচিতি : নাম ইবনে শিহাব যুহরী। আসল নাম- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব। ইমাম যুহরী (র.) ইলমে হাদীসের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস ছিল তাঁর অপূর্ব স্মৃতিশক্তির বাক্তর প্রমাণ।

আমর ইবনে দীনার তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম যুহরী অপেক্ষা হাদীসের অধিক প্রামাণ্য ও অকাটা দলিলরূপে আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি। আত্মাহ্ তাঁকে অপরিসীম স্মরণশক্তি দান করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা মতে, তিনি মাত্র আশি রাতে কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের আদেশক্রমে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলের হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, ইমাম যুহরী না হলে মদীনা হতে হাদীসসমূহ নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেতো।

তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, সাহল ইবনে সা'দ, সায়েব ইবনে ইয়যীদ, আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ, রবীয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে বিপুল সংখ্যক তাবেরী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার দুইশত। হিজরি ১২৪ সনে সিরিয়ার 'সাগুবালা' নামক গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন। আত্মাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

وَمَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর পরিচিতি :

১. জন্ম : হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের ৫০ বৎসর পর ৬১ হিজরি সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আব্দুল আযীয, আর মাতা ছিলেন হযরত ওমর ইবনুল খাতাবের পৌত্রী।

২. শিলাফত : তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় عِلَاةً عَلَى مَشَاهِجِ النَّسْرِ -এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ জন্য তাঁর শাসন আমলকে খেলাফতের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ৯৯ হিজরিতে উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর যুগে অসংখ্য সাহাবী ও তাবেরী জীবিত ছিলেন।

৩. ইসলামের খেদমত : অভিজ্ঞদের মতে তিনি প্রথম মুজাদ্দি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংগ্রহ ও তা কিতাবাকারে বিন্যস্ত করেন। তাঁকে প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি হাদীসশাশ্রে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন।

৪. ইন্তেকাল : হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ১০১ হিজরি সালে ৩৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইসলামের এই প্রথম মুজাদ্দি মাত্র আড়াই বৎসর সংস্কারমূলক কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু এ সংস্করণ সময়ে তিনি এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেন।

وَعَنْ ۵۳۸ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضَا)
 أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَالِهِ أَنْ أَمَّهُمْ أَمْرُكُمْ
 عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ
 عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهَرَبْنَا
 سِوَاهَا أَضَيَّعَ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ أَنْ
 كَانَ النَّفْسُ ذِرَاعًا إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ
 مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مَرْتَفِعَةً بَيْضَاءَ
 نَقِيَّةً وَقَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّايِبُ فَرَسَخِينَ أَوْ
 ثَلَاثَةَ قَبْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَ
 الشَّفَقُ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا
 نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
 فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ
 وَالنُّجُومَ بَادِيَةً مُشْتَبِكَةً- رَوَاهُ مَالِكٌ

৫৩৮. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [আঞ্চলিক] প্রশাসকদের কাছে লিখেছেন—আমার কাছে নামাজই আপনাদের সমস্ত কার্যের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করেছে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষা করেছে, সে তার দীনকে রক্ষা করেছে। যে ব্যক্তি নামাজকে বিনষ্ট করেছে সে তা হাড়া অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আরো অনিষ্টকারী। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) লিখেছেন, তোমাদের নিজেদের ছায়া এক হাত হতে তা তোমাদের সমান হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামাজ পড়বে। আর আসর পড়বে যখন সূর্য উচ্চ ও পরিষ্কার-সাদা থাকে এবং যাতে একজন আশ্বাহারী সূর্য অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দু' বা তিন ফরসখ পথ অতিক্রম করতে পারে। আর মাগরিব পড়বে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরক্ষণেই। ইশা আদায় করবে সূর্যের লালিমা দূর হওয়ার সময় হতে রাতের এক- তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এর পূর্বে নিদ্রা যায় তার চক্ষু নিদ্রা না যাক। যে ব্যক্তি এর পূর্বে নিদ্রা যায় তার চক্ষু নিদ্রা না যাক। যে ব্যক্তি এর পূর্বে নিদ্রা যায় তার চক্ষু নিদ্রা না যাক। আর ফজরের নামাজ আদায় করবে যখন নক্ষত্রসমূহ উজ্জ্বল ও ঘন থাকে। [মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَرِيفَةٌ مُرْتَفِعَةٌ فِيهَا يَعْنِي يَا وَيَالِهَا বা আসলী ছায়া চেনার উপায় : আসলী ছায়া চেনার উপায় হচ্ছে, কোনো এক স্থানকে সমান করে তার উপর একটি বৃত্ত আঁকতে হবে এবং বৃত্তের কেন্দ্রে একটি কাঠি দগায়মান করাতে হবে। বৃত্তের কেন্দ্র হতে বৃত্ত-রেখা পর্যন্ত দূরত্বকে ঐ কাঠির মাপে সমান চার ভাগে বিভক্ত করতে হবে। তাতে মোট তিনটি বিন্দু হবে। প্রতিটি বিন্দুকে ব্যাসার্ধ ধরে বৃত্তের মধ্যে আরও তিনটি অস্পষ্ট বৃত্ত আঁকতে হবে। এখন খাড়া করা কাঠিটি মূল বৃত্তের ব্যাসার্ধের চারভাগের একভাগ। অর্থাৎ ভূমির সমান করে ঐ কাঠি দিয়ে বৃত্তরেখার দিকে পরিমাপ করলে চার কাঠি হবে। সূর্য পশ্চিম দিকে হলেও আরম্ভ করলে কাঠির ছায়াও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এক সময়ে বৃত্ত-রেখা অতিক্রম করে বের হয়ে যাবে। এটি অতিক্রম করার বিন্দু। দুপুরে কাঠির ছায়া এ রেখার উপরে আসলে যে ছায়াটুকু পাওয়া যাবে তা-ই প্রকৃত ছায়া; এরপর উক্ত ছায়া যখন বৃদ্ধি হয়, তখন তাকে *زَوَالٌ* বলে এবং তখন হতেই জোহরের গোয়াক আরম্ভ হয়। প্রকৃত ছায়া স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো সময় আসলী ছায়া পরিদৃষ্ট হয় না।

إِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي التَّوَمِّ قَبْلَ الْغَمَاءِ :

ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার ব্যাপারে আদিমদের মতভেদ : ইশার নামাজ পড়ার পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

مَنْ نَامَ مِنْهُ مَالِكٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ حَسْرٍ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَعَبْرَةٌ
 ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম মালিক, আতা, মুজাহিদ, তাউস (র.) প্রমুখের মতে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া মাস্কুহ

তাদের দলিল— (۱) عَنْ سَيِّرِ بْنِ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَكْرَهُ التَّوَمَّ قَبْلَهَا (أَبُو أَعْيَنَ)।
দ্বিতীয়ত হযরত ওমর (রা.) ইশার পূর্বে শয়নকারীর জন্য বদ দেয়া করেছেন, যেমনি তিনি বলেছেন—

فَمَنْ تَامَ فَلَا تَأْتِ عَيْنُهُ۔

(۲) مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلِيِّ وَابْنِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) : ইমাম আবু হানীফা, আলী এবং আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর মতে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া জায়েজ। তাদের প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ—

(۱) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ائْتَمَّ بِالْعَمَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ (رض) نَامَ الْبَيْتَاءُ وَالصَّبِيَّانُ۔

এতে দেখা যায় যে ইশার পূর্বে মহিলারা ও বালকেরা ঘুমিয়েছিল। এতে রাসূল ﷺ কোনো রকম অসত্বষ্টি প্রকাশ করেননি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَغَلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَحْرَمَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَبَقْنَا ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ

এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার কারণে রাসূল ﷺ কোনো রকম অসত্বষ্টি প্রকাশ করেননি।

তাঁদের হাদীসের জবাব : (১) এ সব হাদীসে নিদ্রা দ্বারা এরূপ নিদ্রা উদ্দেশ্য, যা এশার নামাজ ছুটে যাওয়ার কারণ হয়। (২) অথবা ঐ নিদ্রা উদ্দেশ্য, যা মোস্তাহাব ওয়াক্তের ফজিলত ছুটে যাওয়ার কারণ হয়।

(৩) অথবা এর দ্বারা ঐ নিদ্রা উদ্দেশ্য, যা জামাতে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

এ কারণে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যদি কেউ নিদ্রা যাওয়ার পর পুনরায় জামাত হওয়ার ব্যাপারে আস্থাবান হয় অথবা জামাত করে দেওয়ার মতো অন্য কোনো লোক থাকে তবে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া মাকরুহ নয়; অন্যথা মাকরুহ।

ইশার পর কথা বলা শ্রসসে : ইমামগণ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইশার নামাজের পর কথাবার্তা বলা মাকরুহ। কেননা, হাদীসে এসেছে إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَكْرَهُ التَّوَمَّ قَبْلَهَا—
কথাবার্তা বলা মাকরুহ হওয়ার কারণগুলো হলো—

১. ইশার পরে কথাবার্তা বললে শেষ রাতে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে যান, ফলে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
২. এটা অনেক সময় ফজর নামাজ কাজা হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৩. ফজরের জামাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।
৪. ফজর নামাজ উত্তম ওয়াক্তে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।
৫. ঘুম নষ্ট হলে যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগি ও অন্যান্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। তবে এমন সব কথাবার্তা বলা মাকরুহ নয়, যা দীনের ক্ষেত্রে উপকারী।

الرَّابِعُ الْتَّعْرِيفُ بِالرَّأْيِ : রাবী পরিচিতি :

১. নাম ও উপনাম : তাঁর আসল নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস। তাঁর গুণবাচক নাম ফারুক। তাঁর পিতার নাম খাতাব আর মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশেম ইবনে মুগীরা।
২. বংশধারা : তাঁর বংশ ধারা হলো, ওমর ইবনুল খাতাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল ওজ্জা ইবনে রিয়াহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রাযাহ ইবনে আদী। তাঁর উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষের ক্রমধারা রাসূল ﷺ-এর সাথে গিয়ে মিলে যায়। তিনি কুরায়শ বংশসদস্য।
৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি নবুয়তের ৬ষ্ঠ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে, তিনি নববী পঞ্চম সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে চল্লিশজন পুরুষ এবং এগারোজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারও মতে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই পুরুষের সংখ্যা ৪০ [চল্লিশ] পূর্ণ হয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং তখন তিনি 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি আরকাম ইবনে আবুল আরকামের ঘর, যা সাফা পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত তথায় রাসূল করীম ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনাও রয়েছে।

৪. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইত্তেফাকের পর তিনি ১৩ হিজরি ২৩ ই জামাদুল উত্বর মোতাবেক ২৪ শে আগস্ট ৬৩৪ সালে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আত্মাহের দরবারে নিম্নের দোয়া পাঠ করেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ سَعِيْبٌ فَرَوْنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ غَلِيْظٌ فَلْيَبْسِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ جَبِيْلٌ فَتَسَبِّحْنِىْ

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী কর। হে আল্লাহ! আমি কঠোর আমাকে কোমল কর, হে আল্লাহ! আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল কর।

- ২৩ হিজরি ২৩ ই জিলহজ্জ মোতাবেক ৩ রা নভেম্বর ৬৪৪ সালে তাঁর খেলাফত সমাপ্ত হয়। তাঁর খেলাফতের সর্বমোট ব্যয় হলো ১০ বছর ৬ মাস। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তবে তাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন বলা হতো। কেনন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফাতুর রাসূল ﷺ বলা হতো।
৫. রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সাথে সম্পর্ক : তিনি খীয় কন্যা হযরত হাফসা (রা.)-কে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন। আবার নিজে হিজরি ১৭ সালে হযরত আলীর মেয়ে উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চল্লিশ হাজার দেহরহাম মোহরানা দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।
৬. তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯ [পাঁচশত উনচল্লিশ] টি। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম উভয়েই তাঁদের সহীহ কিতাবে ১০টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর বুখারী এককভাবে ৯টি ও মুসলিম এককভাবে ১৫ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।
৭. তাঁর খেলাফতকালে উল্লেখযোগ্য তথ্য : তাঁর শাসনামলে সর্বাধিক রাজ্য জয় হয়। বিজিত রাজ্যের সংখ্যা হলো ১০৩৬ তিনি সর্বপ্রথম হিজরি সন প্রবর্তন করেন। তারাবীহের নামাজ জামাতে পড়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।
৮. শাহাদাত লাভ : হিজরি ২৩ সালে ২৪ শে জিলহজ্জ বুধবার দিন তিনি মসজিদে নববীতে ইশার নামাজে ইমামত করতে দাঁড়ালে মুগীরা ইবনে শো'বার ক্রীতদাস আবু লু'লু বিদ্রোহ একখানা তরবারি হাতে নিয়ে নামাজের কাতার ফাঁক করে তাঁর নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাথায় ও নাতীতে মারাত্মক আঘাত করে। অবশেষে তিনদিন পর ২৭শে জিলহজ্জ শনিবারে তিনি ইত্তেফাক করেন।
৯. দাফন ও নামাজে জানাযা : তাঁর শাহাদাতের পর হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুতিক্রমে তাঁকে তাঁর দুজরা এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাম পার্শ্বে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ۵۳۹ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رَض) قَالَ كَانَ قَدْرَ صَلَوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرِ فِى الصَّيْفِ ثَلَاثَةً اَقْدَامٍ اِلَى خُمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَا وَخُمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلَى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ - (رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রীষ্মকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জোহরের নামাজের সময়ের পরিমাণ [তথা ছায়ার পরিমাণ] ছিল তিন হতে পাঁচ কদম পর্যন্ত এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম পর্যন্ত।—[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَدْرٌ قَدْرٌ শব্দটি اَقْدَامٌ -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো— পা, এখানে এক কদম বলতে এক হাত দূরত্ব বুঝিয়ে থাকে। পাঁচ ও সাত কদম বলার দ্বারা গ্রীষ্ম ও শীতকালের ১/১৫সী ছায়ার ব্যবধান বুঝানো হয়েছে। কেনন। গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে ছায়ার পরিমাণ দীর্ঘ হয়ে থাকে।

بَابُ تَفْجِيلِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : ওয়াক্তের শুরুতে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়া

আল্লাহ তা'আলা নেক কাজসমূহ তরান্বিত করার জন্য আদেশ দিয়ে বলেন,

(۱) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ الْخ. (۲) فَاسْتَجِيبُوا لِمَدْعَاتِ الْخ. (۳) وَسَارِعُوا إِلَىٰ الْمَغْفِرَاتِ الْخ.

আর হাদীসে এসেছে যে: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ أَوَّلُ مَنِ الصَّلَاةَ وَضَوَانَ اللَّيْلِ الْخ.

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজই সকাল সকাল ওয়াক্তের শুরুতে পড়াই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদসহ প্রমুখ ইমামগণ এ মতই পোষণ করেন।

তবে অপরাপর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাজ উষার আলো স্পষ্ট হওয়ার পর পড়া, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ বিলম্বে পড়া, শীতকালে শীঘ্রই পড়া এবং আসরের নামাজ প্রত্যেক ঋতুতে কিছুটা গোঁথে পড়া এবং ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া উত্তম : ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ ইমামগণ এ মতই পোষণ করেন। তাঁরা জবাবে বলেন, যে সব আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া উত্তম তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ভাগ।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ سَبَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ
أَنَا وَأَبِي عَلَىٰ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ
أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي
تَدْعُونَهَا الْأَوْلَىٰ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ
وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدَنَا إِلَىٰ رِجْلِهِ
فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسَبْتُ
مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَجِيبُ أَنْ
يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ
وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلِهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا
وَكَانَ يَنْقِطِلُ مِنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ
الرَّجُلُ جَلِيْسَةَ وَيَقْرَأُ بِالسَّيْتَيْنِ إِلَى
الْمِيَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ
الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ
قَبْلِهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সায্যার ইবনে সালামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা [সাহাবী] আবু বারযা আসলামীর নিকট গমন করলাম, অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ নামাজ কিভাবে (কখন) পড়তেন? তিনি বললেন, জোহরের নামাজ, যাকে তোমরা প্রথম নামাজ বলে, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে চলতো তখনই পড়তেন। আর আসরের নামাজ পড়তেন যার পর আমাদের কেউ মদীনার অপর প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত অথচ সূর্য তখনও পরিষ্কার থাকতো, বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে কি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। ইশার নামাজকে দেরি করে পড়তে ভালবাসতেন যাকে তোমরা আতামা বলে থাক। এর পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন। আর তিনি ফজরের নামাজ হতে অবসর হতেন। যখন কোনো লোক তাঁর পাশে বসা সঙ্গীকে চিনতে পারতো এবং তাতে ষাট হতে একশত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছাতেও বিধাবোধ করতেন না এবং এর পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলাকে পছন্দ করতেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا يَبَانُ الْآرْقَابُ الْمُسْتَحَبَّةُ بِالتَّفْوِيلِ مَعَ الْأَوَّلَةِ : পীচ ওয়াক নামাজের মোস্তাহাব ওয়াকের প্রমাণসহ বর্ণনা :
 جَوَاهِرُ الْمَنَاجِزِ : জোহর নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক : জোহরের নামাজ কখন পড়া মোস্তাহাব এ বিষয়ে
 ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

إِمَامُ أَبِي هَانِيئَةَ، إِبْرَاهِيمُ، إِسْحَاقُ، إِسْحَاقُ، إِسْحَاقُ، إِسْحَاقُ : ইমাম আবু হানীফা, ইসহাক, আহমদ, ইবনুল মুবারক সহ অধিকাংশ
 ইমামের মতে গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ বিলম্বে আদায় করা উত্তম।

ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রহণে লিখেছেন যে,

الصَّبِيحُ لِشَحَابِ الْإِبْرَاهِيمِ قَالَ قَالَ جُمْهُرُ الْعُلَمَاءِ وَجُمْهُرُ الصَّحَابَةِ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ
 অর্থাৎ সঠিক কথা হলো জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আদায় করা মোস্তাহাব। অধিকাংশ আলেম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীর
 বক্তব্য এটাই। কেননা, এ ব্যাপারে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তবে শীতকালে জোহরের নামাজ তাড়াতাড়ি
 পড়া উত্তম। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। হানাফীদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرَدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَبْحِ جَهَنَّمَ
 (مُسْلِمٌ)

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ قَبْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرَدُوا بِالصَّلَاةِ - (مُسْلِمٌ)

(٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : أَرَادَ مُؤَدِّنُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُؤَدِّنَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْبَرُ أَبْرَدُ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ
 شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَبْحِ جَهَنَّمَ - قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا الْقُلُوبَ - (مُسْلِمٌ)

(٤) عَنْ أَنَسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدُ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلٌ - (النَّسَائِيُّ رَوَى
 الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ)

(٥) عَنِ السُّغَيْرَةِ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ ثُمَّ قَالَ لَنَا أَبْرَدُوا بِالصَّلَاةِ .

বৌদ্ধিক প্রমাণ : দেরি করে নামাজ পড়লে জামাতে জনতার উপস্থিতি সংখ্যা বেশি হয়, যা অতিরিক্ত হওয়াবের কারণ হয়
 তদুপরী ঐচ্ছায়া জামাতের জন্য অপেক্ষমান থাকার কারণে অধিক হওয়াব প্রাপ্ত হবে।

إِمَامُ أَبِي هَانِيئَةَ (ر.ح.)-এর মতে যদি চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকে— (১) গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়া, (২)
 প্রচণ্ড গরম পড়া, (৩) জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, (৪) দূরবর্তী এলাকা হতে লোকদের উপস্থিতি হওয়া। তবে
 জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আদায় করা মোস্তাহাব, নতুবা তাড়াতাড়ি পড়াই উত্তম।

মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। ইমাম আহমাদ হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তাঁরা নিজেদের
 মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন—

হাদীস ভিত্তিক দলিল—

(١) عَنْ أَبِي عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْآرْقَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْآخِرُ عَقْرُ اللَّهِ -

(٢) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَلِيُّ كُنْ لَكَ لَا تُوَضَّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ - (ترمذی)

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْآخِرُ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَكْلِ وَقْتِهَا - (ترمذی)

আক্ষরী দলিল : প্রচণ্ড গরমের সময় নামাজ পড়লে কষ্ট বেশি হয়। আর বেশি কষ্ট অধিক হওয়াবের কারণ, যেমন ইরশাদ
 হয়েছে—
 أَهْرَكُمْ عَلَى قَدْرِ نُصُوبِكُمْ

الجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِينَ : হানাফীদের পক্ষ হতে তাদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ :

ক. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জোহরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম সেগুলো
 جَوَاهِرُ الْمَنَاجِزِ হাদীস দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। কেননা, মুগীরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اَرْقَابُ الْآخِرَةِ

বিলম্ব করে পড়া সংক্রান্ত হাদীসই শেষ পর্যায়ের হাদীস। যেমন তিনি (যুগীরা) বলেছেন— **كُنَّا نَصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ** উল্লেখ্য যে, বর্ণটি বিলম্বের সাথে ক্রমবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, **إِذَا**—এর হাদীস শেষ পর্যায়ের হাদীস। খাদ্বাস বর্ণিত হাদীসও এ কথাই সমর্থন করে। এতে রয়েছে যে, **كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الْإِذَا**

খ. অথবা ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাড়াতাড়ি পড়া বৈধ। তবে উত্তম হলো দেরি করে পড়া। যা অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় :

গ. মোস্তা আলী কাসী (র.) বলেন, ঐ সমস্ত হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম সময় বুঝানো উদ্দেশ্য।

ঘ. তাড়াতাড়ি পড়া সংক্রান্ত হাদীসের বিধান আম, আর বিলম্ব সংক্রান্ত হাদীসের বিধান বাস। হৃদয়ের সময় খাসেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে।

আক্ষয়ী দশিলের উত্তর : কষ্টের আধিক্য ছওয়াবের আধিক্যের কারণ হওয়া সাধারণ বিধান নয়। কেননা, কোনো কোনো সময় কষ্টের স্বল্পতাই অধিক ছওয়াবের কারণ হয়। যেমন— সফর অবস্থায় কসর নামাজ পড়া।

الْوَقْتُ الْمُنْتَحَبُ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ আসরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : আসরের উত্তম ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَابْنَ السَّبَّاحِ (ر.) : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, ইসহাক, ইবনুল মুবারক (র.) প্রমুখ ওলামার মতে আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম। তাঁদের মতের স্বপক্ষীয় দলিলগুলো নিম্নরূপ—

(১) **عَنْ عَائِشَةَ (ر.) أَنَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا - (مُسْلِمٌ)**

(২) **عَنْ أَنَسٍ (ر.) أَنَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَبِعَةً حَتَّىٰ تَذْهَبَ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي نَبَاتِيِّهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَبِعَةً وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ أَيْمَةٌ أَيْمَالُ أَوْ تَحِيْرُهُ - (مُسْتَقٌ عَلَيْهِ)**

(৩) **عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (ر.) يَقُولُ كُنَّا نَصَلِّيُ الْعَصْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْرُ الْجَزُورِ فَتَقْسِمُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَطْفِئُ فَنَأْكُلُ لَعْمًا تَضِيحًا قَبْلَ مَخِيْبِ الشَّمْسِ - (مُسْلِمٌ)**

مَذْهَبُ الْأَحْوَثِيِّ : ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আসরের নামাজ সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া উত্তম। তাঁর মতের পক্ষে প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ—

(১) **عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (ر.) أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ تَمَجُّبًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَمَجُّبًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ - (أَبُو دَاوُدَ - أَحْمَدُ)**

(২) **عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَشَدَّ تَمَجُّبًا لِلظُّهْرِ وَأَشَدَّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ)**

(৩) **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَيْضَةً - (أَبُو دَاوُدَ)**

(৪) **عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ (ر.) فِي الشَّجِيدِ الْأَعْظَمِ فَجَاءَ السُّؤْدُ فَقَالَ الصَّلُوا يَا أَيُّهَا السُّؤْدِيَّةُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ عَلِيٌّ (ر.) اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ مَاءَ السُّؤْدُ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ (ر.) هَذَا الْكَلْبُ يَمْلِكُنَا السُّؤْدُ فَقَالَ عَلِيٌّ (ر.) فَصَلُّوا بِمَا الْعَصْرُ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوسًا فَتَنَزَّوُ الشَّمْسُ الْمَغِيْبَ - (حَاكِمٌ)**

এ ছাড়া **سَيِّئٌ** শব্দের অর্থের মধ্যেও বিলম্ব করার অর্থ পাওয়া যায়, যেমন— আবু কিলাবা হতে বর্ণিত আছে— **رَأَى سَيِّئًا** কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন— **مَقَالٌ جَاءَ فَلَانَ عَصْرًا أَيْ بَيْتًا**— কাসারী বলেন **لِيَعْمَرَ أَيْ يَتَوَخَّرَ**—

رَأَى سَيِّئًا الْعَصْرَ لِيَعْمَرَ وَتَوَخَّرَ—

ইমামহাদদের উপস্থাপিত দশিলের উত্তর : তারা নিজেদের মতের সমর্থনে যে সব হাদীস

পেশ করেছেন হানাফীদের পক্ষ হতে এর জবাব নিম্নরূপ—

প্রথম হাদীসের উত্তর : **وَالنَّسَسُ مِنْ حَجْرَتِهَا** এর উত্তরে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কক্ষের দেওয়াল নিচে অবস্থিত ছিল, তাই সূর্যরশ্মি সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কক্ষের ভিতরেই থাকতো। সুতরাং এটা দ্বারা শীত্রে শীত্রে নামাজ পড়া প্রমাণিত হয় না, বরং এটা দ্বারা বিলম্ব করে পড়া উত্তম বলে প্রমাণিত হয়। আত্মামা বদরুন্নাহীন আইনী (র.) ইমাম তাহাবী (র.) হতে এরপই বর্ণনা করেছেন।

বিভীয়া হাদীসের উত্তর : (ক) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে যে, **الْمَوَالِي إِلَى الْمَوَالِي** রয়েছে এর ভিত্তি হলে অনুমানের উপর, আর এর উপর নির্ভর করে আসরের নামাজ শীত্রে শীত্রে পড়ার হুকুম দেওয়া যায় না। (খ) অথবা যেহেতু গ্রীষ্মকালে সময়ের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশস্ততা থাকে, সুতরাং হাদীসটির বিধান সে সময়ের জন্য নির্দিষ্ট। (গ) অথবা **إِلَى الْمَوَالِي** এর বিধান এ সকল ব্যক্তিরদের জন্য নির্দিষ্ট, যারা দ্রুতগামী অথবা যোড়ায় চড়ে দ্রুততার সাথে পথ অতিক্রম করে। এর দ্বারা শীত্রে নামাজ পড়া বৃথা যায় না। (ঘ) অথবা রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ আদায় করে শিক্ষা ও অধিক হওয়ার লাভের উদ্দেশ্যে দূর-দুরান্ত হতে লোক এসে জামাতে শরিক হতো এবং নামাজের পরে আবার তার নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতো। তাদের কষ্টের দিকে লক্ষ্য করে শীত্রে শীত্রে নামাজ পড়া হতো। সুতরাং শীত্রে শীত্রে পড়া ছিল একটি বিশেষ কারণের সার্থে সম্পূর্ণ, নতুবা বিলম্ব করে পড়াই উত্তম।

তাহাবী শরীফের **وَقَبَّ النَّصْرُ** এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ে মসজিদে কুবায় গিয়ে ও শৌকেরা দেখতো যে, সৈন্যনে জামাত হাঙ্ক। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন এলাকায় সাহাবীরা আসরের নামাজ বিলম্ব করেই পড়তেন। আর এটাই হলো আসল বিধান। রাসূল ﷺ শুধুমাত্র বিশেষ কারণে কখনো শীত্রে আদায় করতেন। তৃতীয় হাদীসের উত্তর : তৃতীয় হাদীসে যে আসরের নামাজের পর উট জবাই করে বটন ও রান্না করত সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, বিলম্ব আসরের নামাজ আদায় করেও এ কাজগুলো আত্মাম দেওয়া সম্ভব। পাকা বাবুর্চির জন্য এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিশেষ করে তারা গোশত অর্ধসিদ্ধ করে খেতো। ফলে বেশি সময়েরও প্রয়োজন হতো না। অতএব এ হাদীস দ্বারা শীত্রে নামাজ আদায় করা প্রমাণিত হয় না।

الْوَيْلُ الْمَغْرِبِ মাগরিবের মোত্তাহাব সময় : সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, মাগরিবের নামাজ সব ঋতুতে প্রথম ওয়াক্তে পড়া মোত্তাহাব, তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেন—

- (১) **عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ جَدِ (رض) كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَيَنْصَرِفُ أَحَدًا وَرَأَتْهُ لَيْبِيسَ نَيْلِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**
- (২) **عَنْ أَبِي أُبَيٍّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَا يَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ . (أَبُو دَاوُدَ)**
- (৩) **عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَخْرَعِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا عَسَرَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . (مُسْنَدُ)**

উল্লেখ্য যে, তারকারাজি সুশ্ৰীভাবে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে মাগরিবের নামাজ পড়া মাকহুহ। আবু আইযুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ . (أَبُو دَاوُدَ)

إِشَارِ الْمَغْرِبِ ইশার নামাজের মোত্তাহাব সময় : ইশার নামাজ কখন পড়া মোত্তাহাব এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; যা নিম্নরূপ—

(**رَح)** **مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح)** : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সকল নামাজই তাড়াতাড়ি তথা ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া মোত্তাহাব। সুতরাং ইশার নামাজের হুকুমও তাই। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন,

عَنْ نَعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ (رض) قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِرَقَبَتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . (أَبُو دَاوُدَ)

ইবনুল হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তিন তারিখ রাতে শাফাফ অনূযা হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই চন্দ্র অস্তমিত হয়, সুতরাং এর দ্বারা ইশার নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالشَّافِعِيِّ : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ (র.) সহ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরীয়র মতে ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা মোত্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন—

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ مَكَّنْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَحْنُظِرُ النَّبِيَّ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا جِئِنَّ دَعَبٌ ثُلُثَ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ عَلَيْنَا السَّلَامُ جِئِنَّا جَرَجَ لَوْلَا أَنْ يُفْلَلَ عَلَيَّ أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ - (مُسْلِمٌ)

(২) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهَا - قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

(৩) عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَخَّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ - (مُسْلِمٌ)

(৪) وَبِئْسَ وَرَائِيَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهَا - (قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

(৫) عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَخَّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ (مُسْلِمٌ)

(৬) وَبِئْسَ وَرَائِيَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَأَجْرُوا الْعِشَاءَ - (كَمَا فِي

الْهِدَايَةِ)

আবুলহাসান দলিল : নামাজ যদি বিলম্ব করে আদায় করা হয় তা হলে নামাজি ব্যক্তি নফল আদায় করা, জামাতের অপেক্ষায় থাকা এবং জামাতে নামাজীদের উপস্থিতি বেশি হওয়ার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ছওয়াব লাভ করার সুযোগ পাবে।

عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ (رض) أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ مَرْزُوقٍ كَانَ يُؤَخَّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ - (مُسْلِمٌ)

দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, হানাফীদের পক্ষ হতে এর নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করা হয়েছে— (ক) মাসের দ্বিতীয় তারিখের চন্দ্র শাফাক অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী সময়েই অন্তিমিত হয়, আর তৃতীয় তারিখের চন্দ্র আরো বিলম্বে অন্তিমিত হয়। অতএব এ হাদীস দ্বারা বিলম্বে পড়াই প্রমাণিত হয়। (খ) ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসটি **فَعِلُوا** [কার্যসূচক] আর হানাফীদের উপস্থাপিত হাদীস **قَوْلِي** [কথাসূচক] ; যদ্বন্দ্বের সময় **قَوْلِي** -এর

প্রাধান্য হয়ে থাকে। (গ) হাদীসটির বিধান একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, আম নয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ يُؤَخَّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ - (مُسْلِمٌ)

ফজরের নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : ফজরের নামাজ আলোতে পড়া উত্তম, নাকি অন্ধকারে পড়া উত্তম, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; যা নিম্নরূপ—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ يُؤَخَّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ - (مُسْلِمٌ)

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ইসহাকসহ প্রথম ইমামের মতে ফজরের নামাজের আরম্ভ ও সমাপ্তি উভয়ই অন্ধকারে হওয়া উত্তম, ইমাম আহমদ হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেন যে, মুক্তাদির অবস্থার পরিশ্রেফিতে দেরি করা কিংবা তাড়াতাড়ি করা উত্তম।

তাদের মতের দলিলগুলো নিম্নরূপ :

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرُّ الْيَسَاءُ مُتَلَبِّعَاتٍ يَسُرُّوهُنَّ مَا يَحْفَرْنَ مِنَ الْعَلْسِ - (تِرْمِذِيُّ)

(২) عَنِ ابْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الصُّبْحَ بِمَكِّيٍّ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى قَاتَفَرِ بَهَا - (مُسْلِمٌ)

ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي النَّجْدِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يُعِدَّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَمَرَ - (أَبُو دَاوُدَ - مِنْ جِبَانَ)

(৩) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الصُّبْحَ بِمَكِّيٍّ - (مُسْلِمٌ عَلَيْهِ)

(৪) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْأَوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ وَضْرَانُ اللَّذَى وَأَخْرَهُ غَفْرُ اللَّهِ -

(৫) قَوْلُهُ تَسَالَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (وَالْتَعَجَّلُوا مِنْ بَابِ الْمَسَارَعَةِ) -

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, সুফইয়ান ছাওরী এবং অন্যান্য হানাফীদের মতে ফজরের নামাজ উষার আলো বিকশিত হওয়ার পর পড়া উত্তম। অর্থাৎ আরম্ভ করবে আলোতে এবং শেষও করবে আলোতে, তাঁরা উষার আলোর সীমা নির্ধারণ করেন এভাবে যে, সূর্য উদয়ের এতটা পূর্বে নামাজ আরম্ভ করবে যাতে উভয় রাকাতে ৪০ হতে ১০০ আয়াত করে দীর্ঘস্থর ও বিতুদ্ধভাবে পড়তে পারা যায়। অতঃপর কোনো কারণে নামাজ নষ্ট হলে অনুরূপভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে যেন আবাবারো দুই রাকাত নামাজ পড়া যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতেও একরূপ একটি মত পাওয়া যায়। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে যে, নামাজ অঙ্ককারে আরম্ভ করে উবার আলোতে শেষ করা উত্তম।

ভাঁদের মতের স্বপক্ষীয় দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

(১) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَصِيحْرُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْمُجْرِمِمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْجَارِمِ - (أَبُو دَاوُدَ - التِّرْمِذِيُّ)

(২) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَصِيحْرُوا بِالصُّبْحِ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْفَجْرِ - (النَّسَائِيُّ - ابْنُ مَاجَةَ)

(৩) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَصِيحْرُوا بِصَلْوَةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْجَارِمِ - (ابْنُ حِبَّانَ)

(৪) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَكَلْنَا أَصِيحْرْتُمْ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْجَارِمِ - (ابْنُ حِبَّانَ)

(৫) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَكَلْنَا اسْتَفْرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْجَارِمِ - (الطَّبْرَانِيُّ)

(৬) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَيْلَالٍ بِلَا تَوَرُّ صَلْوَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُصْبِرَ الْقَوْمَ مَوَافِعَ تَلْبِيهِ مِنَ الْإِسْفَارِ - (ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - إِسْحَاقُ - أَبُو دَاوُدَ الطَّبْرَانِيُّ)

(৭) عَنْ أَنَسِ (رض) يُقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَبْغِضُ الْبَصَرَ -

এর অর্থ দূর হতে কোনো বস্তু দেখা। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে উবার আলো।

(৮) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلْوَةَ لَيْلِيٍّ وَلَا يَجْمَعُ أَنْ يَأْتِيَ صَلْوَةَ لَيْلِيٍّ حَتَّى يَبْغِضَ الْبَصَرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এখানে ওয়াক্ফের পূর্বে ফজরের নামাজ পড়ার অর্থ অঙ্ককারে পড়া, সুবহে সায়েকের পূর্বে পড়া নয়। এতে বুখা যায় যে, রাসূল

ﷺ এর সাধারণ অভ্যাস ছিল ফজরের নামাজ উবার আলোতে পড়া, একদিন মাত্র তিনি ব্যতিক্রম করেছেন।

হানাফীদের পক্ষ হতে তাদের হাদীস সমূহের জবাব নিম্নরূপ :

প্রথম হাদীসের উত্তর :

- সম্ভবত সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ মাঝে-মাঝে অঙ্ককারে নামাজ পড়তেন।
- অথবা الْغَلَسِ مِنَ الْمَاءِ দ্বারা মসজিদের ভিতরের অঙ্ককার বুখানো হয়েছে, রাতের অঙ্ককার উদ্দেশ্য নয়।
- অথবা الْغَلَسِ مِنَ الْمَاءِ বা ক্যাংখ রাবী কর্তৃক বর্ণিত। কেননা, কোনো কোনো বর্ণনায় الْغَلَسِ উল্লিখিত হয়েছে। এতে বুখা যায় যে, الْغَلَسِ مِنَ الْمَاءِ হযরত আয়েশার কথা নয়। হয়তো কোনো বর্ণনাকারী নিজের ধারণানুযায়ী একে হাদীসের সাথে সংযোজন করেছেন।
- অথবা উবার আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীস قَوْلِي এবং অঙ্ককারে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসটি فَعَلِيٌّ। ঘন্দের সময় হাদীসই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
- অথবা অঙ্ককারে নামাজ পড়ার বিধান ছিল সে যুগে, যখন মহিলারাও জামাতে হাজির হতো। পরে যখন পর্দার হুকুম নাজিল হয় তখন এ বিধান রহিত হয়ে যায়।
- অথবা রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর ও ওমরের যুগে غَلَسَ (অঙ্ককার) إِسْفَارَ (আলো) উভয়ের উপরই আমল ছিল। পরে হযরত ওসমান (রা.)-এর সময় إِسْفَارَ (আলো)-এর উপর আমল নির্দিষ্ট হয়ে যায়। হযরত মুগীস বর্ণিত হাদীস এ কথাই প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন-

سَلِّتُ مَعَ ابْنِ الرَّبِيعِ الصُّبْحَ بِغَلَسِي فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رض) فَلَمَّا طَمِنَ عُمَرُ اسْتَفْرَبَهَا عُثْمَانُ -

৭. অথবা শীতকালে অঙ্ককারে পড়তেন এবং গ্রীষ্মকালে আলোতে পড়তেন। মু'আয বর্ণিত হাদীস এ কথাই প্রমাণ বহন করে।

قَالَ بِمَنْعِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الِيسْتِنِ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا مَعَادَ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَنُفَسُوا بِالْفَجْرِ وَأَطِيلَ التَّرَاةَ قَدْرَ مَا يَطْبِقُ النَّاسُ وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَاسِرُوا بِالْفَجْرِ -

৮. অথবা কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ অঙ্ককারে নামাজ পড়েছিলেন, কিন্তু আলোতে নামাজ পড়াই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল।
৯. অথবা অঙ্ককারে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য হলো অধিক লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। রাসূল ﷺ এর যুগে সবলোক অঙ্ককারেই উপস্থিত হয়ে যেতো। ফলে আর দেরি করার আবশ্যিকতা ছিল না। এ জন্য তিনি অঙ্ককারে নামাজ পড়েছেন।
১০. ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র.) উক্ত প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন এভাবে যে, আরম্ভ করা হবে অঙ্ককারে এবং শেষ করা হবে আলোতে।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর :

১. উক্ত হাদীসটির সনদের মধ্যে উসামা ইবনে য়ায়েদ নামীয় একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি হাদীস বিশারদদের নিকট সমালোচিত ব্যক্তি। ইমাম নাশাঈ ও দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। আবু হাতেম বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য না।

২. অথবা হাদীসে উল্লিখিত **إِسْفَارٌ** দ্বারা **إِسْفَارٌ شَدِيدٌ** বা অধিক আলো বুঝানো হয়েছে।

ثُمَّ لَمْ يُعِدَّ إِلَى الْإِسْفَارِ الشَّدِيدِ حَتَّى مَاتَ بَلَّ عَادَ إِلَى الْإِسْفَارِ الْمَتَوَسِّطِ

তৃতীয় হাদীসের উত্তর : (ক) জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি **فَمَلَى** আর আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসটি **قَوْلِي** - আর ঘন্টের সময় **قَوْلِي** হাদীসের প্রাধান্য হয়ে থাকে।

(খ) অথবা অঙ্ককারে নামাজ আদায় করা একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সংযুক্ত, এ বিধানটি সাধারণ নয়। উপরে উল্লিখিত সবগুলো উত্তরই এ হাদীসের উত্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

চতুর্থ হাদীসের উত্তর :

১. মোস্তা আলী কারী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত বলতে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত বুঝানো হয়েছে।
২. হাদীসে উল্লিখিত **عَفْوٌ** শব্দের অর্থ- অতিরিক্ত। মহান আল্লাহর বাণী- **يُنْفِقُونَ قَبْلَ الْمَعْوَرِ** - আয়াতটিতে **عَفْوٌ** শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় হাদীসটির মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করল সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করল। আর যে ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে আদায় করল সে অত্যধিক ছুঁয়াব লাভ করল।
৩. হাদীসের সনদে অলীদ নামীয় একজন বর্ণনাকারী আছে যিনি সমালোচিত ব্যক্তি। আর সমালোচিত ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

আয়াতটির উত্তর : উল্লিখিত আয়াতটিতে **مُسَارَعَةٌ** তথা ত্বরান্বিত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে **مُسَارَعَةٌ** উদ্দেশ্য। কেননা, দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফজরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত হলো **إِسْفَارٌ** তথা আলোতে পড়া, তাই এখানে **مُسَارَعَةٌ** দ্বারা **إِسْفَارٌ** উদ্দেশ্য।

أُولَى পদগুলো স্ত্রীলিঙ্গ। অথচ এ পদগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুংলিঙ্গ তথা **أَلْهَجْرَةُ** পদটি **أَلْهَجْرَةُ** -এর অর্থে অথবা এর পূর্বে **سَلْوَةٌ** শব্দ উহা রয়েছে, আর এ কারণেই স্ত্রীলিঙ্গ সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে। আর সর্বপ্রথম হযরত জিব্রাইল (আ.) রাসূল ﷺ কে জোহরের নামাজের তালিম দিয়েছেন। এ জন্যই জোহরের নামাজকে **أُولَى** বলা হয়েছে।

أَلْمَعْتَهُ শাফক অদৃশ্য হওয়ার পরবর্তী অঙ্ককারকে 'আতামা' বলা হয়। গ্রামীণ সাধারণ লোকেরা **أَلْمَعْتَهُ** -কে **أَلْمَعْتَهُ** না বললে বুঝত না, তবে : **أَلْمَعْتَهُ** -কে **مَعْتَهُ** বলা মাকরুহ। যেমন- মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে **لَا يَغْلِبَنَّكُمْ** -বয়ানে জাওয়াযের জন্য। অতএব নাহীটি মূলত **تَنْزِيهُ** -এর জন্য।

وَعَنْ اَبِي مُعَمَّرٍ بَنِي عَمْرٍو بَنِي
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ
بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالنَّجْرَةِ وَالْعَصْرَ
وَالشُّنْسُ حَيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ
وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا وَإِذَا قَلُوا
أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪১. অনুবাদ : [তাবেসী] হযরত মুহাম্মদ ইবনে
আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, আমরা [সাহাবী] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ
(রা.)-কে নবী করীম ﷺ-এর নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
করলাম। তিনি বললেন, সূর্য চলে পড়লে নবী করীম ﷺ
জোহরের নামাজ পড়তেন এবং আসরের নামাজ এমন
সময় পড়তেন যে, তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকতো। আর
মাগরিব পড়তেন এমন সময় যখন সূর্য অস্ত যেতো। লোক
বেশি হলে ইশা সকাল সকাল পড়তেন। আর যখন লোক
কম হতো তখন দেরি করতেন এবং ফজরের নামাজ
অন্ধকারে পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا وَإِذَا قَلُوا -এর মর্মাৰ্ভ : এ একটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামাত বড় হওয়ার আশায় নামাজ কিছুটা
বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম, বরং মোস্তাহাব। তবে মাগরিবের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। কেননা, মাগরিবের সময়
খুবই কম।

وَعَنْ اَبِي
اَنَسٍ (رض) قَالَ كُنَّا إِذَا
صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظُّهَائِرِ
سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا إِتْقَاءَ الْعَرِ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِابْنِ عَرَبٍ)

৫৪২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর পিছনে
জোহরের নামাজ পড়তাম তখন গরম হতে বাঁচবার জন্য
আমাদের কাপড়ের উপর সেজদা করতাম। -[বুখারী ও
মুসলিম, তবে হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা বুখারী কর্তৃক
বর্ণিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الظُّهَائِرُ -এর উদ্দেশ্য : الظُّهَائِرُ শব্দটি অর্থ বহুবচন, অর্থ দ্বি-প্রহর। তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো
জোহরের নামাজ। এখানে শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিদিন জোহরের নামাজ এ
অবস্থায়ই আদায় করতেন।

حُكْمُ السَّجْدَةِ عَلَى الثُّوبِ :

কাপড়ের উপর সেজদা করার বিধান : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পরিধানের বস্ত্রের উপর সিজদা করা মাকরুহ,
তবে প্রয়োজনের তরিকদে এরূপ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তিনি দাগিল হিসেবে নিম্নলিখিত হাদীস পোশ করেন।

(١) عَنْ أَنَسٍ (رض) كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَجْدَةِ الْعَرِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِيع أَحَدُنَا أَنْ يُسْجِدَ وَجْهَهُ مِنَ
الْأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ .

(٢) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظُّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا إِتْقَاءَ الْعَرِ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পরিধানের বস্ত্রের উপর সেজদা করা বৈধ নয়, তবে পৃথক কাপড়ের উপর সেজদা করা বৈধ।
তিনি উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা বলেন যে, সম্ভবত সাহাবীগণ এ জন্য পৃথক কাপড় ব্যবহার করতেন।

وَعَنْ ٤٤٣ أَبِي مُرَّةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاْبِرِدُوا بِالصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنَ لَهَا يَتَفَسَّيْنَ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيِّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سُمْومِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهِرِيَّهَا .

৫৪৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন [সূর্যের] উত্তাপ বাড়ে, তখন তোমরা নামাজকে শীতল কর। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে 'জোহারকে'। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে। জাহান্নাম প্রভুর নিকট বিনয় স্বরে প্রার্থনা করে বলে, হে আল্লাহ! [উত্তাপের তীব্রতায়] আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দেন, এক নিঃশ্বাস শীতে এবং অপর নিঃশ্বাস গ্রীষ্মে। এতেই তোমরা গ্রীষ্মে তাপের আধিক্য পাও এবং শীতে শীতের আধিক্য পাও। -[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা যে গরমের আধিক্য অনুভব কর, তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই এবং তোমরা যে শীতের আধিক্য অনুভব কর, তা তার শীতল নিঃশ্বাসের দরুনই হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জোহারকে শীতল করার তাৎপর্য : اِبْرَادُ শব্দের শাব্দিক অর্থ- শীতল করা তথা গরম বস্তুকে কিংবা রৌদ্রের তাপকে শীতল করা। আর নবীজীর বাণী- اِبْرَادُ بِالظَّهْرِ -এর অর্থ হলো, উত্তাপের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরিবেশ শীতল হলে জোহারের নামাজ আদায় করা। এর উপর ভিত্তি করেই হানাফীগণ বলেন, গ্রীষ্ম ঋতুতে জোহারকে দেরি করে ঠাণ্ডা সময়ে পড়া উত্তম।

শীতলতার সময়সীমা সম্পর্কে হানাফী আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন—

- * কারো মতে আসলী ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হওয়া পর্যন্ত।
- * আবার কারো মতে বস্তুর দৈর্ঘ্যের চারের এক অংশ পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।
- * কিছু সংখ্যক বলেন, তাদের এক অংশ পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।
- * কেউ কেউ বলেন, অর্ধেকের সমান হওয়া পর্যন্ত।
- * আবার একদল বলেন, ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। তবে একগুণের কথাটাই অধিক বিদ্বন্দ।

এ বিষয়ে শাফেহীগণের বক্তব্য : শাফেহী মতাবলম্বীদের মতে জোহারের নামাজ সকাল সকাল পড়াই উত্তম। তাঁরা অর্থাৎ، وَوَقْتُ السَّحْرِ وَابْرِدُوا الْحَرَارَةَ بِسَبَبِ آدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَارَةِ -এর অর্থ করেন- اِبْرَادُ بِالظَّهْرِ তোমরা উত্তাপের সময়ই নামাজ পড় এবং গরমে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে উত্তাপকে শীতল করো।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ابْرَدَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ عَجَلَ (তাড়াতাড়ি) এসেছে, সুতরাং اِبْرَادُ-এর অর্থ عَجَلَ বা দেরি করা হবে।

هَادِيَسَ وَ جَعَلَتْ بِيَجَانِيَدَةِ بَكْرَةَ بَعْدَ مَدِيَنَةِ مَدِيَنَةِ هَادِيَسَ : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, গরম ও ঠাণ্ডা দোজখের তাপ হতে সৃষ্টি। অথচ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, তা সূর্যের প্রভাবে হয়ে থাকে : ফলে উভয়ের মধ্যে যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ—

১. উক্ত হাদীসে দোজখের তাপ কথটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গরমের উত্তাপ যেন দোজখের আতন, আর ঠাণ্ডার শীতলতা যেন দোজখের হিমশীতলতা।
২. অথবা হাদীস হলো শ্রুত দলিল। প্রমাণ হিসাবে শ্রুত দলিলই অকাটা। এর বিপরীত বিজ্ঞান হলো গবেষণা লব্ধ, অথচ গবেষণালব্ধ বিষয়টি একটি ধারণার উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, কোনো অকাটা প্রমাণ ও ধারণালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে অকাটা দলিলই প্রাধান্য পায় এবং ধারণালব্ধ জ্ঞান প্রত্যাহাত্য হয়। এ সূত্র হিসেবে বিজ্ঞানীদের ধারণালব্ধ জ্ঞান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
৩. অথবা একটি কারণ জাহেন্নী বা প্রকাশ্য, আরেকটি কারণ বাতেনী। গরম ও ঠাণ্ডা সূর্যের তাপের প্রভাবে হওয়া জাহেন্নী কারণ এবং দোজখের প্রভাবে তাপের অধিকা হওয়া বাতেনী কারণ; বিজ্ঞানীরা জাহেন্নী কারণ এবং মহানবী ﷺ বাতেনী কারণ বলেছেন।
৪. অথবা জাহান্নামের স্কুলিক হতে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা জাহান্নামের সাদৃশ্য ও সৃষ্টিকর্তার কুদরতের স্বাক্ষর হিসেবে পৃথিবীকে গরম ও ঠাণ্ডা করছে।
৫. অথবা সূর্য জাহান্নাম হতে উষ্ণতা গ্রহণ করে পৃথিবীতে বিতরণ করে থাকে, তাই হজুর ﷺ হাকীকতের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন শীত ও গরম জাহান্নামের কারণে হয়ে থাকে।

رَجْمَةُ الْمَنَعِ عَنِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ شِدْوِ السَّرِّ
গরমের অধিক্যের সময় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :

১. তখন গরমের কারণে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় অথচ আল্লাহ বান্দার কষ্ট চান না। মহান আল্লাহর বাণী—
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقره - ১৮৫)
২. অথবা কংক্রময় জমিনে নামাজ পড়লে কপালে ফোকা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এ হুকুম দেওয়া হয়েছে।
৩. অথবা অধিক গরমের কারণে নামাজে একাগ্রতা আসে না, অথচ নামাজ কবুল হওয়ার জন্য একাগ্রতা শর্ত, যেমনি কুরআনে এসেছে যে, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مِمَّنْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ
৪. কিংবা গরমের সময় হলো শান্তির সময়। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন,
أَنْعَمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِسْوَارِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَبَّرُ فِيهَا جَنَّتُمْ .

তাই এ শান্তির সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নামাজ হলো অনুগ্রহের কারণ, যা দ্বারা শান্তি দূর হয়। সুতরাং নামাজ ত্যাগ করার নির্দেশ কিভাবে দেওয়া হলো? আলোচ্য প্রশ্নের জবাব হলো, আবুল ফাতাহ ইয়া'মুরী বলেন, কোনো বিষয়ের কারণ (عِلَّةٌ) বা উপলক্ষ্য যদি শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে বর্ণনা করা হয় তবে এর মর্ম বুঝে আসুক বা না আসুক তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। যেহেতু শরিয়ত প্রবর্তক নামাজ ত্যাগ করার কারণ উল্লেখ করেছেন 'প্রথম গরম', সুতরাং তা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে।

جَاهَان্নَامِ الْيُسْرَةَ إِشْبَاةَ النَّارِ إِلَى رَبِّهِ وَاشْتَكَاةَ النَّارِ إِلَى رَبِّهَا 'জাহান্নাম আপন প্রভুর নিকট অভিযোগ করে'। তবে এ অভিযোগের ধরন কি? সে সম্পর্কে হাদীসবিশারদদের মতবিরোধ রয়েছে।

১. কারো মতে জাহান্নাম সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলবে এবং আল্লাহ তার জবাব খুলে দেবেন।
২. কারো মতে জাহান্নামের অবস্থার মাধ্যমে এ অভিযোগ বুঝা যাবে, মুখে বলবে না।
৩. কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের পরিচালকের অভিযোগকে জাহান্নামের অভিযোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
৪. কাজি বায়হাবীর মতে জাহান্নামের তীব্র উত্তেজনাকে রূপকভাবে তার অভিযোগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَرْبِعٌ يَمِيرُهَا "مَا" -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশে زَمْهَرِيرَهَا -এর "مَا" যমীরটির مَرْبِعٌ হলো نَارٌ তাই বাক্যটির অর্থ হবে তোমরা যে শীতের আধিকা অনুভব কর তা জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের দক্ষনই হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, نَارٌ -এর মধ্যে কিভাবে ঠাণ্ডা থাকতে পারে? হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছেন।

- এখানে প্রশ্ন ঘারা অগ্নি উদ্দেশ্য নয়, বরং نَارٌ বলতে سَحْلٌ বা অগ্নিহুল তথা জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে। আর জাহান্নামের মধ্যে উষ্ণতার ঠাণ্ডান্তর উভয়ই থাকতে পারে।
- অথবা মানুষ যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, অনুরূপভাবে জাহান্নামও বৎসরে একবার শ্বাস গ্রহণ ও একবার ত্যাগ করে। যখন উহা শ্বাস গ্রহণ করে তখন তার ভিতরে উষ্ণতা জমা হওয়ার কারণে বহির্গত বাইরের উষ্ণতা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আবার যখন শ্বাস ত্যাগ করে তখন বহির্ভাগ উষ্ণ হয়ে যায়, সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত نَارٌ [অগ্নির ঠাণ্ডা] দ্বারা শ্বাস গ্রহণকালীন ঠাণ্ডাকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ فَيَذْمَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَيَغْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আসরের নামাজ পড়তেন তখন সূর্য উর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকতো। অতঃপর কোনো লোক আওয়ালীর (উচ্চ বস্তি এলাকার) দিকে যেতো এবং সেখানে গিয়ে এমন সময় পৌছতো যে, সূর্য তখনও উর্ধ্ব থাকতো। আওয়ালীর কোনো কোনো এলাকা মদীনা হতে চার মাইল অথবা তার কাছাকাছি দূরে অবস্থিত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَوَالِي এর অর্থ : عَوَالِيٌّ শব্দটি عَالِيَةٌ -এর বহুবচন। عَوَالِيٌّ বলতে মদীনার পাশ্চবর্তী ঐ সকল বসতি এলাকাকে বুঝানো হয়, যা উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।

- কারণে মতে মদীনা হতে নয় হাজার হাত দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।
 - কিছু সংস্কারের মতে তা মদীনারই একটি পাশ্চবর্তী গ্রাম, যার কোনো কোনো এলাকা মদীনা হতে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরে অবস্থিত।
- أَمْيَالٌ -এর ব্যাখ্যা : مَيْلٌ শব্দটি مَيْلٌ -এর বহুবচন। এর দূরত্বের পরিমাণ প্রায় অর্ধকোশ, মুহাম্মিদদের পরিভাষায় দুই হাজার গজ পরিমাণ দূরত্বকে الْمَيْلٌ বলা হয়।

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ صَلْوَةُ الْمَنَافِقِ يَجْلِسُ بِرُقْبِ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَنَقَّرَ أَرْوَامًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ হলো মুনাফিকের নামাজ যে, সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে তখন সে উঠে দাঁড়ায় এবং চার ঠোকর মারে এবং তাতে আত্মাহুকে খুব কমই স্মরণ করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُورَةُ النِّسَابِ তাশবীহ-এর ব্যাখ্যা : এখানে **أَنْزَمَ** দ্বারা অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে চার বাকাত তথা আট সেজন্য আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত বাকো মুনাফিকদের নামাজ আদায় করাকে পাখির আহার খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আর এর **وَجْهَ النَّبِيِّ** হলো **الصلوة** তথা নামাজে তাড়াহুড়া করা অথবা **سُورَةُ النِّسَابِ** অর্থাৎ, কেহেরাও তাড়াহুড়া করা। মুনাফিকরা তরবারির ভয়ে এবং নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি না করার কারণে এভাবে নামাজ আদায় করে।

لَمْ يَخْصُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আসরের নামাজকে কেন পাখির ঠোকরের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে? আসরের নামাজ পড়াকে পাখির দানা খাওয়ার সাথে তুলনা করার কারণ হলো এটি **صَلَاةَ الرَّسُولِ** আর এই নামাজ মানুষের দিনের কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে দুর্বল হওয়ার পর আসে। তখন দুর্বলতার কারণে মানুষ তাড়াহুড়া সেজন্য করে, এ জন্য একে পাখির দানা খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ সূর্য শাল হয়ে খাওয়ার পর পড়ে, তখন সে যেন নিজেকে মুনাফিকদের সাথে তুলনা করে। কেননা মুনাফিক নামাজের বিতর্কিতায়া বিশ্বাস করে না; বরং সে নিজেকে শান্তি হতে রক্ষার জন্য নামাজ পড়ে। আর এরূপ বিলম্ব হওয়ার কারণে তার কোনো ভীতিও নেই। কেননা, সে নামাজ দ্বারা কোনো ফজিলত ও ছওয়াব চায় না। সুতরাং সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পর দায়সারা গোছের মতো করে নামাজ আদায় করে।

وعن **٥٤٦** ابن عمر (رض) قال قال رسول الله ﷺ الذي يؤتونه صلوة العصر فكأنما وتر أهله وماله. (متفق عليه)

৫৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যার আসরের নামাজ ছুটে গেল তার যেন সমস্ত পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুট হয়ে গেল।—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَقْوَالُ الْمُتَمَدِّدِينَ فِي فَوَاتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ :

আসরের নামাজ ছুটে যাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত : উক্ত হাদীসে আসরের নামাজ ছুটে যাওয়ার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

- মুহাল্লাব ও তাঁর অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এখানে আসরের নামাজ ছুটে যাওয়ার দ্বারা আসরের জামাত ছুটে যাওয়া উদ্দেশ্য, সূর্যের বর্ণ হ্রাস হওয়ায় মারকুহ সময় উপস্থিত হওয়া অথবা সূর্য অস্তমিত হওয়ার দরুন নামাজ কাজ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। তাদের যুক্তি হলো, মারকুহ সময় উপস্থিত হওয়া এবং কাজ হওয়া অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রেও হতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আসরের নামাজের উল্লেখ অনর্থক। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জামাত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারটি তো অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রেও হতে পারে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আসরের নামাজকে উল্লেখ করার কারণ কি? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আসরের জামাতের সময় দিনের ফেরেশতার গমন ও রাতের ফেরেশতার আগমনের সময়। তাই উক্ত হাদীসে আসরের নামাজের বিশেষভাবে তাকিদ এসেছে। এ কারণে ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন হারালে কোনো ব্যক্তি যেসকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আসরের নামাজ ফওতকারীও অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ফজরের সময় ও ফেরেশতার গমন। আগমন ঘটে, সুতরাং আসরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কোনো নামাজকে যে কোনো ফজিলতের সাথে নির্দিষ্ট করতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা অনর্থক। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكُمْ بِعَمَلٍ وَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ

২. ইমাম নববী, ইবনে ওহহাব ও কাজি ইয়ায বলেন, আসর নামাজ ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো তা মোস্তাহাব ওয়াজে আদায় না করে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আদায় করা, যেমন- ইমাম আওয়যী হতে বর্ণিত আছে। তিনি উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা বলেছেন-
وَقَرَأْتُهَا أَنْ تَدْخُلَ الشَّمْسُ صَفْرًا
৩. কারো মতে, মূলকথা হলো **فواتِ عَمْرٍ** দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের নামাজ তার নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আদায় করা। হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস এ কথারই সমর্থন করে। তিনি বলেন-
إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيَبَ الشَّمْسُ أَيْ مِنْ غَيْرِ عَدْوٍ - (ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)
৪. মোল্লা আলী কুরী (র.) বলেন, আসর নামাজ ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামাজ দেরি করে পড়া। হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য হলো- আসরের নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করা এবং তা আদায়ের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা।
 -[মিরকাত]
৩. আসরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ :
وَجُؤُهُ تَخْصِيصِ الْعَمْرِ
১. এ সময়টা হলো ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত থাকার সময়, যা মানুষকে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অমনোযোগী করে তোলে। মহান আল্লাহর বাণী—
رَجُلًا لَا تُلْهِيمُهُمْ بَيْعًا وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
২. আবু ওমর (রা.) বলেন, কোনো এক ব্যক্তি আসরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাই আসরকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু আবদিল বারও এরূপই বলেছেন।
৩. হাদীস শরীফে এ নামাজকে **الصَّلَاةُ الْوَسْطَى** বা উত্তম নামাজ বলা হয়েছে। এ জন্য বিশেষভাবে একে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কুরআন মাজীদে **الصَّلَاةُ الْوَسْطَى**-কে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,
حَانِطُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى -
৪. অথবা আল্লাহ যে নামাজকে যে ফজলিতের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, তা-ই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে।
৫. অথবা এ আসরের সময়ই দিনের ফেরেশতার আগমনের সময়, এ জন্য বিশেষভাবে এ নামাজকে উল্লেখ করেছেন।
৬. অথবা এই সময় বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয় তাই বিশেষভাবে এই নামাজকে উল্লেখ করা হয়েছে।
التَّحْرِيفُ بِالرَّأْيِ
১. নাম ও পরিচয় : নাম-আদুল্লাহ, উপনাম আবু আব্দুর রহমান, পিতার নাম- ওমর ইবনে খাত্তাব, মাতার নাম-যয়নব বিনতে মাযউন।
২. জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ : এ মহামনীষী নবুয়তের দ্বিতীয় বর্ষে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন।
৩. স্বভাব-চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে মদীনায হিজরত করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সুল্লাহর অনুসরণ, খোদাতীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে গুণাবিত ছিলেন। ইবনুল আসীরের ভাষ্যে-
كَانَ كَيْفَرًا لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنَازِلَهُ وَيُصَلِّيُ فِي كُلِّ مَكَانٍ صَلَّى فِيهِ
৪. জিহাদে অংশ গ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও ওহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন।
৫. হাদীস বর্ণনা : তিনি হাদীস বর্ণনায় সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০। মুতাফাকুন আলাহিহি ১৭০টি এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ৮১টি ও ইমাম মুশলিম এককভাবে ৩১টি হাদীস বর্ণনা করেন।
৬. ইস্তিকাল : হিজরি ৭৩/৭৪ সালে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে জনৈক সিপাহী তাঁর পায়ে বর্ষা ঢুকালে উক্ত আঘাতে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে হজ্জ থেকে ফেরার পথে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে তিনি মক্কার সন্নিগটে 'কাখ' নামক স্থানে ইস্তিকাল করেন। তাঁকে যী-তুওয়া নামক মুহাজিরদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ۴۴۷ بَرْنَدَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪৭. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। [বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে শব্দ : পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কুফর, শিরক ও ধর্মভ্যাগের ফলে আমল বিনষ্ট হয়। যেমন—

(۱) قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. (الْمَائِدَةُ - ۵)

(۲) وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (الْأَنْعَامُ - ۸৪)

(৬) وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَسِمْتُ وَهُوَ كَأَنَّكَ فَأَوْلِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (الْبَقَرَةُ - ১৭১)

আর হযরত বুরায়দার হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজ ত্যাগ তথা গুনাহের দ্বারা আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, অথচ আহলে সন্নত ওয়াল জামাত এ কথার উপর একমত যে, গুনাহের দ্বারা আমল বিনষ্ট হয় না, সুতরাং বুরায়দার হাদীসটি প্রকাশ্যভাবে কুরআন ও ইজমার বিপরীত বলে মনে হয়। হাদীস বিশারদগণ হযরত বুরায়দার হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা নিম্নরূপ—

১. অথবা মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি আসরের নামাজের অপরিহার্যতা (فَرَضِيَّةً) অস্বীকার করে নামাজ ত্যাগ করে, তার যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, অপরিহার্যতা (فَرَضِيَّةً) অস্বীকারকারী কাফির। আর কুফরি আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ।
২. অথবা মর্ম এই যে, নামাজের অপরিহার্যতা স্বীকার করে বটে; কিন্তু নামাজ প্রতিষ্ঠাকারীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্‌গ্নপ করে। এমন ব্যক্তির আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, ঠাট্টা-বিদ্‌গ্নপও এক প্রকার কুফরি।
৩. অথবা মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি অলসতা করে নামাজ ত্যাগ করে তার আমল বিনষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে আমল বিনষ্ট হওয়ার হুমকি কঠোরতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাত্রয় تَرَكَ الصَّلَاةَ [নামাজ ত্যাগ করা]-এর দৃষ্টিকোণ হতে করা হয়েছে। [আমল বিনষ্ট হওয়া]-এর দৃষ্টিকোণ হতেও হাদীসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে।
৪. এটা مَجَازُ التَّشْبِيهِ [রূপক উপমা]-এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, আসর নামাজ ত্যাগকারী ঐ ব্যক্তির মতো, যার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে।
৫. অথবা বাক্যটির মর্ম হবে যে, তার আমল বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হবে, لَنْ الْإِشْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ بَغْضَى إِلَى الْكِبَائِرِ وَالْإِضْرَارَ عَلَى الْكِبَائِرِ يُغْضَى إِلَى الْكُفْرِ.
৬. অথবা মর্ম এই যে, তার আসরের ছুওয়াব বিনষ্ট হবে, মূল আমল বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য নয়।
৭. অথবা মর্ম এই যে, তার সারা দিনের নেক আমলের ছুওয়াব-হ্রাস পাবে।

আসরের নামাজ ত্যাগ করার হুকুম :

مَذْمُوبُ الْمُتَعَذِّرِ وَالْمُنَابِلَةِ যু'তাবিলা ও কতিপয় হায্বী হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে বলেন যে, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ত্যাগ করে তার বিগত জীবনের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

مَذْمُوبُ أَهْلِ الشُّنَّةِ وَالْحَسَاؤِ : আহলে সন্নত ওয়াল জামাতের মতে নামাজ পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহের ফলে সে কাফির হয়ে যায় না। কেননা, যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -এর স্বীকৃতি প্রদান করে, তার সম্পর্কে রাসূল

ﷺ বলেছেন لَا تُكْفِرُ بِدِينِهِ تَابِعًا وَكَفَرًا بِدِينِهِ لَا تَابِعًا তাকে কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলা না। তাই নামাজ পরিত্যাগের ফলেও কেউ কাফির হবে না এবং তার আমলও বাতিল হবে না।

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (رض) قَالَ
كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৮. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর
সাথে মাগরিবের নামাজ পড়তাম, তারপর আমাদের মধ্যে
কেউ যখন [বাড়ির দিকে] ফিরত তখন সে তার তীরের
লক্ষ্য স্থল দেখতে পেতো। -[বুখারী ও মুসলিম]

সহশ্রিষ্ট আলোচনা

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আসলাম উপনাম আবু রাফে'। তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-এর কিবতী গোলাম ছিলেন।

আব্বাস (রা.) তাঁকে হযরত ﷺ এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনে তাঁকে আজ্ঞা করে দিয়েছিলেন। তিনি আবু রাফে' উপনামে সমধিক পরিচিত। প্রণেতা বলেন-
كَانَ قِبْطِيًّا وَكَانَ لِلْعَبَّاسِ قَوْمَهُ لَيْتِيًّا ﷺ فَلَمَّا بَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِسْلَامِ الْعَبَّاسِ اتَّخَذَهُ.

২. ইসলাম গ্রহণ : তার নাম রাফে' উপনাম আবু আব্দুল্লাহ বা আবু খাদীজ পিতার নাম খাদীজ। বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ :
রাফে' ইবনে খাদীজ ইবনে রাফে' ইবনে আদী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জ'শাম ইবনে হরিসা ইবনে হারিস। তিনি একজন আনসারী সাহাবী। তাঁর পূর্বপুরুষ হারিসা বা হারিসের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে আল-হারেসী এবং আওস গোত্রোদ্ভূত হওয়ায় আল-আওসী বলা হয়। তাঁর মাতার নাম হালীমা বিনতে মাসউদ ইবনে সিনান।

জিহাদে যোগদান : তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। কিন্তু তার বয়স কম থাকায় তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি দেন নি। পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি তীরবিদ্ধ হন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমার এ আহত হওয়ার সাক্ষী হব। তিনি নিফকীদের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ : তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে অনেক সাহাবী ও তাবয়ী হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

ইস্তেকাল : তিনি উহুদ যুদ্ধে যে তীরবিদ্ধ হন সে আঘাত আবার অনেক দিন পর তাজা হয়ে উঠে, ফলে ৭৩ বা ৭৪ হিজরিতে ৬৬ বছর বয়সে মদীনায় ইস্তেকাল করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাঁর নামাজে জানাজা পড়ান।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانُوا
يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُغِيبَ الشَّمْسُ
إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, সাহাবীগণ ইশার নামাজ রক্তিম আভা অদৃশ্য
হওয়ার পর হতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের
মধ্যে পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সহশ্রিষ্ট আলোচনা

১. নাম ও পরিচিতি : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইশার নামাজকে আতামা বলা হতো। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ এরূপ বলতে নিষেধ করেন। মুসলিম শরীফে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

لَا يَغَيِّرَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَوَاتِكُمْ إِلَّا أَنَّهُ الْعِثَاءُ.

এখানে প্রশ্ন হলো যে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রা.) কিভাবে ইশার নামাজের ক্ষেত্রে 'আতামা' শব্দ ব্যবহার করলেন? হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এর সম্ভাব্য দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন- (ক) সম্ভবত এটা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বকার বর্ণনা।

(খ) অথবা নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ তখনও তাঁর নিকট পৌঁছেনি।

بِالْحَرَامِ بِالنَّكَاحِ بِالنَّكَاحِ

১. নাম ও পরিচিতি : নাম আয়েশা। উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ, উপাধি সিন্দিকা, হুমায়রা, উম্মুল মু'মিনীন, রাসূল ﷺ তাঁকে **السَّوْمِيَّةُ** বলে ডাকতেন। পিতার নাম আবু বকর, আর মাতার নাম উম্মে রুমান।
২. তাঁর বংশ তালিকা : আয়েশা বিনতে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবনে কা'ব ইবনে সাদ, ইবনে তাইম।
৩. বিবাহ : হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স যখন ৬/৭ বছর তখন আবু বকর (রা.) তাঁকে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ প্রদান করেন। হিজরতের দ্বিতীয় সনে শাওয়াল মাসে ৯ বছর বয়সের সময় তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর বাসর হয়।
৪. গুণাবলি : ইসলামি জ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অদ্বিতীয়। শররী মাসআলা ও মাসায়েলের ব্যাপারে অন্য সব মহিলার চেয়ে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়া। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এ মর্মে **الْإِمَامُ** গ্রন্থে বলা হয়েছে—
- كَانَتْ قَيْبَةً عَالِمَةً فَصِيحَةً فَاحِشَةً كَثِيرَةَ الْعَدِيْبَةِ عَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَارِيَةً بِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَأَشْرَافَهَا .
- রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—
- فَضَّلَ عَائِشَةَ عَلَى النَّبَاةِ كَفَضَّلَ الثَّرِيْدَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
- হযরত উরওয়া (রা.) বলেন, তাঁর মতো অধিক কবিতা মুখস্থকারিণী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি।
- ※ তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র.) বলেন,

لَوْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ كُلِّهِمْ ثُمَّ عِلْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَسَمَّهْمُ عِلْمًا .

৫. তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২০টি। বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে ১৭০টি স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়া ইমাম বুখারী ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম ৮৫টি হাদীস পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।
৬. ইন্তেকাল : এ মহামানবী ৫৭/৫৮ হিজরিতে ৬৬/৬৭ বছর বয়সে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে ১৭ই রমজান মদীনায়ে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর অসিয়ত মুতাবেক তাঁকে রাতে দাফন করা হয়।

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنَصَّرْتُ النَّبَاةَ مُتَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ [এমন সময়] পড়তেন যে, তখন মহিলারা নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরে যেতো, অথচ অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতো না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَجَّارٍ بِالْفَجْرِ هَلِ الْإِنْسَانُ بِالنَّجْوَى أَنْصَلَ أَمْ التَّغْلِيْسُ অন্ধকারে পড়া উত্তম? ফজরের নামাজ অন্ধকারে উত্তম না ফর্সাতে পড়া উত্তম? এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁদের মতামত দলিলসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ফজরের নামাজ উষার আলো বিকশিত হওয়ার পর পড়া উত্তম।
দলিল— **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَسْرُوْنَا بِالْفَجْرِ فَوَأْتَتْهُ الْعِظْمُ لِلْأَجْرِ**
২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের মতে অন্ধকারে পড়া উত্তম। দলিল—

- ১- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَزِمْتُ الْأَوَّلَ رِضْوَانَ اللَّهِ وَالْآخِرُ عَفْرَ الْوَلَدِ .
 ২- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَتَنَصَّرَتْ النِّسَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ يَمْشُونَ مِمَّا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغُلَسِ .

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে আলোতে শেষ করা উত্তম।
 প্রতিপক্ষের জবাব : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে অপর পক্ষের প্রত্যুত্তরে বলা হয়—
 ১. উভার আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীস **قَوْلِي** এবং অন্ধকার -এর হাদীস **فِعْلِي** সূত্রাং এতে **قَوْلِي** হাদীস প্রাধান্য পাবে।
 ২. অথবা কোনো কোনো সময় তিনি অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন, তবে আলোতে নামাজ পড়াই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। কেননা আলোতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য ছিল অধিক লোকের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।
 ৩. অথবা **يَكُنْ جَوَازُ** -এর জন্য সেদিন অন্ধকারে পড়েছেন।
 ৪. কিংবা উক্ত হাদীসে **الْغُلَسُ** দ্বারা মসজিদের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে।
 ৫. অথবা সেদিন তিনি সফরে যাবার কারণে অন্ধকারে পড়েছেন।

وَعَنْهُ قِسَادَةَ عَنِّ أَنْسِي (رَضَى) أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَعَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنْسِي كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَائِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرَمَّا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

৫৫১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কাতাদা হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, এক রাতে নবী করীম ﷺ ও য়ায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) সাহরী খেলেন, যখন তাঁরা সাহরী খাওয়া হতে অবসর হলেন তখন নবী করীম ﷺ নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামাজ আদায় করলেন। আমরা হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাদের সাহরী খাওয়া হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত ও নামাজে দাখিল হওয়ার মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে এ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিল।
 -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمَدِينَةِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহরী সুবহে সাদেকের নিকটবর্তী সময়ে খাওয়া সুন্নত। পরবর্তী কালের আলিমগণ তার পরিমাণ নির্ধারণ এভাবে করেছেন যে, রাতের সাত ভাগের শেষভাগে সাহরী খাওয়া উচিত। হাদীসটি দ্বারা এটাও অর্থাভিত যে, রাসূল ﷺ রমজান মাসে ফজরের নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন।

الْتَّعْرِيْفُ بِالرَّأْيِ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম কাতাদা, উপনাম আবুল খাভাব, নিসবতী নাম আস-সুদুসী, পিতার নাম দিয়ামা ইবনে কাতাদা। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেয়ী ও যুগশ্রেষ্ঠ হাফেজ।
২. বংশ পরিচয় : কাতাদা ইবনে দিয়ামা ইবনে কাতাদা ইবনে আযীথ ইবনে আমর ইবনে রাযীয়া ইবনে আমর ইবনুল হারেছ ইবনে সাদুস ইবনে শাইবান ইবনে যুহল ইবনে সালাবা ইবনে উকাবা ইবনে সা'ব ইবনে বকর ইবনে ওয়ায়েল আস-সুদুসী আল-বসরী।
৩. যে সফল সাহাবীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছোট তাবেয়ী ছিলেন। এর অর্থ বয়সে ছোট নয়, বরং কম সংখ্যক সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা হলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস, আবুত তোফায়েল আমের (রা.) প্রমুখ সাহাবী।

প্রসিদ্ধ যে সকল তাবেরী হতে তিনি হাদীস তুলেছেন তাঁরা হলেন, সাইদ ইবনুল মুসায্যাব, হাসান বসরী, আবু ওসমান, আননাসহনী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আরও অনেকে। তাঁর নিকট হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁরা হলেন, সুলাইমান আততাঈমী, আইয়ুবুস সাখতিয়ানী, আমাশ, শো'বা, আবওয়ায়ী আরও অনেকে।

৪. ঐতিহাসিক মতামত : ইতিহাসে এ কথা সর্বসম্মত গৃহীত যে, তিনি মাদুগঠ হতে অন্ধ ছিলেন এবং মামসূদল আইন অর্থাৎ চোখ অফুটন্ত ছিল। সকল মুহাদ্দিস একমতয়ে পৌঁছেছেন যে, তিনি অতি বড় বৃষ্ণ, সর্বাধিক মুখস্বকায়ী, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন।

বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযনী বলেন, وَمَا آذَرْنَا، অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যুগশ্রেষ্ঠ হাফেজ দেখতে চায় সে যেন কাভাদার প্রতি তাকায়। আমরা কাভাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হাফেজ অন্য কাউকে পাইনি।

✽ কাভাদা নিজে বলছেন, وَمَا قَلِمِي، অর্থাৎ, আমার দুই কর্ন যা কিছু শ্রবণ করেছে অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।

৫. মুফ্ফা : বদরুদ্দিন আইনীর মতে ১১৭ অথবা ১১৮ হিজরিতে এবং মিশকাতের বর্ণনা মতে ১০৭ হিজরিতে ৫৬ অথবা ৫৭ বৎসরে ইহরাম ত্যাগ করেন।

وَعَنْ ٥٥٢ أَبِي دَرِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ آتَتْ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَّرَاءٌ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخَّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ آذَرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫২. অনুবাদ : হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু যার! যখন তোমার উপর এরূপ শাসনকর্তা হবে যারা নামাজের প্রতি অমনোযোগী, অথবা উহার সময় হতে নামাজকে পিছিয়ে দেবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? আমি বললাম, আপনি আমাকে কি আদেশ প্রদান করেন? তিনি বললেন, নামাজ সময় মতো পড়বে। যদি তাদের সাথে তা পাও তবে তা পুনরায় পড়বে, আর উহা তোমার জন্য নফল হবে।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُئِلَ هَادِيَسِرُ الْبَاطِنِي بِنْتِ الْأَخْبَارِ بِبَيَانِ مَا كَانَ لِلْمَسْأَلَةِ فِي يَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَّرَاءٌ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخَّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ آذَرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ইসলামের প্রথম যুগ এরূপই ছিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ইমামতের অযোগ্য ব্যক্তিরাই ক্ষমতার মসনদে বসে যায়। ফলে এ মহান কর্তব্য হতে দূরে সরে পড়ে। বর্তমান যুগে তো এটাও কল্পনা করা যায় না।

এটা ছিল নবী করীম ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী যে রাজা-বাদশাহগণ নামাজের প্রতি অমনোযোগী হবে বা নামাজকে মাকরূহ ওয়াক্তে নিয়ে যাবে; এরূপ ঘটনা বনী উমাইয়াদের সময়ে ঘটেছিল। এরূপ অবস্থা ঘটলে মোত্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়ে নেওয়া উত্তম। একাকী হলেও তা করতে হবে। পরে যদি জামাত পাওয়া যায় তা হলে তা পড়ে নিলে নফল হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ দু'বার নামাজ পড়া শাফেয়ীদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে জায়েজ আর হানাফী মাযহাব মতে শুধুমাত্র জোহর ও ইশার নামাজে জায়েজ আছে। কেননা হানাফীদের মতে আসরের পর নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। আর মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত। তিন রাকাত নফলের কোনো প্রমাণ নেই। এমনভাবে ফজরের পরেও কোনো নফল নামাজ নেই। তবে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে কোনো নামাজকে উল্লেখ না করে সাধারণভাবে বলেছেন। কাজেই জালেম ইমামের সঙ্গে মাগরিব, ফজর ও আসরের নামাজ না পড়ায় যদি বিপর্যয় ও অভ্যাচারের ভয় থাকে তাহলে এ সব নামাজেও ইমামের সাথে শরিক হবে। কেননা, এ ধরনের বিপর্যয় এড়ানোর জন্য মাকরূহ কার্যও মুবাহ। তাই ইমামের সাথে যে সব নামাজ পড়া হবে তা নফলে পরিগণিত হবে এবং জামাতের ঙ্গোষ পাবে।

وَعَنْ ٥٥٣ أَيْ مُرْتَرَةً (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাজের এক রাকাত পেল, সে যেন পুরো ফজরের নামাজের ওয়াক্ত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাজের এক রাকাত পেল, সে যেন পুরো আসরের নামাজ পেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত নামাজ পেল সে পূর্ণাঙ্গ নামাজ পেল, অবশিষ্ট রাকাতগুলো তার পূর্ণ করতে হবে না। কিন্তু হাদীস ও ফিকহশাফিহগণের কেউই এ মত পোষণ করেননি। তাঁদের সকলের মতেই অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

١ - إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ - (بُخَارِي)

তিনি আরো বলেন—

٢ - مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يَنْتَهُ الْعَصَرَ .

তিনি আরো বলেন—

٣ - مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُكْمِلْ لَهَا أُخْرَى .

উল্লিখিত হাদীসত্রয় দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের বা সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত নামাজ পেলে তার পরিপূর্ণ নামাজ পাওয়া হবে না, বরং অবশিষ্ট রাকাতগুলো পূর্ণ করতে হবে।

উল্লিখিত হাদীসত্রয় মধ্যে ঈশ্বরের সমাধান : আলোচ্য হাদীস তথা ৫৫৩ দ্বারা বুঝা যায় যে, ৫৫৩-এর পূর্বে ফজর ও আসরের এক রাকাত পেলে পূর্ণ নামাজ হয়ে যাবে, অবশিষ্ট নামাজ পড়তে হবে না, অথচ অপরাপর হাদীসে দেখা যায় যে, (فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ) তার অবশিষ্ট নামাজ পড়তে হবে। এ উভয়ের মধ্যকার ঈশ্বরের সমাধান নিম্নরূপ। কেননা, উভয়ের মধ্যে মূলত কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

১. যে সব হাদীসে ৫৫৩ বলা হয়েছে, তাতে ৫৫৩-এর ৫৫৩ উহা রয়েছে তথা—
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ أَيْ فِي الرُّكُوتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرُّكُوتَ أَوْ فَقَدْ أَدْرَكَ قِصْبَةَ الْجَمَاعَةِ .
২. অথবা ৫৫৩ কথার উহা রয়েছে তথা ৫৫৩ তাই পরবর্তীতে তাকে পুরো নামাজ পড়তে হবে অথবা সংক্ষিপ্তাকারে তখন পড়ে নেবে।
৩. অথবা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস ও দলিলে উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে 'সে পেল' এর অর্থ এই যে, যার উপর ইভঃপূর্বে নামাজ ফরজ ছিল না, সে নামাজ পেল। যেমন সে অপ্রাপ্তবয়স্ক, কাফির, ঋতুবতী বা নেফাস-গ্রস্ত ছিল, অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে কিংবা সূর্যাস্তের পূর্বে যথাক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা পাক-পবিত্র হয়েছে এবং নামাজের ওয়াক্তের এক রাকাত পরিমাণ সময় পেয়েছে। সুতরাং তার উপর ঐ নামাজ ওয়াক্তই হবে। যার ফলে তাকে পরবর্তী সময়ে ঐ নামাজ কাজা পড়তে হবে।
৪. অথবা ইভঃপূর্বে হাদীসটি মাসবুকের জন্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে জামাতের পরিপূর্ণ ছওয়াব পেল। অতঃপর যদি সূর্য অস্ত যায়, তবে আসরের নামাজ আদায় হয়ে গেল। আর যদি সূর্য উদয় হয়, তবে সে জামাতের ছওয়াব পাবে, কিন্তু ফজরের নামাজ দ্বিতীয়বার কাজা পড়তে হবে।

মুসলিম শরীফের হাদীস ও এ কথার সমর্থন করে। যেমন - **فَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِيمَانِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ** - যেমন - যে ইমানে সাথে এক রাকাত নামাজ পেল সে জামাতের পূর্ণ ছওয়ার পেল।

৫. অথবা, কখনো **رُكَّتْ** সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সন্দেহবশত মানুষ নামাজ কাঙ্গা করে ফেলে, এ সন্দেহ নিরসনের জন্য রাসূল **ﷺ** বলেছেন যে, যদি এক রাকাত পরিমাণ সময় পায়, তবে সুন্নত মোত্তাহাব বাদ দিয়ে ফরজ নামাজ পড়ে নিতে হবে।
৬. **شَرَحَ النَّبَارِقِ** নামক কিতাবে এসেছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—

فَقَدْ أَدْرَكَ تَرَابَ كُلِّ الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ نَيْبِهِ لَا بِاعْتِبَارِ عَمَلِهِ

৭. অথবা এর জবাব হলো যে, এখানে উহ **مُضَانٌ** রয়েছে। অর্থাৎ **الصَّلَاةُ** **كُلُّهَا** যেমন কোনো ব্যক্তি মানত করল যে, অমুক স্থানে গিয়ে যদি আসরের নামাজ পাই তবে আমার গোলাম আজাদ; যদি সে ব্যক্তি এ স্থানে যাওয়ার পর সূর্যাস্তের পূর্বে এতটুকু সময় পায় যাতে এক রাকাত নামাজ পড়তে পারে, তবে সে নামাজ পেয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

الْإِخْتِلَافُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَعِنْدَ الطُّلُوعِ

সূর্যোদয়কালীন সময়ে ফজরের নামাজ বাতিল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ : সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত আদায় করা পর্যন্ত যদি সময় পাওয়া যায় তবে উক্ত নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে না ; বরং এ নামাজকে পূর্ণ করতে হবে। এ কথার উপর সকল ইমাম একমত। পোষণ করেছেন। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ— **أَنَّ عَلَيْهِ** (রু) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ - (بُخَارِيُّ)**

২. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَيْسَ صَلَاتُهُ - (بُخَارِيُّ)**

তবে ফজরের নামাজ বাতিল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে,

مَنْعَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ (رحا) : ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদের মতে যদি ফজর নামাজরত অবস্থায় সূর্য উদিত হয়, তবে উক্ত নামাজ বাতিল হবে না ; বরং অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করবে।

১. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

২. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَيْسَ صَلَاتُهُ - (بُخَارِيُّ)**

مَنْعَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর দলিল— **عَنِ ابْنِ سَعْدٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَحْرُؤُوا بِصَلَاةِكُمْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا** - এ ছাড়াও আরো বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে সূর্যোদয়ের সূর্য নামাজ বৈধ নয়। সুতরাং সূর্যোদয় দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

- * এ ছাড়া মুক্তিমূলক দলিল হলো— **إِسْفِرَ الرَّاسُ** -এর সময় হচ্ছে আসরের **وَقْتُ تَأْفِصِ** আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ও আসরের **وَقْتُ تَأْفِصِ** -এর সময়। সুতরাং আসরের নামাজ **وَقْتُ تَأْفِصِ** -এর মধ্যে শুরু ও শেষ উভয়টি হয়েছে। কিন্তু ফজরের পুরো সময় হচ্ছে **وَقْتُ كَامِلِ** এতে কোনো **وَقْتُ تَأْفِصِ** নেই তাই **طُلُوعِ شَمْسٍ** -এর সময় ফজরের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

الْجَوَابُ عَنْ دَيْبِلِ الْمُخَالِفِينَ : ইমামত্রয়ের দলিলসমূহের জবাব নিম্নরূপ—

১. প্রথম হাদীসের জবাব **الصُّبْحِ** **فَقَدْ أَدْرَكَ** সংক্রান্ত হাদীসের অনেকগুলো জবাব পূর্বে আলোচনা দেওয়া হয়েছে।
২. অথবা এটাও বলা যায় যে, সূর্যোদয়ের সময় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীস **مُؤَوَّاتٍ** -এর শর্তায়ে শীঘ্রই কিন্তু নামাজ বৈধ সংক্রান্ত হাদীস এ শর্তায়ে পৌঁছেনি, সুতরাং বৈধতার হুকুম **تَرَاتُرٌ** দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, নিয়ম হলো— **إِذَا تَعَارَضَ الصَّيْحُ وَالْمَحْرَمُ تَسَاقَطَ الصَّيْحُ وَتَرَجَعَ الْمَحْرَمُ** -

দ্বিতীয় হাদীসের জবাব : **عَزُّ الْمَسَارِقِ** -এর গ্রহণকার বলেন, **فَلَيْسَتْ صَلَوَتُهُ** -এর অর্থ হলো **وَجَدَ عَلَى رَجْعِهِ**। অর্থাৎ অন্য সময়ে তা যেনোভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেভাবে পূর্ণাক্রমে আদায় করবে ; এর অর্থ এই নয় যে, সূর্যোদয়ের সময়ই পূর্ণ করবে।

النَّاسِ ওতা নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। অর্থাৎ অন্য সময়ে তা যেনোভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেভাবে পূর্ণাক্রমে আদায় করবে ; এর অর্থ এই নয় যে, সূর্যোদয়ের সময়ই পূর্ণ করবে।

فَلَيْسَتْ صَلَوَتُهُ -এর অর্থ হলো **وَجَدَ عَلَى رَجْعِهِ**। অর্থাৎ অন্য সময়ে তা যেনোভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেভাবে পূর্ণাক্রমে আদায় করবে ; এর অর্থ এই নয় যে, সূর্যোদয়ের সময়ই পূর্ণ করবে।

হাদীস দ্বারা ফজর বাতিল হওয়া এবং সূর্যাস্ত দ্বারা আদায় বাতিল না হওয়ার মধ্যকার পার্থক্য : হানাফী আলমগণ এ কথার উপর একমত যে, সূর্যোদয়ের দ্বারা আসরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, তবে সূর্যাস্তের দ্বারা আসরের নামাজ বাতিল হবে না। অথচ হাদীস দ্বারা উভয় নামাজ বাতিল হওয়া প্রমাণিত হয় এবং অপরপন হাদীস দ্বারা বাতিল না হওয়াটাও স্যাবান্ত ; হানাফীগণ উভয় নামাজের মধ্যে এ পার্থক্য করার কারণসমূহ নিম্নরূপ—

- ফজর নামাজের সম্পূর্ণ সময়টাই সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ওয়াক্তে কামেল বা সম্পূর্ণ ওয়াক্ত। এর একটি অংশও নাকেস (অপূর্ণ) নয়। সুতরাং মুসল্লি ফজর নামাজের যে কোনো সময়েই নামাজ আরম্ভ করুক না কেন ঐ সময়টাই কামেল ওয়াক্ত। উ-সুলের একটি স্বত:সিদ্ধ নিয়ম এই যে, **لَوْ جُزِبَ آدَاءُ الصَّلَاةِ** এখন যদি কেউ ফজর ওয়াক্তের শেষ অংশে নামাজ আরম্ভ করে তবে সে কামেল ওয়াক্তে আরম্ভ করল, তাকে কামেলভাবেই আদায় করতে হবে। সুতরাং যেমন ওয়াজিব হয়েছিল তেমন আদায় করা হবে। কিন্তু যদি নামাজে থাকা অবস্থায় সূর্য উদয় হয়ে যায়, তখন কামেল ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে নাকেস ওয়াক্তে এসে পড়ে। এ কারণে যেহেতু তার নামাজ কামেলভাবে আদায় হবে না সেহেতু তার নামাজ বাতিল হবে। কারণ সূর্যোদয়ের সময়টি নাকেস ওয়াক্তের অন্তর্গত। যদি সে কামেল ওয়াক্তে আরম্ভ করে নাকেস ওয়াক্তে শেষ করে তবে যেমন ওয়াজিব হয়েছিল তেমন আদায় হবে না। সুতরাং ঐ নামাজ সিদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে আসরের নামাজের ওয়াক্ত দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন- জোহরের পর হতে সূর্য হ্রদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত সময় কামেল ওয়াক্ত। আর এরপর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নাকেস (ক্রেটিয়ুক্ত) ওয়াক্ত। সুতরাং যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরম্ভ করে এবং সূর্যাস্তের সময় শেষ করে তবে ওয়াজিব ও আদা উভয়ই নাকেস হবে। এ জন্য ঐ নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।
- জোহরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত। তবে সূর্য হ্রদ বর্ণ ধারণ করার পর হতে শুরু করে অবশিষ্ট সময় হলো মাকরুহ ওয়াক্ত। বান্দা এ মাকরুহ ওয়াক্তেও নামাজ আদায়ের জন্য আদিষ্ট। সূর্যাস্ত দ্বারা মাকরুহ ওয়াক্তের সমাপ্তি ঘটে এবং মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। যেহেতু সূর্যাস্ত দ্বারা অন্য এক নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়; তাই সূর্যাস্ত আসরের নামাজ বিনষ্টকারী নয়; কিন্তু সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামাজ বাতিল হবে। কেননা, সূর্যোদয় দ্বারা অন্য কোনো নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না।
- তৃতীয়ত সূর্য একাংশ উদিত হলেই সূর্যোদয় হয়েছে বলা হয়, কিন্তু সূর্যের একাংশ অস্ত গেলে **غروب** বলা হয় না। এ কারণেই আমরা বলি যে, সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, আর সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেলে আসর বাতিল হবে না।

السَّلَاةِ وَالْوَجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ সংকীর্ণ ওয়াক্তে নামাজ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ
مَنْعَهُ أَكْثَرَ الْمَسَاءِ : ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যদি ওয়াক্তের শেষ ভাগে কোনো অপ্রাণবয়স্ক বালক বা বালিকা প্রাণবয়সে উপনীত হয় অথবা কোনো অপবিত্রা মহিলা পবিত্রতা লাভ করে কিংবা কাফির মুসলমান হয় অতঃপর এতটুকু সময় না পায় যাতে ঐ ওয়াক্তের নামাজ পূর্ণাক্রমে আদায় করতে পারে তবে ঐ ওয়াক্তের নামাজ তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, নামাজের সাথে তার ওয়াক্তের সম্পর্ক **طَرَفٌ وَسَيِّبٌ** উভয় দিক দিয়েই হয়।

مَنْعَهُ أَكْثَرَ الْمَسَاءِ : অধিকাংশ ওলামার মতে যদি এক রাকাত আদায় করা পরিমাণ সময় পাওয়া যায় তবু ঐ ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব হবে। যদি সে সময় আদায় করতে পারে তবে তো ভালই, নতুবা কাজা করতে হবে। তাঁদের দলিল-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ
الْجُرَابَ عَنِ وَنَيْلِ الْمَخَالِيفِينَ : ইমাম যুফারের মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাঁর মতটি সহীহ ও সঠিক হাদীসের বিশ্লীত। আর যুক্তিসঙ্গত কথা শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন কুরআন ও হাদীস হতে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

وَعَنْ ٥٥٤ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
 قَبْلَ أَنْ تَقْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا
 أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
 الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আসরের এক সজদা [তথা এক রাকাত] পায় সে যেন তার নামাজকে পূর্ণ করে নেয়। এমনভাবে সূর্য উদয়ের পূর্বে যদি এক সজদা পায় তবে সে যেন তার নামাজকে পূর্ণ করে নেয়।
 -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَغُرُبَتَهَا مُبْطِلُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নামাজ বাতিলকারী কি না? হানাফীদের মতে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সকল নামাজকেই বাতিল করে না। কেননা, সেদিনের ফজরের নামাজ সূর্যোদয়ের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়; কিন্তু সূর্যাস্তের কারণে সেদিনের আসরের নামাজ বাতিল হয় না। এ ছাড়া অন্য সকল নামাজই এ সময়ে নিষিদ্ধ, এমনকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঘি-প্রহরের সময় [আসর বাতীত] সকল নামাজ নিষিদ্ধ। উল্লিখিত সময়ে জানাজার নামাজ পড়াও নিষিদ্ধ।
 কেননা, ফরজে কিফায়ার স্থান ফরজে আইনের নিচে। সুতরাং যেখানে ফরজে আইন নিষিদ্ধ সেখানে ফরজে কিফায়া ও শুদ্ধ হবেই না।

إِخْتِلَافُ الْإِمَمِ فِي أَرْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ: নিষিদ্ধ তিন সময়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদে : নিষিদ্ধ তিন সময়ে নামাজ প্রসঙ্গে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَنْعُ الشَّافِعِيِّ: শাফেয়ী ইমামগণের মতে নিষিদ্ধ তিন সময়ে সকল নামাজ নিষিদ্ধ, তবে ফরজ নামাজ নিষিদ্ধ নয়। তাঁরা নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসটিকে নফলের উপর প্রয়োগ করেছেন। তাই তাঁদের মতে সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামাজ এবং সূর্যাস্তের সময় আসরের নামাজ উভয়টিই তিক্ত হবে। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে উল্লিখিত হাদীসটি পেশ করেন।

مَنْعُ الْأَخْبَانِي: হানাফীদের মতে উল্লিখিত তিন সময়ে ফরজ ও নফল সকল প্রকারের নামাজ নিষিদ্ধ। তাঁদের দলিল হলো—
 عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصَلِّيَ وَأَنْ تَقْرُبَ فِيهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ وَجِبْنَ تَضْيَبَ لِلْفُرُوبِ حَتَّى تَقْرُبَ -

তবে কিয়ামের ভিত্তিতে সেদিনের আসরের নামাজ সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেলে শুদ্ধ হবে। কেননা, তা নাকেসরূপে ওয়াজিব হয়েছে এবং নাকেসরূপে আদায় হয়েছে। এতদ্বিন অন্য যে কোনো নামাজ ফরজ হোক বা নফল, এ তিন সময়ে পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

وَعَنْ ٥٥٥ أَنَسِ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا
 فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِي
 رَوَايَةٍ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. مَعْنَى عَلَيْهِ

৫৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কোনো নামাজ পড়তে ভুলে যায় অথবা তা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে তার প্রতিবিধান হলো যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নেবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, এটা বাতীত তার কোনো প্রতিকারই নেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَّ هَادِيَسِ الرَّحْمَنِ وَرَوَى الْحَدِيثُ: হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন, নিদ্রিত অবস্থার উপর

কোনো কড়াকড়ি নেই। অপরাধ হবে জাগ্রত অবস্থার উপরই। তখন মহানবী ﷺ এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।
 -[তিরমিযী ও নাসায়ী]

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَادِيَسَةٌ بِأَنَّهَا : هَيْرَتْ آَنَآسَ (رَا.) هَتَاتِ بَرْنِيتْ | نَبِيَّ كَرِيْمَ ﷺ هِيْرشَاد كَرَنَن | يَهْ بَرْنِكْتِ نَامَآجَرَهْ كَثَا ذُلَهْ يَآْ يَآْ اَثْوَآَا نَامَآجَرَهْ سَمَآْ اَنْنِشْكَرْكَتْآَابَهْ ذُومِيَهْ وَآَكَهْ | تَبْخَن تَار كَآْفَفَاَرَا اْتَا هَبَهْ يَهْ | يَخْنَهْ تَار شُرَهْ وَآَكَهْ اَثْوَآَا جَآْوَآَتْ هَبَهْ تَبْخَنَهْ سَه نَامَآْ وَآَدَهْ نَهْوَ | اْتَهْ سَه بَرْنِكْتِ اْوَآَرَاثِي هَبَهْ نَا | كَهْنَآَا | سَه اِنْشْكَرْكَتْآَابَهْ نَامَآْ وَآَدَهْ دَهْرِ كَرَهْنِن | ا هَادِيَسٌ دَاَرَا اْوَآَرَاثِي هَلَا نَامَآْ ذُلَهْ يَآْ وَآَاَرِ اَثْوَآَا ذُومُكَتْ اَبْوَآْآَا نَامَآْ وَآَدَهْ سَمَآْ آَلَهْ يَآْ وَآَاَرِ هُكُومُ كِي؟ سُتْرَاَوْ آَمَاَدَهْرَهْ جِيْوَآنَهْ وَ اْوَآَرِهَآَرِ كَرْتَبَا نَامَآْ وَآَدَهْ وَآَاَرَهْ اَرْكَطْ كَوَانَهْ اَبْوَآْآَا آَآَسَلَهْ جَآْوَآَتْ هَلَهْ وَآَا نَامَآْ وَآَدَهْ كَثَا شُرَهْ وَآَا آَمَاَدِ آَمَاَدَهْرَهْ نَامَآْ وَآَدَهْ نِيْتَهْ هَبَهْ | اْتَهْ نَامَآْ وَآَدَهْ دَاْيُوتْ آَالَن هَيَهْ يَآَهْ اَبْوَآَا اَرْكَطْ نَامَآْ آَدَاْآَاْكَآَرِي كَوَانَهْرَهْ اْوَآَرَاثِي هَبَهْ نَا | كَهْنَآَا | اْتَهْ وَآَنَاَرِ اَنْنِشْكَرْكَتْ آَابَهْ نَامَآْ وَآَدَهْ دَهْرِ هَيَهْ وَآَهْ | ا هَادِيَسٌ دَاَرَا كَآَجَا نَامَآْ وَآَدَهْ وَآِيْدَانْ سَاَبَآُ هَلَهْ |

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي التَّوْبِ تَغْرِيطٌ إِنَّمَا التَّغْرِيطُ فِي الْيَقِظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৬. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- নিদ্রায় কোনো ক্রটি নেই; ক্রটি হলো জাগরণে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোনো নামাজ ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে নিদ্রা যায় যখনই তা শ্রণ হয় পড়ে নেবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর আমার শ্রণে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতামত : নিষিদ্ধ সময়সমূহ তথা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরে নফল নামাজ পড়া নিষিদ্ধ; এমনিভাবে সে সময়ে কোনো কাজ। নামাজ পড়াও জায়েজ নেই। তবে সেদিনের ফজর ও আসরের নামাজ জায়েজ কি না? এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে।

مَنْعَبُ الْاَوْقَاتِ السَّلَاةِ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর মতে ঐ দিনের ফজরের নামাজ সূর্যোদয়ের সময় এবং আসরের নামাজ সূর্যাস্তের সময় আদায় করা জায়েজ আছে। তাঁরা দলিল হিসেবে ডাক্রমা إِذَا ذَكَرْتُمَا হাদীসকে পেশ করেন। কেননা, উক্ত হাদীসে মুতলকভাবে নামাজ পড়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

مَنْعَبُ آَبِي هَيْنِيَّةَ : ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে, উক্ত নিষিদ্ধ তিন ওয়াগ্তে সব রকমের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। তবে স্বতন্ত্র একটি কারণে শুধু আসরের নামাজ জায়েজ। কেননা, নিষিদ্ধ তিনটি সময় এই হাদীস হতে স্বতন্ত্র, তিনটি সময়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞাই তার স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ। এ ছাড়া হাদীসটি প্রকাশ্য অর্থে যদিও নিঃশর্ত বলে বৃথা যায়, প্রকৃতপক্ষে তা শর্তযুক্ত। আর এখানে শর্তটি উহা রয়েছে, আর তা হলো اَوْقَاتِ الْمَكْرُومَاتِ এভাবে উহা হলে হাদীসের অর্থ হবে, যখন শ্রণ পড়বে তখনই নামাজ পড়বে, তবে শর্ত হলো তা যেন নিষিদ্ধ সময়গুলোতে না হয়। এতদ্বার্তীত এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যখনই শ্রণ পড়বে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়ে শুধু নামাজ পড়বে; বরং সকলেই বলেন যে, শর্তাবলি সাপেক্ষে যেমন অজু করে, সতর ঢেকে ও অপবিত্রতা হতে মুক্ত হয়ে খাশসম্বব তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে নেবে। ফলে উক্ত হাদীসকে শর্তহীন বলা চলে না; উল্লিখিত শর্তাবলি উহা আছে বলে সকলেই স্বীকার করেন।

আমাদের হানাফীদের মতে সূর্যাস্তের সময় সে দিনের আসর নামাজ পড়া জায়েজ হবে। কেননা, আসরের শেষ ওয়াগ্ত নাকেস ওয়াগ্ত; অতএব যেভাবে নামাজ নাকেস ওয়াগ্তে ওয়াজিব হয়েছিল তেমনি আদায় হয়েছে। এ ছাড়া সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি ফরজ ওয়াগ্ত শুরু হয়ে গেছে, মাঝখানে কোনো বৃথা সময় রচনা করেনি। কাজেই সে দিনের আসরের নামাজ পড়া জায়েজ হবে।

أَمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي -এর মর্মার্থ : আল্লাহা তীবী বলেন, আলোচ্য আয়াতটি কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তবে এখানে এমন একটি অর্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে বর্ণিত হাদীসটির সাথে এর পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হবে নিম্নরূপ—

১. অর্থবা ১ অর্থ হলো এখানে أَمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي أَي وَقْتُ ذِكْرِي অর্থ L বর্ণটি ওয়াক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, নামাজের শরণই অঙ্গাহার শরণকে অপরিহার্য করে তোলে।
 ২. অথবা এর অর্থ হলো এখানে أَمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي أَي وَقْتُ ذِكْرِي উহা রয়েছে অর্থবা
 ৩. অথবা এখানে الصَّلَاة -এর যমীর ব্যবহার না করে اللَّهُ -এর যমীর ব্যবহার করে নামাজের সম্মান ও মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- التَّغْرِيبُ فِي الْبَيْتِ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেন, ঘুমে কোনো ক্রটি নেই, ক্রটি হলো জাগরণে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিদ্রায় কাতর হয়ে নামাজের সময়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সময় থাকতে জাগ্রত হলো না, এতে তার কোনো দোষ বা অপরাধ হবে না। তবে জাগ্রিত হওয়ার পরও যদি সে তাড়াতাড়ি নামাজ আদায় না করে, বরং অলসতা করে তবে এটাই হবে দোষ বা অপরাধের কারণ। التَّغْرِيبُ فِي الْبَيْتِ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে।
- التَّغْرِيبُ بِالرَّأْيِ : বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর মূল নাম হলো, আল-হারেছ অথবা নো'মান অথবা আমর, কুনিয়ত বা উপনাম আবু কাতাদা। পিতার নাম-রিবঈ ইবনে বুলদামা। তিনি উপনামেই মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট প্রসিক্সি অর্জন করেন। তিনি হুজুর ﷺ-এর একজন সাহাবী।
২. নসবনামা বা বংশধারা : আবু কাতাদা আল-হারেছ ইবনে রিবঈ ইবনে বুলদামা ইবনে খুনাছ ইবনে সিনান ইবনে উবাইদ ইবনে আদী ইবনে গানাম ইবনে কায়ব ইবনে সিলমা আস-সালামী আল-মানালী আল-আনাসারী।
৩. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ : তিনি যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি এ ব্যাপারে সকলে একমত না হলেও অংশ গ্রহণ না করার বর্ণনাই প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। তিনি উহ্দ, ঝন্দক ও তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেছেন।
৪. তাঁর হাদীসের সংখ্যা : তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭০ খানা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে তাঁর বর্ণিত ১১খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে ২খানা, ইমাম মুসলিম ৮খানা হাদীস স্ব-স্ব সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
৫. এ নামে অন্য সাহাবী : হারেছ নামে সাহাবায়ে কেরামের অনেককে পাওয়া গেলেও তিনি এ নামে ইলমে হাদীস বর্ণনার পরিচিত নন; বরং আবু কাতাদা নামেই পরিচিত। আবু কাতাদা নামে তিনি ব্যতীত কোনো সাহাবীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।
৭. ইহশোক ভ্যাগ : তিনি ৫৪ হিজরী মতান্তরে হযরত আলীর খেলাফতের যুগে ৭০ বৎসর বয়সে মদীনাতে মতান্তরে কৃষ্ণ নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٥٧ عَلِيٍّ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُوَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْرًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না। (১) নামাজ— যখন তার সময় আসে। (২) জানাযা— যখন তা উপস্থিত হয়। (৩) স্বামীহীন রমণীর বিবাহদান, যখন তুমি সমপর্যায়ের বর পাও।—[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসংশ্লিষ্ট অর্থ হলো যখন নামাজের সময় হয়, অর্থাৎ নামাজের সময় হলে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা ঠিক নয়। এর দ্বারা নিষিদ্ধ সময়সমূহ এর থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, এগুলো নামাজের সময় নয়।

حَضَرَتْ إِذَا حَضَرَتْ -এর অর্থ : এর অর্থ হলো জানাযা যখন উপস্থিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, মাকরুহ সময়ে জানাযা উপস্থিত হলেও ঐ সময় নামাজে জানাযা পাড়া মাকরুহ নয়। তবে মাকরুহ সময়ের পূর্বে উপস্থিত জানাযা মাকরুহ সময়ে পড়লে তা মাকরুহ হবে বলে ফকীহগণ মত ব্যক্ত করেছেন, আর সিদ্ধদায়ে তিলাওয়াতও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে সুবহে সাদেকের পূর্বে কিংবা পরে এবং আসরের পরে নামাজে জানাযা ও সিদ্ধদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা মাকরুহ নয়।

الْأَيْمُ -এর অর্থ : **الْأَيْمُ** শব্দটি **إِسْمٌ صِفَتٌ** বহুবচনে **أَيْمَتُنَّ** - **أَيْمَاتٌ** - **أَيْمَانٌ** - **أَيْمَانٌ** আন্তরমা বদরুদীন আইনী (র.) বলেছেন, স্বামীহীনা নারীকে **أَيْمٌ** বলা হয়। কুমারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

كُفُوٌ -এর অর্থ এবং বিবাহে কোন কোন বিষয়ে সমতা বিবেচ্য : **مَعْنَى الْكُفُوِ وَبَيَانُ شَرْعِيَّتِهِ الْكُفَاءَةُ نِسِ الْكِنَاكِحِ** শব্দটি একবচন, এর বহুবচন- **أَكْفَاءٌ** শাব্দিক অর্থ- অনুরূপ, সাদৃশ্য, সমকক্ষ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ করেকটি বিষয়ে সমতা থাকাকে শরিয়াতের পরিভাষায় **كُفُوٌ** বা সমকক্ষতা বলা হয়।

বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে সমতা থাকা প্রয়োজন : (১) নসব বা বংশগত ঐতিহ্য। সে হিসেবে একজন কোরেশ অপরজন কোরেশের জন্য **كُفُوٌ** বা সমকক্ষ। আর অনারবগণ যেহেতু বংশগত ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি; বরং বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, সেহেতু প্রত্যেক অনারব মুসলমান পরম্পরের সমকক্ষ। (২) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে একে অন্যের সমকক্ষ হওয়া। সুতরাং ধর্মতীক্ৰ ও সীমালঙ্ঘনকারী পরম্পরের সমকক্ষ হবে না। (৩) ইসলাম। যার পিতা ও পিতামহ মুসলমান, সে পুরুষ এমন মহিলার জন্য সমকক্ষ বিবেচিত হবে, যার পূর্বপুরুষ মুসলমান। আর যার শুধুমাত্র পিতা মুসলমান, সে পুরুষ এমন মহিলার সমকক্ষ বিবেচিত হবে না, যার পূর্বপুরুষ মুসলমান। (৪) স্বাধীনতা। সুতরাং উম্মীতদাস, স্বাধীনতার চুক্তি সম্পাদনকারী, মনিবের মুত্য়ার পর স্বাধীনতা লাভের প্রতিকৃতিবন্ধ পুরুষ পূর্ব স্বাধীন মহিলার সমকক্ষ হবে না। (৫) সম্পদ অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দানে সক্ষমতা। সুতরাং যে পুরুষ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দানে সক্ষম সে সম্পদশালিনী মহিলার সমকক্ষ হবে। (৬) পেশা। সুতরাং তাঁতি, জেলে, নাপিত ও ঝাড়ুদার অভিজাত পেশা-জীবী ও ব্যবসায়ীর সমকক্ষ হবে না।

الْأَيْمَانُ بِالنِّسَابِ স্বর্ণনাক্ষারীর পরিচিতি :

- নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আলী, কুনিয়াত বা উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব। উপাধি আসাদুল্লাহ, হায়দার, মুরতযা। পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা। উভয়ে কুরায়েশ বংশের শাখা হাশেমী বংশোদ্ভূত। সাহাবী ও বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।
- নসবনামা বা বংশধারা : আলী ইবনে আবী তালেব ইবনে আবদিল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কীলাব ইবনে মুররাহ।
- জন্ম : তিনি মহানবী **ﷺ**-এর নবুয়ত লাভ করার দশ বছর পূর্বে হাশেমী বংশের আবু তালিবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইসলাম গ্রহণ : একদা হযরত খাদীজা (রা.) হজুর **ﷺ** সহ নামাজ আদায় করছেন। ইত্যবসরে হযরত আলী (রা.) তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এভাবে কি করছেন। তখন তাঁর বয়স এগারো বছর। এ মুহুর্তে হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, এক আগ্রাহর ইবাদত করছি এবং তোমাকেও সে দাওয়াত দিচ্ছি। তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।
- হযরত ফাতেমার সাথে বিবাহ : হিজরি দ্বিতীয় সনে রাসূলে কারীম **ﷺ**-এর কলিজার টুকরা, খাতুনে জন্নাত হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
- রাসূলে কারীম **ﷺ**-এর সাথে সম্পর্ক : প্রথমত কথা হলো, হযরত আলীর পিতা আবু তালিব, হজুর **ﷺ**-এর আপন চাচা। অতএব তিনি তাঁর চাচাত ভাই। আবার সীনের দিক হতে হজুর **ﷺ** তাঁকে ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর চাচা পবিত্র হওয়ায় কারণে তিনি ছোটকাল হতেই তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। অপর দিকে তাঁর জামাতা। নবী করীম **ﷺ** তাঁর সম্পর্কে বলেন- **أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا**
- মদীনায় হিজরত : হজুর **ﷺ** আগ্রাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.)-কে নিজ বিছানায় শায়িত রেখে যান, যাতে তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানত তিনি মানুষের নিকট পৌছে দিতে পারেন। হিজরতের তিন দিন পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

৮. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ : রাসূল ﷺ-এর যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ছাড়া তিনি সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন। খায়বার অভিযানে তিনিই সুদূর দুর্গগুলো পদানত করেন।
৯. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন, হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শদাতা ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) ইন্তেকাল করার পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পান এবং প্রায় পাঁচ বৎসর এ দায়িত্ব পালন করেন।
১০. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হতে ৫৮৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে সখিলিতভাবে আনা হয়েছে ২০ খানা। বুখারী এককভাবে ৯ খানা ও মুসলিম এককভাবে ১৫ খানা হাদীস উল্লেখ করেছেন।
১১. শাহাদাত বরণ : ৪০ হিজরির ১৭ই রমজান শনিবার ভোরে তিনি যখন আস-সালাত বলে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ইবনে মুলজিম নামক খারেজী আততায়ী শাণিত তরবার দিয়ে তাকে আঘাত করে এবং এতে তিনি ঐ দিনই শাহাদাত বরণ করেন।
১২. নামাজে জানাযা : তাঁর পুত্র হযরত হাসান তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে কূফা জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। কারো মতে তাঁকে নাজফে আশরাফে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٥٥٨
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ
رِضْوَانُ اللَّهِ وَالنَّوْتُ الْأَخْرَ عَنُورِ اللَّهِ -
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- নামাজের প্রথম সময় হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, আর শেষ সময় হলো আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা [তথা পাপ হতে কোনো রকম বাঁচা]। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- الْوَتُّ الْأَوَّلُ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত বলতে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন যে, এর অর্থ হলো, ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর শীঘ্রই নামাজ আদায়করণ।
- رِضْوَانُ اللَّهِ -এর মর্মার্থ : رِضْوَانُ اللَّهِ এর অর্থ হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামাজ আদায় করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ। কেননা, প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর বাণী-نَسْتَعِينَا- প্রকৃতি আয়াতের উপর আমল করা হয়।
- النَّوْتُ الْأَخْرَ -এর মর্মার্থ : النَّوْتُ الْأَخْرَ -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-
১. এমন সময়, যখন নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে বলে আশংকা হয়।
২. মাকরুহ সময়। যেমন- সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের নামাজ পড়া, অর্ধরাত্রি অতিক্রম করার পর ইশার নামাজ আদায় করা।
- আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, ফজরের নামাজকে উষা খুব পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত, আসরের নামাজকে সূর্যের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এবং ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম। কেননা, বিলম্ব আদায় করার মধ্যে দু'টি উপকারিতা রয়েছে—
১. নামাজের অপেক্ষায় থাকার ছ'ওয়াব,
২. জামাতে নামাজের সংখ্যা অধিক হওয়ার ছ'ওয়াব।
- رِضْوَانُ اللَّهِ -এর অর্থ : رِضْوَانُ শব্দটি অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَسْتَلُونَكَ مَادَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ الْغَفُورُ এখানে رِضْوَانُ শব্দের অর্থ- অতিরিক্ত। অর্থাৎ, নিজের ও পরিবারের জন্য যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বস্তু খরচ করা। সুতরাং হাদীসাংশের মর্মার্থ হবে فَرَىٰ آخِرَ النَّوْتِ فَعُضِّلَ اللَّهُ كَثِيرًا তবে এখানে رِضْوَانُ শব্দটি ক্ষমা অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٥٥٩ أُمِّ قُرْوَةَ (رض) قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوْلٍ وَقَتِهَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْعُمَرِيُّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৫৫৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে ফারওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন কাজ অধিক উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, নামাজকে তার প্রথম সময়ে আদায় করা। -[আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ] আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আলওমারী ব্যতীত আর কারও থেকে বর্ণিত নয়। আর হাদীসবিদদের নিকট তিনি শক্তিশালী নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَوْمِ بَرَفِطٍ لَمْ يَمْ -এর বর্ণটি -لَوْلَا الْوَقْتُ- আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন-এর অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে বরফট হওয়ায়। অর্থাৎ বরফট হওয়ায় মুহাম্মদ ইবনে আলী আত-তীবী (র.) বলেন, লَمْ বর্ণটি তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বরফট হওয়ায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- فَتَمَّتْ لَمْ -এর মধ্যে -فَتَمَّتْ لَمْ- এর উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে قَبْلُ অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি, যেমন আল্লাহর বাণী- فَتَمَّتْ لَمْ -এর মধ্যে -فَتَمَّتْ لَمْ- এর উল্লেখ রয়েছে। কেননা, এখানে -وَقْتُ- এর উল্লেখ রয়েছে। এটা ই সঠিক অভিমত। এখানে প্রথম ওয়াক্ত বলতে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত বুঝানো হয়েছে। এটা ই হানাফীদের অভিমত।

وَعَنْ ٥٦٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً لَوْ قَتَلَهَا الْآخِرُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৬০. সরল অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার কোনো নামাজকে তার শেষ সময়ে পড়েননি, এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তুলে নিয়েছেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَوْمِ بَرَفِطٍ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিশেষ ওজরবশত বা আকস্মিক কোনো ঘটনাবশত কারণ ছাড়া রাসূল ﷺ অভ্যাসগতভাবে কখনও শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়েননি, এখানে হযরত আয়েশা (রা.) নবীম করী ﷺ -এর একবার হযরত জিবরাঈল ﷺ -এর সাথে শেষ সময়ে নামাজ পড়া, আর একবার এক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামাজ পড়াকে বাদ দিয়ে অপর সময়ের কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত হাদীসত্রয়ে যে প্রথম ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, এর অর্থ উত্তম সময় তথা মোস্তাহাব সময়ের প্রথম ওয়াক্ত।

وَعَنْ ٥٦١ أَبِي أَيُّوبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ أُمَّتِي يَخْتَارُ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ التُّجُومُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ)

৫৬১. অনুবাদ : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণে থাকবে অথবা তিনি বলেছেন সর্বদা উত্তম স্বভাবের উপর থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাগরিবের নামাজ তারকা ঘন হয়ে ওঠা পর্যন্ত বিলম্ব না করবে। -[আবু দাউদ; কিত্ব দারেমী এ হাদীস আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا بُرَأَ لِمَنْ بَخَّسَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে **فِطْرَةٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য স্থায়ী উত্তম স্বভাব অথবা ইসলামত বর্ণনাকারীর সন্দেহ ছিল যে, রাসূল **بَخَّسَ** বলেছেন, নাকি **الْفِطْرَةَ عَلَى** বলেছেন, এ কারণে **أَوْ** কথাটি বলেছেন।

أَنْ تَفْتَحِيَكَ التُّجْمُومَ -এর অর্থ : বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনুল মালেক বাকাটির অর্থ করেছেন যে, **بَطَّحُوا جَنْفَهَا** অর্থাৎ, তারকারাজি সূক্ষ্মভাবে প্রতিভাত হওয়া এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়া, অর্থাৎ তারকারাজি ঘন নিবিড় হয়ে উঠা।

উক্ত হাদীস হতে স্টভাবে বুঝা যায় যে, মাগরিবের নামাজ তারকারাজি ঘন নিবিড় হয়ে উঠা পর্যন্ত দেরি করে পড়া অনুচিত। শরহে সুন্নহ গ্রন্থে এসেছে যে সাহাবায়ে কেলাম, তাবযীন ও তৎপরবর্তী আলিমগণ মাগরিবের নামাজ শীঘ্রই পড়তেন। তবে কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল **بَطَّحُوا** মাগরিবের নামাজ বিলম্বে আদায় করেছেন, তা ছিল বেধুনা বর্ণনার জন্য।

الَّتَمَرَيْنِ بِالرَّوِيِّ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম খালেদ, কুনিয়াত আবু আইয়ূব। পিতার নাম য়ায়েদ ইবনে কুলাইব। বনি নায্জার গোত্রোদ্ভূত। মদিনার অধিবাসী, মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।
২. নসবনামা : আবু আইয়ূব খালেদ ইবনে য়ায়েদ ইবনে কুলাইব ইবনে ছা'লাবা ইবনে আবদে আউফ ইবনে গান্ম আল-আনসারী আল-নায্জার আল-খায়রাজী।
৩. আকাবায়ে হানিয়ায় অংশগ্রহণ : হযরত আবু আইয়ূব আল-আনসারী মদিনার মুসলমানদের পক্ষ হতে হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় আকাবাত হজুর **بَطَّحُوا** -এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।
৪. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত আবু আইয়ূব বদর যুদ্ধসহ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সমূহে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণটি মুদ্বাহত হওয়া হতেই স্ট। তিনি সকল যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে যা তাঁর যুগে যোগেছিল ছিলেন।
৫. তাঁর ঘরে ছদ্মরের পদার্পণ : মক্কা হতে হজুর **بَطَّحُوا** যখন মদীনাতে হিজরত করেন তখনই মদীনার লোকেরা তাঁর আগমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি মদীনায় পৌঁছার সাথে সাথে মুশসমান আনসাররা স্ব-স্ব গৃহে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার মত ব্যক্ত করেন। এ সমস্যা দেখা দিলে হজুর **بَطَّحُوا** সমাধানার্থে বলেন, তাঁর উট যেখানে বেষ্টিয় বসবে সেখানেই তিনি অবতরণ করবেন। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর উট হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর বাড়িতে গিয়ে বসে এবং তিনি তাঁর বাড়িতে অবতরণ করেন ও তথায় তিনি একমাস অবস্থান করেন।
৬. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫০ খানা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সমভাবে তাঁর বর্ণিত ৭ খানা হাদীস এবং ইমাম বুখারী এককভাবে তাঁর বর্ণিত একখানা হাদীস উল্লেখ করেছেন।
৭. ইশলাক ত্যাগ : হিজরি ৫০ মতান্তরে ৫১ তে তিনি কুস্তনতুনিয়াতে ইস্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু গাজী অবস্থাতে হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার সাথে কুস্তনতুনিয়ার যুদ্ধে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি সকলকে অসিয়ত করে বলেন, "আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন তোমরা আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে। যেই মাত্র তোমরা শত্রু সৈন্যদের সাথে মোকাবিলায় জন্য সারিবদ্ধ হবে তখন তোমরা আমাকে তোমাদের পায়ের নিচে দাফন করবে।" এ অসিয়ত মোতাবেক তাকে দাফন করা হয়।

وَعَنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي
لَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ
اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِّرْمِذِيُّ
وَأَبْنُ مَاجَةَ)

৫৬২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** ইরশাদ করেছেন- যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতে আদেশ প্রদান করতাম। -[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَوْلَا كَرَامَةُ الْمُتَّقَةِ عَلَىٰ أُمَّتِي النَّبِ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসের অর্থ হলো। অর্থাৎ, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হওয়া আমার অপছন্দনীয় না হতো, ত তবে আমি ইশার নামাজ বিলম্ব করে পড়ার আদেশ প্রদান করতাম। তথা বিলম্ব করে পড়া ওয়াজিব করে দিতাম।

নবী করীম ﷺ কেন ইশাক দেরি করা ছেড়ে দিলেন? ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছ ছিল না। প্রায় সকলেই সাহাবাদিন কঠোর পরিশ্রম করতেন, ফলে সন্ধ্যার পরপরই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায় যে, তারা মসজিদে বসে ঘুমাতে। ফলে রাসূল ﷺ তাদের এ কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে কাজিক্ত সময় পর্যন্ত ইশার নামাজকে দেরি করা পরিহার করেছেন। বস্তুত ইশার নামাজ দেরি করে পড়া মোস্তাহাব, এ হুকুম এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এরূপ সময়ে পড়া কষ্টকর হওয়া মনে না করলে রাসূল ﷺ তা ওয়াজিব করে দিতেন।

أَوْ نَضِيبٍ -এর অর্থ : কারো মতে এর সম্পর্ক হলো গ্রীষ্মকালের সাথে। আর نَضِيبٍ -এর সম্পর্ক হলো শীতকালের সাথে। আবার কারো মতে যে কোনো কালই হতে পারে, নির্দিষ্ট কোনো কালের সাথে এ হুকুম বাস নয়।

কিছুসংখ্যক বলেন, এখানে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে সন্দেহ হয়েছিল। তথা বর্ণনাকারীর এ সন্দেহ ছিল যে, রাসূল ﷺ نَضِيبٍ বলেছেন, নাকি نَضِيبٍ বলেছেন, এ কারণেই ^১বলেছেন।

وَعَنْ ٥٦٣ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَمُوا بِهِذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضَلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَّمِ وَلَمْ تَصْلِحْهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৫৬৩. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা এ নামাজকে [ইশাকে] দেরি করে পড়। কেননা, এ নামাজ ঘারা তোমাদেরকে সকল [নবীর] উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে কোনো উম্মত এ নামাজ পড়েনি।-[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَدْخُلُوا الْعَتَمَةَ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসসাংশে أَعْتَمُوا শব্দটি অর্ অর্ বা নির্দেশসূচক, অর্থ হবে الْعَتَمَةَ অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে প্রবেশ কর। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা খলীল (র.) বলেন, أَعْتَمُوا অদৃশ্য হওয়ার পরবর্তী সময়কে عَتَمَةٌ বলা হয়। হাদীসের অর্থ : الْفَتْرِ الْفَتْرِ وَتَحَقَّقْ لَكُمْ سُقُوطُ الطَّلَمَةِ وَتَحَقَّقْ لَكُمْ سُقُوطُ الطَّلَمَةِ অর্থাৎ, তোমরা অন্ধকারে প্রবেশ করার পর যখন فَتْرٌ فَتْرٌ হাবে তখন ইশার নামাজ আদায় কর। এ সময়ের পূর্বে যদি আদায় করা হয় তবে এটা ওয়াক্তের পূর্বেই আদায় করা হবে। এ আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় না যে, ইশার নামাজ বিলম্বে আদায় করা উত্তম, বরং এখানে ইশার প্রথম ওয়াক্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, এখানে এটাও হতে পারে যে, أَعْتَمُوا শব্দটি عَتَمٌ হতে উদ্ভূত। অর্থ- বিলম্ব করা। যেমন- বলা হয় أَعْتَمَ الرَّجُلُ রাতে বিলম্ব করে অতিথিকে খানা খাওয়ানো। এ অবস্থায় হাদীসের অর্থ হলো তোমরা ইশার নামাজ বিলম্বে আদায় কর। তাই বুঝা যাচ্ছে যে, ইশার নামাজ বিলম্বে আদায় করা উত্তম।

وَالْتَمَارُ وَالدَّفْعُ ও সমাধান :

ঘনু : মু'আয ইবনে জাবালের বর্ণনা ঘারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে হাদীসে জিবরাদিলে বর্ণিত وَمِنْ تَبِيلِكِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ تَبِيلِكِ ঘারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবীদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই ফরজ ছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে ঘনু পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিম্নরূপ :

সমাধান :

- ইশার নামাজ পূর্ববর্তী কোনো নবীর উম্মতের উপর ফরজ ছিল না। তবে নবীদের উপর ফরজ ছিল। যেমন- তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূল ﷺ এর উপর ফরজ ছিল, কিন্তু উম্মতের উপর ফরজ বা ওয়াজিব নয়।

২. অথবা বলা যায় যে, পূর্ববর্তীগণও ইশার নামাজ পড়তেন, তবে আমাদের ন্যায় তারা পড়তেন না, বরং তাদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন।
৩. অথবা ইশার নামাজ ফরজ হিসাবে শুধু এ উম্মতের জন্যই খাস, পূর্ববর্তীদের জন্য এটা ছিল সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার।
৪. অথবা হাদীসে জিব্রাঈলে ﷺ দ্বারা ফজরের নামাজকে বিলম্ব করে উজ্জ্বল প্রত্যুষে পড়ার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।
সর্বপ্রথম কোন নবী কোন নামাজ পড়েছেন : তাহাবী শরীফে আছে যে,
১. হযরত আদম (আ.)-এর তওবা ফজরের সময়ে কবুল হয়েছে, এ জন্য আদম (আ.) ফজরের নামাজ পড়েছিলেন।
২. ইব্রাহীম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি দিয়েছিলেন জোহরের সময়, যখন ইসমাইলের স্থলে দুধা এসেছে তখন ইসমাইলের বেঁচে যাওয়ার শুকরিয়া আদায় করণার্থে তিনি জোহরের চার রাকাত নামাজ পড়েছেন।
৩. হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আসরের সময় পুনর্জীবিত করা হয়েছে, তখন তিনি আসরের নামাজ পড়েছেন।
৪. দাউদ (আ.)-এর মাগফিরাত মাগরিবের সময়ে হয়েছে, তখন তিনি মাগরিবের তিন রাকাত নামাজ পড়েছেন।
৫. ইশার নামাজ সর্বপ্রথম আমাদের নবীর উপরই ফরজ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٦٤ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ (رَضِيَ) قَالَ
أَنَا أَعْلَمُ بِرَوَيْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ
الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّيْنَهَا لِسُقُوطِ
النَّعْمِ لِشَايَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৬৪. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই নামাজ তথা ইশার
নামাজের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই
জানি। নবী করীম ﷺ তৃতীয় তারিখের চাঁদ অস্তমিত
হলে এটা পড়তেন। [আবু দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসটিতে হযরত নু'মান ইবনে বাশীরের 'أَنَا' দাবিটি কখনো তার অহঙ্কারের পরিচায়ক নয়; বরং এটা 'تَعْدِيْتُ بِالنِّعْمَةِ' -এর অন্তর্ভুক্ত অথবা এ বাক্যটির দ্বারা হাদীসটির প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি হাদীসটি এমন এক সময়ে বর্ণনা করেছেন যখন বিশিষ্ট সাহাবীদের কেউই জীবিত ছিলেন না।

عِشَاءً -এর অর্থ : নবী করীম ﷺ এর যুগে মাগরিবের নামাজকে প্রথম ইশা, আর ইশার নামাজকে 'عِشَاءً' বা শেষ ইশা বলা হতো।

وَأَنَا أَعْلَمُ بِرَوَيْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ -এর অর্থ : এখানে 'أَنَا' বর্ণটি 'وَقْتُ' বা সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর অর্থ হলো 'عُرُوبٌ' বা অস্তমিত হওয়া। অতএব 'سُقُوطِ النَّعْمِ' দ্বারা চন্দ্র অস্তমিত হওয়া উদ্দেশ্য। আর 'لِشَايَةِ' দ্বারা মাসের তৃতীয় রাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ চান্দ্রমাসের তৃতীয় রাতে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে রাসূল ﷺ ইশার নামাজ পড়তেন।

التُّعْمَانِيُّ بِالرَّوَيْتِ : বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম নু'মান, কুনিয়াত বা উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম বাশীর ইবনে সাদ, মাতার নাম আমরা বিনতে রাওয়াহা। তিনি এবং তাঁর পিতা ও দাদী সাহাবী ছিলেন। তিনি খায়রাজ বংশোদ্ভূত।
২. জন্মলাভ : নবী করীম ﷺ মদীনাতে হিজরত করার চৌদ্দ মাস পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পরে সর্বপ্রথম আনসারদের সন্তানের মাঝে তিনি প্রথম। নবী করীম ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স আট বছর সাত মাস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং তিনি একই সনে অর্থাৎ হিজরি দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর হযরত ইবনে যুবাইর হতে বয়সে ছয় মাসের বড়।
৩. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি রাসূলে করীম ﷺ হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সংখ্যা হলো ১১৪ [একশত চৌদ্দ] খানা। তাঁর নিকট হতে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর ছেলে মুহাম্মদ ও হযরত আমের আশশাবী উল্লেখযোগ্য।

৪. শাহাদাত বলণ : ৬৫ হিজরিতে দামেশক এবং হিমস-এর মধ্যবর্তীস্থানে তাঁকে হত্যা করা হয়। মিশকাতের আসমাউর রিজালে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাহায্যার্থে ডাকা হলো তখন হিমসবাসিরা তাঁকে তলব করে এবং তাঁকে ৬৫ হিজরিতে হত্যা করে।

হযরত আলী ইবনে ওসমান আনু নাওফলী হযরত আবু মুছহিবের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) হিমস নগরীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নির্বাচিত আমলে ছিলেন। যখন হিমসবাসিরা তাঁর উপর চড়াও হলো, তখন তিনি পলায়ন করলেন। তখন খালেদ ইবনে খালী আল-কালামী তাঁকে অনুসরণ করে ও পথিমধ্যে হত্যা করে।

হযরত মুফাদ্দাল ইবনে গাস্‌সান আল-গালাবী বলেন, সালামিয়া নামক স্থানে ৬৬ হিজরিতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالِدَّارِمِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)

৫৬৫. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমরা ফর্সা করে ফজরের নামাজ পড়। কেননা, এতে অধিক ছুঁয়াব রয়েছে। -[তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী শরীফে এ অংশটি নেই যে, এতে অত্যধিক ছুঁয়াব রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنِ هَانِيسِ بْنِ سُرْحٍ هَانِيسِ بْنِ سُرْحٍ হানীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হানীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন যে, ফজরের নামাজ অন্ধকারে না পড়ে আলোতে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে হযরত মু'আয (রা.) হতে একটি হানীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- بَعَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي السَّيَاءِ فَغَسَّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرًا مَا يَطْبِقُ النَّاسَ وَلَا تَسْلِبِهِمْ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَاسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَأَنهَلَهُمْ حَتَّى يَبْرُكُوا -

আলোচ্য হানীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ফজরের নামাজ শীত ঋতুতে অন্ধকারে পড়া এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে আলোতে পড়া উত্তম। বস্তুত এ হানীসটির উপর আমল করলে আলো ও আঁধার সংক্রান্ত সমস্ত হানীসেরই একটা সমাধান হয়ে যায়।

ফজর নামাজের মোস্তাহাব ওয়াজ্ব : সুবেহ সাৎবেকের পর ফজরের নামাজের ওয়াজ্ব শুরু হয়, এতে কারো ঘিমত নেই। কিন্তু ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া উত্তম, না ফর্সাতে পড়া উত্তম, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁদের মতামত দলিলসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের (র.) মতে ফজরের নামাজ ফর্সাতে পড়া উত্তম। দলিল—

أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ -

২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের মতে অন্ধকারে পড়া উত্তম। দলিল—

۱- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْرَقْتُ الْأَرْدُ وَرِضْوَانُ اللَّهِ وَالْأَجْرُ عَفْوُ اللَّهِ -

۲- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصَلِيَ الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَخَفِعَاتٍ بِسُرُوطِهِنَّ مَا يَغْتَرْنَ مِنَ الْغَلَسِ -

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে আলোতে শেষ করা উত্তম।

প্রতিপক্ষের জবাব : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে প্রতিপক্ষের জবাবে বলা হয়—

ক. উধার আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হানীস **قَوْلِي** এবং অন্ধকার-এর হানীস **قَوْلِي** ; সুতরাং এতে **قَوْلِي** হানীস প্রাধান্য পাবে।

খ. অথবা কোনো কোনো সময় তিনি অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন। তবে আলোতে নামাজ পড়াই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। কেননা, আলোতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য ছিল অধিক লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. হযরত আয়েশা (রা.) مَا بَعُرَقْنَا مِنَ الْغَلَسِ বা কাকো অন্ধকার বলতে মসজিদের ভিতরকার অন্ধকার বুঝিয়েছেন, রাতের অন্ধকার নয়।

ঘ. হযরত বা মহিলাদের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকারে নামাজ পড়তেন।

ঙ. আলোতে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে নামাজে বেশি লোকের উপস্থিতি উদ্দেশ্য ছিল। রাসূল ﷺ-এর যুগে লোকেরা ভোরে ভোরে জামাতে হাজির হতেন, তাই অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। এ জন্য তিনি অন্ধকারেই নামাজ পড়তেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম তাহাবী (র.) উভয় মাযহাবের মধ্যে নিম্নরূপে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, নামাজকে অন্ধকারে আরম্ভ করবে এবং পরিষ্কার হলে শেষ করবে, অর্থাৎ কেবল লম্বা পড়বে। এটা ছাড়াও যদি নামাজিগণ অন্ধকারে একত্রিত হয়ে যায়, তা হলে অন্ধকারে পড়া হানাফীদের মতেও উত্তম। এরপই হাজীদের জন্য মুযদালিফার নামাজ অন্ধকারে পড়া মোস্তাহাব এবং শ্রীলোকদের জন্য সর্বাবস্থায়ই অন্ধকারে নামাজ পড়া মোস্তাহাব। কেননা, অন্ধকারই শ্রীলোকদের জন্য উপযুক্ত সময়।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অুনচ্ছেদ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (رَضًا) قَالَ
كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
ثُمَّ يَنْحَرُ الْجَزُورَ فَتُقَسَّمُ عَشْرُ قِسْمٍ ثُمَّ
تُطَبِّخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا تَضِيحًا قَبْلَ
مَغِيْبِ الشَّمْسِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৬. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসরের নামাজ পড়তাম। অতঃপর উট জবাই করা হতো। এরপর উটের গোশত দশ ভাগ করা হতো। তারপর রান্না করা হতো। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমরা রান্না করা গোশত খেতাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ هَادِيَةِ الرَّحْمَنِ بِأَنَّهَا : উক্ত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ বুঝা যায় যে, আসরের নামাজ কোনো বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়ার পরই পড়া হতো। নতুবা সূর্যাস্তের পূর্বে এতগুলো কাজ করা সম্ভব হতো না। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এ হাদীসটিকে নিজেদের পক্ষ দলিল হিসেবে পেশ করেন। হানাফীদের পক্ষ হতে হাদীসটির ব্যাখ্যা এই দেওয়া হয়েছে যে, গ্রীষ্মের ঋতুতে দিন বেশ বড় হয়ে থাকে, তখন দুই মিছিলের পরেও আসরের নামাজ আদায় করে উল্লিখিত কার্য সমাধা করা সম্ভব। কারণ, এ সমস্ত কাজ অনেকটা দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। আর আরবগণ এ ব্যাপারে খুবই দক্ষ ছিল। সুতরাং এর দ্বারা আসরের নামাজ প্রত্যেক বস্তুর দ্বারা এক মিছিল পরিমাণ হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে তার দলিল দেওয়া যায় না।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (رَضًا) قَالَ
كَفْنَا دَاتَ لَبْلُوَ نَتَتَطَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
صَلْوَةَ الْمَوَسَاءِ الْأَجْرَةَ فَخَرَجَ الْبِنَا
جِيْنِ ذَهَبٌ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تَدْرِي
أَسْنُ شَفَعَهُ فَنِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ
جِيْنِ خَرَجَ إِيَّاكُمْ لَتَتَطَرُونَ صَلْوَةَ مَا

৫৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে পরবর্তী ইশার নামাজের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অথবা এরও কিছু পরে তখন তিনি বের হয়ে আসলেন, কোনো কাজ তাঁকে পরিবারে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল নাকি অন্য কোনো কিছু? তা আমরা বলতে পারি না। যখন তিনি বের হয়ে এলেন তখন বললেন, তোমরা এমন একটি নামাজের জন্য অপেক্ষা করছিলে।

يَنْتَظِرُهَا أَهْلٌ وَدِينٌ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ
عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ
أَمَرَ الْمُؤَدَّبِينَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى -
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

যার প্রতীক্ষা তোমরা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীরা কখনো করেনি। যদি আমি আমার উম্মতের উপর বোঝা হবে বলে মনে না করতাম তবে আমি তাদেরকে নিয়ে এ নামাজ এ সময়েই পড়তাম। অতঃপর তিনি মুয়াজ্জিনকে আদেশ করলেন, সে নামাজের একামত বলল, আর রাসূল ﷺ নামাজ পড়লেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ -এর অর্থ : মহানবী ﷺ বললেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য বোঝা হবে বলে মনে না করতাম তবে তাদেরকে এই নামাজ তথা ইশার নামাজ আমি এ সময়ই রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি অতিবাহিত হওয়ার পর পড়তাম। রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে অথবা তার উপরে আনায় করা মোস্তাহাব। হানাফীগণ এ অভিমতই পোষণ করেন।

وَعَنْ ٥٦٨ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الصَّلَاةَ
نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ
بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ
الصَّلَاةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৮. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজ পড়তেন প্রায় তোমাদের নামাজসমূহের মতোই। কিন্তু তিনি আতামা তথা ইশার নামাজকে তোমাদের নামাজের তুলনায় কিছুটা বিলম্ব করে পড়তেন এবং নামাজকে সংক্ষেপ করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ -এর অর্থ : মুক্তাদিদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধ বা কর্মব্যস্ত লোক থাকতে পারে। এ জন্য নবী করীম ﷺ প্রায় নামাজই খুব সংক্ষেপে পড়তেন। যখন সকলকে নিকিত ও নির্বিঘ্ন আছে বলে মনে করতেন এবং সকলের আত্মহ লক্ষ্য করতেন, তখনই মাত্র নামাজকে কিছু দীর্ঘায়িত করতেন। এ যুগের ইমামগণেরও এর প্রতি আরও অধিক লক্ষ্য করা উচিত, তা না হলে লোক জামাতের প্রতি বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ অন্য হাদীসে বলেছেন যে, رَأَى أَنَّهُمْ أَمَّ أَحَدَكُمْ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيكُمْ الضَّمِينَةَ وَالرَّيْبَ وَرَأَى الْعَاجِزَةَ .

এর অর্থ : الضَّمِينَةُ শব্দের অর্থ রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ। শব্দটির মূল হলো عَتَمٌ শব্দের অর্থ- রাতের অন্ধকারে দুখ সোধন করা, দুখ সোধন করতে বিলম্ব করা। আরব বেদুইনরা রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর উষ্ট্রের দুখ সোধন করতো এবং সে সময়ই ইশার নামাজ পড়া হতো। আর এ কারণেই তারা ইশার নামাজকে عَتَمَةٌ (আতামা) বলতো। তবে ইশাকে আতামা বলা মাকরুহ। কেননা, মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَاتِكُمْ, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশাকে আতামা বলা অপছন্দনীয় কাজ। তবে কোনো কোনো হাদীসে যে, ইশাকে আতামা বলা হয়েছে তা বৈধতা বর্ণনার জন্য।

মহানবী ﷺ-এর পক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) কেন ইশার নামাজের ক্ষেত্রে الضَّمِينَةَ (আতামা) শব্দ ব্যবহার করলেন? এ ব্যাপারে আল্লামা মোস্তা আলী কারী সন্ধ্যা দুটি উত্তর প্রদান করেছেন-

(ক) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা পৌঁছেনি।

(খ) যাদের নিকট তিনি হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তাদের নিকট এ নামটিই সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় তিনি এ নামটিই উল্লেখ করেছেন।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ
 صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ
 الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوَ مِ
 شْطَرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ
 فَاخْذُوا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنْ النَّاسَ قَدْ
 صَلَّوْا وَأَخْذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ
 تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ
 وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ
 لَأَخْرَجْتُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ -
 (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَسَائِيُّ)

৫৬৯. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [একদা রাতে] রাসূলুল্লাহ
 ﷺ এর সাথে আতামা [ইশার নামাজ] পড়ব বলে মনস্থ
 করলাম; কিন্তু তিনি প্রায় অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত
 বের হলেন না। অতঃপর তিনি [বের হয়ে এসে] বললেন,
 তোমরা তোমাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ কর। তখন
 আমরা আমাদের আসন গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন,
 লোকজন নামাজ সম্পন্ন করেছে এবং শয্যা গ্রহণ করেছে।
 আর তোমরা অবশ্যই নামাজে রত আছ, যতক্ষণ পর্যন্ত
 নামাজের প্রতীক্ষায় রয়েছ। যদি দুর্বলের দুর্বলতা ও
 রোগক্লিষ্টের রোগকাতরতার আশঙ্কা না থাকতো তবে
 আমি এ নামাজকে রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে
 পড়তাম। -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عِدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস ও উপরে বর্ণিত কতিপয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ বিলম্ব
 করে পড়াই উত্তম; কিন্তু উত্তমতা লাভের আশায় যুমিয়ে পড়ার কারণে নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে শীঘ্রই পড়াই
 উত্তম। আর ইশার নামাজের ওয়াজ্ব বলতে অর্ধরাত্রের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বুঝায়, এর পরে ইশা পড়া জায়েজ হলেও মাকরুহ।
 এটা ছাড়াও দুর্বল ও শুম-ক্রান্ত ব্যক্তিদের কষ্টের সম্ভাবনা থাকলেও শীঘ্র পড়া উত্তম। হাদীসের শেষের দিকে এ কথা প্রতি
 বশপষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, ধৈর্য ও অগ্রহের বিষয় ভালোভাবে জানতেন
 বলেই মাঝে মাঝে ইশার নামাজকে বিলম্ব করে এবং কোনো কোনো নামাজকে একটু দীর্ঘায়িত করে পড়তেন। আজকাল
 ইমামদেরকে এ বিষয়ে বেশি সজাগ থাকা উচিত।

الْكَرِيمُ الْبَارِي বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম সা'দ, উপনাম বা কুনিয়াত **أَبُو سَعِيدٍ** তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী উপ-নামে প্রসিদ্ধি অর্জন
 করেন। তাঁর পিতার নাম মালেক ইবনে সিনান। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী।
২. বংশধারা : তাঁর বংশধারা হলো, আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালেক ইবনে সিনান ইবনে ওবাইদ [কারো মতে আবদ] ইবনে
 ছালাবা ইবনে ওবাইদ ইবনুল আবজার। আবজার হলেন খুদরা ইবনে হারেছ ইবনে খায়রাজ আল-আনসারী।
৩. জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি উহুদ যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ছোট ছিলেন। তাই তাঁকে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোনো সুযোগ
 দেওয়া হয়নি। তবে এর পরে তিনি রাসূলে কারীম ﷺ এর সাথে সর্বমোট ১২ (বারো) টি গণ্যওয়াতে অংশগ্রহণ
 করেন।
৪. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আন্তামা বদক্বদীন আইনী এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে
 সর্বমোট ১ হাজার একশত সত্তরখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) একই সনদ-মতনে
 তাঁর বর্ণিত ৪৬ (ছয়চল্লিশ) খানা হাদীস, আর ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ১৬ খানা এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৫২ খানা
 হাদীস নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
৫. তাঁর নিকট হতে ঝাঝা হাদীস বর্ণনা করেছেন : তাঁর নিকট হতে সাহাবায়ে কেলাম ও তাবয়ীনের অনেকে একটি
 জামাত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আকবাস, ইবরাহীম নাখারী প্রমুখ।

৬. তিনি যাদের নিকট হতে হাদীস তনেছেন : তিনি যদিও সাহাবী তবু রাসুলে কারীম ﷺ -এর সকল হাদীস তো তিনি শুনেনি। তাই তিনি অনেক হাদীস সাহাবায়ে কেবরামদের নিকট হতেও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন চার খলিফা, তাঁর পিতা মালেক, তাঁর মায়ের পক্ষের ভাই কাতাদা ইবনে নু'মান প্রমুখ।
- তাঁর কতিপয় গুণাবলি : তিনি যেমনভাবে হাদীস মুখস্থের দিকে ছিলেন অগ্রগামী অন্যদিকে তিনি কুরআনের হাফেজও ছিলেন। অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মাঝে তিনি একজন। তিনি সবার নিকট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
- মৃত্যু ও দাফন : তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٥٧
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ تَعَجُّبًا لِلظَّهْرِ
مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدَّ تَعَجُّبًا لِمَنْصَرٍ مِنْهُ
- (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৭০. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজকে তোমাদের তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামাজকে তার তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়।
-[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

التَّعَرُّفُ بِالرَّأْيِ :

বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম হিন্দ, উপনাম উম্মে সালামা। পিতার নাম সুহাইল, কারো মতে, হুয়াইফা। উপনাম আবু উমাইয়্যা। মাতার নাম আতিকা বিনতে আমের।
২. নসবনামা : হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়্যা সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মাখযুম।
৩. পূর্ববর্তী বিবাহ : হযরত উম্মে সালামার বিবাহ প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদিল আসাদের সাথে হয়েছিল। তিনি এবং তাঁর স্বামী ইলামের প্রথম দিকেই মুসলমান হন।
৪. ইসলাম গ্রহণ : রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তপ্রাপ্তির প্রারম্ভেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।
৫. হাবশায় হিজরত : ইসলাম গ্রহণের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় কিছুকাল থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনিই হিজরতকারিণী প্রথম মহিলা।
৬. হুজুর ﷺ -এর সাথে বিবাহ : হযরত আবু সালামার ইন্তেকালের পর রাসুলে কারীম ﷺ তাঁর বিবাহের পয়গাম পাঠান। উম্মে সালামা তিনটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। হুজুর ﷺ সমস্যাগুলোর সমাধানের কথা জানালে তাঁর পুত্র সালামার অলিভুে রাসুলে পাকের সাথে বিবাহের কাজ সম্পাদিত হয়। হযরত উম্মে সালামার বিবাহের কিছুদিন পূর্বে তাঁর স্বামী হযরত যয়নব বিনতে খুয়াইমা ইন্তেকাল করায় তিনি তাঁর ঘরে অবস্থান নেন।
৭. তাঁর সন্তান-সন্ততি : রাসুলে পাকের ঔরসে তার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তবে আবু সালামার ঔরসে ৬ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা হলেন- ১. সালামা, ২. যয়নব, ৩. ওমর, ৪. দুবরাহ, ৫. মুহাম্মদ, ৬. উম্মে কুলছুম।
৮. তাঁর গুণাবলি : হযরত উম্মে সালামা দৈহিক সৌন্দর্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মেধা, ফিকহশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য দিক হতে তাঁর স্থান হযরত আয়েশার পরেই ছিল। তাঁর পরামর্শক্রমেই রাসুলে কারীম ﷺ সর্বপ্রথমে হৃদায়বিয়াতে হাদী কুরবানি করেন এবং হলক করেন।
৯. তাঁর ইন্তেকাল : তাঁর ইন্তেকালের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়। ওয়াকেদীর মতে ৫৯ হিজরিতে, ইবনে হিব্বানের মতে ৬১ হিজরিতে ইবনে হাজ্জারের মতে ৬২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٥٧١ أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ
وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৫৭১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত ।
তিনি বলেন, যখন গরমকাল আসত তখন রাসূল ﷺ
নামাজ ঠাণ্ডা সময় পড়তেন, আর যখন ঠাণ্ডা পড়ত তখন
সকাল সকাল পড়তেন। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ٥٧٢ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ
عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَّرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ
الصَّلَاةِ لَوْ قَتَبْتُهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا
فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبْتُهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৫৭২. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)
হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাকে
বললেন, 'আমার পরে তোমাদের উপর এমন শাসনকর্তাও
হবে, যাদেরকে নানারূপ ঝামেলা যথাসময়ে নামাজ আদায়
করা হতে বিরত রাখবে । এমনকি এর সময়ও চলে যাবে ।
তখন তোমরা ঠিক সময় নামাজ পড়ে নেবে ।' এক ব্যক্তি
জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাঁদের সাথেও নামাজ
পড়ব?' তিনি বললেন, 'হাঁ'। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ٥٧٣ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ
عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَّرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ
الصَّلَاةِ لَوْ قَتَبْتُهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا
فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبْتُهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

এর অর্থ : এখানে মহানবী ﷺ উম্মতকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন যে, আমার অবস্থানের পর
তোমাদের উপর এমন অনেক শাসক হবে, যাদেরকে পার্থিব জগতের নানারূপ ঝামেলা যথাসময়ে নামাজ আদায় করা হতে
বিরত রাখবে । এমনকি এর সময় চলে যাবে, অর্থাৎ মোস্তাহাব সময় চলে যাবে এবং মাকরুহ সময় এসে উপস্থিত হবে । যখন
তোমরা এমন অবস্থার শিকার হবে তখন একা একা হলেও যথাসময়ে নামাজ আদায় করে নেবে । তবে এ ক্ষেত্রে যেন
কোনোরূপ বিপর্যয়ের সূঁচি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে । রাসূল ﷺ-এর এ সতর্কবাণী শ্রবণে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন
করলেন যে, আমরা কী পুনরায় তাদের (শাসকদের) সাথে নামাজ পড়ব । রাসূল ﷺ বললেন, হাঁ, তোমরা তাদের সাথে
পুনরায় নামাজ পড়বে । কেননা, এতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।

এ ক্ষেত্রে প্রথম নামাজ ফরজ এবং পরে জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাজ নফল হিসেবে গণ্য হবে । তবে এ বিধান কেবল
জোহর ও ইশার নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কারণ অন্য হাদীসে আসর ও ফজরের নামাজের পর নফল পড়তে রাসূল ﷺ
নিষেধ করেছেন । আর তিন রাকাত বিশিষ্ট কোনো নফল নামাজ শরিয়তে বিধিত নয়, তাই মাগরিবের নামাজ পড়ে পুনরায়
জামাতে নামাজ পড়া যায় না । যদি শাসক শ্রেণী অত্যাচারী হয় এবং তাদের পক্ষ হতে কোনোরূপ বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে তবে
আসর, ফজর এবং মাগরিবও পুনরায় শাসকদের সাথে জামাতে আদায় করা বৈধ ।

وَعَنْ ٥٧٣ قُبَيْصَةَ بِنِ وَقَاصِ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرًا مِنْ بَعْدِي يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَمَنْ عَلَيْهَا فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৫৭৩. অনুবাদ : হযরত কাবীসা ইবনে ওয়াহ্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আমার পরে তোমাদের উপরে এমন কিছু শাসক হবে, যারা নামাজকে পিছিয়ে দেবে, তা তোমাদের অনুকূলে হবে এবং তাদের প্রতিকূলে যাবে। সুতরাং তখন তোমরা তাদের পিছনে নামাজ পড়ো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে [অর্থাৎ ইসলামের উপর থাকে]।—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٧٣-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেন, এটা তোমাদের অনুকূলে হবে এবং তাদের প্রতিকূলে। অর্থাৎ, শাসকদের কারণে নামাজ বিলম্বে আদায় করতে হলে এটা তোমাদের অনুকূলে হবে। দেরি করার কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কেননা, এটা তোমাদের সামর্থ্যের বহির্ভূত। বিশেষ প্রয়োজনের তাকিদেই তোমরা বিলম্ব করেছ। আর সে প্রয়োজন হলো শাসকদের অনুকরণ। সুতরাং এ ক্ষতি তোমাদের উপর বর্তাবে না; বরং শাসকরাই আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে। কেননা, তারা ইচ্ছা করলে বিলম্ব না করে পারত। শুধুমাত্র পার্থিব নানাবিধ ব্যস্ততা তাদেরকে যথাসময়ে নামাজ আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। সুতরাং বিলম্বের কারণে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের ওপর বহাল থাকে, তাদের পিছনে নামাজ আদায় করতে থাকো, যদিও নামাজ দেরিতে আদায় করে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বাক্যটির মর্মার্থ হলো, তোমরা যখন প্রথম ওয়াফাতে নামাজ আদায় করবে, অতঃপর পুনরায় শাসকদের সাথে জামাতে আদায় করবে তখন এ নামাজ তোমাদের অনুকূলে হবে। আর শাসকরা যেহেতু ইচ্ছা করে বিলম্ব করেছে তাই এটা তাদের প্রতিকূলে যাবে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

وَعَنْ ٥٧٤ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٌ وَتَزَلُّ بِكَ مَاتَرِي وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنَ مَعَهُمْ وَإِذَا آسَاءَ وَأَفْجَنِينَ آسَاءَ تَهُمُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে শিয়ার হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত ওসমান (রা.) তখন বিদ্রোহীগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি [রাবী] বললেন, হযরত আপনিই জনসাধারণের ইমাম, কিন্তু আপনার উপর এ বিপদ উপস্থিত যা আপনি দেখছেন। আর বিদ্রোহী নেতা [কিনানা ইবনে শিয়ার] আমাদের নামাজ পড়াচ্ছে, অথচ একে আমরা গুনাহ বলে মনে করি। তখন তিনি বললেন, মানুষ যে সমস্ত কার্যাবলি করে, তন্মধ্যে নামাজ হলো সর্বোত্তম কাজ। সুতরাং মানুষ যখন ভালো কাজ করে তখন তাদের সাথে ভালো কাজ কর। আর যখন মন্দ কাজ করে তখন তাদের মন্দ কাজ হতে দূরে সরে থাক।—[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٧٤ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে হযরত ওসমান (রা.)-এর উত্তরে বুখা গেল যে, প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ; যদিও কারো পিছনে উত্তম, আর কারো পিছনে উত্তম নয়। এতে এ কথাও বুখা গেল যে, ভালো কাজে অন্যের অনুসরণ করা এবং মন্দ কাজে তা হতে দূরে থাকা সকলেরই উচিত।

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের ফজিলত

نَمَائِلٌ শব্দটি نَمَيْتَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- মর্যাদা ও মহত্ত্ব। আলোচ্য অধ্যায়ে নামাজের দ্বারা মানুষ কি কি মর্যাদা লাভ করবে এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ যা কিছু ইরশাদ করেছেন, এখানে তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। নামাজের ফজিলত সম্পর্কে পরিচয় কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে যে, وَالنَّكْرِ وَالْفَعْمَاءِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ- নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখে।

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ عَمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (رض)
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ
يَلْبِغَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ
وَالْعَصْرَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭৫. অনুবাদ : হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এমন ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামাজ পড়বে অর্থাৎ, ফজর ও আসরের নামাজ। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَجْرٍ وَوَعْدَ التَّخْمِينِ بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ : ভোর রাত আরামদায়ক ঘুমের সময়। আর আসরের সময় ব্যবসায় লিগু থাকা ও খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনে মত্ত থাকার সময়। এ সমস্ত বাধা ও ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এ দুই নামাজের যত্ন করে তার সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করা যায় যে, সে অবশিষ্ট নামাজগুলো নষ্ট করবে না। আর কুরআনেরও দাবি, নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। কাজেই এমন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকবে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

অথবা এ দুই সময়ের নামাজের মর্যাদা অন্যান্য নামাজের তুলনায় অনেক বেশি। কেননা, এ দুই সময়ে রাতের ও দিনের ফেরেশতা উম্মতের আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করেন। এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশে উঠতে যে সমস্ত মানুষকে নামাজে রত অবস্থায় দেখে, আল্লাহর দরবারে তাদের নামাজি হওয়ার সাক্ষ্য দান করবেন। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে তাদেরকে মাফ করে দেবেন।

لَنْ يَلْبِغَ النَّارَ أَحَدٌ -এর ব্যাখ্যা : ফজরের সময় আরামদায়ক ঘুমের সময়। আর আসরের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে লিগু থাকা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকার সময়। ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এ দুই নামাজের যত্ন করে, সে নিশ্চিতভাবেই অবশিষ্ট নামাজ নষ্ট করবে না। আর কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। কাজেই সে কবীরা গুনাহ হতেও বেঁচে থাকবে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে না।

২. অথবা এ দুই সময়ের নামাজকে প্রকাশ করেছে এ দুই নামাজের ফজিলত বর্ণনা করার জন্য। কেননা, এ দুই সময়ে রাতের ও দিনের ফেরেশতা এসে উম্মতের আমল আল্লাহর দরবারে নিয়ে যায়। এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশে উঠতে যে সমস্ত মানুষকে নামাজে রত অবস্থায় দেখবে, আল্লাহর দরবারে তাদের নামাজি হওয়ার সাক্ষ্য দান করবে। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে তাদেরকে মাফ করে দেবেন। যেমন-

হাদীসে এসেছে—

بَعَّعَاتِمُونَ نِيَكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَتَجْتَمِعُونَ مِنْ صَلَوةِ الْغَيْبَرِ وَصَلَوةِ الْعَصْرِ .

৩. অথবা এটাও হতে পারে যে, 'بَعَّعَاتِمُونَ' দ্বারা 'সব সময় দোজখে থাকবে না' বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যারা এভাবে নামাজের যত্ন করে এবং ঠিক মতো আদায় করে তারা সব সময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে না। কবীরা ওনাহের কারণে জাহান্নামে গেলেও পরে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসটি হতে ফজর ও আসরের নামাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।
৪. কারো মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে এ দুই ওয়াক্ত ফরজ ছিল, তাই এই দুই নামাজের গুরুত্ব বেশি হিসেবে **تَخْفِيفُ** করেছেন।
৫. কিছু সংখ্যকের মতে দিনের শুরু হলো রিজিক বস্টনের সময়, আর দিনের শেষে আমল উত্তোলিত হয়। কাজেই যে ব্যক্তি এ দুই ওয়াক্তের যথাযথ হেফাজত করে তার রিজিক ও আমলের মধ্যে বরকত হয়। এ জন্য রাসূল ﷺ এই দুই ওয়াক্তকে **تَخْفِيفُ** করেছেন।

وَعَنْ ٥٧١
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ
دَخَلَ الْجَنَّةَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৬. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামাজ পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٧١ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামাজ যথা সময়ে নিয়মিত পড়ে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যদিও সে অন্যান্য ফরজসমূহকে তাগা করে এবং কবীরা ওনাহ করে। অথচ জমহুর আলিমগণ বলেন যে, নামাজ দ্বারা সপীরা ওনাহসমূহ মাফ হয়, কবীরা ওনাহ মাফ হয় না। ফরজ তাগা করলে বা কবীরা ওনাহ করলে শাস্তি পেতে হবে, যদিও ফজর ও আসর নামাজ নিয়মিত সম্পন্ন করে।

জমহুর আলিমগণ আলোচ্য হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেন—

১. ফজরের সময় আরাম উপভোগ করার মতো সময়, আর আসরের সময় নানাবিধ গৃহকর্ম ও পারিবারিক কার্যে বাস্তবতার সময়। যে ব্যক্তি এই আরাম-আয়েশ ও কর্মবাস্তবতা পরিত্যাগ করে ফজর ও আসর যথাসময়ে সম্পন্ন করে, সে তো স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ফরজসমূহও আদায় করে থাকে, আর এরূপ ব্যক্তি সাধারণত কবীরা ওনাহ হতেও মুক্ত থাকে। অতএব সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
২. উক্ত হাদীসে ফজর ও আসরের নামাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ দুই নামাজের যারা যথাযথভাবে হেফাজত করে তারা প্রকৃতই জাহান্নামে যাবে না। যদিও আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দার ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিফল দেননি তবু এ দুই নামাজ নিয়মিত আদায়কারীকে আল্লাহ নিজের করুণা ও অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারেন।
৩. অথবা এ দুই সময়ে বান্দার আমল ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়, তখন তারা বান্দার উপর সাক্ষী স্বরূপ বলে যে, وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَبْكُونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَبْكُونَ বান্দার জন্য ফেরেশতাদের এরূপ সাক্ষ্য তাদের জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

عَنْ ٥٧١ দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এ নামকরণের কারণ কি? الْبَرْدَيْنِ দ্বারা ফজর ও আসরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। অথবা الْبَرْدَيْنِ দ্বারা ফজর ও ইশার নামাজকে বুঝানো হয়েছে। আর الْبَرْدَيْنِ শব্দের অর্থ হলো— দুই ঠাণ্ডা, যোহেতু ফজর ও আসরের সময় দুটি দিবসের দুই প্রান্তে হওয়ায় দিবসের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ দুই সময় ঠাণ্ডা থাকে। তাই এ দুই সময়ের নামাজকে الْبَرْدَيْنِ বলা হয়েছে। আর ফজর ও ইশা অর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই নামাজকে الْبَرْدَيْنِ বলে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো, এ দুই নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রথম ও শেষ ওয়াক্তের নামাজ।

عَنْ ٥٧٧ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ وَأَتَيْنَهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কাছে একের পর এক একদল ফেরেশতা রাতে, আর একদল ফেরেশতা দিনে আসে এবং উভয় দল ফজরের নামাজে ও আসরের নামাজে মিলিত হয়। অতঃপর যারা তোমাদের মধ্যে ছিল তারা উঠে যায়, তখন তাদের প্রভু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তাদের [আপন বান্দাদের] অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?' উত্তরে তারা বলে, আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাজ পড়ছে এবং আমরা যখন তাদের নিকট পৌঁছেছিলাম তখনও তারা নামাজ পড়ছিল।- [বুখারী ও মুসলিম]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

عَنْ ٥٧٧ -এর মর্মার্থ : পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে কেন এরূপ জিজ্ঞাসা করেন? এর জবাবে বলা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির সূচনাতে ফেরেশতারা এ বলে আপত্তি উত্থাপন করেছিল যে, তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।' এখন সেই ফেরেশতাদের মুখেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে যে, তারা নামাজ পড়ছে, এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ফেরেশতাদের মধ্যে মানুষের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই হলো মহান আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য।

عَنْ ٥٧٨ -এর অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে একের পর এক একদল ফেরেশতা রাতে এবং একদল ফেরেশতা দিনে আসে।' অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত দুই দল ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে। দিনের ফেরেশতা ফজরের পূর্বে আগমন করে এবং আসরের পরে আকাশে চলে যায়। আর রাতের ফেরেশতা আসরের পূর্বে আসে এবং ফজরের পরে আকাশে উঠে যায়। সুতরাং ফজরের ওয়াক্তে এবং আসরের ওয়াক্তে উভয় দল পরস্পর মিলিত হয়। এখানে ফেরেশতা দ্বারা বান্দার আমল সংরক্ষণকারী ফেরেশতা উদ্দেশ্য। তবে কারো কারো মতে, অন্য ফেরেশতাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

عَنْ ٥٧٨ جُنْدَبُ الْقَسْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ كَهَوِّ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يُكَبِّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ حَهْتَمٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَوَيْفَى بَعْضُ نَسِخِ الْمَصَابِيحِ الْقَسْرِيِّ بِذَلِكَ الْقَسْرِيِّ -

৫৭৮. অনুবাদ : হযরত জুনদুব কাসুরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে থাকে। সুতরাং [হে মানুষ!] আল্লাহ যেন নিজ তত্ত্বাবধানের কোনো কিছু সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিরুদ্ধে আপন তত্ত্বাবধানের কোনো কিছু সম্পর্কে বাদী হবেন তাকে ধরবেনই। অতঃপর তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।- [মুসলিম। মাসাবীহ গ্রন্থের কোনো কোনো কপিতে কাসুরীর পরিবর্তে কুশায়রী লেখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهَرَفِي ذِيَةِ الْبَلَدِ - এর অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে সে আত্মাহ তা'আলার হেফাজতে থাকে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তির জ্ঞান-মাল ও ইজ্জতের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে সে যেন আত্মাহর দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল। আর যে ব্যক্তি আত্মাহর দায়িত্ব ভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে আত্মাহ তা'আলা অভিযোগ উত্থাপন করবেন। আর আত্মাহ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেন তার পরিণাম জাহান্নাম। অতএব কোনো মুসলিম ব্যক্তির জ্ঞান-মাল ও ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হাদীসটি ধারা বিশেষভাবে ফজর নামাজের গুরুত্বের প্রতি ইশিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٧٩ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبِنَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ জানত নামাজের জন্য ডাকা এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার মধ্যে কি [ছওয়াব] রয়েছে। আর যদি লটারী ছাড়া এটা [ভাগে] না পেত, তবে তারা এর জন্য লটারী দিত। আর যদি জানত নামাজের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কি [ছওয়াব] রয়েছে, তবে তারা সে দিকে অন্যের আগে পৌছতে চেষ্টা করত। আর যদি জানত যে, ইশা ও ফজরের মধ্যে কি [ফজিলত] রয়েছে, তবে তারা এর জন্য হামাণ্ডি দিয়ে হলেও আসত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الصَّفِّ الْأَوَّلِ - এর অর্থ : উক্ত হাদীসে الْأَوَّلِ ধারা উদ্দেশ্য হলো ঐ কাতার বা সফ, যার সম্মুখে আর কোনো কাতার নেই। সূতরাং যার কা'বা ঘরের পিছন ভাগে কাতার করে তারাও প্রথম কাতারেরই অন্তর্ভুক্ত।

لَأَسْتَهْمُوا - এর অর্থ : اسْتَهْمُوا শব্দের অর্থ হলো - লটারীর মাধ্যমে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত করা। আত্মাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ জানত নামাজের জন্য ডাকা এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার মধ্যে কি ফজিলত, কি ছওয়াব রয়েছে, আর লটারী ছাড়া তা না পেত, তবে তারা লটারীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত। অর্থাৎ নামাজের জন্য ডাকা এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার জন্য তারা পরস্পর ঝগড়া করত এবং পরিশেষে লটারীর মাধ্যমে মুয়াজ্জিন ও প্রথম সফে পড়ার স্থান নির্ধারণ করত।

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبِنَاءِ - এখানে الْبِنَاءِ ধারা একামতও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبِنَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ - এখানে الْبِنَاءِ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ - এর অর্থ : تَهْجِيرُ শব্দটি বাবে تَفْعِيلُ - এর মাসদার। এর অর্থ - [إِلَى] الْمَسَارِعَةِ 'ইবাদতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া'। আত্মাহা তীবী (র.) বলেন, প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করার পর এখানে প্রথম ওয়াক্ত পাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তَهْجِيرُ - এর অর্থ হয়, সকাল সকাল নামাজ আদায় করা। অধিকাংশ হাদীসবিশারদদের অভিমত এটাই। কেউ কেউ বলেন, এখানে تَهْجِيرُ - এর অর্থ হলো - প্রার্থকের প্রত্যেক পরমের সময় জুমা বা যোহরের নামাজের দিকে গমন করা।

عَنْ ٥٨٠ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ
الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
لَاتَوَّهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— মুনাফিকদের কাছে ফজর ও ইশা অপেক্ষা বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। যদি তারা জানতো এর মধ্যে কী (মাহাত্মা) আছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার জন্য আসতো।—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٨٠—এর ব্যাখ্যা : রাসূল কারীম ﷺ বলেছেন, মুনাফিকদের কাছে ফজর ও ইশা অপেক্ষা বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। অর্থাৎ, মুনাফিকদের নিকট সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হলো ফজর ও ইশার নামাজ আদায় করা। ফজর ও ইশার নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ফজরের সময় আরামদায়ক ঘুমের সময়, আর ইশার সময় খাওয়া-দাওয়া ও সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রামের সময়। সুতরাং আরামদায়ক ঘুম ও বিশ্রামকে উপেক্ষা করে মুসলিমদের হাজির হওয়া সহজ কাজ নয়। আর এখানে মুনাফিকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা অলস। তারা রীতিমতো নামাজ পড়তে অভ্যস্ত নয়। যদিও পড়ে এতে উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো : সুতরাং যাদের অবস্থা এই, তাদের পক্ষে আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে ফজর ও ইশার নামাজে যোগদান করা তো অবশ্যই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

হাদীসটিতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিষ্ঠাবান মু'মিনের কাছে নামাজ কোনো ভারী বস্তু নয়। যেমন মহান আল্লাহর ভাষায়—
وَأَنَّهُمْ لَكَيِّبَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَافِئِينَ

عَنْ ٥٨١ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮১. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ইশার নামাজ জামাতে পড়েছে, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত নামাজ পড়েছে, আর যে (এর সাথে) ফজরের নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন সম্পূর্ণ রাত নামাজ পড়েছে।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٨١—এর অর্থ : হাদীসের আলোচ্য অংশ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন রাতের প্রথমার্ধ নামাজ ও আল্লাহর স্মরণে কাটাল, এতে ইশার নামাজ জামাতে পড়ার ফজিলত ও মাহাত্মা বর্ণনা করা হয়েছে। ইশার সময় হলো সাধারণত বিশ্রামের সময়, সারাদিন পরিশ্রমের পর মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মানুষ যখন এ বিশ্রামকে হারাম করে ইশার নামাজে উপস্থিত হয় এবং : নামাজের অপেক্ষায় থেকে তা জামাতে আদায় করে তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। আর এ সব কারণেই ইশার জামাতের একুশ ফজিলত।

عَنْ ٥٨١—এর অর্থ : সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে পড়ল সে যেন রাতের শেষার্ধ নামাজ ও আল্লাহর স্মরণে কাটাল। এখানে صَلَّى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ ইতঃপূর্বে قَامَ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَلَاةُ اللَّيْلِ [রাতের নামাজ]-কে قِيَامُ اللَّيْلِ নামে অভিহিত করা হয়। আর وَكَأَنَّمَا শব্দ যোগ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইশার জামাতের তুলনায় ফজরের জামাত উত্তম। কেননা, ফজরের জামাতে শরিক হওয়া খুবই কষ্টকর। কারণ, ফজরের সময় মানুষ ঘুমে নিদ্রাবিহীন থাকে। সুতরাং জামাতে শরিক হওয়ার জন্য এ আরামের ঘুমকে বর্জন করতে হয়, পক্ষান্তরে ইশার নামাজের পূর্বে সাধারণত মানুষ নিদ্রা যায় না, বরং নামাজ আদায় করার পরই নিদ্রামগ্ন হয়।

الْمَغْرِبُ بِالرَّوِي

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম ওসমান, কনিয়াত আবু আবদুল্লাহ বা আবু লায়লা। লকব মুন-নুরাইন ও গনী। তাঁর পিতার নাম আফফান ইবনে আবিল আস : মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয। হজুর ﷺ এর জামাতা ও তৃতীয় খলিফা। কুরায়েশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান।
২. নসবনামা : ওসমান ইবনে আফফান ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ।
৩. হজুর ﷺ এর সাথে সম্পর্ক : কয়েকটি দিক হতেই তাঁর সাথে হজুর ﷺ এর সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত তাঁর উর্ফ পুরুষ আবদে মানাফের সাথে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশ সূত্র মিলে যায়। দ্বিতীয়ত তাঁর নানী বায়য়া বিনতে আবদিল মুতা়িলব রাসূল ﷺ এর ফুযু ; তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু' কন্যা রুকাইয়া ও উমে কুলসুমকে একের পর এক তাঁর নিকট বিবাহ দেন। এ কারণেই তাঁকে মুন-নুরাইন বলা হয়।
৪. ইসলাম গ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ'। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন।
৫. হিজরত : নবুয়তের পঞ্চম বৎসরে মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে মুসলমানদের যে দলটি হাবশায় হিজরত করে তাঁদের সাথে তিনিও স্ব-পরিবারে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর গুজব শুনলেন যে মক্কার নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহর মদিনায় হিজরতের পর তিনি মদিনাতে হিজরত করেন।
৬. জিহাদে অংশ গ্রহণ : ইসলামে যতগুলো জিহাদ সংঘটিত হয় তন্মধ্যে বদর এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন না, বাকি সকল জিহাদেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বদরের সময় তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া অসুস্থ থাকায় হজুর ﷺ তাঁকে রুগীর সেবার নির্দেশ দেন। আর বাইয়াতে রিদওয়ান তো তাঁর মক্কায় অবরুদ্ধ হওয়ার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল।
৭. দৈহিক আকৃতি : তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংশহীন গণ্ডেশ, ঘন দাঁড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন চুল, কোমর ও বুক প্রশস্ত, কান পর্যন্ত ঝুলানো জুলফি, পায়ের নালা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রংয়ের দাঁড়ি এবং স্বর্ণ খচিত দাঁত।
৮. খেলাফতের দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর অসিয়ত মোতাবেক মুসলমানদের পরামর্শক্রমে ২৪ হিজরির ১লা মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বার দিন কম বারো বৎসর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।
৯. তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস : তিনি রাসূলে পাক ﷺ এর নিকট হতে সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তন্মধ্যে হতে ১১ খানা হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করেন।
১০. শাহাদাত : ৩৫ হিজরির ১৮ই যিলহজ্জ গুরুবর আসর নামাজের পর তাঁর বাসভবনে আল-আসওয়াদুত তুজিবী তাঁকে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়; এগুলো যথাক্রমে ৮০ / ৮২ / ৮৬ / ৮৮ / ৯০।
তাঁকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের হুশশে কাওকাব অংশে মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٥٨٢
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ
عَلَىٰ إِسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ
الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمْ
الْأَعْرَابُ عَلَىٰ إِسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ
فَاتَّهَا فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ قَاتَّهَا
تُعْتَمُ بِحِلَابِ الْإِيلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাগরিবের নামাজের নামকরণে বেদুঈনগণ যেন তোমাদের উপর জয়লাভ করতে না পারে। তিনি [বর্ণনাকারী] বলেন, বেদুঈনগণ একে ইশা বলত। রাসূল ﷺ আরও বলেন, তোমাদের ইশার নামাজের নামকরণেও যেন বেদুঈনগণ তোমাদের উপরে জয়লাভ করতে না পারে। কারণ, আত্মাহর কিতাবেই একে 'ইশা' বলা হয়েছে। আর তা পড়া হয় 'আতামা' অর্থাৎ, উটের দুধ দোহনের সময়। [মুসলিম]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

بَلَدًا وَلَا تَغْلِبْنَكُمْ الْأَعْرَابَ عَلَىٰ رِسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ -এর অর্থ : আরবের বেদুঈনরা মাগরিবের নামাজকে ইশা বলত : আত্মাহার রাসূল ﷺ বললেন, মাগরিবের নামাজের নামকরণে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। অর্থাৎ, বেদুঈনদের মতো তোমরাও মাগরিবের নামাজের স্থলে ইশা শব্দ বেশি ব্যবহার করো না। কেননা, এর ফলে তোমাদের নামকরণের উপর ওদের নামকরণ জয়ী হবে। কাজেই তোমরা তাকে মাগরিব-ই বলতে থাকো।

فَاتَّهَمْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِنَاءَ -এর ব্যাখ্যা : পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা অদৃশ্য হয়ে গাঢ় অন্ধকার হলে তাকে 'আতামা' বলে। বেদুঈনদের চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, এ সময় তারা উটের দুধ পোহন করতো। ইসলামের আগমনের পরে ইশার নামাজ এ সময়ে পড়া হতো বলে ইশার নামাজকেও লোকেরা 'আতামার নামাজ' বলতে শুরু করল। রাসূল ﷺ বেদুঈনদের অনুকরণে ইশাকে আতামা বলতে পছন্দ করেননি। তাই তিনি বলিলেন: الْمَغْرِبُ عَلَىٰ رِسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبَ - অর্থাৎ, তোমাদের ইশার নামাজের নামকরণে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপরে জয়ী হতে না পারে। অর্থাৎ বেদুঈনদের মতো তোমরাও ইশার নামাজকে আতামা বলা না। কেননা, কুরআন মজীদে এ নামাজকে এশা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالْحَرَابُ وَ السَّمَاوَاتِ ۝ ১১৩ ৩ সমাধান : আলোচ্য হাদীসটি ঘারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজকে আতামাহ বলা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে ইশাকে আতামা বলা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে ঘনু পরিলক্ষিত হয়। ইমাম নববী (র) উক্ত ঘনুদের সমাধানে দু'টি মত পেশ করেছেন—

১. আতামা শব্দের ব্যবহারের বৈধতা বর্ণনার জন্য এবং নিষেধাজ্ঞা মারুফে জানযীহির জন্য।
২. আতামা দ্বারা সন্ধান করা হয়েছে তাদেরকে, যারা 'ইশা' নামের সাথে পরিচিত নয়। কেননা, আতামা নামটিই আরবদের নিকট বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। অথবা এর জবাব হলো যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি নিষেধাজ্ঞা—বানী উচ্চারিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

وَعَنْ ٥٨٣ عَلِيٍّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوَسْطَى صَلَاةَ الْوَسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بَيْتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খন্দক যুদ্ধের দিন বলেছেন, তারা [কুরায়েশেরা] আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাজ তথা আসরের নামাজ হতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ তাদের গৃহ এবং কবরসমূহকে আগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মধ্যবর্তী নামাজ নির্ণয়ে ওলামাদের মতভেদ : সালাতুল উসতা তথা মধ্যম নামাজ দ্বারা কোন নামাজকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে বিস্তারিত মতভেদ রয়েছে। كُنْتُ الْمَغْطَى عَنْ صَلَاةِ الْوَسْطَى নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ মত উল্লিখিত হয়েছে যা নিম্নরূপ— (১) তাহাজ্জুদ নামাজ, (২) ফজর বা আসরের যে কোনো এক ওয়াক্ত, (৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্য হতে অনির্দিষ্ট কোনো এক ওয়াক্ত, (৪) চাশতের নামাজ, (৫) ঈদুল ফিতরের নামাজ, (৬) ঈদুল আযহার নামাজ, (৭) বিতরের নামাজ, (৮) জামাতের নামাজ, (৯) ভয়কাঙ্গীন নামাজ, (১০) ফজর ও আসরের উভয় নামাজ, ১১. ফজর ও ইশা উভয় নামাজ, (১২) শুধু ইশার নামাজ, কেননা ইশার নামাজ এমন দুই ওয়াক্ত নামাজ তথা মাগরিব ও ফজর নামাজের মধ্যবর্তী সময় পড়া হয় যে দুই ওয়াক্তে কসর নেই, (১৩) জুমার দিনে জুমার নামাজ উদ্দেশ্য এবং অবশিষ্ট ছয় দিনে যোহরের নামাজ উদ্দেশ্য, (১৪) জুমার নামাজ, কারণ তা ফজর ও আসর নামাজদ্বয়ের মধ্যখানে দিনের মধ্যভাগে পড়া হয়, (১৫) সকল নামাজই উসতা, (১৬) মাগরিবের নামাজ, কারণ এ নামাজে সফরে কোনো কসর নেই। আর এর পূর্বে যোহর ও আসর দুই ওয়াক্ত নীতর নামাজ এবং পরে ইশা ও ফজর দুই ওয়াক্ত স্বরব

নামাজ রয়েছে, (১৭) কারো মতে যোহরের নামাজ। কেননা এটা দিনের মধ্যভাগে পড়া হয়, (১৮) ফজরের নামাজ। কেননা এটা দিনের দুই নামাজ ও রাতের দুই নামাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ মতটি ইমাম শাফেয়ী সহ কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ী সমর্থন করেছেন, (১৯) কিছুসংখ্যক এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, (২০) আসরের নামাজ, কেননা এটা দিনের দুই নামাজ এবং রাতের দুই নামাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ মতটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ সহ অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ সমর্থন করেছেন।

সঠিক অভিমত : উপস্থিত মতামতসমূহের মধ্যে ফজর, যোহর ও আসর নামাজের মধ্য হতে যে কোনো একটিকে **صَلَاةُ الْوُسْطَى** হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়; আর তা প্রমাণ সাপেক্ষে—

১. ফজরের নামাজ : এই মতটি ইমাম শাফেয়ী ও কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী-এর অভিমত। তাঁদের দলিল হলো—
۱. عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ (الْوُسْطَى)
২. যৌক্তিক প্রমাণ : শীতকালে প্রচণ্ড শীতের কারণে এবং গ্রীষ্মকালে অধিক ক্লান্তি ও নিদ্রাজনিত কারণে ফজরের নামাজ পড়া খুব কষ্টকর হয়ে থাকে। অতএব এ নামাজের ফজিলত বেশি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে অনুমিত হয়।
২. যোহর নামাজের প্রবক্তাদের দলিল : যারা বলেন যে, সালাতুল উসতা হলো যোহরের নামাজ। তারা নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেন। এটি ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত।
১. হাদীসের প্রমাণ : **عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَا قَالَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ**
২. যৌক্তিক প্রমাণ : যোহরের সময় প্রচণ্ড গরম থাকে, এই সময় নামাজ পড়া অধিক কষ্টকর, তাই ঐ নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পৃথকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া যোহর নামাজই দিনের মধ্যভাগে পড়া হয়ে থাকে।
৩. আসর নামাজের প্রবক্তাদের দলিল : যারা 'সালাতুল উসতা' আসর নামাজকে বলে থাকেন এটি ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর অভিমত, তাঁদের দলিল—
۱. عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَمَسْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
۲. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ - (تَرْغِيبٌ)
৩. **عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزَابٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ تَزَلَّ حَافِظُنَا عَلَى الصَّلَاةِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَرَانَا مَا مَشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَبَّحْتَ فَتَزَلَّتْ حَافِظُنَا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ رَجُلٌ فَبَيَّ أَدْنَى صَلَاةِ الْعَصْرِ - (مُسْنَدٌ)**
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, **صَلَاةُ الْوُسْطَى** হলো আসরের নামাজ।
৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও আসরের নামাজের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
৬. ইমাম শাফেয়ী **الْحَرْابُ** عَنْ **دَلِيلِ الْحَضَائِقِ** মনে করেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে নিম্নলিখিতভাবে তাদের দলিলের জবাব প্রদান করা হয়েছে—
১. ফজর নামাজের দাবিদারদের জবাবে আত্মমা শওকানী (র.) বলেন যে, সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় অনুমান নির্ভর কথাবার্তা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে আসর নামাজকে উসতা নামাজ বলা হয়েছে। আর শীতের কষ্ট ও গ্রীষ্মকালে ঘুম হতে জাগার কষ্টের কারণে ফজরের নামাজ গুরুত্ব লাভ করেছে এবং 'সালাতুল উসতা' বলে একেই হেফাজত করতে বলা হয়েছে, এটা নিছক কিরাস মাত্র।
২. ইমাম নববী (র.) শাফেয়ী মতাবলম্বী হয়ে যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টিকে যাঁচাই করে আসরের নামাজের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, যেহেতু সহীহ হাদীসে আসর নামাজ বলেই প্রমাণিত হয়, সেহেতু এটাই শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হওয়া উচিত।

৩. হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীসে 'উসতা নামাজ' বলতে ফজরের নামাজ প্রমাণিত হয়। হতে পারে তা অন্য কোনো রাবীর বর্ণনা, হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর উক্তি নয়। এটা 'মুদরাজ হাদীস' মারফু' হাদীসের মোকাবিলায় মুদরাজ ফিহল হাদীস দলিল হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) উসতা নামাজ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর হাদীস পরিত্যাজ্য হবে।

বন্দক যুদ্ধের সর্বাঙ্গীণ ঘটনা : হিজরি চতুর্থ হিমায বুখারী এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মতান্তরে পঞ্চম হিজরি [এটা অধিকাংশের মত] ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে আবু সুফিয়ান সর্বমোট ১০,০০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। আসনু বিপদ সম্পর্কে অবগত হয়ে রাসূল ﷺ সাহাবীদের পরামর্শক্রমে শহরের ভিতরে থেকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে শহরের রক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিন হাজার আনসার ও মুহাজির কঠোর পরিশ্রম করে এক সপ্তাহে খনন কার্য সমাপ্ত করেন। মহানবী ﷺ স্বয়ং খনন কার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য হযরত ﷺ ৩০০০ সৈন্য নিয়ে পরিখা-অভ্যন্তরে অবস্থান করতে থাকেন। পরিখা অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে অসমর্থ হয়ে আবু সুফিয়ানের বাহিনী প্রায় এক মাস পর্যন্ত মদীনা নগরী অবরোধ করে রাখে। অবশেষে মারাত্মক খাদ্যাভাব, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রবল হিমেল হওয়ায় বাধ্য হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে তারা স্বদেশ যাত্রা করে।

পরিখা খনন করে মদীনা রক্ষা করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধকে পরিখার যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।

বিভিন্ন সৈন্যদল তথা কুরায়েশ, গাতফান, ও ইহুদি সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বলে একে আহযাব [দল বা সম্প্রদায়সমূহ]-এর যুদ্ধও বলা হয়। শত্রুদল দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে রেখেছিল বলে এটা মদীনা অবরোধ নামেও পরিচিত।

বন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : বন্দক যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। যেমন-

১. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হিজরি চতুর্থ সনে বন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
২. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হিজরি পঞ্চম সনে, ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে।

خَدَنَى নামকরণের কারণ **خَدَنَى** শব্দটি আরবি। এর অর্থ- পরিখা। যেহেতু এ যুদ্ধে কুরায়েশ ও ইসলাম বিরোধী শত্রুর প্রতিরোধে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে মদীনার বাইরের স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করা হয়। সেহেতু এ যুদ্ধকে 'খন্দকের যুদ্ধ' নামকরণ করা হয়েছে।

مَلَ اللَّهُ بِرَسُولِهِمْ وَقَبْرَهُمْ تَارًا -এর অর্থ : হিজরি ৪র্থ/ ৫ম সনে 'খন্দকের যুদ্ধ' অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদের জুলনায় কাফিরদের সংখ্যা ছিল অধিক। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে রাসূল ﷺ এ যুদ্ধে মদীনার অরক্ষিত এলাকায় পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিখা খননের কাজ ও শত্রুদের প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকায় নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কয়েক ওয়াস্ত নামাজ কাজ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত আসরের নামাজ। যেহেতু এ কাযা মুশরিকদের মোকাবিলার কারণেই হয়েছিল, তাই আত্মাহার রাসূল ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়িসমূহ এবং কবরসমূহ অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করুন।

※ আত্মা তীবী (র.) বদদোয়া বাক্যটির অর্থ করেছিলেন এই যে, জীবন ও মরণে আত্মাহার তাদের জন্য অগ্নি নির্ধারিত করুন এবং ইহকাল ও পরকালে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করুনক।

কেউ কেউ বলেছেন যে, পার্থিব শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঘর-বাড়ি বিরান হয়ে যাওয়া, ধন-সম্পদ লুপ্ত হওয়া, ছেলে-সন্তান বন্দী হওয়া। আর পরকালীন শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের কবরসমূহ অগ্নি দ্বারা ভরপুর করা।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٤
ابن مسعود (رض) وَسَمَرَةَ
بن جندب (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ صَلَّى صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَضْرِ .
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
এবং সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা
উভয়েই বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-
ওসতা বা মধ্যম নামাজ হলো আসরের নামাজ।
- [তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَضْرِ -এর অর্থ : 'উসতা নামাজ' দ্বারা যে আসরের নামাজ উদ্দেশ্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো আলোচ্য হাদীসটি। একে 'উসতা নামাজ' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা দিনের দুই নামাজ- ফজর ও যোহর এবং রাতের দুই নামাজ- মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে অবস্থিত। যেহেতু এই সময় বাজার জমজমাট হতো, লোকেরা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত হয়ে যেত, ফলে অনেক সময় নামাজ ছুটে যাওয়ার উপক্রম হতো, এজন্যই এখানে এ নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীসটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতকে সমর্থন করে। যদিও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, 'উসতা নামাজ' হলো ফজর নামাজ, কিন্তু তাঁর বর্ণনাটি মারফু' নয়; বরং মাওকুফ। আর উপরে উল্লিখিত হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি মারফু'। সুতরাং মারফু' হাদীসের মোকাবিলায় মাওকুফ হাদীস দলিল হতে পারে না। অথবা হতে পারে এটা ইবনে আব্বাসের উক্তি নয়, বরং এটা মুদরাজ বা বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে সংযোজিত।

وَعَنْ ٥٨٥
أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ
اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী
করীম ﷺ হতে আলাহ তা'আলার বাণী-
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا -এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এতে
রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ হাজির হয়।
- [তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا -এর অর্থ : মানুষের আমল তদন্ত করার জন্য দু'দল ফেরেশতা আসেন। একদল রাতের জন্য এবং অপর দল দিনের জন্য। উভয় দল আসরের নামাজের সময় এবং ফজরের নামাজের সময় একসাথে হয়। হাদীসে উল্লেখিত আয়াতে উভয় দল ফেরেশতার ফজর নামাজে হাজির হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

قُرْآنَ الْفَجْرِ -এর অর্থ দ্বারা ফজরের নামাজ উদ্দেশ্য কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য করা হতে পারে। নামাজকে কেবল বলায় কারণ এই যে, এটা নামাজের একটি রোকন। এমনিভাবে নামাজকে রাকাত এবং সিজদা বলা হয়ে থাকে। আত্মা তীর্থী (রা.) বলেন, নামাজকে কুরআন নামে অভিহিত করে নামাজদেয়কে নামাজের কেবল দীর্ঘ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٦ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ
(رض) قَالَا أَلَّصَلُّوهُ النَّوَطِيَّ صَلُّوهُ
الطُّهْرِ . رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالْتَرْمِذِيُّ
عَنْهَا تَعْلِيْقًا

৫৮৬. অনুবাদ : হযরত য়ায়েদ ইবনে ছাবিত ও হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, উসতা নামাজ যোহরের নামাজ। -মালেক য়ায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী উভয় হতে সনদবিহীন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٨٦ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটি مُؤَقَّرُونَ আর ইমাম তিরমিযী তো একে সনদবিহীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর পূর্বেলিখিত العَصْرِ النَّوَطِيَّ صَلُّوهُ হাদীসটি مُؤَقَّرُونَ আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, مُؤَقَّرُونَ -এর মোকাবেলায় مؤَقَّرُونَ বা সনদবিহীন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই صَلُّوهُ النَّوَطِيَّ ছাড়া আসরের নামাজ উদ্দেশ্যই হওয়াই বিশুদ্ধ অতিমত।

عَنْ ٥٨٧ -এর পরিচিতি : হাদীসের সনদের মধ্য হতে বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ার বিভিন্ন অবস্থার মধ্য হতে ভাঙ্গীক একটি অবস্থা। যদি সনদের প্রথম দিক দিয়ে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, অথবা পুরা সনদই বিলুপ্ত করা হয় তবে তাকে তাঙ্গীক বলা হয়। যেমন- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَنْ ٥٨٧ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الطُّهْرَ
بِالْحَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلُّوهُ أَشَدُّ
عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا
فَنَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
النَّوَطِيَّ وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَوَاتِنِ
وَبَعْدَهَا صَلَوَاتِنِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

৫৮৭. অনুবাদ : হযরত য়ায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের নামাজ খুব সকাল সকাল পড়তেন। তিনি এমন কোনো নামাজ পড়তেন না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের পক্ষে এটা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর ছিল। তখন এই আয়াত নাজিল হয়- حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ النَّوَطِيَّ -এর অর্থ 'নামাজ সমূহের যত্ন করো, বিশেষভাবে উসতা নামাজের'। তিনি [যায়েদ] বলেন, এর পূর্বেও দুটি নামাজ রয়েছে এবং পরেও দুটি নামাজ রয়েছে। -[আহমদ ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٨٧ হাদীসের ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি যে, صَلُّوهُ النَّوَطِيَّ ছাড়া উদ্দেশ্য হলো আসরের নামাজ। যার পূর্বে রয়েছে দুই নামাজ তথা জোহর ও ফজর। আর এর পরেও রয়েছে দুই নামাজ তথা মাগরিব ও এশা

وَعَنْ ٥٨٨ مَالِكٍ (رض) بَلَّغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ الصَّلَاةُ الْوَسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ - (رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا)

৫৮৮. অনুবাদ : ইমাম মালেকের নিকট [বিশ্বস্ত সূত্রে] পৌঁছেছে যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, 'উসতা নামাজ ফজরের নামাজ।' হাদীসটি ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর হতে সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি হযরত আলী (রা.)-এর স্ববিরোধী হাদীস। কেননা, তাঁর থেকে বর্ণিত ৫৮৩ নং হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে যে, ওসতা নামাজ হলো আসরের নামাজ। সুতরাং এখানে ফজর বলটা সম্ভবত রাসূল ﷺ হতে অবগত হওয়ার পূর্বকার কথা, তাই এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَعَنْ ٥٨٩ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَأْيَةِ الْإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّرُوقِ غَدَا بِرَأْيَةِ إِبْلِيسَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৮৯. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাজের দিকে গেল, সে ঈমানের পাতাকা বহন করল। আর যে ভোরে [নামাজ না পড়ে] বাজারের দিকে গেল, সে ইবলিসের ঝাঞ্জ বহন করে নিল। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আন্সামী তীবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসটিতে হেযবুল্লাহ [আল্লাহর দল] ও হেযবুশ শয়তান [শয়তানের দল]-এর উপমা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করে সে যেন ঈমানের পতাকা উড্ডীন করল, ইসলামের প্রতীক প্রকাশ করল এবং বিরুদ্ধবাদীদের কার্যবলিকে পর্যুদস্ত করে দিল। এ ব্যক্তিই হেযবুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি ভোরে নামাজ না পড়ে বাজারে গেল সে হেযবুশ শয়তানের অন্তর্ভুক্ত। সে শয়তানের পতাকা উত্তোলন করল এবং স্বীয় দীনকে পর্যুদস্ত করল।

মহানবী ﷺ-এর বাণী حَسْبُكَ শব্দটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, সকাল বেলা বাজারে গিয়ে আড্ডা দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে নামাজ ইত্যাদি আদায় করার পর যদি কেউ হালাল রিজিক অন্বেষণে বের হয় তা হলে দোষের কিছু নেই।

بَابُ الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ : আযান

الْأَذَانُ-এর পরিচিতি : الْأَذَانُ শব্দটি মাসদার, শাখি অর্থ হলো- الْإِعْلَامُ তথা জানিয়ে দেওয়া, সংবাদ প্রদান করা, তনিয়ে দেওয়া বা অবহিত করা। পবিত্র কুরআনেই এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْعِبْرَةَ آتَاهَا اللَّهُ وَتَرَى رُسُلَهُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَكْفُرُونَ। সূরা الْأَعْرَافُ এ রয়েছে যে, فَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تথা মুয়াজ্জিন আযান দিয়েছে।

এর পারিভাষিক পরিচয় হলো : الْإِعْلَامُ بِرِسْمَةِ السَّلَاةِ بِالْفَاعِلِ مَخْمُومَةٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নামাজের ওয়াক্ত জানিয়ে দেওয়াকে অঁান বলা হয়। বস্তুত আযানের বাক্যসমূহের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ যথা- তাওহীদ-রিসালাত এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে।

আযানের উৎপত্তি : ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র মক্কা নগরীতে আযান ব্যতীতই নামাজ পড়া হতো। হুজুর ﷺ মদীনায়ে হিজরত করার পর যখন সেখানে মসজিদ নির্মিত হলো তখন তিনি মুসল্লিদেরকে নামাজে একত্রিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সাহাবীদের কাছে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। কেউ কেউ আঙন প্রজ্জলিত করার পরামর্শ দিলেন। আবার কেউ শিক্ষা বাজানোর কথা বললেন। কিন্তু একটিও গ্রহণযোগ্য হলো না; কোনো সিদ্ধান্ত ব্যতীতই পরামর্শ সভা মূলতবি হয়ে গেল। সাহাবীগণ বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করতে করতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব বাড়ি-ঘরে চলে গেলেন। ঐ রাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বায়েদ সপ্নে দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শিক্ষাটি ব্রিক্ত করতে বললে ঐ ব্যক্তি কোনার কারণ জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, আমি শিক্ষা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাজে ডাকব; ঐ ব্যক্তি বলল, তা হতে উত্তম একটি জিনিসের সংবাদ আপনাকে আমি দেব কি? এ বলে তিনি আযানের বাক্যগুলো তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। প্রত্যয়ে তিনি রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে স্বপ্নের ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার স্বপ্ন সত্য। তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। আজ থেকে বেলাল আযান দেবে। এভাবে সর্বপ্রথম আযানের প্রচলন হলো।

জামাতে নামাজের জন্য আযান দেওয়া সুন্নত, মতান্তরে ওয়াজিব। তবে সুন্নত বা ওয়াজিব যাই হোক না কেন, এটা ইসলামের শেয়ার বা প্রতীক। রাসূল ﷺ যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন, তাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনে অভিযান বন্ধ করে দিতেন এবং বলতেন, তারা মুসলিম।

আলাচ্যে অধ্যায়ে আযানের বিধি-বিধান ও এটা প্রবর্তনের ঘটনাসহ এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٩٠
أَنَّسِ (رَضًا) قَالَ ذَكَرُوا
النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا النِّيْهُدَى
وَالنَّصَارَى فَامْرًا بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِمَامَةَ قَالَ إِنْ سَمِعْتُمْ
فَذَكَرْتُمْ لَا يُؤْتَى قَالَ إِلَّا الْإِمَامَةَ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ আঙন ও শিক্ষার উল্লেখ করলেন। একে কেউ কেউ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রথা বললেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো আযান জোড়া জোড়া এবং ইকামত বেজোড় করে দিতে। বর্ণনাকারী ইসমাঈল বলেন, আমি আমার উর্ধ্বতন বর্ণনাকারী আইয়ুবকে জিজ্ঞাসা করলাম। একামত বেজোড় দেওয়া সম্পর্কে তিনি বললেন, فَذَكَرْتُمْ الْبَلَاءُ 'কাদ-কামাতিস্ সালাত' অর্থাৎ, একে জোড় বলতে হবে বাকি সবটা বেজোড়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَصَلِّ مَشْرُوعِيَّةَ الْاَذَانِ وَالْاِطَاعَةَ আযান ও একামত শ্রচলনের ঘটনা : শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মদীনায় মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাধা করলেন, তখন তিনি প্রত্যেক মুসল্লিকে নামাজের জন্য সমবেত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত ধ্বনি স্থির করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এ জন্য নবীজী সাহাবায়ে করোরের একটি পরামর্শ সভা ডাকলেন; অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব আসল। যথা- ১. ঝাঞ্জ উড়ানো, ২. আশুন প্রজ্বলন, ৩. শিঙ্গা বাজানো, ৪. ঢোল বাজানো। এগুলোর একটিও গৃহীত হয়নি। কেননা, ঝাঞ্জ উড়ালে সকল মানুষ তা দেখতে পাবে না। দ্বিতীয়ত আশুন প্রজ্বলন অগ্নি উপাসকদের কাজ। তৃতীয়ত শিঙ্গা বাজানো খ্রিষ্টানদের কাজ এবং চতুর্থত ঢোল বাজানো ইহুদিদের কাজ।

পরামর্শ সভা সেদিন মূলতবি ঘোষণা করা হলো। এ রাতেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, শিক্ষাটি আমার নিকট বিক্রি কর। এর মাধ্যমে আমি মানুষদেরকে নামাজের জন্য ডাকব। লোকটি বলল, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দেব কি? এ কথা বলে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ (রা.)-কে আযানের কালেমাগুলো শিক্ষা দিলেন। রাত পোহালে তিনি ঘটনাটি মহানবী ﷺ-এর নিকট বললেন। এ ঘটনা শুনে রাসূল ﷺ বললেন- **إِنَّهَا كَرُؤْيَا حَقٌّ** অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে এটা সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালকে এটা শিখিয়ে দাও। এরপর বেলালকে কালেমাগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.) আযান দিলে হযরত ওমর (রা.) দৌড়ে এসে বললেন- **يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى** এভাবেই ইসলামে আযানের প্রবর্তন হয়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীদের মধ্যে চৌদজনই ঐ রাতে আযানের বাক্যগুলো স্বপ্নে জেনেছিলেন। এর পরে হযরত বেলাল (রা.) নিয়মিত আযান দিতে লাগলেন এবং ঐ সাহায্যে নামাজের জন্য আহবান জানাতেন। পরে একদিন হযরত বেলাল (রা.) ফজরের আযান দিতে আসলেন তখন তাঁকে বলা হলো যে, রাসূল ﷺ নিদ্রিত রয়েছেন। হযরত বেলাল (রা.) উচ্চ কণ্ঠস্বরে বললেন 'আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাওম'- 'যুম হতে নামাজ উত্তম'। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেছেন, পরে ফজরের নামাজের আযানে এই বাক্যটি শামিল করে দেওয়া হয়।

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো সাহাবী আযান ও একামতের বাক্যসমূহ স্বপ্নেযোগে জানতে পেরেছিলেন এবং মহানবী ﷺ সেগুলো চালু করে দেন। অন্য কথায়, আযান হলো সাহাবীদের স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়- ওহিযোগে প্রাপ্ত নয়, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং মূল ব্যাপার হলো, আযান ও তার বাক্যসমূহ মহানবী ﷺ আঙ্গার নিকট হতে ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। তবে স্বপ্নযোগে আযান প্রাপ্তি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সামনে রেখে এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, ওহি অনুযায়ী আযানের বর্তমান বাস্তব প্রচলন চালু হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে একসঙ্গে বহু সংখ্যক সাহাবী স্বপ্নযোগে আযানের বাক্যসমূহের আধা পরিচিত হয়েছিলেন। আঙ্গার ওহি ও সাহাবীদের স্বপ্ন একই সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিংবা আঙ্গার পক্ষ হতে আসা প্রথম এবং স্বপ্নে জানা পরে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, আঙ্গারই কোনো কোনো সাহাবীকে এ আযান স্বপ্নযোগে জানিয়ে দিয়েছেন এবং রাসূল ﷺ-কেও তা মঞ্জুর করা ও তদনুযায়ী আযান দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

مَعْنَى الْاَذَانِ لَعْنَةً وَ شُرْعَا আযানের শাখিক ও পারিভাষিক অর্থ :

الْاَذَانُ -এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে **الْاَذَانُ** শব্দটি **مَصْدَرٌ** অর্থ নিম্নরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়—

১. **اِعْلَانٌ** | ঘোষণা করা। যেমন পরিবে কুরআনের বাণী- **وَاذَانَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ**
 ২. **الْاِعْلَامُ** | জানিয়ে দেওয়া।
 ৩. **التَّنَادُ** | আহবান।
 ৪. **التَّنَادُ لِلصَّلَاةِ** | নামাজের জন্য আহবান।
 ৫. **الْقَوْرَةُ الرَّفِيعَةُ لِيُنْمَرُ النَّاسُ إِلَى الْجَمَاعَةِ** অর্থাৎ মানুষদেরকে জামাতের প্রতি আহবান করার জন্য উচ্চ আওয়াজ।
- مَعْنَى الْاَذَانِ اِسْطِلَاحًا** :

الْاَذَانُ -এর আভিধানিক অর্থ : নিম্নে **الْاَذَانُ** -এর কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপিত হলো—

১. **الْاِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِاللَّفَاطِ مَخْصُوعِيَّةً** অর্থাৎ, কিছু নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়া।
২. **مُرُ الْاِعْلَامِ بِمُكْرَمِلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِاللَّفَاطِ مَشْرُوعِيَّةً** অর্থাৎ, অনুমোদিত কিছু শব্দাবলির মাধ্যমে সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়া।

৩. الْأَذَانُ هُوَ إِعْلَانٌ مَّخْصَرٌ بِالْفَاطِ مَخْصَرَةٌ فِي أَوْقَاتٍ مَّخْصَرَةٍ
 ৪. الْأَذَانُ هُوَ التَّيْدَاءُ لِلصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ
 ৫. الْأَذَانُ هُوَ الصَّلَاةُ الرَّبِيعَ لِلْمُؤَدِّينَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

সার কথা- কতিপয় নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নামাজের ওয়াক্ত জানিয়ে দেওয়াকে আযান বলে।

অযানের আযানের বাক্যসংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আযানের বাক্য কয়টি হবে? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদের পরিপাক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. **تَرْجِيْعٌ وَ دُعَاءُ اللّٰهِ اَكْبَرُ** দু'বার ও **مَدْعَبُ الْاَسْمَاءِ مَالِكُ** - ইমাম মালিকের মতে আযানের বাক্য ১৭টি। তাঁর নিকট প্রথমে **اللّٰهُ اَكْبَرُ** দু'বার ও **تَرْجِيْعٌ** ১৭টি। তাঁর দলিল—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْنَى مَعْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً

২. **مَدْعَبُ الْاَسْمَاءِ الشَّافِعِيُّ وَاحْتَمَدَ (رح)** : ইমাম শাফেঈ ও আহমদের নিকট আযানের বাক্য ১৯টি। তাঁর মতে প্রথমে **تَرْجِيْعٌ** চার বার হবে এবং **شَهَاتَيْنِ** -কে- **تَرْجِيْعٌ** করতে হবে। তাদের দলিল—

۱. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَمَرَ بِإِلَاءِ أَنْ يُسْمَعَنَّ الْأَذَانُ وَيُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ -

۲. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعْنَى مَعْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّهُ تَقَرُّلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ .

৩. **مَدْعَبُ الْأَحْنَابِ (رح)** : আহনাফের মতে আযানের বাক্য ১৫টি। তাঁদের মতে **اللّٰهُ اَكْبَرُ** ৮ চার বলতে হবে, তবে **تَرْجِيْعٌ** করতে হবে না। আহনাফের দলিল—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ فَذَكَرَ الْأَذَانَ يَلَا - **تَرْجِيْعٌ**

নিম্নে ছকের মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হলো—

✓
আযান

বাক্যাবলি	ইমাম আবু হানীফার মতে	ইমাম মালিকের মতে	ইমাম শাফেঈর মতে
اللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার	২ বার	৪ বার
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার	৪ বার	৪ বার
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার	৪ বার	৪ বার
حَسْبُ عَلَيَّ السَّلَاةِ	২ বার	২ বার	২ বার
حَسْبُ عَلَيَّ الْفَلَاحِ	২ বার	২ বার	২ বার
اللّٰهُ اَكْبَرُ	২ বার	২ বার	২ বার
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ	১ বার	১ বার	১ বার
মোট	১৫ বার	১৭ বার	১৯ বার

একামতের বাক্যাবলি সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (র.)-এর মতে একামতের বাক্যসংখ্যা মোট ১১ টি। প্রত্যেক কালিমাকে একবার, আর **اللّٰهُ اَكْبَرُ** ও **اَشْهَدُ** দু'বার করে বলতে হবে। তাঁদের দলিল—

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِلَاءِ أَنْ يُسْمَعَنَّ الْأَذَانُ وَيُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ

عَنْ ابْنِ عَصَمَةَ (رض) كَانَ الْأَذَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَفْنَى مَفْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ تَعْمَلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ .

(রহ) : ইমাম মালিকের মতে ১০টি। তাঁর মতে একবার বলতে হবে।

(রহ) : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একামতের শব্দ সংখ্যা ১৭টি। তাঁর মতে আযান ও একামতের শব্দসংখ্যা সমান তবে একামতের মধ্যে الصَّلَاةُ দু'বার বলতে হবে। তাঁর দলিল-

عَنْ أَبِي مَحْمُودٍ (رض) قَالَ عَلَيْنَا التَّيْسُ ﷺ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً .

(رض) قَالَ رَأَيْتُ فِي النَّعَامِ كَانَ رَجُلًا يُؤَدِّنُ مَفْنَى وَيَقِيمُ مَفْنَى .

নিম্নে তা ছকাকারে পেশ করা হলো-

ইকামত

বাক্যাবলি	ইমাম আবু হানীফার মতে	ইমাম মালিকের মতে	ইমাম শাফেহী'র মতে
اللَّهُ أَكْبَرُ	৪ বার	২ বার	২ বার
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	২ বার	১ বার	১ বার
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	২ বার	১ বার	১ বার
حَسَّ عَلَى الصَّلَاةِ	২ বার	১ বার	১ বার
حَسَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	১ বার	১ বার
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ	২ বার	১ বার	২ বার
اللَّهُ أَكْبَرُ	২ বার	২ বার	২ বার
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	১ বার	১ বার	১ বার
মোট	১৭ বার	১০ বার	১১ বার

হানাফীদের আরো দলিল :

- হযরত আবু মাহযুরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উনিশ বাক্যে আযান এবং সতেরো বাক্যে একামত শিখিয়েছেন।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস- তিনি বলেন, আকাশ হতে যে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে বপু দেখিয়েছেন তাতে একামতের বাক্য সতেরটি স্পষ্টভাবে ছিল।
- আসওয়াদ ইবনে য়ায়েদ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত বেলাল (রা.) আযান ও একামতের বাক্যগুলোকে দু' দু' বার করে বলতেন।
- ইমাম তাহাবী (র.) বলেন যে, হযরত বেলাল (রা.) ইত্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত একামতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলতেন, এ বিষয়ে হাদীসগুলো মুতাওয়াতির বর্ণিত হয়ে এসেছে।
- হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী (র.) বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত একামতের বাক্য আযানের বাক্যের মতোই ছিল। বনী উমাইয়াগণ একামতের বাক্য একবার করে প্রচলন করেন।
- ইবনে জাওয়যী (র.) বলেন, আযানের বাক্য দু' দু' বার করে ছিল। একামতও তদ্রূপই ছিল; কিন্তু বনী উমাইয়াগণ ক্ষমতা গ্রহণ করে একামতের বাক্য একবার করে বলার প্রচলন করেন।

হানাফীদের পক্ষ হতে উত্তর :

- হানাফী মতানুসারী শায়খ মুফতীহ তরাবলুসী বলেন, একামতকে একবার বলা জায়েজের জন্য। এতে মনে হয়, হানাফী মতে একামতের বাক্য একবার বলাও জায়েজ। তবে দু'বার করে বলাই উত্তম।

১. عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ ثُمَّ تَعَوَّذَ فَتَعَوَّذَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْح.

২. عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ رُبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ثُمَّ تَعَوَّذَ فَتَعَوَّذَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْح.

মু'ত্তা'ব আল-আযম আহমদের মতে তারজী' করা না করা উভয়ই জায়েজ।

যুক্তি : যেহেতু তারজী' করা না করা উভয় পক্ষেই দলিল-প্রমাণ রয়েছে সুতরাং অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো একটি পস্থা অনুসরণ করলেই হবে।

মু'ত্তা'ব আল-আযম আহম আবু হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের মতে আযানে তরমী' মাকরুহ। তিনি প্রমাণ হিসেবে নিম্নরূপ দলিল পেশ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ (রা.)-এর হাদীস, যে হাদীসের উক্তিহে আযানের সূত্রপাত হয়েছে তাতে আকাশ হতে অবতীর্ণ ফেরেশতা স্বপ্ন যোগে যে আযানের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাতে তারজী' ছিল না; বরং আযান ও একামতের বাক্যগুলো দু' দূ'বার করে বলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

পবিত্র মদীনায় নবী করীম ﷺ-এর দু'জন মুয়াজ্জিন ছিলেন। হযরত বেলাল ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রা.)। তাঁদের কারো আযানে তারজী' ছিল না। যদি তারজী' সুন্নত হতো, তবে হজুর ﷺ তাদেরকে তারজী' করতে বলতেন। এতে অনেকে বলেন, হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-এর হাদীস মনসূখ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা মনসূখ হয়নি। তাঁর হাদীসে যে তারজী'র কথা আছে, ওটা সম্পর্কে হানাফী আলিমদের অভিমত এই যে, তারজী' শরিয়তের বিধান কায়ম হওয়ার জন্য ছিল না। বরং সেটা ছিল তালীমের জন্য।

হানাফীসের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব হলো-

প্রথম হাদীসের উত্তর : প্রথমোক্ত হাদীসে যে বাক্য রয়েছে তার কয়েকটি জবাব হতে পারে। যথা-

ক. রাসূল ﷺ-এর ইচ্ছা ছিল যে, আবু মাহযুরা আযানের বাক্যগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলুক; কিন্তু সে সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলেছিল, তাই রাসূল ﷺ কথার দ্বারা সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয়কে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করতে বলেছিলেন। এটা দ্বারা তারজী' প্রমাণিত হয় না।

খ. হেদায়া গ্রন্থকার হাদীসটির জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী ﷺ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয়কে পুনঃউচ্চৈঃস্বরে উল্লেখ করতে বলেছিলেন, আর আবু মাহযুরা একে আযানের অংশ মনে করেছিলেন।

গ. আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেছেন, যেহেতু শিক্ষাদানকালে আবু মাহযুরা মুসলমান ছিল না; তাই রাসূল ﷺ তার হৃদয়ে সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয়কে সূদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনঃউচ্চারণ করতে বলেছেন।

ঘ. আবু মাহযুরা মক্কাত্বীর এমন একটি স্থানে আযান দিতেন যেখানে রাসূল ﷺ উপস্থিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে হযরত বেলাল (রা.) রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেই আযান দিতেন, অথচ তাঁর আযানে তারজী' ছিল না। সুতরাং তারজী' না থাকার বর্ণনাই অধিকার পাবে।

ঙ. মোস্তা আলী কারী (র.) বলেছেন যে, আবু মাহযুরা বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনায় তারজী'র উল্লেখ নেই, সুতরাং না থাকার বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর :

(ক) যদিও এ একটি বর্ণনা দ্বারা আযানে তারজী' প্রমাণিত হয়, কিন্তু যেহেতু যে ফেরেশতা ও যে সাহাবীর মাধ্যমে আযানের সূচনা হয়েছিল তাতে তারজী'র উল্লেখ নেই। সুতরাং তারজী' না থাকার বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে।

(খ) তারজী' হলো সকল মুয়াজ্জিনের আমলের বিপরীত। সুতরাং তারজী'র উপর আমল করা যাবে না।

(গ) প্রথমোক্ত হাদীসের যে কয়টি জবাব দেওয়া হয়েছে সব কয়টি উত্তরই এ হাদীসের উত্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তৃতীয় হাদীসের উত্তর : শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মাহযুরাকে সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয় পুনঃউচ্চারণ করতে বলেছিলেন। আবু মাহযুরা একে আযানের অংশ মনে করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আযানের বাক্য ১৯টি।

আযানে চার ভাকবীর বলা সম্পর্কে ইয়ামদের মতভেদ: مَدْعَبُ الْإِمَامِ مَالِكُ : ইয়াম মালেক ও তাঁর অনুসারীদের মতে আযানের শুরুতে যে 'আল্লাহ্ আকবার' রয়েছে তা দু'বার বলবে, চার বার নয়। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেন: وَرَدَّ نَبِيُّ رَبَائِهِ عَبْدَ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَحْدُورَةَ يُؤَدِّنُ مِثْنِي مِثْنِي وَيُتَمِّمُ (طَحَارِيُّ) (مَعَارِئُ) اَرْخَا۟ءُ, আবু মাহযুরা (রা.) আযান ও একামতের প্রত্যেকটি বাক্য দু' বার বলতেন; এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্যান্য বাক্যের ন্যায় শুরুতে যে اللهُ اَكْبَرُ রয়েছে তাও দু' বারই বলতেন। এ দলিলের মাধ্যমে ইয়াম মালেক (র.) বলেন যে, আযানের বাকসমূহ ১৭টি।

مَدْعَبُ الْإِمَامِ ابْنِ حَيْنَةَ وَالثَّانِعِيَّ وَاحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ : ইয়াম আবু হানীফা, শাফেরী, আহমদ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়ামের মতে আযানের প্রথম দিকে ভাকবীর চার বার বলতে হবে। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন- ۱ . عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ (رَضِيَ) قَالَ أَلْقَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ الشَّاذِينَ مَرَّيْنَتَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ - اَكْبَرُ ، اللهُ اَكْبَرُ ، اللهُ اَكْبَرُ ، اللهُ اَكْبَرُ - (مُسْلِمٌ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবাদি রাক্বিবী (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ আকবার চার বার বলতে হবে। কেননা, তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে আযানের যে বাক্যগুলো শ্রাণ্ড হয়েছিলেন তাতে আল্লাহ আকবার চার বারই উল্লেখ রয়েছে।

৩. আল্লাহ্ আকবার চারবার বলাই মক্কাবাসীদের আমল। হজের মৌসুমে এর উপর মুসলিমদের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। তদুপরী আল্লাহ্ আকবার চার বার বলার মধ্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব চতুর্দিকে বিস্তৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইয়াম মালেকের উপস্থাপিত হাদীসের উত্তর :

- ইয়াম মালেকের উপস্থাপিত مَدْعَبُ الْإِمَامِ مَالِكُ : হাদীসটি অস্পষ্ট, আর ইয়াম আবু হানীফা (র.) উপস্থাপিত হাদীসটি ব্যাপক ও বিস্তারিত। সুতরাং مَدْعَبُ الْإِمَامِ مَالِكُ : হাদীসটি ব্যাখ্যার যোগ্য।
- যে সমস্ত হাদীসে আল্লাহ্ আকবার চারবার বলার কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর বর্ণনাকারী তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তাঁদের বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে।

الدُّعَاءُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۵۹۲ ابْنِ عَمَرَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ
الْأَذَانَ عَلَيَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ
مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - (رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَالثَّانِعِيَّ وَالذَّهَابِيَّ)

৫৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর যুগে আযানের প্রচলন ছিল দু' বার করে আর একামত এক একবার করে। কিন্তু قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ব্যতীত। [যেহেতু এটা দু'বার বলা হতো]-[আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۵۹۲ ابْنِ عَمَرَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ

عَنْ ۵۹۲ ابْنِ عَمَرَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ... এলাহদের সংজ্ঞা : قَوْمٌ , এর শব্দটি বাবে إِفْتَالٌ -এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- أَعِيْشُوا الدِّيْنَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- أَعِيْشُوا الدِّيْنَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- أَعِيْشُوا الدِّيْنَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- أَعِيْشُوا الدِّيْنَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- أَعِيْشُوا الدِّيْنَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে- أَعِيْشُوا الدِّيْنَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে- قَوْمٌ , এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা।

الْقَوْمِ بِالتَّوَكُّفِ بِالرَّأْيِ :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু আবদুর রহমান, পিতার নাম ওমর ইবনে খাতাব, মাতার নাম যয়নব বিনতে মাফুউন।

২. নসবনামা : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাতাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে রিয়াহ ইবনে কুরত ইবনে রাজাহ ইবনে আদী ইবনে কাব ইবনে লুয়াই। তাঁর নবম পুরুষ রাসূল ﷺ এর বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি কুরায়েশ বংশোদ্ভূত।

৩. জন্ম : নবুয়তের দ্বিতীয় বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

৪. ইসলাম গ্রহণ : নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর পিতা হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁকেও মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. হিজরত : ১১ বছর বয়সে পিতার সাথে নবুয়তের ১৩তম বছর মদীনায় হিজরত করেন।

৬. জিহাদে অংশগ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রথমবারের মতো খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূল ﷺ এর সাথী ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শ্রেণিত বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

৭. স্বভাব চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। রাসূল শ্রেম, সুন্নাহর অনুসরণ, জিহাদ, খোদাভীতি, ইবাদতে মনোযোগী, বদান্যতা, আত্মত্যাগ, বিনয়, অল্পে তৃপ্তি, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইবনুল আসীরের ভাষ্য থেকে আমরা তাঁর গুণাবলি জানতে পারি। তিনি বলেন-

كَانَ كَثِيرَ الْإِتِّبَاعِ لِأَخِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنَازِلَهُ وَيَسَلِّي فِي كُلِّ مَكَانٍ صَلَّى فِيهِ. (أَسَدُ الْغَابَةِ ج ৩/ ২২৭)

হযরত মাইমুন ইবনে মেহরান বলেন, "مَا رَأَيْتُ أَرْزَعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ" 'আমি ইবনে ওমরের চেয়ে ধর্মতীক্ষণ কাউকে দেখিনি।'

৮. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। ইলমে ফিক্হে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। ১৭০টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন। ৮১টি বুখারী ও ৩১টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।

৯. ইত্তেকাল : আব্দুল মালিকের শাসনামলে হজ্জ থেকে ফেরার পথে হাজ্জাজের পরামর্শে তার জটনক সিপাহী ইবনে ওমরের পায়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিলে উক্ত আঘাতে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে হিজরি ৭০/৭৪ সালে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে মক্কায় ইত্তেকাল করেন।

১০. নামাজ জানাযা ও দাফন : হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর জানাযার ইমামত করেন। ইবনে ওমরের অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে 'হিয়ে' দাফন করতে চাইলে হাজ্জাজ বাধা দেয়। অবশেষে তাঁকে যীতোয়া মতান্তরে মোহাসসাবে দাফন করা হয়। কেউ কেউ তাঁকে 'কাখ' নামক স্থানে দাফন করার কথা বলেন।

أَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الْإِقَامَةِ فِي إِتْبَارِ الْإِقَامَةِ একামত বেজোড় দেওয়া সম্পর্কে মতভেদ : একামতের বাক্যগুলো জোড় বা বেজোড় হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। নিম্নে প্রামাণ্য সহকারে বর্ণনা করা হলো-

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ بَعْضَ الْإِقَامَةِ فِي إِتْبَارِ الْإِقَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, যুহরী এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরীরা মতে একামতের বাক্যগুলো বেজোড়। অর্থাৎ, প্রথম ও শেষের ভাকবীর দু' দু'বার বলবে এবং অবশিষ্ট বাক্যগুলো একবার করে বলবে। তাঁরা নিজের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন :

১. عَنْ أَنَسٍ أَمْرٌ بِلَاغٌ أَنْ يَسْمَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يَتَوَكَّفَ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

সম্ভবত এটা ছিল হযরত বেলাল (রা.)-এর একামত।

৩. ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী ইব্রাহীম ইবনে সায়াদের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে রয়েছে **الْأَذَانَ مَثْنَى وَالْإِقَامَةَ مَثْرَةً مَثْرَةً** : ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান ছওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং কুফাবাসীদের মতে আযানের ন্যায় একামতের বাক্যও দু' দু'বার বলবে। তবে প্রারম্ভিক তাকবীর চার বার বলবে। তাঁরা নিজের মতের পক্ষে নিয়োক্ত দলিল উপস্থাপন করেন :

১. **عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ نِسَاءَ الْمَسْتَنَامِ كَانَتْ رَجُلًا قَامَ فَأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى - (ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)**
২. **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى - (بَيْهَقِيُّ)**
৩. **عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ يَلَاءَ كَانَ يُعْتَنِي الْأَذَانَ وَيُعْتَنِي الْإِقَامَةَ حَتَّى مَاتَ -**
৪. **عَنْ عَلِيِّ (رَضِيَ) أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى - (بَيْهَقِيُّ)**
৫. **عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يُعْتَنِي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ - (طَحَاوِيُّ)**
৬. **مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ السَّخَعِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّنُ مَثْنَى وَيُعْتَمِ مَثْنَى -**
৭. **عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً - (تِرْمِذِيُّ نَسَائِيُّ)**
৮. **عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَحْدُورَةَ يُؤَدِّنُ مَثْنَى وَيُعْتَمِ مَثْنَى مَثْنَى - (طَحَاوِيُّ)**

প্রথম পক্ষের উপস্থাপিত দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী প্রমুখগণ যে সমস্ত হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, হানানীদেবর পক্ষ হতে এর নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম দলিলের উত্তর : তাঁদের উপস্থাপিত প্রথম হাদীসটিতে রয়েছে যে, বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আযান জোড় জোড় এবং একামত বেজোড় করে দিতে। হতে পারে যে, এ নির্দেশটি ছিল সাময়িক সময়ের জন্য, স্থায়ীভাবে ছিল না।

২. অথবা জবাব এই যে, একবার বলা এবং দু'বার বলা স্বাস ও স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে, বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। অর্থাৎ আযানের বাক্য দু'টি দুই স্বাসে বলতে এবং একামতের বাক্য দু'টি এক স্বাসে।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : তাঁদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় দলিলের দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত বেলাল (রা.) একামত বেজোড় করে দিতেন। এর উত্তর এই যে, হযরত বেলাল (রা.) হযরত কখনও **جَوَازٍ** -এর বর্ণনার জন্য অথবা **تُعَلِّمُ** -এর জন্য একবার করে একামত দিয়ে ছিলেন। অন্যথা তিনি যে সার্বক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে একামত জোড় জোড় করে দিতেন। তা সবিস্তারে বর্ণিত একাধিক রেওয়য়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হযরত বেলালের সার্বক্ষণিক আমলই দলিল হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

ইমাম ডাহাবী (র.) বলেছেন, যেহেতু হযরত বেলাল (রা.) মহানবী ﷺ ও আবু বকর (রা.)-এর সম্মুখে আযান ও একামতের বাক্যগুলো জোড় জোড় করে বলতেন, সুতরাং যে সমস্ত হাদীস দ্বারা একামতের বাক্যগুলো বেজোড় প্রমাণিত হয় তা এর পূর্বের।

তৃতীয় দলিলের উত্তর : তৃতীয় হাদীসে যে **الْإِقَامَةَ مَثْرَةً** বলা হয়েছে তার উত্তর হলো-

১. সম্ভবত বৈধতা বর্ণনার জন্য কোনো কোনো সময় **مَثْرَةً مَثْرَةً** [একবার একবার] বলা হয়েছে।
২. সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো কোনো সময় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে একবার বলাই যথেষ্ট মনে করা হতো।

وَعَنْ ٥٩٣ أَبِي مَحْدُورَةَ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِئِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৯৩. অনুবাদ : হযরত আবু মাহযুরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন উনিশ বাক্যে এবং একামত [শিক্ষা দিয়েছেন] সতেরো বাক্যে। -[আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রীহাদীসের ব্যাখ্যা : আযানের মধ্যে তারজী' সুন্নত নয়। এটাই ইমাম আবু হানীফার মাযহাব। সুতরাং তাঁর মতে আযানের বাক্য সংখ্যা ১৫টি। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক বলেন, তারজী' সুন্নত। কাজেই তাঁদের মতে আযানের বাক্য সংখ্যা ১৯টি। আবু মাহযুরার এ হাদীসই তাঁদের দলিল। আর একামতের শব্দসংখ্যা ১৭ টি। এটাই ইমাম সাহেবের অভিমত। অর্থাৎ তিনি বলেন, আযানের ১৫ বাক্যের সাথে 'কাদ্কা মাতিস সালাহ' বাক্যটি দু'বার সংযুক্ত করলেই একামতের বাক্য সংখ্যা ১৭ই হয়ে যাবে। তবে আবু মাহযুরার হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, এ অধ্যায়ের শুরুতেই তা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٩٤ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي سُنَّةَ الْأَذَانَ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৫৯৪. অনুবাদ : হযরত আবু মাহযুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম বলে দিন। আবু মাহযুরা বলেন, অতঃপর হজুর ﷺ তার মাথার সম্মুখের ভাগের উপর হাত মুছলেন এবং বললেন, বোলো, 'আল্লাহ আক্‌বার, আল্লাহ আক্‌বার, আল্লাহ আক্‌বার, আল্লাহ আক্‌বার।' এতে তুমি স্বরকে খুব উচ্চ ও বুলন্দ করবে। অতঃপর বলবে, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' এতে তুমি তোমার স্বরকে নিচু করবে। এরপর তুমি তোমার স্বরকে উচ্চ করে বলবে, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া 'আলাস সালাহ, হাইয়া 'আলাস সালাহ। হাইয়া 'আলাল ফালাহ, হাইয়া 'আলাল ফালাহ।' যদি ফজরের নামাজ হয়, তখন বলবে, 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম।' আল্লাহ আক্‌বার, আল্লাহ আক্‌বার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ هَادِي السَّرِّ مَطْرُوقٌ : একবার নবী করীম ﷺ হনাইন থেকে ফেয়ার পথে কোনো এক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং মুদ্রাজ্জিন আযান দিলেন। আযানের বাক্যগুলো শুনে নিকটবর্তী বালক-বালিকাগণ শিশুসুলভ উচ্চাসে ও খেলার ছলে বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। নবী করীম ﷺ বালক-বালিকাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে উচ্চ ও মধুর কণ্ঠস্বর কার আছে? সকলেই আবু মাহযুরাকে দেখালেন, তখন আবু মাহযুরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। রাসূল ﷺ আবু মাহযুরাকে বললেন, যে কথাগুলো তোমরা বলছিলে, সেগুলো আমাকে একটু বলে শুনাও। আবু মাহযুরা ঐ কথাগুলো পুনরায় বলতে লাগলেন। যখন দুই শাহাদাত আবৃত্তি করছিলেন তখন আশ্তে আশ্তে বলছিলেন। কারণ, এ তাওহীদের বাণী তাদের ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত ছিল। এ জন্যই আশ্তে আশ্তে বলেছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'এগুলো আবারও জ্বোরে জ্বোরে বলো।' সুতরাং তিনি পুনরায় ঐ বাক্যগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন। এ ঘটনায় বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আযানে কোনো তারজী ছিল না। আবু মাহযুরা আশ্তে বলাতে দ্বিতীয়বার জ্বোরে বলার জন্য রাসূল ﷺ তাঁকে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু আবু মাহযুরা বুঝে নিয়েছিলেন তারজী আযানের অন্তর্গত। এ জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আযানে তারজী করতেন। অথবা তারজী করাকে শরিয়তের মূল বিধান মনে করে করতেন না, বরং বরকতের জন্য করতেন। কথিত আছে যে, তাঁর মাথার সম্মুখভাগে যে চুলে রাসূল ﷺ -এর পবিত্র হাতের পরশ পড়েছিল, রাসূল ﷺ -এর হাতের বরকতের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনও ঐ চুল কাটেননি। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন, আযানের ব্যাপারে আবু মাহযুরার ঘটনা স্বতন্ত্র। কাজেই তা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

عَنْ ٥٩٥ بِلَالٍ (رَضَا) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُتَوَسَّنَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْرَائِيلَ الرَّاؤِي لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ)

৫৯৫. অনুবাদ : হযরত বেলাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, ফজরের নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজেই 'তাহবীব' করবে না। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজা] ইমাম তিরমিযী বলেন, বর্ণনাকারী আবু ইসরাঈল মুহাদ্দিসদের নিকট তেমন শক্তিশালী রাবী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ : -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ الْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ বা الْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ সংবাদের পর পুনঃসংবাদ দেওয়া, প্রচারের পর পুনঃপ্রচার করা।

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিও দৃষ্টি ক্ষেত্রে তাহবীব শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে—

১. বলায় পর التَّوَسُّلُ مِنْ التَّوَسُّلِ বলা। এটা তাসবীব ফজরের নামাজের সাথে নির্দিষ্ট। উপরোক্তিখিত হাদীসের তাসবীব দ্বারা এই তাসবীব-ই উদ্দেশ্য। এটা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।
 ২. আযান ও একামতের মাঝখানে الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ অথবা الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ কিংবা الصَّلَاةُ عَلَى الصَّلَاةِ বা অনুরূপ কোনো শব্দ দ্বারা নামাজদের ডাকা। এ প্রকার তাসবীবের শরয়ী বিধান সম্পর্কে ফিকহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।
- التَّوَسُّلُ فِي التَّوَسُّلِ : -এই তাসবীব সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত : পূর্ববর্তী আলিমগণ ফজর ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে তাসবীব বলা মাকরুহ বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নববী (র.) বলেন, এটাই অধিকাংশের মত। তাঁরা নিজেদের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন—

۱. رَوَىٰ أَنْ عَلِيًّا رَأَىٰ مَرْوَانَ يَتَوَكَّفُ فِي الْعِمَاءِ . فَقَالَ أَخْرَجْنَا هَذَا السَّبِيحَ مِنَ السَّبِيحِ .
 ۲. عَنْ مَعْبُدِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ (رض) فَوَجَدْتُ رَجُلًا فِي الظُّهْرِ أَوْ المَعْرِ قَالَ قَالَ أَخْرَجَ بِنَا فَإِنَّ فِيهِ بَدْعَةٌ .
 (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

তবে পরবর্তী আলিমগণ একে প্রত্যেক নামাজের জন্য মোস্তাহাব বলে অভিহিত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একামতের কিছু পূর্বে নামাজের কথা শ্রবণ করে দেওয়াকে উত্তম মনে করতেন। আল্লামা শামী (র.) লিখেছেন যে, কাজি, মুফতি বা অনুরূপ যারা দীনি কাজের সাথে জড়িত তাদের ব্যাপারে তাসবীব বলার অনুমতি রয়েছে। তা ছাড়া বর্তমানে দীনি কাজে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট শিথিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাদেরকে নামাজের প্রতি সতর্ক করার জন্য তাসবীব বলা যেতে পারে।

পরবর্তীদের শফ হতে পূর্ববর্তীদের দলিলের উত্তর : পূর্ববর্তী আলিমগণ ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজে তাসবীব বলা মাকরুহ হওয়ার পক্ষে যে দু'টি হাদীস উপস্থাপন করেছেন, পরবর্তী আলিমগণ এর নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেছেন—

- ফজরের নামাজে তাসবীব বেধ হওয়ার কারণ এই যে, এ সময়টা হলো ঘুমের সময়। এ সময় মানুষ অচেতন অবস্থায় ঘুমে নিমজ্জিত থাকে। বর্তমান যুগে এ অচেতনতা ফজরের সময় ছাড়া অন্যান্য নামাজের সময়ও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একই কারণের ভিত্তিতে বেধতার বিধান সমভাবে প্রত্যেক নামাজের জন্য হওয়া উচিত।
- যে সমস্ত হাদীসে তাসবীবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তা সে যুগের সাথে নির্দিষ্ট, যখন মানুষের মধ্যে সচেতনতা পর্যাপ্তায় বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে যেহেতু মানুষের মধ্যে দীনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতনতা দেখা যায় না; সুতরাং পূর্বের অবস্থার হুকুম এবং বর্তমান অবস্থার হুকুম এক হতে পারে না।
- হযরত বেলাল (রা.) থেকে বর্ণিত **لَا تُسَوِّبَنَّ فِي شَوْكِ النَّعْ** হাদীসটির উত্তর এই যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু ইসরাঈল হাদীসবিদদের নিকট শক্তিশালী ও নির্ভরশীল ব্যক্তি নন।
التَّعَرُّفُ بِالرَّأْيِ বর্ণনাকারী পরিচিতি :
- নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম বেলাল, উপনাম আবু আবদিলাহ। লকব ছিল মুয়াযযিনু রাসুলিল্লাহ। পিতার নাম রাবাহ, মাতার নাম হামামাহ। হাবশী বংশোদ্ভূত ত্রীতদাস। মক্কাতেই বসবাস ছিল। তাঁর মনিব ছিল উমাইয়া ইবনে খলফ।
- জন্ম গ্রহণ : নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত লাভের প্রায় সতেরো বৎসর পূর্বে রাবাহুর ঔরসে, হামামাহুর উদরে মক্কা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাবশী বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অত্যন্ত কালো রংয়ের ছিলেন।
- ইসলাম গ্রহণ : হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে ইসলামের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অল্প কিছু লোক সতের দাওয়াত গ্রহণ করার পর যে সাতজন ব্যক্তি প্রকাশ্যে দীন গ্রহণের ঘোষণা দিয়াছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।
- দাসত্ব জীবন ও অসহনীয় অত্যাচার সহ্য : তাঁর মনিব ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। সে ছিল প্রতিমা পূজক। সে যখন জানল যে, তার দাস বেলাল মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন সে তাঁর প্রতি অসহনীয় অত্যাচার শুরু করে। তাঁকে তত্ত্বালির ওপর উপডু করে শোয়ায়ে পিঠের উপর পাথরের চাপা দিয়ে রাখতো। তাঁর গলায় রশি লাগিয়ে শিশুদের মক্কার অলিতে-পলিতে টানতে নির্দেশ দিতো। এত অত্যাচার সহ্য করেও তিনি দীনের উপর অবিচল থাকেন এবং আহাদ আহাদ উচ্চারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে **وَكَانَ يَسْتَعِذُّ بِعَذْبَةِ أَمَلٍ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ** বলেন, **صَاحِبُ الْكُفَّانِ** বলেন, ইমাম মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর পথ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি এ জাতীয় অত্যাচার দেখে অত্যন্ত ব্যথানুভব করেন এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে অজস্ত অর্থ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন। অবশেষে তিনি তাঁকে আজাদ করে অবর্ণনীয় শান্তি হতে মুক্তি দেন এবং অবাধে দীন পালনের সুযোগ করে দেন।
- মদীনায় হিজরত : মক্কার কুরায়েশ কাবিরদের অত্যাচারে তিনিও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি সেখানে হযরত সা'দ ইবনে যুজাইমার অতিথি হন। রাসুলে করীম ﷺ তাঁর সাথে হযরত আবু রুওয়াইয়া ইবনে আবদির রহমান খাসয়ামীর আত্মত্ব স্থাপন করে দেন।
- রাসুল ﷺ-এর মুয়াযযিন নিযুক্ত : নামাজের সূচনার পর পরই নামাজের জন্য আহ্বান করার উদ্দেশ্যে আযানের পদ্ধতি চালু হয়। হযরত বেলাল (রা.) পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত হন। তাঁর কদয়গ্রাহী আযান শুনে কেউই ঘরে বসে থাকতে পারতো না। মসজিদে লোকজনের ভিড় জমে উঠলে তিনি রাসুলিল্লাহ ﷺ-এর দরজায় গিয়ে **سَلِّ عَلَى**

(السَّلَاة) বললে রাসূলে কারীম ﷺ জামাতে হাজির হতেন। হযরত বেলালের অনুপস্থিতির দিন হযরত আবু মাহযূর অথবা আমার ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এ দায়িত্বের আঞ্জাম দিতেন।

৮. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ: ইসলাম গ্রহণের পর হতে গুরুত্বপূর্ণ সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে বদরের যুদ্ধে তিনি ইসলামের বড় শত্রু এবং তাঁর প্রতি অমানবিক অভ্যাত্যারী উমাইয়া ইবনে খাল্ফকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে ছিলেন এবং তিনি মক্কার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পান। রাসূলে কারীম ﷺ-এর নির্দেশে তিনি মক্কার কা'বা শরীফের উপর দাঁড়িয়ে আযান দেন।

৯. সিরিয়া গমন ও তথ্যায় স্থায়ী বসবাস: হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে তিনি আমীরুল মু'মিনীন হতে অনুমতি নিয়ে সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ার সবুজ ও শস্য-শ্যামল ভূমি তাঁর নিকট অত্যন্ত পছন্দ হয়। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হতে অনুমতি নিয়ে তাঁর ইসলামি ভাইসহ খাওলান নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

১০. মৃত্যু ও দাফন: তিনি ২০ হিজরি সনে ৬০ অথবা ৬৩ বৎসর বয়সে দামেস্ক নগরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দামেস্কের বাবুস সগীরের নিকটে দাফন করা হয়। আবার কারো মতে তাঁকে বাবুল আরবাইন-এ দাফন করা হয় এবং তিনি জালব নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

وَمَاتَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَدُفِنَ بِبَابِ الصَّفِيرِ وَ قِيلَ مَاتَ بِجَلَبَ وَ دُفِنَ بِبَابِ الْأَنْعَيْنِ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ

এ মর্মে ঐকমত্য বলেন, صَاحِبُ الْإِكْمَالِ

وَعَنْ جَابِرِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ إِذَا أَدْنَتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقْنَتَ فَاحْذَرْ وَأَجْعَلْ بَيْنَ أَذْرِكَ وَأَقَامَتِكَ قَدْرُ مَا يَفْرُغُ الْأَكِيلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءٍ حَاجِبِهِ وَلَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوْنِي - (رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ)

৫৯৬. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বললেন, যখন আযান দেবে, ধীরে ধীরে দীর্ঘস্বরে দেবে এবং যখনই একামত বলবে, তাড়াতাড়ি নিম্নস্বরে বলবে এবং তোমার আযান ও একামতের মধ্যে এ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখবে, যাতে ভোজনরত ব্যক্তি ভোজন হতে, পানরত ব্যক্তি পান করা হতে এবং পায়খানা-প্রস্রাবে রত ব্যক্তি তার কার্য হতে অবসর গ্রহণ করে নেয় এবং তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে না, যতক্ষণ না আমাকে [মসজিদে] দেখো। -[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি আব্দুল মুনইম ব্যতীত অপর কোনো সূত্র হতে আমরা জানি না এবং এ হাদীসের সনদটি মাজহুল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَفَعَّلَ ٱلرَّسُلُ শব্দটি বাবে مَعْنَى التَّرَسُّلِ ٱلرَّسُلِ وَٱلْعَبْرِ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ- ধীরস্থিরভাবে কোনো কাজ করা। আযানের মধ্যে তারাসসুল করার অর্থ হলো আযানের বাক্যগুলো খেমে খেমে উচ্চারণ করা।

تَرَسَّرَ ٱلْعَبْرُ শব্দটি বাবে تَعَسَّرَ وَتَرَسَّرَ-এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক অর্থ- তাড়াতাড়ি করা। একামতে হদর করার অর্থ হলো একামতের বাক্যগুলো না খেমে একত্রে উচ্চারণ করা। আযানের মধ্যে তারাসসুল ও একামতের মধ্যে হদর সুন্নত।

أَجْعَلْ ٱلْبَيْنَ ٱلْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءٍ حَاجِبِهِ-এর অর্থ: এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নামাজ হলো আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করার অন্যতম মাধ্যম। তাই যাবতীয় বিষয় ও প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ানো একান্ত আবশ্যিক। ফলে অতিমাত্রায় ক্ষুধা-পিপাসা সামনে রেখে অথবা পানাহারে লিপ্ত অবস্থায় তা ত্যাগ করে নামাজে শরিক হলে নামাজ বা নামাজের কার্য আদায়ে একগুণতা থাকবে না। তাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি, তিনি বলেছেন- 'আমি নামাজকে খাদ্যে পরিণত করার চাইতে খাদ্যকে নামাজে পরিণত করাটা অধিক উত্তম মনে করি।'

এমনিভাবে পেশাব-পায়খানার হাজত থাকা অবস্থায় নামাজির মানসিকতা স্থির থাকতে পারে না; বরং অতি প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তা ত্যাগ না করে নামাজ পড়া মাকরুহ।

মেটিকথা, মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক নামাজের পূর্বে এ পরিমাণ সময় হাতে রেখে আযান দিতে হবে, যাতে যার কোনো প্রয়োজন রয়েছে, সে যেন তার অভাব্যবশ্যকীয় প্রয়োজন সেদে নামাজে শরিক হতে পারে।

وَلَا تَقْرَأُوا حَتَّى تَرَوُنَّ -এর অর্থ : মহানবী ﷺ-এর আলোচ্য বাক্যটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে-

- মহানবী ﷺ হলেন ইমাম। সুতরাং ইমাম মসজিদে আসার পূর্বে অনর্থক মুসল্লিদের দাঁড়িয়ে থাকা কষ্ট বৈ কিছু নয়, তাই ইমামের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন।
- কেউ কেউ বলছেন, মহানবী ﷺ নিজের হজুরা হতে তখনই বের হয়ে মসজিদে আসতেন যখন মুযাজ্জিন একামত বলা আরম্ভ করতেন এবং যখন عَلَيَّ الصَّلَاةُ বলতেন তখন তিনি মেহুরাবে প্রবেশ করতেন। তাই আমাদের ইমামগণ বলেন- عَلَيَّ الصَّلَاةُ বলার সাথে সাথে সমস্ত মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যাবে এবং قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার সাথে সাথে নামাজ শুরু করে দেবে।
- আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, একামত বলা শেষ হলেই হজুরা ﷺ হজুরা হতে বের হতেন এবং তখনই লোকদেরকে নামাজের জন্য দাঁড়াতে আদেশ করতেন, এর পূর্বে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।
- আবার কেউ কেউ বলেছেন لَا تَقْرَأُوا দ্বারা মুযাজ্জিনদেরকে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ মহানবী ﷺ তাদেরকে বলছেন, আমি হজুরা হতে বের হয়ে আসার পূর্বে একামত বলার জন্য তোমরা দাঁড়াতে না। শায়খুল আদব (র.) বলেছেন, এ শেষের অর্থটিই অধিক মুক্তিসঙ্গত।

নামাজের জন্য দাঁড়ার সময় সম্পর্কে ইমামদের মতামত :

مَنْعَبُ الْأِمَامِ مَالِكٌ وَغَيْرِهِ : ইমাম মালেক ও অধিকাংশ আলিমের মতে নামাজের জন্য দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোনো সময়-নীমা নির্ধারিত নেই। একামত শুরু করার পূর্বে বা পরে অথবা عَلَيَّ الصَّلَاةُ বলার সময় কিংবা একামত শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় দাঁড়াতে পারবে। এ ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো বাধা-বাধকতা নেই।

مَنْعَبُ الْأِمَامِ الشَّافِعِيُّ : ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফের মতে একামত বলা শেষ হওয়ার পর নামাজের জন্য দাঁড়ানো মোস্তাহাব। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, মুযাজ্জিন যখন قَامَتِ الصَّلَاةُ একবার বলবে তখন সব নামাজি দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন দ্বিতীয় বার قَامَتِ الصَّلَاةُ বলবে তখন নামাজ আরম্ভ করবে।

مَنْعَبُ الْأِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ : ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুযাজ্জিন যখন عَلَيَّ الصَّلَاةُ বলবে তখন সব নামাজি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং মুযাজ্জিন যখন قَامَتِ الصَّلَاةُ বলবে তখন ইমাম তাকবীর বলে নামাজ আরম্ভ করবে।

‘মারাকিল ফালাহ’ গ্রন্থে এসেছে যে, একামত শেষ করার পর নামাজ আরম্ভ করতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে সঠিক কথা হলো মুযাজ্জিন যখন একামত শুরু করবে, সমস্ত নামাজি তখন দাঁড়িয়ে যাবে। এটাই মোস্তাহাব। কেননা, ইবনু শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন-

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةً يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ اللَّهُ أَكْبَرَ يَقْرَأُونَ إِلَى الصَّلَاةِ
ইমাম যুহরী এখানে সাহাবীদের আমল বর্ণনা করেছেন যে, মুযাজ্জিন যখন একামত শুরু করতেন তখন সাহাবীগণ নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। আর সাহাবীদের কার্য অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। মহানবী ﷺ-এর উক্তি-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
নামাজের ইমাম যদি মসজিদে উপস্থিত না থাকে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে ইমামকে না দেখা পর্যন্ত মুক্তাদিরা দাঁড়াতে না।

একটি দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : মহানবী ﷺ-এর আলোচ্য উক্তি لَا تَقْرَأُوا حَتَّى تَرَوُنَّ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর হজুরা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই একামত দেওয়া হতো, নতুবা নিষেধাজ্ঞার কি অর্থ হতে পারে? পক্ষান্তরে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস (مُسَيَّمٌ) عَلَيَّ الصَّلَاةُ (مُسَيَّمٌ) -একামত দিতেন। সুতরাং বাহ্যত উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে, হযরত বেলাল (রা.) মহা নবী ﷺ -এর বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন। যখনই তাঁকে দেখতেন একামত আরম্ভ করে দিতেন। অথচ অন্য লোকেরা তখনও পর্যন্ত মহানবী ﷺ-কে দেখতো না। পরে যখন তারাও দেখতো তখন তারাও দাঁড়িয়ে যেতো। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

عَنْ مَرْثَبَةَ - এর মর্শ্বা: ইমাম তিরমিযী বলেন, আব্দুল মুনইম ব্যতীত অপর কোনো সূত্র হতে হাদীসটি আমাদের জানা নেই।

ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত উক্তি উদ্দেশ্য এই যে, উপরোক্ত হাদীসটির ভিত্তি হলো আব্দুল মুনইম। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী এটা বর্ণনা করেননি। তবে ইমাম তিরমিযী নিজ ধারণার ভিত্তিতে এ উক্তি করেছেন। নতুবা হাকেম ও ইবনু আদী প্রমুখ এ হাদীসটিকে অন্য বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এমনকি হাদীসের অন্যান্য কিভাবে অন্য সাহাবীর সূত্রে এ বিষয়বস্তুর উপর হাদীস বর্ণিত আছে। যদিও এ পর্যায়ের সকল হাদীস সনদের ভিত্তিতে দুর্বল, কিন্তু দুটি কারণে একে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত উম্মতের সমষ্টিগতভাবে হাদীসটির উপর আমল করা।

عَنْ ٥٩٧ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِقِيِّ (رَضِيَ) قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَذِّنَ فِيمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَذَّتُ فَرَادًا بِلَالًا أَنْ يُعَيِّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَا صَدَاءِ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُعَيِّمُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৯৭. অনুবাদ : হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফজরের নামাজের আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমি আযান দিলাম, অতঃপর বেলাল একামত বলতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুদায়ী আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেবে সে একামতও বলবে। -তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বেলাল (রা.) একামত দিতে চাওয়ার কারণ কি? হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন। হয়তো বা তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোথাও দূরে গিয়েছিলেন এদিকে ফজরের আযানের সময় হয়ে গেল। লেকেরা তাঁকে বোঝাবুজি করতে লাগল; কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। অবশেষে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে সুদায়ী আযান দিলেন। ইতোমধ্যে হযরত বেলাল এসে উপস্থিত হলেন এবং নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন হিসেবে তিনি একামত দিতে চাইলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে আযান দেবে সে একামত বলবে। বস্তুত হযরত বেলাল (রা.) রাসূল ﷺ-এর নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন হিসাবে একামত দিতে চেয়েছিলেন।

মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলা সম্পর্কে ইমামদের মতামত :

عَنْ ٥٩٨ مَدْمَةَ السَّافِمِيِّ وَرَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের মতে মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলা মাকরুহ। মুয়াজ্জিন এতে সন্তুষ্ট হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রের হুকুম একই।

তারা মহানবী ﷺ-এর উক্তি- **مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُعَيِّمُ** -কে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলার বৈধতা সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই, মতভেদ হলো উত্তমতার ব্যাপারে।

عَنْ ٥٩٩ سَنَعَبِ ابْنِ حَيْثَمَةَ وَسَالِكِ : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক প্রমুখের মতে মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলা কোনো প্রকার মাকরুহ ছাড়াই বৈধ।

তারা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন—

١. أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ لَقَبْتُهَا بِلَالًا فَأَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ٢. وَرَوَى أَنَّ ابْنَ إِمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يَوْمَئِذٍ وَيْلًا يُعَيِّمُ وَرَسَا أذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ ابْنُ إِمِّ مَكْتُومٍ -

بِدَائِعِ الصَّنَائِعِ নামক গ্রন্থে এসেছে যে, অন্যের একামত বলা সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য এই যে, যদি মুয়াজ্জিন অপছন্দ মনে করে তবে অন্যের একামত দেওয়া মাকরুহ। কেননা, একামত দেওয়া মুয়াজ্জিনেরই অধিকার। যেমন যিয়াদ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। আর যদি মুয়াজ্জিন খারাপ মনে না করে তবে মাকরুহ হবে না।

যিয়াদ ইবনে হারেসের সুদায়ী (রা.) সম্পর্কে তারা বলেন, যিয়াদ ইবনে আল-হারেস তখন নব মুসলিম ছিলেন, এ কারণে অন্যের একামত বলাকে হয়তো বা তিনি অপছন্দ মনে করবেন, তাই রাসূল ﷺ বেলাল (রা.)-কে একামত বলতে নিষেধ করেছেন।

التَّائِبُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٩٨

ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ
الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ
فَيَتَحَرَّيُونَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يَنَادِي بِهَا أَحَدٌ
فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
إِتَّخَذُوا مِثْلَ نَاقُوسِ التَّصَارِي وَقَالَ
بَعْضُهُمْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ
أَوْ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يَنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আসেন, তখন তারা অনুমান করে নামাজের জন্য একটা সময় স্থির করে নিতেন এবং ঐ সময় সকলে সমবেত হতেন। নামাজের জন্য কেউ ডাকতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। কেউ কেউ বললেন, খ্রিস্টানদের মতো একটা ঘণ্টি বাজানো হোক। আর কেউ কেউ বললেন, ইহুদিদের মতো একটা শিক্ষা বাজানো হোক। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা কী কোনো লোককে পাঠাতে পারো না, যে ব্যক্তি মানুষকে নামাজের দিকে ডেকে আনবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বেলাল! উঠ এবং মানুষকে নামাজের জন্য ডাক। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আশোচনা

عَنْ هَانِئِ بْنِ سَالَمٍ : قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَادِيٍّ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ : «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ»

হানীসের ব্যাখ্যা : ইহুদি নাসারাগণ নিজ নিজ সংকেত অনুযায়ী মানুষদেরকে ইবাদতের জন্য ডাকতো, তাই হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশ্নে হযরত বেলাল (রা.) কর্তৃক 'الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ' নামাজ প্রস্তুত! নামাজ প্রস্তুত!!' বলে লোকদেরকে নামাজের জন্য ডাকা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাদের ঘর-বাড়ি এবং মহল্লা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে মুসলিমগণ একটি বৈঠকে সমবেত হলেন। এবারও কোনো প্রকার ফয়সালা ছাড়াই বৈঠকের কার্য সমাপ্ত হলো। পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রাক্বিহীসহ কয়েকজন সাহাবী স্বপুযোগে আযানের বাক্যগুলো প্রাপ্ত হলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ ওঁহি বা ইজতেহাদের মাধ্যমে আযান প্রথা প্রচলন করলেন।

عَنْ ٥٩٩

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ
رَبِّهِ (رض) قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِالتَّائِبِينَ يُعْمَلُ لِبُضْرَبِ يَهُودِ التَّائِبِينَ
لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ
يَعْمَلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ
اللَّهِ أَتَيْتَنِي النَّاقُوسُ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ
قُلْتُ تَدْعُرُ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا
أَدُلُّكَ عَلَيَّ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ
لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى

৫৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাক্বিহী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [নামাজের জন্য] ঘণ্টি বানানোর আদেশ করলেন, যাতে নামাজের জন্য লোকদেরকে সমবেত করতে তা বাজানো হয়। তখন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে আমার নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি গমন করছিল, তার হাতে একটি ঘণ্টি ছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এ ঘণ্টিটি বিক্রয় করবে কি? সে বলল, তুমি এটা ধারা কী করবে? আমি বললাম, এটা ধারা আমরা নামাজের জন্য আহ্বান করব। সে বলল, এর চেয়ে উত্তম পছন্দ আমি কী তোমাকে বলে দেব না? আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই বলুন। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, তখন সে 'আল্লাহ আক্বার' হতে আরম্ভ করে

أَخْبَرَهُ وَكَذَا الْإِقَامَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ
 إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمَعَ مَعَ يَلَالٍ
 فَأَنَّى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ فَلْيُؤَدِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ
 أَنْدَى صَوْرَتًا مِنْكَ فَمَمْتِ مَعَ يَلَالٍ
 فَجَعَلْتُ أَلْقِيَهُ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنُ بِهِ قَالَ
 فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي
 بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَحْرُرًا رَدَاهُ يَقُولُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ
 مِثْلَ مَا أَرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ
 مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَقَالَ
 التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِكُنْهَ لَمْ
 يُصْرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوسِ)

আযানের শেষ বাক্য পর্যন্ত শব্দগুলো বলল। এরূপে একামতের শব্দগুলোও বলল। অতঃপর যখন আমি ভোরে উঠলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যা স্বপ্নে দেখলাম তা বললাম; তখন তিনি বলে উঠলেন- ইশ্বাআল্লাহ এটা সত্য স্বপ্ন! উঠো! বেলালের সঙ্গে যাও এবং যা যা তুমি দেখেছ তা বেলালকে বলে দাও। সে শব্দ দ্বারা বেলাল যেন আযান দেয়। কেননা, সে তোমার চেয়ে অধিক উচ্চ-স্বরধারী। সে বলল, অতঃপর আমি বেলালের সাথে গেলাম এবং তাঁকে তা বলে দিতে লাগলাম, আর তিনি তা দ্বারা আযান দিতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) নিজের ঘরে থেকেই তা শুনেতে পেলেন এবং ত্বরিত বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, যা তাকে (আব্দুল্লাহকে) দেখানো হয়েছে, আমিও সেরূপ স্বপ্নে দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قَلْبِي الْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। -[আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

কিন্তু ইবনে মাজাহ একামতের কথা উল্লেখ করেননি। আর ইমাম তিরমিযীও এ হাদীসটি রিওয়াত করেছেন এবং বলেছেন এটা সহীহ ও বিশ্বস্ত হাদীস বলে। তবে তিনি 'ঘণ্টির' কথা উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَهُ - এর অর্থ : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘণ্টি বানানোর নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ أَنْ يَنْفَعَهُ - ঘণ্টি বানিয়ে তার দ্বারা লোকদেরকে নামাজের জন্য সমবেত করার আদেশ দানের ইচ্ছা করলেন, ঠিক সে রাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যয়েদ ইবনে আবদে রাবিহীসহ আরো কয়েকজন সাহাবী স্বপ্নযোগে আযানের বাক্যগুলো প্রাপ্ত হলেন। উল্লেখ্য যে, ১১ জন মতান্তরে ১৪ জন সাহাবী একইরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নের কথা শুনে রাসূল ﷺ ওই বা নিজ ইজতেহাদ দ্বারা স্বপ্নে প্রাপ্ত বাক্যগুলোকে আযান হিসেবে সবাঞ্ছ করলেন।

শব্দ ও সমাধান : 'নিশ্চয়ই এটা সত্য স্বপ্ন' এখানে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যয়েদের স্বপ্নকে কিভাবে নির্ধারিত সত্য স্বপ্ন বলে ঘোষণা দিলেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সাহাবী। নবীর স্বপ্ন অবশ্য ওহির সমতুল্য; কিন্তু একজন সাধারণ সাহাবীর স্বপ্নকে কিভাবে সত্য বলে ঘোষণা করে শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? উক্ত প্রশ্নের জবাব কয়েকটি হতে পারে-

১. সম্ভবত মহানবী ﷺ নিজের খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতা তথা ইজতেহাদ অথবা সরাসরি ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এটা সত্য স্বপ্ন।
২. আবার কেউ কেউ বলেছেন, মি'রাজের রাতে তিনি ফেরেশতাদের আযানের শব্দগুলো শুনেছিলেন, এতদিন তা তাঁর স্মরণ পড়েনি, পরে আব্দুল্লাহর মুখে শব্দগুলো শুনার সাথে সাথেই তা তাঁর স্মরণে পড়েছে। তাই তিনি নির্ধারিত বলে ফেলেছেন, এটা সত্য স্বপ্ন। সুতরাং এটা একজন সাহাবীর স্বপ্ন হিসেবে শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

৩. আবার কেউ কেউ বলেছেন, আযানের শব্দগুলোর মধ্যে তার অন্তর্নিহিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্মিলিত যে নূর বা জ্যোতি বিদ্যমান রয়েছে, তা শুনাআই হুজুর ﷺ বৃদ্ধত পেরেছিলেন যে, এটা **اصناف احلام** বা শয়তান প্রদত্ত স্বপ্ন নয়; বরং এটা মহান প্রভু রাক্বল আলামীর পক্ষ হতে আমাদের জন্য একটি কল্যাণ ও রহমত, যা তিনি আমাদের সমস্যা নিরসনের জন্য দান করেছেন।

وَعَنْتَ أَيُّ بَكْرَةَ (رض) قَالَ
حَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلْوَةِ الصُّبْحِ
فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ
حَرَكَهَ بِرَجْلِهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

এ-এর অর্থ : আযানের বাক্যসমূহ হযরত বেলাল (রা.)-কে শিখাতে ও তাঁকে আযান দিতে বলার কারণ স্বরূপ মহানবী ﷺ বলেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর অন্যদের তুলনায় উঁচু। এ থেকে বুঝা গেল যে, উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তিরই আযান দেওয়া উচিত, যেন বহু দূরের লোকেরাও আযান শুনেতে পারে।

৬০০. অনুবাদ : হযরত আবু বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাজের জন্য বের হলাম। তখন তিনি যে ব্যক্তির কাছে দিয়েই যেতেন তাকে নামাজের জন্য ডাকতেন, অথবা নিজের পা দ্বারা তাকে নাড়া দিতেন।
-[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ কিভাবে পা দিয়ে নাড়া দিলেন? মহানবী ﷺ ফজরের নামাজের জন্য বের হয়ে পথে যাকেই পেয়েছেন তাকে নামাজের জন্য ডেকেছেন, আর যাকে অচেতন পেয়েছেন তাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়েছেন। হুজুরের পা দিয়ে নাড়া দেওয়া ব্যহত তাঁর শানের খেলাফ মনে হয়। এর জবাবে বলা যায় যে, হুজুর ﷺ নামাজের জন্য প্রস্তুতির গুরুত্বের তাকিদে এরূপ করেছেন। অথবা হুজুর ﷺ যাদেরকে পা দিয়ে নাড়া দিয়েছেন তারা রাসূলের পায়ের নাড়া খাওয়াকে নিজের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার মনে করতেন, তাই এরূপ করা রাসূলের শানের খেলাফ নয়।

বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম নুফাই। আবার কারো মতে তাঁর নাম মাসরুহ। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম আবু বাকরাহ। তাঁর পিতার নাম হারেছ ইবনে কালাদা। আবার কারো মতে তাঁর পিতার নাম মাসরুহ যিনি হারেছের আজাদ করা গোলাম। তাঁর মাতার নাম সুমায়্যা। তিনি একজন সাহাবী।
২. বংশ ধারা : তাঁর বংশধারা হলো নুফাই ইবনে হারেছ ইবনে কালাদা ইবনে আমর ইবনে ইলাজ ইবনে আবী সালমা। তিনি আব্দুল ওজ্জা ইবনে গিয়ারা ইবনে আউফ ইবনে কাসী।
৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি তায়েফের দিন তায়েফের সুরক্ষিত দুর্গ হতে চরকির সাহায্যে নেমে রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। চরকিকে আবিতে বাকরা বলা হয়। এ কারণে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর কুনিয়াত রাখলেন আবু বাকরা। ইত্যবসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে হুজুর ﷺ তাঁকে আজাদ বা মুক্ত করে দিলেন।
৪. তাঁর ফজিলত : তিনি সম্মানিত সাহাবায়ে কে-রামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের মাঝে অত্যন্ত নেক্কার ও পরহেজ্জগার ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা ইবাদতের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকতেন।
৫. ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান : ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান যথেষ্ট রয়েছে। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বমোট ১৩২ [একশত বিশ] খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সম্মিলিতভাবে আট খানা এবং এককভাবে বুখারীতে পাঁচ খানা ও মুসলিমে তিন খানা হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে, হাসান বসরী এবং আহনাফ ইবনে কায়েছ সহ আরও অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৬. ইশ্তেকালা ও দাম্ফন : তিনি তায়েফ হতে আসার পর বসরা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতঃপর বসরা নগরীতে ৪৯ হিজরিতে আবার কোনো বর্ণনা মতে ৫১ বা ৫২ হি. সালে ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁকে বসরাতেই সমাহিত করা হয়।
৭. সন্তানাদি : মৃত্যুকালে তিনি ৮ জন পুত্র সন্তান রেখে যান। তারা হলেন আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুল আযীয, মুসলিম, রায়াদ, ইয়াযীদ এবং ওকবা।

وَعَنْ مَالِكٍ (رض) بَلَّغَهُ أَنَّ
الْمُؤَدِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤَدِّنُهُ لِيُصَلِّىَ الصُّبْحِ
فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ
النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ
الصُّبْحِ - (رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ)

৬০১. অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, জনৈক মুয়াজ্জিন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসল তাঁকে ফজরের নামাজের জন্য ডাকতে এবং তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেল; [এটা দেখে] সে বলল, তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় 'যুম হতে নামাজ উত্তম' তখন হযরত ওমর তাকে এটা ফজরের আহবানের সাথেই যুক্ত করতে বললেন। -[মুয়াত্তা মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ مَالِكٍ (رض) بَلَّغَهُ أَنَّ الْمُؤَدِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤَدِّنُهُ لِيُصَلِّىَ الصُّبْحِ -এর মর্মার্থ : হযরত ওমর (রা.) মুয়াজ্জিনকে 'الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ' বাক্যটিকে ফজরের নামাজের আযানের সাথে সংযোগ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। হাদীসাংশ ঘারা বুঝা যায় যে, 'الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ' বাক্যটি হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশেই ফজরের আযানে সংযোজিত হয়েছে; কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; বরং মহানবী ﷺ-এর যুগ হতেই এটা বলার রীতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসাংশটির মর্মার্থ এই যে, কারো ঘরে এসে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বাক্যটি ব্যবহার করা ওমর (রা.) পছন্দ করতেন না। বাক্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে হলো ফজরের আযান। তাই বাক্যটিকে যথাস্থানে প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। -[মিরকাত]

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ
عَمْرٍاءِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ أَمَرَ بِإِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ
قَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِيَصُوتِكَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬০২. অনুবাদ : [তাবে তাবেয়ী] হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে আশ্বার ইবনে সা'দ- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন (রা.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর বাপের মাধ্যমে তাঁর দাদা সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলালকে হুকুম দিলেন, [আযান দেওয়ার সময়] তার দুই আঙ্গুল তার দুই কানের মধ্যে স্থাপন করতে। তিনি বলেন, এটা তোমার স্বরকে উচ্চ করবে। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ -এর মর্মার্থ : এখানে সা'দ বলতে আল-কারাজ উদ্দেশ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় 'কোবা' মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন এবং তাঁর (রাসূলের) ইন্তেকালের পর মসজিদে নববীতে হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁর প্রপৌত্র আব্দুর রহমান তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ -এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলালকে নির্দেশ দিলেন, যেন আযান দেওয়ার সময় তাঁর দুই আঙ্গুল তাঁর কানে স্থাপন করে। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন- إِنَّهُ أَرْفَعُ لِيَصُوتِكَ -এটা স্বরকে উচ্চ করবে। আল্লামা তীব্বী (র.) বলেন, সম্ভবত এর তাৎপর্য এই যে, যখন মুয়াজ্জিনের উভয় কানের ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়া হতে তখন সে উচ্চ আওয়াজ ছাড়া নিজ স্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে পায় না। ফলে সে তার আওয়াজকে অধিক উচ্চ করে দূরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করবে। কেউ কেউ বলেন, কানে আঙ্গুল দেওয়ার ফলে বধির ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এখন আযান হচ্ছে। সুতরাং আযানের সময় কানে আঙ্গুল দেওয়াই নামাজের জন্য আহবানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ কার্যকর ব্যবস্থা।

بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَدِّنِ

পরিচ্ছেদ : আযানের মাহাত্ম্য ও মুয়াজ্জিনের উত্তর দান

আযানের মাহাত্ম্য : আযান ঘারা মানুষদেরকে নামাজ তথা কল্যাণের দিকে আহ্বান করা হয়। এ কাজ অত্যন্ত মসলহন কাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর প্রশংসা বলা হয়েছে যে, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَحْمَةٍ تَارِ حَيْثُ يُؤْمِنُ بِهِ اللَّهُ. যে লোকদেরকে আত্মাহার দিকে আহ্বান করে। এ আয়াতটি আত্মাহার পথে আহ্বানকারীর প্রশংসা অবতীর্ণ হয়েছে। আর আযান দেওয়া ও মূলত আত্মাহার দিকে আহ্বান করা।

আযানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম ﷺ বলেন, **الْمُؤَدِّنُونَ** 'الْمُؤَدِّنُونَ' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন হবেন; তথা কিয়ামতের দিন তারা অন্যদের তুলনায় অধিক ছওয়াব ও আত্মাহার নৈকট্য লাভে ধনা হবেন।

আযানের জবাব দেওয়া : আযানের জবাব দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আযানের জবাব পূর্ণ অন্তরিকতার সাথে প্রদান করলে সে বেহেশত প্রবেশ করবে বলে নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন।

আযানের জবাব দু'ভাবে হয়—

1. **قَوْلِي :** আযানের বাক্য শ্রবণের পর ঐ বাক্যগুলো শ্রোতা আন্তে আন্তে বলবে। অবশ্য **عَلَى** ছয়ের জবাব **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ** বলতে হবে, আর **الْقَلْبُ خَيْرٌ مِنَ التَّوَمِّ** -এর জবাবে **بَرَزْتُ** বলতে হবে অজ্বিহীন, জুন্নবী, ঋতুবতী ও নেফাসওয়াসী নারী মুখে মুখে জবাব দিতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি মল-মূত্র ত্যাগে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত থাকে তবে সে অবস্থায় জবাব দেওয়া নিষিদ্ধ।
2. **فِيْلِي :** এটা হলো আযান শুনার সাথে সাথে নামাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদের দিকে গমন করা। আলোচা অধ্যায়ে আযানের মাহাত্ম্য ও আযানের উত্তর দান সংক্রান্ত হাদীসগুলো স্থান পেয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ** **بِقَوْلِ** **الْمُؤَدِّنِ** **أَطْوَلَ** **النَّاسِ** **أَعْنَانًا** **يَوْمَ** **الْقِيَامَةِ** . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০৩. অনুবাদ : ইয়রত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় অন্যান্য মানুষের তুলনায় দীর্ঘ হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : দুনিয়াতে যারা একমাত্র আত্মাহারকে রাজি ও খুশি করার লক্ষ্যে আযান দেয় তাদের মর্বাদা সম্পর্কে বলেছেন যে, 'কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন হবেন।' এ দীর্ঘ ঘাড়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ—

1. ইবনুল আরাবী বলেছেন— **أَطْوَلَ النَّاسِ** অর্থ **أَكْفَرَ النَّاسِ** অর্থাৎ, আমলের দিক দিয়ে তারা অধিক আমলকারী প্রমাণিত হবে।
2. কেউ বলেছেন, এর অর্থ কিয়ামতের দিন তারা আত্মাহার নৈকট্য লাভ করবে। মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন নবীগণ প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে, অতঃপর প্রবেশ করবে বায়তুল্লাহ শরীফের মুয়াজ্জিনগণ, অতঃপর বাইতুল মাকদিসের মুয়াজ্জিনগণ, অতঃপর আমার মসজিদের মুয়াজ্জিনগণ। পরে দুনিয়ার অন্যান্য মুয়াজ্জিনগণ প্রবেশ করবে।

৩. অথবা এর অর্থ এই যে, মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন সকলের সরদার ও নেতা হবে। আরবের লোকেরা সাধারণত সরদার বা নেতাকে **مَوْلَى الْعَسَنِ** বা 'লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট' বলতো।
৪. অথবা অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন তারা লজ্জিত হবে না, লজ্জিত ব্যক্তি মাথা তুলে তাকায় না।
৫. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ **أَكْتَفَرَهُمْ دَرَعَةً** তারা সকলের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হবে।
৬. কারো মতে তাদের অনুসারীর সংখ্যা হবে অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক বেশি। এ কথার বাস্তব বাখ্যা এটাও হতে পারে যে, দুনিয়ায় যেহেতু লাখ লাখ মুসলমান মুয়াজ্জিনের আযান শুনে পাঁচ গুণ্যক্ত নামাজের জামাতে হাজির হয়, তাই কিয়ামতের দিনও লাখ লাখ লোক তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে।
৭. নযর ইবনে ওমায়োল বলেন, এর অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ ঘামের সাগরে হাবুড়ুবু খাবে তখন মুয়াজ্জিনগণের ঘাড় ঘামমুক্ত থাকবে। তারা এ বিপদ থেকে রেহাই পাবেন।
৮. **عُنُقُ** শব্দটি **عُنُقُ** -এর বহুবচন। এর একটি অর্থ জামাত বা দল। আরবের লোকেরা বলে **عُنُقُ مِنَ النَّاسِ** তথা **جَاءَ عُنُقُ مِنَ النَّاسِ** তখন হাদীসের মর্যাদা হবে, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণের দল ভারী হবে।
৯. কেউ বলেছেন, এর অর্থ **أَكْتَفَرَهُمُ الْكُفْرُ النَّاسِ كُفْرًا** অর্থাৎ মুয়াজ্জিনগণ সকলের তুলনায় অধিক ছুওয়াব লাভে ধনা হবে।
১০. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ **أَكْتَفَرَهُمْ رَحْمَةً** অর্থাৎ তারা সকলের তুলনায় অধিক আশাবাদী হবে। কারণ যখন কোনো মানুষ কোনো কিছু পাবার আশা পোষণ করে, তখন সে দিকে সে ঘাড় উঁচু করে তাকায়। কিয়ামতের দিন যখন অন্যান্য লোক ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে তখন মুয়াজ্জিনগণ বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকবেন।
১১. কারো মতে এর অর্থ এই যে, তারা আন্তরিক প্রশান্তি ও মর্যাদা প্রকাশের ভিত্তিতে উন্নত মস্তকে সুদৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকবেন। লজ্জিত ও অপমানিত ব্যক্তির ন্যায় মস্তক অবনত করে দাঁড়াবেন না।
১২. কাজী ইয়ায় প্রমুখ মনীষী বলেছেন, **عُنُقًا** শব্দটির হামযাটি যের বিশিষ্ট; এমতাবস্থায় এর অর্থ **إِلَى الْحَيَّةِ** অর্থাৎ তথা বেহেশতের দিকে দ্রুত গমন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ বেহেশতের দিকে দ্রুত গমন করবেন।
১৩. আবু দাউদের পুত্র বলেছেন, আমি আমার পিতা আবু দাউদের নিকট শুনেছি, বাকাটির অর্থ—
- إِنَّ النَّاسَ يَبْطِشُونَ نَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطَشَ الْإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَدَّبُونَ لَا يَبْطِشُونَ قَاعَانَهُمْ قَائِمَةً**
- অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়বে। আর মানুষ যখন পিপাসা-কাতর হয় তখন তার ঘাড় ভাঁজ ও খাটো হয়ে যায়। কিন্তু মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন পিপাসা-কাতর হবে না, তাই তাদের ঘাড় উর্ধ্বে উন্নত ও দীর্ঘ থাকবে। বস্তুত উক্ত হাদীস দ্বারা মুয়াজ্জিনগণের উচ্চ মর্যাদার কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّيْدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّشْرُوبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَذُرُّ كَمْ صَلَّى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬০৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম **ﷺ** বলেছেন— যখন নামাজের আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পশ্চাৎবায়ু ত্যাগ করতে করতে পিছন দিকে পালাতে থাকে, যাতে সে আযানের ধ্বনি শুনে না পায়। অতঃপর আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন একামত বলা হয় তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে থাকে, একামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্বু ঢেলে দেয়। আর সে বলে, এ বিষয় স্মরণ কর, ঐ বিষয় স্মরণ কর, যা এতক্ষণ তার স্মরণে ছিল না। মানুষ শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে, সে বলতে পারে না কত রাকাত নামাজ পড়েছে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُ ضَرُاطٌ -এর মর্মাৰ্থ : মহানবী ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পচাংবায়ু ত্যাগ করতে করতে পিছনে পলাতে থাকে। মিরকাত ও আশি'আতুল লুমু'আত গ্রন্থে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

- হাদীসবিশারদদের কেউ কেউ বলেন, এটা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ শয়তান দেহ বিশিষ্ট প্রাণী, সে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। তাই গাধা যেমনি দৌড়ালে পচাংবায়ু বের হয় শয়তানেরও তেমনি হয়ে থাকে।
- কেউ কেউ বলেন, এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আযান ধ্বনি শ্রবণে শয়তানের অমনোযোগী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারও মতে, এটা শয়তানের প্রতি বিদ্রূপ বুঝানো হয়েছে। যেমন- বলা হয়ে থাকে, اسْتَهْوَىٰ ضَرَطِيْمَ [সে বিদ্রূপ করল।]

قَوْلُهُ حَتَّىٰ يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ -এর ব্যাখ্যা : আল্লামা রাযী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসসাংশের ব্যাখ্যা হলো শয়তান মানুষের উন্নতি ও সাফল্যের বিরোধী। মানুষ যখন একগ্রহতা ও ঐকান্তিকতার সাথে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে, তখন শয়তান মানুষকে এই সাফল্য হতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে মানুষের মনে নানা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে শুরু করে। এমনকি মানুষ শেষ পর্যন্ত বলতে পারে না যে, সে কত রাকাত নামাজ পড়ল। আলোচ্য উক্তির ব্যাখ্যা এটাই।

শয়তান আযান হতে পলায়ন করার এবং নামাজ ও যিকর হতে পলায়ন না করার কারণ : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আলোচ্য বিষয়ে আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে—

- কেউ কেউ বলেন, হাদীস আছে (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمَوْذِنِ جَنَّ وَلَا إِنْشَ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. আর শয়তান এ সাক্ষ্য দেওয়া হতে বাঁচার জন্য আযানের আওয়াজ শ্রবণ মাত্র পলায়ন করে। আর এ সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপার অন্যান্য আমল তথা নামাজ ও জিকরে নেই। তাই অন্যান্য আমল হতে পলায়ন করার প্রয়োজন নেই।
- ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, আযানের মধ্যে এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে, যা শয়তানের জন্য বিরক্তির কারণ হয়। কেননা, আযানে রিয়্যা ও গাফলত ইত্যাদি নেই। আর নামাজ ও অন্যান্য আমল এর বিপরীত।
- কারো মতে আযান সর্বোত্তম আমল নামাজের প্রতি আহ্বান। আর আযান এমন কতিপয় শব্দে দেওয়া হয় যাতে কমাবেশির অবকাশ নেই। তাই এতে শয়তানের শয়তানী প্রকাশের সুযোগ থাকে না। নামাজ এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে অনেক লোকেরই কম ও বেশি হওয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, আযানের মধ্যে যেহেতু الْأَرْكَانَ وَأَمَّ الْقُرْبَانَ -এর উপর উদ্বুদ্ধ করে আখিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্বের অধীনে إِعْلَانًا كَلِمَةَ اللَّهِ -এর বাস্তবায়ন পূর্বক সাফল্যকে প্রসার করা হয়, তাই শয়তান এতে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক রাগান্বিত হয়। كَمَا نَفَىٰ قَوْلِهِ (ع) قَعْبَهُ وَاحِدًا أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ এ জন্য শয়তান আযান হতে পলায়ন করে।

وَعَنْهُ ۖ
أَبَى سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ
(رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْمَعُ
مَدَى صَوْتِ الْمَوْذِنِ جَنَّ وَلَا إِنْشَ وَلَا شَيْءٌ
إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

৬০৫. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে কোনো মানুষ, জিন বা অন্য কোনো কিছু মুয়াজ্জিনের স্বরের শেষ রেশটুকুও শুনবে সে-ই কিয়ামতের দিনে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْهُ ۖ هাদীসের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয় এবং এতে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহানত্ব ও এককত্ব এবং তাঁর রাসূলের রিসালাত এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের ঘোষণা দেওয়া হয় তখন জিন, মানুষ ও বস্তু যারা তা শুনতে পায় কিয়ামতের দিন তারা সকলেই সে মুয়াজ্জিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ফলে এ সাক্ষ্য ঐ সমস্ত লোকের বিপক্ষে যাবে যারা কার্যত উক্ত আযানের জবাব দেয়নি। অর্থাৎ নামাজ আদায় করেনি।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَّاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা যখন মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণ করবে, তখন সে যা বলে তোমরাও অনুরূপ তাই বলবে। অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা, যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অসিলা প্রার্থনা করো। কেননা, তা বেহেশতের এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন যা বান্দাগণের মাঝে একজন মাত্র প্রিয় বান্দা ব্যতীত আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। আর আমি সে বান্দা হওয়ার আশা রাখি। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলা কামনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ কার্যকর হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْلَافُ الْإِيْتَةِ فِي إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ আযানের জবাব দেওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

১. مَدْعَى الْجَمْعَةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মোস্তাহাব। তাদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ سَمِعَ مُؤَذِّنًا فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْفَيْطْرَةِ فَلَمَّا تَشَهَّدَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَجَ مِنَ النَّارِ.

২. أَهْلُ الظُّوَاهِرِ : এ-র মতে শ্রেষ্ঠাদের উপর আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

۱. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَّاصِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْع. (مسلم)

প্রতিপক্ষের প্রমাণের উত্তরে বলা হয়—

১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসে উল্লেখ নেই যে, মুয়াজ্জিন যা বলেছেন অনুরূপ তিনি বলেননি।

২. অথবা এটা আযানের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দানের পূর্বের ঘটনা।

৩. অথবা মুক্তাভিয়ান পরিচালনার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তি হতে যে অর্থাৎ, মুয়াজ্জিন যা বলেছেন অনুরূপ তিনি বলেননি।

উল্লেখ্য যে, আযানের জবাব দেওয়া হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারী সকলের মতে ওয়াজিব নয়; বরং কতিপয়ের মতে ওয়াজিব। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) এ কথা কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

শামসুল আইখা হুলওয়ামী বলেন, আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মোস্তাহাব এবং কার্যত জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এটা ই হানাফীদের গ্রহণযোগ্য অভিমত।

أَخْلَطُ أَزْجِيَةً مِنْ حَوَائِجِ الْمُتَمَلِّئِينَ : হাইয়াআলাতাইনের জবাবের ব্যাপারে ইমামদের অভিমত :

مَدَّعَبَ الشَّانِعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّخَمِيَّ وَأَهْلَ الظُّوَاهِرِ وَغَيْرِهِمْ. : ইমাম শাফেয়ী, ইবরাহীম নাখায়ী, আহলে যাহের, ইমাম মালেক ও আহমদের এক বর্ণনা মতে আযানের জবাবদাতা হুবহু আযানের শব্দগুলোই বলবে। তাঁদের দলিল হলো—

١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. (بخاری)

٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَاصِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. (مسئلم)

إِمَامُ أَبِي هَانِيْفَا، إِمَامُ أَبِي إِسْحَاقَ، إِمَامُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدَ وَ مَالِكٍ وَ أَحْمَدَ وَ غَيْرِهِمْ : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইসুফ, মুহাম্মদ, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক প্রমুখের মতে শ্রোতা আযানের উত্তরে الصَّلَوَةُ & حَمَى عَلَى الْفَلَاحِ & حَمَى عَلَى الصَّلَوَةِ ব্যক্তি অন্যান্য বাক্যের ক্ষেত্রে মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলবে। এর উত্তরে বলবে حَمَى عَلَى الْفَلَاحِ & حَمَى عَلَى الصَّلَوَةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

তাঁরা নিজদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন যে,

١- عَنْ عَمْرٍو (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَمَى عَلَى الصَّلَوَةِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (مسئلم)

٢- وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ حَمَى عَلَى الصَّلَوَةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَالَ مَهْدًا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ يَقُولُ.

৩. মুয়াজ্জিন যেহেতু صَلَوَةٌ (নামাজ) & فَالَاحٌ (কল্যাণ)-এর দিকে আহ্বান করে, সুতরাং শ্রোতা যদি তার উত্তরে অনুরূপ বাক্য বলে তবে এটা বিজ্ঞপের শামিল হবে। কাজেই হুবহু অনুরূপ বাক্য না বলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলা উচিত।

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের উপস্থাপিত উভয় হাদীসে যে يَقُولُوا রয়েছে এর উত্তরে (১) আলামা শামী (র.) বলেন, যদিও ব্যাপারটি এখানে অস্পষ্ট, কিন্তু মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উহার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, حَمَى عَلَى الصَّلَوَةِ & حَمَى عَلَى الْفَلَاحِ -এর উত্তরে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলবে।

২. আলামা শাবরীরা আহমদ ওসমানী (র.) বলেন, যদিও مِثْلُ শব্দটি সাদৃশ্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কখনো উপযোগী অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং يَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ -এর অর্থ হবে أَجِبُوا بِالْقَوْلِ الَّذِي يُنَاسِبُهُ -এর অর্থ হবে উপযুক্ত বাক্যমাগে আযানের জবাব দাও। আর হাইয়াআলাতাইনের উপযুক্ত জবাব হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ নতুবা এটা ঠাট্টার শামিল হবে।

أَجِبُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ : মহামারী ﷺ হলেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব। সুতরাং বেহেশতের ঐ সম্মানিত স্থানটি একমাত্র তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এতদসত্ত্বেও তিনি কেন উক্ত স্থানটি পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন? এর উত্তর এই যে, রাসূল ﷺ এত বড় সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও নিজের বিনয়ী ভাব ও নম্রতা প্রকাশার্থে এরূপ আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন।

وَعَنْ ٦٠٧ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا

৬০৭. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যখন মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার তখন তোমাদের কেউ বলে, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। অতঃপর যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেও বলে, আশহাদু আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আবার যখন

رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى عَلَيَّ الصَّلٰوةَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى عَلَيَّ الْفَلَاحَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুন্নাহ্, সেও বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুন্নাহ্। এরপর যখন মুয়াজ্জিন বলে, হাইয়্যা আলাস সালাহ, সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। পুনঃ যখন মুয়াজ্জিন বলে, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, পরে যখন মুয়াজ্জিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেও বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একান্ত অন্তর হতে, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আজানের জবাব দানের বিধান : মুয়াজ্জিনের আযানের জবাব দু'প্রকার। যথা- (১) **قَوْلِي** তথা মৌখিক উত্তর। (২) **فِعْلِي** তথা কর্মের মাধ্যমে উত্তর প্রদান।

১. **قَوْلِي** উত্তর দেওয়া মোস্তাহাব। **قَوْلِي** উত্তর প্রদানের পদ্ধতি হচ্ছে, মুয়াজ্জিন যা উচ্চারণ করে থাকে ঠিক তা-ই বলা। শুধুমাত্র **عَلَيَّْ الصَّلٰوةَ** ও **عَلَيَّْ الْفَلَاحَ** -এর সময় বলবে **اِلَّا بِاللّٰهِ**। এমনিভাবে আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া হচ্ছে মোস্তাহাব।

২. **فِعْلِي** তথা কর্মের মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার অর্থ হলো, আযান হওয়ার সাথে সাথে পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া তথা মসজিদের উদ্দেশ্যে গমন করা। আর আযানের এ **فِعْلِي** জবাব দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, জামাতের জন্য আযান সুন্নাতে মুয়াজ্জিদা, কিন্তু আযানের জবাব দেওয়া কারও কারও মতে, ওয়াজিব। তবে যদি কোনো বাধা থাকে তখন তাদের মতেও ওয়াজিব নয়। যেমন- খাওয়া-নাওয়ায় রত থাকলে, সঙ্গমে লিপ্ত থাকলে, প্রস্রাব-পায়খানায় থাকলে অথবা নামাজ অবস্থায় থাকলে আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়।

دَخَلَ الْجَنَّةَ এর অর্থ : রাসূলে কারীম **ﷺ** বলেছেন, যদি কেউ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আযানের জবাব দেয়, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এখানে **دَخَلَ الْجَنَّةَ** বাবা দ্বারা অতীতকাল বুঝা গেলেও মূলতঃ অর্থ হবে, ভবিষ্যৎকাল। অর্থাৎ নিশ্চিত সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

১. আত্মা না নব্বী এ ব্যাকের অর্থে বলেছেন, আযানের জবাব দানকারী অন্যান্য নাজাতপ্রাপ্ত মু'মিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
২. অথবা অন্যান্য গুনাহের শাস্তি ভোগের পর হলেও এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের হকদার হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে শাস্তি ভোগ করার পর সব মু'মিনই তো জান্নাতে যাবে। সুতরাং আযানের জবাব দানকারীকে নির্দিষ্ট করার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এর উত্তরে বলা হয় যে, মু'মিনদের বেহেশতে প্রবেশের অন্যান্য গুণের মধ্যে এটাও অন্যতম বিশেষ গুণ।

৩. অথবা বেহেশতে প্রবেশের জন্য অন্য কোনো বাধা না থাকলে শুধু এই আমল দ্বারাই প্রবেশ করতে পারবে।

৪. অথবা এমন ব্যক্তি নির্দিষ্ট জান্নাতেই প্রবেশ করবে, তখন **اَلْجَنَّةُ** -এর আলিফ-লাম হবে- **عَهْدَ حَارِجِي** -

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, 'লা-হাওলা' বাবা তো কোনো অপ্রিয় ও শরিয়ত বিরোধী ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাতাইন' বাবা তো অতি প্রিয় কাজের প্রতি আহ্বান করেন। এখানে 'লা-হাওলা' বলার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এর জবাব এই যে, 'লা-হাওলা' বাবা যেমন অপ্রিয় ও শরিয়ত বিরোধী ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে প্রিয় ও শরিয়ত সম্মত ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাক্যটির কিছু অংশ উহা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি হবে, **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِلَّا بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَيَّ طَاعَةَ اللّٰهِ اِلَّا بِعِزَّةِ اللّٰهِ** অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা রক্ষা না করলে ওনাই হতে বিচার কোনো উপায় নেই। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্যের উপর টিকে থাকার কোনো শক্তি নেই।

وَعَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الدَّعَاءَ اللَّهُمَّ
 رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أْتِ
 مُحَمَّدَ النَّوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا
 مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৬০৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— আযান শুনে
 যে ব্যক্তি বলে— অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ
 আস্থান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের তুমিই প্রভু! তুমি
 মুহাম্মদ ﷺ কে অসিলা ও মর্যাদা দান করো এবং
 তাঁকে ‘মাকামে মাহমুদে পৌছাও যার জন্য তুমি
 প্রতিশ্রুতি দিয়েছ” কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার
 সুপারিশ ওয়াজিব হবে। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে আযানকে দাওয়াতে তামাহ তথা পূর্ণাঙ্গ আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে।
 কেননা, আযানে ঘোষিত বাক্যগুলো; আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর ইবাদতের জন্য আকুল আবেদন। এ দাওয়াতে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ
 পরিণত ; কেননা, এটা সমুদয় শিরক ও বিদ'আত উৎখাত করে। এ দাওয়াতে কোনো প্রকার পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না।
 এটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকবে।

الصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ -এর অর্থ : আযান দিয়ে যে নামাজের দিকে মুসলমানদের আহ্বান করা হয়, তা চিরদিন স্থায়ী থাকবে।
 কোনো জাতি বা শরিয়ত এটা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে না। যতদিন এ বিশ্বলোক স্থায়ী থাকবে, ততদিন নামাজ স্থায়ী
 থাকবে। এ জন্যই একে স্থায়ী ও চিরন্তন নামাজ বলা হয়েছে।

الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ কি? ‘মাকামে মাহমুদ’ কোনো বিশেষ স্থানের নাম নয়, বরং যেখানেই আল্লাহর প্রশংসা (হামদ) করা হয়
 এবং যা-ই অতীব সম্মানজনক স্থান, তাই এ নামে অভিহিত হতে পারে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, ‘মাকামে মাহমুদ’ বলে শাফায়াত করার অধিকার বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তিনি
 এক অতীব প্রশংসনীয় স্থানে উপবেশন করে তাঁর উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। সে স্থানেরই হয়তো অপর নাম
 ‘আল-ওয়াসীলা’ কিংবা ‘আল-ফাদীলা’।

সাধারণত আযানের পর যে দোয়া পড়া হয়, এতে আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দোয়া হতে দু'টি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। একটি
 হলো الرَّغِيْبَةُ -এর পর الدَّرَجَةُ الرَّيْبِيَّةُ আর দ্বিতীয়টি হলো দোয়ার শেষাংশে اِنَّكَ لَا تُغْلِبُ النَّبِيَّاءَ
 এ সম্পর্কে হাদীসবিদদের অভিমত হলো, প্রথম শব্দদ্বয় হাদীসের কোনো বর্ণনায়ই উদ্ধৃত হয়নি। ইমাম সাখাবী (র.) বলেছেন,
 اِنَّكَ لَا تُغْلِبُ النَّبِيَّاءَ হাদীসের কোনো একটি বর্ণনায়ও আমি এটা দেখতে পাইনি।

আর দ্বিতীয় বৃদ্ধিটি বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে। সুতরাং এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي -এর অর্থ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলার প্রার্থনা করে, তার ‘খাতেমা বিল খায়ের’ অর্থাৎ
 ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। আশা করা যায়, সে ঈমানের উপর বহাল থেকেই মারা যাবে। আর দয়াল নবী মানবতার মুক্তির
 দিশারী পানী মু'মিনদের জন্য নাজাতের সুপারিশ করবেন, এটা তাঁর ওয়াদা। তাই তিনি বলেছেন, আমার জন্য সুপারিশ
 ওয়াজিব হবে।

وَعَنْ أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَالْأَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ الْفِطْرَةَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَجْتِ مِنَ النَّارِ فَانظُرُوا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْرَى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোনো যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতেন যখন উষার আবির্ভাব হতো এবং আযান শোনার জন্য কান পেতে রাখতেন। যখন আযানের ধ্বনি শুনতে পেতেন, তখন আক্রমণ বন্ধ রাখতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন। একদা তিনি এক ব্যক্তিকে 'আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার' বলতে শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সত্য ধর্মে আছ! অতঃপর সে বলল, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি দোজখ হতে বের হয়ে গেলে' [অর্থাৎ রেহাই পাবে]। অতঃপর তারা [সাহাবীগণ] তাঁর প্রতি দেখলেন যে, সে একজন ছাগলের রাখাল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِطْرَةٌ -এর অর্থ ও তার দ্বারা উদ্দেশ্য :

فِطْرَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ : فِطْرٌ শব্দটি فِطْرٌ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১. ছিড়ে ফেলা : যেমন, কুরআনের বাণী - إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ -
২. স্নাত, রীতি। যেমন, বলা হয় - فِطْرَةَ الْآبِيَاءِ -
৩. স্বভাব। যেমন, কুরআনের বাণী - فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا -
৪. উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা। যেমন, আল্লাহর বাণী - فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

فِطْرٌ -এর পারিভাষিক অর্থ :

১. আল্লামাতা তীবী, কুরতুবী, তুরপুশতী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেন, فِطْرَةٌ হলো, দীন বা সত্য কবুল করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা যা আল্লাহ তা'আলা, মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই সংস্থাপন করেছেন।
২. কারো কারো মতে, হাদীসে বর্ণিত فِطْرَةٌ হলো সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি, যা প্রভুর أَنْتَ بِرَبِّكَمُ শ্রেণীর উত্তরে সকল মানুষ بَلَى বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
৩. অথবা فِطْرَةٌ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো, সঠিক বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিশু সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিসহ জন্মগ্রহণ করে।
৪. কেউ কেউ বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মানব সন্তানের প্রাথমিক অবস্থাকে فِطْرَةٌ বলে।
৫. কেউ কেউ বলেন, الْطَّبِيعَةُ السَّلِيمَةُ لَمْ تَتَّيَّبْ بِمَتِّبٍ অর্থাৎ, খোদাপ্রদত্ত কদম্বহীন সুস্থ প্রজ্ঞা ও মেধা-ই হলো فِطْرَةٌ

হাদীসে উল্লিখিত فِطْرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে فِطْرَةٌ দ্বারা প্রথম অভিমতটিই তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কথাই বুঝানো হয়েছে। তবে রাসূল ﷺ -এর বক্তব্য অনুযায়ী এখানের فِطْرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য দীন বা ইসলাম। فِطْرَةٌ -এর অর্থ : 'তুমি দোজখ হতে বেঁচে গেলে' এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি শাহাদাতাইনের অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে বদ-আমলের দরুন প্রথমে দোজখে গেলেও শান্তি শেষ হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোটকথা, সে হামেশার জন্য দোজখে থাকবে না।

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬১০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াস্বাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুযাজ্জিনের আযান শুনে বলে- অর্থ- 'আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক প্রভু হিসাবে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি' তবে তার গুনাহ মার্ফ করা হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : আযানের পর দোয়া পূর্ব করা অতি ছুওয়াবের কাজ। সাধারণত যে দোয়াটি প্রচলিত আছে তা ৬০৮ নং হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত দোয়ার পর উল্লিখিত হাদীসে উদ্ধৃত দোয়াটি পড়ার ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ পরোক্ষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম বায়হাকী বর্ণিত একটি হাদীসে দোয়াটি নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে যে,

رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيًّا وَالْقُرْآنَ آيَاتًا وَالْكَعْبَةَ قِبْلَةً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ شَهَادَتِي فِيهِ فَيَنْ عَلَيَّ وَأَشْهَدُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ الْمَقْرَبِينَ وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَأَخْتِمَ عَلَيْهَا بِأَيْمَانٍ وَأَجْعَلَ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تَرْفُئُهُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে [অর্থাৎ আযান ও একামতের মধ্যে] নামাজ রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে নামাজ রয়েছে। অতঃপর তৃতীয় বারে বলেছেন, যে পড়তে চায় তার জন্য। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : একামত ও আযানের অনুরূপ। আযান দ্বারা নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একামতের দ্বারা নামাজ শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়। কাজেই একটার প্রাধান্যের ভিত্তিতে উভয়টিকে আযান বলা হয়েছে, এরূপ বলার প্রচলন আরবদের মধ্যে রয়েছে। যেমন তারা বলে থাকে الْقَمَرَيْنِ তথা চন্দ্র ও সূর্য بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করার পিছনে রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো, আযান ও একামতের মাঝখানে নামাজ পড়ার প্রতি উত্থানেরকে উৎসাহ প্রদান করা। অবশ্য এ নামাজ ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। রাসূল ﷺ-এর উক্তি বাক্য দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মাগরিব ব্যতীত অন্যায় নামাজে আযান ও একামতের মাঝখানে পুনতে মুযাজ্জিন ও পুনতে যাদেনা ইত্যাদি নামাজ আছে, কিন্তু মাগরিবের নামাজের আযান ও একামতের মাঝখানে কোনো নামাজ পড়া যাবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

مَذْعَبَ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَهْلَ الْعِدْبِثِ : ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আসহাবে হাদীসের মতে মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকাত পড়া মোস্তাহাব। দলিল হিসাবে ইবনুল মুগাফফালের হাদীস পেশ করা হয়েছে যে, أَنَّهُ قَالَ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ . হযরত ইবনে হিব্বান সহীহাইনের হাদীসের উপর বৃদ্ধি করেছেন—

أَنَّ (ع) صَلَّاهَا أَي صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত প্রমাণিত নয়, যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—

١. مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاسْتَأْذَنَ صَاحِبُ وَعَيْنَ الْخَلْفَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَجَمَاعِيهِمْ كَانُوا لَا يَصَلُّونَهُمَا حَتَّى تَهْلِي عَنْهُمَا إِبْرَاهِيمُ السَّخَعِيُّ فَيَسَاءُ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ تَهَى عَنْهُمَا وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمْ يَكُونُوا يَصَلُّونَهَا .

٢. عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عِنْدَ كُلِّ آذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ .

٣. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ إِلَّا الْمَغْرِبَ .

৪. তদুপর এর দ্বারা মাগরিবের নামাজে দেরি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, অথচ মাগরিব নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার প্রতি পরোক্ষ নির্দেশ রয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي يَخَيْرُ مَا لَمْ يُؤَخَّرِ الْمَغْرِبُ إِلَى اسْتِحْبَابِكَ التَّجْرِمِ-

প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর :

১. প্রতিপক্ষ ইবনুল মুগাফফাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করছেন তার উত্তর এই যে, যেহেতু রাসূল ﷺ খুলাফায় রাশেদা ও বহু সংখ্যক সাহাবী হতে না পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই বَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ -এর ন্যায় অস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ প্রমাণিত হবে না।

২. ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল ﷺ মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন, তা নাফল নামাজ ছিল না; বরং তা ছিল অনাদায়ী নামাজের কায। তাবারানী শরীফে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) قَالَ سَأَلْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ رَأَيْتُنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْنَ لَا غَيْرَ أَمْ سَأَلْتَهُنَّ فَأَلْتِ صَلَّاهَا عِنْدِي مَرَّةً فَسَأَلْتُهُ مَا هِيَ الصَّلَاةُ فَقَالَتْ (ع) تَسْبِطُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْتُهُمَا أَوْ .

الدِّفْعُ الثَّانِي : دِثِيَّيْ أَنْوَحْدَه

عَنْ ١١٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِمَامُ ضَامِرٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمِنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْإِمَامَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَدِّنِينَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَفِي أُخْرَى لَهُ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ)

৬১২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— ইমাম হলেন দায়িত্বশীল, আর মুয়াজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামদেরকে সঠিক পথে চালাও এবং মুয়াজ্জিনদেরকে ক্ষমা করে দাও। [আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অপর এক রেওয়াজেতে মাসাবীহে সংকলিত শব্দাবলি সহকারে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -এর বিশেষণ এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনের মাঝে উত্তম কে? আলোচ্য হাদীসে ضَامِرٌ বাক্যে মুতামিন ও মুতামিন -এর অর্থ জরিমানা নয়; বরং এখানে অর্থ— হেফাজত ও সংরক্ষণ। কেননা, ইমাম মুক্তাদিগণের

নামাজের অর্থাৎ, তাদের কেবল, রাকাতের সংখ্যার কফিল। আর মুক্তাদী ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে তখন ইমাম মুক্তাদির কেয়ামের দায়িত্বশীল। তাই ইমাম হলেন জামিন।

আর মুয়াজ্জিন **مُؤْتَمِرٌ** বা আমানতদার হওয়ার অর্থ হলো মানুষ মুয়াজ্জিনের আযানের আওয়াজের উপরই নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে এবং অন্যান্য ওয়াক্তিয়া দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্ভর করে থাকে।

অত্যাশা আশরাফ বলেছেন, উক্ত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, আযানের মর্যাদা ইমামতের চেয়ে অধিক। কেননা হাদীসে এসেছে **إِشَادَةُ الْمُؤْتَمِرِ وَالْمُؤْتَمِرِ مُؤْتَمِرٌ** আর **صَامِرٌ** -এর তুলনায় **إِشَادَةُ** উত্তম।

তবে সর্বসম্মত অভিমত এই যে, ইমামতের মর্যাদা অধিক। কেননা, মুয়াজ্জিন শুধু নামাজের ওয়াক্তের জিম্মাদার। আর ইমাম নামাজের সকল রুকনের জিম্মাদার এবং ইমাম মুক্তাদিগণ ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে দোয়ার দূতালি করে থাকেন। তা ছাড়া ইমাম, নবী করীম **ﷺ** -এর খলিফা। আর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.) -এর খলিফা।

এতদ্ব্যতীত হাদীসে আছে, রাসূলে করীম **ﷺ** বলেন, **(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)**, **اللَّهُمَّ ارْزُقِ الْاَئِمَّةَ وَارْزُقِ الْمُؤْتَمِرِينَ** -এর শব্দ রয়েছে। আর **ارْشَادٌ** এটা **الْمُتَّقِلُوبِ إِلَى الْمُتَّقِلُوبِ** -কে বলে, যা নিশ্চিতভাবে উচ্চ মর্যাদার বিষয়। আর মুয়াজ্জিনদের জন্য **مَغْفِرَةٌ** -এর দোয়া বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে, মাগফিরাত পাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **لَانَ الْمُغْفِرَانَ مَسْبُورٌ بِالذُّنُوبِ**।

وَمِنْ اٰخَرَىٰ لَهُ يَلْفُظُ النَّصَابِيعِ দ্বারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অপর এক বর্ণনায় হাদীসটি মাসদাবীহে উল্লিখিত শব্দবলি সহকারে সংকলিত হয়েছে। আর তা হল-

اٰئِمَّتُهُمْ سُنَّةٌ وَالْمُؤْتَمِرُونَ اُنْتَاهُ فَاَرْزُقِ اللّٰهُ الْاَئِمَّةَ وَارْغِفِرْ لِلْمُؤْتَمِرِينَ।

وَعَنْ ۱۱۳
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ **مَنْ اَذِنَ سَبَعَ سِنِيْنَ**
مُعْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ .
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র ছওয়াবের উদ্দেশ্যেই সাত বছর আযান দেয়, তার জন্য দোজখের আগুন হতে মুক্তি নির্ধারিত।
-[তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَعَ سِنِيْنَ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে **سَبَعَ سِنِيْنَ** বা সাত বছর দ্বারা নির্ধারিত সাত বছর উদ্দেশ্য নয়, বরং বেশির নিম্ন সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, তথা যে ব্যক্তি কমপক্ষে সাত বছর আযান দেয়। আর **مُعْتَسِبًا** -এর অর্থ হলো কোনো প্রকার লৌকিকতা প্রদর্শন বা পার্থিব স্বার্থ-হাসিল ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা।

وَعَنْ ۱۱۴
قَالَ قَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ **يُعْجِبُ رَسُوْلَكَ مَنِ**
رَاعَىٰ عَنِيْمٍ فِى رَاسِ سَطِيْبَةٍ لِلْجَبَلِ يُوْدِنُ
بِالْقَلْبِ وَيُصَلِّيْ قَبْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
اَنْظُرُوْا اِلَىٰ عَبِيْدِيْ هَذَا يُوْدِنُ وَيُقِيْمُ
الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِثِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبِيْدِيْ
وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ . **(رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَ التَّسَاتُرِ)**

৬১৪. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন, তোমার প্রভু সেই ছাগল-ভেড়ার রাখালের উপর সন্তুষ্ট হন, যে পাহাড়ের চূড়ায় ছাগল-ভেড়া চরায়; নামাজের [সময় মতো] আযান দেয় এবং নামাজ পড়ে। তখন পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহ [ফেরেশতাদেরকে] বলেন, আমার এই বান্দার প্রতি দেখ! সে আযান দেয় এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, আর আমাকে ভয় করে [তোমরা সাক্ষী থাক] আমি আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُؤْتُونَ بِالصَّلَاةِ وَصَلَّى -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে 'সে আযান দেয় এবং নামাজ পড়ে।' এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, রাখাল ছিল এক। সে কেন আযান দিল। আযান তো দেওয়া হয় জামাতের জন্য। ইবনুল মালিক এর উত্তরে বলেন যে, একাঙ্গী ব্যক্তির আযান দেওয়ার মধ্যে উপকারিতা হলো ফেরেশতা ও জিন জাতিকে নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার খবর দেওয়া। কেননা তাদের জন্য নামাজ রয়েছে। এখানে একামতের কথা উল্লেখ করা হয়নি এ জন্য যে, একামত দেওয়া হই উপস্থিত জনতাকে নামাজ আরম্ভের প্রতি সতর্ক করার জন্য। আর যেহেতু ঐ ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়ার মতো কেউ ছিল না, তাই নামাজ আরম্ভ করার প্রতি সতর্ক করার জন্য একামত দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এটা মাযহাব পরিপন্থি কথা। কেননা, একাঙ্গী নামাজ পালনকারীর জন্যও আজান ও ইকামত উভয়টি দেওয়া উত্তম। তাই এখানে এরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত যে, আযান দ্বারা এখানে ব্যাপক অর্থে জানান দেওয়া ও অবহিত করা উদ্দেশ্য। অতএব এ বিবেচনায় আযানের মধ্যে একামতও शामिल। অথবা একামতের কথা উহা রয়েছে। সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে একামতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তী বাক্যে উল্লিখিত **بِنِمْ** শব্দটি এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে।

وَعَنْ ۱۱۵
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانَ النَّسِكِ
يَوْمَ الْقَيْمَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى
وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ
وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

৬১৫. অনুবাদ : হযরত ইবন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কল্পুরীর ত্বুপের উপরে থাকবে। এক : ঐ ক্রীত দাস যে আল্লাহ তা'আলার হুক এবং তার প্রভুর হুক আদায় করেছে। দুই. ঐ ব্যক্তি যিনি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করেন, আর তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তিন. ঐ ব্যক্তি যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রত্যেক দিনে ও রাতে আজান দেন। -[তিরমিযী। তিনি বলেন, এটা গরীব হাদীস]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে তিন ব্যক্তির পরকালীন সফলতার কথা ঘোষিত হয়েছে-

এক : যে আল্লাহর বান্দা একই সময় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর হুক আদায় করে এবং একই সাথে তিনি পার্থিব জগতে যার অধীনে কোনো কাজে নিয়োজিত তার কাজেও বিদ্যুতক্রম ফাঁকি না দিয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

দুই : যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করেন, আর সে সম্প্রদায়ের জনগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এখানে শুধু নামাজের ইমামতি উদ্দেশ্য নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইমামতিও এর মধ্যে शामिल অর্থাৎ যিনি সমাজের নেতৃত্ব দান করেন এবং জনসাধারণের জন্য ন্যায্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেন।

তিন : যিনি দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য আযান দেন। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুযাজ্জিন আমানতদার। নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী আযান দেওয়ার দায়িত্ব মুযাজ্জিনের উপর অর্পিত। কেননা, অনেক মানুষ নামাজে শরিক হওয়ার ব্যাপারে মুযাজ্জিনের উপর নির্ভরশীল থাকে। মুযাজ্জিন আযান দিলেই তারা নামাজের জামাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَوْذَنُ يُغْفِرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَسْهَدُ لَهُ كُلَّ رَطْبٍ وَيَأْسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيَكْفَرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ كُلَّ رَطْبٍ وَيَأْسٍ وَقَالَ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى .

৬১৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মুয়াজ্জিনকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার স্বরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং তার জন্য প্রতিটি সজীব ও নির্জীব সাক্ষ্য দান করবে। আর [আযান শুনে] যে নামাজে উপস্থিত হয় তার জন্য এক নামাজে পঁচিশ নামাজের ছওয়াব লেখা হবে এবং তার উভয় নামাজের মধ্যকার [সগীরা] ওনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। [আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

কিন্তু নাসাই 'প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, 'তার জন্য রয়েছে যারা নামাজ পড়েছে তাদের সমান ছওয়াব।'

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

المَوْذَنُ يُغْفِرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ -এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুয়াজ্জিনকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার স্বরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।' মহানবী ﷺ-এর উক্তিটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে-

১. মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত পৌছবে তার পাপ ততদূর স্থান পূর্ণ করলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
২. অথবা যে প্রান্ত পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি পৌছবে সেই প্রান্তে বসে যদি সে কোনো অপরাধ করে থাকে তবে তাও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
৩. অথবা মুয়াজ্জিনের আযান-ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত পৌছবে তত দূরের মধ্যে যত লোক বসবাস করবে মুয়াজ্জিনের সুপারিশে তাদের সকলের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
৪. অথবা ততদূর স্থানের ঐসব শ্রোতাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যারা তার আযান শুনে জামাতে শরিক হয়।
৫. অথবা يُغْفِرُ অর্থ- يَسْتَعْفِرُ অর্থাৎ সব কিছু মুয়াজ্জিনের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবে।
৬. অথবা অর্থ এই যে, মুয়াজ্জিন যখন আযানের ধ্বনিকে নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছাতে চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ ও তার জন্য ক্ষমার শেষ সীমা নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ তাঁকে পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমা করে দেন।

وَعَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَأَتَّخِذْ مَوْذَنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৬১৭. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক আছে! তুমি তাদের ইমাম, তবে তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির অনুসরণ করো [অর্থাৎ, দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো] এমন একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করো যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেবে না।-[আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাই]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَسْتَعْفِرُ -এর আলোচ্য হাদীস হতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, আর তা হলো,

১. মুক্তাদিদের মধ্যে কেউ দুর্বল বা সমসাম্প্রদ্য থাকলে ইমামের উচিত তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। যথাসম্ভব নামাজ সংশ্লিষ্টকারে পড়া।
২. আযানের ন্যায় ইমামতির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই উত্তম।

আযান ও অন্য সব দীনি কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদ : আযান ও অন্য সব দীনি কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ কি না এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ : ইমাম শাফেয়ী আহমদ মালিকের মতে আযান ইত্যাদি দীনি কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ ।

ইবনুল আরাবী বলেন, আযান, নামাজ, বিচার-ফয়সালা, কুরআন শিক্ষা দান এবং অন্যান্য দীনি কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ, এটাই সঠিক অভিমত । তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন করেন—

১. মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ উক্ত কাজের বিনিময়-পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন । সুতরাং তাদের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও এটা বৈধ হবে ।
২. মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন— وَمَوَدَّةَ عَامِلِي قَوْمٍ صَدَقَ . আর মুয়াজ্জিন ও কর্মচারীর ন্যায়, সুতরাং তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে ।
৩. হযরত আবু মাহযুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَاتَمَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْإِذَانَ فَادَّتْهُمُ اعْطَايَنِ حِينَ قَضَيْتَ التَّائِيْمَ مَرَّةً فِيهَا شَرٌّ مِنْ قَيْصَةَ . (تَسَانِي)

এখানে আযানের উপর বিনিময় দেওয়া সাব্যস্ত হলো, তা ছাড়া সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুক করার হাদীস দ্বারাও বিনিময়ের পক্ষে দলিল দেওয়া হয় । অর্থাৎ সূরায় ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুক করার পর যে বিনিময় নেয়া হয়েছে, তার উপর হুজুরের পক্ষ হতে কোনো বিরোধিতা হয়নি ।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ : তবে ইমাম আযম ও তাঁর প্রবীণ শিষ্যদের মতে আযান, একামত, তালীমে কুরআন ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণ হালাল হবে না । তাঁদের দলিল— হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস—

إِنَّهُ (ع) قَالَ وَأَحْمَدُ مَوْذُبًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِي وَأَحْمَدُ)

তা ছাড়া আযান, একামত, ইয়ামত ও তালীমে কুরআন ইত্যাদির ব্যাপারে বিনিময় গ্রহণ লোকদেরকে এ সকল দীনি ব্যাপার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয় لِأَنَّ الْجَارِ سَتَعْتَهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

আর এ কথাই আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন : وَمِنْ مَقْرَمٍ مَتَقَلَّبُوا . সুতরাং বিনিময় নেওয়ার কারণে লোকজন দীনি বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— وَمَا تَسْتَلْهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَى مَا تَسْتَلْهُمُ عَلَى الْجَلْبِيعِ أَجْرًا . (تَسَانِي) নিজে করুন বা অন্যকে হুকুম দিয়ে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেওয়া হোক । যেমন— فَيَلْبِغُ السَّامِرَ . সুতরাং হযুর ﷺ নিজে তাবলীগ করলে যেমন বিনিময় গ্রহণ জায়েজ নয়, তদ্রূপ হযুরের নির্দেশে যে তাবলীগ করে তার জন্যও বিনিময় গ্রহণ জায়েজ হবে না । لِأَنَّ ذَلِكَ تَلْبِيعُ النَّبِيِّ ﷺ . (تَسَانِي) তদ্রূপ হযরত ইবনে হিব্বান ইয়াহইয়া হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে,

أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ قَالَ لِبَنِ عُمَرَ إِنَّ لَاحِبِيكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لَاحِبِيكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أُمَيْكَ فِي اللَّهِ وَتَبِعِيَّتِي فِي اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَمَّ أَنْتَ تَسْتَلُّ عَلَى أَذَانِكَ أَجْرًا حَكَاهُ الشُّوْكَانِيُّ فِي التَّيْلِ .

আহনাফের পক্ষ হতে তিন ইমামের দলিলের উত্তর :

১. অযিহাযে ছালাহা তাদের প্রথম দলিলে বলেছেন যে, খালীফাতুল মুসলিমীনা আযান ও একামতের বিনিময় গ্রহণ করতেন । এর উত্তর এই যে, তারা রাষ্ট্রীয় এত্তেজাম ও হেফাজতের বিনিময় গ্রহণ করতেন, ইয়ামত ও ইকামতের বিনিময় নয় ।
২. আর দ্বিতীয় দলিলের উত্তর এই যে, মুয়াজ্জিন ইত্যাদিকে عَامِلٌ -এর উপর কিয়াস করা হয়েছে এই কিয়াস ঐ نَسْرُ -এর প্রতিদন্দ্বী যা হানাফীাদের দলিলে বর্ণিত হয়েছে ।
৩. তৃতীয় দলিলে হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-এর যেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা ছিল । আর হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস-এর পরে মুসলমান হয়েছেন । সুতরাং ওসমান ইবনে আবুল আসের হাদীস দ্বারা সে হাদীস মানসনূহ হয়ে গেছে । তা ছাড়া এ ঘটনার নানা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রয়েছে । তবে নিকটতম সম্ভাবনা এই যে, হযরত আবু মাহযুরা নও মুসলিম হওয়ার কারণে تَالِيْفٌ -এর ভিত্তিতে তাকে রৌপ্যের খলি দেওয়া হয়েছে ।

৪. আর চতুর্থ দলিলে সূরায়ে ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুক করার হাদীস নেওয়া হয়েছে। এর উত্তর এই যে, এতে চিকিৎসার ভিত্তিতে বিনিময় নেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, যা সর্বসম্মতভাবে জায়েজ আছে। এতে তালিম ইত্যাদির জন্য বিনিময় নেওয়া হয়নি। মুতাকাদ্দেমীন-এর মাযহাব এই যে, لَا يَجُوزُ اخْذُ الْاَجْرِ عَلَى الْأَمْرِ الْدِينِيِّ, বা নিশ্চিতরূপে সঠিক ও কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে মুতামাখখিরীন ইমামগণ যুগের অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য হয়ে ফতোয়া দিয়েছেন যে, বিনিময় নেওয়া জায়েজ।

كَمَا قَالَ فِي الْهَدَايَةِ وَعَصَفَ مَشَارِقَنَا اِبْتِغَاءً لِمَا نَحْتَجُّهُ الْاِسْتِجَارَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لِيُظْهِرَ الشَّرَائِ فِي الْأَمْرِ الْدِينِيِّ فَمِنِ الْاِمْتِنَاعِ تَضَيُّعُ حَفِظِ الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

সূত্রাং দীনি বিষয়ে অলসতা ও অমনোযোগ আসার কারণে বর্তমানে হানাফী আলিমগণ একেই বিশুদ্ধ অভিমত মুতামাখখিরীন ইমামগণ বিনিময় গ্রহণের বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন, বর্তমানে হানাফী আলিমগণ একেই বিশুদ্ধ অভিমত হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন।

وَعَنْ ٦١٨ أُمِّ سَلَمَةَ (رَض) قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ عِنْدَ آذَانِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَأَغْفِرْ لِي - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

৬১৮. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ কথাগুলো মাগরিবের আযানের সময় বলতে শিখিয়েছেন [অর্থাৎ], হে আল্লাহ! এটা তোমার রাতের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার আহ্বানকারীদের [মুয়াজ্জিনদের] ডাকার সময়। সূত্রাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। -[আবু দাউদ, বায়হাকী তাঁর দাওয়াতিল কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটি মাগরিবের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট, এটা আযানের জবাব দানের পরে অথবা জবাব দানের মধ্যেই পড়বে, কিংবা আযানের পূর্বমুহুর্তে পড়বে।

وَعَنْ ٦١٩ أَبِي أُمَامَةَ (رَض) أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كُنْخُو حَدِيثِ عَمْرِ فِي الْأَذَانِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬১৯. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা (রা.) অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বলেন, একদিন হযরত বেলাল (রা.) একামত দিতে লাগলেন। যখন তিনি 'কাদ কামাতিস সালাহ' বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'। অর্থ- আল্লাহ [নামাজকে] সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাকে চিরস্থায়ী করুন। আর অবশিষ্ট সমস্ত একামতে হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে আযানের জবাবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেরূপ বলেছেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَدْ قَامَتِ الْع -এর অর্থ : হাদীসে উল্লিখিত আলোচ্য বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন- قَامَتِ الْع بِلَالًا ব্যতীত অন্যান্য বাক্যগুলো একামতের ন্যায়। অথবা নামাজের একামত ব্যতীত অন্যান্য একামতে অথবা একামত উচ্চারণকারী যেভাবে একামত বলেছেন অনুরূপই বলেছেন। তবে হাইয়া আলাখয়ের সময় বলেছেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।' অর্থাৎ আমানের জবাবে যেরূপে বলেছেন একামতের জবাবেও তদ্রূপই বলেছেন।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৬২০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া [আল্লাহর দরবার হতে] ফেরত দেওয়া হয় না।—[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে—

১. আযানের শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া, এমনিভাবে একামতের শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আল্লাহর দরবার হতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।
২. অথবা আযানের শুরু হতে একামত শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। এ শেখোক্ত অর্থটি গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُثْنَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَمًا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْبِتْدَاءِ وَعِنْدَ الْبَاسِ حِينَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِي رِوَايَةٍ وَتَحْتَ الْمَطَرِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَحْتَ الْمَطَرِ

৬২১. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— দুই [সময়ের] দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, অথবা কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (এক) আযানের সময়কালের দোয়া এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালীন দোয়া যখন একে অপরকে নিধন করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে, বৃষ্টির নিচের দোয়া।—[আবু দাউদ, দারেমী]। কিন্তু দারেমী 'বৃষ্টির নিচের দোয়া' বাক্যাংশটি উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) এর মর্মার্থ : বৃষ্টি হলো আল্লাহ তা'আলার বড় রহমত। এটা মানব-দানব ও জীব জগতের প্রয়োজনেই আসমান হতে বর্ষিত হয়ে থাকে। এ সময়ে মহান আল্লাহর রহমত অব্যাহত থাকে, সুতরাং এ সময়ে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অব্যাহত রহমত হতে তা দান করে থাকেন।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضَلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬২২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মাহাত্ম্য লাভ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাঁরা যে রূপ বলে থাকেন তুমিও সে রূপ বলা এবং যখন শেষ করবে তখন প্রার্থনা করো - তোমাকেও দেওয়া হবে'।—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মুয়াজ্জিনদের মর্মাদা ও আযানের উত্তরদাতাদের মাহাত্ম্য শ্রান্তির বিষয় আলোচিত হয়েছে। তথা আযানে যে রকম ফজিলত অর্জিত হয়, তেমনি আযানের জবাবদাতার জন্যও তদ্রূপ মর্মাদা অর্জিত হয়।

الرَّوَيْتُ بِالسَّعِيدِ الْبَرْبَانِيَّ

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ; উপনাম আবু মুহাম্মদ অথবা আবু আব্দুর রহমান বা আবু নুসাইর, পিতার নাম আমর ইবনুল আস; মাতার নাম রাইতা বা রায়েতা বিনতুল মুনাবিহ। তাঁর ইসলাম পূর্ব নাম ছিল আস তথা অব্যাহ বা পাপী, ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল ﷺ তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ।
২. নসবনামা বা বংশ ধারা : তাঁর নসবনামা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হাশেম ইবনে মুয়াইদ ইবনে সাদ ইবনে সাহাম ইবনে আমর ইবনে হুছাইছ ইবনে কাব ইবনে লুয়াই ইবনে পালেব আল-কুরাশী অস-সাহমী। তাঁর বংশ কুরায়েশের একটি শাখা।
৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না, তবে তিনি তাঁর পিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা বয়সের দিক হতে তাঁর তুলনায় এগার অথবা বারো অথবা তেরো বৎসরের বড় ছিল। অপর এক বর্ণনা মতে, উভয়ের বয়সের মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পিতা কালিমা পড়েন।
৪. ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান : তিনি ইলমে হাদীস লেখে রাখার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন। তাই তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক।
৫. তাঁর বর্ণিত হাদীস : তাঁর থেকে বর্ণিত মুখস্থ হাদীসের সংখ্যা ৬০০। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৭ খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮ খানা এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ২০ খানা হাদীস তাঁর বর্ণনায় স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
৬. বিশেষ গুণ : তিনি একজন আবেদ, আলিম ও হাফেজে কুরআন ছিলেন। হযরত ইয়ালা ইবনে আতা তাঁর মা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর মা আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের জন্য সুরমা তৈরি করতেন। তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে, তিনি গভীর রাতে জাগতেন এবং বাতি নিভিয়ে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। এমনকি এ কান্নার কারণে তাঁর দু' চোখের পাতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।
৭. মৃত্যু : তাঁর মৃত্যুর তারিখ ও স্থান নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, তিনি ৬৩ হিজরির মিলহজ্জ মাসে ইন্তেকাল করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৭ হিজরি, এ ছয়টি অভিমতও পাওয়া যায়। এমনভাবে তাঁর মৃত্যুর স্থান নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তিনি মক্কায়, কারো মতে তায়েফে, কারো মতে মিসরে, আবার ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ جَابِرِ (رَضَا) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّيْدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّوَيْ وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مَيْلًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬২৩. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শয়তান যখন নামাজের ডাক [অর্থাৎ আযান] শুনে তখন 'রাওহা' পর্যন্ত [পালিয়ে] যায়। বর্ণনাকারী বলেন, রাওহা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শয়তান আযানের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, শয়তান যখন আযানের আওয়াজ শুনে তখন রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়, এখানে রাওহা পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

- শয়তান আযানের স্থান হতে অনেক দূর চলে যায়।
- অথবা মদীনা হতে রাওহার দূরত্ব পরিমাণ তথা ৩৬ মাইল ব্যবধানে চলে যায়।
- অথবা শয়তান প্রকৃতই রাওহা নামক স্থানে পালিয়ে যায়।

وَعَنْ ١٢٤ عَلَقَمَةَ بِنْتِ وَقَاصٍ (رض) قَالَ لَأَنْتِ لَعِنَتُ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَدَّنَ مُؤَدُّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ (رض) كَمَا قَالَ مُؤَدُّهُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَتَّى عَلَى الصَّلْوَةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৬২৪. অনুবাদ : হযরত আলকামা ইবনে ওয়াস্কা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট ছিলাম। যখন তাঁর মুয়াজ্জিন আযান দিতে লাগলেন, তখন তাঁর মুয়াজ্জিন যেরূপ বললেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও সেরূপ বলতে থাকেন। যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়া 'আলাস সালাহ' বললেন, তিনি 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বললেন। আর যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বললেন, তখন তিনি 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিহিল 'আলিয়্যাল আযীম' বললেন। এরপর মুয়াজ্জিন যা বললেন, তিনিও সেই বাক্যগুলো বললেন, অবশেষে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি।' -[আহমদ]

وَعَنْ ١٢٥ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يَسْأَلُنِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَغِيْبُنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৬২৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন হযরত বেলাল (রা.) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। হযরত বেলাল (রা.) যখন থামলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি দু' বিশ্বাসের সাথে এর মতো বলবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : আলেচা হাদীসে আযানের জবাবের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা আযানের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত এবং পরোক্ভাবে আখেরাতের স্বীকারোক্তি রয়েছে। আযানের মাধ্যমে মানুষকে পরম শ্রুটার সান্নিধ্যে আসার জন্য ডাকা হয়, মানুষ এ ডাকে সাড়া দিলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

وَعَنْ ١٢٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَدِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মুয়াজ্জিনের আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে শুনতেন, তখন তিনি বলতেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি-আমি আন্বাহর রাসূল। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ যখন মুয়াজ্জিনকে قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ বলতে শুনতেন, তখন তিনি বলতেন وَأَنَا وَأَنَا 'আর আমিও আমিও' আর অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। এখানে أَنَا পদটি দু'বার বলে দুই সাক্ষ্য বাক্যের দিকে ইশ্তিত করেছেন। অর্থাৎ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ অথবা তাকিদেবর জন্য أَنَا পদটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্বামা তীযী (রা.) বলেন, হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ নিজেও নিজের রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে বাধ্য ছিলেন। তবে তাঁর সাক্ষ্য দান পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি رَسُولُ اللَّهِ ﷺ বাক্য দ্বারা ই সাক্ষ্য দিয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, وَأَنَا وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ বাক্য দ্বারা ই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় মতটিই বিস্তৃত যার সমর্থন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

وَعَنْ ٦٢٧ ابْنِ عُمَرَ (رضاً) أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدَانَ عَشْرَةَ سَنَةٍ
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي
كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ
ثَلَاثُونَ حَسَنَةً - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬২৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি
বারো বছর যাবৎ আযান দেয়, বেহেশত তার জন্য
অবধারিত হয়ে যায়। আর তার জন্য তার আযানের
বিনিময়ে প্রত্যেক দিন [প্রত্যেক ওয়াক্ত] ষাট নেকী করে
এবং প্রত্যেক একামতে ত্রিশ নেকী করে লেখা হয়।
-ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٦٢٧ ابْنِ عُمَرَ (رضاً) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدَانَ عَشْرَةَ سَنَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) ৬২৭ ও তার সমাধান : পূর্বে এক হাদীসে সাত বৎসরের কথা বলা হয়েছে, আর উক্ত হাদীসে ১২ বৎসরের কথা এসেছে ফলে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তার সমাধান হলো-

১. প্রথমে ১২ বছরের ওহি এসেছিল, এরপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে তা কমিয়ে সাত বছর করে দিয়েছেন।
২. অথবা এটাও হতে পারে যে, সাত বছরে জান্নাত লাভের উপযোগী হবে। আর বারো বছর আযান দিলে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ষাট নেকী, আর প্রত্যেক একামতের জন্য ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হবে।
৩. অথবা, স্বল্প সংখ্যা অধিক সংখ্যার বিপরীত নয়।

وَعَنْ ٦٢٨ ابْنِ عُمَرَ (رضاً) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدَانَ عَشْرَةَ سَنَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাগরিবের আযানের সময় দোয়া করতে আদেশ করা হতো।
-[বায়হাকী-দাওয়াতে কবীর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٦٢٨ ابْنِ عُمَرَ (رضاً) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدَانَ عَشْرَةَ سَنَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) ৬২৮ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে আদেশকারী নিশ্চয়ই মহানবী ﷺ ছিলেন, আর মাগরিবের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তখন দিনের প্রস্থান ও রাতের আগমন সময় তথা আলো হতে আঁধারের প্রবেশের সময়, এটা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কুদরতের বহিঃ প্রকাশের সময়, তাই এ সময়ের দোয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

بَابُ فِيهِ فَضْلَانِ

পরিচ্ছেদ : আযান । এতে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَأَشْرِكُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يَقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬২৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- বেলাল রাত থাকতে আযান দেয়, সূতরাং তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেওয়া পর্যন্ত পানাহার করো। তিনি [ইবনে ওমর] বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম একজন অন্ধ লোক ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে বলা না হতো যে, ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সময়ের পূর্বে আযান দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : এ কথার উপর সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার আযান সময় আসার পূর্বে দেওয়া জায়েজ নয়; তবে ফজরের আযান সময়ের পূর্বে দেওয়া জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ أَيْمَةَ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, ইবনুল মুবারক, আওয়ামী, দাউদে জাহেরী ও ইবনে জারীর এবং ইমাম আবু ইউসুফের এক উক্তি অনুযায়ী ফজরের আযান সময় হওয়ার পূর্বে দেওয়া জায়েজ। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَأَشْرِكُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَغْرَنُكُمْ إِذَا نَ بِلَالٍ عَنِ السُّحُورِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ .

যখন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, হযরত বেলাল (রা.) রাতে আযান দিতেন। বস্তুত রাতে তো ইশার নামাজের পর কোনো জামাত নেই। সূতরাং সে আযান অবশ্যই ফজরের নামাজের জন্য সময় আসার পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আযম, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান ছাওরীর প্রমুখের মতে ফজরের আযানও সময় আসার পূর্বে দেওয়া জায়েজ নেই। যদি সময় আসার পূর্বে আযান দেওয়া হয়, তবে আযান পুনরায় দেওয়া আবশ্যিক হবে। সূতরাং হানাফীদের মতে সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া কোনো মতেই জায়েজ নয়।

দলিল হিসাবের হযরত শাদ্দাদ (রা.)-এর হাদীস পেশ করেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন-

۱. لَا تُؤَدِّنُ حَتَّى يَسْتَسِينَنَّ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

۲. إِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا بِلَالُ لَا تُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ - (بَيْهَقِيُّ)

۳. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَدَّنَ السُّؤْدُونَ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَصْبِحَ - (طحاوِيُّ)

১. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ . (ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)
২. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ يَلَلًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَامَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيُنَادِي إِلَّا أَنْ الْعَبْدَ نَامَ . (أَبُو دَاوُدَ . طَعَاوِيُّ . دَارُ قُطَيْبٍ)
৩. عَنْ أَبِي عُمَرَ (رض) أَنَّ يَلَلًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَامَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي إِلَّا أَنْ الْعَبْدَ قَدَ نَامَ . (أَبُو دَاوُدَ)
৪. كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ فِي حَالِ النَّوْمِ وَالْعَفْلَةِ وَكَانَ يَبْكِي وَيَطْرُقُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَقَوْلُ لَيْتَ يَلَلًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَغْتَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِتَاءَهُ كَمَا فِي الْعَيْنَايَةِ .
৫. كَمَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رِوَادٍ أَنَّهُ (ع) قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
৬. إِنَّ مُؤَدِّئًا لِعُمَرَ (رض) يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ أَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَامَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُنَادِي أَنْ الْعَبْدَ قَدَ نَامَ . (رِوَاةُ أَبِي دَاوُدَ)
৭. عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَمَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَدُّ لِمَلُوءَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

যুক্তিভিত্তিক দলিল :

- আযান অনুমোদিত হয়েছে সময় হওয়ার অবগতি প্রদানের জন্য, যেমন আযান শুরুর ইতিহাস হতে বুঝা যায়। অতএব সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়ার দ্বারা মিথ্যা অবগতি দেওয়া সাব্যস্ত হয়।
- আযানের উদ্দেশ্য হলো ঘোষণা দেওয়া। সুতরাং সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া দ্বারা অবগতির ঘোষণা অজ্ঞতায় রূপান্তরিত হবে।
- সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া দ্বারা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। কেননা, তখন ঘুমের সময়। বিশেষ করে ঐ সকল লোকের জন্য ক্ষতি, যারা প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য ইহা বিভ্রান্তির ব্যাপার হয়, যা মাকরুহ।
- হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি যখন সময়ের পূর্বে আযান শুনতেন তখন বলতেন, যদি এদেরকে হযরত ওমর (রা.) পেতেন তা হলে তাদেরকে শাস্তি দিতেন। **كَمَا رَأَى الْمَدَائِعِ**। হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদের দলিলে যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **إِنَّ يَلَلًا يُؤَدُّنَ يَلِيلًا**।
- এর উত্তর এই যে, হযরত বেলাল (রা.) রাতে যে আযান দিতেন তা যদি ফজরের জন্য হতো, তা হলে বিপক্ষীদের দাবি সঠিক হতো যে, সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হযরত বেলালের সে আযান ফজরের জন্য ছিল না; বরং তাঁর রাতের এই আযান ছিল সাহরীর জন্য। তিনি ঘুমন্তদেরকে সাহরীর জন্য জাগানোর উদ্দেশ্যে এ আযান দিতেন।

فَقَالَ الْعَيْنِيُّ إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ كَانَ لِرَبْعِ الْعَائِشَةِ وَإِنَّمَا ظَلَمَ النَّبِيُّ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَدَّ مِنْ أَذَانِ آخَرَ كَمَا فَعَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . كَمَا رَوَى أَنَّهُ (ع) قَالَ إِنَّ يَلَلًا يُنَادِي يَلِيلًا فَكَلِمًا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَصَبَّ يَذْلِكُ أَنْ مَا كَانَ مِنْ أَذَانَ يَلَلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَكُنْ لِمَلُوءَةِ الصُّبْحِ فِي الْعَيْنِيِّ .

- তা ছাড়া হযরত বেলাল (রা.)-এর আযানের উপর যথেষ্ট মনে করা হতো না; বরং সর্বদা সময়ের পরে আযান দেওয়া হতো। যেমন হাদীসে আছে- **يُقَالُ أَصْبَحَتْ أَصْبَحَتْ**। যদি সময়ের পূর্বের আযান যথেষ্ট হতো তা হলে কোনো না কোনো সময় একে যথেষ্ট মনে করা হতো।
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান জর্ভাবে বলেছেন, হযরত বেলাল (রা.) যে রাতে আযান দিতেন তা হজজানের সাহরী খাওয়ার জন্য ছিল। আর লোকেরা ফজরের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের আযানের উপর নির্ভর করতেন।

لَئِنَّهُ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ يَلَلًا إِنَّمَا يُؤَدُّنَ بِاللَّيْلِ لِسُحُورِ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ (ع) قَالَ لَا يَسْتَعْمَنُ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سُحُورِهِ أَذَانَ يَلَلٍ الْحَدِيثُ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رَمَضَانَ .

৪. ইমাম তাহাবী উত্তর দিয়েছেন, মূলত হযরত বেলাল (রা.) এ ধারণায় আযান দিতেন যে, সন্ধ্যাত ফজরের সময় হয়ে গেছে। কেননা, তাঁর দৃষ্টি শক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল।

كَسَأَ فِي رَوَابِعِ النَّسْرِ (رض) أَنَّهُ (ع) قَالَ لَا بُرْتُرُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ فَإِنَّ مِنْ بَصِيرَةٍ شَيْئًا.

অন্তএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জায়েজ নয়।

إِنَّ بِلَالَ بْنَ بَدَيْلٍ كُنَّا وَأَشْرَبْنَا حَتَّىٰ الْتَمَّارُصُ وَدَفَعَهُ وَأَنَّ أَمَّنَ أُمَّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِبَدَيْلٍ كُنَّا وَأَشْرَبْنَا حَتَّىٰ يُوَدُّونَ بِلَالَ. অর্থাৎ, হাদীসটিতে ইবনে উমে মাকতূমের আযান পর্যন্ত পানাহারের অনুমতির কথা রয়েছে: পক্ষান্তরে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, بِلَالٍ حَتَّىٰ يُوَدُّونَ بِلَالَ. হাদীসটিতে বেলালের আযান পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ প্রথমেই হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, বেলাল রাতে আযান দিতেন, আর শেষেই হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে উমে মাকতূম রাতে আযান দিতেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মুহাদ্দিসগণ উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নরূপ করেছেন—

- ইবনু আবদিল বার সহ কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন, بِلَالٍ حَتَّىٰ يُوَدُّونَ بِلَالَ বাকাটি মূলত পরিবর্তিত। কোনো বর্ণনাকারী বাকাটি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে ফেলেছেন।
- হতে পারে শেষ ঘণ্টা উভয়ের মধ্যে পালা বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল। কিছু দিন হযরত বেলাল (রা.) রাতে আযান দিতেন এবং ইবনে উমে মাকতূম সুবহে সাদেকের পরে আযান দিতেন। আর কিছুদিন ইবনে উমে মাকতূম রাতে আযান দিতেন এবং বেলাল সুবহে সাদেকের পরে আযান দিতেন। রাসূল ﷺ-এর উক্তি إِنْ بِلَالَ يُنَادِي بِبَدَيْلٍ سے সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যখন বেলালের পালা ছিল রাতে আযান দেওয়া এবং তাঁর উক্তি إِنْ بِلَالَ يُنَادِي بِبَدَيْلٍ سے সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যখন ইবনে উমে মাকতূম রাতে আযান দিতেন। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

وَعَنْ ۱۳ سَمْرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْتَنِعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلَ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْآخِرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ)

৬৩০. অনুবাদ : হযরত সামুয়াহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— 'তোমাদেরকে যেন বেলালের আযান এবং সুবহে কায়েব সাহরী খাওয়া হতে বিরত না করে, কিন্তু [বিরত করবে] দিগন্তে প্রসারিত উষা অর্থাৎ 'সুবহে সাদেক'।—[মুসলিম, হাদীসের উপরিউক্ত ভাষা তিরমিমী কর্তৃক বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلَ—এর অর্থ : ভোর রাতে প্রথমে যে আলোক রশ্মি ফসাঁ হয়ে উপরের দিকে উঠে এবং কিছুক্ষণ পরে আকাশে মিলে যায় তাকে 'সুবহে কায়েব' বলে। আর যে ফসাঁ উত্তর-দক্ষিণ দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে উঠে এবং না মিলে ধীরে ধীরে ভোর হয়ে যায় তাকে 'সুবহে সাদেক' বলে। সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার পূর্বেই 'সাহরী' খাওয়া বন্ধ করতে হয় এবং শুরু হলেই ফজরের আযানের সময় হয়।

وَعَنْ ۱۴ مَالِكِ بْنِ الْعُوَيْرِثِ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي فَقَالَ إِذَا سَأَلْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقْبِمَا وَلِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৬৩১. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, যখন তোমরা সফর কর, তখন [নামাজের সময় হলে] আযান দেবে এবং একামত বলবে এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।—[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَيُؤْمِنَنَّ كَبِيرُكُمْ -এর ব্যাখ্যা : আলোচা হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, যিনি বয়সে বড় তিনিই ইমামতের বেশি হকদার। অথচ অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যিনি অধিক কেবরাত সম্পন্ন তিনিই বেশি হকদার। ইমাম শাফেয়ী এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, যিনি অধিক জ্ঞানবিশিষ্ট, অর্থাৎ নামাজের যাবতীয় মাসায়েল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তিনিই অধিক হকদার। আর যদি এ উভয় গুণে ভূষিত একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ হয় তখন বয়সের তারতম্যে যিনি বড়, তিনিই অধিক হকদার। এ হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। সম্ভবত মালেক ও তাঁর চাচাত ভাই উভয়ই কেবরাত ও ইলমে সমমানের ছিলেন, তাই হযুর ﷺ বড়কে ইমামত করতে আদেশ দিয়েছেন।

وَعَنْ ١٣٢ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَأَذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ كَبِيرُكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৩২. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হযাইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ, তোমরাও তেমনভাবে নামাজ পড়। আর যখন নামাজের সময় হয় তখন তোমাদের কোনো একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামত করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ إِذْ رَسَّوَلُ اللَّهِ ﷺ جَمِينَ قَفَلٍ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكِرْبِيُّ عَرَّسَ وَقَالَ لِيَلَالٍ إِكْلَامًا لَنَا اللَّيْلُ فَصَلَّى بِلَالٍ مَا قَدَّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنْدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوجِّهًا الْفَجْرَ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَهُمْ اسْتَيْقَاطًا فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّ بِلَالٍ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا وَرَاحِلَتُهُمْ شَيْنًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَاقَامَ

৬৩৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধ হতে ফেরার সময় রাতে পথ চলছিলেন। অবশেষে তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তখন শেষ রাতে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং বেলালকে বললেন, আমাদের [নামাজের] জন্য রাতের প্রতি লক্ষ্য রেখো। অতঃপর বেলাল যতক্ষণ সম্ভব নামাজ পড়লেন। আর রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ফজর নিকটবর্তী হলো তখন বেলাল সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে উটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন। ফলে বেলালকে তার চক্ষুদ্বয় পরাভূত করল [অর্থাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন], অথচ তিনি তাঁর উটের গায়ে হেলান দিয়েই ছিলেন। অতঃপর সূর্য-কিরণ গায়ে এসে ঠেকা পর্যন্ত রাসূল ﷺ বা বেলাল (রা.) অথবা কোনো সাহাবী জাগরিত হতে পারেননি। তারপর রাসূল ﷺ-ই সর্বপ্রথম জাগরিত হলেন। তখন রাসূল ﷺ ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, ওহে বেলাল! [তোমার কি হলো?] বেলাল (রা.) বলেন, হজুর! আমাকে সে জিনিস পরাভূত করেছে যা আপনাকে পরাভূত করেছে। তিনি বললেন, সওয়ারি আগে নিয়ে চলে। তাঁরা তাঁদের উটসমূহ কিছু সামনে নিয়ে গেলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ অজু করলেন এবং বেলালকে [একামতের]

الصَّلَاةَ نَصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا
قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ
فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
قَالَ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আদেশ দিলে বেলাল (রা.) একামত দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের ফজরের নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে যায়, সে তা পড়ে নেবে, যখনই স্মরণ হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন **اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** অর্থাৎ আমার স্মরণে নামাজ কয়েম করো। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : সপ্তম হিজরি সনের মহররম মাসে খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। খায়বর মদীনা শরীফ হতে তিন মজিল দূরে অবস্থিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রাসূল ﷺ হৃদয়বিয়ার সন্ধি শেষে ফিরে এসে বিশ দিন মদীনা অবস্থান করে খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হন।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, খায়বর যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।

এ মতভেদের কারণ হলো, কতিপয় লোক হিজরি সনকে মহররম মাস হতে গণনা করেন। এ কারণে তাঁদের মতে ৫ মহররম মাসেই ৭ম হিজরি আরম্ভ হয়েছিল। আবার অনেকে রবিউল আউয়াল মাসকে বছরের প্রথম মাস গণনা করেন। কেননা, রাসূল ﷺ রবিউল আউয়াল মাসেই মদীনায হিজরত করেছেন। তাঁদের মতে মহররম ও সফর মাস ৬ষ্ঠ হিজরি শেষ দুটি মাস ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না এমতাবস্থায় তাঁর সূর্যোদয় সম্পর্কে না জানার কারণ : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ -এর সূর্যোদয় সম্পর্কে কেন জানা হলো না? অথচ তিনি নিজেই বলেছেন- আমার চক্ষু ঘুমায়, অন্তর জাগ্রত থাকে; অন্তর জাগ্রত থাকে সত্ত্বেও তিনি সূর্যোদয় সম্পর্কে কেন জানতে পারলেন না, কেন নামাজ কাজা হলো! এ প্রশ্নের জবাব নিম্নরূপ—

১. অন্তর জাগ্রত থেকে সূর্যোদয় সম্পর্কে জ্ঞাত না হওয়ায় ক্ষতিব কিছু নেই। কারণ অন্তরাখা বাতেনী কার্যাবলি অনুভব করে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত এগুলো বাতেনী ব্যাপার নয়, এগুলো চর্মচক্ষুর কাজ। চর্মচক্ষু ঘুমানোর কারণে তিনি তা জানতে পারেননি।
 ২. এ নামাজ কাজা হওয়ার মধ্যে উম্মতের জন্য কল্যাণ নিহিত ছিল। নবীর নামাজ কাজা হওয়ার কারণে উম্মতের জন্য কাজার বিধান চালু হয়েছে।
 ৩. নবী করীম ﷺ সাধারণ মানুষের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ; এখানে তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। যেমন, আল্লাহ বলে— **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**
 ৪. ঘুম ও ক্লান্তি তাঁকেও অবসন্ন করত, তাঁকেও বিভোর করত। এটা প্রমাণ করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য।
- নামাজ আদায়ের আগে সওয়ারি সামনে নিয়ে যাওয়ার কারণ : নবী করীম ﷺ যখন জেগে উঠলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে নামাজ কাজা না পড়ে অগ্রসর হওয়ার কোন হুকুম দিলেন। অগ্রসর হতে হুকুম দেওয়ার কারণ হানাফীদের মতে সে সময় সূর্য উদয় হচ্ছিল- সূর্য তখনও পুরোপুরি উদয় হয়নি। এ কারণে সামনে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন, যাতে নামাজের মাকরুহ সময়টি অতিবাহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, সে স্থানে শয়তানের দখল ছিল। শয়তানী প্ররোচনা হতে সাথীদেরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। যেমন- অন্য এক হাদীসে আছে **رَأَى فِيهِ الشَّيْطَانَ** শাফেয়ী মাযহাবে সূর্যোদয়ের সময় নামাজ জায়েজ আছে, এ কারণে তাঁরা শুধু দ্বিতীয় কারণটি গ্রহণ করেন।

কাজা নামাজের জন্য আযান ও একামত সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : কাজা নামাজের জন্য আযান ও একামত উভয়ই দেওয়া জায়েজ আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাজা নামাজের জন্য আযান নেই; শুধু একামতই যথেষ্ট। উল্লিখিত হাদীসই তার দলিল।
২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম, আবু সওর ও ইবনুল মুনিযির প্রমুখের মতে কাজা নামাজের জন্য আযান ও একামতের প্রয়োজন রয়েছে।

দলিল :

১ - عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ ... ثُمَّ أَمَرَ مُؤَدَّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ تَبَلَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ .
 ২ - فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ لَيْلَةِ التَّغْرِيثِ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالًا بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدْوِ .

আকসী দলিল : আযান-একামত নামাজের সুন্নত; ওয়াক্তের সুন্নত নয়। সূতরাং ওয়াক্ত ছুটে গেলেও নামাজ কাজ করা সময় সুন্নত আনায় করা উচিত।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে অবিকল রয়েছে, যেখানে আযানের কথা উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত করার জন্য আযানের কথা উল্লেখ করেননি।

একাধিক নামাজ কাজ হলে তার বিধান : একাধিক ওয়াক্তের নামাজ কাজ হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য আযান ও একামত আবশ্যিক কি না, এ সম্পর্কেও ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবু সওর প্রমুখের মতে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান ও একামত দেবে এবং অবশিষ্ট প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য শুধু একামত দেবে।

হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মতে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আজান ও একামত প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাধিকার রয়েছে, আযান ও একামত উভয়টিই দিতে পারে অথবা শুধু একামতও দিতে পারে। তিরমিযী শরীফে ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاتَهُ بِرَمِ الْغَنَدِقِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

উক্তির বিশ্লেষণ : নবী করীম ﷺ যখন হযরত বেলাল (রা.)-কে ঘুম অচেতন হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত বেলাল (রা.) বলেন—أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِيكَ এর ব্যাখ্যা হলো, যেমনিভাবে আপনাকে ঘুম অচেতন করেছে তেমনিভাবে আমাকেও অচেতন করেছে।

২. অথবা, অর্থ এই যে, আমি ইচ্ছা কৃতভাবে ঘুমিয়ে পড়িনি; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার চেয়ে ঘুম চেপে আসে।

৩. আল্লাহ তীবীর বিশ্লেষণ আল্লাহ তা'আলার এরশাদ—اللَّهُ يُتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَائِمِهَا -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে। (الآية)

এ-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসাত্বের ব্যাখ্যা এই যে, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে গেছে, যখনই তার স্মরণ হবে তখন নামাজ পড়ে নেবে। হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, যখন স্মরণ হবে তখন যদি নিষিদ্ধ তিন সময় (সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঝি-প্রহর)-এর যে কোনো এক সময়ও হয়, তবু নামাজ পড়বে। এ মত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর। হানাফী মতে নামাজ পড়বে যদি মাকরুহ ওয়াক্ত না হয়। কেননা, হানাফী অনুসারীদের মতে ঐ তিন সময়ে নামাজ পড়া হারাম, আর শাফেয়ীদের মতে ফরজ হারাম নয়। কাজেই যখনই সে জাগ্রত হবে তখনই নামাজ পড়ে নেবে, যদিও এটা তিন নিষিদ্ধ সময়ে হয়। আমাদের মতে যদি কেউ মাকরুহ সময়ে জাগ্রত হয় তা হলে সে অপেক্ষা করবে। যখন মাকরুহ সময় পার হয়ে যাবে তখন সে কাজ করে নেবে।

وَعَنْ ۳۴ أَبِي قَتَادَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَيْمَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَقْرَأْ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৩৪. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যখন নামাজের জন্য একামত বলা হয়, তোমরা দাঁড়াবে না, যতক্ষণ না তোমরা আমাকে বের হতে দেখ। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : মুযাজ্জিন 'হাইয়া আলান ফালাহ' বলা পর্যন্ত মুসল্লিগণ বসে থাকতে পারেন। কিন্তু কাতার সোজা বা ঠিক-ঠাক করার জন্য এর পূর্বে উঠাই ভালো। 'এর আগে উঠা যায় না', এখন ধারণা করা ভাল। তবে 'হাইয়া আলান ফালাহ' বলার পর বসে থাকা যায় না। অবশ্য তখন পর্যন্ত যদি ইমাম না আসেন তবে বসে থাকবে। উক্ত হাদীস দ্বারা তাই বুঝা যায়।

وَعَنْ ۱۳۵ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعُونَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَغْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي.

৬৩৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন নামাজের একামত বলা হয় তখন তোমরা তাতে দৌড়ে এসো না, বরং তাতে শরিক হওয়ার জন্য এরপ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এসো, যাতে তোমাদের উপরে শান্তি বিরাজ করে। অতঃপর যতটুকু নামাজ ইমামের সাথে পাবে পড়বে, আর যতটুকু নামাজ ছুটে যাবে তা, পরে [একা একা] পূর্ণ করে নেবে। -[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ার ইচ্ছা নিয়ে বের হয় তখন সে নামাজেই থাকে। [এ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদ নেই]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاعْتَمِرُوا إِلَى ذِكْرِ - فَاعْتَمِرُوا آয়াত ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- فَاعْتَمِرُوا إِلَى ذِكْرِ الْأَيْمَةِ وَالْمَدِينَةِ اللَّهُ أَرْبَعًا, তোমরা নামাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আর উক্ত হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার সমাধান নিম্নরূপ—

১. আল্লামা জীবী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত فَاعْتَمِرُوا দ্বারা فَاعْتَمِرُوا বা ইচ্ছা করা উদ্দেশ্য। وَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لَا تَأْتَوْهَا تَسْعُونَ -এর হুকুমের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকল না।

কَمَا قَالَ الْحَمْسَنُ الْبَصْرِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ السَّعْيُ مُنْعِمًا عَلَى الْإِقْدَامِ لِكَيْفَهُ عَلَى النَّبَاتِ وَالْفُلُوبِ .
 ২. অথবা উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার এরশাদ فَاعْتَمِرُوا -এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যাওয়া উদ্দেশ্য إِلَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سَعَيْتُ إِلَى -এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

৩. سَعَى শব্দটি عَمَلٌ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আয়াতে عَمَلٌ -এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর হাদীসে দৌড়ের নিষেধ এসেছে। সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

৪. শায়খ আকবর বলেন, যে সকল নস-এর মধ্যে سَعَى -এর হুকুম এসেছে সেগুলোতে সময়ের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যে সকল নস-এর মধ্যে নিষেধ এসেছে সেগুলো দ্বারা দৌড় ও তাড়াহুড়া পরিহার পূর্বক শান্ত ও গাঞ্জীরের সাথে যাওয়া উদ্দেশ্য।

তাকবীরে উলা ফওত হওয়া কালে দৌড়ের বিধান : ধীরস্থিরভাবে নামাজে গেলে যদি তাকবীরে উলা ফউত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন কারো কারো মতে দৌড়ে গিয়ে তাকবীরে উলা লাভ করবে। যেমন- হযরত ওমর (রা.) জান্নাতুল বাকীতে থাকা অবস্থায় একামত শুনে দৌড়ে মাসজিদে নববীতে গিয়ে তাকবীরে উলা পেয়েছেন। আর যে সকল নসে إِسْرَافٌ বা দৌড়ানোর নিষেধ এসেছে তা দ্বারা অতি দ্রুত দৌড়ের নিষেধ এসেছে। নতুবা সাধারণভাবে দৌড় বা দ্রুত যাওয়া নবী করীম ﷺ হতে প্রমাণিত আছে—

كَمَا وَدَّ فِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَعَمَّدُ عِنْدَهُمْ فَيَتَعَمَّرُ الْعَرَبُ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَيَسَأُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَّتًا بِالْبُيُوعِ . (رَوَاهُ الشَّيْخَانِيُّ) আর কিছুসংখ্যক আলিম ধীরস্থিরভাবে চলাকে উত্তম বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, (ع) قَالَ وَآتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
 যেহেতু নসের মধ্যে উভয় প্রকারের হুকুম রয়েছে যে, فَاعْتَمِرُوا তারপর আয়াত—

অনুরূপ অন্য وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَهِيَ الْعِبَادَةُ هُنَا مَعْنَىٰ سَارِعَ إِلَى الْعِبَادَةِ فَقَدْ سَارِعَ إِلَى الْمَغْفِرَةِ আয়াতে আছে الْغَنَاتِ فِي الْغَنَاتِ সুতরাং উভয় প্রকারের নদের উপর আমল করে উভয় ফজিলত অর্জন করার জন্য السَّكِينَةَ تَطَاوَعًا مع السَّكِينَةِ তথা ধীরস্থিরতার সাথে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

الفصل الثالث: তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (رض) قَالَ عَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ بَطْرِيَّتِي مَكَّةَ وَكُلَّ يَلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَقَدَ يَلَالًا وَرَقَدُوا حَتَّى اسْتَبَقَطُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَبَقَطَ الْقَوْمُ فَقَدَّ فَرَعُوا فَاْمَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَإِ بِهِ شَيْطَانٌ فَرَكَبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ أَمَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا وَأَمْرًا يَلَالًا أَنْ يُنَادِيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ يَقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَرَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي جَنِينٍ غَيْرِ هَذَا فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَرَعَ إِلَيْهَا فَلْيَصِلْهَا كَمَا كَانَ يَصِلُهَا فِي وَجْهِهَا ثُمَّ التَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى يَلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي فَاضْجَعَهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَهْدِيهِ كَمَا يَهْدِي الصَّيِّ حَتَّى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৬৩৬. অনুবাদ : হযরত যাইদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার পথে এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাতে সওয়ারি হতে অবতরণ করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং নামাজের সময় তাঁদেরকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বেলালকে নিযুক্ত করলেন, কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং বেলালও ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁরাও ঘুমিয়ে থাকলেন। অবশেষে তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন সূর্য উদয় হয়ে গেছে। এদিকে তাঁরা জাগরিত হওয়ার পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে আদেশ দিলেন সওয়ারি হয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তাঁরা এ ময়দান হতে বের হতে যায়। অতঃপর বললেন, এ ময়দানে শয়তান বিদ্যমান। সুতরাং তাঁরা সওয়ারি হয়ে চলতে লাগলেন যে পর্যন্ত না সেই ময়দান হতে বের হয়ে পেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন সওয়ারি হতে অবতরণ করতে এবং অজু করতে, আর বেলালকে আদেশ করলেন আযান দিতে অথবা একামত বলতে। অতঃপর তিনি লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন এবং নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং দেখলেন তাদের ভীতিবিহ্বলতাকে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ আমাদের প্রাণসমূহকে কবজ করে নিয়েছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে অপর সময়েও এটা আমাদের ফেরত দিতে পারতেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা এটা আদায় করতে ভুলে যায়, অতঃপর [জেগে] এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে যেন তাকে সেরূপ পড়ে, যেরূপ যথাসময়ে পড়তো। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, 'শয়তান, বেলালের নিকট আসে, তখন সে নামাজ পড়ছিল এবং তাকে শুইয়ে দেয়। অতঃপর তাকে চাপড়াতে থাকে যেভাবে ছেলেকে চাপড়ানো হয় যে পর্যন্ত না সে ঘুমিয়ে পড়ে।' অতঃপর

بِلَا فَخْبَرٍ بِلَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَثَلِ الْيَدِي
 أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
 أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

তিনি বেলালকে ডাকলেন, বেলাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
 অনুরূপ সংবাদ দিলেন যা তিনি হযরত আবু বকরকে
 দিয়েছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি
 যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কেন হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল বলে সাক্ষ্য দিলেন, অথচ তিনি ইতঃপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন :
 আলোচ্য হাদীসে হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'রাসূল' বলে সাক্ষ্য দেওয়া ঈমান আনার জন্য নয়। তিনি
 জিব্রাঈলের আগমন এবং ওহি নাজেল সম্পর্কে প্রথমেই বিশ্বাস করেছিলেন। তা হলে এখানে সাক্ষ্য প্রদান উদ্দেশ্যে ও অতিরিক্ত ভক্তি-বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ
 -এর আরও একটি মুজিবা দেখতে পেলেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর কি ঘটেছিল তা নবী করীম ﷺ পূর্বাংগেই হযরত আবু
 বকর (রা.)-কে বলে দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٦٣٧
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَصَلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي
 أَعْنَاقِ الْمُؤَدَّبِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صِيَامُهُمْ
 وَصَلَوْتُهُمْ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-
 মুসলমানদের দু'টি জিনিস মুয়াজ্জিনদের কাঁখে ঝুলে
 আছে- (এক) তাদের রোজা (দুই) তাদের নামাজ।
 -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইসলামে আযানের গুরুত্ব : ইসলামে আযানের গুরুত্ব অত্যধিক। যেমন-

- আযান দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।
- আযানের মাধ্যমে সালাত যে ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়।
- আযানের দ্বারা গণমানুষের মধ্যে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি হয়।
- আযানে মুয়াজ্জিন যখন "اللَّهُ أَكْبَرُ" ধ্বনি দেয়, তখন আল্লাহর ঘোষণায় অবিশ্বাসীদের আত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠে।
- আযানে "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" বলার দ্বারা মুশরিকদের অংশীবাড়ীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষিত হয় এবং গুরুগম্ভীর উপস্থাপনে তার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।
- আযানে "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" বলার সাথে সাথে আকাশ-বাতাস ছড়িয়ে রাসূল ﷺ-এর রিসালাত ও নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয় এবং তাঁর সপক্ষে যাবতীয় বাধা-বিপত্তির উপেক্ষা ও মোকাবেলা করার শপথ নেওয়া হয়।
- আযানে "حَمْرٌ عَلَى الصَّلَاةِ" এবং অন্যান্য বাক্যগুলো দ্বারা জামাতে নামাজের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, আমাদের জীবনের যাবতীয় ইবাদতের মূলে হলেন আল্লাহ তাআলা। আর তিনি যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ, একক ও অদ্বিতীয়, তাই ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য হবে, অন্যের জন্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هُذِهِ الْقِبْلَةُ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ -এর বাণী هُذِهِ الْقِبْلَةُ -এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; যা নিম্নরূপ-

১. আরামা তুরপুশতী বলেন, هُذِهِ الْقِبْلَةُ দ্বারা কা'বা শরীফের ঐ অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার মধ্যে দরজা রয়েছে ;
২. আ স্লামা খাতাবী বলেন- هُذِهِ الْقِبْلَةُ -এর অর্থ হলো—
إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدِ اسْتَفْرَتَ عَلَىٰ هَذَا الْبَيْتِ لَا يَنْسُجُ بَعْدَ الْجَمِّ فَصَلُّوا إِلَى الْكَعْبَةِ أَبَدًا تَهَيُّ قِبْلَتِكُمْ
৩. কারো মতে এ বর্ণনা দ্বারা দ্বারা হুজুর ﷺ সুনুতের তালিম দিয়েছেন। অর্থাৎ যদিও কা'বার সকল দিকেই নামাজ জায়েজ। কিন্তু কা'বা শরীফের চেহারার দিকে ফিরে ইমামের দণ্ডায়মান হওয়া সুনুত। এর অর্থ এই নয় যে, কেবলা শুধু এ দিকেই, অন্যান্য দিকে ফিরে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। আর এর অর্থ এটাও নয় যে, বের হতে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে দাঁড়ালে নামাজ صَحِيح হবে, আর কা'বার ভিতরে নামাজ ঠিক হবে না।

وَعَنْ ١٢٩ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِيمِيُّ وَبِلَالٌ بْنُ رِيَاحٍ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَتَ فِيهَا فَسَأَلَتْ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَأَاهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتْرٍ أَعْمِدَةٌ ثُمَّ صَلَّى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন। [প্রবেশকারীদের মধ্যে ছিলেন] তিনি, উসামা ইবনে যায়েদ, ওসমান ইবনে ডালহা হাজাবী ও বেলাল ইবনে রাবাহ। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিতরে থাকা অবস্থায় কেউ [বেলাল বা ওসমান] দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ এর ভিতরে থাকলেন। পরে বেলাল (রা.) যখন বের হলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কী করেছেন? হযরত বেলাল (রা.) বললেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামে, দু'টিকে ডানে এবং তিনটিকে পিছনে রাখলেন। তৎকালে কা'বা ছয়টি স্তম্ভের উপরে ছিল- অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الْأِمَامِ مَالِكٍ وَأَهْمَدٍ : ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, কা'বার অভ্যন্তরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে, কিন্তু ফরজ নামাজ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তারা বলেন, ফরজ নামাজ কা'বার অভ্যন্তরে জায়েজ নয়। পূর্বে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসই তাঁদের দলিল। অবশ্য বিভিন্ন সাহাবীদের কর্ম ও বর্ণনা হতে দেখা যায় নফল জায়েজ আছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফরজ, নফল কোনো নামাজই জায়েজ নয়। কেননা কুরআনের নির্দেশ হলো নামাজের মধ্যে কা'বাকে সম্মুখে রাখা, আর অভ্যন্তরে নামাজ পড়লে কা'বার কিছু অংশ পিছনে পড়তে বাধ্য। কাজেই কোনো নামাজই জায়েজ নয়।

مَذْهَبُ الْأِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ : ইমাম আবু হানিফী ও তাঁর অনুসারীদের মতে ফরজ, নফল সব নামাজই জায়েজ। দলিল হলো— أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِطَائِفَيْنِ وَالْمَاكِينِينَ وَالرُّكُومِ السَّجْدِ সূত্রাৎ যদি কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া জায়েজ না হয়, তা হলে এর মধ্যে রুকু সেজদা করার অর্থ নিরর্থক হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে বলা হয় যে, 'গোটা ঘরকে' সম্মুখে রাখার নির্দেশ নয়, বরং সে 'দিকটিই' সামনে রাখতে বলা হয়েছে— فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীসে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মহানবী ﷺ ভিতরে নামাজ পড়তেন।

মসজিদে হারামের মর্যাদা সম্পর্কে মন্তভেদ : ইমাম মালেক (রা.)-এর মতে মর্যাদার দিক দিয়ে মসজিদে নববী পৃথিবীর অন্য সব মসজিদ, এমনকি মসজিদে হারামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন-

১. মহানবী ﷺ মদীনায অধিক কল্যাণ নাজিল করার জন্য আশ্রাহর নিকট দোয়া করেছেন।
২. মক্কা শরীফ যদিও ইসলামের বিকাশ স্থল; কিন্তু মদীনায ইসলামের বিজয় হয়েছে, সুতরাং এর মর্যাদাও বেশি।
৩. মসজিদে হারাম হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নামাজের স্থান, আর মদীনা মহানবী ﷺ-এর নামাজের স্থান।
৪. মসজিদে হারামের ভিত্তি স্থাপন করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ.), আর মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন মহানবী ﷺ;
৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَّى فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَوَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

মালেকী মাযহাবের অনুসারীরা হাদীসটির ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, মসজিদে নববীতে এক নামাজ পড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার নামাজ হতে উত্তম; কিন্তু মসজিদে হারামে নামাজ পড়লে এ পরিমাণ ছওয়াব হবে না, বরং এর চেয়ে কম হবে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِي وَبُيْعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا كَفَرَ الْإِنْسَانُ نَبِيًّا وَرَبُّكَ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ - (الاية)

অধিকাংশ ইমামের মতে মর্যাদার দিক দিয়ে মসজিদে হারাম অন্যসব মসজিদ, এমনকি মসজিদে নববীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন, মহান আশ্রাহর বাণী-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِي وَبُيْعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا كَفَرَ الْإِنْسَانُ نَبِيًّا وَرَبُّكَ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ - (الاية)

উল্লিখিত আয়াতে মসজিদে হারাম শ্রেষ্ঠ হওয়ার কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে—

১. মসজিদে হারামের প্রস্তুতকারী স্বয়ং আশ্রাহ। কর্তৃবাচ্যের কেহাৎ এ কথাই প্রমাণ।
২. মসজিদে হারামকে مُبَارَكٌ (কল্যাণময়) বলা হয়েছে।
৩. মসজিদে হারামকে বিশ্ববাসীর জন্য 'হিদায়াত' বলা হয়েছে।
৪. এতে বহুসংখ্যক নিদর্শন (آيَاتٌ) রয়েছে।
৫. মসজিদে হারামে প্রবেশকারী নিরাপত্তা লাভ করে।
৬. মসজিদে হারামকে জিয়ারত করা ফরজ। মহান আশ্রাহর বাণী - وَلِيْلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
৭. আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَّى فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَوَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হলো, মসজিদে নববীতে এক নামাজ পড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার নামাজ পড়া হতে উত্তম, কিন্তু মসজিদে হারামের মর্যাদা এর তুলনায় অনেক বেশি।

ইমাম মালেক (রা.)-এর উপস্থাপিত দলিলের উত্তর : ইমাম মালেক (র.)-এর উপস্থাপিত প্রথমোক্ত চারটি দলিলের উত্তর এই যে, উক্ত চারটি দলিল দ্বারা আংশিকভাবে মদীনার মর্যাদা প্রমাণিত হয়। আর আমাদের বক্তব্য হলো মৌলিক মর্যাদা সম্পর্কে।

পঞ্চম দলিলের উত্তর এই যে, তাঁরা হাদীসটির যে অর্থ করেছেন, তা প্রকাশ্য অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এ অর্থ কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪১. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- এ তিন মসজিদ ব্যতীত অপর কোনো দিকে ভ্রমণ করা যায় না [আর সে তিন মসজিদ হলো] (১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা এবং (৩) আমার এ মসজিদ। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে আশোচিত তিনটি মসজিদের ফজিলতের বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসের মহানবী ﷺ-এর বাণী **أَلَىٰ تَلْفَةِ مَسْجِدِ مَسْجِدِ** ঘারা ইস্তিবহ তিন মসজিদ তথা মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার ফজিলত এবং মর্যাদা ইসলামে ব্যাপক। তনুধো অন্যতম কমটি নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

ক. মসজিদে হারাম : এ মসজিদটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর; যেমন কুরআনে এসেছে-

إِنَّ أَوْلَىٰ مَبْنِيٍّ وَصِيحَ لِيثَائِي لِنَدْنِيَّ بِيَكَّةَ مَبَارَكًا وَهُدَىٰ لِيثَائِي -

✽ এটির মর্যাদা তৈরি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

✽ এ ঘরটি মুসলমানদের কেবলা।

✽ হজের অন্যতম রোকন হলো এ ঘরকে তওয়াফ করা।

✽ সমস্ত নবী রাসূল এ ঘরটি তওয়াফ করেছেন।

✽ এ ঘরের প্রতি প্রতিদিন অসংখ্য রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

✽ দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা হাজার হাজার মানুষ এ ঘর তওয়াফ করে।

✽ এ স্থানে অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় তওয়াফই সর্বাধিক ছুওয়াবের কাজ।

✽ এ মসজিদ নির্মাণে অসংখ্য ফেরেশতা ও নবী-রাসূল অংশগ্রহণ করেন।

✽ এ মসজিদ মানবজাতির মুক্তির একটা বড় ধরনের মাধ্যম।

✽ এ মসজিদে ইবাদত করলে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অনেক বেশি নেকী অর্জিত হয়। যেমন, হাদীস-

১. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত- **فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ بِسَاتَةِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ** মসজিদে হারামে সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

২. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, মসজিদে হারামে একটি সালাত অন্যস্থানে দশ কোটি সালাত অপেক্ষা উত্তম।

হযরত আনাস (রা.)-এর অপর বর্ণনা মতে অবশ্যই মসজিদে হারামে সালাত আদায় অন্যস্থানে সালাত আদায়ের চেয়ে পাঁচশ' কোটি গুণ বেশি ছুওয়াব হয়।

ব. মসজিদুল আকসা'র মর্যাদা : মসজিদুল আকসা হলো বাইতুল মুকাদ্দাস। এ মসজিদের মর্যাদাও অনেক বেশি। কারণ-

✽ এ মসজিদ বিগত নবী-রাসূলদের হাতে গড়া।

✽ আল-কুরআনে এ মসজিদের বিবরণ গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হয়েছে।

✽ এ মসজিদ থেকেই রাসূল ﷺ-এর উর্ধ্বাকাশে গমন, অর্থাৎ মিরাজের সূচনা হয়।

✽ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, মসজিদে আকসায় সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদ হতে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি ছুওয়াব পাওয়া যায়।

গ. মসজিদে নববীর মর্যাদা :

✽ স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর নিজ হাতে গড়া মসজিদ [তথা মসজিদে নববী]।

✽ এ মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর নিকট অনেকবার ওহি নাছিল হয়।

✽ এ মসজিদকে কেন্দ্র করে রাসূল ﷺ ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

মসজিদে নববীর মর্যাদা প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- 'যে ব্যক্তি এ মসজিদে কিছু শেখার জন্য আসে কিংবা শেখানোর জন্য, সে মুজাহিদের সমমর্যাদায় ভূষিত হবে।'

সূতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এ তিনটি মসজিদ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

নামাজ নির্ণয়ে ইমামদের মতভেদ : উপরোক্ত তিন মসজিদে নামাজ পড়ার ফজিলত কি ফরজ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত, না অন্য নামাজেও এ ফজিলত রয়েছে। এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বর্ণনা করেন যে, এটা ফরজ নামাজের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়; বরং নফল নামাজেও ছওয়াব পাবে। তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেন যে, এটা ফরজ নামাজের জন্য সুনির্দিষ্ট হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, এ সুনির্দিষ্ট বাড়তি ছওয়াব শুধু নামাজের জন্যই নয়, অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি, সদকা, দান ইত্যাদিতেও বেশি ছওয়াব পাওয়া যাবে। হযরত ইবনে আকবাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ (র.), আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ সহ এক দল আলিম বলেন, যদি কেউ মসজিদে হারামে পাপ করেন, তা হলে তার পাপও বেশি লেখা হবে। কিন্তু জমহুর ওলামার মত হলো, ওনাহ বর্ধিত হবে না।

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَمْرُؤُ إِلَّا بِمِثْلِهَا وَمَنْ لَا يُظَلِّمَنَّ—তাদের দলিল

উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত নবী, ওলি ও সালেহীনদের কবর জেয়ারতে সফর করার বিধান : উল্লিখিত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে—

১. উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের দিকে সফর করা।
২. নবী, ওলি ও বৃহত্তর ব্যক্তিদের কবর জেয়ারতের জন্য সফর করা।
৩. বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সফর করা।
৪. কারো সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করা।
৫. বাণিজ্যিক ব্যাপারে বা কোনো প্রয়োজনে সফর করা ইত্যাদি।
৬. বিন্যা অর্জনের জন্য ভ্রমণ করা।
৭. যদি নিজের এলাকায়-মহল্লায় মসজিদ না থাকে তখন অন্য মসজিদের দিকে সফর করা জায়েজ। কেননা, ঘরের মধ্যে নামাজ পড়া অপেক্ষা পাঞ্জগানা মসজিদে নামাজ আদায় করার ছওয়াব বহু বেশি। তবে নিজের মহল্লায় মসজিদ থাকা সত্ত্বেও অন্য মসজিদের সফর করা জায়েজ নেই। এরূপ জুমার মসজিদের বিধানও তাই। কেননা, তিন মসজিদ ব্যতীত সব মসজিদের হুকুম ও ছওয়াব সমান।
৮. নবীর মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শুধু জায়েজই নয়; বরং অনেক নেকী ও সৌভাগ্যের কাজও বটে। শায়খ আব্দুল হক দেহলবী (র.) বলেছেন- **لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ** দ্বারা যে কোনো ধরনের সফরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ছওয়াব ও পুণ্য কাজ বলে নিয়ত করে যাওয়া তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের জেয়ারতে যাওয়া জায়েজ নেই। ইমাম আহমদ তাঁর প্রসিদ্ধ মুনাহাদ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন- **لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ لِمَنْ فِيهِ** এ হাদীসের মধ্যে 'নামাজ পড়া'-এর উদ্দেশ্যে শব্দটি বর্ণনা দেওয়া যাচ্ছে, নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ আছে। যেমন-বিদ্যালয় শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির জন্য সফর করা জায়েজ। ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে লিখেছেন, আবু মুহাম্মদ বলেছেন, **بِعَرْمُ شُدِّ الرِّجَالِ إِلَى غَيْرِ الشَّلَاةِ وَهُوَ غَلَطٌ**, ইমাম আহমদ তাঁর প্রসিদ্ধ মুনাহাদ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন- **بِعَرْمُ شُدِّ الرِّجَالِ إِلَى غَيْرِ الشَّلَاةِ وَهُوَ غَلَطٌ** এতে বুঝা যায় যে, বিধান ও পুণ্যবানদের কবর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা নাজায়েজ নয়। তবে কোনো প্রকার বিদ'আতের সম্ভাবনা থাকলে নাজায়েজ। যেমন- বর্তমান যুগে কবরকে কেন্দ্র করে শত প্রকার বিদ'আতী কার্যকলাপ চলছে। কবরে সেজদা করা, ফুল ছিটানো, নজর মানত দেওয়া, কবর গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা।
৯. দেশ-বিদেশে ভ্রমণ যদি শুধু রং-তামাশার জন্য বা নিছক উপভোগের জন্য হয়, তবে এ ধরনের ভ্রমণ জায়েজ নয়। কেননা এটা **سَيْرًا فِي الْأَرْضِ** এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি কেউ কুরআনের আয়াত **سَيَّرُوا نَفْسَ الْأَرْضِ كُنْهَا صِرَامًا** এর উপরে আমল করে আশ্চাহর কুদরতের মহিমা জানার জন্য এবং সৃষ্টি হতে উপদেশ গ্রহণের জন্য ভ্রমণ করে, তবে শুধু জায়েজই নয়; বরং অধিক পুণ্যের কাজ।
১০. জ্ঞানী ও পুণ্যবানদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাও উত্তম ও পুণ্যের কাজ। আর দুনিয়ার অনুসারীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়।
১১. এ প্রকার ভ্রমণও জায়েজ যদি ভ্রমণ করা অত্যাব্যক হয়ে থাকে।

৬. বিদ্যার্জনের জন্য ভ্রমণ নবী করীম ﷺ-এর হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে।

এ ছাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে শিক্ষালাভ ও খোদাভীতি অর্জনের লক্ষ্যেও ভ্রমণ করা জায়েজ আছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে—**قَدْ سَيَّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَيْبِينَ**—**قَدْ سَيَّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَيْبِينَ**—**قَدْ سَيَّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَيْبِينَ** হাদীস উদ্দেশ্য: রাসূল ﷺ-এর বাণী "ومسجدي هذا"-এর মধ্যে মসজিদ দ্বারা মাসজিদে নববী বুঝানো হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে নববীর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন—

১. এ মসজিদ স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর হাতের গড়া।
২. এ মসজিদে রাসূল ﷺ-এর উপর বহু বার ওহি নাজিল হয়েছে।
৩. এ মসজিদকে কেন্দ্র করে রাসূল ﷺ ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।
৪. রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কিছু শেখার জন্য কিংবা শেখানোর জন্য এ মসজিদে আসে, সে একজন মুজাহিদের মর্যাদা পাবে।
৫. এ মসজিদে এক রাকাত নামাজ অন্যান্য মসজিদের এক হাজার রাকাত নামাজ অপেক্ষা উত্তম।

কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ: কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার বৈধতা নিয়ে আলিমদের মতামত নিয়ে উপস্থাপিত হলো—

কতিপয় ওলামার মতে কবর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়; যেহেতু হাদীসে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।

مَذْعَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: মুসলিম মনীষী, জ্ঞানী-গুণী, নবী-রাসূল বা ওলি-আউলিয়াদের মাজার তথা কবর জিয়ারত করা সাধারণভাবে জায়েজ এবং জেয়ারতকারীর জন্য উপকারী। নিম্নে তার কারণ উপস্থাপিত হলো—

এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। মৃত ব্যক্তির জীবনে ইসলামের জন্য করা কীর্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। আল্লাহভীতি তথা তাকওয়া অর্জিত হয়।

এ জন্য মুসলিম ব্যক্তিবৃন্দের মাজার জিয়ারত করা জায়েজ এবং পুণ্যকর্ম। তা করা একজন মু'মিনের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা, হাদীসে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ رَوْدَ عَلَيْهِ حَسَى يَوْمَهُ -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ يَعْرفُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَرُوِّدْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَعَرَفَهُ. الْحَدِيثُ

তবে শর্ত হলো, এ জিয়ারত হতে হবে খাঁটি মনে, অনানুষ্ঠানিকভাবে। কোনো অনুষ্ঠান করে বা মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য বা দোয়া প্রার্থনার নিয়তে তার নিকট হতে নাজাত কামনা করে তার মাজারে সেজদা বা এমনি ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জিয়ারত করা জায়েজ নয় এবং তা শিরক ও বিদ'আতে পরিণত হয়ে যায়।

মোটকথা, যে সকল ক্ষেত্রে কবরকে কেন্দ্র করে বিদ'আত ও শিরকি কার্যকলাপ চলে থাকে বা বিদ'আত সৃষ্টি হতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে কবর জিয়ারত জায়েজ হতে পারে না; বরং হারামে পরিণত হয়ে যায়।

وَعَنْ عَلِيٍّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِي
وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যখানে যে স্থানটি রয়েছে তা বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিম্বারটি আমার হাওজের [হাওজে কাওসার] উপর [নির্মিত]।—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الرَّضَىٰ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -এর অর্থ: নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার ঘর ও মিষারের মধ্যখানে বেহেশতের একটি টুকরা আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সে জায়গায় ইবাদত করবে, সে বেহেশতের বাগানে পৌঁছেবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এ হাদীসটি প্রকৃতই এর বাহ্যিক অর্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ এ জায়গাটি এমন একটি টুকরা যা বেহেশত হতে স্থানান্তর করা হয়েছে, হাজ্জের আসওয়াদের মতো। পরে আবার এটা বেহেশতে স্থানান্তর করা হবে। জমিনের অন্যান্য অংশের ন্যায় এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে না।

- আল্লামা ইবনে হাজ্জর (র.) বলেন, এটাই অধিকাংশের অভিমত। প্রকৃতপক্ষে এটা বেহেশতের একটি টুকরা, যদিও সে স্থানের অবস্থানকারী ক্ষুধা, পিপাসা এবং শীত ও গরম উপলব্ধি হতে নিবৃত্ত পায় না। কেমনা এটা দুনিয়ার স্বভাব। যেমন, হজ্জর ﷺ বলেছেন—الرَّضَىٰ الْجَنَّةَ تَحْتِ ظِلِّ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ الْيَهْدِيَ بِؤَدَىٰ إِلَى الْجَنَّةِ অর্থ—বেহেশত তলোয়ারের ছায়ার নিচে। অর্থাৎ জিহাদ বেহেশতে পৌঁছে দেয়। এখানেও হাদীসের অর্থ হলো উক্ত স্থানের নামাজ ও জিকির ইত্যাদি আদায়কারী জান্নাতে পৌঁছে যাবে।
- আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেছেন, এ জায়গার নাম রওজা বা বাগান এ কারণেই রাখা হয়েছে যে, এ স্থানের ফেরেশতা, জিন ও মানুষ ইবাদতে ও মহানবী ﷺ-এর জেয়ারতে ব্যস্ত থাকে। যেমন— অন্য হাদীসে জিকিরের মজলিসকে رِيَاضُ الْجَنَّةِ বেহেশতের বাগান বলা হয়েছে।

আমার মিষার আমার হাওজের উপর: কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আমার নিকট উপস্থিত হয়, [অর্থাৎ সাহাবীগণ] অথবা যারা এ হাদীস হতে কল্যাণ লাভ করবে [অর্থাৎ পরবর্তী যুগের উম্মতগণ] তারা 'হাওয়ে কাওসার' হতে উপকৃত হবেন। বস্তুত হাদীসটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, 'মিষার' তথা মিষারের উপর হতে যা প্রচার ও প্রকাশ করা হয় তা হলো অন্তরের মূর্খতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণের ঘাট, যেমন 'হাওয়ে কাওসার' হলো কিয়ামতের দিন তৃষ্ণার্ত দূরীভূত করণের ঘাট।

আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, হাদীসটির নিতৃত্ব তত্ত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত জিনিস। সূত্রাং একে এমনিই মেনে নেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

وَعَنْ ٤٣٠ ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ نَبَاءٍ كُلَّ
سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّي فِيهِ
رَكَعَتَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৩. অনুবাদ: ইয়রত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক শনিবারে পায়ে হেঁটে বা বাহন জন্তুতে আরোহণ করে 'কুবার' মসজিদে আসতেন। অতঃপর সেখানের দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٤٣١ ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهُمَا وَأَبْغَضُ إِلَيَّ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهُمَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৪৪. অনুবাদ: ইয়রত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—আল্লাহ তা'আলার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ এবং সবচেয়ে ঘৃণ্য ও দিকৃত স্থান হলো বাজারসমূহ। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُئِلَ الْحَدِيثُ هَادِيَسَرِ الْبَاطِنِ : শরিয়ত যে ধরনের স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি দিয়েছে তদাধাে বাজার সর্ব নিকট এবে মসজিদ সর্বেৎকষ্ট : কেননা, মসজিদ ইবাদত-বন্দেগি ও শরিয়ত প্রচার ও প্রসারের জায়গা, আর বাজার ঘােবতীয় শয়তানি কর্ম, লোভ-লালসা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচর্চা ও খেয়ানতের জায়গা। সর্বেপরি নামাজ, ইবাদত ইত্যাদি ভুলে থাকার জায়গা। শরিয়তে বাজার নির্মাণের অনুমতি থাকলেও শরােবখানা, বেশ্যাশয় ইত্যাদি বানানোর অনুমতি নেই।

وَعَنْ ٦٤٥ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِي مِنْ بَنِي لِي مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করেন।-[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -এর মর্মার্থ : 'আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন' বাকটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে সে বেহেশতী হবে। কেননা মসজিদ হলো নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট সে ব্যক্তির পক্ষেই মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব। আর তার জন্যই বেহেশত। সুতরাং মসজিদ নির্মাণকারী বেহেশতে যাবে।

مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا وَلَوْ كَفَنَحْمِصَ قَطَاةٍ : হস্তের সমাধান : আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় হাদীসে قَطَاةٍ : অর্থ হলো এক জাতীয় ছোট পাখি। আর كَفَنَحْمِصٍ বলতে ঐ ঘরকে বুঝানো হয়েছে যা ঐ ছোট পাখিটি মাটি খুঁড়ে ডিম পাড়ার জন্য তৈরি করে। সুতরাং قَطَاةٍ : এর অর্থ দাঁড়াল কাভাত নামক পাখিটি তার ডিম পাড়ার জন্য মাটি খনন করে যে ছোট গর্তটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ছোট গর্তে তো একটি পা রাখার স্থানও হয় না। সুতরাং উক্ত হাদীসে যে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ তৈরি করবে তার জন্য বেহেশত তা হলে কাভাত পাখির ঘরের ন্যায় যেই মসজিদ খানি হবে তাতে তো নামাজ পড়ার জায়গা হবে না এরূপ মসজিদ কি কাজে আসবে?

জবাব এই যে,

- আলোচ্য মসজিদ তৈরির দ্বারা অর্থ হলো, মসজিদের এরূপ সামান্য পরিমাণ অংশও যদি মসজিদের প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হয় তবে তার জন্য উপরিউক্ত পুরস্কার রয়েছে।
- অথবা অনেকে পয়সা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করল, প্রতিজনের অংশে যদি কাভাত পাখির বাসার পরিমাণ ক্ষুদ্র অংশও হয় তা হলেও এর ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে।
- হাদীসে এত ক্ষুদ্র অংশ বলে مَبَالِغَةً করা উদ্দেশ্য। মূলত এত ক্ষুদ্র অংশ হওয়া উদ্দেশ্য নয়।
- হাদীসের বর্ণিত মসজিদ দ্বারা সেজদার স্থান উদ্দেশ্য আর সেজদার স্থানের জন্য কাভাত পাখির বাসা পরিমাণই যথেষ্ট।
- মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য তদরূপ ঘরের ওয়াদা করা হয়েছে অথচ আল্লাহ বলেন, যে একটি সংকাজ করবে তার জন্য দশ গুণ বিনিময় রয়েছে।

এর জবাব হলো যে,

- আলোচ্য হাদীসখানি সম্ভবত (الاية) وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ (الاية) -এর পূর্বে।
- কারো মতে কোনো কোনো মুসখায় (مَنْ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا مِنْهُ) বলা হয়েছে তাতে (مِنْهُ) -এর বর্ণনা অধিক হওয়ায় বিতর্কী নয়।
- অথবা আলোচ্য হাদীসের অর্থ হলো (مَنْ بَنَى اللَّهُ لَهُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْهُ) -এর পূর্বে।
- অথবা উত্তর এই যে, এক নেকীর বিনিময়ে একটি ছওয়াব হওয়া এটা ইনসাফ। আর এক নেকীর বিনিময়ে ১০ ছওয়াব হওয়া এটা পুরস্কারের ভিত্তিতে। সুতরাং হাদীসে ইনসাফের এবং আয়াতে পুরস্কারের বর্ণনা এসেছে।

৫. অথবা উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীসের **مِنْهُنَّ** ধারা বুঝানো হয়েছে মসজিদ ঘর নির্মাণের বিনিময়ে জ্ঞান্নাতে ঘর দেওয়া হবে। যদিও দুনিয়ার ঘর ও জ্ঞান্নাতের ঘরের মাঝে কোনো তুলনা নেই। **وَمَا** তুলনা নেই। **إِذْ مَوْضِعٌ شَيْئٍ فِي الْحَيْفَةِ حَضْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا** হতে উত্তম।
 “কেননা, জ্ঞান্নাতের এক বিগত জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে উত্তম।”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا عَدَا أَوْ رَاحَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে সকালে কিংবা বিকালে মসজিদে গমন করে, আত্মাহ তার জন্য বেহেশতে মেহমানী প্রস্তুত করে রাখবেন, তার প্রত্যেকবারের জন্য- যখন সে সকালে বা বিকালে [মসজিদে] গমন করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ হাদীসের ব্যাখ্যা : সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়ার অর্থ হলো, যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য নিজেকে সারাক্ষণ মসজিদের সাথে সম্পর্কিত রাখে এমন ব্যক্তির জন্য আত্মাহ তা'আলা বেহেশতের মধ্যে অপ্যায়নের বস্ত্রসমূহ প্রস্তুত করে রাখেন। এক কথায় এরূপ ব্যক্তির বেহেশতে যাওয়া সুনিশ্চিত।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَيْعُدُّهُمْ فَأَبْعُدُّهُمْ مَمْشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَ ثُمَّ يَنَامُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৭. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- নামাজের ছুওয়াবের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক ছুওয়াবের ভাগী, যে মসজিদে অধিক দূর হতে আগমনকারী তারপর সে ব্যক্তি, যে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দূরবর্তী স্থান হতে আগমনকারী। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করে সে ঐব্যক্তির চেয়ে অধিক ছুওয়াবের ভাগী হবে যে একা নামাজ পড়ে তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদের দিকে যার পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তার পাপ তত কমে যাবে এবং ছুওয়াব বৃদ্ধি হবে, এ জন্য দূর থেকে আসা ব্যক্তির ছুওয়াবও বেশি হবে। আর যে ব্যক্তি জামাতের অপেক্ষায় থেকে জামাতে নামাজ পড়ে সেও ঐ ব্যক্তি হতে অধিক ছুওয়াবের মালিক হবে যে একা একা নামাজ পড়ে, জামাতে পড়ার জন্য অপেক্ষা করে না।

وَعَنْ جَابِرٍ (رَضًا) قَالَ خَلَّتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلْمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ بَلِّغْنِي أَنْكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا

৬৪৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মসজিদে নববীর পার্শ্বে কিছু জায়গা খালি হলো। তখন বনু সালামা গোত্র মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইল। এ সংবাদ নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, তোমরা মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করছ। তখন তারা প্রত্যুত্তরে

رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي
سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تَكْتَبُ أُنَارَكُمْ دِيَارَكُمْ
تَكْتَبُ أُنَارَكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বলল হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এরূপ ইচ্ছে পোষণ
করেছি। তখন তিনি বললেন, হে বনু সালামা! তোমরা
তোমাদের নিজ স্থানেই থাক, তোমাদের পদচিহ্নগুলো
লেখা হবে। তোমরা তোমাদের নিজ স্থানেই থাক,
তোমাদের পদচিহ্নগুলো লেখা হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ رُوِيَ هَادِيَسِرِ پَطْرُمِي : বর্ণিত আছে যে, বনু সালামা মদীনার আনসারদের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। মাসজিদে
নববীর আশপাশের কিছু পরিবারের লোকজন মরে যাওয়ায় অথবা অন্যত্র চলে যাওয়ায় মসজিদের পাশের এলাকা খালি হয়ে
গেল। তখন মাসজিদে নববী হতে তিন মাইল দূরে অবস্থানরত বনু সালামা মসজিদের নিকট আসার ইচ্ছা করল। নবী করীম
ﷺ বনু সালামার এই মনোভাব শুনে তাঁদেরকে স্ব স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন, দূর হতে মসজিদে আসার দ্বারা
তোমাদের যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পুণ্য দেওয়া হবে। বনু সালামার এ ঘটনা উল্লেখ করে নবী
করীম ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেন।

دِيَارَكُمْ تَكْتَبُ أُنَارَكُمْ -এর মর্মার্থ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বনী সালামা গোত্র মসজিদে নববীর নিকট আসার ইচ্ছা
পোষণ করলে তাঁদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের আবাস গৃহে অবস্থান কর। কেননা, তোমাদের পদচিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ
করা হবে অর্থাৎ দূর থেকে এসে মসজিদে উপস্থিত হওয়া আর নিকটে এসে অবস্থান করে মসজিদে উপস্থিত হওয়া অবশ্যই
একই মর্যাদার বিষয় নয়। মূলত আল্লাহর কাছে মানুষের প্রতিটি কর্মই মর্যাদার দাবিদার। এ ক্ষেত্রে যে যত বেশি শ্রম ব্যয়
করবে, সে তত বেশি পুণ্যের অধিকারী হবে। আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দূর থেকে মসজিদে এসে উপস্থিত হওয়াকে
উৎসাহিত করেছেন- دِيَارَكُمْ تَكْتَبُ أُنَارَكُمْ বাক্যের মাধ্যমে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبْعَةٌ يَظْلُهُمُ اللَّهُ فِي
ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ
نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعْلُقٌ
بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ
رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ
وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِبًا
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ
حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِيَّايَ أَخَافُ اللَّهَ وَ
رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا
تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ
তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান
দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে
না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. ঐ যুবক- যে নিজের
যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে, ৩. ঐ ব্যক্তি যে
মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে ফিরে না
আসা পর্যন্ত তার অন্তর মসজিদের সাথে টানা থাকে, ৪.
আর ঐ দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর
[সন্তুষ্টির] জন্য, উভয়ে একত্রে মিলিত হয় তাঁরই জন্য এবং
পৃথক ও হয় তাঁরই জন্য, ৫. আর যে নিজেকে আল্লাহকে
স্মরণ করে, আর তার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, ৬.
ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো সজ্জা ও সুন্দরী মহিলা [কুপ্রবৃত্তি
চরিতার্থে] আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে
ভয় করি, এবং ৭. ঐ ব্যক্তি যে দান-সদকা করে তা
গোপনে করে, এমনকি তার ডান হাত কি দান করে তা
বাম হাত জানে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -এর ব্যাখ্যা : এ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সংযুক্ত, যখন সে মসজিদ হতে বের হয়ে পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার মনটা অস্থির থাকে। সে সর্বদা অপেক্ষায় থাকে যে, কখন আযান হবে, কখন জামাত হবে। মাছ যেমন পানির বাইরে অবস্থান করতে পারে না, তদ্রূপ মু'মিন ব্যক্তিও মসজিদের বাইরে অবিচলিত থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে মুনামিক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে তদ্রূপ অশান্তি অনুভব করে, যেমন পাখি বন্ধ খাঁচায় অস্থিত বোধ করে।

الْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَالْمَنَائِقُ فِي الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِي الْقَفَصِ - যেমন বলা হয়ে থাকে-

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُورِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ التَّوَضُّؤَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلِيكَةُ تُصَلِّي عَلَيهِ مَا دَامَ فِي مَصَلَاةِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارحمهُ وَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْسِيئَهُ وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلِيكَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتُؤَرْ فِيهِ مَا لَمْ يَخْدُرْ فِيهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫০. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো ব্যক্তির জামাতে আদায়কৃত নামাজের ছওয়াব তার ঘরে বা দোকানে আদায় কৃত নামাজের ছওয়াব অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি। আর এটা তখনই হয়, যখন সে অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয়। আর এ বের হওয়া তার নামাজ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এ অবস্থায় সে যত কদমই হাঁটে, প্রত্যেক কদমেই জান্নাতে তার জন্য এক একটা পদমর্যাদা উন্নীত করা হয় এবং তার এক একটা গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সে নামাজ পড়তে থাকে ফেরেশতাগণ তার জন্য এক নাগাড়ে দোয়া করতে থাকেন, যে পর্যন্ত সে তার নামাজের জায়গায় থাকে; ‘হে আল্লাহ তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর’। [অতঃপর মহানবী ﷺ বলেন,] তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজেই থাকে।

অপর বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বলেন, যতক্ষণ সে মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ তাকে আবদ্ধ রাখে। আর সে বর্ণনায় ফেরেশতাদের দোয়ায়-এই কথাটি বেশি বলা হয়েছে। ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কর, তুমি তার তওবা কবুল কর।’ ফেরেশতারা এরূপ দোয়া করতে থাকেন, যতক্ষণ সে মসজিদে কাউকেও কষ্ট না দেয় এবং অজু ভঙ্গ না করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায়কারীর মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য নিশ্চয় ফেরেশতারা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে, পাক-পবিত্র অবস্থায় যতক্ষণ সে মসজিদে থাকবে ততক্ষণই তার জন্য দোয়া করবে।

وَعَنْ ٦٥١ أَيْ أُسَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৫১. অনুবাদ : হযরত আবু উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মসজিদে ঢুকে, সে যেন বলে **اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ** 'হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।' আর যখন বের হয়ে যায়, তখন যেন বলে **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ** 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করি।' -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে **رَحْمَةً** ও **فَضْلٌ** -এর ব্যাখ্যা আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে **رَحْمَةً** এবং বের হওয়ার ক্ষেত্রে **فَضْلٌ** -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সে এমন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, যার দ্বারা সে ছুওয়াব লাভ করে থাকে এবং যা তাকে বেশেতের নিকটবর্তী করে দেয়। আর এ ক্ষেত্রে **رَحْمَةً** প্রার্থনা করাই যুক্তিসঙ্গত এবং যখন সে মসজিদ হতে বের হয় তখন বিজিক অন্বেষণে লিপ্ত হয়, যেমন কুরআনে এসেছে-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ -

وَعَنْ ٦٥٢ أَيْ قَتَادَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫২. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকে সে যেন বসে পড়ার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দুই রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাহিয়াতুল মসজিদ। আহলে জাহেদের মতে এ দু' রাকাত পড়া ওয়াজিব, আর আমাদের মতে মোস্তাহাব। তবে মাকরুহ সময়ে বা জামাত শুরু হওয়ার সময়ে প্রবেশ করলে উক্ত নামাজ থেকে বিরত থাকবে এবং নিম্নোক্ত তাসবীহ পাঠ করবে-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْعَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

আর কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে সুন্নত, ফরজ পড়া শুরু করে, তবে তাহিয়াতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

وَعَنْ ٦٥٣ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৩. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ দিনের পূর্বাঙ্ক ব্যতীত সফর হতে বাড়ি আগমন করতেন না। আর যখন আগমন করতেন তখন প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং তথায় দু' রাকাত নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তথায় বসতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِي السَّيْرِ بِأَنَّهَا : সফর হতে সাধারণত দিনের প্রথমংশে বাড়িতে আসাই উত্তম। কেননা এ সময়ে আসলে বাড়ি ওয়ালাদের তেমন কষ্ট হয় না, আর প্রথমে মহল্লার মসজিদে এসে দু' রাকাত নামাজ পড়ে বাড়ি খবর দিয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া উচিত। অন্যথা হঠাৎ বাড়ি গেলে বিভ্রমের সমুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অথবা নিজ স্ত্রীকে অপ্রস্তুত ও সাজ-সজ্জাহীন অবস্থায় পেয়ে মন খারাপ হয়ে উঠতে পারে।

وَعَنْ ٦٥٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنِ لِهَذَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৫৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি শোনে যে, কেউ মসজিদে এসে কোনো হারানো জিনিস তালিশ করছে, তবে সে যেন বলে, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা ফেরত না দিন'। কারণ মসজিদসমূহ এ জন্য বানানো হয়নি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِي السَّيْرِ بِأَنَّهَا : মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। এখানে দুনিয়াবী কোনো কাজকর্ম করা বা আলোচনা করা সম্পূর্ণ হারাম। এ স্থানসমূহ শুধু আল্লাহর ইবাদত ও পরকালীন বিষয়ে আলোচনার জন্যই নির্মিত। কাজেই কোনো হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া বা তালিশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٦٥٥ جَابِرِ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتَنَةِ فَلَا يَفْرِنَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلِيكََةَ تَتَأَذَى وَمَا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৫. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় গাছের [রসুন বা পিয়াজ] কিছু খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে। কেননা, যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তার দ্বারা ফেরেশতাগণও কষ্ট পায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِي السَّيْرِ بِأَنَّهَا : الشَّجَرَةُ الْمُنْتَنَةُ : রসুন গাছকে বুঝানো হয়েছে, আর الْمُنْتَنَةُ অর্থ হলো- দুর্গন্ধময়, তাই এর দ্বারা পিয়াজ-রসুন সহ অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো কাঁচা হলে মাকরুহ হবে, আর রান্না করা হলে মাকরুহ হবে না। এমনিভাবে মুখের গন্ধের মতো শরীরের গন্ধ, তামাকের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ ও কেরোসিনের গন্ধ নিয়ে মসজিদে বা কোনো ওয়াজ মাহফিলে ও হালকায়ে জিকিরে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

ধূমপান করার বিধান : হুক্মা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ধূমপান করে মসজিদের গমন করা মাকরুহ তাহরীমী।

১. মাজ্জুমায়ে ফতোয়া গ্রন্থে আছে, হুক্মা পান করে বা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরুহ তাহরীমী। হুক্মা মাধ্যমে তামাক পান এবং আধুনিক কালের বিড়ি-সিগারেট হিজরি ১১১ (একশত এগারো) সনে প্রচলিত হয়েছে।

২. অবশ্য বর্তমান যুগে কেউ একে মুবাহ, কেউ মাকরুহ তান্বীহী।

৪. আবার কেউ কেউ একে মাকরুহ তাহরীমী বা হারাম বলেছেন।

৫. শাহ্ আলীউল আযহারী মালেকী এবং আরেফ নাবেলী একে মুবাহ বলেছেন। শায়খ ইমাদী মাকরুহ তাহরীমী বলেছেন এবং ধূমপায়ীর পিছনে একতেনা করাও মাকরুহ বলেছেন।
৬. ধূমপান সম্পর্কে 'মাজমুয়ায়ে ফতোয়া'য় বলা হয়েছে, মাকরুহ, 'ফতোয়ায়ে আযহীমী'তে আছে মাকরুহ তাহরীমী। গায়াতুল আওতায়েও তাহরীমী বলা হয়েছে। 'মুযাহিরে হক' গ্রন্থে বলা হয়েছে হারাম। 'শামী' গ্রন্থে আছে মাকরুহ তানযীহী;
৭. মাওলা আবদুল হাই লক্ষ্মীবা (র.) 'তারযীফুল জেনান' গ্রন্থে বলেছেন, ধূমপান হারাম নয়, তবে মাকরুহ হওয়াতে সন্দেহ নেই। চাই যে কোনো প্রকারের মাকরুহ হোক। কাজেই যদি 'মাকরুহ তাহরীমী' হয়, তা হলে এটা পান করা ওনাহ হবে। আর 'তানযীহী' হলে সগীরা ওনাহ হবে। 'দুরের মুখতার' কিতাবে আছে এটা বারবার করলে কবীরা ওনাহ হবে।

وَعَنْ ١٥٦ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মসজিদে থুথু ফেলা পাপ, আর তার কাফফারা হলো তা মুছে ফেলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَمِيذُ হাদীসের ব্যাখ্যা : থুথুকে মাটিতে পুঁতে ফেলার অর্থ হলো মসজিদ হতে একে সরিয়ে ফেলা। যেহেতু তখনকার যুগে মসজিদে নববী ছিল কাঁচা এবং ভিতটিতে শুধু কঙ্কর বিছানো ছিল। কফ, থুথু ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে ফেলা সহজসাধ্য ছিল, এ জন্যই মাটিতে পুঁতে ফেলার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু বর্তমান যুগের অধিকাংশ মসজিদই পাকা। সুতরাং এ যুগে পিকদানী বা ঐ জাতীয় কোনো পাত্র ব্যবহার করে পরে দূরে ফেলে দিতে হবে।

وَعَنْ ١٥٧ أَبِي ذَرٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرِضْتُ عَلَى أَعْمَالِ أُمَّتِي حَسَنًا وَسَيِّئًا فَرَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْآذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّعَاغَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَذْفَنُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৫৭. অনুবাদ : হযরত আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমার উম্মতের ভাল ও মন্দ কাজসমূহ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি তাদের ভাল কাজসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু [কাঁটা] দূর করা; আর মন্দ কাজসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম কফ বা নাসিকার শ্রেণী মসজিদে ফেলা, যা পুঁতে ফেলা হয়নি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَمِيذُ হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদ হলো অতি পবিত্র স্থান আর তাকে সর্বদা পবিত্র রাখাই হলো উত্তম কর্ম। সেখানে থুথু বা শ্রেণী ফেলা অনুচিত কর্ম। এ রূপ কর্ম হতে বিরত থাকাই হলো মুমিনের কর্তব্য।

وَعَنْ ١٥٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يَنْجِي اللَّهُ مَادَامَ فِي مَصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ

৬৫৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজের জন্য দাঁড়ায় তখন সে সম্মুখের দিকে থুথু ফেলবে না; কারণ, সে আত্মাহর সাথে মুনাযাত্তে রত আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজের স্থানে

عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ
تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَيَذَرُهَا وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى
سَمِعَ يَمِينَهُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيَسْرَى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আছে। ডান দিকেও [থুথু ফেলবে] না। কেননা, ডান দিকে ফেরেশতা রয়েছে; বরং সে তার বাম দিকে অর্থাৎ কাপড়ে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলবে, অতঃপর মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, তার বাম পায়ের নিচে ফেলবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ষড় ও উহার সমাধান : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ডান দিকে ফেরেশতা থাকার কারণে থুথু ফেলা নিষেধ; কিন্তু বাম দিকেও তা ফেরেশতা থাকে। এতদসত্ত্বেও **عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ** বলার তাৎপর্য কি? উক্ত প্রশ্নের নিম্নরূপ উত্তর হতে পারে-
- শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে নামাজ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সুতরাং নামাজের মধ্যে অন্যান্য কাজের হিসাব রক্ষকের কোনো হস্তক্ষেপ নেই।
 - তাবারানী শরীফে আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, **عَنْ يَمِينِهِ وَتَحْتِهَا وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى** সূত্রায় থুথু **فَرَسْنِ** অর্থাৎ শয়তানের উপর পড়বে।
 - অথবা উত্তর এই যে, বাম দিকের ফেরেশতা ডান দিকে চলে যায়।
 - অথবা নামাজের অবস্থায় ফেরেশতা এমনভাবে অবস্থান করে যাতে থুথু ইত্যাদি তার নিকট পৌঁছে না।
 - অথবা উত্তর এই যে, উভয় দিকের ফেরেশতার মর্যাদার মধ্যে যে কমবেশি রয়েছে তার প্রতি সতর্ক করার জন্য এবং রহমতের ফেরেশতা ও শাস্তির ফেরেশতার মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ উত্তরটিতে আপত্তি রয়েছে।

وَعَنْ ١٥٩ عَائِشَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ
مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُوا
قُبُورَ أَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** যবে রোগ হতে আর সস্থ হয়ে উঠেননি, সে রোগ শযায় থেকেই বলেছেন, আত্মাহুর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক ইহুদি ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। -[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানানোর অর্থ : আলোচ্য হাদীসটি মাজার ভক্তি বা মাজার পূজার তীব্র প্রতিবাদ। কবরকে মসজিদ বানানোর মধ্যে দুই প্রকারের শিরক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথমতঃ ইহুদি ও নাসারাগণ তাদের নবীদের সম্মান প্রদর্শন ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবরকে সেজদা করতো। এটা ছিল 'শিরকে জঙ্গী' বা স্পষ্ট শিরক।

দ্বিতীয়তঃ তাদের দ্বিতীয় প্রকারের আচরণ ছিল এই নামাজ বা ইবাদত আত্মাহুর উদ্দেশ্যেই করতো, কিন্তু তারা এ কাজ করতো নবীদের মাজারের পার্শ্বে গিয়ে। কেননা, তারা মনে মনে এ বিশ্বাস রাখতো যে, কবরবাসীর প্রতি আত্মাহুর অসীম অনুগ্রহ আছে, তাই তিনি আত্মাহুর নিকট হতে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করে দিতে পারবেন, তাঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং ইবাদতের সময় কবরবাসীর প্রতি মনোনিবেশ করলে আত্মাহু ও সত্ত্বই হবেন, এটা ছিল নবীদের প্রতি তাদের সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা। অথচ এরূপ বিশ্বাস রাখলে এটা হবে 'শিরকে খফী' বা প্রচ্ছন্ন শিরক। বস্তুত উভয় আচরণই আত্মাহুর কাছে

ঘৃণিত। অন্য হাদীসে মহানবী ﷺ নিজের কবর সম্পর্কে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন-
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي رُتْبًا | [যেভাবে বনী ইসলাঈল তাদের নবীগণের কবরসমূহকে
 অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করা না।] যেভাবে বনী ইসলাঈল তাদের নবীগণের কবরসমূহকে
 করেছে। তিনি উমতকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন-
 إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا |
 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন সম্প্রদায়ের উপর অত্যধিক রাগান্বিত, যারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

وَعَنْ ۱۱۰ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ
 النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْآ وَالْآ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
 كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ الْآ فَلَا تَتَّخِذُوا
 الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৬০. অনুবাদ : হযরত জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি- তিনি
 বলেন, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের
 নবীগণের ও সাধু পুরুষদের কবরসমূহকে মসজিদে
 পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে
 মসজিদে পরিণত করা না। আমি তোমাদেরকে এ
 থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবরস্থানে নামাজ পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে কি না এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে
 মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

- ইমাম আহমাদ (র.) ও আবু সওর প্রমুখ ইমামের মতে কবরস্থানে নামাজ পড়া যে কোনো ভাবেই নিষিদ্ধ। আহলে
 যাহেরও এ মত পোষণ করেন। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন-
 الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ-
- ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যদি কবরের মাটি মৃত ব্যক্তির গোশত ও চামড়ার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় তবে অপবিত্র
 হওয়ার ভিত্তিতে এর উপর নামাজ পড়া বৈধ নয়, তবে যদি কেউ পবিত্র স্থানের দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তা হলে তা বৈধ হবে।
- ইমাম আযম আবু হানীফা (র.), সুফিয়ান সওরী ও আওযায়ী প্রমুখের মতে কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরুহ। ইমাম আহমদ
 প্রমুখ যে *الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ* দ্বারা দলিল উপস্থাপন করেছেন, তার উত্তর হলো, উক্ত হাদীসটি
 মাকরুহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরুহ।

وَعَنْ ۱۱۱ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوا فِي بَيْوتِكُمْ مِنْ
 صَلَوَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৬১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-
 তোমাদের কিছু কিছু নামাজ তোমাদের ঘরেও সমাধা
 করা, একে কবর (সম) বানিয়ে ফেলা না। -[বুখারী ও
 মুসলিম]

الدَّفْعُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱۲ ابْنِ مَرْثَدَةَ (رض) قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৬৬২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-
 পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যখানেই কেবলা। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنِ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ قِبَلَةَ -এর ব্যাখ্যা : 'পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে কেবলা।' এ বাকটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন-

১. উত্তর দিকের লোকদের দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামাজ পড়লেই চলবে, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নাক বরাবর কেবলাকে সোজা করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কা'বা শরীফ মদীনা হতে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণে অবস্থিত। অতএব মদীনাবাসীদের কেবলা হলো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে অর্থাৎ দক্ষিণে। এভাবে দক্ষিণ দিকের মুসলমানদের কেবলা উত্তর দিকে, পশ্চিম দিকের লোকদের কেবলা পূর্বদিকে এবং পূর্বদিকের মুসলমানদের কেবলা পশ্চিম দিকে। মোটকথা, শুধুমাত্র حَيْثُ বা দিককে সমুখে রাখলেই চলবে কা'বা শরীফকে নাক বরাবর সোজা সামনে রাখতে হবে না।
২. অথবা কেবলা তথা কা'বা শরীফ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত।
৩. অথবা পৃথিবীর মধ্যখানে কেবলা। সুতরাং চতুর্দিকের মুসলমান কেবলাকে কেন্দ্র করে এবং কেবলামুখী হয়ে নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগী করলে কার্যত কেবলা মধ্যবর্তী স্থানেই প্রমাণিত হয়।
৪. অথবা যারা দুই দিকের ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈরুত যে কোনো এক কোণে অবস্থিত, তারা বিপরীত দিককে সামনে রেখে নামাজ আদায় করলে চলবে। কেননা কেবলা তার মাঝখানে থাকবে।

وَعَنْ ٦٦٣ طَلِقَ بِنِ عَلِيٍّ (رَضًا) قَالَ
خَرَجْنَا وَفَدَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ
بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ
فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ
وَتَمَضَّضَ ثُمَّ صَبَّهَ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا
فَقَالَ أَخْرُجُوا فَإِذَا اتَّيْتُمْ أَرْضَكُمْ
فَاكْسِرُوا بِبَيْعَتِكُمْ وَأَنْضِحُوا مَكَانَهَا
بِهَذَا الْمَاءِ وَأَتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا قُلْنَا إِنَّ
الْبَلَدَ بَيْعِدٌ وَالْحَرُّ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ
فَقَالَ مَدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا
طِينًا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৬৬৩. অনুবাদ : হযরত তালক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা গোত্রীয় দূত রূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গমন করলাম, অতঃপর তাঁর কাছে বাইয়াত করলাম ও তাঁর সাথে নামাজ পড়লাম। এরপর আমরা তাঁকে জানালাম, হুয়ূ! আমাদের অঞ্চলে আমাদের একটি গির্জা আছে, [তা আমরা ভেঙ্গে ফেলব না কী করব?] অতঃপর আমরা তাঁর নিকট তাঁর অজু করা [বাবরুহতা] পানি তাবারুক স্বরূপ চাইলাম। সুতরাং তিনি পানি আনালেন এবং অজু করতে শুরু করলেন এবং কুল্লি করলেন আর ঐ পানি আমাদের জন্য একটি পাত্রে ভরে দিলেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। যখন তোমরা তোমাদের অঞ্চলে পৌছবে তখন তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঐ স্থানটিতে এ পানিগুলো ছিটিয়ে দেবে, অতঃপর একে মসজিদে রূপান্তরিত করবে। আমরা বললাম, হুজুর আমাদের জনপদ অনেক দূরে এবং গরমও ভীষণ, পানি শুকিয়ে যাবে। তখন হুয়ূর বললেন, আরও পানি এতে মিশিয়ে বাড়িয়ে নেবে এতে তার পবিত্রতা বরং বৃদ্ধি পাবে, কমবে না। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গির্জাকে মসজিদে পরিবর্তন করার বিধান : হযরত তালক ইবনে আলী (রা.) ইসলামের পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন, গির্জা ছিল তাদের ইবাদতখানা, তাই আলোচনায় এর উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে, হুয়ূর মূলে গির্জাকে ভেঙ্গে মসজিদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আসলে তা নয়, বরং পৃথের যে যে অংশে মসজিদের বিপরীত তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে 'মেহরাব'। তাদের কেবলা ছিল বায়তুল মাকদাস, অথচ আমাদের কেবলা হলো বায়তুল্লাহ শরীফ।

মোট কথা, গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশের মাধ্যমে কোনো সম্প্রদায়ের ইসলাম পূর্ব সময়ের পবিত্র ও সন্মানিত স্থানকে ইসলাম গ্রহণের পরও সন্মানিত স্থান হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার এবং তাকে অপমানিত না করার প্রতি পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। মুসলমানরা বিধর্মীদের বহু দেশ জয় করেছে, কিন্তু তাদের কোনো একটি ধর্মীয়শালা মুসলমানরা অবমাননা করেছে এমন একটি নজিরও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানরা যুদ্ধাভিযানে বের হলে মুসলমানদের মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করতো, অথচ মুসলমানরা কখনো এরূপ করেনি।

وَعَنْ ۱۱۴ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ يَنْظَفَ وَيُطَيَّبَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬৬৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ বানাতে, তাকে পাক-পবিত্র রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। —[আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱১৫ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ

উদ্দেশ্য : হাদীসের শব্দ الدُّورُ ঘারা মহল্লা এবং গৃহকোণ উভয়টি বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মসজিদরূপে নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে। নামাজ পড়ার স্থান হিসাবে একে মসজিদ বলা হয়েছে। সুতরাং শরিয়ত সম্মত মসজিদের সকল বিধি-বিধান এতে প্রযোজ্য নয়। আর যদি হাদীসে الدُّورُ শব্দের অর্থ 'মহল্লা' 'মহল্লা' নেওয়া হয়, তখন অর্থ হবে, যেখানেই জনপদ ও লোকের বসতি রয়েছে সেখানেই মসজিদ থাকতে হবে যেন মহল্লা বা পাড়ার লোকেরা জামাতে নামাজ আদায় করতে পারে, তবে অন্য কোনো মসজিদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যেন না হয়। তখন এটা মসজিদে ضَرَارٌ 'মসজিদে যিরার' এর আওতায় পড়বে, তা নির্মাণ করা হারাম।

وَعَنْ ۱۱৬ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَزُخْرَفَنَّهَا كَمَا زُخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— মসজিদকে চাকচিক্যময় করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, [কিন্তু পরিতাপের বিষয়] তোমরা একে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত, কান্নাকাঁচ মণ্ডিত ও চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদি ও নাসারাগণ করেছে। —[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱১৭ هَادِيَسَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ هَادِيَسَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ

হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের এত উন্নত প্রক্রিয়া মানুষের জানা ছিল না। সে যুগের মানুষের বাড়ি-ঘর সাদামাঠা ছিল। মসজিদ ছিল তেমনি। এ যুগে মানুষের বাড়িঘরের চাকচিক্য ও অভিনবত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব অনেকের মতে, মসজিদেও যেন ঘর-বাড়ির সাথে সমতা রক্ষা করে চাকচিক্য ও পৌনর্ষ বৃদ্ধি করা হয়। মসজিদকে ঘর-বাড়ি হতে হীন করে না রাখাই শ্রেয়। তবে এতে ইবাদতের স্থান হিসাবে যাতে ভাব-গম্বীর বজায় থাকে সে ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

মসজিদকে সাজানো ও মজবুত করা সম্পর্কে মতভেদের বর্ণনা : মসজিদকে সাজানো ও চিত্রায়িত করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আত। কেননা নবী করীম ﷺ এরূপ করেননি এবং এতে আহলে কিতাবের অনুসরণ রয়েছে। বরং মসজিদ মজবুত করাও এ হাদীস ঘারা বিদ'আত বুঝা যায়।

বদর ইবনে মুনাীর ও অন্যান্য জায়েজ অভিমত পোষণকারীগণ বলেন, যখন লোকেরা নিজ নিজ বাড়ি ঘরকে সাজাচ্ছে, তখন মসজিদকে সাজানো উচিত, নতুবা মসজিদের অপমান হয়। তা ছাড়া মসজিদের সাজ-সজ্জার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের থেকে বিরোধিতা পাওয়া যায়নি। সুতরাং যে এরূপ মসজিদকে চাকচিক্য করেছে সে বিদ'আতে হাসানা করেছে এবং মসজিদের প্রতি স্নেহ-করমের আওহ্য সৃষ্টি করেছে।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَّبِعَهُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬৬৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, মানুষ মসজিদ নিয়ে একে অপরের সাথে গর্ব করবে। -[আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেম্ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মসজিদ নিয়ে গর্ব করার তাৎপর্য : এ কথার তাৎপর্য হলো, মানুষ নিজের নাম-কাম ও যশ-সুখ্যাতির জন্য এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বড় বড় শান্দার ও জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করবে, এতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকবে না। অথবা হাদীসটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, মূলত মসজিদ হলো নিছক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার স্থান, কিন্তু তদন্বলে মানুষ তথায় বসে বিভিন্ন ধরনের গর্ব-অহঙ্কার করবে।

মসজিদ নিয়ে গর্ব করা কিয়ামতের নিদর্শন : মসজিদ ইবাদত ও বিনয়ানবত হওয়ার স্থান। মসজিদে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকে না; কিন্তু এমন দিন আসবে যখন মসজিদেও এ ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে, আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই মানুষ অবনত হবে না। ধনী ও সন্ত্রাস্তগণ বাইরের অহঙ্কারবোধ মসজিদের ভিতরেও পোষণ করবে। ফলে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, ভেদাভেদ মসজিদের ভিতরেও বিরাজ করবে।

وَعَنْ عُرَيْضَةَ عَلِيٍّ جُرُوبُ امْتِي حَتَّى الْقَدَاوِ يُخْرِجَهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرَيْضَةَ عَلِيٍّ ذُنُوبُ امْتِي فَلَمْ أَرِ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ تَيْبَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ)

৬৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমার কাছে আমার উম্মতগণের প্রতিদান [ছওয়াব] সমূহ উপস্থাপন করা হয়, এমনকি কেউ মসজিদ হতে একটি খড়-কুটা বাইরে ফেলে থাকলে তার ছওয়াবও। এরূপে আমার কাছে আমার উম্মতগণের গুনাহসমূহও উপস্থাপন করা হয় তখন আমি এ থেকে বড় কোনো গুনাহ দেখিনি যে, কোনো ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা বা আয়াত দান করা হয়েছে, অতঃপর সে তা ভুলে গেছে। -[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উভয় হাদীসের ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ বা একটি সূরা মুখস্থ করার শক্তি লাভ করা আল্লাহর বিরাট দান ছাড়া কিছুই নয়। যে মুখস্থ করল তার উচিত নিয়মিত তেলাওয়াত করে তাকে মানসপটে পঁেখে রাখা। এভাবে এর মর্যাদা রক্ষা পায়। আর চর্চা না করলে তুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে যে ভুলে যায় সে তার অবমাননা বা অমর্যাদা করল বলে বুঝা যায়। এভাবে কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া বিরাট গুনাহ। তাই মহানবী ﷺ এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

গুনাহে কবীরাহ-এর বিশ্লেষণ : **بَابُ الْكَبَائِرِ** -এর মধ্যে **أَكْبَرُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ** -এর জবাবে শিরককে **أَكْبَرُ الذُّنُوبِ** বলা হয়েছে। এখানে **نَسِيَانُ سُورَةٍ** -কে কিভাবে **أَكْبَرُ الذُّنُوبِ** বলা হয়েছে? এর উত্তর এই যে, যদি **أَكْبَرُ** এবং **كَبِيرٌ** উভয় শব্দকে **مُرَادُونَ** হওয়া মেনে নেওয়া হয় তা হলে উত্তরে বলা যাবে যে, উভয় স্থানে দুই ভিত্তিতে **হুকুম** হয়েছে—

১. শিরককে **أَكْبَرُ** বলা আল্লাহ তা'আলার জাতের দৃষ্টিতে আর **نَسِيَانُ سُورَةٍ** -কে **أَكْبَرُ** বলা আহকামের দৃষ্টিতে। সূত্রান্ত উভয়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।
২. অথবা বলা যায় যে, যদি **سِيْفَانٌ** -এর ভিত্তিতে না হয়, তা হলে **نَسِيَانُ سُورَةٍ** সগীরার মধ্যে **أَكْبَرُ** আর শিরক **بَابُ الْكَبَائِرِ** -এর মধ্যে **أَكْبَرُ** হবে।

وَعَنْ ۱۱۸
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَرِّ الْمَشَائِمِ فِي
 الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ
 ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ)

৬৬৮. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যারা অন্ধকারে
 মসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ
 জ্যোতির সুসংবাদ দাও। -[তিরমিযী ও আবু দাউদ এ
 হাদীসটি ইবনে মাজাহ সাহল ইবনে সা'দ ও আনাস (রা.)
 হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱১৮ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, রাতের
 অন্ধকারে কষ্ট স্বীকার করে যারা ইশার জামাতে হাজির হয় তাদের জন্য কিয়ামতের দিবসে নূরের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা,
 সে এ কষ্ট আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করেছে। আজকাল আমাদের সমাজেও বাস্তব জীবনে এরূপ অবস্থা অনেক আছে
 যে, আমাদেরকে অনেক কষ্টে মসজিদে যেতে হয়, তখন আমাদেরকে এ আকিদা রাখতে হবে যে, আমরা এ কষ্টের বিনিময়ে
 আল্লাহর নিকট অবশ্যই বিরাট প্রতিদানের অধিকারী হবে। আর এ বিষয়ে সমাজের লোকদেরকে অবহিত করে তাদেরকেও
 জামাতের প্রতি উৎসাহিত করা আমাদের কর্তব্য।

عَنْ ১১৯ হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর একটি মসজিদ নির্মাণ
 করলেন। [যা বর্তমানের মসজিদে নববী নামে প্রসিদ্ধ।] এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য মুসল্লিগণ যাতে যথাসময়ে
 উপস্থিত হতে পারে এ জন্য আযানের বিধান প্রবর্তন করেন। মসজিদ হতে বহু দূরে অবস্থানকারী মুসল্লিগণের অন্ধকারের
 কারণে ইশার জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে আপত্তি তুলল। রাসূল
 ﷺ তখন মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য মুসল্লিদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত
 হাদীসটি বর্ণনা করেন।

وَعَنْ ۱১৯
 أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
 (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ
 الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ
 بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَغْمُرُ
 مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৬৬৯. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যদি
 কাউকেও দেখে যে, সে নিয়মিত মসজিদে আসে যায়
 এবং তার তত্ত্বাবধান ও খেদমত করে তখন তোমরা তার
 ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা
 إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
 وَالثَّوَمِ الْأَخِيرِ অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের
 উপর বিশ্বাস রাখে সে-ই মসজিদসমূহকে আবাদ রাখে।
 -[তিরমিযী, ইবনে, মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ১১৯-এর অর্থ : মসজিদকে আবাদ রাখার অর্থ-সব সময় মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখা, মসজিদের
 তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং নামাজ, দোয়া-কালাম ও জিকির-আখ্কার এবং ইবাদতের দ্বারা একে আবাদ রাখা।
 আর এ পবিত্র দায়িত্ব ঐ ব্যক্তি করতে পারে, যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের এবং কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে। যেমন,
 কুরআনে আছে-
 إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَعَنْ ۱۷ عُمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ (رض) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لَنَا فِي الْإِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَلَا اخْتَصَى إِنَّ خِصَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ قَالَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ ائْتِظَارَ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

৬৭০. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে খোজা হতে অনুমতি দিন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও খোজা করেছে কিংবা নিজে খোজা হয়েছে, সে আর আমার দলে নেই। আমার উম্মতের খোজাত্ব রোজা রাখা। [কেননা, রোজা কাম-প্রবৃত্তিকে দমন করে।] অতঃপর ইবনে মাযউন বললেন, হযূর! আমাদেরকে দেশ ভ্রমণের অনুমতি দিন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ ও পর্যটন হলো আল্লাহর পথে জিহাদে গমন করা। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) বললেন, হজুর! আমাদেরকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে সংসার বিরাগী হতে অনুমতি দিন। উত্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। -[শরিহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শান হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) রাসূল ﷺ-এর দুধভাই ছিলেন। আসহাবে সুফ্ফা মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ঠিক, কিন্তু স্ত্রীদের ব্যয়ভারের সামর্থ্য তাঁদের ছিল না, এ জন্য তাঁরা হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-কে এই বলে রাসূল ﷺ পর্যন্ত পাঠালেন যে, স্ত্রী গ্রহণের প্রতি আমাদের কোনোরূপ আসক্তি না থাকে এমন কোনো উপায় আছে কি? অতঃপর রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসটি এরশাদ করেন।

খোজা হওয়া, ভ্রমণ করা এবং বৈরাগী হওয়ার বিধান : উল্লিখিত হাদীসটির মধ্যে তিনটি কাজের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, খোজা হওয়া, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করা ও সন্ন্যাস জীবন-যাপন করা। প্রথমত খোজা হওয়া সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর কথার ব্যাখ্যা হলো, আধুনিক কালে একে বলা হয় 'ভ্যাসকটমী' যা জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ যখন নিজের স্ত্রীর ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণ দিতে পারত না তখন খোজা বা নপুংসক হয়ে যেত। ইসলামে এরূপ ভ্যাসকটমী বা খোজা হওয়া হারাম। জন্মনিয়ন্ত্রণের অপর পদ্ধতি হলো 'আযল'। আজাদ নারীদের সহবাসের বেলায় খাদ্যাভাবের ভয়ে এ আযল নীতি অবলম্বন করাও হারাম। দ্বিতীয়ত ভ্রমণ পর্যটন তথা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়। ইসলামে এর অনুমতি দেয় না। বর্ণিত হাদীসই এর প্রমাণ। অবশ্য আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন অবলোকন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করা জায়েজ আছে, কুরআন হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তৃতীয়ত সংসার ত্যাগী হয়ে বৈরাগ্য-সন্ন্যাস জীবন-যাপন করাও হারাম। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।

وَعَنْ ۱۷ عِبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتَ رَيْسَ جَلٍّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَ عَزَّ وَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ

৬৭১. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- একবার আমি আমার মহাপরাক্রমশালী প্রভূকে অতি উত্তম অবস্থায় [বশ্লে] দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কী বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত। তখন

فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَيْفَى فَوَجَدَتْ بَرْدَهَا
بَيْنَ تَذِيى فَعَلِمَتْ مَا فِى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَتَلَا وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ
- (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

وَلِلْتَمِزِيذِي نَحْوَهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ
هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى
قُلْتُ نَعَمْ فِى الْكُفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ
الْمُكْتُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ
وَالْمَشَى عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ
وَابْتِلَاحِ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ
ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ
خَطِيئَتِهِ كَيْوَمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ
الْمَسَاكِينِ فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً
فَاقْبِضْنِى إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قَالَ
وَالدَّرَجَاتِ إِنْشَاءً السَّلَامِ وَاطْعَامِ الطَّعَامِ
وَالصَّلْوَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا وَلَفْظُ هَذَا
الْحَدِيثِ كَمَا فِى الْمَصَابِيحِ لَمْ أَجِدْهُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا فِى شَرْحِ السُّنَنِ .

আল্লাহ তা'আলা তাঁর [কুদরতের] হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আকাশসমূহে ও জমিনে যা কিছু আছে সবই অবগত হলাম। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উদাহরণ স্বরূপ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - এরূপে আমি দেখাই ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। [দারেমী এহাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।]

তিরমিযী-ও এরূপ একটি হাদীস সেই আব্দুর রহমান থেকে এবং ইবনে আক্বাস ও মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে এবং এতে এ কথাটি বেশি বলেছেন, 'তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মদ! ﷺ আপনি বলতে পারেন কি শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কী নিয়ে বিতর্ক করছে?' আমি বললাম, হাঁ, 'কাফ্ফারাত' নিয়ে বিতর্ক করছে। আর 'কাফ্ফারাত' হলো, (ক) নামাজের পর মসজিদে অবস্থান করা। (খ) পায়ে হেঁটে জামাতে হাজির হওয়া। (গ) কষ্টের সময়ও পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ অজু করা। যে এটা করবে সে কল্যাণের সাথে বাঁচবে এবং কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে তার গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মদ! যখনই নামাজ পড়বেন, এই দোয়া করবেন; اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ - হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি, ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দকাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালোবাসতে। হে খোদা! যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফেতনা -ফ্যাসাদ ও বিপর্যয়ে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফেতনামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন, 'দারাজাত' হলো, খুব বেশি সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাতে নামাজ পড়া যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন থাকে।

[গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসের শব্দগুলো মাসাবীহ কিতাবে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তা আমি শরহে সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ হতে বর্ণিত পাইনি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্তম অবস্থায় দেখার তাৎপর্য: নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে যে অবস্থায় দেখেছেন তাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার আকার ও আকৃতি আছে। তিনি শারীরিক আকৃতি বিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যে কোনো আকৃতি হতে পবিত্র। সুতরাং এতে দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এ হৃদয়ের সমাধান এই যে, যদি দেখার দ্বারা স্বপ্নের দেখা অর্থ হয়, তবে এখানে কোনো দৃশ্যই নেই। কারণ অনেক সময় স্বপ্নে অদৃশ্য বস্তুকে দৃশ্যমান, আবার দৃশ্যমান বস্তুকে অদৃশ্যমান মনে হয়। অতএব স্বপ্নে দৃশ্যমান মনে হলেও আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়নি। আর নিম্নলিখিত হাদীসগুলোতে বুঝা যায় যে, এ দেখা স্বপ্নে দেখা ছিল। যেমন-

১. তাবারানীর হাদীসে আছে- **قَالَ (ص) إِنِّي صَلَّيْتُ اللَّيْلَةَ مَا قَطَيْتُ رَيْبِي وَضَعْتُ جَبِينِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** এবং ২. হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে- **فَتَمَسَّتُ فِي صَلَاتِي الْحَرَامِ**

※ আবার কেউ কেউ বলেন যে, জ্ঞাত অবস্থায় দেখেছেন, যেমন- ইমাম আহমদ ইবনে হাযল (র.) বলেন, **قَالَ (ص) فَتَمَسَّتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَبَقَطْتُ فَاذَا أَنَا بِرَيْبِي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ** এমতাবস্থায় উপরোক্ত হৃদয়ের সৃষ্টি হবে। তা হলে হৃদয়ের সমাধান এই যে,

১. হাদীসে উল্লিখিত 'সূরাত' শব্দের প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং গুণ, মহিমা ও গরিমা এখানে উদ্দেশ্য। তা হলে হাদীসের অর্থ হবে- আমি আল্লাহ আযয ও জাভ্বাকে তাঁর উত্তম গুণ-গরিমা, অপরিমিত মহিমা সহকারে দেখেছি। এখানের বাহিকা অবস্থা নয়, বরং আল্লাহ যে, মহীয়ান গরীয়ান তা বুঝানো হয়েছে। ২. দ্বিতীয় জবাব এই যে, হাদীসটি প্রকাশ্য অর্থে আকৃতিই বুঝিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলারও আকৃতি আছে; কিন্তু ঐ আকৃতি সৃষ্ট কোনো বস্তুর মতো নয় এবং ধ্বংসশীল কোনো জিনিসের মতো নয়; বরং আমাদের কল্পনাতীত, অখচ মহা-মহীয়ান আল্লাহর মহীয়ান আকৃতি তারই মতো ছিল। ঐ আকৃতিতে রাসূল ﷺ দেখেছিলেন। ৩. তৃতীয় জবাব এই যে, সমস্যা ভাষন দেখা দেবে যখন **أَحْسَنُ صُورَةٍ** বাক্যাংশকে **رَيْبِي** শব্দের **حَال** বলে ধরা হবে; কিন্তু এটাও হতে পারে যে, **أَحْسَنُ صُورَةٍ** শব্দের যমীর **فَاعِل** হতে **حَالٌ** হয়েছে। তা হলে কোনো সমস্যাই থাকে না। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে 'আমি আমার মহীয়ান-গরীয়ান প্রভুকে এমন অবস্থায় দেখেছি যখন আমি উত্তম অবস্থায় ছিলাম।'

وَعَنْ (ص) وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ كُلْهُمُ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَقَّأَ فَيَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَأَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - (رواه أبو داود)

এর অর্থ: এখানে 'হাত' অর্থ প্রকৃত হাত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হাত-পা বা কোনো প্রকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। বরং বাক্যের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে অভিহিত করলেন। ফলে তিনি অসীম মেহেরবানী করে আকাশসমূহ ও মাটির পৃথিবীর অনেক জ্ঞানদান করলেন। অবশেষে অনেক দুর্লভ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মহানবী ﷺ আত্মতৃপ্তি পেলেন। ফলে তাঁর জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হলো, প্রাণ শীতল হলো। প্রকাশ্য বাক্য এই অপ্রকাশ্য অর্থেরই ইঙ্গিত বহন করে। এটা হলো 'যার শীতলতা' আমি আমার বক্ষ অনুভব করলাম।

وَعَنْ (ص) إِنِّي صَلَّيْتُ اللَّيْلَةَ مَا قَطَيْتُ رَيْبِي وَضَعْتُ جَبِينِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَعَنْ (ص) فَتَمَسَّتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَبَقَطْتُ فَاذَا أَنَا بِرَيْبِي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

وَعَنْ (ص) وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ كُلْهُمُ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَقَّأَ فَيَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَأَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - (رواه أبو داود)

৬৭২. অনুবাদ: হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তিন ব্যক্তি আছে যারা সকলেই আল্লাহর দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে। (১) যে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়েছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করান অথবা ঐ যুদ্ধে সে যে ছওয়াব বা গনিমত লাভ করেছে, তা সহকারে তাকে সইহী সালামতে ফিরিয়ে আনেন। (২) ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে যে মসজিদে গমন করেছে। (৩) আর সে ব্যক্তিও আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে যে সালাম সহকারে ঘরে প্রবেশ করেছে। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ এর অর্থ : এখানে اللّٰهِ শব্দের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ অনুগ্রহ করে এদের দায়িত্ব বেঞ্চায় নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন; অথবা, ضَامِنٌ এখানে فَاعِلٌ এর অর্থে ব্যবহার হয়নি বরং مَفْعُولٌ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং ضَامِنٌ يَمْنَعُنِي مَضْمُونٌ যেমন আল্লাহর কালামে বর্ণিত হয়েছে اَوْقِفْ-এর অর্থ আন্তাহর কালাম ডَافِعٌ مِنْ سَاءِ دَافِعٍ عَاصِمٌ এবং عَاصِمٌ ব্যবহৃত হয় مَعْصُومٌ অর্থে اللّٰهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهُ অর্থে لا عَاصِمَ الْيَوْمِ مِنْ أَمْرِ اللّٰهُ অর্থ لا ইত্যাদি। অর্থাৎ এদের সম্পর্কে যে ওয়াদা- অঙ্গীকার করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ, দুনিয়ার ক্ষতি ও আখেরাতের হতাশা হতে তাদেরকে হেফাজতে রাখবেন।

رَجُلٌ رَّاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْغ- এর অর্থ : হাদীসে উল্লিখিত আলোচ্য বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে—

১. এমন ব্যক্তির হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের উপর অপরিহার্য করে নেন।
২. আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে ছুওয়াব প্রদান করেন এবং তার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন না।

رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ- এর অর্থ : 'যে ব্যক্তি সালাম সহকারে নিজ গৃহে প্রবেশ করে সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকে' - ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাকে প্রচুর ছুওয়াব ও কল্যাণ দান করেন। বর্ণিত আছে—

رَأَى عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لَيْتَنِي إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَهْلِكَ تَسَلَّمَ بِرُكْعَةٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

তবে গৃহভাঙুরে যদি কেউ না থাকে তা হলে নিজের প্রতি সালাম করবে এবং وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ وَعَلَى الصَّالِحِينَ বলবে। যোগ করার রহস্য এই যে, হয়তো বা গৃহভাঙুরে ফেরেশতা বা মুসলিম জিন রয়েছে।

عَنْ ۱۷۳ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَوةٍ مَكْتُوبَةٍ فَاجْرَهُ كَأَجْرِ النَّجَاحِ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا رِيَاءَهُ فَاجْرَهُ كَأَجْرِ الْمُغْتَمِرِ وَصَلَوةٍ عَلَى أَتْرِ صَلَوةٍ لَا لَفْرَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيَيْنِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

৬৭৩. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যে ব্যক্তি অজু করে ঘর হতে বের হয় এবং ফরজ নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে তার ছুওয়াব একজন ইহ্রামধারী হাজীর ছুওয়াবের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি যোহর নামাজ [পূর্বাঙ্কে চাশতের নামাজ] -এর জন্য ঘর হতে বের হয় এবং শুধুমাত্র চাশতের নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে তার ছুওয়াব এক ওমরা আদায়কারীর ছুওয়াবের সমতুল্য। আর এক নামাজের পর দ্বিতীয় নামাজের জন্য অপেক্ষমান থেকে সে নামাজ পড়া এবং উভয় নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা বা বেহুদা কাজ না করা [এত উত্তম কাজ যে, তা] 'ইল্লিয়ীনে' লেখা হয়।—[আহমদ ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَسْبِيحِ الضُّحَى- এর অর্থ : সূর্যোদয়ের পর হতে দুপুরের পূর্বে যে সব নফল নামাজ আদায় করা হয় তাকে যোহর নামাজ বলা হয়। যেমন— ইশ্রাক, চাশ্ত ইত্যাদি। দু' দু' রাকাত কিংবা চার চার রাকাত উভয়ভাবে আদায় করা যায়। একেই উক্ত হাদীসে "তাসবীহুযযোহা" বলা হয়েছে। 'ওয়াহ' হজের মতো বায়তুল্লাহ শরীফকে কেন্দ্র করে একটি ইবাদত। এতে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করা ব্যতীত হজের অন্যান্য কার্যগুলো সম্পন্ন করতে হয়, যেমন— ইহ্রাম, তওয়াফ ও সায়া ইত্যাদি। 'ইল্লিয়ীনে' এটা উর্ধ্বলোকের একটি স্থানের নাম, যেখানে ফেরেশতাগণ মু'মিনদের আমল লিখে রাখেন। অথবা মু'মিনদের আখা যেখানে রাখা হয় তাকে ইল্লিয়ীনে বলা হয়। এর বিপরীত স্থানকে বলা হয় 'সিঙ্কীনে', যেখানে জাহান্নামীদের আত্মা রাখা হয়।

وَعَنْ ١٧٤ أَيْسَى مَرْبَرَةَ (رض) قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ
 الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
 رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قَبِيلُ وَمَا
 الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
 (رواه الترمذی)

৬৭৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ‘যখন
 তোমরা বেহেশতের উদ্যান দিয়ে যাবে তখন তার ফল
 খাবে [অর্থাৎ জিকির করবে নিচুপ থাকবে না]। তাঁকে
 জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বেহেশতের উদ্যান
 কি? তিনি বললেন, ‘মসজিদসমূহ’। পুনরায় প্রশ্ন করা
 হলো, ‘আর ফল খাওয়া কি? হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি
 বললেন, ‘سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ’
 বলা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে যে ফল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে এর অর্থ হলো, আল্লাহর জিকির
 করা তথা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা, প্রশংসা করা এবং একত্ব ও মহত্বের ঘোষণা দেওয়া। এখানের জিকিরকে ফল খাওয়ার
 সাথে এ জন্য তুলনা করা হয়েছে যে, জিকির ছাওয়ার লাভের কারণ। সুতরাং ফল খাওয়া দ্বারা যেমন উদর পূর্ণ হয় তেমনি
 জিকির দ্বারা আমলনামা পূর্ণ হয়।

উক্ত হাদীসে মসজিদকে বেহেশতের বাগান বলা হয়েছে। অথচ অপর এক হাদীসে জিকিরের মজলিসকে বেহেশতের উদ্যান
 বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা মসজিদের ক্ষেত্রেও জিকিরের মজলিস শব্দের প্রয়োগ প্রযোজ্য
 হয়। মূলত ‘জিকিরের মজলিস’ শব্দটি ব্যাপক এবং ‘মসজিদ’ শব্দটি নির্দিষ্ট। তবে মসজিদ যেহেতু ইবাদতের সর্বোত্তম ও
 সর্বোৎকৃষ্ট স্থান, তাই এখানে বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.
 (رواه أبو داود)

৬৭৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ‘যে
 লোক মসজিদে যে উদ্দেশ্যে আসে তাই তার প্রাপ্য হয়।’
 –[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মসজিদে আগমনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে
 নিয়তে মসজিদে আসবে তা-ই হবে তার প্রাপ্য দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে আসলে দুনিয়া পাবে, আর আখেরাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে
 আসলে আখেরাত পাবে।

وَعَنْ ١٧٦ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ (رض) عَنِ جَدِّهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ
 الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ

৬৭৬. অনুবাদ : [মহিলা তাবেয়ী] হযরত ফাতিমা
 বিনতে হুসাইন (র.) আপন দাদী হযরত ফাতিমায়ে কুবরা
 বিনতে রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,
 মহানবী ﷺ [অর্থাৎ আমার পিতা] যখন মসজিদে প্রবেশ
 করতেন, তখন মুহাম্মদের প্রতি [অর্থাৎ নিজের প্রতি দরুদ
 ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, হে আমার প্রভূ!

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ
وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي
أَبْوَابَ فَضْلِكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ
وَأَبْنُ مَاجَةَ) وَفِي رَوَايَتَيْهِمَا قَالَتْ إِذَا
دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا إِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ
اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ يَدُلُّ صَلَّى
عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ
إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ
لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى) .

তুমি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং তোমার
বহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন
মসজিদ হতে বের হতেন, তখনও মুহাম্মদের প্রতি দরুদ ও
সালাম পাঠ করতেন। আর বলতেন, হে পরওয়ারদেগার!
আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য
তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দাও। - [তিরমিযী,
আহমদ ও ইবনে মাজাহ] কিন্তু শেষোক্ত দু' জনের বর্ণনায়
রয়েছে, হযরত ফাতিমায়ে কুবরা (রা.) বলেছেন, যখন
মহানবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এরূপে যখন
তিনি মসজিদ হতে বের হতেন, তখন বলতেন, অর্থাৎ,
আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, আর আল্লাহর রাসুলের প্রতি
শান্তি বর্ষিত হোক। صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ
বাক্যাংশের পরিবর্তে। তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি বর্ণনাসূত্র
[সনদ] মুক্তাসিল নয়। কেননা, ফাতিমা বিনতে হুসাইন
ফাতিমায়ে কুবরাকে দেখেননি, অর্থাৎ তাদের পরস্পর
সাক্ষাৎ হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ بْنِ سُرْحٍ الْحَدِيثِ
ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এর কারণ হলো, এর দ্বারা তাঁর উখতদেরকে শিক্ষা দানই উদ্দেশ্য অথবা ক্ষমা প্রার্থনা উচ্চ মর্যাদা
লাভের জন্যই করেছেন।

وَعَنْ ٦٧٧
عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ
تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ
وَالْإِشْتِرَاءِ فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৬৭৭. অনুবাদ : হযরত আমার ইবনে শোয়াইব
(রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন
যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কবিতা আবৃত্তি
করতে, তাতে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমার দিন
নামাজের পূর্বে মসজিদে লোকজনকে গোল হয়ে বসতে
নিষেধ করেছেন। - [আবু দাউদ ও তিরিমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ بْنِ سُرْحٍ الْحَدِيثِ
করেছেন, যা নিম্নরূপ—

- কবিতা আবৃত্তি করা। এ নিষেধাজ্ঞাটি الْبَيْعُ عَنْهُ الْبَيْعُ -এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা মূলত অশ্লীল ও অলীক কবিতা
আবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামি কবিতা এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, হাঙ্গসান ইবনে সাবিত ও
কা'আব ইবনে মুহাম্মদের মতো সাহাবী-কবি মহানবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে মসজিদে নববীর মিথাকে দাঁড়িয়ে ইসলামি

কবিতা এবং কাফির-মুশরিকদের নিন্দা বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করেছেন, অথচ মহানবী ﷺ নিষেধ করেননি; বরং তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেছেন—

الْبَغْرُ كَالْكَلَامِ حَتَّى كَمَنْبِهِ رَقِيمُهُ كَتَيْبِهِ .

২. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা। তবে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। ইতিফাক অবস্থায় যদি তার ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের মতো অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে মাল তথায় উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।
৩. জুমার দিন নামাজের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসা। কেননা, এভাবে বসলে বিভিন্ন পার্থক্য কথাবার্তা সৃষ্টি ও স্বর উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা অন্যান্য নামাজের অসুবিধার কারণ হবে এবং মসজিদের মর্যাদা ব্যাহত হবে। কাজেই এভাবে বসা উচিত নয়; বরং শুরু হতেই নামাজের পুস্তুরতির জন্য সারিবদ্ধভাবে বসাই উচিত।

মসজিদে কবিতা আবৃত্তির হুকুম : আত্মা তুরপুশতী বলেন, কবিতা আবৃত্তি যদি গর্ব-অহঙ্কারের জন্য হয় বা কবিতার বিষয়বস্তু শ্রবণে কামশুহা জাগ্রত হয়, তা হলে তা আপত্তিকর হবে। কিন্তু কবিতা আবৃত্তি যদি হক ও আহলে হকের প্রশংসায় এবং বাতিল ও আহলে বাতিলের নিন্দায় রচিত হয় অথবা কবিতা দ্বারা যদি দীননের বিধি-বিধানের সাজানো বা শত্রুর অপমানের উদ্দেশ্য হয় তা হলে এ জাতীয় কবিতায় কোনো আপত্তি নেই। কেননা, এরূপ কবিতা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে আবৃত্তি করা হয়েছে। মহানবী ﷺ -এর ভাল উদ্দেশ্য জানার কারণে এগুলো হতে নিষেধ করেননি। আইনী কিতাবে আছে—

- الْبَغْرُ الْمَنْعُ لَا يُعْرَفُ فِي الْمَسْجِدِ - বরং যে সকল কবিতায় অশ্লীল ও মিথ্যা রয়েছে তা হারাম।
- * অতঃপর কবিতা চর্চা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হযরত হাসানরুক, ইব্রাহীম নাখরী, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী, আমর ইবনে শোয়াইব প্রমুখের মতে কবিতা চর্চা মাকরুহ।
- بَدِيلُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْعَطَابِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَأَنْ يَسْتَلِيَ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَبْعًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْتَلِيَ شِعْرًا .

- * তবে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ প্রমুখের মতে এমন কবিতা চর্চাতে কোনো আপত্তি নেই, যাতে অশ্লীলতা, দুর্নাম, মিথ্যা ইত্যাদি নেই। কেননা, নবী করীম ﷺ হযরত হাসানদের জন্য তার কবিতা চর্চার জন্য দোয়া করেছেন : .
- قَالَ اللَّهُمَّ آيِدِيهِ يَرْوَحُ الْفَنَسِ .
- প্রতিশব্দের জবাব : হযরত ওমর (রা.) -এর যে হাদীস দ্বারা কবিতা আবৃত্তির বিরোধিতা করা হয়েছে তা সে কবিতার ব্যাপারে যাতে অশ্লীলতা ও মিথ্যা রয়েছে। আর لَأَنْ يَسْتَلِيَ جَوْفَ أَحَدِكُمْ -এর উত্তরে বলা যায় যে, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়ে অধিক কবিতা আবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া।

وَعَنْ ١٧٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرِيعَ اللَّهُ يَجَارَتِكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৬৭৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যদি তোমরা দেখ যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করছে তখন তোমরা বলবে, ‘আল্লাহ তোমার এ ব্যবসায় তোমাকে লাভবান না করুন।’ আর যখন দেখো যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে হারানো বস্তু তালাশ করছে, তখন বলবে, ‘আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন।’ —[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলাচ্য হাদীসটিতে মসজিদে দু'টি কাজ করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং যে ব্যক্তি এ দু'টি করবে তার জন্য বদদোয়া করতে বলেছেন। কাজ দু'টি হলো— (১) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা। কেননা, মসজিদ বাজার নয়, বরং তা হলো ইবাদতের স্থান। মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে মসজিদের উদ্দেশ্যের অমর্যাদা করা হয়। (২) হারানো বস্তু তালাশ করা, সাধারণত হারানো বস্তু তালাশের জন্য উইক্‌স্বেরে আওয়াজ করতে হয়। আর মসজিদে স্বর উচ্চ করা বেআদাব, কাজেই এ সব কাজ পরিহার করা উচিত।

وَعَنْ ١٧٩ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (رَضَا)
 قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقَادَ فِي
 الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَنْشُدَ فِيهِ الْأَشْعَارَ وَأَنْ
 تَقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي
 سُنَنِهِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ عَنِ
 حَكِيمِ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنِ جَابِرٍ)

৬৭৯. অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে
 মৃত্যাদও প্রদান করতে, সেখানে কবিতা আবৃত্তি করতে
 এবং শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন। [আবু দাউদ
 তাঁর সুনানে এবং জামেউল উসূলের গ্রন্থকার তাঁর
 জামেউল উসূলে হাকীম ইবনে হিয়াম হতে হাদীসটি বর্ণনা
 করেছেন। আর মাসাবীহ -এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.)
 হতে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে তিনটি কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে—

১. মসজিদে মৃত্যাদও প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মসজিদ অতীব পবিত্র জায়গা; এখানে যদি মৃত্যাদও প্রদান করা হয়, তবে রক্ত ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আল্লাম ইবনুল হাজার আল-আসকালানী (র.) বলেন, মসজিদ যদি অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে মসজিদে মৃত্যাদও কার্যকরী করা মাকরুহ, নতুবা হারাম।
২. কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে কবিতা দ্বারা অশ্লীল ও অশ্লীক কবিতা উদ্দেশ্য।
৩. কোনো প্রকার শরয়ী শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং মসজিদ অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

وَعَنْ ١٨٠ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَهَى عَنِ هَاتَيْنِ
 الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِي الْبِصَلَ وَالشُّومَ وَقَالَ
 مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَفْرِنَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ
 كُنْتُمْ لَا بُدَّ أُكَلِيهِمَا فَاِمْتَرُوهُمَا طَبَعًا -
 (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬৮০. অনুবাদ : [তাযেয়ী] হযরত মুয়াবিয়া ইবনে
 কুররাহ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ
 ﷺ এ দু'টি গাছ খেতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ পিয়াজ ও
 রসুন। আর তিনি বলেছেন, যে এ দু'টি জিনিস খাবে সে
 যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। তিনি
 আরও বলেছেন, যদি তোমাদের এ দু'টি জিনিস একান্ত
 খেতে হয়, তবে রান্না করে তার গন্ধ নষ্ট করে দেবে।
 -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে কাঁচা পিয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে।
 এর অধীনে দুর্গন্ধযুক্ত সব বস্তুই शामिल হবে। কেননা এ দুর্গন্ধের ফলে মসজিদে অবস্থানরত মানুষ ও ফেরেশতাগণ কষ্ট পায়,
 তবে ঐ সব বস্তু রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খেতে কোনো আপত্তি নেই।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْقَبْرَةَ وَالْحَمَامَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৬৮১. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন— কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র জমিনই মসজিদ। —[আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবনে হাদীসের ব্যাখ্যা : কোনো অপবিত্র বস্তু না থাকলে সকল জায়গায়ই নামাজ পড়া জায়েজ আছে। এতে কোনো প্রকার মাকরুহও হবে না। কিন্তু কবরস্থান ও গোসলখানায় কোনো নাপাকি না থাকলেও তথায় নামাজ পড়া মাকরুহ। কেননা সাধারণত এ স্থান দুটিতে নাপাকি থাকেই, ফলে অন্তর ও মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্ভেক হয়।

وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ (رض) قَالَ تَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصَلِيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَامِ وَفِي مَعَاظِنِ الْأَيْلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬৮২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত জায়গায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। আবর্জনা স্থলে, জবাইখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উটের বাথানে এবং বায়তুল্লাহর ছাদে। —[তিরমিযী, ইবনে মাজা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাত জায়গায় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : যদি আবর্জনা স্থল ও জবাইখানায় নাপাকি বস্তু থাকে তখন সমস্ত ইমামের মতে সেখানে নামাজ পড়া হারাম। অন্যথা ইমাম আহমদ বলেন, তবুও হারাম, কিন্তু জমহুর ওলামার মতে নিষিদ্ধ অর্থ মাকরুহ। 'কবরস্থান' সম্পর্কে ব্যাখ্যা হলো, যদি কবরস্থানে নামাজের জন্য কোনো একটি জায়গা নির্দিষ্ট থাকে এবং সেখানে কোনো কবর বা নাপাকি না থাকে তখন হানাফী ফকীহদের মতে তথায় নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

জামে' সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, কবরকে সামনে রেখে নামাজ পড়া মাকরুহ। তবে কিছুই দ্বারা আড়াল-অন্তরাল থাকলে কিংবা কবর ডানে-বামে যে কোনো এক পাশে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই, তখন মাকরুহও হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত নিষেধ অর্থ মাকরুহ। কিন্তু ইমাম আহমদ (র.) বলেন, হারাম। তিনি আরো বলেছেন, নিষিদ্ধ তিন সময়ে নামাজ পড়া যেমন হারাম এবং পড়লেও বাতিল হয়ে যাবে— কবরস্থানের নামাজের হুকুমও উক্ত।

গোসলখানায় নামাজ পড়া সম্পর্কে জমহুর ওলামার মতে মাকরুহ। কিন্তু জাহেহরী সম্প্রদায়ের মতে হারাম। উক্ত পথিমধ্যে এবং রাস্তার উপরে নামাজ পড়াও জমহুরের মতে মাকরুহ এবং জাহেহরীদের নিকট হারাম। আর উটের বাথানে নামাজ পড়া ইমাম আহমদ ও জাহেহরীদের মতে হারাম এবং জমহুরের নিকট মাকরুহ। বায়তুল্লাহ শরীফের নামের উপর নামাজ পড়া হানাফীদের মতে মাকরুহ, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, সমুখে অন্তরাল বা সুতরা না থাকলে নামাজ বাতিল হবে। আর সুতরা থাকলে জায়েজ হবে। অবশ্য সেখানে নামাজ পড়া বেআদবী বটে।

نِيبِ الْمَسَاجِدِ নিষেধের কারণ :

১. আবর্জনা স্থল : এ সব স্থান সাধারণত অপবিত্র বস্তুতে ভরা থাকে।
২. কসাইখানা : এখানেও নাপাকি রক্ত ইত্যাদি থাকে।
৩. কবর : তথায় নামাজ পড়লে কবরের প্রতি অতি মাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করা হয়।
৪. পথের মাঝখানে : মানুষের চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটায় সজাবনা থাকে, তা ছাড়া এতে একমাত্রা নষ্ট হয়।
৫. গোসলখানা : এ স্থান সাধারণত অপবিত্র থাকে।
৬. উটের আস্তাবল : নাপাকি ময়লা থাকার দরুন এখানে নামাজ পড়া নিষেধ। তা ছাড়া উট যে কোনো সময় মুসল্লিকে আঘাত করতে বা পেশাব করতে পারে।
৭. বায়তুল্লাহর ছাদ : বেআদবী থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

وَعَنْ ٦٨٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْأَيْلِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৬৮৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে নামাজ পড়তে পারো, কিন্তু উটের বাথানে নামাজ পড়বে না। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছাগলের খোঁয়াড় ও উটের বাথানের মধ্যে পার্থক্য : ছাগল ও উটের আন্তাবলের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রাণীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই নিষেধাজ্ঞা অর্পিত হয়েছে। পার্থক্যের কারণগুলো যথাক্রমে—

১. উট যে কোনো সময় মুসল্লিকে আঘাত করতে পারে; অপর দিকে ছাগল শান্ত প্রাণী, তার থেকে এরূপ আশঙ্কা নেই।
২. উট দাঁড়িয়ে পেশাব করে যা বহুদূরে পর্যন্ত ছিটে যায়; পক্ষান্তরে ছাগলের পেশাব দূরে ছিটে যায় না।
৩. ছাগলের খোঁয়াড়ে মুসল্লির একগ্রতা নষ্ট হয় না; কিন্তু উটের বাথানে একগ্রতা নষ্ট হয়।

وَعَنْ ٦٨٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِئِيُّ)

৬৮৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর জেয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে, কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। -[আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নারীদের কবর জেয়ারতের মাসআলা :

- * 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী-পুরুষ সবাইকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আবার অনুমতি প্রদান করেছেন। যেমন বলেছেন- نَهَيْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا أَرْثَاً, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। অবশ্য এখন তোমরা কবর জেয়ারত করো। কেননা, এটা মানুষদেরকে পরকাল স্বরণ করিয়ে দেয়।
- * কেউ কেউ বলেন, নিষেধের মধ্যে যেভাবে নারী-পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তদ্রূপ অনুমতির মধ্যেও সবাই সমানভাবে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস মনসুখ হয়ে গেছে।
- * আবার কিছু সংখ্যকের অভিমত যে, এ অনুমতি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। নারীদের প্রতি নিষেধের হুকুম এখনও বহাল রয়েছে। কেননা, স্বভাবগতভাবে মহিলাদের এ ব্যাপারে ধৈর্য-সহ্য খুবই কম। তাদের মধ্যে অস্থিরতা অনেক বেশি। আপন লোকদের কবর দেখলে স্থির থাকতে পারে না, তাই তাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখার নিমিত্তে জেয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। হানাফী ইমামগণ শেষোক্ত মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নারীদের জন্য মাকরহে তানবীহী বলেছেন। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর 'রওজা মুবারক' জিয়ারত করা এ নিষেধ-বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, হজুর ﷺ-এর 'রওজা' জিয়ারত করা কারো মতে মোস্তাহাব, আবার কারো মতে ওয়াজিব।

يَا أَيُّهَا النَّسْرِيُّ وَالرُّجِجِيُّ عَلَى الْقُبُورِ :

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা ও বাক্তি আশ্রয়নাহা :

※ ইবনুল মালিক বলেন, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হারাম। এটা ইহুদি ও নাসারাদের কর্ম। আল্লাহর নবী তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

لَمَّا لَمْ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ اتَّعَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ .

কাজেই এরূপ করা হারাম। তবে কবরের আশে-পাশে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ।

※ আর কবরে বাতি জ্বালানো এ জন্য হারাম যে, এতে মালের অপচয় করা হয়। কারণ, এতে কারো কোনো উপকার হয় না। তদুপরি বাতি বা আশুন জাহান্নামের নির্দশন এবং এটা বিদ'আতও; তাই হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَعَنْ ١٨٥ أَبِي أُمَامَةَ (رَضِيَ) قَالَ إِنْ
جَبْرًا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَىُّ
الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ أَسْكَتُ
حَتَّى يَجِيءَ جِبْرِئِيلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ
جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا
الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ
وَلَكِنْ أَسَأَلُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ
جِبْرِئِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي دَنَوْتُ مِنَ اللَّهِ
دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا
جِبْرِئِيلُ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ
أَلْفَ جَبَابٍ مِنْ نُورٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ
أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا . (رَوَاهُ
ابْنُ جِبَانٍ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)

৬৮৫. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদিদের একজন বিদ্বান ব্যক্তি নবী
করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন স্থানটি উত্তম? রাসূল
[এ ব্যাপারে] নীরব থাকলেন এবং বললেন, তুমিও চূপ
থাক যতক্ষণ না জিব্রাঈল আসেন। তখন সে চূপ থাকল।
এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আ.) আসলেন। তখন
রাসূল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি [হযরত জিব্রাঈল]
উত্তরে বললেন, প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি অধিক
জ্ঞাত নয়। তবে আমি আমার প্রভু তাবারাকা ও
তা'আলাকে [এ বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর হযরত
জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি [আজ] আল্লাহ
তা'আলার এত কাছে পৌছেছিলাম যে, ইতঃপূর্বে আর
কোনোদিন এত কাছে পৌছিনি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা
করলেন, হে জিব্রাঈল! এ নৈকট্য কিরূপ ছিল? তখন
তিনি বললেন, তখন আমার ও তাঁর মধ্যে সত্তর হাজার
নূরের পর্দা অবশিষ্ট ছিল। [তখন আল্লাহ] বললেন,
'নিকৃষ্টতম স্থান হলো হাট-বাজার এবং উৎকৃষ্টতম স্থান
হলো মসজিদ।' -ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনে
ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِئْسَ مَا يَشْرِكُ الْهَادِيَةِ : হযরত জিব্রাঈল (আ.) অন্যান্য সময় যত নিকটে যেতেন, সম্ভবত ঐ দিন সে তুলনায়
অনেক নিকটে গিয়েছিলেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাঁর বন্ধুর এক প্রশ্নের জবাব দান করবেন, তাই জিব্রাঈলকে নৈকট্য দান
করেছিলেন, যেমন- হাদীসের কুদসীতে বর্ণিত আছে- مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَيْئًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِأَعْلَى 'আর সত্তর হাজার নূরের
পর্দা দ্বারা' এ সংখ্যা সীমিত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং অসংখ্য পর্দা। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ অসংখ্য নূরের পর্দায়
বেষ্টিত আছেন।

الفصل الثالث : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِيُخْبِرَ بِتَعَلُّمِهِ أَوْ يُعَلِّمَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِيُغَيِّرَ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৬৮৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে আসে এবং কেবলমাত্র ভালো কাজের জন্য আসে, যা সে ভাল কাজ শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয়, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। আর যে লোক এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসে, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্যের সম্পদের দিকে [শুধু অনুতাপের দৃষ্টিতে] তাকায়। [অথচ ভোগ করতে পারে না।] -ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী- শু'আবুল ইমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত সَجِدِي দ্বারা মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববী উদ্দেশ্যে। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে ভাল কাজ শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা করার জন্য আসে তার মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতো। তাঁর এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মধ্যে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বৈধ। আর যে ব্যক্তি নামাজ ও শিক্ষাদান ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্যের সম্পদের দিকে তাকায়, অর্থাৎ অনুতাপের সাথে দেখে, অথচ ভোগ করতে পারে না। এর মর্মার্থ এই যে, তার মসজিদে আসা নিফল। সে কোনোরূপ কল্যাণপ্রাপ্ত হবে না।

وَعَنْ أَحْسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَيْدُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرٍ دُنْيَاهُمْ قَلَّا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ حَاجَةٌ - (رَوَاهُ التَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৬৮৭. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন - [অদূর ভবিষ্যতে] মানুষের জন্য এমন এক জামানা আসবে যখন মানুষ তাদের মসজিদসমূহে দুনিয়াবী কথাবার্তা আলোচনা করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না। আর আল্লাহ তা'আলার এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই। -বায়হাকী- শু'আবুল ইমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর, তাতে দীনী কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলা জায়গা নেই।

ইমাম ইবনে হুমাম বলেছেন, মোবাহ কথাবার্তা ও মসজিদে আলোচনা করা মাকরুহ যা নেক আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়। আর উক্ত হাদীসে উল্লিখিত "আল্লাহ তা'আলার এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই"-এর অর্থ হলো মসজিদে আসা ও বসে তার জন্য নিবর্ধক হিসাবে গণ্য হবে।

وَعَنْ ١٨٨ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (رض) قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِذْهَبْ فَأَتَيْتَنِي يَهْدِيَنِي فَجِئْتَهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتُمْ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ قَالَ لَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَأَوْجَعْتُكُمْ تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৬৮৮. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে [নববীতে] ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার প্রতি একটি কঙ্কর মারল। জাযত হয়ে দেখলাম সে ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)। তিনি আমাকে বললেন, যাও, ঐ দু' ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। [যারা মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলছে]। আমি দু'জনকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তখন হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক, অথবা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি [ওমর (রা.)] বললেন, তোমরা যদি মদীনার অধিবাসী হতে, তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। কারণ, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেছ। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, অন্য মসজিদের মধ্যেও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বেআদবী। যদিও তা ইলম ও জ্ঞানের কথা হয়। তবে মসজিদে নববীতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা আরো আধিক বেআদবী। কেননা, নবী করীম ﷺ সেখানে শায়িত।

وَعَنْ ١٨٩ مَالِكِ بْنِ يَسْرِ (رض) قَالَ قَالَ بَنِي عُمَرَ (رض) رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تَسْمَى الْبَطِيحَاءُ وَقَالَ مَنْ كَانَ يَرِيدُ أَنْ يَلْفَطَ أَوْ يَنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ - (رَوَاهُ فِي الْمَوْطِ)

৬৮৯. অনুবাদ : হযরত ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে এক পার্শ্বে একটি সমতল খোলা চত্বর তৈরি করেছিলেন। যার নাম ছিল 'বুতাইহা'। আর মানুষদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যারা [দুনিয়াবী] কথাবার্তা বলার এবং কবিতা আবৃত্তি করার কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার ইচ্ছা রাখে সে যেন মসজিদ হতে বের হয়ে সেই চত্বরে গিয়ে বসে। -[মুআত্তা মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পরিস্থিতি : এ শব্দটির অর্থ হলো কঙ্করময় স্থান। এ স্থানটি পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে মসজিদ সম্প্রসারণের সময় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের বসা বা কথাবার্তা বলার সুবিধার্থে মসজিদ সংলগ্ন একটি স্থান তৈরি করে নেওয়া উচিত।

وَعَنْ ٦٩ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَرَ رَأَى
 النَّبِيَّ ﷺ نَحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ
 عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَهُ
 بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ
 قَائِمًا يَنَاجِي رَبَّهُ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
 الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدَكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ
 وَلَكِنْ عَنِ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ
 طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَّقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ
 عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا . (رَوَاهُ
 الْبُخَارِيُّ)

৬৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, একদা মহানবী ﷺ মসজিদে কেবলার দিকে
 কিছু নাকের শ্লেষ্মা পড়ে থাকতে দেখলেন। এটা তাঁর
 কাছে খুব কষ্টদায়ক বোধ হলো। এমনকি এটা তাঁর
 চেহায়ায় ও প্রকাশ পেল। সুতরাং তিনি দাঁড়ালেন এবং
 নিজের হাতে তা ঝুঁচিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন,
 তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের
 সাথে কথাপকথনে থাকে। আর তার পরওয়ারদেগার
 তার ও তার কেবলার মাঝখানে থাকেন। অতএব কেউ
 যেন তার কেবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বাম
 দিকে অথবা পায়ের নিচে ফেলে। অতঃপর মহানবী ﷺ
 নিজের চাদরের একপার্শ্ব ধরলেন এবং এতে থুথু
 ফেললেন, তারপর তার একাংশকে অপরাংশ দ্বারা মলে
 দিলেন এবং বললেন, অথবা সে যেন এক্রপ করে।
 -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উই হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদ অতি পবিত্রস্থান, সেখানে কোনো অবস্থাতেই থুথু বা শ্লেষ্মা ফেলা উচিত নয়। থুথু
 বাম দিকে বা পায়ের নিচে ফেলার হুকুম ছিল বালুকাময় কাঁচা মসজিদের বেলায়। বর্তমানের পাকা মসজিদে তা ও করা যাবে
 না, বরং বাইরে বা নিজের কাপড়ে ফেলতে হবে।

وَعَنْ ٧١ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ وَهُوَ
 رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلًا
 أَمَّ قَوْمًا فَبَصَّقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقَوْمِهِ
 يَصَلُّونَ لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فَرَغَ لَا
 أَنْ يَصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّ قَالَ إِنَّكَ قَدْ
 أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬৯১. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ এর একজন সাহাবী
 ছিলেন- তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি একদল লোকের
 ইমামতি করলেন আর কেবলার দিকে থুথু ফেললেন এবং
 রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে ফেলেন। যখন লোকটি নামাজ
 হতে অবসর হলো তখন রাসূল ﷺ তার দলকে বললেন,
 সে যেন তোমাদেরকে নামাজ না পড়ায়। এরপর একদিন
 লোকটি তাদের নামাজ পড়াতে চাইল। তখন লোকেরা
 তাঁকে নিষেধ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধাজ্ঞার
 খবর জানাল। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে
 এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি 'হ্যা' বলে এর
 সত্যতা স্বীকার করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে
 হয়, তিনি বলেছেন যে, 'তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে
 দুঃখ দিয়েছ'। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُئِلَ عَنْ الْحَدِيثِ هَادِيَسَهُرَ بَيَاثِيَا : يَه لَوَاكُتِي نَا مَآجِرَ الْإِيْمَا مَاتِي كَرَوْتَه غِي يَه كِي بَلَا رِ دِي كَه تُثُو فَه لَه لِي تَا كَه هَ يَر ت رَا سُلُو لَآ هَ الْإِيْمَا مَاتِي كَرَوْتَه سَرَا سَرِي نِي بَه نَا كَرَه تَا رِ چَلَه يَا وَآيَا رِ پَر مُسَلِّمِي دِي رِ بَلَه لِي خَلَه يَه , سَه يَه ن تَوَا مَادِي رِ الْإِيْمَا مَاتِي نَا كَرَه . اَه تَه اَدِي كَه اِي لِي ت كَرَا هَي مَه هَه يَه , يَه بَا كُتِي مَسْ جِي دِي , كِي بَلَا اِي تَا دِي رِ اَدِي ب رَكَا كَرَه نَا , سَه اِيْمَا مَاتِي رِ اُ ط پ و كُ ت نَم : تَا حَا ذَا تَا رِ كِي بَلَا رِ اُ ط رِي تِي تُ ثُو فَه لَشَا رِ اُ چَا رَه نَه اَتَا ت رُ كُ كُ هُو يَا ي رِ تَا كَه سَرَا سَرِي سَهْوَا ن كَرَه نِي بَه ن نِي . پَر بَر تِي تَه تَا رِ سَا مَه يَه يَا غَا يَه يَا كَرَا هَلَه تَا نِي 'تُو مِي اَللَا هُ وَ تَا رِ رَا سُلُو كَه كُ ت دِي يَه هَ بَلَه سَه كَه وَ ت بَا كُ ت كَرَه ن :

وَعَنْ ٦٩٢ مِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رَضَا) قَالَ اِحْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَأَى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فُتُوبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مَصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي سَاخِذٌ كُمْ مَا حَبَسْنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَفْقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفِي حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ

৬৯২. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষে ফজরের নামাজে আমাদের নিকট হতে অনুপস্থিত ছিলেন, এমনকি আমরা সূর্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার কাছাকাছি পৌছলাম, তখন তিনি দ্রুতপদে বের হয়ে আসলেন। নামাজের জন্য তাকবীর বলা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়ালেন এবং নামাজের কার্যাবলি সংক্ষিপ্ত করলেন। [কারণ পরে বর্ণিত হচ্ছে] সালাম ফিরিয়ে আমাদেরকে স্বশব্দে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা সারির যে যেখানে বসে আছ সেখানেই থাক। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, কিসে আজ আমাকে তোরে আসতে বাধা দিয়েছে তা তোমাদেরকে বলব। আমি রাতে [তাহাজ্জুদ] নামাজের জন্য উঠলাম, অতঃপর অজু করলাম এবং আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভবপর হলো নামাজ পড়লাম। তখন নামাজের মধ্যে আমার তন্দ্রা আসল, আমি অসাড়া হয়ে পড়লাম। তখনই দেখি আমি আমার প্রতিপালক কল্যাণময় মহান আল্লাহর কাছে রয়েছি। আর তিনি অতি মনোরম অবস্থায় আছেন। তখন সস্বোধন করলেন, হে মুহাম্মদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাজির আছি। আল্লাহ বললেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কী নিয়ে তর্কবিতর্ক ও আলাপ আলোচনা করছে? আমি জবাব দিলাম, আমি জ্ঞাত নই প্রভু। এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন [আমিও একই রকম জবাব দিলাম]। অতঃপর আমি দেখলাম আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের হাত আমার দুই কঁধের মাঝখানে রাখলেন, এমনকি তাঁর আঙ্গুলের স্পর্শ আমার দুই কঁধের মাঝখানে অর্থাৎ বক্ষে অনুভব করতে লাগলাম। তখন সব জিনিস আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আর আমি সব কিছু

تَذِيَّتِي فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ
 يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَا
 بَخْتِصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نِي
 الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ مَشَى
 الْأَقْدَامَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسِ فِي
 الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَسَبَّحَ الْوُضُوءِ
 حِينَ الْكُرْبَاهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيمَ قُلْتُ فِي
 الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ إِنْطَعَامُ
 الطَّعَامِ وَلَيْسَ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ
 نِيَامًا قَالَ سَلَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ
 وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي
 وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ
 مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ عَمَلِ
 يُغْفِرُ بِي إِلَى حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِنَّهَا حَقٌّ فَأَذْرَسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا -
 (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
 وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا
 الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

অবগত হলাম! অতঃপর আত্নাহ তা'আলা আমাকে
 ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি জবাবে বললাম, আমি হাজির
 আছি হে প্রভু! তখন তিনি বললেন, এখন বসো দেখি, কী
 বিষয় নিয়ে শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ বিতর্ক করছে? আমি
 বললাম, শুনাহসমূহের কাফ্ফারা নিয়ে বিতর্ক করছে।
 আত্নাহ বললেন, সেগুলো কি? আমি উত্তর করলাম, (ক)
 পায়ে হেঁটে জামাতে হাজির হওয়া, (খ) এক নামাজের পর
 পরবর্তী নামাজের জন্য মসজিদে বসে থাকা, (গ) কষ্টের
 সময়ও যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে অজু করা এবং উত্তমরূপে
 অজু করা। অতঃপর আত্নাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর
 কী বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? আমি জবাব দিলাম,
 দারাজাত (মর্যাদা) সমূহ নিয়ে। [অর্থাৎ ঐ সমস্ত মর্যাদা যা
 মানুষ বেহেশতে লাভ করবে।] তিনি বললেন, সেগুলো
 কি? আমি উত্তরে বললাম, (ক) অপরকে খাদ্য দান করা,
 (খ) নম্র ও বিনয়ভাবে কথাবার্তা বলা এবং (গ) রাত
 জেগে নামাজ পড়া, যখন সকল মানুষ নিদ্রায় বিভোর
 থাকে। তখন আত্নাহ তা'আলা আমাকে বললেন, তুমি
 আমার কাছে যা খুশি প্রার্থনা কর। আমি বললাম, হে
 আমার পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে ভালো কাজ
 সম্পাদন করার এবং মন্দকাজ পরিহার করে চলার এবং
 গরিব ও নিঃস্বদেরকে ভালোবাসার প্রার্থনা করছি। আমি
 আরো প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে এবং
 আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। আর যখন তুমি লোকদেরকে
 ফিতনা ও বিপর্যয়ে ফেলতে চাইবে তখন আমাকে
 বিপর্যয়মুক্ত অবস্থায় মুক্ত্য দান করবে, আমি তোমার কাছে
 তোমার প্রেম ও ভালোবাসা প্রার্থনা করছি এবং যে লোক
 তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করি, আর
 সে কাজের প্রতি ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যে কাজ আমাকে
 তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেওয়া। অতঃপর
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা সত্য স্বপ্ন। এটা তোমরা
 শ্রবণ রাখো এবং অন্যকে জানিয়ে দাও। -[আহমদ ও
 তিরমিধী]

তিরমিধী আরো বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও
 সহীহ। আমি এই হাদীসটি সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে
 ইসমাঈল বুখারীকে জিজ্ঞাসা করছি: তিনিও বলেছেন এ
 হাদীসটি সহীহ।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
النَّعَّاصِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ
الْعَظِيمِ وَيَسُجِدُ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ
الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ فَإِذَا
قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حَفِظَ مِنِّي
سَائِرَ الْيَوْمِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৬৯৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন—

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَسُجِدُ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ
الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

অর্থ— আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর অর্পাৎ, তাঁর
অনুগ্রাহক সত্তার ও তাঁর অনাদি, অক্ষয় পরাক্রমশালিতার,
বিতাড়িত শয়তানের কবল হতে। মহানবী ﷺ বলেন,
যখন কেউ এরূপ বলে, তখন শয়তান বলে, আজকের
সারাটা দিনের জন্য সে আমার কবল হতে রক্ষা পেল।
—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَانِيسَةَ بِنْتِ أَبِي سَعْدٍ هَانِيسَةَ উল্লিখিত দোয়ায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হুমি
আমাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা, প্রভাব ইত্যাদি থেকে রক্ষা কর। এরূপ দোয়া করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের বিভ্রান্ত
ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কার্যকারণ হচ্ছে শয়তান। অন্যথা প্রকৃত হিদায়েত ও গুমরাহী দানের মালিক আল্লাহ তা'আলা। একারণে
জমৈক বুরূগ বলেছেন, أَصْحَرُ وَأَصْمَرُ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَصْفَرُ وَأَسْمَرُ অথবা শয়তান থেকে
রক্ষার জন্য আশ্রয় প্রার্থনার মানে তার মন্দ স্বভাব-চরিত্র তথা হিসা-বিচ্ছেদ, অহংকার, আত্মগরিভতা প্রত্যারণা, কুমন্ত্রণা ইত্যাদি
থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা।

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ (رض)
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ
قَبْرِي وَتَنَّا يَعْجَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى
قَوْمٍ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ -
(رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

৬৯৪. অনুবাদ : হযরত আতা ইবনে ইস্যাসার (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,
হে আল্লাহ! হুমি আমার কবরকে মূর্তি বানায়ো না; যার
পূজা হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ভয়ঙ্কর রোষ ঐ
সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছে, যারা নিজেদের
নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।
—[মালেক, মুরসাল হিসাবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবরকে মসজিদ বানানোর হুকুম : 'কবরকে মসজিদ বানানো' অর্থ— আল্লাহর ইবাদতের জন্য মানুষ যেভাবে মসজিদে যায়
তদ্রূপ কবরবাসীর সম্মান প্রদর্শনার্থে পূজার জন্য কবরের কাছে গমন করা। বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক নামধারী মুসলমান
ওলিআল্লাহ পীরমুরশিদদের কবরকে প্রায় কিংবা বানিয়ে ফেলেছে, আবার এক শ্রেণীর লোক আছে যারা শরিয়তের আদৌ ধার
ধরে না; অথচ মাজারে মাজারে যুগে বেড়ায়। মাজারে মানত সাদকা করে। মৃত তথা কাগ্নিক পীরের কাছে পার্থিব উন্নতির
জন্য প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে এরা কবরকে মূর্তি বানিয়ে তা পূজা করছে। এটা এক রকম প্রকাশ্য শিরক, যে অনায়া আল্লাহ
কখনো ক্ষমা করবেন না। অতএব আমাদের এরূপ কর্ম হতে বিরত থাকা একান্তই আবশ্যিক।

وَعَنْ ١١٥ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحَبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحَيْطَانِ قَالَ بَعْضُ رَوَاتِهِ يَعْنِي النَّبَاتَيْنِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ كَذَّ ضَعْفَهُ يَعْنِي بَنُ سَعِيدٍ وَغَيْرَهُ .

৬৯৫. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানে নামাজ পড়তে পছন্দ করতেন। হাদীসটির জনৈক রাবী হাদীসে উল্লিখিত 'حَيْطَانٌ' শব্দের ব্যাখ্যা 'بَسَاتَيْنِ' অর্থাৎ 'বাগান' দ্বারা করেছেন। -[আহমাদ, তিরমিহী]

তিরমিহী এটা বর্ণনা করেছেন যে, এটা গরীব হাদীস এবং এর রাবী হাসান ইবনে আবু জাফর এর মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনোভাবে হাদীসটি আমাদের জানা নেই, আর ইয়াহইয়া ইবনে সাদ্দ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল রাবী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

وَعَنْ ١١٦ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسِينَ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْيَدِيِّ يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِينَ مِائَةَ صَلَاةٍ وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬৯৬. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—কারো নিজের ঘরের এক নামাজে শুধু এক নামাজেরই সমান ছওয়াব পাবে। তার মহদ্বার মসজিদের এক নামাজ পঁচিশ নামাজের সমান। আর যে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করা হয়, সে মসজিদে এক নামাজ পাঁচ শত নামাজের সমান। বায়তুল মুকাদ্দাসের এক নামাজ পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান। আমার এ মসজিদে এক নামাজ পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান এবং মাসজিদুল হারামে এক নামাজ, এক লক্ষ নামাজের সমান। [ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَيْنِ مَسْجِدَيْهِ مَرْفَأٌ : তিন মসজিদের মর্যাদার বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তিন মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, সে তিন মসজিদ হলো মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী।

• মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাসে এক রাকাত নামাজ আদায় করা নিজের ঘরে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজ আদায় করার সমতুল্য।

• মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। অবশ্য মসজিদে নববীর ফজিলত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন— এই হাদীসে বলা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান, কিন্তু ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে এক হাজার নামাজের সমান। আবার মাসজিদুল হারামের ফজিলত সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন— উপরিউক্ত হাদীসে এক লক্ষ নামাজের সমান বলা হয়েছে। পঞ্চাশের অন্য হাদীসে দশ কোটি রাকাত নামাজের চেয়েও অধিক বলা হয়েছে। আবার এক হাদীসে মসজিদে নববী অপেক্ষা এক লক্ষ নামাজের সমান বলা হয়েছে, যেমন— হুজুর ﷺ—এর বাণী

الصلوة في المسجد الحرام أفضل من الصلوة في مسجدي هذا مائة ألف صلوة : এ হাদীস অনুযায়ী এক লক্ষকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে গুণ করলে পাঁচ শত কোটি ছুওয়াব দাঁড়াবে। আর মাসজিদে নববীর এক নামাজকে যদি অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামাজের সমান ধরা হয়, তখন এক লক্ষকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে দশ কোটিতে দাঁড়াবে।

মূলকথা উল্লিখিত তিন মসজিদে মর্যাদার ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনায় পার্থক্য থাকলেও কোনোটি মূল ফজিলতকে অস্বীকার করে না; বরং উল্লিখিত রেওয়াজাতের মাধ্যমে উক্ত মসজিদগুলোর মর্যাদা ও ফজিলত প্রমাণিত হয়। সমস্ত বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাধারণ মসজিদগুলোর তুলনায় মসজিদে নববীর মর্যাদা অনেক অনেক বেশি এবং তার তুলনায় বায়তুল মুকাক্কাদাসের মর্যাদা আরো বেশি। আর তা অপেক্ষা মাসজিদুল হারামের মর্যাদা আরো অধিক।

এ ফজিলত কোন নামাজের সাথে সম্পৃক্ত : এ বর্ণিত ছুওয়াব ফরজ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। আশ্রামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, এটা ফরজ নামাজের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং নফল নামাজেও এ সব মসজিদে উপরিউক্ত ছুওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু হানাফী ও মালেকী মাযহাবের কতিপয় ইমাম বলেন, এ বর্ণিত ছুওয়াব শুধুমাত্র ফরজ নামাজের জন্য সুনির্দিষ্ট।

আবার কারো মতো, এ বর্ণিত ছুওয়াব শুধু নামাজের ক্ষেত্রে নয়, বরং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ইবনে মাজাহ্ বর্ণিত হাদীসে আছে, “যে মসজিদে রমজান মাসের রোজা রাখে তার আমলনামায় মক্কা ছাড়া অন্যান্য স্থানের এক হাজার রমজান মাসের রোজার সমান ছুওয়াব লেখা হয়।” এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু নামাজ নয় অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও এ মসজিদগুলোর অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে।

وَعَنْ ١٩٧ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ
أَوْلَى قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ
قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا
قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ
فَعِنْتُ مَا أَدْرَكَتَكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

৬৯৭. অনুবাদ : হযরত আবু ঘর (গিফারী) (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে কোন্ মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মাসজিদুল হারাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদে আকুসা। আমি বললাম, উভয়ের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান?, তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসরের, অতঃপর সমস্ত জমিনই তোমার জন্য মসজিদ, যেখানেই নামাজের সময় হবে সেখানেই নামাজ পড়বে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কা'বা শরীফ কতবার নির্মিত হয়েছে? ওলামায়ে কেরাম ও ঐতিহাসিকগণ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ ও পূর্ণ নির্মাণ সর্বমোট দশবার হয়েছিল। এ বিষয়ে জৈনিক কবি বলেন,

بَنَى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرَ فَعُدَّوْهُمْ * مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْكِرَامِ فَادَمُ
فَبَنَيْتُمْ ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ عِيسَى * فَصَلَّى قُرَيْشٌ قَبْلَ هَذَيْنِ جَزْءَهُمْ
فَعَبَدَ إِلَاهَهُ بَنَ الرَّبِّيْرَ بَنَى كَدًّا * بَنَى بَعْدَكَعَجَبًا وَهَذَا مَوْجِبُ

১. সর্ব প্রথম ফেরেশতাগণ |আদম সৃষ্টির পূর্বে।

২. আদম (আ.)।

৩. তাঁর পুত্র শীশ (আ.)।

৪. হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.)।

৫. আমালিকা সম্প্রদায়।

৬. তার পর জুরহুম গোত্র।

৭. এরপর কুসাই সম্প্রদায়।

৮. কুরাইশ।

৯. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) (একে ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নির্মাণের ন্যায় নির্মাণ করেন)।

১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কা'বাকে ভেঙ্গে কুরায়েশদের ভিত্তির ন্যায় পুনরায় নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই বিদ্যমান রয়েছে।

কেন চল্লিশ বছরের ব্যবধানের কথা বলেছেন? আলোচ্য হাদীসে প্রশ্ন হতে পারে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী হযরত সলাইমান (আ.)। উভয়ের ব্যবধান হাজার বছরের বেশি। এতদসত্ত্বেও নবী করীম ﷺ শুধু চল্লিশ বছরের ব্যবধানের কথা কেন বলেছেন?

এর জবাবসমূহ নিম্নরূপ—

১. হাদীসে প্রথম নির্মাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত সলাইমান (আ.) তাদের কেউই যথাক্রমে কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণকারী নন। কথিত আছে যে, সর্ব প্রথম আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতাগণ কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) এটা পুনঃ নির্মাণ করেছেন।

অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসও কা'বা শরীফের চল্লিশ বছর পরে ফেরেশতাগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে।

২. বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আ.) যখন বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করলেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ভ্রমণ করতে এবং তা নির্মাণ করতে আল্লাহ হুকুম করেছিলেন। সুতরাং তিনি জেরুজালেম গমন করে তা নির্মাণ করেন, উভয় ঘর নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কা'বা শরীফ তৈরি করার চল্লিশ বছর পর হযরত ইয়াকুব (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। হযরত সলাইমান (আ.) ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন না, বরং তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সংস্কারক ও পুনঃ নির্মাণকারী ছিলেন। এতে বুঝা গেল যে, চল্লিশ বছর ব্যবধানের কথাটি সঠিক।

بَابُ السَّتْرِ

পরিচ্ছেদ : আচ্ছাদন

السَّتْرِ সতরের অর্থ : **السَّتْرُ** শব্দটি মাসদার, শাব্বিক অর্থ হলো- আবরণ করা বা ঢেকে রাখা। পুরুষের নাজী হতে হাঁটু পর্যন্ত, আর নারীদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা এই তিন অঙ্গ ব্যতীত সমস্ত শরীরই আবৃত রাখা আবশ্যিক; বিশেষ করে নামাজের মধ্যে এ সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন- **حُدُّوا** বিশেষ করে নামাজের মধ্যে এ সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন- **حُدُّوا** এখানে **رَيْنَةً** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **الْعَوْرَةَ** তথা বা দ্বারা সতর ঢাকা হয়; আর মসজিদ তথা 'সিঙ্গদার স্কোর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **مَلَأُوا** বা নামাজ; অতএব আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ কর বা সতর ঢাক।

আলোচ্য অধ্যায়ে সতর সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوْلَى : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٦٩٨
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ
(رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ
سَلَمَةَ وَأَضْعًا طَرْفِيهِ عَلَى عَاتِقِيهِ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

৬৯৮. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে আবু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাত্র এক কাপড়ে নামাজ পড়তে দেখেছি। অর্থাৎ তিনি উম্মে সালামার ঘরে এক কাপড়কে এমনভাবে শরীরে পেঁচিয়েছেন, যার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপরে ছিল।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِشْتِمَالُ ইশতিমালের অর্থ : ইশতিমালের নিয়ম হলো, কাপড়ের এক প্রান্তকে পিঠের দিক হতে বাম বগলের নিচে দিয়ে এনে ডান কাঁধের উপরে রাখা এবং অপর প্রান্তকে ডান বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখা, তারপর ডান কাঁধের প্রান্তকে বাম বগলের এবং বাম কাঁধের প্রান্তকে ডান বগলের নিচে দিয়ে টেনে বুকের উপর বাঁধাকে ইশতিমাল বলে। একে **(تَوَشُّعٌ)** তাওয়াশুহুও বলা হয়। এক কাপড়ে নামাজ পড়তে হলে তাওয়াশুহু করতে হয়, নতুবা কাপড় খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের আরবগণের অনেকেই এক কাপড় পরিধান করত, ভিতরে তহবন্দ বা পায়জামা পরিধান করত না।

নামাজে কাঁধ ঢাকা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

ক. ইমাম আহমদ (র.) ও কোনো কোনো সলফে সালেহীন বলেছেন, যদি কারো কাঁধে কাপড় না থাকে তবে তার নামাজ সহীহ হবে না।

دليله - (ع) لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ

খ. ইমাম আজম, মালেক, শাফেয়ী (র.) এমনকি জমহুর ইমামদের মতে যদি সতর ঢেকে নামাজ পড়ে, যদি কাঁধে কাপড় না থাকে তাহলে সহীহ হবে তবে এটা মাকরুহ। যেমন- হযরত জাবের (রা.) এর হাদীসে এসেছে যে,

إِنَّهُ (ع) قَالَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ رَأْسًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ وَإِذَا كَانَ صَفِيحًا فَاسْتَدَاهُ عَلَى حَقْوَرَاتِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অর্থাৎ কাপড় দীর্ঘ হলে কাপড়ের দুই মাথা দুই কাঁধের উপর দিয়ে কাঁধ ঢেকে দিবে। আর কাপড় ছোট হলে কাপড়টি কোমরে বেঁধে নিবে অর্থাৎ, লুঙ্গির ন্যায় পরবে। আর এমতাবস্থায় কাঁধ খোলাই থাকবে।

জমহরের পক্ষ হতে অপর পক্ষের দাশিলের উত্তর : ওলামায়ে কেরামের মতে وَعَاتِقِيهِ দ্বারা ওয়াজিব হুকুম সাব্যস্ত হয়নি; বরং এর রহস্য এই যে, যদি কাঁধের উপর কাপড় না থাকে তবে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* অথবা যদি কাপড় কাঁধের উপর না থাকে তবে উভয় হাতে কাপড় ধরতে হয়, ফলে হাতের উপর হাত রাখার প্রক্রিয়া, যা সুন্নত বটে। তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

مُتَمَلِّل শব্দের মহল্পে ইরাব : مُمْتَلِّم পদটি বুখারীর অধিকাংশ নুসখায় نَصَبُ -এর সাথে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পদটি مُصَلِّي -এর যমীর হতে حَال হবে। কোনো কোনো নুসখায় যেহেতু উল্লিখিত হয়েছে নিকটবর্তী শব্দের হরকত অনুসারে।

* কিছু সংখ্যকের মতে পেশ দিয়ে পড়া হবে, এমতাবস্থায় مُتَمَلِّل পদটি উহা মুবতাদার غَيْر হবে তথা وَهُوَ مُتَمَلِّلٌ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৯৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যেন এরূপে এক কাপড় পরিধান করে নামাজ না পড়ে, যার কোনো অংশ তার উভয় কাঁধের ওপর না থাকে। -[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ -এর ভাষা 'চাদরের উভয় প্রান্ত উভয় কাঁধের উপর হওয়ার অর্থ হলো, যদি এক চাদর পরিধান করায় সমস্ত শরীর আবৃত না করা যায়, তবে এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করবে না।

ইমাম শাফে'রী, মালেক, আবু হানীফা ও ইমাম নববী প্রমুখের মতে এই নিষেধাজ্ঞা তানযীহীর জন্য।

কাজেই যদি গোটা শরীর আবৃত করা ব্যতীতও এক কাপড় দিয়ে নামাজ পড়া হয়, আর সতর ধোলা না থাকে তবে নামাজ জায়েজ হবে। তবে এরূপ করা মাকরুহ।

* ইমাম আহমদ প্রকাশ্য হাদীসের ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করে বলেন, মকরুহে তাহরীমী হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সমস্ত ইমামগণ একমত যে, দুই কাপড়ে [কামিস ও ইয়ার] নামাজ পড়া উত্তম। তৎকালে মহানবী ﷺ ও সাহাবাদের এক কাপড়ে নামাজ পড়ার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা জায়েজের জন্য পড়েছেন, অথবা এটাও হতে পারে যে, তখন দু' কাপড় না থাকার কারণে এক কাপড় পরিধান করেই নামাজ পড়েছেন।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭০০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে এক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়বে সে যেন তার দু' প্রান্তকে [দু' কাঁধের উপর] বিপরীত দিক হতে জড়িয়ে নেয়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : কাপড় যদি লম্বা চওড়া হয় তবে তার দু' প্রান্তকে জড়িয়ে নিতে হবে। এটা এইভাবে যে, এর এক প্রান্ত লুঙ্গির ন্যায় পরিধান করবে এবং অপর প্রান্ত কাঁধের উপর রাখবে। অথবা এভাবে যে, ডান প্রান্ত বাম কাঁধে এবং বাম প্রান্ত ডান কাঁধে উপর রাখবে। আর কাপড়খানা যদি ছোট হয় তবে তা কোমরে বেঁধে নেবে।

وَعَنْ ۷۰۱ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ
 صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خِمِصَةٍ لَهَا
 إِغْلَامٌ فَتَنْظَرُ إِلَى إِعْلَامِهَا تَنْظَرَةً فَلَمَّا
 أَنْصَرَفَ قَالَ إِذْ هُمْزًا يَحْمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى
 أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ
 فَإِنَّهَا أَهْتِنِي أَنْفَاءً عَنِ صَلَاتِي -
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ
 كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَليِّهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ
 فَاخْفَأَ أَنْ يَفْتِنَنِي -

৭০১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত :
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এমন চাদর পরিধান
 করে নামাজ পড়লেন যার কিনারায় কারুকর্ষ ছিল, তখন
 তিনি এর কারুকর্ষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন,
 যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন তখন বললেন,
 আমার এ চাদরটি নিয়ে আবু জাহম [ব্যবসায়ী]-এর নিকট
 যাও [এর পরিবর্তে] আমার জন্য আবু জাহমের
 আশ্বেজানিয়ার চাদর নিয়ে আস। কারণ, এ চাদর এখনই
 আমাকে নামাজ হতে [অর্থাৎ নামাজের একগ্রহতা হতে]
 বিরত রেখেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বললেন, আমি
 নামাজের মধ্যে এর কারুকর্ষের দিকে তাকাতে ছিলাম।
 সুতরাং আমার ভয় হয় যে, এটা আমাকে গোলমালে
 ফেলে দেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : খামীসা এমন চাদরকে বলা হয়, যা তসর বা উল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, যার রঙ কালা হয়
 এব ডোরাকাটা থাকে। এরূপ একটি চাদর আবু জাহম নামক এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ
 নিয়ে আসেন। তিনি সে চাদরটি পরে নামাজ পড়েন। নামাজের মধ্যে সেই চাদরটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি যায়। এটাকে তিনি
 নামাজের একগ্রহতা ব্যঘাত বলে মনে করেন। তাই তিনি নামাজ শেষ করে সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা এ চাদরটি
 ফেরত দিয়ে আস। কিন্তু তিনি ভাবলেন যে, চাদরটি একেবারে ফেরত দিলে সেই সাহাবীর মনে দুঃখ পেতে পারেন। তাই
 তিনি বললেন, তার বদলে তার নিকট থেকে একটি আশ্বেজানিয়া চাদর নিয়ে আস। আশ্বেজান একটি জায়গার নাম। সেখানের
 প্রস্তুত চাদর সাদা মাঠা হতো। সেখানকার প্রস্তুত চাদরকে আশ্বেজানিয়া বলা হয়।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো বস্তুর বাহ্যিক কারুকর্ষ পবিত্র ও নির্মল অন্তরেও প্রভাব ফেলে। আর এরূপ প্রভাব
 অন্তরের নির্মলতা ও পরিষ্কৃততার কারণেই হয়ে থাকে। যেমন কোনো ধবধবে সাদা কাপড়ে সামান্য ময়লার দাগও স্পষ্টভাবে
 দেখা যায়। পশ্চাত্তরে পাপাচারের কারণে যাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাদের অন্তর বড় বড় পাপাচারেও বিচলিত হয় না।

উক্ত হাদীস থেকে এও বুঝা যায় যে, নামাজে এমন কোনো জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়, যা নামাজের একগ্রহতা নষ্ট করতে পারে।

وَعَنْ ۷۰۲ أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ قَرَامًا
 لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا
 النَّبِيُّ ﷺ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا
 يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي -
 (رِوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭০২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত :
 তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি পর্দা
 ছিল, যা দ্বারা তিনি তাঁর ঘরের একদিক ঢেকে
 রেখেছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার
 এ পর্দাখানি আমাদের সম্মুখ হতে সরিয়ে ফেলে।
 কারণ, এর ছবিগুলো সর্বদাই নামাজের মধ্যে আমার
 দৃষ্টিতে পড়ে। -[বুখারী]

وَعَنْ ۷۰۳ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رَضَا)
 قَالَ أَمَدَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوجَ حَيْرِ
 فَلَيْسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَتَزَعَا
 نَزَعًا شَدِيدًا كَأَنَّكَارَهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا
 يَنْبَغِي هَذَا لِمُتَّقِينَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭০৩. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
 একটি রেশমের আলখেল্লা হাদিয়া দেওয়া হলো, তিনি তা
 পরিধান করে নামাজ পড়লেন এবং নামাজ শেষে উহা
 সজোরে খুলে ফেলে দিলেন, যেন তিনি তাকে খুব ঘৃণা
 করছেন। অতঃপর বললেন, খোদাতীক মুত্তাকীদের জন্য
 এল্প পোশাক পরিধান করা উচিত নয়। -[বুখারী,
 মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَنَّ فُرُوجَ -এর পরিচিতি এবং তা কোথা হতে এসেছে? فُرُوجُ অর্থ- আলখেল্লা যার পিছন দিক কাটা থাকে, যেমন- কোট
 বা আলেক্টার ইত্যাদি। এ আলখেল্লাটি আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহের পক্ষ হতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া দেওয়া
 হয়েছিল। এটা ঐ সময়কার ঘটনা, যখন রেশমী বস্ত্র পরা পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে হাদীসের ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে
 যে, নিষেধাজ্ঞার পূর্বেও মহানবী ﷺ এ ধরনের পোশাক খোদাতীক লোকদের জন্য পছন্দ করেননি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি 'দৌমাতুল জানালের' বাদশাহের তরফ হতে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। অন্য আর এক
 রিওয়ামতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ এটা পরিধান করে নামাজ পড়েছেন এবং পরে খুলে ফেলেছেন; তারপর
 বলেছেন যে, জিব্রাইল আমাকে এটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

الدَّفْصَلُ الثَّانِي : دِثْيِي أَنْوَحْدَه

عَنْ ۷۰۴ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رَضَا)
 قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ
 أَفَاصِلِي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ
 وَأَزْرَهُ وَلَوْ يَشْرُكُهُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ رَوَى
 النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

৭০৪. অনুবাদ : হযরত সালামা ইবনে আকওয়া
 (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি বললাম, হে
 আল্লাহর রাসূল! আমি একজন শিকারী [শিকারীকে হালকা
 অবস্থায় চলতে হয়]। সুতরাং আমি কি একই জামা
 পরিধান করে নামাজ পড়তে পারব? রাসূল ﷺ বললেন,
 হ্যাঁ পারবে, তবে গিরবান [বুকের উপরস্থ ফাঁকা] বন্ধ করে
 নিবে; যদিও কাঁটা দ্বারা হয়। -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الدَّفْصَلُ الثَّانِي هَادِيَسِ الرَّ بَآبِآ : এখানে গিরবান অর্থ বুকের উপরস্থ জামার ফাঁক। যেখানে বোতাম লাগানো হয়। নামাজের
 মধ্যে জামার বোতাম লাগিয়ে রাখা নামাজের সম্মান। তবে বোতাম না লাগানোর কারণে যদি নামাজের মধ্যে নামাজি ব্যক্তির
 নিজের সতরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। কেননা, কারো নিজের সতর নিজের দৃষ্টিতে যাতে না পড়ে,
 এভাবে ঢেকে রাখা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, অন্যের নিকট সতর প্রকাশিত হয়ে পড়ে,
 তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

আরবদের সাধারণ পোশাক ছিল লুঙ্গি ও চাদর। যারা টিলা লম্বা জামা পরিধান করত তারা ভিতরে কোনো পাজামা বা লুঙ্গি
 পরিধান করত না, বরং কোমরে একটি বাঁধ দিত। শিকারীদের জন্য এ ধরনের পোশাকই ছিল উপযোগী। আর এ জন্যই
 প্রশংসারী প্রশ্ন করেছিল যে, এক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়তে পারবে কি না?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَبَّنَا كَانَتْ

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম সালামা, কুনিয়াত বা উপনাম হলো, আবু মুসলিম। আবার কারো মতে আবু ইয়াস, কারো মতে আবু আমের। তাঁর পিতার নাম আমর। আকওয়া তাঁর দাদার নাম। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং আসলামী বংশের লোক।
২. নসবনামা : তাঁর নসবনামা আমাদের নিকট সামান্য কিছু পৌছেছে। তা হলো আবু মুসলিম সালামা ইবনে আমর ইবনুল আকওয়া সিনান ইবনে আবদিলাহ আল-আসলামী আল-মাদানী।
৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি একটি বাঘের তিরকারের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪. বাঘের সাথে কথাপকথন : শিকার আছে যে, তাঁর সাথে বাঘ কথাপকথন করেছে। হযরত সালামা বলেন, আমি একদা একটি বাঘকে একটি হরিণ শিকার করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তখন বাঘটির নিকট হতে হরিণটি উদ্ধার করে নিয়ে আসলাম। তখন বাঘটি বলল, আমার মালাটি ধ্বংস হলো, আর তুমি আমার রিজিক নিতে ইচ্ছা পোষণ করলে, যা আল্লাহ আমাকে রিজিক হিসাবে দান করেছেন। তুমি যে মালাটা আমার নিকট হতে নিয়ে নিয়েছ তা তোমার নয়। বাঘের একথা শুনা মাত্র আমি বললাম, আচ্ছের ব্যাপারে একটি বাঘ কথা বলছে। তৎক্ষণাৎ বাঘটি বলে উঠল, এর চাইতে অত্যধিক আচ্ছের ব্যাপার হলো, আল্লাহ তোমাদেরকে তার ইবাদতের দিকে ডাকছে, অথচ তোমরা তাঁর নিকট হতে দূরে সরে মূর্তির ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ছ। সালামা বলেন, বাঘের এ মন্তব্য শুনে আমি রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।
৬. হাদীস বর্ণনা : তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বমোট ৭৭ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম তাঁর বর্ণিত সম্মিলিতভাবে ১৬ খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে পাঁচখানা ও ইমাম মুসলিম এককভাবে ৯ খানা স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
- তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের একটি দল হাদীস শ্রবণ করেছেন।
৭. তাঁর বিশেষ গুণ : তিনি অত্যধিক সাহসী, তীরাশাজ, নেক চরিত্রের অধিকারী, দয়ালু, ঘোড়দৌড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।
৮. মৃত্যুবরণ : তিনি ৭৪ হিজরিতে ৮০ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়রায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَصَلِّيْ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ هَبَ فِتْرَوسًا فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمْرَتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ صَلَّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭০৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছিল তখন তার লুঙ্গি ছিল [টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত] বেশি প্রলম্বিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যাও অজু কর, ফলে সে গেল এবং অজু করে ফিরে আসল। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেন তাকে অজু করতে [এবং পুনরায় নামাজ পড়তে] বললেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, সে তার টাখনা গিরার চিন পর্যন্ত লুঙ্গি প্রলম্বিত করে নামাজ পড়ছিল, অথচ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না, যে ব্যক্তি আপন লুঙ্গি টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ কেন পুনরায় অজু করতে আদেশ করলেন? যদিও টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত জামা প্রলম্বিত হলে অজু নষ্ট হয় না, তথাপি তাকে কঠোরভাবে সাবধান করার জন্য পুনরায় অজু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলে সে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, সে গুনাহের কাজ করেছে।

আর এ জন্যও অন্ধুর কথা বলেছেন যে, অন্ধু তার গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। কেননা, অন্ধু দ্বারা গুনাহ মফহ হয়। অথবা এটাও হতে পারে যে, মানুষ সাধারণত অহমিকার কারণেই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জামা বুলিয়ে পরে থাকে। আর এ অহমিকাই কলুষিত অন্তরের পরিচায়ক। অন্ধুর সাহায্যে তার বহিরাঙ্গ বিধৌত করার নির্দেশ দিয়ে রাসূল ﷺ তাকে তার অন্ধুর গুনাহের প্রতিই সুস্থভাবে ইস্তিত করেছেন।

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ইসবালের সীমা ও তার হুকুম : ইসবাল বলা হয় টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত লুঙ্গি-জামা ইত্যাদি বুলিয়ে পরিধান করা। এরূপ কাপড় পরিধান করা মাকরুহ তাহরীমী। তা নামাজের মধ্যে হোক কিংবা নামাজের বাইরে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে ইসবাল করা জায়েজ আছে। তবে নামাজের বইরে মাকরুহ, যদি অহমিকার উদ্দেশ্যে এরূপে পরিধান করা হয়। কিন্তু যদি অনিচ্ছা বশত কাপড় টাখনা গিরার নিচে চলে যায় তবে তা মাকরুহ হবে না। যেমন- হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাপড় অনেক সময় টাখনা গিরার নিচে পড়ে যেত। কেননা, তিনি কিছুটা মোটা ব্যক্তি ছিলেন, সব সময় কাপড়কে কাপড় টাখনা গিরার উপরে রাখতে পারতেন না। অবশ্য কারো এভাবে অনিচ্ছাবশত কাপড় টাখনা গিরার নিচে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে নিতে হবে। কিন্তু মহিলাদের জন্য কাপড় টাখনা গিরার নিচে কিছুটা কাপড় বুলিয়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। তবে সীমিতরিক্ত লম্বা করে ছেড়ে দিলে তাও ইসবালের আওতায় পড়বে।

আর হাদীসে যে বলা হয়েছে, এরূপ ইসবাল করে নামাজ পড়লে সে নামাজ আত্মাহ কবুল করেন না, এর অর্থ হলো এরূপ ইসবালকারী ব্যক্তি পূর্ণ হুওয়াবপ্রাপ্ত হয় না।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৭০৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, উড়না ব্যতীত সাবালিকা মেয়ের নামাজ কবুল হয় না। -[আবু দাউদ ও তিরমিধী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজের সতর ঢাকার বিধান : নামাজে সতর ঢাকা ফরজ। দলিল **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ** এখানে **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** দ্বারা সতর ঢাকা উদ্দেশ্য। আর **سَجِدٌ** দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য। অতএব এ আয়াতে নামাজে সতর ঢাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

* তদ্রূপ নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ- **إِلَّا بِخِمَارٍ** এখানে **حَائِضٌ** দ্বারা বালগা মহিলা উদ্দেশ্য। **لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ** অতএব সতর ঢাকা যেহেতু ফরজ তাই সতর খোলা থাকলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি অতি সামান্য জায়গা অনাবৃত থাকে তবে তাতে নামাজ নষ্ট হবে না।

لَإِنَّ الْيَابَانَ لَا تَغْلُظُ عَنْ قَلْبِلِ عَرَقٍ عَادَةٍ وَكَثِيرِ الْعَرَقِ يَمْتَعُ الْجَوَارِ لِيَمِمْ الْعَرَجِ وَالْمَسْرُورَةِ -

অতঃপর কম ও বেশির পরিমাণে মতভেদ আছে—

ইমাম আবু ইসুফ (র.) বলেন, কোনো অঙ্গের অর্ধেকের অধিক হলে তা বেশি, আর অর্ধেকের কম হলে তা কম।

ইমাম আযম (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন $\frac{2}{3}$ ও উহার অধিক হলে বেশি, আর $\frac{1}{3}$ -এর কম হলে তা কম। কেননা শরিয়তে অনেক স্থানে $\frac{2}{3}$ কে **كُلُّهُ** বা সম্পূর্ণের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যেমন মুহরিমের ব্যাপারে মাথা মুগনের বিষয়ে।

অত্রপ মাথার $\frac{2}{3}$ অংশ মসেহ করার হুকুম। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাও।

আহ্নাদের পক্ষ হতে উক্ত : শরিয়তের হুকুম নির্ধারণের মোকাবেলায় ইমাম আবু ইসুফ (র.)-এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নহে।

পুরুষের জন্য জানু হতে নাভি পর্যন্ত ঢাকা ফরজ। আর স্বাধীন মহিলার জন্য চেহারা এবং হাতের কব্জী ব্যতীত সমস্ত দেহ সতর। কেননা আত্মাহ জাআলা বলেন— **لَا يُبْرِمُنْ رِزْتَهُنَّ إِلَّا مَا كَهَرْنَ سِنَهَا** এখানে **رِزْتٌ** দ্বারা **رِزْتٌ** -এর অঙ্গ উদ্দেশ্য। আর **رِزْتٌ** -এর শ্রকাশ্য অঙ্গ হলো হাত এবং চেহারা। সুতরাং এ দুই অঙ্গ খোলা জায়েজ।

※ হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, দু' পায়ের প্রতি নজর করা জায়েজ আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা وَنَتَّ প্রকাশ করাকে নিষেধ করে مَا ظَهَرَ مِنْهَا কে বাদ দিয়েছেন, আর مَا ظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা দু' পাও অন্তর্ভুক্ত।

※ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পা খোলা থাকলেও নামাজ পূনঃ পড়া ওয়াজিব হবে।

كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْصَلِيَ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ يَخْتِيرُ إِزَارًا قَالَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ سَابِغًا يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا .

জবাব : এখানে সাবগা দ্বারা কাম্বা হওয়া উদ্দেশ্য। যদি দু' পা সতর হতো তবে তাই উভয় পা ঢাকতে) বলা হতো।

মহিলাদের মাথার চুলের হুকুম : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের মাথার চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঢেকে রাখা ফরজ, তবে এই হুকুম স্বাধীন নারীদের জন্য, তাই এটা খোলা রেখে নামাজ পড়লে নামাজ বিতর্ক হবে না।

وَعَنْ ۷۰۷. أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا سَأَلَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَلِيَ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ سَابِغًا يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَقَفُوهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ)

৭০৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোনো মহিলা কি তহবন্দ ব্যতীত শুধু জামা ও ওড়না পরিধান করে নামাজ পড়তে পারে? রাসূল ﷺ বললেন, জামা যদি এতটুকু খুলানো হয় যে, পায়ের পাতার উপরিভাগ ঢেকে ফেলে [তবে নামাজ পড়তে পারবে]। -[আবু দাউদ] আবু দাউদ, মুহাম্মাদিসগণের একদল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা এ হাদীসকে স্বয়ং উম্মে সালামার উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রুৎ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মেয়েদের পায়ের পাতার উপরিভাগও সতরের অন্তর্ভুক্ত। শরহ সুন্নাহ গ্রন্থে আছে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলছেন, মেয়েদের মুখমণ্ডল ও হাতের দুই পাতা ব্যতীত অন্য কোনো অংশ যদি নামাজের মধ্যে প্রকাশ পায় তবে পুনরায় নামাজ পড়া ওয়াজিব।

কাজীখান ও শরহে মুনিয়া গ্রন্থে আছে যে, মেয়েদের পায়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক কথা হলো যে, মেয়েদের দুই পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হেদায়া ও দুরের মুখতার গ্রন্থে আছে যে, পায়ের এক-চতুর্থাংশ যদি প্রকাশ পায় তবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

মিরকাত ও ফতোয়ায়ে শামীতে আছে যে, মেয়েদের পায়ের ব্যাপারে তিনটি মাহাবহ রয়েছে।

১. সম্পূর্ণ পা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

২. পা নামাজের বাইরের জন্য সতর, নামাজের ভিতরের জন্য নয়। ৩. সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মত এই যে, দুই পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَعَنْ ۷۰۸. أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৭০৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে সন্দল করতে এবং মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। -[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّدَلُ -এর সংজ্ঞা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত سَدَلُ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ :

১. মাজমাউল বিহার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, কাপড়কে কবলের মতো গায়ে দিয়ে তার ভেতরে উভয় হাত ঢুকিয়ে রেখে ককু-সেজদা করাকে 'সদল' বলা হয়।
২. আবু উবাইদা বলেছেন, কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার দুই প্রান্তকে হস্তদ্বয়ের সাথে না আটকিয়ে খুলিয়ে দেওয়া সদল বলে। যদি হস্তদ্বয়ের সাথে আটকিয়ে দেওয়া হয় তবে 'সদল' হবে না।
৩. আন্বামা খাতাবী বলেন, কাপড় এমনভাবে খুলিয়ে দেওয়া, যাতে তা মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
৪. ইমাম কারশী (র.) বলেন, পরনে লুঙ্গি বা পায়জামা না থাকা অবস্থায় মাথা বা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার দুই প্রান্ত দু'দিকে খুলিয়ে দেওয়া।
৫. কাঁধের উপর চাদর রেখে এর প্রান্তদ্বয় খুলিয়ে দেওয়া।
৬. কাবা বা জুক্বা কাঁধের উপর রেখে হস্তদ্বয় তার মধ্যে না ঢুকানো। কাযীখান গ্রন্থে আছে—
إِنَّهُ لَوْلَا لَيْسَ الْجَبَّةُ وَيَدَاهُ فِي خَارِجِ الْكَمِيْنِ يَكُونُ سَدَلًا .
৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মদিসে দেহলবী (র.) বলেন, ইসলামি শরিয়ত উত্তম ও মানানসই আকৃতির পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছে, তার বিপরীত করাকেই সদল বলে।

নামাজের মধ্যে 'সদল' করার বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে বিতর্ক মত হলো যে, নামাজের মধ্যে 'সদল' করা মাকরুহ। উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী নামাজের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখাও মাকরুহ।

وَعَنْ ۷. شَدَادِ بْنِ أُوَيْسٍ (رَضًا) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ
لَا يَصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَانِهِمْ -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭০৯. অনুবাদ : হযরত শাদাদ ইবনে আউস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— তোমরা [নামাজের মধ্যে] ইহুদিদের বিপরীত কাজ করবে। কেননা তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরিধান করে নামাজ পড়ে না। [কাজেই তোমরা এটা পরিধান করে নামাজ পড়বে।]—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّدَلُ -এর সংজ্ঞা : আলোচ্য হাদীসে ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে দু'টি বিষয় জানা যায়—

১. জুতা-মোজা পাক থাকলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া যায়। যদি জুতা বা মোজা এতটুকু নমনীয় হয় যে, সেজদার সময় পায়ের অঙ্গুলি কেবলার দিকে মুড়িয়ে সেজদা করা সম্ভব হয়। অবশ্য যে জুতায নাপাক বা ময়লা লেগে থাকার সম্ভাবনা আছে তা পরিধান করে মসজিদে যাওয়া বেআদবি।
২. মোবাহ বিষয়েও ইহুদি, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিধর্মীদের অনুকরণ করা মুসলমানদের জন্য মাকরুহ। আর দীনি বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অনুকরণ করা হারাম।
যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) ঘরের পূর্ব দিকে জনগণের করেছেন এ কারণে তারা পূর্ব দিকে মুখ করে ইবাদত করে।

وَعَنْ ٧١ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَض) قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمَ اتَّقُوا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوَتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْفَتَنِ كُمْ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ الْفَتَيْتَ نَعْلَيْكَ فَالْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيَصِلْ فِيهِمَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالِدَارِمِيُّ)

৭১০. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর চটি দুটি খুলে ফেললেন এবং বাম পার্শ্বে রাখলেন। জনতা যখন এটা দেখে তারাও নিজেদের চটিসমূহ খুলে রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ সমাপন করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কারণে তোমাদের চটিসমূহ খুলে রাখলে? লোকেরা বলল, আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার চটিদ্বয় খুলে ফেলছেন, তাই আমরাও আমাদের চটিগুলো খুলে ফেললাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হযরত জিব্রীলিল (আ.) আমার কাছে এসে খবর দিলেন যে, আমার চটি দুটিতে নাপাকি রয়েছে। [এ জন্য আমি তা খুলে ফেলেছি]। তোমাদের কেউ যদি মসজিদে আসে সে যেন দেখে নেয়— যদি তার চটিদ্বয়ে ময়লা বা নাপাকি দেখে, তবে সে যেন তা মুছে ফেলে তারপর চটি পরে নামাজ পড়ে।—[আবু দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুতা সহকারে নামাজ পড়ার বিধান : যদি চটি পবিত্র হয় তবে তা নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ আছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে সে যেন তার চটি দেখে নেয়; যদি তাতে নাপাকি কিছু থাকে তবে তা মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে নামাজ পড়বে।' নাপাকি যদি শুকনা হয় বা খুঁটেলে উঠে যায়, তবে মাটিতে রগড়ালে জুতা পবিত্র হবে। নাপাকি অর্দ্র হলে ধোয়া ব্যতীত পবিত্র হবে না। নাপাকি যদি শরাব বা প্রস্রাব জাতীয় হয় তবে শুকনা বা অর্দ্র যাই হোক না কেন, ধোয়া ব্যতীত পবিত্র হবে না।

- * আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, চটি পরে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- * হাযলী মাহহাবের কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, চটি পরিধান করে নামাজ পড়া সুন্নত। কেননা, তাবারানী শরীফে রয়েছে মহানবী ﷺ বলেছেন, صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ وَلَا تَفْتَهُرُوا بِالنَّهْرِ
- * দুররুল মুখতার গ্রন্থে রয়েছে যে, চটি পরিধান করেই নামাজ পড়া উত্তম। তবে মসজিদে চুকানোর পূর্বে চটিতে নাপাকি আছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত।
- * ইবনুল আবেদীন বলেছেন, চটি বা মোজা পরিধান করে নামাজ পড়া উত্তম, যদি তা পবিত্র হয়। কেননা, এটা ইহুদিদের বিরোধিতা করা।
- * ইবনু দাকীকিল ঈদ ও তালীক গ্রন্থকার বলেন যে, চটি পরিধান করে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় না। রাসূল ﷺ যে জুতা পরিধান করে নামাজ পড়েছেন তার দু'টি কারণ— ১. ইহুদিদের বিরোধিতা করা এবং ২. জুতা পরিধান করে নামাজ পড়ার বৈধতা বর্ণনা করা।
- * রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিগত কাজ উম্মতের উপর ওয়াজিব কি না? নবী করীম ﷺ -এর যে কোনো মৌখিক আদেশ-নিষেধ মানা করা উম্মতের উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য, এর মধ্যে কারও দ্বিমত নেই। তবে তাঁর কোনো কাজ, যা তিনি নিজে করেছেন, কিন্তু সে সম্পর্কে উম্মতকে আদেশ কিংবা নিষেধ কিছুই করেননি, এমন কাজ করলে তা উম্মতের উপর ওয়াজিব কি না এ সম্পর্কে মতভেদ আছে।
- * ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী ﷺ -এর যুগ উম্মতের জন্য দলিল স্বরূপ, কাজেই তাঁর কথা ও কাজের অনুকরণ করা উভয়টি উম্মতের জন্য ওয়াজিব। আলোচ্য হাদীস হতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন— মহানবী ﷺ কে চটি খুপতে

দেখে লোকেরাও নিজ নিজ চটি খুলে ফেলেছেন। যদি রাসূলের কাজের অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব না হতো, তা হলে লোকেরা তাদের চটি খুলতেন না। এতদিন শব্দকের যুদ্ধের দিন মহানবী ﷺ ও সঙ্গীদের চার ওয়াজ্বের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। হুজুর ﷺ ক্রমান্বয়ে সেই নামাজগুলো পরে কাজা আদায় করেছিলেন এবং তখন বলেছেন 'তোমরাও কাজা নামাজ এমনভাবে পড়বে যেমনভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছিলে।' **صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي** 'صَلُّوا' এসব হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মহানবী ﷺ -এর কাজগুলো অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব, যদিও মৌখিক নির্দেশ না থাকে।

※ হানাফীদের মতে মহানবী ﷺ -এর হুকুম ওয়াজ্বিবের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাঁর যে কোনো আমল বা কাজের অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়। তবে হ্যাঁ যদি মহানবী ﷺ যে কাজটি নিয়মিতভাবে করেছিলেন এবং তা ওয়াজ্বি হওয়ার কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে, তখন তার অনুকরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে, অন্যথা নয়।

উল্লিখিত দলিলসমূহের জবাব হলো :

1. উল্লিখিত হাদীসের শব্দ **صَلُّوا** নির্দেশসূচক। সুতরাং উক্ত নির্দেশের দরুনই ওয়াজ্বি হয়েছে, শুধু কাজ বা আমল দ্বারা ওয়াজ্বি হয়নি। যদি তাই হতো তবে **صَلُّوا** শব্দ ব্যবহার করার আদৌ প্রয়োজন হতো না।
2. আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ চটি খুলতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধ করাটা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, নবী করীম ﷺ -এর সকল কর্মের অনুকরণ উম্মতের জন্য ওয়াজ্বি নয়। এর বিপরীত দলিল রয়েছে যে, এক সময় সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ কে **صَوْمٌ وَصَالٌ** ইফতার বিহীন উপর্যুপরি রোজা রাখতে দেখে তাঁরাও **صَوْمٌ وَصَالٌ** করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এ খবর জানতে পেরে তিনি এরূপ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের নির্দেশ বাতীল তাঁর কোনো কাজ বা আমল উম্মতের জন্য ওয়াজ্বি নয়।

وَدَعُمَا ও সমাধান : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ চটিতে নাপাকিসহ যে কম রাকাত নামাজ পড়তেন তা পুনঃ পড়তেননি, তা হলে তার পূর্বোক্ত রাকাতসমূহ বিতর্ক হয়েছে কি না?

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর **قَوْلُ نَدِيمِ** অনুসারে উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, পূর্বের রাকাতসমূহ যেহেতু নাপাকী সম্পর্কে অববহিত অবস্থায় পড়া হয়েছে, তাই সেগুলো বিতর্ক হয়েছে।

আর যারা বলেন যে, নাপাকী সম্পর্কে অববহিত অবস্থায় নামাজ পড়া হলে তা শুদ্ধ নয়, তাদের মতে উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, নাপাকির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তা ক্ষমার যোগ্য। তবু হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজ যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয় তাই তাকে এ সম্পর্কে অববহিত করা হয়েছে।

অথবা এ উত্তর ও হতে পারে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চটিতে ময়লা ছিল, নাপাকী ছিল না। তবু সে ময়লা যাতে সিঁজনায় গেলে তাঁর কাপড়ে না লাগে সে জন্য তাকে এ সম্পর্কে অববহিত করা হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ تَعْلِيَهُ عَنِ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا رَجُلَيْهِ وَقِي رَوَايَةٌ أَوْ لِيَصَلَّ فِيهِمَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ)

১১১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে তখন সে যেন তার জুতা বা চটি তার ডান দিকে না রাখে এবং বাম দিকেও না রাখে, যাতে তা অন্যের ডান দিকে হয়ে যায়। অবশ্য যদি বাম দিকে কোনো লোক না থাকে, [তবে বাম দিকে রাখা যেতে পারে।] বরং তা যেন নিজের দু পায়ের মাঝখানে [কিছুটা সামনে] রাখে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অথবা, [পাক থাকলে] তা পরেই নামাজ পড়বে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল-মুনিব **سُرْحُ** হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদে যদি জুতার নিরাপত্তা না থাকে এবং পাহারাদারও না থাকে আর ডান পাশে বা বাম পাশে রাখার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তখন এভাবে দু' পায়ের মাঝখানে একটু সমুখ দিকে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ জুতা কাছে না থাকলে নামাজে মনের একাগ্রতা থাকে না।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧١٢ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتَهُ يَصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتَهُ يَصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَتَوَشِّعًا بِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭১২. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন দেখলাম তিনি মাদুরের উপর নামাজ পড়ছেন, আর এর উপরই সিজদা করছেন। বাবী বলেন, আমি আরও দেখলাম যে, তিনি বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর জড়িয়ে এক কাপড় পরিধান করেই নামাজ পড়ছেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٧١٣ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي حَافِيًا وَمَتَنِعًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭১৩. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খালি পায়ে এবং জুতা পরিহিত (উভয়) অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছি। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ٧١٤ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (رح) قَالَ صَلَّى بِنَا جَابِرٍ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسَاهُ وَنَيْبَاهُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تَصَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لَيْرَانِي أَحْمَقُ مِثْلَكَ وَإِنَّمَا كَانَ لَكَ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭১৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) বলেন, একবার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) আমাদের সাথে নামাজ পড়লেন মাত্র একটি লুঙ্গি পরিধান করে, যার গিরা লাগিয়ে ছিলেন পিছনে ঘাড়ের উপরে। অথচ তাঁর অন্যান্য কাপড় আলনার উপর রক্ষিত ছিল। এতে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি যে একটি মাত্র ইয়ার [তহুবন্দ] পরিধান করে নামাজ পড়লেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন, তোমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি যেন দেখে, এ জন্য আমি এরূপ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় আমাদের কোন ব্যক্তির দু'টি কাপড় ছিল। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এতে বুঝা গেল যে, দুই কাপড়ে অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর অথবা লুঙ্গি ও জামা পরে নামাজ পড়া উত্তম হলেও এক কাপড়ে পড়া ও জায়েজ।

وَعَنْ ٧١٥ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ أَلْصَلُّوهُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَعْابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الثَّيِّبِ قَلَّةٌ فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَالْصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৭১৫. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কাপড়ে নামাজ পড়া সনুত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে এরূপ করেছি। এতে আমাদের কোনো দোষ ধরা হতো না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এরূপ ছিল যখন কাপড়ের খুব অভাব ছিল; কিন্তু আল্লাহ যখন স্বচ্ছলতা দান করেছেন তখন দুই কাপড়ে নামাজ পড়াই উত্তম। -[আহমদ]

بَابُ السُّتْرَةِ

পরিচ্ছেদ : সুতরা

سُتْرَةٌ শব্দের আতিথানিক অর্থ হলো— অন্তরাল, আর শরিয়তের পরিভাষায় খোলা বা উন্মুক্ত স্থানের নামাজ পড়তে নামাজির সম্মুখে যে দণ্ড দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় তাকে سُتْرَةٌ বলে। একাকী হোক বা জামাতের সাথে হোক সর্বাবস্থায় সুতরা আবশ্যিক। তবে জামাতে নামাজ আদায় করার সময় শুধু ইমামের সম্মুখে সুতরা থাকাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মুক্তাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুত্রার আবশ্যিকতা নেই। এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي بِالسَّاسِ بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ وَأَقْبَلْتُ رَأْسًا عَلَى أَنَا نِ قَمْرَتِ بَيْنِ يَدَيَّ بَعْضَ الصَّيِّ فَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَزْتَعُ وَدَخَلْتُ عَلَى الصَّيِّ فَلَمْ يَنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

সুত্রার পরিমাণ : এটা এক হাত লম্বা ও অসুলি পরিমাণ মোটা দণ্ড হওয়া আবশ্যিক, তিন হাতের চেয়ে বেশি লম্বা হওয়া উচিত নয়, যদি দণ্ড বা তদ্রূপ কোনো বস্তু পাওয়া না যায় তবে পাথর বা মাটির স্তূপ তৈরি করে নেবে। এটাও সম্ভব না হলে জায়নামাজ বা কোনোকিছু লটকিয়ে দেবে।

সুত্রার হুকুম : সুতরা স্থাপন করা মোস্তাহাব আর পরিহার করা করা মাকরুহে তানযীহী। আলোচ্য অধ্যায়ে সুতরা স্থাপন করার ক্ষেত্রে যে নির্দেশ এসেছে সবগুলো মোস্তাহাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, সুতরা পরিহার সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে যে:

عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي بَادِيَةِ لَنَا يُصَلِّي فِي سَعْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ . (أَبُو دَاوُدَ)

তবে যদি এমন জায়গায় নামাজ পড়া হয় যা মানুষের চলাচলের রাস্তা নয়, কিংবা তার সম্মুখ দিয়ে কেউ যাবার সম্ভাবনা নেই, তা হলে সুতরা পরিহার করা মাকরুহ নয়। কিন্তু সতর্কতার লক্ষ্যে সুতরা স্থাপন করাই উত্তম।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧١٦
عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمَصَلِيِّ وَالْعَنْزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْمَلُ وَتَنْصَبُ بِالْمَصَلِيِّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ খুব সকালে ঈদগাহের দিকে যেতেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা বহন করে নেওয়া হতো এবং তা ঈদগাহে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। অতঃপর হজুর ﷺ তা সামনে রেখে নামাজ পড়তেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ عَبْدِ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : ঈদের নামাজ সাধারণত মুক্ত মাঠেই আদায় করা হয়, কাজেই সেখানে সুতরা ব্যবহার করা আবশ্যিক, আর তা ইমামের সম্মুখেই স্থাপন করতে হয়।

عَنْ ٧١٧
عَنْ أَبِي جَعْفَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ فِي قَبَةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ

৭১৭. অনুবাদ : হযরত আবু জুহাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কায় দেখলাম, তিনি তখন আবতাহা নামক স্থানে একটি লাল চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন। বেলালকে রাসূলুল্লাহ

يَلَا أَخَذَ وَضَوْءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَسْتَدِيرُونَ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَمَنْ
أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ
يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بِلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ
رَأَيْتَ يَلَا أَخَذَ عَنزَةَ فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فِي حَلَّةٍ حَمْرَاءَ مَشِيمًا صَلَّى
إِلَى الْعَنْزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ وَالذُّوَابَ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنْزَةِ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

ﷺ-এর অজুর [উযুত] পানি নিতে এবং লোকদেরকে অজুর [উযুত] পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখলাম। যে সে পানির কিছু পেল সে তা আপন গায়ে মুখে মুখে দিল, আর যে পেল না সে তার সঙ্গীর ভিজা হাত হতে সিক্ততা গ্রহণ করল। অতঃপর বেলালকে একটা বর্শা হাতে নিতে দেখলাম। সে তা মাটিতে পুতে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লাল রংয়ের ডোরাদার পোশাক পরিধান করে তার আঁচল সামলিয়ে নিয়ে বের হলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে লোকজন সমভিব্যাহারে দু' রাকাত নামাজ পড়লেন। আমি দেখলাম, লোকজন এবং গবাদি পশু বর্শার সম্মুখ দিয়ে [অর্থাৎ বাইরে দিয়ে] চলাচল করছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْأَبْنَعُ-এর পরিচিতি : 'আবতাহ' মক্কা হতে মিনা যাতায়াতের পথে একটি নিচু জায়গা। সাধারণত এ স্থান দিয়ে পানি গড়িয়ে থাকে। উক্ত স্থানটিকে 'বাভীহা' 'বাত্হা' বা 'মুহাসসা'ব'ও বলা হয়। এ হাদীস হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সূত্রার বাইরে দিয়ে অবধাে চলাচল করা যেতে পারে।

الْتَّعْرِنُ بِالرَّأُوِي পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম ওহাব, কুনিয়াত বা উপনাম আবু জুহাইফা, পিতার নাম আব্দুল্লাহ আসু সুওয়ামী। কারো মতে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার উভয়ের নাম ছিল ওহাব। তাঁকে ওহাব আল খায়বও বলা হয়। ইনি কূফা নগরীতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করতেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর বয়ঃকনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন।
২. ইসলাম গ্রহণ : সম্ভবত তিনি ফিতরতে ইসলামিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইস্তিকালের সময় তিনি প্রাণ্ডবয়স্ক হননি।
৩. হযরত আলী (রা.) সাথে সম্পর্ক : হযরত আলী (রা.) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। এমনকি তিনি অনেকাংশে তাঁর উপর নির্ভরশীল হতেন। এ কারণেই তিনি তাঁর খেলাফত আমলে তাঁকে কূফার বায়তুল মালের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।
৪. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলে পাক ﷺ-এর ইস্তিকালের সময়ে নাবালেগ ছিলেন। অতএব হুজুরের ﷺ যুগে কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। তবে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধেই তাঁর স্বপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন।
৫. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪৫ খানা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ২ খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে দুইখানা ও ইমাম মুসলিম এককভাবে ৩ খানা হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন।
৬. তাঁর নিকট হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন : তাঁর নিকট হতে তাঁর ছেলে আউন, শা'বী ও তাবেরীদের একটি জামাত হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৭. ইহলোক ত্যাগ : তিনি ৭২ হিজরিতে মতাস্তরে ৭৪ হিজরিতে ৮০ বছরের অধিক বয়সে বসরা নগরীতে ইস্তিকাল করেন। তাঁকে বসরাতেই সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ۷۲۱ آيِسِي سَعِيدِ (رَضًا) قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى
 شَيْءٍ يَسْتَرْهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ
 يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ آيِسِي
 فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . (هُذَا لَفْظُ
 الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ)

৭২১. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিসকে লোকজন হতে সুতরা রূপে দাঁড় করিয়ে নামাজ পড়ে আর যদি কেউ সে নামাজের সম্মুখ দিয়ে [সুতরার ভিতর দিয়ে] অতিক্রম করতে চায় তবে সে নামাজি যেন অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়। যদি সে বাধাকে অমান্য করে তবে তার সাথে লড়াই করে। কেননা, এমতাবস্থায় সে [মানুষরপী] শয়তান। [বুখারী, আর মুসলিমও উক্ত হাদীসের মর্মার্থ ব্যক্তকারী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلْيَدْفَعْهُ -এর অর্থ হলো, তাকে হাতের ইশারা দ্বারা বা অতিক্রমকারীর বক্ষের উপর হাত রেখে বাধা দেবে। শরহে মুনিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, অতিক্রমকারীকে হাতের ইশারা বা তাসবীহ ইত্যাদি বলে বিরত রাখবে।

فَلْيَقَاتِلْهُ : এর অর্থ তাকে হত্যা করা নয়, বরং এর অর্থ হলো শক্তি প্রয়োগে বাধা প্রদান করা। তবে যেন আমলে কাছীরের পর্যায়ে না যায়। কেননা এতে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

বাধা প্রদানের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন فَلْيَدْفَعْهُ সে যেন তাকে বাধা প্রদান করে। এ বাধা প্রদানের হুকুম কি? সে সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আহলে হাযেরের মতে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন—

۱. حَدِيثُ آيِسِي سَعِيدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَلْيَدْفَعْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

۲. وَفِي رَوَايَةٍ لِآيِسِي سَعِيدٍ وَلِبَدْرَاءُ مَا اسْتَطَاعَ .

২. ইমাম চতুর্থ ও জমহর ফিকহবিদদের মতে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব নয়। কাজি ইয়ায ও ইমাম কুরতুবী বলেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা অপরিহার্য নয়। কেননা এটা السَّلْوَةُ كُفْرًا إِنَّ نِي السَّلْوَةَ كُفْرًا নামাজের পরিপন্থি। কারণ فَصَال নামাজের বিধিভূত কাজ। সুতরাং এতে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, 'فَلْيَدْفَعْهُ' অর্থাৎ বাধা দান পরিহার করা উত্তম।

প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : যে সব হাদীসে বাধা দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা رُفِعَتْ (অনুমতি)-এর জন্য।

* অথবা উক্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে। যেমন ইমাম যাইলাঈ সারাখসী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ الْأَمْرَ بِهَا مَحْتَمِلٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ وَحِينَ كَانَ الْمَسَلُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاهَاً .

হাদীসে উল্লিখিত নির্দেশটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্য প্রযোজ্য, যখন নামাজের মধ্যে নামাজ বিধিভূত কর্ম বৈধ ছিল। নিহত হওয়ার পর কিসাসের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ইমাম কাজি ইয়ায (র.) বলেছেন যে, বৈধ পন্থায় বাধা দানের পর অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি মারা যায়, তবে আলিমগণের ঐকমত্যে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে কি না এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে ওয়াজিব, আবার কারো মতে ওয়াজিব নয়।

* হানফীগণের মতে কিসাস বা দিয়াত কোনোটিই ওয়াজিব হবে না, দুরকুল মুখতার গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত আছে।

হাদীসের মধ্যে যে, فَلْيَقَاتِلْهُ এসেছে এর فَصَال বা হত্যার বৈধতা প্রমাণিত হয় না; বরং সুতরা ও নামাজি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রম না করার নির্দেশকে কড়াকড়িভাবে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। অথবা এখানে مَعَاتِلُهُ দ্বারা পরস্পর হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কি করা উদ্দেশ্য, হত্যা উদ্দেশ্য নয়।

فَاتَسَا مَرْطَبَانِ—এর অর্থ : উক্ত হাদীসের এ পদটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

১. তার এ কাজটি শয়তানের কাজের ন্যায় ।
২. শয়তান তাকে এরূপ কাজ করতে উৎসাহিত করেছে । এ জন্য তাকে শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।
৩. শয়তান বলে এখানে অবধা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে । কেননা, অবধা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও শয়তান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমনি আদ্রাহ তা'আলা বলেন, وَيَسَاطُنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ

وَعَنْ ٧٢٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَطُّعُ الصَّلَاةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَذِبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُوَحَّرَةِ الرَّحْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭২২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— নামাজ নষ্ট করে স্ত্রীলোক, গাধা ও কুকুর এবং এটা হতে রক্ষা করে হাওদার পেছনের লাঠির ন্যায় কোনো জিনিস ।
—মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত তিনটিকে নির্দিষ্ট করার কারণ : মহিলা সম্পর্কে হাদীসের ভাষা ছাড়াও দার্শনিকদের মতে তারা মনোহারি ও প্রলুব্ধকারিণী । হাদীসে বলা হয়েছে, 'নারী হলো পুরুষদেরকে শিকার করার জন্য শয়তানের ফাঁদ বিশেষ ।' কুকুর সম্বন্ধে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কালো কুকুরই শয়তান ।' সুতরাং কুকুর কঠোরভাবে নাপাকা । আর গাধা চিংকার করলে শয়তান এগিয়ে আসে । অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, এ তিন বস্তু শয়তানের সাথে সম্পর্কিত, কাজেই এগুলোকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে । নামাজি লোকের সম্মুখ দিয়ে মহিলা, গাধা ও কুকুর অতিক্রম করার হুকুম : নামাজি লোকের সম্মুখ দিয়ে যাই অতিক্রম করুক না কেন তা একজন মহিলা হোক, একটি গাধা হোক কিংবা কুকুর হোক অথবা অন্য কিছু হোক এতে নামাজ নষ্ট হবে না । এটাই জমহুর ইমামদের অভিমত । অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.), আবু ইউসুফ (র.), মুহাম্মদ (র.), শাফেয়ী (র.), মালেক (র.) প্রমুখ ও অন্যান্য ফিকহবিদদের মায়হাব এই যে, নামাজি লোকের সম্মুখ দিয়ে যা কিছু অতিক্রম করুক না কেন তাতে নামাজ নষ্ট হবে না । তবে ইমাম আহমদ (র.) বলেন যে, কালো কুকুর অতিক্রম করলে নামাজ বিনষ্ট হবে; কিন্তু মহিলা ও গাধা অতিক্রম করলে নামাজ নষ্ট হবে কি না এ বিষয়ে আমি দ্বিধামুদ্বৈ আছি ।

আহলে যাওয়ারেগণ বলেন যে, মহিলা, কুকুর ও গাধা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে । শুধু এটাই নয়, তাঁরা আরও বলেন যে, গাধা ও কুকুর সামনে থাকুক কিংবা সামনে দিয়ে অতিক্রম করুক, আর এগুলো ছোট হোক বা বড় হোক, জীবিত হোক কিংবা মৃত হোক যে কোনো অবস্থাতেই নামাজ নষ্ট হবে । মহিলার ব্যাপারেও তাঁদের একই অভিমত, তবে ব্যবধান এই যে, উক্ত মহিলা মুম্বু বা বেহঁশ অবস্থায় থাকলে নামাজ বিনষ্ট হবে না ।

জমহুর ইমামদের দলিল :

১. عَنْ أَبِي أَسَامَةَ (رَض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَنْقَطِعُ الصَّلَاةُ شَيْءٌ - رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَكْبَرِ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো কিছুই নামাজকে বিনষ্ট করে না ।
২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَنْقَطِعُ الصَّلَاةُ شَيْءٌ وَأَدْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَرَسًا مَوْ شَيْطَانًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো কিছুই নামাজকে বিনষ্ট করে না । এরূপভাবে হযরত আনাস (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত ছযাযিফা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে ।

জমহুর হাদীসবিদগণ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত (৭২২ নং) হাদীসের নিম্নলিখিত জুঝাব দিয়েছেন— ১. এ হাদীস রহিত হয়ে গেছে । ২. নামাজ নষ্ট দ্বারা নামাজ বাতিল অর্থ নয় বরং নামাজের একাধতা ও ধ্যান-গম্ভীরতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য । (৩) যখন বিপরীত দুই হাদীস পাওয়া গেছে, তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, রাসূলের সাহাবীগণ কোনটির উপর আমল করেছেন, তা হলে আমরাও তার উপরেই আমল করব । অনুসন্ধান জানা যায় যে, অধিকাংশ সাহাবী নামাজ বিনষ্ট না হওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন, ফলে আমরা একেই গ্রহণ করছি ।

وَعَنْ ٧٢٣ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ كَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭২৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় নামাজ পড়তেন, আর আমি তাঁর এবং কেবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম যেভাবে জানাজাকে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীলোক সম্মুখে থাকলে এমনকি আড়াআড়ি শুয়ে থাকলেও নামাজ বাতিল হবে না।

وَعَنْ ٧٢٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى آتَانَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ
تَاهَزْتُ الْأَحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَنَّ
بِالنَّاسِ يَمْنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَصَرَّتْ
بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضَ الصَّيْفِ فَتَزَلَّتْ وَ أَرْسَلْتُ
الْآتَانَ تَرْتَعُ وَ دَخَلْتُ فِي الصَّيْفِ فَلَمْ
يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭২৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এক গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে উপস্থিত হলাম, তখন আমি যৌবনে পদার্পণ আসন্ন কিশোর ছিলাম, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনাতে কোনো দেওয়ালের অন্তরাল ছাড়াই লোকজন সমভিব্যাহারে নামাজ পড়ছিলেন। তখন আমি [নামাজ সারির] একাংশের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম, অতঃপর অবতরণ করলাম। আর গর্দভীকে চরতে দিয়ে আমি নামাজের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হলাম, অথচ এতে আমার প্রতি কেউই আপত্তি করল না। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নামাজের সম্মুখ দিয়ে গাধা চলাচল করলে নামাজ নষ্ট হয় না, আর অপ্রাপ্য বালকের অজ্ঞতাবশত চলাচল করলেও তা ধর্তব্য নয়।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٢٥ ابْنِ مَرْزُورَةَ (رض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ
يَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا
فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضْرِبْهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৭২৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যদি তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে সে যেন নিজের সামনে একটা কিছু রেখে দেয়। যদি সে কিছুই না পায় তবে যেন নিজের লাঠিখানা খাড়া [লম্বা] করে দেয়, আর যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে তবে সে যেন একটি রেখা টেনে দেয়। অতঃপর কেউ তার সম্মুখ দিয়ে গেলেও তার অনিষ্ট করবে না। [আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِعْلَانُ الْإِمَامَةِ نَسَبِ السُّنَّةِ بِالنَّهْيِ রেখা টেনে সুত্তরা স্থাপন করার ব্যাপারে ইমামদের মতান্তর : ইমাম শাফেয়ীর পূর্বের মত ও ইমাম আহমদের মতানুসারে এবং পরবর্তীকালে হানাফী ইমামদের মতানুসারে সুত্তরা হিসেবে রেখা টেনে দেওয়া যথেষ্ট। তবে রেখা টানার ধরনের মধ্যে মতভেদ আছে—

কেউ কেউ বলেন, নতুন চাঁদের ন্যায় করবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, কেবলার দিকে লম্বা করে লাইন টেনে দেবে।

আবার কারো মতে ডানে-বামে আড়াআড়িভাবে লাইন রেখা টানতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী মত, ইমাম মালেক ও হানাফী মাশায়েখদের মতে রেখা টানায় কোনো লাভজনক গুরুত্ব নেই। এক দিকে তাঁরা এ হাদীসটিকে যঈফ মনে করেন, অপর দিকে অন্য হাদীসের সাথে বিরোধও দেখেন।

∴ ইবনে হুমায বলেন, রেখা টানা এ জন্য জায়েজ আছে যে, এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। সুত্তরাং হাদীসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনে এর উপর আমল করা উচিত, যদিও এ রেখা টানায় অতিক্রমকারীকে নিবৃত্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়, তবুও মনের সাহাবার জন্য এবং নিজের খেয়ালকে সংযত করার জন্য এটা অবশ্যই উপকারী।

উল্লেখ্য যে, নামাজি তার সম্মুখে একটি ছড়ি বা লাঠি পুতে দেওয়া ওয়াজিব কিংবা মোস্তাহাবও নয়; বরং নামাজির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে গমনকারীরই কবীরা গুনাহ হবে, তবে কা'বা শরীফে সব সময় মানুষের ভিড় জমে থাকে, তাই হেরেম শরীফে নামাজ পড়ার সময় সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহ হবে না। অবশ্য ভিড় না থাকলে অতিক্রম করা জায়েজ হবে না।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَمَةَ
(رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ إِلَى سُرَّةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ
الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭২৬. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে আবু হাস্‌মাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যদি তোমাদের কেউ সুত্তরার দিকে নামাজ পড়তে যে যেন তার কাছাকাছি দাঁড়ায়, তাহলে শয়তান তার নামাজ বিনষ্ট করতে পারবে না।—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِعْلَانُ الْإِمَامَةِ ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ যখন সম্মুখে সুত্তরা রেখে নামাজ পড়তেন তখন তা একেবারে সোজাসুজি নাক বরাবর রাখতেন না। মুর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্য হতে বাঁচার জন্য তিনি এরূপ করতেন।

وَعَنْ ۷۲۷ المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
(رَضِيَ) قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يُصَلِّي إِلَى عُرْدٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا
جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا
يَضُدُّ لَهُ صَنْدًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭২৭. অনুবাদ : হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কাঠ, স্তম্ভ বা পাছকে সম্মুখে রেখে নামাজ পড়তে দেখেছি তখন তা তাঁর ডান দ্র বা বাম দ্র বরাবর সম্মুখে রেখেছেন, নাক বরাবর সোজা রাখার ইচ্ছা করেননি।—[আবু দাউদ]

وَعَنْ ٧٢٨ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُرَّةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي بِذَلِكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْسَانِيُّ نَحْوَهُ)

৭২৮. অনুবাদ : হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বনে ছিলাম। তাঁর সাথে [আমাদের পিতা] হযরত আবাবাস (রা.) ছিলেন। তখন তিনি [বনের মধ্যস্থিত] ময়দানে নামাজ পড়লেন, তাঁর সম্মুখে কোনো অন্তরায় ছিল না। আমাদের একটি গর্দভী ও কুকুর তার সম্মুখ দিকে খেলা করছিল। এতে তিনি পরোয়া করলেন না। - [আবু দাউদ এবং নাসায়ী ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٧٢٩ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَنْ وَاذَرَةٌ وَأَمَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭২৯. অনুবাদ : হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো কিছুই নামাজকে ভঙ্গ করতে পারে না [যা কিছুই নামাজের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করুক না কেন] তোমরা সাধ্য মতো যাতায়াতকারীকে প্রতিহত করবে। কারণ সে শয়তান। - [আবু দাউদ]

الْفَضْلُ الثَّلَاثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٣٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ رَجُلَايَ فِي قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَكَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّونَ يَوْمِنِي لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখ দিকে ঘুমাতাম। আর আমার দু'পা থাকত তাঁর কিবলার দিকে। যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি আমাকে টোকা দিতেন। আর আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি দু'পা প্রসারিত করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তখন ঘরগুলো এমন ছিল যে, তাতে বাতি থাকত না। [বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٧٣١ هَادِيَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي السُّجُودِ مِائَةَ مَغْفِرَةٍ وَأَمَّا إِذَا قَامَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الْقِيَامِ مِائَةَ مَغْفِرَةٍ وَأَمَّا إِذَا سَجَدَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي السُّجُودِ مِائَةَ مَغْفِرَةٍ وَأَمَّا إِذَا قَامَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الْقِيَامِ مِائَةَ مَغْفِرَةٍ

হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজি ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে কোনো স্ত্রীলোক গমন করলে বা অবস্থান করলে নামাজ নষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মَسْرُورَةٌ বা নারী স্পর্শ দ্বারা অজু নষ্ট হয় না।

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের নিয়ম-কানুন

صِنَةُ الصَّلَاةِ -এর অর্থ হলো- নামাজের গুণ। তবে এখানে صِنْتُ বলতে নামাজের যাবতীয় বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- ফরজ, ওমাজ্জিব, সুন্নত মোস্তাহাব ইত্যাদি, এক কথায় কোন কাজের সাথে নামাজের কী পর্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে, আলোচ্য অধ্যায়ে সে সব বিষয়সহ নামাজ সংশ্লিষ্ট অনেক বিধি-বিধান আলোচিত হবে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۷۳۴
أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا
دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ
فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ
السَّلَامُ ارْزِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَرَجَعْ
فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ
ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ
أَوْ فِي الْأَتْنِي بَعْدَهَا عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَانْبِيعِ الوُضُوءَ
ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَسَّرَ
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
رَاكِعًا ثُمَّ ارْزِعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ
حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزِعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ
ارْزِعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى
تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزِعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا
وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْزِعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ
افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামাজ পড়ল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। অতঃপর সে তাঁর নিকট আসল এবং তাঁকে সালাম করল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম, যাও এবং আবার নামাজ পড়। তোমার নামাজ পড়া হয়নি।' সে পুনঃ গেল আবার নামাজ পড়ল, অতঃপর আসল এবং রাসূল ﷺ-কে সালাম করল। রাসূল ﷺ বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম, আবার যাও এবং পুনঃ নামাজ পড়। তোমার নামাজ পড়া হয়নি।' অতঃপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হজুর ﷺ বললেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে তখন পূর্ণরূপে অজ্ঞ করবে। এরপর কেবলার দিক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীর বলবে। তারপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। এরপর রুকু করবে এবং রুকুতে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে, এরপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তারপর সেজদা করবে এবং সেজদাতেও স্থির থাকবে কিছু সময়। তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে, তৎপর দ্বিতীয় সেজদা করবে এবং স্থির থাকবে সেজদাতে। এরপর মাথা তুলবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে তারপর মাথা তুলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাজে এরূপ করবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ
حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ نِي كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةِ وَكَانَ يَفْرَشُ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ
يَنْهَى عَنِ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَتَفَرَّشَ
الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّيِّعِ وَكَانَ يَغْتَمُّ
الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

যেতেন না এবং সেজদা হতে যখন মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত [পুনরায়] সেজদায় যেতেন না এবং তিনি প্রতি দুই রাকাত্তে একবার আত্মতামিহাত্য পড়তেন, তারপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা ঝাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো নিতম্বের উপর বসতে [কুকুর-বৈঠক] নিষেধ করতেন এবং কোনো ব্যক্তিকে তাঁর নামাজে দুই হাত হিঙ্গু জঙ্ঘুর মতো বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন এবং সালাম সহকারে নামাজ শেষ করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজ শুরু করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাবে যে, নবী করীম ﷺ দ্বারা নামাজ শুরু করতেন, তা হলে বিসমিল্লাহ পড়া আবশ্যিক কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

مَذْعَبُ الْأَسْمَاءِ: ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, নামাজ জাহরী হোক বা খফী (অর্থাৎ, যে নামাজে কেবল চুপে চুপে শরুবিহীন ভাবে পড়তে হয়) হোক, উভয় অবস্থায় বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়া সুন্নত। তাঁর দলিল—

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সুবহানাকা নামাজের মধ্যে চুপে চুপে পড়তেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, নামাজের মধ্যে চারটি জিনিস চুপে চুপে পড়তে হয়। যথা— আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, হামদ [অর্থাৎ রাব্বানা লাকাল হামদ], আমীন ও তাশাহুদ [অর্থাৎ আতাযিয়াতু]। হযরত আনাস হতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

مَذْعَبُ الْأَسْمَاءِ مَالِكٍ وَآهْمَدٍ: ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) আলেচা হাদীসের তিতিতে বলেন যে, সূর্যয়ে ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ার আদৌ প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেন, জাহরী নামাজে বিসমিল্লাহ ও জাহরীভাবে পড়া সুন্নত। এ পর্যায়ে হযরত ইবনে আকবাস (রা.) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

তাঁদের জ্বাবে হানাফীগণ বলেন: হুজুর ﷺ যে, কখনও কখনও বিসমিল্লাহ সরবে পড়েছেন তা আমরাও অস্বীকার করি না, তবে এটা তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম ছিল না। অবশ্য এটা জায়েরের প্রমাণ স্বরূপ অথবা সাহাবী তথা উম্মতের শিক্ষার জন্য করেছেন।

নামাজে বসার নিয়ম: মহানবী ﷺ -এর নামাজে বসার সাধারণ নিয়ম ছিল, উভয় বৈঠকের মধ্যে বাম পা বিছিয়ে তার পাতার উপর বসতেন এবং ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলো কেবলামুখী রেখে পায়ের মুড়ি ওপরের দিকে ঝাড়া করে রাখতেন। সাধারণত যেভাবে আমরা বসি। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাফহাব মতে সুন্নত।

* ইমাম শাফেয়ী বলেন, প্রথম বৈঠকে এরূপ বসবে। কিন্তু যখন নামাজ দুই, তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, তখন শেষ বৈঠকে এরূপে বসা সুন্নত নয়। [অর্থাৎ যে নামাজে মাত্র একটি বৈঠক রয়েছে, তাতে এবং একাধিক বৈঠক বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে] বরং স্ত্রী লোকদের ন্যায় উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে বাম নিতম্বের উপর বসাই সুন্নত। পরবর্তী আবু হুমায়েদের হাদীসে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

* ইমাম মালেক (র.) বলেন, উভয় বৈঠকেই মেয়েলোকের ন্যায় বাম নিতম্বের উপর বসা সুন্নত।

* ইমাম আহমদ (র.) তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকরণে এবং দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমতের অনুকরণে বসার অভিমত প্রকাশ করেন।

আবু হুমাইদের হাদীসে তথা ইমাম শাফেয়ী, মালেক প্রমুখের অভিমতের জবাবে ইমাম আবু হানীফ (র.) বলেন, হযরত রাঃ -এর নারীদের ন্যায় বসতি হয়তো বার্ষিকের কারণে কিংবা শারীরিক দুর্বলতা ক্রান্তির দরুনই হয়েছিল। আর তা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত নিয়মই আ'মল; কিন্তু তাঁর মুখ নিগূঢ় বাণী বা হুকুম ছিল তা-ই, যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَاءً

এক উভয় পা খাড়া করে কতিদেশকে পায়ের গোড়ালির উপর রেখে বস। এটা সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরুহ। তবে ইমাম নববী ও বায়হাকীর মতে দুই সেজদার মধ্যখানে একপে বসা মাকরুহ নয়।

দুই- নিতম্ব জমিনের উপর রেখে দুই হাঁটু খাড়া করে দুই হাত জমিনের উপর রেখে কুকুরের মতো বসা। এটাও সকলের মতে মাকরুহ। সালামের সাথে নামাজ শেষ করা ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফরজ নয়; বরং গোয়াজিব।

وَعَنْ ۷۳۶ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ فِي نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِمَلُوكِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتَهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَاءً مَنكَبِيهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا تَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَتَصَبَّ الْيُمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَتَصَبَّ الْآخِرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৩৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুমাইদ আস, সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ রাঃ -এর একদল সাহাবীর মধ্যে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ রাঃ -এর নামাজ পড়া আপনাদের চেয়ে বেশি স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন, দুই হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন তখন দুই হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে নত করে [পাছা ও ঘাড়ের বরাবর সোজা সমতল] রাখতেন। আর যখন রুকু হতে মাথা উত্তোলন করতেন তখন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, যাতে পিঠের প্রতিটি হাড় [জোড়া] নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যায়। অতঃপর যখন সেজদা করতেন তখন দুই হাতকে জমিনের উপর এমনভাবে রাখতেন যাতে না মাটির সাথে বিছিয়ে থাকে, আর না পেটের সাথে মিশে থাকে এবং দুই পায়ের অঙ্গুলিসমূহের মাথাকে কেন্দ্রবিন্দু করে রাখতেন। অতঃপর যখন দুই রাকাতের পরে বসতেন, তখন বাম পায়ের পাতার উপর বসতেন এবং ডান পা-কে খাড়া রাখতেন। আর যখন শেষ রাকাতে বসতেন তখন বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং ডান পা যথাবিনীতি খাড়া রাখতেন এবং নিতম্বের উপর বসতেন। -[বুখারী]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

উভয় হাত উত্তোলনের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কতটুকু পর্যন্ত উঠাতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে—

مَنْعَبُ الْأَمَةِ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) -এর মতে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে। তাঁদের দলিল হলো—

عَنْ ابْنِ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَاءً مَنكَبِيهِ

২. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رض) كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَنَعَهُ رَأَى ابْنَ الْحَبِيبِ - ইবনে হাবীবের মতে হাতকে মাথার উপরে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পর্যন্ত উঠাবে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ السُّبُحُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا (طَحَاوِيُّ)
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ التَّيْسُ إِذَا كَبَّرَ لِإِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شُحْمَةِ أُذُنَيْهِ - ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে পুরুষ কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, তাঁর দলিল হলো-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ التَّيْسُ إِذَا كَبَّرَ لِإِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شُحْمَةِ أُذُنَيْهِ - (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)
তিনি ইমামের হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, তাঁদের হাদীস আমাদের মতের বিপরীত নয়। কেননা, بَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ -এর নিকটবর্তী করা হলে হাতের তালু কাঁধ বরাবর হয়।

وَعَنْ ۷۳۷ ابْنِ عَمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى مَنَعَهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رِسْنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শুরু করার সময় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকুুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপভাবে হাত উঠাতেন। এবং সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন; কিন্তু তিনি সেজদায় এরূপ করতেন না।
-[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উত্তম হাত উত্তোলন সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠিয়ে উভয় হাত উত্তোলন করতে হবে কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

১. رَفَعُ يَدَيْهِ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে رَفَعُ করা সন্নত ও উত্তম। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

১. عَنْ ابْنِ عَمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى مَنَعَهُ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
২. عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَنَعَهُ وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَسْتَوِيَ رَأْسُهُ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَنْ يَرْكَعُ وَيَضَعُهُ إِذَا قَرَعَ وَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ - (طَحَاوِيُّ)

২. رَفَعُ يَدَيْهِ : ইমাম আবু হানীফা, সাহেবাইন ও সুফিয়ান ছাওরীর মতে رَفَعُ সন্নত নয়; এটা না করাই উত্তম। তাঁদের দলিল হচ্ছে এই—

১. لَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا أُصِلِيَ يَدَاكَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شُحْمَةِ أُذُنَيْهِ - (رَوَاهُ الْبَرَاءُ)
২. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ التَّيْسُ إِذَا كَبَّرَ لِإِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شُحْمَةِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَسُجُدُ - (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

* অপরদিকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে— وَكُفِّرُوا بِهِ قَانِئِينَ -আম্মাতের উদ্দেশ্যে হচ্ছে নামাজে নড়াচড়া কম করা: رَفَعُ يَدَيْهِ -এর মধ্যে নড়াচড়া বেশি হয় তাই এটি বর্জন করাই উত্তম।

* **أَلْجَرَابُ عَنْ أَدْنَيْهِمْ** : ইমামছয়ের পেশকত হাদীসগুলোর জবাবে বলা হয়—

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে **إِطْرَابٌ** রয়েছে।

১. আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী 'আল-জাওহারুন নাকী' গ্রন্থ বলেন ইবনে ওমর (রা.)-এর প্রথম হাদীসে একটি অতিরিক্ত অংশ আছে **عَدَمَ رَفَعٍ مِّنَ الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ** অর্থ তাঁরা এখানে **رَفَعٌ يَدَيْنِ** কে মানে না। এ ক্ষেত্রে **رَفَعٌ** **عَدَمَ**-এর ব্যাপারে তারা যে উত্তর দেনেন আমরাও **رُكُوعٌ** ও **رَفَعُ رَأْسٍ**-এর মধ্যে **رَفَعٌ**-এর একই উত্তর দেব।

২. হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে এর বিপরীত আমল পাওয়া যায়—

عَنْ مُعَاذِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عَمْرٍ وَعَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى .

৩. অথবা, **رَفَعٌ** প্রথম যুগে ছিল, পরে মনসূখ হয়ে গেছে।

৪. অথবা, হুজুর **بَيَانَ جَوَازِ**-এর জন্য **رَفَعٌ** করেছেন।

৫. দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আলী তার বিপরীত আমল করেছেন। যেমন—

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا (رض) كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ . (طَعَارَى)

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর মতে **رَفَعٌ** করা ও না করা উভয়টি জায়েজ এবং মুসল্লীর ইচ্ছাধীন।

وَعَنْ ٧٣٨ نَافِعِ بْنِ أَبِي عَمْرٍ (رض) كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَمْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . (رَوَاهُ الْمُعَارِئِيُّ)

৭৩৮. অনুবাদ : হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যখন নামাজ আরম্ভ করতেন দুই হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন, আর যখন রুকু করতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন দু' রাকাত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ হাদীসকে নবী করীম **ﷺ** পর্যন্ত মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
-[রুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَمَّةِ فِي النَّسْبِ وَالرَّكْعَتَيْنِ তাসমী' ও তাহমীদ সম্পর্কে মতভেদ : তাসমী' এবং তাহমীদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আলোচ্য হাদীসটি একাকী যে নামাজ পড়ে তার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ একাকী যে নামাজ পড়ে সে রুকু হতে উঠার সময় তাসমী' [সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ] ও তাহমীদ [রাব্বানা লাকাল হাম্দ] উভয়টিই বলবে, যদি জামাতে নামাজ হয় তবে ইমাম তাসমী' বলবে এবং মুক্তাদি তাহমীদ বলবে। কেননা, নবী করীম **ﷺ** বলেছেন, যখনই ইমাম 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলবে তখন মুক্তাদিগণ বলবে, রাব্বানা লাকাল হাম্দ। সাহেবাইনের মতে ইমাম তাসমী' ও তাহমীদ দু'টিই বলবে। তাসমী' প্রকাশ্যে বলবে এবং তাহমীদ চূপে বলবে। আর মুক্তাদি শুধুমাত্র তাহমীদ বলবে। ইমাম দ্বাহাবীও এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার অন্য একটি বর্ণনাও এরূপ। ইমাম শাফেয়ীর মতে ইমাম মুক্তাদি প্রত্যেকেরই তাসমী' ও তাহমীদ দু'টিই বলতে হবে।

وَعَنْ ۷۳۹ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رَضًا) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا قُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩৯. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন দুই হাত তাঁর কান পর্যন্ত উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা তুলতেন তখন বলতেন, আমি আল্লাহ লিমান হামিদাহ: তখনও ঐরূপ করতেন [অর্থাৎ হাত উঠাতেন]। অপর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি দুই হাত দুই কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ۷৪০ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَيَأْذَى كَمَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَوَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (رِوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৪০. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে নামাজ পড়তে দেখেছেন যখন তিনি তাঁর বেজোড় রাকাত হতে দাঁড়াতে যেতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জলসায়ে ইসতেরাহাত সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য : প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর দাঁড়ানোর পূর্বে খানিকটা বসাকে জালসায়ে ইসতেরাহাত বলে। এটা জায়েজ আছে কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ীর মতে এবং ইমাম আহমদের এক রিওয়ায়ত মতে এ সময় খানিকটা বসা সুন্নত। গমায়ের মুকাল্লিদগণও ঐরূপ আমল করে থাকেন। তারা উক্ত হাদীস হতেই দলিল গ্রহণ করেন।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّرَفِيِّ وَالْأَزْهَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, আওয়ামী, ইসহাক ও অন্যান্য হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, 'জলসায়ে ইসতেরাহাত' সুন্নত নয়। ইমাম আহমদের দ্বিতীয় রিওয়ায়ত মতে 'জলসায়ে ইসতেরাহাত' না করাই উচিত : তাঁদের দলিল হলো—

- ইমাম তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ বেজোড় রাকাতের পর সেজাসুজ পায়ে মুড়ির উপর দাঁড়িয়ে যেতেন। অর্থাৎ সেজদার পর বসতেন না।
- ইমাম তাহাবী বলেছেন, হুজুর ﷺ কোনো বিশেষ ওজরের দরুন বসেছেন। যেমন— তিনি হয়তো শারীরিক ক্রান্তি অনুভব করেছেন অথবা বার্বাক্য জ্ঞানিত দুর্বলতার দরুন কখনও কখনও বসেছেন।
- মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাত' বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। ইমাম শা'বী বলেন, হযরত ওমর, আলী এবং অন্যান্য প্রথম সারির প্রবীণ সাহাবীগণও না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন।
- আল্লামা শামসুল আয়েম্বা হুলওয়ানী হানাফী বলেন, হানাফী ও শাফেয়ীর এ মতবিরোধ উত্তমতা সম্পর্কে। এমনকি যদি কোনো শাফেয়ী আমাদের ন্যায় না বসে নামাজ সম্পাদন করে, তা হলে শাফেয়ী ওলামাগণ এটা আপত্তিকর বলে মনে করেন না। ঐরূপে আমরাও যদি তাদের ন্যায় আমল করি তাতেও আপত্তির কিছুই নেই। এতে বুঝা গেল যে, উভয়টাই রাসূল ﷺ -এর সুন্নত, অর্থাৎ মহানবী ﷺ কখনও বসেছেন, আবার কখনও বসেননি। ফলে উভয় রকমের হাদীসের মধ্যে আর কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ جِئِن يَرْفَعُ صَلْبَهُ
مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَيْنَا لَكَ
الْحَمْدُ ثُمَّ يَكْبِرُ جِئِن يَهْوِي ثُمَّ يَكْبِرُ
جِئِن يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَكْبِرُ جِئِن يَسْجُدُ
ثُمَّ يَكْبِرُ جِئِن يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقَعْلُ ذَلِكَ
فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَفْضِيَهَا وَيَكْبِرُ
جِئِن يَقُومُ مِنَ الثَّنِيَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

বলতেন এবং রুকু হতে পিঠ সোজা করে উঠবার সময় 'সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলতেন, তৎপর দাঁড়িয়ে বলতেন 'রাব্বানা লাকাল হামদ', অতঃপর যখন নিচের দিকে ঝুকতেন অর্থাৎ সেজদায় যেতেন তখন তাক্বীর বলতেন। আবার সেজদা হতে মাথা তুলবার সময় তাক্বীর বলতেন। অতঃপর [পুনরায়] তাক্বীর বলে সেজদায় যেতেন এবং মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। এভাবে তিনি নামাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত পুরো নামাজেই এরূপ করতেন। আর দুই রাকাত নামাজ পড়ে বৈঠক শেষে যখন দাঁড়াতেন তখনও আল্লাহ আকবার বলতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ .
(رواه مسلم)

৭৪৪. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- উত্তম নামাজ তাই যাতে কুনূত [অর্থাৎ দাঁড়ানো] দীর্ঘ হয়।
—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُنُوتُ হাদীসের ব্যাখ্যা (الْقُنُوتُ) : কুনূত শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। হাদীস বিশারদদের মতে এখানে কুনূত অর্থ- দাঁড়ানো। যে নামাজে বেশি দাঁড়ানো হয়, অর্থাৎ অধিক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করা হয় এটাই উত্তম নামাজ। এর অন্যান্য অর্থ যেমন বশ্যতা, বিনয়, দোয়া, মৌনতা ইত্যাদিও সামগ্রিকভাবে নামাজে প্রয়োগ হওয়ার অর্থ হতে পারে। কারণ, এ সবগুলো গুণের সমাবেশ যে নামাজে তা-ই উত্তম নামাজ। অপর এক হাদীসে আছে যে, 'যখন বান্দা সেজদাতে যায় তখন আল্লাহর অতি নিকটে হয়।' এতে কেউ কেউ সেজদাকেই নামাজের উত্তম অংশ বলেন। অবশ্য কেউ কেউ উভয় হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান এভাবে করেন যে, দিনের নামাজে সেজদা এবং রাতের নামাজে কিয়াম দীর্ঘ করাই উত্তম।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٤٥
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالُوا فَأَعْرِضْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنكَبَيْهِ ثُمَّ يَكْبِرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ

৭৪৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুমাইদ আস সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দশজন সাহাবীর মধ্যে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামাজ সম্পর্কে আপনাদের চেয়েও বেশি অবগত। তাঁরা বললেন, তা হলে আপনি বলুন! তিনি বললেন, যখন নবী করীম ﷺ নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, নিজ দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন তারপর আল্লাহ আকবার বলতেন, অতঃপর কেরাত পাঠ করতেন, তারপর তাক্বীর বলে দুই

يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا
 مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى
 رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَيِّرُ رَأْسَهُ وَلَا
 يَقْنَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ
 لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
 بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ
 أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا فَيَجَافِي
 يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ
 ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُنْثِنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى
 فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ
 كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسْجُدُ
 ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيُنْثِنِي رِجْلَهُ
 الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى
 يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَنْهَضُ
 ثُمَّ يَضَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
 ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
 حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ
 عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَضَعُ ذَلِكَ فِي
 بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي
 فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ
 مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِيهِ الْيُسْرَى ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا
 صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ
 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর রুকুতে যেতেন এবং দুই হাতের করকে দু' হাঁটুর উপরে রাখতেন এবং কোমরকে সোজা [সমান্তরাল] রাখতেন, মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাতেন না এবং উপরের দিকেও উঁচু করতেন না। অতঃপর মাথা উঠাতেন এবং বলতেন, 'সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ' অতঃপর সোজা হয়ে দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর 'আল্লাহ আকবার' বলে জমিনের দিকে সেজদায় নত হতেন, আর দু' হাতকে দু' পার্শ্ব হতে আলাদা রাখতেন এবং দু' পায়ের অঙ্গুলিসমূহকে [কেবলার দিকে] খুলে রাখতেন, অতঃপর [সেজদা হতে] মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন, তারপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর জোড়ার প্রত্যেকটি হাড় স্বস্থানে ঠিক ঠিক মতো ফিরে আসতো। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদায় যেতেন। আর 'আল্লাহ আকবার' বলতেন এবং মাথা উঠাতেন, আর বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এমনভাবে সোজা হয়ে বসতেন যে, তাঁর সমস্ত জোড়ার হাড়গুলো স্বস্থলে ফিরে আসে। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদায় যেতেন এবং 'আল্লাহ আকবার' বলতেন এবং মাথা উঠাতে উঠাতে 'আল্লাহ আকবার' বলতেন। অতঃপর বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন। এ সময় এমনভাবে সোজা হয়ে বসতেন যে, তাঁর সমস্ত গস্থির জোড়াগুলো স্ব-স্ব স্থলে ফিরে আসতো। অতঃপর দাঁড়াতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতেও এরূপ করতেন। অতঃপর যখন দু' রাকাত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও তাকুবীর বলতেন এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, যেভাবে নামাজ শুরু করতে তাকুবীর বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট নামাজে এরূপ করতেন। অবশেষে যখন শেষ সেজদায় যেতেন যার পর সালাম ফিরাতে হয়, তাঁর বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর চেপে বসতেন, এরপর সালাম ফিরাতে। এটা শুনে তাঁরা বলে উঠলেন আপনি সত্য বলেছেন। মহানবী ﷺ এরূপ নামাজ পড়েছেন।—[আবু দাউদ ও

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
 حَمِيدٍ ثُمَّ رَكَعَ قَوَّضَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
 كَأَنَّهُ قَائِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَرَ يَدَيْهِ
 فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ
 فَأَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ وَنَحَى يَدَيْهِ
 عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ
 وَفَرَجَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى
 شَيْءٍ مِنْ فَخْذَيْهِ حَتَّى فَرَعَ ثُمَّ جَلَسَ
 فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَنْدِ
 الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ
 الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ
 الْبُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْبُسْرَى وَأَشَارَ
 بِإِصْبَعِهِ يَعْزِي السَّبَابَةَ وَفِي أُخْرَى لَهُ
 وَإِذَا قَعَدَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ
 قَدَمِهِ الْبُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا كَانَ
 فِي الرَّابِعَةِ أَقْضَى يَدَيْهِ الْبُسْرَى إِلَى
 الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاجِدَةٍ .

وَعَنْ ٧٤٦ وَأَبِي بَنْ حُجْرٍ (رضا) أَنَّهُ
 أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
 رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْمَا بِحِمَالِ مَنْكَبَيْهِ
 وَحَادَى إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ . (رواه أبو
 داود) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلَى
 شَعْمَةِ أُذُنَيْهِ .

দারেমী তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এরূপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে এটাও আছে যে, অতঃপর রাসূল ﷺ রুকু করতেন এবং তাঁর দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন যেন হাঁটুদ্বয়কে শক্ত করে ধরে রেখেছেন এবং ধনুকের 'জ্যা' এর মতো দুই হাতকে করতেন এবং পাজর হতে দূরে রাখতেন। রাবী বলেন যে, অতঃপর তিনি সেজদা করতেন এবং নাক ও কপালকে উত্তমরূপে মাটিতে লাগাতেন এবং দুই হাত পাজর হতে দূরে রাখতেন এবং দুই হাত (করদ্বয়) মাটিতে দুই কাঁধ বরাবর স্থাপন করতেন। আর দুই উরুকে খোলা রাখতেন, পেটের সাথে ঠেকাতেন না। এভাবে তিনি সেজদা শেষ করতেন, অতঃপর বসতেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন এবং ডান করকে ডান হাঁটুর উপর বাম করকে বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা অর্ধাংশ অনামিকা দ্বারা ইঙ্গিত করতেন। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে, যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাতে বসতেন, তখন বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন এবং যখন তিনি চতুর্থ রাকাতে যেতেন বাম নিতম্বকে জমিনে লাগিয়ে বসতেন এবং দুই পা একদিকে [ডানদিকে] বের করে দিতেন।

৭৪৬. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ কে দেখেছেন যখন তিনি নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন, তিনি তাঁর দুই হাত উপরে উঠালেন যাতে তা কাঁধ সমান হলো এবং তিনি দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই কান বরাবর করলেন এবং তাকবীর বললেন।
 —[আবু দাউদ]

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُنَيْبَةُ الْإِسْرَارُ بِالسَّبَابَةِ وَالْجَلَسِ شাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা ও বসার নিয়ম : শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করার অর্থ- 'লা ইলাহা' বলার সময় অঙ্গুলি উপরের দিকে উঠালেন এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলবার সময় নিচের দিকে নামালেন। এরপূর্ণ করা মোস্তাহাব। 'দুই পা একদিকে বের করে দিলেন' এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শেষ বৈঠকের নিয়ম সম্পর্কে হাদীসে তিন প্রকারের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে এবং সকল প্রকারই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনত।

১. বাম পায়ের পেটের উপর বসবে এবং ডান পায়ের মুড়ি খাড়া রেখে অঙ্গুলিসমূহকে কেবলামুখী রাখবে। হানামাফীগণ পুরুষদের জন্য এটাই উত্তম মনে করেন।
২. বাম পায়ের পাতা আগে বাড়িয়ে দিয়ে নিতম্বের উপর চেপে বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। শাফেয়ীগণ একেই উত্তম মনে করেন।
৩. উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর চেপে বসা, অর্থাৎ বাম কাটিদেশ মাটির সাথে লাগিয়ে বসা। হানামাফীদের মতে এ পদ্ধতি মহিলাদের জন্য উত্তম। উল্লেখ্য যে, এ মতভেদ শুধু উত্তমতা সম্পর্কে, তবে সবক'টি পদ্ধতি সকলের মতে জায়েজ।

وَعَنْ ٧٤٧ قُبَيْصَةَ بِنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

৭৪৭. অনুবাদ : হযরত কাবীসা ইবনে হুব্ব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন এবং [দাঁড়ানো অবস্থায়] বাম হাত [এর কজি]-কে ডান হাত দ্বারা ধরতেন। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٧٤٨ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعٍ (رَضِيَ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعَدَّ صَلَوَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَقَالَ عَلِمْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصَلَّيْتُ قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَأْسَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَأَمُدَّ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاتِمِّمْ صَلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَفْصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى

৭৪৮. অনুবাদ : হযরত রিফা'আহ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নামাজ পড়ল। অতঃপর অগ্রসর হয়ে নবী করীম ﷺ-কে সালাম করল। মহানবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার নামাজ পুনরায় পড়ো। কেননা, তুমি নামাজ পড়নি। তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে নামাজ পড়ব, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, যখন তুমি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সুরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং এর সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি যা পাঠ করতে পার তা পাঠ করবে। অতঃপর যখন রুকু করবে তখন দু' হাতের করণীয় দু' হাঁটুর উপরে রাখবে এবং রুকুতে বহাল অবস্থায় স্থির থাকবে, আর পিটিকে সঠান রাখবে। অতঃপর যখন রুকু হতে উঠবে পিঠকে সোজা রাখবে এবং মাথাকে এমনভাবে উঠাবে যাতে হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যায়। অতঃপর যখন সেজদা করবে, সেজদাতে স্থির থাকবে আবার যখন সেজদা হতে উঠে বসবে তখন বাম উরুর উপরে বসবে। অতঃপর প্রত্যেক রুকু ও সেজদাতে এন্নপ করবে

فَخَذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ
رُكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ. (هَذَا لَفْظُ
الْمَصَابِيحِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيرِ
يَسِيرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ)
وَفِي رِوَايَةٍ لِالتِّرْمِذِيِّ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى
الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ
تَشَهَّدْ فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ
وَالْأُفْحَمِ اللَّهُ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ -

থাকবে, অবশেষে ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করবে।
এটা 'মাসাবীহ'-এর বাক্য। আবু দাউদ কিছুটা পরিবর্তন
সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ
এরই অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযীর অপর বর্ণনায় আছে যে, মহানবী ﷺ
বলেছেন, যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে,
তখন অজু করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে আদেশ
করেছেন, অতঃপর 'কালিমায়ে শাহাদাত' পড়বে [অর্থাৎ,
আযান দেবে] তৎপর একামত বলবে এবং নামাজ আরম্ভ
করবে, আর যদি কুরআনের কিছু জানা থাকে তা হতে পাঠ
করবে, অন্যথা কিছু হামদ, তাকবীর ও তাহলীল পাঠ
করবে তারপর রুকু করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রী হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ اللَّهُ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন জানা না থাকলে আল্লাহ
তা'আলার প্রশংসাসূচক কিছু বাক্য যথা - اللَّهُ أَكْبَرُ - ইত্যাদি পাঠ করলেও
নামাজ শুদ্ধ হবে। এ মাসআলাটি নতুন মুসলমানদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। তবে তাড়াতাড়ি কুরআন শিখার চেষ্টা করতে
হবে। আর এখানে হারা খাল্দাত ইবনে রাফে' উদ্দেশ্য অর্থাৎ رُكْعَةٍ -এর তাই : فَكَمَا نَفَسَ الخ - অর্থাৎ নামাজ পড়ে
হুকুম্বাহি আগে আদায় করেছেন। আর সালাম তথা হুকুম মাখলুক পরবর্তীতে আদায় করেছেন।

وَعَنْ ٧٤٩ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ
عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ مَثْنَى
مَثْنَى تَشْهَدُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ
وَتَضَرَعُ وَتَمْسُكُنَّ ثُمَّ تَقْنَعُ بِيَدَيْكَ، يَقُولُ
: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا
بِطَوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَفِي
رِوَايَةٍ فَهُوَ خَدَّاجٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৭৪৯. অনুবাদ : হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.)
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-
[নিফল] নামাজ দু' দু' রাকাত করে আদায় করা শ্রেয়।
প্রত্যেক দু'রাকাতের তাশাহহুদ রয়েছে। আর নামাজ আদায়
করতে হবে একাগ্রতা, বিনয় ও দীন-হীনতার সাথে।
অতঃপর তোমার হাতদ্বয় উত্তোলন করবে। বর্ণনাকারী
বলেন, হাতদ্বয় উত্তোলন করার মর্ম হলো- তুমি দোয়ার
জন্য তোমার প্রতিপালকের দিকে এমনভাবে হাতদ্বয়
উত্তোলন করবে যেন উভয় হাতের তালু তোমার মুখের
সম্মুখে থাকে। অতঃপর তুমি বলবে, হে আমার প্রভু! হে
আমার প্রভু! যে ব্যক্তি এরূপ করে না, সে অর্থাৎ,
তার নামাজ এরূপ এরূপ। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তার
নামাজ অসম্পূর্ণ। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিফল নামাজের রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ : নিফল নামাজ কয়
রাকাত করে পড়া উত্তম, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরূপ—

مَنْعَبُ الشَّامِيِّ: ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নফল নামাজ দু' রাকাত করে পড়া উত্তম। তিনি আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

مَنْعَبُ أَبِي حَنِيفَةَ: ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে চার চার রাকাত করে পড়া উত্তম, দিনে হোক কিংবা রাতে হোক। সাহেবাইন [আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ] বলেন, রাতে দু' দু' রাকাত করে এবং দিনে চার চার রাকাত করে পড়াই উত্তম। তাঁরা তাগাবীহ নামাজের উপর কিয়াস করেন। কারণ, তারাবীহ নামাজ দু' দু' রাকাত করে পড়া উত্তম। তাঁদের মতে রাতের নফল নামাজও দু' দু' রাকাত করে পড়া উত্তম হবে। দিনে চার চার রাকাত বলার কারণ একই, যা ইমাম আবু হানীফা (র.) বর্ণনা করেছেন।

رَيْسُ أَبِي حَنِيفَةَ: ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নিম্নলিখিত কারণে চার চার রাকাত করে নফল নামাজ পড়া উত্তম। সহীহ হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এশার নামাজের পরে একই নিয়তে চার রাকাত পড়তেন এবং চাশতের নামাজও এক সঙ্গে চার রাকাত পড়তেন। এ ছাড়া এক নিয়তে চার রাকাত নামাজ পড়া বেশি কষ্টসাধ্য। সুতরাং যে ইবাদত বেশি কষ্টসাধ্য তাতে ছুগুয়াবও বেশি হওয়ার কথা। সুতরাং চার রাকাত পড়া উত্তম।

جَرَابُ وَكَيْلِ الشَّامِيِّ: ইমাম শাফেয়ীর পেশকৃত দলিলের জবাব ইমাম আবু হানীফা (র.) এভাবে প্রদান করেন যে, আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর বাণী **أَصْلُهُ مَثْنَى مَثْنَى** কথার অর্থ হলো, নফল নামাজ এক রাকাত এক রাকাত হয় না; বরং নফলের নিম্নতম স্তর হলো দুই রাকাত।

অথবা অর্থ এই যে, নফল নামাজের দু' রাকাত করে এক এক জোড়া আছে। তাই বলে দু' দু' রাকাত করে পড়া উত্তম- এ কথা নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য নয়।

الْغُضُوءُ وَالْغُضُوءُ-এর মধ্যকার পার্থক্য: আলোচ্য শব্দদ্বয়ের অর্থের ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে—

- কতিপয় আলিমের মতে শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। তবে **غُضُوءٌ** অর্থ- দৈনিক বিনয় এবং **غُضُوءٌ** অর্থ- চক্ষু, স্বর, ধ্বনি ইত্যাদির মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করা।
- আবার কারো মতে **غُضُوءٌ** অর্থ হলো- আভ্যন্তরীণ বিনয় এবং **غُضُوءٌ** অর্থ হলো- বাহ্যিক বিনয়।
- ইমাম ইবনুল মালিকের মতে যে বিষয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করে, তাকে **غُضُوءٌ** বলা হয় এবং নামাজে পূর্ণ একত্রতাকে **غُضُوءٌ** বলা হয়।

التَّفَضُّلُ الثَّلَاثُ: তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٥٠
سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
الْمَعْلِيِّ (رَحِمَهُ اللهُ) قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ
الْخُدْرِيُّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ
وَحِينَ رَفَعَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৫০. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে হারেস ইবনে মুআত্তা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আমাদের নামাজ পড়ালেন। তিনি যখন সেজদা হতে মাথা উঠালেন, যখন সেজদা করলেন এবং দু' রাকাতের পর মাথা উত্তোলন করলেন উচ্চঃস্বরে তাক্বীর [আত্লাহ আকবার] বললেন। অতঃপর বললেন, আমি মহানবী ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।
-বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে তিন স্থানে তাক্বীর উচ্চঃস্বরে বলার কথা আলোচিত হয়েছে, আর এ তিন স্থানের উচ্চঃস্বরে তাক্বীর বলা সুন্নত কি না? এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। তবে ইমামের জন্য তাক্বীর উচ্চঃস্বরে বলা সুন্নত; আর একাকী নামাজের জন্য স্বরবে বা নিরবে তাক্বীর বলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে।

وَعَنْ ٧٥١ عِكْرِمَةَ (رَح) قَالَ صَلَّيْتُ
خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَ
عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ
أَحْمَقُ فَقَالَ تَكَلَّمَ أُمَّكَ سَنَةً أَوْسَى
النَّاسِ ﷺ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৫১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মক্কায় এক বৃদ্ধের পিছনে নামাজ পড়েছি: তিনি মোট বাইশ বার তাকবীর বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বললাম, লোকটি বোকা বাটে: এটা শুনে তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হালাক করুক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। এটা তো আবুল কাসেম [নবী করীম] ﷺ -এর সুনত [পদ্ধতি]। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত বৃদ্ধ কে এবং তাকে কিভাবে আহমক বলা হলো: মক্কার বৃদ্ধ বলতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে আহমক বলার দ্বারা তা গালি অর্থে ব্যবহার হয়নি। এটা একটি আরবদের সামাজিক প্রথা বা রেওয়াজ মার্কি প্রবাদ বাক্য। কোনো কিছুর প্রতি গুরুত্ব প্রদান, চমক সৃষ্টি, বিরাগ প্রদর্শন ও বিস্ময় প্রকাশার্থে এ বাক্যগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এটা একটি বাগধারা। অতিসম্পাত কিংবা ঘৃণা প্রকাশ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বলা হয় না। 'তোমার মা তোমাকে হারাক' এটাও এরূপ একটি তিরস্কারসূচক বাক্য।

চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের তাকবীরের সংখ্যা: বনি উমাইয়্যার শাসনামলে উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলার নিয়ম পরিত্যক্ত করা হয়েছিল। হযরত ইকরিমা তাকবীর বলার নিয়ম হতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এ মশহুর ও প্রসিদ্ধ কথাটি তিনি কেন জানতেন না? আশ্চর্যবোধ করে ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে তিরস্কার করেছেন। তাকবীরে তাহরীমাসহ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের তাকবীর সংখ্যা বাইশ বারই হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٧٥٢ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ (رَض) مَرْسَلًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تَلِكْ صَلَوَتُهُ ﷺ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৭৫২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আলী ইবনে হুসাইন (র.) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে 'আল্লাহ আকবার' বলতেন, যখন মাথা নত করতেন এবং মাথা উঠাতেন। নবী করীম ﷺ -এর নামাজ সর্বদা এরূপই ছিল যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। -[মালিক]

وَعَنْ ٧٥٣ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ (رَض) أَلَا أَمَلَيْتُمْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الْإِنْفِتَاحِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى)

৭৫৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আলকামাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদেরকে বললেন, আমি কী তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো নামাজ পড়ে দেখাব না? অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন, অথচ নামাজ আরম্ভ করা কালীন তাকবীর বলার সময় একবার ব্যতীত আর হস্তদ্বয় উঠালেন না। -[তিরমযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। আবু দাউদ বলেন, এ অর্থে হাদীসটি সহীহ নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহাঙ্গ হাদীসের ব্যাখ্যা: তাকবীরে তাহরীমার সময় ব্যতীত অন্যনা অবস্থায় হাত উত্তোলনের ব্যাপারে ইমামদের ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা ১৩৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

وَعَنْ ٧٥٤ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৭৫৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন কেবলামুখী হতেন এবং দুই হাত উত্তোলন করে 'আল্লাহ আকবার' বলতেন। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٧٥٥ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَفِي مَوْجِرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ فَاسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فَلَانُ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تَصَلِّيَ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَضَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ. (رواه احمد)

৭৫৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের নামাজ পড়ালেন, তখন এক ব্যক্তি সর্ব পিছনের সারিতে ছিল এবং খারাপভাবে নামাজ পড়ছিল। যখন সে নামাজে সালাম ফিরাল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন, হে অমুক! তুমি আল্লাহকে ভয় করো না? দেখো না তুমি কিরূপে নামাজ পড়? তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা করো তা আমার নিকট অজ্ঞাত থাকে; আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি দেখি আমার পিছন দিকে, যেভাবে দেখি আমার সম্মুখ দিকে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের বন্দু ও সমাধান : আলোচ্য হাদীসে *لَأَرَى مِنْ خَلْفِي* প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ অদৃশ্য বস্তু ও দেখতে পান। পক্ষান্তরে অপর হাদীস *لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي* প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ অদৃশ্য বস্তু দেখতে পান না।

উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান এভাবে দেওয়া হয়েছে যে,

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর মুজিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ ওহি ও এলহাম দ্বারা অদৃশ্যের খবর রাখেন। আর *جِدَارِي* -এর অর্থ হলো ওহি ও এলহাম ব্যতীত আমি দেয়ালের অপর দিকের খবর বলতে পারি না।
২. অথবা হতে পারে যে, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে নামাজের মধ্যকার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যান্য হাদীসে নামাজের বাইরের কথা বলা হয়েছে। পার্থক্যের কারণ এই যে, নামাজের অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে একাগ্রতা ও একাকীত্বের অবস্থা হয়। সে সময় জাগতিক সমগ্র ধ্যান-ধারণা হতে এক দিক হয়ে রাক্বুল ইজ্তাত আল্লাহ তা'আলার নূরানুহ দেখায় নিমগ্ন থাকার কারণে সৃষ্টির রহস্য বেশি উন্মোচিত ও দীপ্তিমান হয়। তখন তিনি যেভাবে সামনের জিনিস দেখতেন তেমনিভাবে পিছনের জিনিসও দেখতেন; কিন্তু নামাজের বাইরের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

মহানবী ﷺ কি গায়েব জানতেন ? : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কেবলমাত্র আল্লাহই গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। কোনো নবী-রাসূল কিংবা আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মাখলুক গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত নয়; বরং এমন কিছু আকিদা রাখা বা তাদেরকে 'আলেমুল গায়েব মনে করা শিরক। আল্লাহর কালামে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ গায়েব জানতেন না। হাদীসেও এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। অবশ্য মহানবী ﷺ হতে কোনো কাজ বা তাঁর কোনো কোনো কথা হতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি গায়েব জানতেন। বস্তুত তা হয়েছিল ওহি বা এলহামের দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা ওহি ও এলহামের দ্বারাই কোনো কোনো গায়েবী ইলম তাঁকে দান করেছিলেন। সুতরাং যারা এ ধারণা ও আকিদা রাখে যে, তিনি সরাসরি গায়েব জানতেন, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও গোমরাহী।

بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পর যা পড়তে হয়

ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, নবী করীম ﷺ নামাজের ভিতরে বা বাইরে যে সব দোয়া পড়ছেন, শরিয়তের পরিভাষায় এসব দোয়াগুলোকে دُعَايُهُ مَأْتُوْرَةٌ [দোয়ায়ে মাছুরা] বলা হয়। তাকবীরে তাহরীমার পর এবং সূরা ফাতিহার পূর্বে পড়ার জন্য হাদীসে বিভিন্ন দোয়ায়ে মাছুরার উল্লেখ রয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করেছেন। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে ফরজ বা নফল সব নামাজেই ঐ সমস্ত দোয়ার কোনো একটি বা একাধিক পড়লে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। আর হানাফীদের মতে اَللّٰهُمَّ وَرَبِّكَ الْخَيْرُ দোয়া দ্বারা নামাজ আরম্ভ করতে হবে এবং অন্য সকল দোয়া নফল নামাজের জন্য প্রযোজ্য। তবে ফরজ নামাজে অন্যান্য দোয়া পড়তে চাইলে তাশাহহদের পরে পড়তে পারবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٥٦
أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَيَبْنِ
الْقِرَاءَةَ إِسْكَاتَةً فَقُلْتُ يَا أَبَى
رَسُولُ اللَّهِ إِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَيَبْنِ الْقِرَاءَةَ
مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ
خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৫৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাত পাঠের মধ্যে কিছু সময় নীরব থাকতেন। একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা ও মা আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত হোক। আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাত পাঠের মধ্যখানে নীরব থাকেন, এতে কি পাঠ করেন? তিনি বললেন, আমি বলি 'হে আল্লাহ তুমি আমার এবং আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দাও, যেভাবে তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছ। হে আল্লাহ! পাপ হতে আমাকে নির্মল রাখ, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে নির্মল রাখা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহকে পানি, বরফ এবং বারিধারায় ধুয়ে ফেল।' -[বুখারী মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাকবীর ও কেরাতের মধ্যে দোয়া পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাতের মধ্যখানে দোয়া পড়ার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ— ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'সুবহানাকাল্লাহু ওয়া বিহামদিকা' পড়াই সুন্নত। যদিও সহীহ হাদীসে অন্যান্য দোয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আহমদ ও মালেক (র.)-এর প্রকাশ্য মাহাবাবও এরূপ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, 'সুবহানাকা ও ইন্নী ওয়াজ্জাহু' উভয়টি পড়া সুন্নত। এটা ব্যতীত অন্যান্য দোয়াসমূহ তাহাজ্জুদ ও নফল ইত্যাদিতে পড়া সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রথম খুশা মহানবী ﷺ ফরজ নামাজেও অন্যান্য 'দোয়ায়ে মাছুরা' পাঠ করেছেন এবং পরবর্তীকালে উম্মতকে শিক্ষা দানের জন্য কখনও কখনও ফরজ নামাজেও অন্যান্য দোয়া পাঠ করেছেন।

وَعَنْ ٧٥٧ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلذَّنْبِ فَطَرَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُورْنِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِنِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَالْإِلَهَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشِعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُعْصِي وَعَظْمِي وَعَصِي فَيَاذَا رَفَعَ

৭৫৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, অন্য বর্ণনায় আছে যখন নামাজ আরম্ভ করতেন তখন প্রথমে ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন। অতঃপর বলতেন [দোয়া] “আমি আমার মুখ সেই সত্তার প্রতি ফিরিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে হকের প্রতি মনোনিবেশ করেছি এবং বাতিল হতে প্রত্যাবর্তন করেছি। আর আমি সেই লোকদের দলভুক্ত নই যারা শিরুক করে। নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যিনি বিশ্বজাহানের প্রভু! যার কোনো অংশীদার নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমি সার্বভৌম বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমি আমার প্রভু, আর আমি তোমার গোলাম [দাস]। আমি আমার নিজের উপর অবিচার করেছি এবং আমি আমার নিজের অপরাধ স্বীকার করছি। তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করো! নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে চালিত কর, নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া উত্তম চরিত্রের পথে অন্য কেউ চালিত করতে পারে না। আমার থেকে মন্দ আচরণকে দূরে রাখ, তুমিই আমাকে মন্দ আচরণ হতে রক্ষা করতে পার। হে আল্লাহ! তোমার সমীপে আমি হাজির আছি, তোমার আদেশ পালনের জন্য সदा প্রস্তুত আছি, যাবতীয় কল্যাণ তোমারই করতলে এবং কোনো অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমারই ভরসায় আছি এবং তোমারই শক্তির প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি মহীয়ান। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। যখন তিনি রুকুতে যেতেন তখন বলতেন, [দোয়া] “হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে রুকু করছি, তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তোমারই কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি। আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার স্নায়ুতন্ত্র তোমার নিকট অবনত”। অতঃপর যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন “হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক, তোমারই

وَعَنْ ٧٥٨ أَنَسِ (رض) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ
فَدَخَلَ الصَّلَاةَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ
أَكْبَرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا
مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
صَلَوَتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ
فَارَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ
بِالْكَلِمَاتِ فَارَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ
الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ
رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ
فَقُلْتُهَا فَقَالَ فَقَدْ رَأَيْتُ إِثْنَيْ عَشَرَ
مَلَكًا يَنْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا -
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৫৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত,
এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি এসে নামাজের সারিতে অন্তর্ভুক্ত
হলো, তখন তার শ্বাস দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, [এ অবস্থায়] সে
আল্লাহু অক্ববরুল্লু হুমদা কুবিরা টুবিবা - বলল -
“مُبَارَكًا فِيهِ” অর্থাৎ “আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর জন্যই
প্রচুর প্রশংসা, এতে অনেক পবিত্রতা ও বরকত দেওয়া
হয়েছে”। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ সমাপ্ত
করলেন, তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই
কথাগুলো বলল? লোকেরা [ভয়ে ও সংশয়ে] চুপ থাকল।
রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে
এই কথাগুলো বলল? জনতা চুপচাপ থাকল। রাসূল
আবারও বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এগুলো বলল? সে
তো খারাপ কিছু বলেনি। তখন লোকটি উঠে বলল, ইয়া
রাসূলুল্লাহ আমি [দ্রুত] এসেছিলাম। ফলে আমার শ্বাস দীর্ঘ
হয়েছিল। [তাই আপনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন]
আমিই [এ কথাগুলো] বলেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন,
আমি বারোজন ফেরেশতাকে দেখেছি যারা এই
কথাগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করেছে কে কার
আগে আল্লাহর দরবারে নিয়ে হাজির করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ هَادِيَسِ الرَّحْمَنِ :

عَنْ ٧٥٨ أَنَسِ (رض) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّلَاةَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوَتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَارَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَارَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ فَقَدْ رَأَيْتُ إِثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَنْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে রাসূল ﷺ দৌড়ে আসাকে নিষেধ করেননি। ইদা আতিনুম্‌ সলুওয়া ফলা তাতুওয়া আন্তুম্‌ তস্মেন্‌ হেল্‌ ইন্তুওয়া আন্তুম্‌ তস্মেন্‌ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ . فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَأَتَبَرُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْبَرُوا .

হাদীসটি হলো:-

إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُواهَا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ هَلْ إِنْتَرْتُمَا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ . فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَأَتَبَرُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْبَرُوا .

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে রাসূল ﷺ দৌড়ে আসাকে নিষেধ করেননি। ইদা আতিনুম্‌ সলুওয়া ফলা তাতুওয়া আন্তুম্‌ তস্মেন্‌ هَلْ إِنْتَرْتُمَا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ . فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَأَتَبَرُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْبَرُوا .

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٥٩

عَائِشَةُ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ وَيُبَارِكُ أَسْئَلُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَارِثَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ)

৭৫৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত :

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন তখন বলতেন— سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ وَيُبَارِكُ— [অর্থঃ, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসাসহকারে, তোমার নাম মঙ্গলময়, তোমার কৃতিত্ব সুমহান, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।—তিরমিযী ও আবু দাউদ] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি এমন একটি হাদীস, যা হারেছা ব্যতীত অন্য কারও সূত্র হতে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দোয়া নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : কোন দোয়া দ্বারা নামাজ শুরু করা হবে এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতান্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে الخ ... اِنِّي وَجَّهْتُ ... দোয়া দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব। তিনি মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। হাদীসটি হলো—

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ الصَّلَاةَ وَقَفَى رِوَابِعَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلدُّنْيَا فَطَرَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

২. ইমাম আযম আবু হানীফা, আহমদ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ وَيُبَارِكُ ... দোয়া দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নলিখিত দলিলগুলো পেশ করেন—

(১) قَوْلُهُ تَعَالَى يَحْمَدُ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ .

ইমাম আবু বকর জাসসাস (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য :

(২) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ ... الخ . (তিরমিযী . أَبُو دَاوُدَ)

(৩) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ الخ . (দারুফতীন)

(৪) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ الخ . (দারুফতীন)

(৫) عَنْ وَائِلَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ ... الخ . (طَبْرَانِيُّ)

(৬) عَنْ أَبِي بَكْرٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الخ

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত দলিলের উত্তর :

১. সম্ভবত এ হাদীসটি ইসলামের প্রথম যুগের। সূত্রাং তা রহিত হয়ে গেছে।
২. الخ ... اِنِّي وَجَّهْتُ ... তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়তেন। এবং الخ ... اِنِّي وَجَّهْتُ ... তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পড়তেন :

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ، فَكُنَّا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي إِفْرَادِهِ وَكُنَّا صَاحِبِ الْجَمَاعِ عَنِ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَهُ .

৭৬২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন ‘আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’ বলে কেবল আরাধনা করতেন এবং নীরব থাকতেন না।—[মুসলিম]

ইমাম হুমাইদী ইমাম মুসলিম কর্তৃক এ সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়াজাতসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে জামেউল উসুল প্রণেতাও শুধুমাত্র মুসলিম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَلَا فِي رَأْسِهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ : إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ، فَكُنَّا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي إِفْرَادِهِ وَكُنَّا صَاحِبِ الْجَمَاعِ عَنِ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَهُ .

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّلَاثُ

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَذَلِكُ أَمْرٌ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِينِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِينُنِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৭৬৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন [প্রথমে] ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন যার অর্থঃ— আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহরই জন্য; যিনি গোটা বিশ্বের প্রতিপালক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, আর এর জন্যই আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আর আমি হলাম এর প্রতি প্রথম অনুগত ব্যক্তি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ভালো কাজ ও ভালো চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া আর কেউই ভালো কাজ ও ভালো চরিত্রের পথ প্রদর্শন করতে পারে না। তুমি আমাকে খারাপ কাজ ও খারাপ চরিত্র হতে রক্ষা কর। কারণ, খারাপ কাজ ও চরিত্র হতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ রক্ষা করতে পারে না।—[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : **أَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ** الخ কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ 'আউয়াল' শব্দটির হুজ্জত ব্যবহার করে বলেছেন **أَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ** আর কখনো **أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** الخ বলেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভাষায়। আর প্রত্যেক নবীই তাদের উম্মতদের তুলনায় **أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ** বা প্রথম মুসলিম। আর এ হিসাবেই রাসূল ﷺ **أَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ** বলেছেন।

وَعَنْ ٧٦٤ **مُعَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ** (رض) **قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ لِلَّهِمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَيَعْمَدُكَ ثُمَّ يَقْرَأُ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)**

৭৬৪. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল নামাজে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন, “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” **وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** [অর্থঃ আল্লাহ সূমহান, সর্বদিক হতে প্রত্যাভর্তন করে আমি সেই সত্তার দিকে অভিমুখী হয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন।]

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা হাদীসটির অবশিষ্টাংশ হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি **أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** -এর পরিবর্তে **أَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ** বলেছেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে খোদা! তুমি মালিক, তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার গুণ-কীর্তন সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ কেরাত পাঠ শুরু করতেন। -[নাসায়ী]

কথা দ্বারা 'নামাজ পূর্ণ হবে না' বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি হাদীসকে এ মতের পক্ষে পেশ করা যেতে পারে। যথা— مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ এ হাদীসটির দ্বারাও বুঝা যায় যে, সূরায় ফাতিহা পাঠ না করলে নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু নামাজ বাতিল হয় বলে বুঝা যায় না। আর সাধারণত ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলেই নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শাফেয়ীর মতে সূরা মিলানো সন্নত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে সূরা মিলানো ও ফাতিহা পাঠ উভয়ই ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেন, ফাতিহা পাঠ ও সূরা মিলানো উভয়টি ফরজ।

وَعَنْ ٧٦٦ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَيُقْبَلُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْأِمَامِ قَالَ أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ائْتِنِي عَلَى عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ مَجْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي مَا سَأَلَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৬৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন— যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামাজ অসম্পূর্ণ। একথা তিনি তিনবার বললেন। তখন হযরত আবু হুরায়র (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি। তিনি বলেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ রাক্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন, আমি নামাজকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আধাআধি করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দা তখন যা চাইবে, তাই পাবে। যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ["সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"] তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।" যখন বান্দা বলে الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ["আল্লাহ পরমদাতা এবং দয়ালু"] তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ ব্যক্ত করল এবং যখন বান্দা مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ ["আল্লাহ কিয়ামত দিবসের মালিক"] বলে, তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল" এবং যখন বান্দা বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ["হে আল্লাহ! আমি তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই"] তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আধাআধি। "এ মুহূর্তে আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তা রয়েছে।" আর যখন বান্দা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ["হে আল্লাহ! আমাদের সরল পথ দেখান, এমন পথ, যে পথপ্রাপ্তদের উপর আপনি অনুগ্রহ করছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছেন"] তখন আল্লাহ বলেন, "এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তাই রয়েছে।" [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَلَى الْبُرْءَةِ فَرَضَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ কি না? নামাজের প্রতি রাকাতকে কেব্রাত ফরজ কি না? নামাজের প্রতি রাকাতকে কেব্রাত ফরজ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে যে কোনো দু'রাকাতকে কেব্রাত পড়া ফরজ। তবে প্রথম দু'রাকাতকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া ওয়াজিব।

فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرَر مِنَ الْقُرْآنِ - দলিল

- * ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে সব রাকাতেই কেব্রাত পড়া ফরজ।
- * ইমাম মালিক (র)-এর মতে যে কোনো তিন রাকাতকে কেব্রাত পড়া ফরজ।
- * ইমাম হাসান বসরী ও যুফার (র)-এর মতে শুধু এক রাকাতকে কেব্রাত পড়া ফরজ।
- * ইমাম আহমদের মতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ।
- * হানাফীদের মতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া নিয়ে ইমামদের মতভেদ : সকল ওলামায়ে কেব্রাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম ও একাঙ্গী নামাজ আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক রাকাতকে সূরায় ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমামের পিছনে মুজাদির কেব্রাত পঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে ওলামায়ে কেব্রাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যথা-

১. ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে কেব্রাত **جَهْرِي** হোক বা **سِرِّي** সর্বাবস্থায় মুজাদির উপর কেব্রাত পড়া ফরজ। তাঁর দলিল হচ্ছে-
 ۱. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِمَا تَحْتَ الْكِتَابِ .
 ۲. مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ نَبِيٌّ خَدَّاجٌ . الْحَدِيثُ
 ۳. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَقَرَأَ بِمَا تَحْتَ الْكِتَابِ .
২. ইমাম মালিক ও আহমদ (র)-এর মতে **جهري** সালাতে কেব্রাত পড়তে হবে না। তাঁর দলিল-
 ۱. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِذَا اسْتَرَتْ قِرَاءَتِي فَأَقْرَأُوا . (دَارُ قُطَيْبِ)
৩. ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) বলেন, মুজাদির উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করার কোনো বিধান নেই; বরং সে নীরব থাকবে। শুধুমাত্র ইমাম ও একাঙ্গী সালাতে আদায়কারীর উপর এটি পড়া ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হচ্ছে-
 ۱. قَوْلُهُ تَعَالَى : فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرَر مِنَ الْقُرْآنِ .
 ۲. وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَجِيعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . (الْآيَةُ)
 ۳. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْجَرِيِّ (رَضِيَ) وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا . (مُسْلِمٌ)
 ۴. عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ .
 ۵. عَنْ تَابِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَبَّلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَعَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ . (بَدَأَ مَالِكٌ)

إِمَامٍ شَا فَعَيْدٍ ، آهَمَدٌ وَ مَالِكٌ (ر.)-এর দলিলের জবাবে আহনাফ বলেন—

১. **مُنْفَرِدٌ** -এর সালাতের **تَعْنِي** করা হয়েছে, মুজাদির সালাতের **تَعْنِي** করা হয়নি।
২. **كَمَالِيَّتٌ** -এর **تَعْنِي** করা হয়েছে।
৩. দ্বিতীয় হাদীসের সনদে **اضْطِرَابٌ** রয়েছে।
৪. ইমাম মালিক ও আহমদের হাদীসের জবাবে ইমাম দারে কুতনী (র.) বলেন,

تَعْنِي بِهِ رَكْعَتًا وَهِيَ مُنْفَرِدٌ مَعْرُوكٌ .

وَعَنْ ٧٦٧ أَنَسِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ (رض) وَعُمَرُ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) তাঁরা সকলেই ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’ বাক্য দ্বারা নামাজ আরম্ভ করতেন।
-মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٧٦٧ হাদীসের ব্যাখ্যা : ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’ বাক্য দ্বারা সূরয়ে ফাতিহা বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য হাদীসের রাবী সূরয়ে ফাতিহাকে সশব্দে পড়তে শুনেছিলেন, বিসমিল্লাহকে পড়তে শুনেনি। কারণ বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়া হয়েছিল। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) বিসমিল্লাহকে চুপে চুপে পড়ার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন যে, সূরয়ে ‘নমল’ ব্যতীত বিসমিল্লাহ কোনো সূরার অংশ নয়। ইমাম শাফেয়ীর মতে বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ। সুতরাং প্রকাশ্য নামাজে তা সশব্দে পড়া আবশ্যিক। এ মতের অনুকূলে তিনি কতিপয় হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

وَعَنْ ٧٦٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاَقَعَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا أَمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَاَقَعَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِنَّا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ فَمَنْ وَاَقَعَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৬৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ইমাম যখন ‘আমীন’ বলবেন, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলবে। কেননা, যার ‘আমীন’ বলা ফেরেশতাদের ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে হবে তার বিগত যত গুনাহ আছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [বুখারী-মুসলিম] অপর এক রিওয়ায়তে আছে মহানবী ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** বলবেন, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, যার বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে সাথে হবে, তার বিগত যত পাপ আছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এটা বুখারীর বর্ণিত ভাষ্য। মুসলিমও এরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেবরাত পাঠকারী ‘আমীন’ বলেন, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলবে। কেননা, ফেরেশতাগণও ‘আমীন’ বলেন। যার ‘আমীন’ বলা ফেরেশতাদের ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে হবে তার বিগত যত পাপ আছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٧٦٨ আমীন বলার মধ্যে ফেরেশতাদের সাথে সাথে হওয়ার অর্থ : ফেরেশতাদের আমীনের ‘সাথে সাথে’ হওয়ার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যা নিম্নরূপ—

১. ফেরেশতাগণ যখন ‘আমীন’ বলে সে ওয়াক্ত বা সময়ে তোমরাও আমীন বল। আর এটাই অধিকাংশের মতে সহীহ অর্থ।
২. কারো মতে, তাঁরা কেবল নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে ‘আমীন’ বলে থাকেন তোমরাও তদ্রূপভাবে বল।

৩. আবার কারো অভিমত এই যে, তারা যেভাবে 'আমীন' বলে সুরায়ে ফাতিহা পাঠের শেষে জবাব দেন, তোমরাও অনুরূপভাবে জবাব প্রদান কর। অর্থাৎ তারা চুপে চুপে 'আমীন' বলেন, তোমরাও তাই কর। তবেই ফেরেশতাদের সাথে সঠিক ভাবে **سَوَافِيَتْ** হবে।

অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে—এর ব্যাখ্যা : এখানে গুনাহ অর্থ—'সগীরা' বা ছোট ছোট গুনাহ। আল্লাহ স্বীয় কালামেই ঘোষণা দিয়েছেন 'দৈক আমলের দ্বারা সগীরা গুনাহের মার্জনা হয়ে যায়।' বক্তৃত্ত কবীরা গুনাহেরও মার্জনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, বান্দা নামাজের মধ্যে থেকেই অমীন শব্দ বলছে। আর নামাজ হলো ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম। এতদ্ভিন্ন নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর ফেরেশতাগণও এ শব্দে 'আমীন' বলে সে বান্দার জন্য দোয়া করেন। কাজেই কবীরা গুনাহও মাফ হতে পারে।

وَعَنْ ٧١١ **أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ** (رض) **قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِيبِكُمُ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْلِكَ يِتْلِكَ قَالَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رِنَّا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ . (رواه مسلم) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَقَادَةَ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا .**

৭৬৯. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—যখন তোমরা নামাজ পড়বে, তখন প্রথমে তোমরা নিজেদের কাতার সোজা করবে। অতঃপর যেন তোমাদের একজন ইমামতি করে। যখন তিনি তাকবীর [তাহরীমা] বলবেন, তোমরাও [সাথে সাথে] তাকবীর বলবে এবং যখন তিনি **غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** বলবেন, তখন তোমরা বলবে 'আমীন'। আল্লাহ তা কবুল করবেন। অতঃপর যখন তিনি তাকবীর বলবেন ও রুকু করবেন, তোমরাও তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাবেন আর তোমাদের আগেই মাথা উঠাবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এটা এর পরিবর্তে [অর্থাৎ তোমরা দেরিতে রুকুতে গেলে এবং দেরিতে মাথা উঠালে ইমাম সকালে রুকুতে গেলে এবং সকালে মাথা উঠালে উভয়ের সময় সমান হয়ে গেল]। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আর যখন ইমাম **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলবে, তখন তোমরা বলবে—**اللَّهُمَّ رِنَّا لَكَ الْحَمْدُ** আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন।—[মুসলিম] অপর বর্ণনায় আবু হুরায়রা ও কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম কেব্রাত পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বাস্তব ইমামদের বক্তব্য : আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, ইমামের দায়িত্ব হলো **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** এবং মুক্তাদির দায়িত্ব **رِنَّا لَكَ الْحَمْدُ** বলা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেহী (র.) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদি উভয়েই উভয়টি বলবেন। অবশ্য তিনি অন্য হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। আর সকল ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়বে সে উভয় বাক্যই বলবে; তবে শুধু **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বললে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

يِتْلِكَ يِتْلِكَ—এর ব্যাখ্যা : **يِتْلِكَ يِتْلِكَ** বাক্যটির ব্যাখ্যা তিন প্রকার হতে পারে। সব প্রকারের মর্মার্থ একই।

۱. اللَّحْظَةُ الَّتِي سَبَقَكُمْ الْإِمَامُ بِهَا فِي تَقْدِيمِهِ إِلَى الرُّكُوعِ تَنْجِيحٌ بِأَخْرَجَكُمْ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ رَفْعِهِ لِحْظَةً فَيَلِكُ اللَّحْظَةُ بِحَلِكِ اللَّحْظَةِ وَصَارَ قَدْرُ رُكُوعِكُمْ كَقَدْرِ رُكُوعِهِ .

১. প্রথম লَحْظَةً দ্বারা মুক্তাদির লَحْظَةً উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় لَحْظَةً দ্বারা ইমামের লَحْظَةً উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম মুক্তাদি অপেক্ষা যেই সময়টুকু পূর্বে রুকুতে গেছে, আর ইমাম রুকু হতে উঠার যে পরিমাণ সময় মুক্তাদির বিলম্ব হয়েছে। সুতরাং রুকুতে ইমাম এবং মুক্তাদির সমপরিমাণ সময় ব্যয় হবে। এ ব্যাখ্যা হলো উল্লিখিত এই হাদীসটির জন্য। কেননা- لَحْظَةُ يَلِكُ بِحَلِكِ -এর সম্পর্কটি এখানে রুকুর সাথে।

۲. زِيَادَةُ إِمَائِكُمْ أَوْلَىٰ فِي السُّجُودِ مُتَمَيِّرَةٌ بِزِيَادَتِكُمْ عَلَيْهِ فِي السُّجُودِ آخِرًا .

۳. زِيَادَتُكُمْ آخِرًا فِي السُّجُودِ فِي مَقَابِلَةِ زِيَادَةِ إِمَائِكُمْ عَلَيْهِ فِي السُّجُودِ أَوْلَىٰ .

উল্লিখিত দু' নং এবং তিন নং ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তের হাদীসের لَحْظَةُ يَلِكُ بِحَلِكِ -এর মর্মার্থ।

وَعَنْ ۷۷ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأَوَّلِينَ يَأْمُ الْكِتَابِ وَ سُوْرَتَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ يَأْمُ الْكِتَابِ وَ يَسْمِعُنَا آيَةَ أَحْيَانًا وَ طَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مَالًا يُطْبِلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ هَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَ هَكَذَا فِي الصُّبْحِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭০. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজের প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন এবং শেষ দু' রাকাতে কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করতেন, তিনি মাঝে মাঝে কখনও কখনও আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পাঠ করতেন। আর তিনি প্রথম রাকাতে কেবলমাত্র দীর্ঘ করতেন, যা তিনি দ্বিতীয় রাকাতে করতেন না, এভাবে তিনি আসর এবং ফজর নামাজেও করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَسَمِعْنَا آيَةَ أَحْيَانًا -এর অর্থ : এটা সুস্পষ্ট যে, দিবা ভাগের নামাজে قُرَاتٍ اِخْفَاءٍ ওয়াজিব; কিন্তু রাসূল ﷺ কোনো কোনো সময় আয়াতসমূহ কতক শব্দাবলি উচ্চঃস্বরে পড়তেন, যাতে সাহাবীগণ সূরা শব্দকে অবহিত হতে পারেন এবং তাঁরা রাসূল ﷺ -এর অনুকরণ করতে পারেন। মূলকথা হলো, এটা রাসূল ﷺ -এর জন্যই একমাত্র খাস ছিল।

وَسَمِعْنَا آيَةَ أَحْيَانًا -এর অর্থ : প্রথম রাকাতে কেবলমাত্র দীর্ঘায়িত করার কারণ হলো, যাতে মুক্তাদিগণ নামাজে শরিক হওয়ার সুযোগ পায়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক, হানাফীদিগের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সব প্রায় সমস্ত ইমামগণই বলেন, সকল নামাজেই প্রথম রাকাতে কেবলমাত্র দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকাতে খাটো করে পড়াই উত্তম। এ হাদীসটি তাঁদের দলিল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ফজর নামাজ ব্যতীত সকল নামাজে উভয় রাকাতে সমানভাবে দীর্ঘ কিংবা খাটো হওয়া উত্তম। মূলত ফজরের সময় নিদ্রা ও অসচেতনের সময়, তাই মুক্তাদিদের সহানুভূতির লক্ষ্যে কেবলমাত্র দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়। আর কেবলমাত্র দীর্ঘ উভয় রাকাতের মর্মাদি সমান। কাজেই উভয় রাকাতই সমপরিমাণ হওয়া উচিত। যেমন- অন্য আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে তিনি ফজরের প্রত্যেক রাকাতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। আর প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন মানে বিস্মিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও ছানা ইত্যাদির দরুন দীর্ঘায়িত হতো।

وَعَنْ ٧٧١ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ السَّمِّ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأَخْرَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأَخْرَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭১. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যোহর ও আসর নামাজের কিয়াম [দাঁড়িয়ে থাকা] সম্পর্কে অনুমান করতাম। আমরা অনুমান করেছি যে, তিনি যোহর নামাজের প্রথম দু' রাকাতে 'আলিফ-লাম মীম তানযীলুস সিজদাহ' নামক সূরা পাঠ পরিমাণ সময় কিয়াম করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, প্রত্যেক রাকাতেই ত্রিশ আয়াত পড়া পরিমাণ সময় তিনি কিয়াম করতেন। আমরা আরও অনুমান করেছি যে, তাঁর শেষের দু' রাকাতের কিয়াম প্রথম দু' রাকাতের কিয়ামের তুলনায় অর্ধেক হতো। আমরা এটাও অনুমান করেছি যে, আসরের প্রথম দু' রাকাত নামাজের কিয়াম জোহরের শেষ দু' রাকাত নামাজের কিয়ামের সমান। আর আসরের শেষ দু' রাকাত প্রথম দু' রাকাতের কিয়ামের তুলনায় অর্ধেক হতো। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٧٧٢ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يقرأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي رِوَايَةٍ يَسْبِحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ اطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

জোহরের শেষ রাকাতে সূরা ফাতিহা সাথে অন্য সূরা পাঠ করতেন। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা পরেও অন্যান্য আয়াত পাঠ জায়েজ আছে এটা দেখানোর জন্য রাসূল ﷺ-এর মাঝে মাঝে সূরা পড়তেন। মূলত শেষ দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

৭৭২. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর নামাজে 'আলিফ-লাম মীম তানযীলুস সিজদাহ' নামক সূরা পাঠ পরিমাণ সময় কিয়াম করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি যোহর নামাজের শেষ দু' রাকাত নামাজের কিয়ামের তুলনায় অর্ধেক হতো। আমরা এটাও অনুমান করেছি যে, আসরের প্রথম দু' রাকাত নামাজের কিয়াম জোহরের শেষ দু' রাকাত নামাজের কিয়ামের সমান। আর আসরের শেষ দু' রাকাত প্রথম দু' রাকাতের কিয়ামের তুলনায় অর্ধেক হতো। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٧٧٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يقرأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي رِوَايَةٍ يَسْبِحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ اطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তারাবাহের নামাজ ব্যতীত এক রাকাতে একটি পূর্ণ সূরা পাঠ করাই সুনত, অংশ বিশেষ পড়া জায়েজ ভাবে সুনত নয়। রাসূল ﷺ-এর একই পড়তেন। কোনো একটি নামাজের জন্য বিশেষ কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট

وَعَنْ ۷۷۳ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رَض) سَأَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭৩. অনুবাদ : হযরত জুবাইর ইবনে মুত ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল্লাহ ﷺ কে মাগরিব নামাজে সূরায় তুর পড়তে শুনেছি।

وَعَنْ ۷۷۴ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারেস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাজে সূরা মুরসালাত পড়তেন।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ কোনো বিশেষ নামাজের জন্য বিশেষ সূরাকে নির্দিষ্ট করে পড়েননি; বরং একই নামাজে বিভিন্ন সূরা পড়তেন। তবে যে নামাজে যে সূরা অধিকাংশ সময় পড়েছেন, আমাদেরও সে নামাজে তা অধিকাংশ সময় পড়া উত্তম। রাসূল ﷺ মুক্তাদির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কখনও কেবল দীর্ঘ করেছেন আবার কখনও সংক্ষিপ্ত করেছেন। হযরত ওমর (রা.) কুরআনের সূরাসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন-

১. তেওয়ালে মুফাস্সাল অথবা দীর্ঘ সূরা। সূরায়ে হজরাত হতে সূরায়ে বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলো তেওয়ালে মুফাস্সাল। ফজর ও জোহর নামাজে তেওয়ালে মুফাস্সাল উত্তম।
২. আওসাতে মুফাস্সাল বা মধ্যম সূরা। সূরায়ে বুরূজ হতে লَمْ يَكُنْ পর্যন্ত সূরাগুলো আওসাতে মুফাস্সাল। আসর ও ইশার নামাজে এ সূরাগুলো পড়া উত্তম।
৩. কেসারে মুফাস্সাল বা সংক্ষিপ্ত সূরা। আর তা হলো লَمْ يَكُنْ হতে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলো। মাগরিবের নামাজে এই সূরাগুলো পড়া সন্নত।

وَعَنْ ۷۷۵ جَابِرٍ (رَض) قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رَض) يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَانْفَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَأَنْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنْفَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا تَيَسَّرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَاخِرَتَهُ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ

৭৭৫. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) মহানবী ﷺ-এর সাথে জামাতে নামাজ পড়তেন। অতঃপর নিজ মহল্লায় গিয়ে মহল্লাবাসীদের ইমামতি করতেন। একদা রাতে তিনি মহানবী ﷺ-এর সাথে ইশার নামাজ পড়লেন এবং এরপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন এবং নামাজে পূর্ণ সূরায় বাকারা পাঠ করা শুরু করলেন। এতে এক ব্যক্তি [অপারগ হয়ে] সালাম ফিরিয়ে জামাত হতে পৃথক হয়ে গেল এবং একাকী পৃথকভাবে নামাজ পড়ে অবসর গ্রহণ করল। লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি মুনাফিক হইনি। নিশ্চয়ই আমি রাসূল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাকে অবহিত করব। অতঃপর সে রাসূল্লাহ ﷺ-এর

تَوَاضِعٌ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مَعَادًا صَلَّى
 مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ سُورَةَ
 الْبَقَرَةِ فَاقْبَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَعَادٍ
 فَقَالَ يَا مَعَادُ أَتَنْتَانِ أَنْتَ إِفْرَأُ وَالشَّمْسِ
 وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
 وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

নিকট গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ক্ষেতে-মাঠে পানি সেচনকারী লোক। সারা দিন সেচের কাজে পরিশ্রম করে থাকি, এমতাবস্থায় মুআয আপনার সাথে ইশার নামাজ পড়ে নিজ মহল্লায় এসে সূরা বাকারা দিয়ে ইশার নামাজ শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআযকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুআয! তুমি কি সমস্যা-সৃষ্টিকারী! তুমি ইশার নামাজে সূরা 'ওয়াশ শামসি ওয়া দোহাহা' 'ওয়াদ দোহা' 'ওয়াল লাইলি ইয়া ইয়াগুশা' এবং 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা'[-এর ন্যায় ছোট সূরা] পড়বে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেন্দা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَنْعَبُ الشَّامِيِّ وَأَمَدٌ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ও আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেন্দা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

- আলোচ্য হাদীসে হযরত মুআয (রা.)-এর ঘটনা যা হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি হুজুর ﷺ -এর পিছনে প্রথমে ফরজ হিসেবে আদায় করে পরে নফল আদায়কারী হিসেবে ইমামতি করতেন। যদি এটা জায়েজ না হতো, তবে মহানবী ﷺ অবশ্যই তাকে দ্বিতীয়বারে ইমামতি করতে নিষেধ করতেন।
- হযরত জিব্রাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইমামতি করেছেন। অথচ ফেরেশতার উপর নামাজ ফরজ নয়। যদি এটা জায়েজ না হতো তা হলে ফরজ আদায়কারী মহানবী ﷺ -এর পক্ষে নফল আদায়কারী জিব্রাইলের পিছনে একতেন্দা করা কিভাবে জায়েজ হলো?
- হানাফীদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর এক মতানুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেন্দা জায়েজ নেই।

مَنْعَبُ الْأَحْنَابِ وَدَلِيلُ الْأَحْنَابِ : হানাফী মতাবলম্বীদের দলিল : হানাফীগণ নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন—

- নবী করীম ﷺ বলেছেন, ইমাম মুক্তাদির নামাজের জামিন হয়। এখানে এটা যুক্তিযুক্ত যে, নফল আদায়কারী দুর্বল এবং ফরজ আদায়কারী শক্তিমান। দুর্বল কখনও শক্তিমানের জামিন হতে পারে না। সুতরাং নফল আদায়কারী কখনও ইমাম হিসেবে ফরজ আদায়কারী মুক্তাদির জামিন হতে পারে না।
 - দ্বিতীয়ত যদি ফরজ নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির একতেন্দা নফল আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে জায়েজ হতো, তা হলে সালাতুল খাওফে নবী করীম ﷺ একই নামাজে দু' দলের ইমাম না হয়ে; বরং এক দলকে নামাজ পড়িয়ে দ্বিতীয়বার নফল নিয়তের সাথে অন্য দলকে নামাজ পড়াতেন। অথচ তিনি এরূপ করেননি। এটা সহজ পস্থা ছিল। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেন্দা জায়েজ নেই।
- শাফেয়ী মতাবলম্বীদের দলিলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে শাফেয়ী মতাবলম্বীদের দলিলের নিম্নলিখিত জবাব প্রদান করা হয়েছে—
- হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম ﷺ -এর পিছনে নফলের নিয়তে নামাজ পড়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলের সাথে নামাজ পড়ে নামাজের নিয়মকানুন ও আদাব শিক্ষা করবেন। অথবা এটাও হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ -এর পিছনে নামাজ পড়ার বরকত ও ফজিলত পাওয়ার জন্য তিনি নফল নামাজের নিয়ত করে নামাজ পড়েছিলেন। অতঃপর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে ফরজ নামাজ পড়েছিলেন।
 - হযরত মু'আয (রা.)-এর এ কার্যকলাপ ঐ সময়ের ছিল, যখন একই ফরজ নামাজ দু'বার পড়ার অনুমতি ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই ফরজ

নামাজকে দু'বার পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে আরও আছে, তিনি বলেছেন— একই নামাজকে একই দিনে দু'বার পড়ো না। এ হাদীসগুলোতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফরজ নামাজকে দু'বার পড়ার শরয়ী বিধান ছিল, পরবর্তীকালে নবী করীম ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ বৈধতার উপরেই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে থাকে।

৩. জিব্রাঈলের ইমামতি সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তর হচ্ছে—

ক. আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে নামাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন, এ আদেশের ফলেই তার উপরে নামাজ ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত জিব্রাঈল (আ.) নফল নামাজ আদায়কারী ছিলেন না; বরং ফরজ নামাজ আদায়কারী ছিলেন। সুতরাং এখানে ফরজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীরই একতেনা করা হয়েছে।

খ. হযরত জিব্রাঈল (আ.) এ প্রশিক্ষণ দানের পূর্বে নবী করীম ﷺ-এর উপরে নামাজ ফরজ ছিল না; বরং নামাজ নফল ছিল। এতে বুঝা যায় যে, নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর একতেনা করা হয়েছিল। এরূপ একতেনা সকলের মতেই জায়েজ।

وَعَنْ ٧٧٦ الْبَرَاءِ (رَض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالْتَّيْمِينَ وَالزَّنُتُونَ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭৬. অনুবাদ : হযরত বার' ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-কে ইশার নামাজে সূরা ওয়াত তীনি ওয়ায যায়তুনি পাঠ করতে শুনেছি। আমি তাঁর চেয়ে উত্তম কণ্ঠস্বর কারও শুনি নি। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٧٧٧ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوَهَا وَكَانَتْ صَلَوَتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭৭. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজে সূরা ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ এবং এরূপ দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন এবং এটা ছাড়া অন্যান্য নামাজগুলো সংক্ষেপ করতেন। —[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٧٨ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ (رَض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজে 'ওয়াল লাইলি ইয়া আসআসা' [সূরায়ে তাকবীর] পড়তেন। —[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٧٩ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ (رَض) قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتِ النَّبِيُّ ﷺ سَعْلَةً فَرَكَع . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [মক্কা বিজয়ের দিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়ালেন এবং সূরায়ে মু'মিনীনি পাঠ করা শুরু করলেন। যখন তিনি হযরত মুসা ও হারুন অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাহিনী পর্যন্ত পৌছলেন, [ক্রন্দনের দরুন] তাঁর হেঁচকি এসে গেল। তখন তিনি রুকুতে চলে গেলেন। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَيْثُ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসে جَاءَ -এর রাসূল ﷺ হলে ذَكَرَ পদটি মানস্ব, তা না হলে মাহফু' আর ذَكَرَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াত هَارُونَ وَأَخَاهُ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ আর ذَكَرُ عَيْسَى দ্বারা উদ্দেশ্য আয়াত وَمَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِمْرًا وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِمْرًا وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْرَائِيلَ অর্থাৎ এ সমস্ত আখিয়ারের অতীত ঘটনাবলি স্বরণ পড়ায় কান্নায় তাঁর হেঁচকি এসে যায় এবং কষ্ট রুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে তিনি সুবাটি সমাণ্ড করতে পারেননি।

নামাজে কেব্রাত পড়তে গিয়ে কোনো কারণে যদি বাধার সৃষ্টি হয়, আর এ পরিমাণ কেব্রাত পড়া হয়ে থাকে যার দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হয় অর্থাৎ বড় এক আয়াত বা ছোট তিনি আয়াত পরিমাণ, তবে তৎক্ষণাৎ রুকুতে চলে যাওয়াই উত্তম।

وَعَنْ ٧٨٠ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يقرأ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِآلَمِ تَنْزِيلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৮০. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজের প্রথম রাকআতে 'আলিফ লাম-মীম তানযীল' এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'হাল আ'তা আলাল ইনসান' তথা সূরা দাহর পাঠ করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٧٨١ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ (رَض) قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرأ بِهَمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮১. অনুবাদ : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার [খলিফা] মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কা অভিযুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) জুমার নামাজে আমাদের ইমামতি করলেন এবং এতে তিনি প্রথম রাকআতে সূরায় জুমু'আ এবং অপর রাকআতে 'ইয়া জা-আকাল মুনাফিকুন' পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জুমার দিনে এ দু'টি সূরা পড়তে শুনেছি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : জুমার দিন উক্ত সূরা দু'টি পড়ার মধ্যে সম্ভবত এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো, মানুষের সৃষ্টি, সূচনা, পরিণতি ও পরকাল, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, বেহেশত ও দোজখ এবং এর অধিবাসীদের অবস্থার বিররণ এবং অবশেষে দুনিয়ার ধ্বংস-প্রলয় তথা কিয়ামত কায়েম হবে সেই জুমার দিনেই। তাই প্রায়শঃ হজুর ﷺ উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করতেন। তবে তিনি সর্বদা এটা পড়তেন না।

وَعَنْ ٧٨٢ الثُّعْمَانَ بْنِ يَسْبِرٍ (رَض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقرأ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَهَلْ آتَىٰكَ حَدِيثُ الْغَائِثِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهَمَا فِي الصَّلَوَتَيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮২. অনুবাদ : হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদে এবং জুমার নামাজে 'সাব্বিহিসুমা রাব্বিকাল আ'লা' এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' এ দুই সূরা পাঠ করতেন। রাবী বলেন, যদি ঈদ ও জুমা একই দিনে হতো, তখনও তিনি এ দুই সূরাই উভয় নামাজে পাঠ করতেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٨٣ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮৩. অনুবাদ : হযরত ওবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একবার আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাজে কি পাঠ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এ দুই ঈদে 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' এবং 'ইক্বতারাবাতিস সা'আহ' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উপরে উল্লিখিত কয়েকটি হাদীসে পরম্পর বিপরীত বর্ণনা এসেছে। মূলত এটা বৈপরীত্য প্রকাশ নয়। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি হুজুর ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় একই নামাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা পাঠ করেছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবগতি অনুসারে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা.) অবশ্যই জানতেন যে, মহানবী ﷺ দুই ঈদে কি পড়েছেন, তবু লোকদের সম্মুখে প্রমাণের উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছেন।

وَعَنْ ٧٨٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضاً) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رُكْعَتِي الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (সুন্নত) দু' রাকাতে কুল ইয়া আইয়্যুল কাফিরুন এবং কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ সূরাদ্বয় পাঠ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে ফজরের দুই রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজরের সুন্নত রাকাতদ্বয়। রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নত নামাজে প্রায়ই ছোট ছোট সূরা পড়তেন।

وَعَنْ ٧٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضاً) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رُكْعَتِي الْفَجْرِ قَوْلُوا أَمْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাকাতে যথাক্রমে সূরায়ে বাকারার 'কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা' এবং সূরায়ে আলে ইমরানের 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তা'আলা ও ইলা কালিমাতিন সাওয়ামিম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম' পাঠ করতেন। -[মুসলিম]

الدَّفْعُ الثَّانِي : ১ম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٨٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضاً) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتَتِعُ صَلَوَتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَكَرٍ)

৭৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাকাসহকারে নামাজ শুরু করতেন। -[তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটির বর্ণনাসুখ সুদৃঢ় নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَسَةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ آيَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ تَقْرَأُ هَذِهِ آيَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؟ قَالَ: «لِيُحْيِيَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ آيَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ»

হাদীসের ব্যাখ্যা : বিসমিল্লাহ সহকারে শুরু করার অর্থ হলো, বিসমিল্লাহকে প্রকাশ করে পড়তেন, এমন নয় বরং তা চুপে চুপেই পড়তেন। কেননা, পূর্বে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' ধারাই নামাজ শুরু করতেন এ পর্যায়ে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। মূলত বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

عَنْ ٧٨٧ وَائِلِ بْنِ حَنْبَرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ آيَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ تَقْرَأُ هَذِهِ آيَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؟ قَالَ: «لِيُحْيِيَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ آيَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ»

৭৮৭. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'গায়রিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বান্নীন, পড়তে শুনেছি। অতঃপর তিনি নিজের স্বরকে উঁচু করে 'আমীন' বলেছেন।-।তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْلَافُ الْأَيْمَةِ فِي السَّامِيْنَ فِي الصَّلَاةِ নামাজে আমীন বলা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : নামাজে সূরা 'ফাতিহা'-এ আমীন বলা সম্পর্কে তিন ধরনের আলোচনা হতে পারে, যা নিম্নরূপ—

প্রথমত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, নামাজের মধ্যে সুরায়ে ফাতিহার সমাপ্তিতে আমীন বলা মোস্তাহাব। জাহেরিয়া সম্প্রদায় বলেন, ওয়াজিব এবং রাফেজীগণ বলেন, বিদ্'আত। তাদের মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত : ইমাম 'আমীন' বলবে কি না? ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, ইমাম 'আমীন' বলবে না। কেবলমাত্র মুক্তাদিগণই বলবে। কেননা, আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, ইমাম বলবে—وَالصَّالِحِينَ এবং মুক্তাদিগণ বলবে—أَمِينَ এ হাদীস হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমামের অংশ হলো وَالصَّالِحِينَ পর্যন্ত বলা এবং মুক্তাদির অংশ হলো 'আমীন' বলা। ফলে উভয়টির মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, ইমামও আমীন বলবেন। এরূপ এক রিওয়ায়াত ইমাম আবু হানীফা (র.) হতেও বর্ণিত আছে। কেননা এক হাদীসে বর্ণিত আছে, ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও আমীন বলবে।

তৃতীয়ত : আমীন চুপে চুপে বলবে না কি প্রকাশ্যে বলবে? তবে যে নামাজের কেবলমাত্র চুপে চুপে পড়তে হয়, সে নামাজে 'আমীন'ও চুপে চুপে পড়তে হবে এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সরব কেবলমাত্র নামাজে 'আমীন' বলার মধ্যে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়ই চুপে চুপে 'আমীন' বলবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, নামাজে ইমাম হন কিংবা মুক্তাদি 'আমীন' সশব্দে উচ্চারণ করতে হবে।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, ইমাম সরব কেবলমাত্র 'আমীন' বলবে না, বরং শব্দবিহীন কেবলমাত্র 'আমীন'ও চুপে চুপে বলবে।

'আমীন' চুপে চুপে বলার সমর্থকদের দলিল : ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী আলিমগণ বলেন,

- মহানবী ﷺ বলেছেন, 'যখন ইমাম وَالصَّالِحِينَ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। অন্য আরেক হাদীসে আছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَيِّنَةُ الْإِيمَانِ أَنْ تَقُولَ آمِينَ» অর্থ 'ইমাম তা বলে'। এ কথাটি বলার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইমামের 'আমীন' বলাটা চুপে চুপেই হবে।
- হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমলও হাদীসে বর্ণিত আছে, وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَوَسَّعَانَكَ اللَّهُ الْخَيْرُ তাঁরা চারটি বক্তৃকে নামাজের মধ্যে চুপে চুপে পড়তেন, তা হলো: আউযু, বিসমিল্লাহ, আমীন ও সুবহানাকা।

৩. আল্লামা সুফুতী হযরত আবু ওয়ায়েল হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ও আলী (রা.) আউযু, বিস্মিল্লাহ ও আমীনকে প্রকাশ করে পড়তেন না।

৪. শো'বা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আমীন' বললেন এবং স্বরকে নিচু করলেন।

সরবে 'আমীন' বলার পক্ষপাতীদের দলিলের জবাব: যখন ইমাম 'আমীন' বললেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলে। এ হাদীসের জবাব চুপে চুপে বলার পক্ষপাতীদের তরফ হতে এই যে, **أَمِين**-এর অর্থ **قَرُبَ أَنْ يُؤْمِنَ** অর্থাৎ 'ওয়ালদা দ্বালীন, বলে 'আমীন' বলার যখন নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। এখানে **مَجَازًا** অর্থাৎ বোধগম্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করণার্থে **أَمِين** বলা হয়েছে এবং অপর হাদীসে 'আমীন' বললেন এবং স্বরকে দীর্ঘায়িত করলেন, এর জবাব এই যে, এখানে মাদ্দা শব্দটির অর্থ স্বরকে উচ্চ করা নয়, বরং 'আমীন' (**أَمِين**)-এর হামযাকে মদসহকারে দীর্ঘায়িত করেছেন ও লথা করে উচ্চারণ করেছেন। এটা নয় যে, 'আমীন' (**أَمِين**)-এর হামযাকে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করেছেন। আর যে বর্ণনায় **رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ** অর্থাৎ 'স্বরকে উচ্চ করলেন' আছে, এর জবাব এই যে, এ বর্ণনাটি অনুবাদমূলক। অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী **مَدَّ**-এর অর্থ **رَفَعَ** বুঝেছেন। যেমন সশব্দে বলার পক্ষপাতীগণ বুঝেছেন। প্রকৃতপক্ষে মূল বর্ণনায় **رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ** ই ছিল। আর এ বাক্যাংশ আমাদের মতের পরিপন্থি নয়।

وَعَنْ ٧٨٨ **أَبِي زُهَيْرٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ**
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدِ اعْتَمَدَ فِي الْمَسْئَلَةِ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ قَالَ بِ-
أَمِينٍ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৭৮৮. অনুবাদ: হযরত আবু যুহাইর নুমাইরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নৈশ ভ্রমণে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছলাম যিনি খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি সে মোহরাক্ষিত করত, তবে নিজের জন্য বেহেশত অবধারিত করে নিত। জনতার মধ্য হতে একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কী জিনিস দ্বারা মোহর অঙ্কন করবে? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমীন' বলে। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ٧٨٩ **عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**
قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَقْرِبَ
بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَّهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ -
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৭৮৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরায় 'আ'রাফ' দ্বারা মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন এবং উক্ত সূরটিকে উভয় রাকাতে ভাগ করে পড়লেন। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাগরিবের নামাজে দীর্ঘ কেরাত পড়া নামাজেজ্ঞ নয়, এটা বখানোর জন্য হুজুর ﷺ কখনো দীর্ঘ কেরাত দ্বারা মাগরিবের নামাজ পড়েছেন।

وَعَنْ ٧٩٠ **عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ**
كُنْتُ أَقْرَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ فِي
السَّفَرِ فَقَالَ لِي يَا عُقَيْبَةُ أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ

৭৯০. অনুবাদ: হযরত উক্ববা ইবনে আমির (রা.) বলেন, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর নাসি ধরে টেনে চলতাম। একদা হুজুর ﷺ আমাকে বললেন, হে উক্ববা! আমি কি তোমাকে উত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দেব না

سُورَتَيْنِ قُرَيْشًا فَعَلَمَنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلْقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ قَلَمٌ
يَرْنِي سُرْتُ بِهَمَا جِدًا فَلَمَّا نَزَلَ لَصَلَاةِ
الصُّبْحِ صَلَّى بِهَمَا صَلَاةِ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ
فَلَمَّا فَرَغَ التَّفَتَّ إِلَى فَقَالَ يَا عُقْبَةُ
كَيْفَ رَأَيْتَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

যা পড়া হয়? এ বলে তিনি আমাকে সূরা ক্বুল আউযু
বিরাক্বিল ফালাক" এবং ক্বুল আউযু বিরাক্বিন নাস"
শেখালেন। কিন্তু এতে আমি তেমন খুশি হয়েছি বলে
তিনি মনে করলেন না। এরপর যখন তিনি ফজরের
নামাজের জন্য অবতরণ করলেন তখন এ দুটি সূরা দ্বারা
আমাদের নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি নামাজ শেষ
করলেন তখন আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কেমন
দেখলে, হে উকবা!-[আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী]

সহীহ আলোচনা

১৯১-এর মর্মার্থ : সম্পূর্ণ কুরআনই উত্তম, তবে উক্ত সূরাদ্বয়ের অনেক মর্মার্থ রয়েছে। এতে মানুষ ও
আল্লাহর সম্পর্কে কথা বর্ণিত হয়েছে। অকল্যাণ হতে আল্লাহর শরণ লাভের জন্য বিশেষভাবে ভ্রমণে এবং মুখস্থ করার জন্য এ
দুটি সূরা অতি সহজ ও উত্তম। বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ জনৈক যাদুকারের যাদুটোনায় আক্রান্ত হলে হযরত
জিব্রীল (আ.)-এর মাধ্যমে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ এ সূরাদ্বয় পাঠ করেন। সূরাদ্বয়ে এগারটি আয়াত রয়েছে। এগারোটি
আয়াতে যাদুর এগারোটি গিরা খুলে যায়। রাসূল ﷺ যাদুটোনার ক্ষতি হতে রক্ষা পান। আজ-কালও উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করলে
যে কোনো যাদু-টোনা জিনের ক্ষতি হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رَضِيَ
عَنْهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكٰفِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - (رَوَاهُ فِي
شَرْحِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ)

৭৯১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমার রাতে
[অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে] মাগরিবের নামাজে
'ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' এবং 'ক্বুল হয়ালাহ আহাদ'
সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। -[শরহে সুন্নাহ] ইবনে মাজাহ
হাদীসটি ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে
তিনি জুমার রাত কথাটি উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ٧٩٢ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
(رَضِيَ عَنْهُ) قَالَ مَا أَحْصَى مَا سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ
الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ)

৭৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে
মাগরিবের পরের দু' রাকাত নামাজে এবং ফজরের পূর্বের
দু' রাকাত নামাজে 'ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' এবং
'ক্বুল হওয়ালাহ আহাদ' সূরাদ্বয় কতবার যে পাঠ করত
তবে তার হিসাব নেই।-[তিরমযী]

ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
হতে বর্ণনা করেন, কিন্তু এতে তিনি বা'দাল মাগরিব
কথাটি উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ٧٩٢. سَلِمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنِ
 أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَاصَلَيْتُ وَرَأَى أَحَدٌ
 أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَلَانٍ
 قَالَ سَلِمَانٌ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطْبِلُ
 الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ
 الْأَخْرَسِينَ وَيُخَفِّفُ العَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي
 المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُنْفَصِلِ وَيَقْرَأُ فِي
 العِشَاءِ بِوَسْطِ المُنْفَصِلِ وَيَقْرَأُ فِي
 الصُّبْحِ بِطَوَالِ المُنْفَصِلِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
 وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ إِلَى وَيُخَفِّفُ العَصْرَ)

৭৯৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সুলাইমান ইবনে
 ইয়াসার (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন,
 একমাত্র অমুকের পিছনে ছাড়া আর কারও পিছনে আমি
 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজের ন্যায় নামাজ পড়িনি।
 সুলাইমান বলেন, আমি তার তথা আবু হুরায়রা (রা.)-এর
 পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি জোহরের প্রথম দু'
 রাকাতকে দীর্ঘ করতেন এবং শেষ দুই রাকাতকে সংক্ষিপ্ত
 করতেন। আর আসর নামাজকেও। সংক্ষিপ্ত করতেন।
 মাগরিব নামাজে কেসারে মুফাসসাল [সংক্ষিপ্ত] সূরাসমূহ
 হতে পাঠ করতেন। ইশার নামাজে আওসাতে মুফাসসাল
 বা মধ্যম সূরাসমূহ হতে পাঠ করতেন এবং ফজরের
 নামাজে তিওয়ালে মুফাসসাল বা দীর্ঘ সূরাসমূহ হতে পাঠ
 করতেন। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

তবে ইবনে মাজাহ 'আসর নামাজকেও সংক্ষিপ্ত
 করতেন' পর্যন্ত রিওয়াযাত করেছেন।

وَعَنْ ٧٩٤. عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
 (رض) قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
 صَلَاةِ الفَجْرِ فَقَرَأَ فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ
 فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ
 إِمَامِكُمْ فُلْنَا نَعْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا
 تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا
 صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ) وَفِي رِوَايَةٍ
 لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي
 القُرْآنَ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ إِذَا
 جَهَرْتُمْ إِلَّا بِأَمِّ القُرْآنِ .

৭৯৪. অনুবাদ : হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা ফজরের
 নামাজে রাসূল ﷺ -এর পিছনে ছিলাম, তিনি নামাজের
 কেরাত পাঠ করলেন, তবে কেরাত পাঠ করা তার জন্য
 খুবই কষ্টকর হলো। অতঃপর তিনি যখন নামাজ শেষ
 করলেন, তখন [আমাদেরকে লক্ষ্য করে] বললেন, সর্ববত
 তোমরাও ইমামের পেছনে কেরাত পড়েছ? আমরা
 বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন,
 তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো কেরাত পড়বে
 না। কেননা, যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাজ হয় না।
 -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

কিন্তু আবু দাউদ শরীফের অপর বর্ণনায় আছে যে,
 রাসূল ﷺ বললেন, কি হলো, আমার সাথে কুরআন এরূপ
 টানাটানি করছে কেন? আমি যখন শব্দ করে কেরাত পড়ি
 তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত কুরআনের আর কিছু
 পড়ো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমামের পিছনে মুকাদির উপরে সূরা ফাতিহা পাঠ করা
 ওয়াজিব কি না? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। এ মতভেদপূর্ণ মাসআলাটিকে **إِسْمِ خَلْفِ الْإِمَامِ** বলা হয়। দিচ্ছে এ
 ব্যাপারে ফিকহ বিদদের মতামত প্রদান করা হলো—

১. আহনাফ এবং সাহেবাব্বিনের মতে ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য কেৱাত পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তাঁদের দলিল-

১. قَوْلُهُ تَعَالَى "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

২. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) مَرْفُوعًا "وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا".

৩. عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ".

৪. عَنِ الشَّعْبِيِّ مَرْفُوعًا "لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ".

২. ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখের মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সব নামাজেই শুধুমাত্র সুব ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, অন্য কেৱাত পড়া ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল-

১. حَدِيثُ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ تَلَاثًا غَيْرَ تَعَامٍ".

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ قَبِضَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৩. ইমাম মালেক ও আহমদের মতে যে নামাজে কেৱাত জোরে পড়া হয় তাতে মুক্তাদির জন্য কেৱাত পড়তে হবে না; কিন্তু যে নামাজে কেৱাত চুপে পড়া হয়, তাতে মুক্তাদির কেৱাত পড়তে হবে।

তিন ইমামের দলিলের জবাব :

ইমামদের দলিলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন,

১. উদ্ধৃত দ্বারা ইমাম মুত্তাফির-এর নামাজের তফীফ করা হয়েছে; মুক্তাদির নামাজের তফীফ করা হয়নি।

২. অথবা প্রথমে ইমামের জায়েজ ছিল, পরে মনসুখ হয়ে গেছে।

৩. জায়েজ ও নাজাজেজ নিয়ে হাদীসের বর্ণনায় ঘনু দেখা দিলে নাজাজেজের হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।

দু'টি হাদীসের মধ্যে ঘনু ও সমাধান :

উদ্ধৃত হাদীস অনুসারে জানা যায়, সূরা ফাতিহা বাতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না। অপর হাদীসে বলা হয়েছে, আনুগত্য করার জন্য ইমাম নির্বাচিত হয়। সুতরাং ইমাম যখন কেৱাত পাঠ করবে, তোমরা তা শুনবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে ঘনু পরিলক্ষিত হয়।

ঘনুের সমাধান :

১. উদ্ধৃত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান যা আল্লাহর বাণী-وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

২. ইমাম শাফেয়ীর মতে إِئِمَّا جَعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ইমামের আনুগত্য করার হুকুম পাওয়া যায়। এখানে হযরত

৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস খবরে ওয়াহেদ। সুতরাং তা দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না; আর এর বিরুদ্ধে রয়েছে কুরআন। সুতরাং উদ্ধৃত হাদীসের বিধান মনসূখ।

৪. আবু কবর রাযী (র.) বলেন, إِئِمَّا جَعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ দ্বারা ইমামের আনুগত্য করার হুকুম পাওয়া যায়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি মতে কুরআন শ্রবণ করা ন্যায়সঙ্গত কথা। যে লোক কুরআন শ্রবণ করে না সে এ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করে।

এর উপর কেৱাত জারী হওয়ার কারণ :

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সম্ভবত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কেৱাত জারী বোধ হওয়ার কারণ ছিল, মুক্তাদিগণ তাঁর কেৱাতের উপর যথেষ্ট না করার কারণে সৃষ্টি অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি। কেননা সম্পূর্ণ বহু অনেক তৎপরবর্তী অসম্পূর্ণ বস্তুর কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাজে সূরা রুম পড়তে শুরু করেন এবং তিনি তাতে ভুলের শিকার হন। অতঃপর দেখা গেল যে, এটা তাঁর পিছনে একেদাকারী এক গোত্রের কারণে হয়েছিল, যারা উত্তমরূপে পরিভ্রতা অর্জন করত না।

وَعَنْ ٧٩٥. أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ جَهْرٍ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَيْنًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَارِعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَاَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدٌ وَابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ)

৭৯৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এক নামাজ হতে অবসর হলেন, যাতে তিনি প্রকাশ্যে কেবল পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এখন আমার সাথে কেবল পড়েছে? এক ব্যক্তি উত্তর করল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আমি [নামাজে মনে মনে] বলছিলাম, আমার কী হলো, কুরআন পড়তে আমি এরূপ টানা-হেঁচড়া অনুভব করছি কেন? হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে এটা শুনল তখন হতে তারা প্রকাশ্য কেবলপড়ার নামাজে [হিমামের পিছনে] কেবল পড়া হতে বিরত হয়ে গেল। -[মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী] ইবনে মাজাহও এরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমাম আজম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, এই হাদীস দ্বারা ইমামের পেছনে কেবল পড়ার সমস্ত হাদীস মানসূহ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٧٩٦. ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيَّاضِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يَنْجِي رَأْيَهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يَنْجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৭৯৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর ও বায়যী [আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস] হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজরত ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সঙ্গোপনে কথাবার্তা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য রাখা উচিত, সে তার সাথে কি কথোপকথন করছে। সুতরাং একজনের কুরআন পড়ার সময় আরেকজন যেন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ না করে। -[আহমদ]

وَعَنْ ٧٩٧. أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৭৯৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইমাম এ জন্য নির্ধারিত হয়েছেন, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম 'আল্লাহ আকবার' বলবে তখন তোমরাও আল্লাহ আকবার বলবে। আর যখন তিনি কেবল পাঠ করেন তখন হুপ থাকবে। -[আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামের পেছনে কেবল না পড়া সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত হাদীস দু'টিও ইমাম আজম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল। এ ছাড়াও অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: **مَنْ لَمْ يَأْمُرْ قَوْمَهُ بِالْإِيمَانِ لَمْ يَأْمُرْ لَهُ قَوْمَهُ** অর্থাৎ যার ইমাম রয়েছে তার ইমামের কেবলই তার কেবল।" সুতরাং ইমামের পেছনে কেবল পড়া ঠিক নয়। হিন্দায়াপ্রণেতা আল মারগীনাণী বলেন, ইমামের পেছনে মুকাদির কেবল না পড়া সম্পর্কে সাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

وَعَنْ ٧٩٨ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِمْتَنِي مَا يُجْزئُنِي قَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَاذَا لِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي فَقَالَ هَكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبْضُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَنْتَهَتْ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا بِاللَّهِ)

৭৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে আরজ করল, আমি কুরআনের কোনো অংশ মুখস্থ করতে অক্ষম। সুতরাং আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বলবে- **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** অর্থাৎ আল্লাহ মহাপবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ ব্যতীত কারও কোনো উপায় নেই, কারও কোনো শক্তি নেই। [এতদশ্রবণে] লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো সবই আল্লাহর জন্য; আমার জন্য কি? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বলবে- **اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي** "হে আল্লাহ! আমাকে দয়া করো, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমাকে রিজিক দাও"। রাবী বলেন, লোকটি দুই হাত দ্বারা এভাবে [পেয়েছি বলে] ইঙ্গিত করল এবং দু' হাত বন্ধ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি তার দু' হাত কল্যাণ দ্বারা ভরে নিল।-[আবু দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী বর্ণনা লা পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা হাদীস্যাংশের অর্থ : **وَعَنْ ٧٩٨ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى** -এর অর্থ : আলোচনা হাদীস্যাংশের অর্থ হলো, উভয় হস্ত দ্বারা ইশারা করল। অর্থাৎ কালিমাগুলো একটি একটি করে আবুলে গণনা করার পর একটি একটি আবুল বন্ধ করল। এর মর্মার্থ হলো, লোকটি এ কথা বলতে চাচ্ছে যে, আমি কালিমাসমূহ মুখস্থ করেছি; এটা কখনো ভুলব না। তবে এটা প্রাথমিক যুগের হুকুম। সুতরাং পরবর্তী যুগে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

অথবা এ হুকুম এমন ব্যক্তির জন্য, যে সবে মাত্র মুসলমান হয়েছে এবং নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার সময় পায়নি।

عَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوْلِيهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا آتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَيَأْتِي الْأُمَّةَ رِتْكُمْ تَكْذِبَانِ قَالُوا لَا يَشْئُ مِنْ نَعْمِكَ رَتْنَا نَكْذِبُ فَكَكَ الْحَمْدُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

৮০১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক দলের কাছে আসলেন এবং তাদের সম্মুখে সূরা আর-রাহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরবে শুনে রইলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি জিনের রাতে [যে রাতে জিন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং পবিত্র কুরআন শ্রবণের জন্য সমবেত হয়েছিল।] এটা জিনদের সম্মুখে পাঠ করেছিলাম। তারা [জিন সম্প্রদায়] তোমাদের চেয়ে ভাল জবাব দিয়েছিল। আমি যখনই “কাবি আইয়ি আ-লাই রাব্বিকুমা তুকাযিবান” অর্থাৎ -তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে? বাকা পাঠ করেছি তখনই তারা বলেছে رَتْنَا نَعْمِكَ رَتْنَا لَا يَشْئُ مِنْ نَعْمِكَ رَتْنَا نَكْذِبُ فَكَكَ الْحَمْدُ - অর্থাৎ হে প্রভু তোমার কোনো নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করি না, আর তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা।” - [তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এবং বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجَمَلِ [বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ]:

قَالُوا لَا يَشْئُ مِنْ نَعْمِكَ رَتْنَا نَكْذِبُ آR পদটি তামস্বৰ হেতু مَنْصُوب আR
مَرْدُودًا وَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا وَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا
পদটি পরবর্তী نَكْذِبُ-এর সাথে যুক্ত হয়েছে رَتْنَا পদটি মুনাদা মুযাফ হেতু মানসূব।

التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ إِنْ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ إِذَا زَلَزَلَتْ فِي الرُّكْعَتَيْنِ كِلْتَابَهُمَا فَلَا أَدْرِي أُنْسَى أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৮০২. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে আব্দুল্লাহ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে খবর দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের দুই রাকাতের উভয় রাকাতেই ‘ইয়া যুলযিলাত’ সূরা পাঠ করতে শুনেছেন। রাবী বলেন, আমি বলতে পারি না রাসূল ﷺ ভুলে গেছেন, না ইচ্ছাকৃতভাবেই এভাবে পাঠ করেছেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرْحُ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ একই সূরা উভয় রাকাতে পড়েছেন এ কথা বুঝানোর জন্য যে, দু’ রাকাতে একই সূরাও পাঠ করা জায়েজ তবে প্রত্যেক রাকাতে ভিন্ন ভিন্ন সূরা পাঠ করা সুলত।

وَعَنْ ۳.۸ عُرْوَةَ (رض) قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فقرأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَابِيهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৳০৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওরওয়া ইবনে জুবাইর। (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিন্দীক (রা.) একদা ফজরের নামাজ পড়লেন এবং উভয় রাকাতেই সূরায় বাকারা [বিত্তক করে] পাঠ করলেন। -[মালিক]

وَعَنْ ۴.৪ الْفَرَأْفَصَةَ بِنِ عُمَيْرِ الْحَنْفِيَّ (رح) قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِنَاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৳০৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ফারাফিসাহ ইবনে উমাইর হানাফী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরায় ইউসুফ কেবল হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর কেবল শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি তা ফজরের নামাজে পুনঃ পুনঃ পড়তেন [ফলে শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে]। -[মালিক]

وَعَنْ ۵.৫ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فقرأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِينَةً قِيلَ لَهُ إِذَا لَقَدْتَ كَانَ يَقْرَأُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرَ قَالَ أَجَلٌ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৳০৫. অনুবাদ : হযরত আমের ইবনে রাবীআ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর পিছনে ফজর নামাজ পড়লাম। তিনি ঐ নামাজের দু' রাকাতেই দু'টি পূর্ণ সূরা-সূরায় ইউসুফ ও সূরায় হজ্জ ধীর গতিতে থেমে থেমে পড়লেন। আমেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হযরত ওমর সত্ত্বত ফজর নামাজের প্রথম ওয়াক্কেই নামাজ শুরু করেছিলেন; আমের বললেন, হ্যাঁ। -[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَلَبُ الْبَاكِيَا سَمُوهُرِ الْبِيْشْرِ بِيْشْرِ :

قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَيَّ مَا ذَكَرْتُ إِذَا وَاللَّهِ لَنَأْمَ فِي الصَّلَاةِ أَوْلَ - কালামটি হলো নিম্নরূপ -
بَطِينَةً نَبِيٌّ مُطَاطَبَتْ هَادِيَةً كَيْتُ مَضِيَّ اسْتِمْرَارِي وَ التَّقَاتِ حِينَ الْفَجْرِ قَالَ أَجَلٌ كَانَ يَقْرَأُ
পদটি হলো -

وَعَنْ ۶.۶ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ مَا مِنْ الْمَفْصَلِ سُورَةٍ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُؤْم بِهَا النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৳০৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুফাস্সাল সূরার ছোট বড় সব কয়টি সূরা দ্বারা ই রাসূলুন্নাই ﷺ কে ফরজ নামাজের ইমামতি করতে দেখেছি। -[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُورَةُ الْمُرَادِ بِسُورَةِ الْمَفَصَّلِ সূরা মুফাসসাল দ্বারা উদ্দেশ্য : সূরায় হুজুরাত হতে নাস পর্যন্ত সব কয়টি সূরাকে 'মুফাসসাল' বলা হয়। মুফাসসাল তিন ভাগে বিভক্ত। 'হুজুরাত' হতে 'বুরুজ' পর্যন্ত সূরা গুলোকে 'তেওয়ালে মুফাসসাল', 'বুরুজ' হতে 'লাম ইয়াকুন' পর্যন্ত সূরাসমূহকে 'আওসাতে মুফাসসাল' এবং 'লামইয়াকুন' হতে 'নাস' পর্যন্ত সমস্ত সূরাগুলোকে 'কিসারে মুফাসসাল' বলা হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর জামানায় এটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٨٠٧. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ ابْنِ
مَسْعُودٍ (رَضِيَ) قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحَمِّ الدُّخَانِ - (رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

৮০৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বা ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাজে 'হা-মীম আদুখান' এই সূরাটি পাঠ করেছেন।-[নাসায়ী হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح হাদীসের বাখ্যা : আলোচ্য হাদীসসমূহ দ্বারা এটা বুঝা যায়, যে রাসূল ﷺ এক এক সময় এক এক সূরা পাঠ করতেন এবং কখনো একই সূরাকে ভাগ করেও পড়েছেন। এ ভাবে তিনি সমস্ত কুরআনই পাঠ করেছেন; আর বর্ণনাকারীগণ যা শুনেছেন বা অবগত হয়েছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

بَابُ التَّرْكَوعِ

পরিচ্ছেদ : রুকু

الرُّكُوعُ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। শাব্বিক অর্থ হলো- الْإِتِّحَانُ তথা অবনত হওয়া, অর্ধনমিত হওয়া বা ঝুঁকে যাওয়া। আবার এটা কখনো الْخُضُوعُ বা বিনয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাঁটুর উপর হাত রেখে অর্ধনমিত হওয়াকে রুকু বলে। এটা নামাজের অভ্যন্তরীণ ফরজসমূহের একটি, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে، أَرَأَيْتُمْ مَعَ الرَّكْعَيْنِ আর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَوْلَ اللَّهِ إِيَّيَ لَأَرَأَيْتُمْ مِنْ بَعْدِي . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য রুকু ছিল না, শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীরই এই বৈশিষ্ট্য। নিম্নে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আলোচিত হচ্ছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٠٨ أَنَسِ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَوْلَ اللَّهِ إِيَّيَ لَأَرَأَيْتُمْ مِنْ بَعْدِي . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮০৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রুকু ও সেজদা যথাযথভাবে সমাধা করো। আল্লাহর কসম! নিচুই আমি তোমাদেরকে আমার পশ্চাৎ হতেও দেখি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : পিছনের দিকে দেখতে পাওয়া এটা মহানবী ﷺ -এর একটি বিশেষ মু'জিযা। কিছু সংখ্যকের মতে ছুজুর ﷺ -এর মোহরে নবুয়তের কারণে পিছনের দিকে দেখতে পেতেন বা তিনি অন্তরদৃষ্টি দ্বারাও পিছনের দিকে দেখতে পেতেন। রাসূল ﷺ -এর এ কথায় সাহাবীদেরকে সুন্দরভাবে রুকু-সেজদা করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে, যাতে কেউ রুকু-সেজদাতে গাফিলতি না করে।

عَنْ ٨٠٩ الْبَرَاءِ (رَض) قَالَ كَانَ رُكُوعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودِهِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَآخِلًا الْقِيَامِ وَالْقَعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮০৯. অনুবাদ : হযরত বারী ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর রুকু তাঁর সেজদা, দুই সেজদার মধ্যখানে বসা ও রুকুর পরে মাথা উঠিয়ে দাঁড়ানো, এ চারটি কাজের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল; কিন্তু কিয়াম ও কুউদের পরিমাণে ব্যতিক্রম ছিল। -[বুখারী মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : 'কিয়াম' অর্থ- দাঁড়ানো; শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের কেলাত পাঠকালীন দাঁড়ানোকে 'কিয়াম' বলে। আর 'আত্যাহিয়াতু' পড়াকালীন বসাকে বলা হয় 'কুউদ'। কিয়াম এবং শেষ বারে তাশাহুদ পড়াকালীন বসা নামাজের রোকন তথা ফরজ। অবশ্য তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম দু' রাকাতের পর বসা ওয়াজিব।

وَعَنْ ٥١٠ أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন "সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ" বলতেন, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা [মনে মনে] বলতাম, তিনি সত্ত্ববতঃ ভুলে গিয়েছেন। অতঃপর সেজ্দা করতেন এবং দু' সেজ্দার মধ্যখানে এতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতেন যে, আমরা [মনে মনে] বলতাম, তিনি সত্ত্ববত ভুলে গেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ সাধারণত ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নফল নামাজে বিভিন্ন দেয়া-কালাম পাঠ করার জন্য এরূপ দীর্ঘ সময় দেরি করতেন, সত্ত্ববত কোনো কোনো সময় ফরজ নামাজেও এরূপ করতেন। **حَتَّى نَقُولَ تَذ** অর্থ ফলে আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি ভুলে গেছেন। এর অর্থ হলো, তিনি এত দীর্ঘ সময় রুকু হতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম সত্ত্ববত তিনি উক্ত রুকু ও রাক'আতকে বাতিল সাব্যস্ত করে নতুনভাবে কিয়ামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং নামাজকে প্রথম হতে শুরু করবেন।

وَعَنْ ٥١١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮১১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর রুকু-সেজদার মধ্যে খুব বেশি বেশি বলতেন, যার অর্থ— **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا** — **وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** "হে আমাদের আল্লাহ! হে প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর"। তিনি এ কার্য কুরআনের আদেশ মতোই করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামের সুরায়ে 'নসর'-এ বলেছেন— **سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** — **وَسُبِّحْهُ** "তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।" উক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেকই মহানবী ﷺ এভাবে তাসবীহ পাঠ করতেন।

وَعَنْ ٥١٢ أَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ** - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। [তিনি বলেন] যে, নবী করীম ﷺ তাঁর রুকুতে এবং সেজদাতে বলতেন, **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ** অর্থ— আল্লাহ অতি পাক ও পবিত্র; তিনি ফেরেশতাগণের প্রতিপালক এবং রুহ বা জিবরাঈল ফেরেশতারও প্রতিপালক। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١١٣ **ابْنِ عَبَّاسٍ** (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **أَلَا إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فَمَاذَا الرَّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبِّ وَأَمَّا التَّسْجُدُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ فَمَنِ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)**

৮১৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সাবধান! আমাকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা রুকুতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে এবং সেজদাতে প্রার্থনায় খুব প্রচেষ্টা করবে অর্থাৎ খুব অনুন্নয় বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করবে। খুবই সজাবনা আছে যে, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : রুকু ও সেজদা অবস্থায় কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশ পাঠ করা মাকরুহে তাহরীমী। কেননা, বান্দা স্বয়ং নিজে অবনত হয়ে খোদার কাছে নিজের অসহায়তা ও বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে। রুকু সেজদা হলো বিনয়ের চরম বিহীনপ্রকাশ, বক্তৃত বান্দা স্বয়ং অবনত ও বিনয় প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ তথা আল্লাহর কালামকে অবনত করা যায় না। সুতরাং উক্ত দুই অবস্থায় কুরআন পাঠ করা হারাম। ফলে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, রুকুতে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** এবং সেজদায় **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** ফরজ নামাজে পড়াই শ্রেয়। অবশ্য নফল নামাজে অন্যান্য তাসবীহ বা দোয়াও পাঠ করা যায়।

وَعَنْ ١١٤ **أَبِي هُرَيْرَةَ** (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

৮১৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ইমাম যখন “সামি’আল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলবেন তখন তোমরা “আল্লাহুয়া রাব্বানা লাকাল হাম্দ” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই” এ কথা বলবে। কারণ যার বলা ফেরেশতাদের বলার সময়ে হবে তার বিগত জীবনের [ছোটখাটো] পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

‘তাসমী’ ও তাহমীদ একত্র করবে কি না এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে : ইমাম শাফেয়ী, আতা, আবু বুরদা, মুহাম্মাদ ইবনে সিল্লী, ইসহাক, দাউদ যাহেরী ও ইমাম মালেক [এক মতে]-এর মতে নামাজী ব্যক্তি ইমাম হোক বা মুস্তাদি, একাকী নামাজ আদায়কারী হোক বা জামাতে, সর্বাবস্থায় তাসমী’ ও তাহমীদ একসাথে করবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রা.)-এর মতে ইমাম ও একাকী নামাজী তাসমী’ ও তাহমীদ উভয়ই একত্র করে পড়বে। ইমাম ডাহাবী (র.) এ মতই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

(١) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ** (رض) **أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ .**
(٢) **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَلَلٌ বাকাসমূহের বিশেষণ : أَهْلُ الْمَدِينَةِ পদটি মারফু' হলে উহ্য অথবা هُوَ মুবতাদার খবর হবে, আর মানসূব পড়লে উহ্য أَهْلِي -এর মাফউল হবে। অথবা, মুনাদা মুযাফ হেতু মানসূব হবে। অর্থাৎ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنِ الْمَدِينَةِ পদটি খবর হেতু মারফু'। অথবা أَهْلِي মুবতাদা عَنِ الْمَدِينَةِ খবর, আর كُنَّا لَكَ عِيْدًا টি জুমলায়ে মু'তারেজা।

অথবা أَهْلِي পদটি সীগায়ে মাযী আর الْعِيْدُ لَكَ -এর مَا পদটি مُرْصَوْلَةٌ অথবা مُرْصَوْلَةٌ আর عِيْدٌ হতে রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য। শব্দটি تَوَاضَعٌ -এর প্রতি ইঙ্গিত করে।

وَعَنْ ٨١٧ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رض)
 قَالَ كُنَّا نَصَلِّيَ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا
 رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
 حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَسْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
 حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا
 أَنْصَرَفَ قَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ إِنِّمَا قَالَ أَنَا
 قَالَ رَأَيْتَ بِضَعْمَةَ وَتَلَيْبِينَ مَلَكَمَا يَبْتَدِرُونَهَا
 أَيُّهُم يَكْتُبُهَا أَوْلُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৮১৭. অনুবাদ : হযরত রিফাআ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর পিছনে নামাজ পড়াছিলাম। রাসূল ﷺ যখন বকু হতে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, "সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ" তখন তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি বলে উঠল, "رَسْنَا وَلَكَ" অর্থাৎ "হে প্রভু! আর সকল প্রশংসা তোমারই; অনেক অনেক প্রশংসা, পূত ও পবিত্র প্রশংসা, কল্যাণময় প্রশংসা"। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন বললেন, এইমাত্র কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, "আমি বলেছি"। রাসূল ﷺ বললেন, আমি ত্রিশের উর্ধ্বে ফেরেশতাদের দেখলাম, তারা খুব তাড়াহুড়া করছে যে, কার আগে কে কথাগুলোকে লিখবে [এবং আল্লাহর দরবারে পৌছাবে]। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَلَلٌ [বাকাসমূহের বিশেষণ] : ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُ أَنَا অথবা এর উল্টা হতে পারে। অর্থাৎ أَنَا পদটি হেতু মারফু'র স্থলে। অর্থাৎ ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُ أَنَا অথবা হাল হেতু مَنْصُوبٌ অথবা পদটি عَلَى الْعَمِيمِ আর أَيُّهُم শব্দটি মুবতাদাতা يَكْتُبُهَا তার খবর।

الْفَصْلُ الثَّانِي : بِيْتِيْهُمُ اَنْوَاعُ

عَنْ ١١٨ اَيْبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ
(رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُجْزِيْ
صَلٰةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ
وَالسُّجُوْدِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيْ
وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيْثٌ
حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৮১৮. অনুবাদ : হযরত আবু মাসুদ আনসারী
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন, কারও নামাজ কবুল হয় না, যে পর্যন্ত না সে
রুকুতে ও সেজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না
করে। -[আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে
মাজাহ ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি
হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَرَحَ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নামাজের রুকু ও সেজদাকে ধীরস্থিরভাবে সম্পাদন করাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়
تَغْدِيْلُ اَرْكَانٍ 'তাদীলে আরকান'। রুকু কিংবা সেজদাতে ন্যূনতম এক তাসবীহ পরিমাণ সময় স্থির না থাকলে তা'দীলে
আরকান হবে না, আর সহীহ শুদ্ধভাবে একবার 'সুহনাল্লাহ' বলতে যেটুকু সময় লাগে, তাই এক তাসবীহ পরিমাণ সময়। এ
সময় পরিমাণ রুকু সেজদাতে না থাকলে তার ওয়াজিব আদায় না হওয়ার কারণে নামাজ পরিপূর্ণ হবে না। উপরিউক্ত হাদীস
অনুসারে ইমাম মালিক, ইমাম শায়েখী ইমাম আহমদ ইবনে হাযল ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) নামাজের মধ্যে তাদীলে
আরকান অর্থাৎ নামাজের রুকু-সিজদা ধীরস্থির ভাবে সম্পাদন করাকে ফরজ বলেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
এটাকে ওয়াজিব বলেন। এক তাসবীহ পরিমাণ সময়ের কম হলে তাকে স্থিরতা বলা যায় না।

وَعَنْ ١١٩ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض)
قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِى
رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ
الْاَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِى سُجُوْدِكُمْ -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৮১৯. অনুবাদ : হযরত উক্বা ইবনে আমের (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "ফাসাক্বিহ বি-ইস্মি
রাব্বিকাল আযীম" [তোমাদের মহা প্রভুর নামের পবিত্রতা
বর্ণনা করো] আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ
বললেন, এটা তোমাদের রুকুর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে
নাও, আর যখন "সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আ'লা" অর্থাৎ
"তোমার উচ্চ মর্যাদাবান প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা
করো" আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,
একে তোমাদের সিজদায় অন্তর্ভুক্ত করে নাও। -[আবু
দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَّحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ এ নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী ﷺ আমাদেরকে রুকুতে سَبَّحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ
বলতে আদেশ করেছেন। এখানে الْعَظِيْمِ অর্থ- মহান এবং الْاَعْلٰى অর্থ- উচ্চ মর্যাদাবান।

وَعَنْ ۸۲۰ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَ ذَلِكَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَ ذَلِكَ أَذْنَاهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ عَوْنَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ)

৮২০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ইবনে মাসউদ] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রুকু করে এবং সে রুকুতে তিনবার বলে- “সুবহানা রাব্বিয়াল আ’যীম তখন তার রুকু পূর্ণ হলো। আর এটাই হলো তার সর্ব নিমন্তর। আর যখন কেউ সিজ্দা করে এবং সে তার সেজ্জাদায় তিনবার বলে “সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা” তখন তার সেজ্জাদা পূর্ণ হলো, আর এটাই হলো তার সর্ব নিমন্তর। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটির বর্ণনা সূত্র মুত্তাসিল বা পর্যায়ক্রমিক নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। কেননা হযরত আওন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : রুকু ও সেজ্জাদার তাসবীহ তিনবার পড়া পূর্ণতার সর্বনিমন্তর; তবে একবার বললেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। ইমাম ইবনুল মালিক (র.) বলেন, পূর্ণতার সর্বনিমন্তর হলো তিনবার তাসবীহ বলা মধ্যমন্তর হলো পাঁচবার বলা সর্বোচ্চ হলো সাত বা ততোধিক বলা।

وَعَنْ ۸২১ حُذَيْفَةَ (رض) أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى عَلَيَّ آيَةٌ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفْتُ وَسَأَلْتُ وَمَا أَتَى عَلَيَّ آيَةٌ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفْتُ وَتَعَرَّدَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التَّسْلَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ الْأَعْلَى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

৮২১. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়েছেন। তিনি তাঁর রুকুতে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ এবং সিজ্দাতে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা’ বলতেন। আর যখনই কোনো রহমতের আয়াতে পৌছতেন খেমে যেতেন এবং [আল্লাহর নিকট রহমত] প্রার্থনা করতেন এবং যখন কোনো শাস্তির আয়াতে পৌছতেন তখন খেমে যেতেন এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন। -[তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেযী এবং নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ] ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

وَعَنْ ٨٢٢ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ (رض) قَالَ
قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَتَ
قَدَّرَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَقُرْلُ فِي رُكُوعِهِ
سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৮২২. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে নামাজে দাঁড়িয়েছিলাম। যখন তিনি রুকুতে গেলেন তখন তিনি সুরায়ে 'বাকারাহ' পরিমাণ রুকুতে অবস্থান করলেন এবং তিনি রুকুতে [এই দোয়া] বলতে লাগলেন, আমি প্রভাপশালী, সার্বভৌম ও সুমহানের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। -[নাসাই]

الفصل الثالث : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٢٣ ابْنِ جُبَيْرٍ (رح) قَالَ
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رض) يَقُولُ مَا
صَلَّيْتُ وِرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَشْبَهَ صَلَاةَ يَصَلُّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا
الْفَتَى يَعْنِي عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ
قَالَ فَحَزْرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ
وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ . (رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৮২৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, আমি শুনেছি যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন- এ যুবকের অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের পিছনে ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্তিকালের পরে আর কারও পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের সদৃশ নামাজ পড়িনি। সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, আমরা অনুমান করেছি যে, তাঁর রুকু, দশ তাসবীহ পরিমাণ সময় এবং সেজদা ও দশ তাসবীহ পরিমাণ সময় ছিল। -[আবু দাউদ ও নাসাই]

وَعَنْ ٨٢٤ شَقِيبِ (رح) قَالَ إِنَّ
حُذَيْفَةَ (رض) رَأَى رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا
سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ
لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ
وَلَوْ مَتَّ مَتْ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَّرَ
اللَّهُ مُحْتَمًا ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৮২৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হুযাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজে তার রুকু ও সিজদা পূর্ণ করেছে না। যখন সে নামাজ সমাপ্ত করল তখন হযরত হুযাইফা (রা.) তাকে ডেকে বললেন, তুমি তো নামাজ পড়নি। রাবী শাকীক (র.) বলেন, আমি বোধকরি যে, তিনি [হুযাইফা] এটাও বলেছেন, যদি তুমি [এ অবস্থায়] অসম্পূর্ণ রুকু সিজদার নামাজ সহকারে] মরে যাও তবে ফিতরাতের বাইরে মরবে, যে ফিতরাতের উপরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে সৃষ্টি করেছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْفَطْرَةَ - এর অর্থ : نَطْرَةَ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নির্দেশিত পথ বা তাঁর অনুসৃত সন্নত অথবা দীন ও মিল্লাতে ইসলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী ও তাবয়ীদের মতে শ্বেশ্বায় নামাজ বর্জনকারী সরাসরি কাফের হয়ে যায়, যেমন পরবর্তীকালে ইমাম আহমদের অভিমতও এরপই। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ বলেন, যদি কেউ নামাজ বর্জন করাকে বৈধ বা হালাল মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর এখানে 'ফিত্বারাতের উপর মরবে না' এর অর্থ হলো, পরিপূর্ণ দীনে ইসলামের উপর তার মৃত্যু হবে না।

وَعَنْ ۲۵۰ أَبِي قَتَادَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آسَوْءُ النَّاسِ سَرَقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৮২৫. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে চুরির দিক দিয়ে জঘন্য চোর সেই ব্যক্তি যে নিজের নামাজের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে মানুষ তার নামাজের অংশ চুরি করে? রাসূল ﷺ বললেন, নামাজের রুকু ও সিজ্দা পূর্ণ করে না। [এটাই নামাজের অংশ চুরি করা]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রচলিত চুরির ঘারা দুনিয়াতে অনেক সময় চোরের বাহ্যিক লাভ বা সজাবনা থাকে। যেমন- চুরি করার পর তার প্রকৃত মালিককে বলল এবং তার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে মালটিকে নিজের জন্য হালাল করে নিল। অথবা কখনো তার হাত কাটা হলো ফলে আশা করা যায় আখেরাতের আজাব ও শাস্তি হতে অব্যাহতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে নামাজের অংশ চুরি করার মধ্যে অপরের কোনো ক্ষতি তো হয় না; বরং ক্ষতি যা কিছু হয় তা সবটা নিজেরই। কেননা এতে সে কোনোরূপ লাভবান তো হয়ই না; বরং তদস্থলে আজাব বা শাস্তি তার জন্য অবধারিত। তাই নামাজের চুরিকে জঘন্যতম বলা হয়েছে।

وَعَنْ ۲۶۱ التَّعْمَانِ بْنِ مُرَّةٍ (رَض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي السَّارِبِ وَالزَّرَائِنِ وَالسَّارِقِ وَذَلِكَ قَبِيلٌ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشٌ وَفِيهِنَّ عِقُوبَةٌ وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ)

৮২৬. অনুবাদ : হযরত নুমান ইবনে মুররাহ (রা.) হতে হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীদেরকে] বললেন, তোমরা মদখোর, ব্যভিচারী ও চোরের শাস্তি সম্পর্কে কি মত পোষণ কর? এটা ছিল এগুলো সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এগুলো জঘন্য অপরাধ, আর এগুলোর জন্য শাস্তিও রয়েছে। চুরির মধ্যে জঘন্য চুরি হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজ নামাজের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তার নামাজের অংশ চুরি করবে? রাসূল ﷺ বললেন, সে নামাজের রুকু ও সিজ্দা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে না। -মালেক, আহমদ ও দারেমী

بَابُ السُّجُودِ وَقَضِيهِ

পরিচ্ছেদ : সিজদা ও তার মাহাত্ম্য

السُّجُودُ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার; শাব্দিক অর্থ হলো- وَضَعَ جَنْبَهُ الرَّأْسَ عَلَى الْأَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর কপাল রাখা। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো, আল্লাহ নিকট চরম বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে কপাল, নাক, উভয় হাত, পা ও হাঁটু জমিনের উপর রাখা, এটি নামাজের রোকনসমূহের একটি। এটা ফরজ হয়েছে পবিত্র কুরআন দ্বারা; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَأَرَكُمُورًا وَسُجُودًا- মহানবী ﷺ বলেন- أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ- বালেন- নামাজ আদায় হয়ে যাবে এবং নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিনা ওজরে শুধু কপাল কিংবা শুধু নাকের উপর সিজদা করলে মাকরুহ হবে। আর সাহেবাইনের মতে শুধু নাকের উপর সিজদা করা জায়েজ নেই।

সবচেয়ে বিনয় প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সিজদা করা। আলোচ্য অধ্যায়ে সিজদা ও তার মাহাত্ম্য সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

الفصل الأول: প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٢٧
أَبْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى
سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَنْبَةِ وَالْيَدَيْنِ
وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِيكَ
الْقِيَابَ وَالشَّعْرَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮২৭. অনুবাদ : ইয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি সাতটি হাড় [অঙ্গ] দ্বারা সিজদা করি। [আর তা হলো] কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের মাথা। আর কাপড় ও চুল যেন না গোছাই। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও যুফার-এর মতে সপ্তাঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। উল্লিখিত হাদীসের উপরই তাঁদের আমল।

ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে শাফেয়ী ও আহমদের অসমর্থিত এক বর্ণনা অনুসারে সিজদার জন্য শুধুমাত্র কপালই জমিনে রাখা ওয়াজিব, উভয় পা জমিন হতে পৃথক রাখলে নামাজই হবে না। অবশ্য এক পা আলগ রাখলে মাকরুহ হবে। সিজদায় অন্তত পায়ের একটি অঙ্গুলি হলেও কেবলমুখী করে রাখবে, অথচ অনেক নামাজিকে দেখা যায় এ ব্যাপারে বড়ই অসাবধান। বিনা ওজরে এক পা জমিন হতে পৃথক রাখলে নামাজ মাকরুহ হবে।

সিজদায় কপাল ও নাক উভয়টি রাখা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَسَالِكِ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং কোনো কোনো মালেকী মতালম্বীর মতে সিজদা করার সময় কপাল ও নাক দু'টি লাগানোই ফরজ। একটা দ্বারা সিজদা করলে শুদ্ধ হবে না।

مَذْهَبُ الْأَحْبَابِ : হানাফী মাযহাবের তিন ইমামের মতে এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের অন্য এক বর্ণনা মতে যদি নাকের মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকে তা হলে শুধু কপাল দ্বারা সিজদা করাই যথেষ্ট হবে, এতে নামাজ মাকরুহ হবে না। আর যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তা হলে নামাজ সহীহ হবে কিন্তু মাকরুহ হবে। আর যদি কপালে কোনো অসুবিধা থাকে তা হলে শুধু নাক দ্বারা সিজদা করা হানাফী মাযহাবের তিন ইমাম এবং ইমাম শাফেয়ীর এক রিওয়াযাত অনুসারে জায়েজ আছে।

ذَاوُدَ كَمَا صَرَخَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِإِسْنَادِهِ
وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بِهِمَّةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

উল্লেখ করা হয়েছে। একই অর্থে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত মাইমুনা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন যদি একটি ছাগল ছানা ইচ্ছা করত তবে তাঁর দুই হাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যেতে পারত।

وَعَنْ ۸۳۱ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ
بُحَيْنَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا
سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضَ
إِطْيَاهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন দু' হাত [বাহুদ্বয়] পাঁজর হতে পৃথক রাখতেন, এমনকি তাঁর দুই বগলের গুহতা নজরে পড়ত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : বুহাইনাহ হলো মালিকের স্ত্রী এবং আব্দুল্লাহর মা, আর মালিক হলো আব্দুল্লাহর বাপ।

ইশ শব্দ ব্যবহারের মূলনীতি এই যে, যে দুই ইসমের মধ্যে ইশ শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক যদি পিতা-পুত্র হয় তবে ইশ শব্দটি আলিফবিহীনভাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন-عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ-কিন্তু ইশ শব্দটি যদি দুটি ইসমের মধ্যে আলিফসহ ব্যবহৃত হয় তবে মানে করতে হবে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্র নয়, যেমন বলা হয়েছে بَحَيْنَةَ ابْنِ مَالِكٍ এখানে বুহাইনাহ হলো আব্দুল্লাহর মা। যেমনি বলা হয় اِبْنِ سُلَيْمٍ এখানে সুলুই হলো আব্দুল্লাহর মাতা এবং উবাইর স্ত্রী।

وَعَنْ ۸۳۲ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةَ وَجَلِّهِ وَأَوْلَهُ وَأَخْرَهُ
وَعَلَائِيَّتَهُ وَسِرَّهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৩২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةَ وَجَلِّهِ وَأَوْلَهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَائِيَّتَهُ وَسِرَّهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সমস্ত অপরাধ-ছেঁট, বড়, আগের ও পরের, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব ক্ষমা করে দাও। -[মুসলিম]

وَعَنْ ۸۳۳ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ
فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ
فَالْتَمَسْتَهُ فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ
قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا

৮৩৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিছানা হতে হারিয়ে ফেললাম (অর্থাৎ বিছানায় পেলাম না) অতঃপর আমি তাঁকে [অন্ধকারে] খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তার দুই পায়ের তালুতে লাগল। তিনি মসজিদে ছিলেন আর দুই পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায়

تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا
 دَرَجَةً وَحَظَّ عَنْكَ بِهَا حَظِيْبَةٌ قَالَ مَعْدَانُ
 ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي
 مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثُوْبَانَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তোমার উপরে আবশ্যক করে নাও [অর্থাৎ বেশি বেশি সিজদা কর]। কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তুমি যতবারই সিজদা করবে, আল্লাহ ততবারই তার ফলে তোমার মর্যাদা উঁচু করবেন এবং তার কল্যাণে গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দেবেন। রাবী মা'দান বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকেও একই প্রশ্ন করলাম, হযরত ছাওবান আমাকে যা বলেছেন তিনিও আমাকে তা বললেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত ছাওবান (রা.) দীর্ঘক্ষণ উত্তর দানে বিরত থাকার দুটি কারণ হতে পারে : যথা-

১. প্রশ্নকৃত বিষয়টির উত্তর জানার জন্য প্রশ্নকারী কি পরিমাণ আগ্রহী ছিল তা পরীক্ষা করা।
২. অথবা উত্তরটি ভৎক্ষণাৎ স্মরণে ছিল না বিধায় তিনি জবাব দিতে বিলম্ব করেন।

অর্থঃ সিজদা বা সাক্ষাৎকারের বিশেষণ :

أَعْمَلُ -এর লামটি পেশ বিশিষ্ট -এর সিজদা। অথবা أَعْمَلُ -এর লামটি জম্ম বিশিষ্ট এবং আমরের জবাব। আর يُدْخِلُنِي و جَمَّ بِشَيْءٍ -এর বদল। مَفْعُولٌ عَلَيْكَ تِي كَثْرَةَ السُّجُودِ -এর অর্থঃ সূত্রাৎ অর্থঃ عَلَيْكَ تِي كَثْرَةَ السُّجُودِ

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٣٨
 وَأَيْبِلُ بْنُ حُجْرٍ (رَضًا) قَالَ
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ
 رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ
 قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ
 وَ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِيُّ)

৮৩৮. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতকে মাটিতে রাখার আগে দুই হাঁটুকে মাটিতে রাখতেন এবং যখন সিজদা হতে উঠতেন তখন দুই হাঁটু উঠানোর আগে দুই হাত উঠাতেন। -[আবু দাউদ, তিরমিধী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহু ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : শরীরের যে অঙ্গ জম্মিনের নিকটবর্তী সিজদা করার সময় যথাক্রমে সে অঙ্গকে আগে রাখতে হবে। আর উঠাবার সময় যে অঙ্গ জম্মিন হতে দূরবর্তী তাকে আগে উঠাতে হবে। যেমন সিজদা করার সময় প্রথমে হাঁটু পরে হাত, তারপর নাক ও সর্বশেষ কপাল রাখবে, আর উঠানোর সময় বিপরীত প্রথমে কপাল, পরে নাক, তারপর উভয় হাত ও সর্বশেষ হাঁটু উঠাবে। এটাই হলো সূত্র নিয়ম।

وَعَنْ ۴۳۹ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَيْعُورُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ الدَّرِمِيُّ) قَالَ أَبُو سَلِيمَانَ الْخَطَّابِيُّ حَدِيثٌ وَإِنَّا لَبْنُ حَجْرٍ أَثْبَتَ مِنْ هَذَا وَقِيلَ هَذَا مَنْسُوحٌ

৮৩৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজ্দা করে সে যেন উট যেভাবে বসে সেভাবে না বসে। আর সে যেন তার দু' হাতকে তার দু' হাঁটুর পূর্বে মাটিতে রাখে।—[আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]
আবু সলাইমান খাত্তাবী বলেন, পূর্বে উল্লিখিত ওয়ায়েল ইবনে হজ্জর-এর হাদীসটি এ হাদীস হতে বেশি নির্ভরযোগ্য। কারো মতে এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের দ্বন্দ্ব ও এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজ্জর বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু এবং পরে হাত মাটিতে রাখতে হয়। অথচ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এ হাদীস তার বিপরীত কার্যের প্রমাণ করে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আওয়ামী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস অনুসারে আমল করেন। ইমাম আহমদের এক বর্ণনাও এর অনুরূপ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অপর বর্ণনা মতে তাঁরা হযরত ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আমল করেন। কেননা আশিয়াতুল লুময়াতে আছে যে, ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী। এ ছাড়া ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীস দ্বারা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতেও হযরত ওয়ায়েলের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ডাহাবী (র.) বলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজ্দা করে, সে যেন হাত রাখার আগেই হাঁটুতে প্রথম রাখে। সুতরাং তাঁর এ পরম্পরবিরোধী হাদীস গ্রহণযোগ্য না হয়ে বরং ওয়ায়েল ইবনে হজ্জর-এর হাদীস গৃহীত হবে। কারণ হযরত ওয়ায়েল হতে বিপরীত কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। উপরন্তু ওয়ায়েলের সমর্থনে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে কাইয়িম বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের শেষ অংশ প্রথম অংশের বিরোধী। তাঁর বর্ণনায় প্রথম অংশের রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যদি সিজ্দা করে, সে যেন উটের বসার মতো না বসে, অথচ উট বসার সময় প্রথমেই সামনের হাত গুটিয়ে সামনের দিক নিচু হয়ে বসে। তাঁর হাদীসের দ্বিতীয় অংশের রয়েছে বরং সে যেন হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাতকে মাটিতে রাখে, এখানে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যাবে। কারণ হাদীসের দ্বিতীয় অংশের জামা অনুযায়ী আমল করলে উটের মতো হাত আগে মাটিতে রেখে সামনের দিক নিচু করে সিজ্দা করলে যেতে হয়। সুতরাং তিনি [ইবনে কাইয়িম] বলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনায় সম্ভবত তুল করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি ছিল رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ তা হলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের প্রথম অংশ ও শেষ অংশে বিরোধ থাকে না। এমনকি এ মর্মে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলোর সাথেও তাঁর হাদীসের দ্বন্দ্ব থাকে না।

উটের বসার অবস্থা : উট বসার সময় প্রথমে সামনের পা দু'টি গুটিয়ে বসে এবং পিছনের দিক উপরে তুলে রাখে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি প্রথমে হাত মাটিতে রাখলে, তার অবস্থাও উটের বসার ন্যায় হবে। এভাবে সিজ্দায় যেতে হজ্জর ﷺ নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٨٤٠. ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ
التَّيْبِيُّ   يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৮৪০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম   দুই
সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন, নবী করীম  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي অর্থাৎ হে আল্লাহ!
তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর,
আমাকে সঠিক পথ দেখাও; আমাকে শান্তি ও স্বস্তি দান
কর এবং আমাকে রিজিক দাও। -[আবু দাউদ ও তিরমিধী]

وَعَنْ ٨٤١. حَدِيثَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ
  كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ
اغْفِرْ لِي . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৪১. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত
যে, নবী   দু' সিজদার মধ্যখানে বলতেন,
"রাব্বিগফিরুলী" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা
করো। -[নাসাঈ ও দারেমী]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّالِثُ

عَنْ ٨٤٢. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ
(رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ   عَنِ نَفْرَةِ
الْغُرَابِ وَأَقْتِرَاشِ السَّبْعِ وَأَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ
الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيرَ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৪২. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিব্ব
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ   [নামাজের
মধ্যে তিনটি কাজ করতে] নিষেধ করেছেন। (১) সিজদায়
কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, (২) হিংস্র জন্তুর ন্যায় দু'
হাতের বাহু মাটিতে বিছিয়ে দিতে এবং (৩) মসজিদের
মধ্যে করে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেভাবে
উট নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। -[আবু দাউদ,
নাসাঈ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মসজিদ সবার ইবাদতের স্থান। অএতব সেখানে কারো স্থান নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত নয় বরং মাকরুহ। ইমাম হুগওয়ানী
(র.) বলেন, মসজিদের জন্য কোনো কাপড় নির্দিষ্ট করে রাখা মাকরুহ। এর উপর মসজিদের কোনো স্থান নিজের জন্য নির্দিষ্ট
করে নেওয়ার মাসআলাটিও অনুমান করা যায় যে, নিজের জন্য নির্ধারিত স্থানে অন্যকে বসতে বাধা দেওয়া শরিয়তে কোনো
জালো কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

وَعَنْ ٨٤٣. عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ   يَا عَلِيُّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا
أُحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي
لَا تُفِغْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৪৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ   আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে
আলী! অবশ্য আমি যা নিজের জন্য পছন্দ করি তা তোমার
জন্যও পছন্দ করি, আর যা নিজের জন্য অপ্রিয় মনে করি
তা তোমার জন্যও অপ্রিয় মনে করি। তুমি দু' সিজদার
মধ্যবর্তী সময় ইকআ করে বসো না। -[তিরমিধী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ نَزَحَ هَانِيَسَ الْبَآخْيَا : কুকুরের ন্যায় নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে দুই পা সম্মুখে উভয় হাঁটু উপরের দিকে তুলে হাতের পাতা দুই পাশে মাটিতে স্থাপন করে বসাকে 'ইকআ' বসা বলে। আবার কেউ কেউ দুই পায়ের গোড়ালি খাড়া করে এর ওপর নিতম্ব রেখে বসাকে 'ইকআ' বলেছেন।

وَعَنْ ٤٤٤ طَلِقَ بِنِ عَلِيَّ الْحَنَفِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صَلَاتَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا وَسُجُودِهَا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৮৪৪. অনুবাদ : হযরত তালক ইবনে আশী আল-হানাতী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মহীয়ান গরীমান আল্লাহ ঐ বান্দার নামাজের প্রতি সূদৃষ্টি করেন না, যে বান্দা নামাজের রুকু ও সিজদার মাঝে নিজের পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفِيَّةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ রুকু ও সিজদার পদ্ধতি : রুকু ও সিজদাতে পিঠ এমনভাবে সমান্তরাল রাখবে যেন রুকুতে কোমর হতে মাথা পর্যন্ত এবং সিজদাতে কোমর হতে ঘাড় পর্যন্ত একটি সরল রেখার ন্যায় দেখায়। ফকীহগণ উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, যাতে পানিপূর্ণ একটি পাত্র পিঠের উপর রাখলে পাত্রটি পড়ে না যায় এবং পানিও না পড়ে।

মোটকথা, যথাসম্ভব আগে পিছে সমান রাখতে চেষ্টা করতে হবে। অনেক লোককে দেখা যায় রুকুতে মাথা খুব বেশি নিচু করে ফেলে এবং আবার অনেকেই সিজদায় পাছার দিকটাকে খুব বেশি উপরে তুলে রাখে। কাজেই উভয়টির মধ্যবর্তী একটি অবস্থা অবলম্বন করাই শরিয়তের নির্দেশ।

وَعَنْ ٤٤٥ نَافِعِ (رحا) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفْيَهُ عَلَى الذِّئْيِ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الذِّئْيَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৮৪৫. অনুবাদ : [ভাবেয়ী] হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ কপাল জমিনে ঠেকায় অর্থাৎ সিজদা করে সে যেন উভয় করণ্ডট [হাতের তালু] সেখানে স্থাপন করে, যেখানে নিজের কপালকে স্থাপন করেছে। অতঃপর যখন কপাল উঠাবে তখন উভয় হাত উঠাবে। কারণ উভয় হাতের তালুও সিজদা করে, যেভাবে তার মুখমণ্ডল সিজদা করেছে। -[মালিক]

بَابُ التَّشْهَدِ

পরিচ্ছেদ : তাশাহুদ

تَعْتَلُّ رَبَّكَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো- সাক্ষ্য প্রদান করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের উভয় বৈঠকে যে আত্তাহিয়াতু পড়া হয় তাকে তাশাহুদ নামে অভিহিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আত্তাহিয়াতুকে তাশাহুদ বলা হয় এ জন্য যে, এতে তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য উক্তারিত হয়েছে। এ তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব না সন্নত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব, আর ইমাম শাফেয়ী ও অপার কিছু সংখ্যকের মতে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ সন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহুদ ওয়াজিব। তাশাহুদের শব্দ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে তাশাহুদ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

أَفْضَلُ الْأَوَّلِ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ^{٨٤٦}ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشْهِدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَفِي رَوَايَةٍ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِأَسْطَافِهَا عَلَيْهِمَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহুদ পড়তে বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপরে রাখতেন এবং ডান হাতকে ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন ও তিগ্নান গণনার মতো করে অঙ্গুলি বন্ধ করতেন, আর তজনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন তিনি নামাজের মধ্যে বসতেন, দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্তী অঙ্গুলি উত্তোলন করতেন এবং এর দ্বারা প্রার্থনা করতেন অর্থাৎ ইশারা করতেন। আর বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে খোলা অবস্থায় থাকতো।
-মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْدُ আঙ্গুল গণনার বর্ণনা : আরবদের মধ্যে আঙ্গুলের কর গণনা করার একটি নিয়ম রয়েছে। একে عَنَدُ বলে। নামাজের তাশাহুদে অঙ্গুলি পেচানোর পদ্ধতি বর্ণনায় তিন ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে। আর তা হলো, তিগ্নান, নকই ও তেত্রিশ।

তিগ্নান গণনার মতো : এ কথার অর্থ হলো, আরবদের লোকেরা যখন অঙ্গুলির কর দ্বারা গণনা করতো তখন তিগ্নান গণনার সময় কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলি বন্ধ করে তজনীকে খাড়া রাখতো এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ তজ্ঞীর গোড়ার সাথে লাগিয়ে রাখতো। আমাদের দেশেও সাধারণত তিগ্নান গণনা করার সময় এরূপ করা হয়ে থাকে।

নকই গণনার মতো : অন্য হাদীসে নকই সংখ্যা গণনার মতো করে অঙ্গুলি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ কনিষ্ঠা ও তার পার্শ্ববর্তী অনামিকা অঙ্গুলিকে বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে পরস্পরে মিলিয়ে বৃক্রে মতো করা এবং তজ্ঞীকে খাড়া রাখা।

তেত্রিশের গণনা : এটি হলো কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বন্ধ করে তজ্ঞীর সাথে মিলিয়ে রাখা। তখন ধারণা হবে যেন, তজ্ঞী দ্বারা ইশারা করবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করতেন।

হোটকথা এ জাতীয় কতিপয় হাদীস হতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহুদ পড়ার সময় তর্জনী খাড়া রেখে 'আল্লাহ এক' এ কথার প্রতি ইশারা করতেন, কাজেই এটা হৃৎকের সূন্নত। আর এটাই হলো বিশ্বস্ততার কথা। তবে এ জন্য তিনি কখনও ৫৩ আবার কখনও ৯০-এর বন্ধনের ন্যায় বন্ধন করতেন। আবার কখনও তর্জনীকে খাড়া রেখে অপর সমস্ত অঙ্গুলিকে উরুর উপরে বিছিয়ে রাখতেন।

হানাফী ইমামদের মতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় অঙ্গুলি উঠাতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় অঙ্গুলি নামাতে হয়। তবে শাফেয়ীদের মতে 'আশহাদু' বলার সময় অঙ্গুলি তুলে ইশারা করতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সাথেই অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলতে হয়। خِيَلَاتُ الْأَيْمَنِ فَمِنْ سُنَّةِ الْأَشَارَةِ وَكَفَيْتِ الْعَنْدَ | অঙ্গুলি ইশারা সূন্নত হওয়া সম্পর্কে মতভেদে ও অঙ্গুলি চটানোর পদ্ধতিতে কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী ইমাম তাশাহুদে ইশারা করতে নিষেধ করে থাকেন। আবার কেউ কেউ ইশারা করাকে উত্তম বলেন। ইবনে হুমায় ইশারাকে প্রাধান্য দান করেছেন। তাশাহুদের মধ্যে ইশারা করা হানাফী মাযহাবের তিন ইমামের মতে সূন্নত। 'আর-কাওকাবুদ দুররী' গ্রন্থে আছে যে, ছয় ইমামের ঐকমত্যে তাশাহুদের মধ্যে ইশারা সূন্নত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) লেখেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) এ মত গ্রহণ করেছেন।

ফতোয়ায় শামীতে আছে, এটা করা সূন্নত। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি। ইশারা করার সময় তর্জনীকে উপরের দিকে করবে না, তা হলে নিজের দিকেই ইশারা করা হবে। কেননা ইবনে যুবায়েরের বর্ণনায় لا يَحْرُكُهَا এসেছে। শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে ইশারার সময় অঙ্গুলি নাড়াতে হবে। তাঁরা হযরত ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীসে يَحْرُكُهَا-এর উপর আমল করেন। হানাফী মতে এটা ঘরা ঐ নড়া বৃথানে হয়েছে, যা তর্জনি উঠানোর সময় হয়। আর অঙ্গুলি যখন উঠাবে তখন নড়বে না। ইবনে হাজারের মতে না নাড়ানোই সঠিক। আর ইশারা করার সময় অঙ্গুলিগুলো পঁচিয়ে নেওয়া সূন্নত। পঁচানো ব্যতীতও ইশারা করার প্রমাণ আছে। হয়তো রাসূল ﷺ উভয় পদ্ধতিতে আমল করেছেন। অঙ্গুলি পঁচানোর পদ্ধতি বর্ণনায় তিন ধরনের হাদীস আছে। যেমন-

১. তিপ্রান্ন গণনার ন্যায় আঙ্গুল পঁচানো। এতে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে বন্ধ করে তর্জনীকে খাড়া রেখে বৃদ্ধার মাথাকে তর্জনির গোড়ার সাথে মিলিয়ে রাখা। এটা হযরত ইবনে ওমরের বর্ণনাতে আছে এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।
২. নব্বই গণনার মতো করে পঁচানো। নব্বইয়ের জন্য কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধার মাথাকে পরস্পরের মুখামুখি মিলিয়ে বৃত্তাকারে হালকা করা এবং তর্জনীকে খাড়া রাখা। এটা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর-এর বর্ণনাতে আছে এবং এটাই হানাফী উলামায়ে কেলাম ও ইমাম আহমদ (র.)-এর পছন্দনীয় মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) কিতাবুল আমালীতে এ পদ্ধতিই বর্ণনা করেছেন।
৩. তেত্রিশ সংখ্যা গণনার মতো করে পঁচানো। এটা এই যে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বন্ধ করে তর্জনির সাথে মিলানো। এমনভাবে যে, মনে হবে যে, তর্জনি দ্বারা ইশারা করবে। এটা হযরত ইবনে যুবাইর (রা.)-এর পছন্দনীয় পদ্ধতি। হানাফী মাযহাব মতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় অঙ্গুলি গুটিয়ে ইশারা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় তর্জনীকে নিচু করে হালকা করবে। শাফেয়ী মাযহাব মতে তাশাহুদের প্রথম অবস্থায় হালকা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় ইশারা করবে। আল-আরফুশ শাযী গ্রন্থে আছে যে, শাফেয়ী মাযহাব মতে আশহাদু বলার সময় ইশারা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলবে।

وَعَنْ ٨٤٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزْمِيِّ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعُ يَدَهُ
الْيَمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَيَدُهُ الْيُسْرَى
عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ
وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوَسْطَى
وَيَلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৪৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসতেন তখন তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপরে ও বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপরে স্থাপন করতেন এবং তাঁর শাহাদাত [তর্জনি] অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। এ সময় তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি তাঁর মধ্যমা অঙ্গুলির উপরে রাখতেন আর বাম হাত [হাতের তালু] বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরত। -[মুসলিম]

مَدْعُبُ مَالِك : ইমাম মালেকের নিকট হযরত ওমরের তাশাহুদ উত্তম। হযরত ওমর (রা.)-এর তাশাহুদ হলো, "আতা'হিয়াতু লিল্লাহি আযমাকিয়াতু লিল্লাহি আতা'মিয়াতু আস্‌সালাওয়াতু লিল্লাহি আস্‌সালামু আলাইকা আয্মাহান নাযিয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" শেষ পর্যন্ত।

مَدْعُبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَمَد : ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র.)-এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদ যথা— "আতা'হিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু" উত্তম। হাদীসবিদগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদকেই বিতর্কিত বলেছেন। আব্দামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তাশাহুদের ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসই অন্যান্য হাদীসের তুলনায় বিতর্কিত। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরীন্দের রায়ও এটাই। এ কারণে ইমাম ত্বাহাবী 'শরহে মাআনিল আসার' কিতাবে লিখেছেন যে, এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ হতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মাধ্যমে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনো বিপরীত বর্ণনার প্রমাণ নেই। সুতরাং এর বিপরীত অন্য কোনো তাশাহুদ পাঠ করা ঠিক হবে না।

এ ছাড়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন, যা বিতর্ক হওয়ার আরও অতিরিক্ত প্রমাণ। তাশাহুদের ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেননি। উপরে বর্ণিত মতান্তর কেবলমাত্র উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে, উপরে নতুবা উল্লিখিত তাশাহুদ হতে যেটাই পড়ুক না কেন, সকলের মতেই নামাজ বিতর্ক হয়ে যাবে। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেন, এ মতভেদ শুধুমাত্র ফজিলতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফতোয়া-ই-শামীতে আছে যে, তাশাহুদের মধ্যে কমবেশি করা মাকরুহ।

مَدْعُبُ تَاشَاهُودِ الْمَسْأَلَةِ : ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র.)-এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদ যথা— "আতা'হিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু" উত্তম। হাদীসবিদগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদকেই বিতর্কিত বলেছেন। আব্দামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তাশাহুদের ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসই অন্যান্য হাদীসের তুলনায় বিতর্কিত। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরীন্দের রায়ও এটাই। এ কারণে ইমাম ত্বাহাবী 'শরহে মাআনিল আসার' কিতাবে লিখেছেন যে, এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ হতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মাধ্যমে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনো বিপরীত বর্ণনার প্রমাণ নেই। সুতরাং এর বিপরীত অন্য কোনো তাশাহুদ পাঠ করা ঠিক হবে না।

وَعَنْ ٨٤٩ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - لَكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَمْعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ

৮৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে আমাদেরকে কুরআন শরীফের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন, তিনি সেভাবে আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ সমস্ত ইজ্জত- সম্মান, সমস্ত ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের উপরে ও আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আরও ঘোষণা করছি যে, যুহাখিদ বলুন, আমি সালামুন আলাইকা এবং 'সালামুন আলাইনা' আলিফ লাম ব্যতীত বুখারী, মুসলিম ও উভয়ের সমষ্টিত সংকলন হুমাঈদীর কিতাবে কোথাও পাইনি, কিন্তু জামে' উল উসুল প্রণেতা তিরমিযীর বরাতে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

الفصل الثانی : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٥٠. وَأَبِي بِنِ حَنْبَرٍ (رَض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَقْرَشَ رِجْلَهُ الْيَسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيَسْرَى وَمَدَّ يَرْقَعَهُ الْيَمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيَمْنَى وَكَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتَهُ يَحْرِكُهَا يَدْعُو بِهَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৮৫০. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে [তাশাহুদের বৈঠক সম্পর্কে] বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [নামাজের মধ্যে] বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর স্থাপন করলেন এবং ডান হাতের কনুইকে পাজর হতে পৃথক করে ডান উরুর উপর স্থাপন করলেন এবং দুই অঙ্গুলি [কনিষ্ঠা ও অনামিকা] বন্ধ করলেন এবং [মধ্যমা ও বৃদ্ধা] এ দুই অঙ্গুলি দ্বারা কৃত রচনা করলেন। অতঃপর [তজনী] উত্তোলন করলেন এবং [তজনী] অঙ্গুলি উঠালেন। রাবী বলেন, এ সময় আমি তাঁকে দেখলাম তিনি অঙ্গুলি নাড়াচ্ছিলেন এবং তাশাহুদ পাঠরত অবস্থায় তার দ্বারা ইশারা করছেন।—[আবু দাউদ ও তিরমিহী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বি. দ্র. উল্লিখিত হাদীসের রাবী এ হাদীসের প্রথমংশ উল্লেখ করেননি। আর তা হলো—

لَا تَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّيَ فَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَا أَذُنَيْهِ . ثُمَّ أَخَذَ شِئَاءَهُ يَمِينِهِ . فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعُ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ . فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ .

ইহা হাদীসের ব্যাখ্যা : বাহাত উক্ত হাদীস ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবের সমর্থন করে, যেখানে তিনি বলেছেন, ইশারার জন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করে তাকে নাড়াতে হবে। অথচ সামনের হাদীসে ইবনে যুবাইর হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ অঙ্গুলি নাড়তেন না, এভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে ঘন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার সমাধানে বলা যায় যে, অঙ্গুলি নাড়ানো ছাড়া উত্তোলন করা সম্ভব নয়। কাজেই এখানে অঙ্গুলি নাড়ানো মাঝেই উত্তোলন করা। তবে ইশারার জন্য উত্তোলন করার পর নাড়ানো হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য সহীহ ও সঠিক কথা হলো, হযূর ﷺ শুধুমাত্র অঙ্গুলি উত্তোলন করেছেন, কিন্তু নাড়েননি।

وَعَنْ ٨٥١. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّزْبِيِّ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يَحْرِكُهَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا يَجَاوِرُ بَصْرَةَ إِشَارَتِهِ)

৮৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন তাশাহুদ [কালিমায়ে শাহাদাত] পাঠ করতেন, তখন অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন, কিন্তু একে নাড়াতে না।—[আবু দাউদ, নাসায়ী] আবু দাউদ এ কথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, এ সময় রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি ইশারার দিক হতে সামনের দিকে যেতো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১) উক্ত হাদীসের মধ্যে ৯ম ও তার সমাধান : পর পর বর্ণিত ইবনে হুজর ও ইবনে যুবাইরের এর হাদীসদ্বয়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে বলা হচ্ছে যে, 'অঙ্গুলি নাড়াতে' এ বাক্যের অর্থ হলো, তজনী উঠাতে আর নাড়ানো বাতীত উঠানো সম্ভব নয়। ইবনে যুবাইরের হাদীসে 'অঙ্গুলি নাড়াতে না' এ বাক্যের অর্থ হলো, অঙ্গুলিটিকে পুনঃ পুনঃ উঠানো করা তেন না, বরং একবারেই উঠানো রাখতে এবং নামাযের সময় আল্লাহ ﷻ বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলতে। এভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٥٥٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأَضْعَفِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ آخِذٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيُّ وَالتَّبَهِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

৮৫২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি [সায়াদ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা.)] তার দুই অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, একটি দ্বারা, একটি দ্বারা। - [তিরমিযী ও নাসায়ী এ ছাড়াও বায়হাকী কর্তৃক দাওয়াতুল কবীরে বর্ণিত।]

وَعَنْ ٥٥٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ)

৮৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে নামাজের মধ্যে তার হাতের উপরে ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। - [আহমদ ও আবু দাউদ] আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে নামাজে সিজ্জা হতে দু' হাতে ভর দিয়ে উঠতে নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের মধ্যে হাতে ভর দিয়ে বসা বা উঠা যাবে না। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফে উল্লিখিত একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল ﷺ উভয় হাত দ্বারা মাটিতে ভর করেছেন। হাদীসটি হুলা- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ - (عِنْدَ الْقِيَامِ) - সত্যতাঃ উভয় বর্ণনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে, বুখারী শরীফে উল্লিখিত হাদীসটি মূলত বৈধতা বর্ণনার জন্য। অথবা এটা ছিল রাসূল ﷺ-এর বার্ষিক্যালীন অবস্থার বর্ণনা। কাজেই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। উঠা নামাজ, শক্রিয়া : আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, শরীরের যে অঙ্গ জমিন হতে যথাক্রমে নিকটে সিজ্জা ও বসার সময় তা আগে যাবে, যেমন- প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক ও সর্বশেষে কপাল। অনুরূপভাবে সিজ্জা বা বসা হতে দাঁড়াবার সময় যে অঙ্গ জমিন হতে দূরে যথাক্রমে তা আগে উঠাতে হবে, যেমন- প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাঁটু।

وَعَنْ ٥٥٤ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّصْفِ حَتَّى يَقُومَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُّ)

৮৫৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রথম দুই রাকাতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। [তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث হাদীসের ব্যাখ্যা : উত্তপ্ত পাথরের উপর বসা অর্থাৎ বেশিক্ষণ না বসে থাকা। রাসূল ﷺ প্রথম বৈঠকে আত্মবিহাঙ্গুর বেশি কিছুও পড়তেন না; বরং তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতেন। আমাদের জন্য এ বিধান পালন করা অপরিহার্য। এর চেয়ে এক বাক্য বেশি পড়লেই সাহা সিজ্জা ওয়াজিব হবে।

عَنْ جَابِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الرَّصْفِ فَقَالَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّصْفِ حَتَّى يَقُومَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُّ)

وَعَنْ ٨٥٥ جَابِرِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِكُلِّ الصَّلَاةِ الطَّيِّبَاتُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسَأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّالِثُ

عَنْ ٨٥٦ تَافِعِ (رض) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصْرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِهَيْ أَسَدٌ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَابَةَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِسْمُهُ بِاللَّسْبَابَةِ -এর উদ্দেশ্য বাক্যাংশে -مِنِ الْهَيْ أَسَدٌ [বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ] تَرْكِيْبُ الْجَمْلِ مِنْ سَهٍ وَ سَرْدَا مُفْرَدًا مُضَاكِّكَارِ بَابِ كَرْتٍ هِيَ بَاكْيَاتِي دَارَا رَابِي بَالِنِ يَهْ -পদটি দ্বারা রাসূল ﷺ স্পষ্ট করেছেন।

وَعَنْ ٨٥٧ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) كَانَ يَقُولُ مِنَ السُّنَنِ اخْفَاءَ التَّشَهُدِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

৮৫৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহুদ শিখাতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআন মাজীদের কোনো সূরা শিখাতেন, [তাশাহুদ এই] بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِكُلِّ الصَّلَاةِ الطَّيِّبَاتُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسَأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ "আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহরই সাহায্যে আরম্ভ করছি। সমস্ত সন্মান, সমস্ত বন্দেগি ও সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও মনোনীত রাসূল। আমি আল্লাহর সকাশে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি কামনা করছি।

৮৫৬. অনুবাদ : [তাবেহী] হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) যখন নামাজে বসতেন, তখন তাঁর দুই হাতকে দুই হাঁটুর উপরে রাখতেন ও অঙ্গুলির [তর্জনী] দ্বারা ইশারা করতেন এবং অঙ্গুলির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ অঙ্গুলির ইশারা শয়তানের উপরে লোহার গদা হতেও অধিক কঠিন। -[আহমদ]

৮৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি সাধারণত বলতেন, তাশাহুদ [আজাহিয়াতু] চুপে চুপে পড়াই সুলত -[আবু দাউদ ও তিরমিধী] ইমাম তিরমিধী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِهَا

পরিশ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ ও তার মাহাজ্বা

الصَّلَاةُ শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো- দরুদ যা ফারসি ভাষার শব্দ। এ الصَّلَاةُ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনেই এটি দশটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَاللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ- এখানে صَلَاة টি রহমত ও اِسْتِغْفَارُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূল ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا- পবিত্র হাদীস শরীফে তাকিদ এসেছে যে, صَلُّوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِلْ عَلَيَّ, যে লোকের নিকট আমার স্মরণ করা হয় সে যদি আমার প্রতি দরুদ পাঠ না করে তবে সে কৃপণ ব্যক্তি।

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, (عَبْرَاتِي) "যে লোকের নিকট আমার স্মরণ করা হয়, সে যদি আমার প্রতি দরুদ না পড়ে তবে সে হতভাগ্য।"

দরুদের হুকুম : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দরুদ পাঠ করা জীবনে একবার ফরজ। যেমন তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতি দেওয়াও একবার ফরজ। এটা ব্যতীত যতবার তাঁর নাম শুনেবে ততবার দরুদ পাঠ করা সুন্নত। কারো মতে যতবার শুনেবে প্রত্যেকবার দরুদ পড়া ওয়াজিব।

হানাফী ইমামদের মতে নামাজের মধ্যে তাশাহুদদের পর দরুদ পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজের শেষ বৈঠকের তাশাহুদদের পর দরুদ পাঠ করা ফরজ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামাদের মতে সুন্নত। তবে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মিদে দেখলতী (র.) বলেছেন, হানাফীদের মতে মূলত রাসূল ﷺ -এর প্রতি দোয়া, দরুদ ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব, কিন্তু শেষ তাশাহুদদের পরে পাঠ করা সুন্নত। অবশ্য দরুদ পাঠের বহু ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে।

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

৮৫৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুর রহমান

ইবনে আবু লায়লা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [সাহাবী] হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, [হে আব্দুর রহমান!] আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা উপটৌকন দেব না, যা আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট শুনেছি? তখন আমি বললাম, জি-হ্যাঁ, আমাকে তা উপটৌকন দিন। তিনি বললেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি সালাত বা দরুদ পাঠ করব, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দরুদ ও সালাত পাঠ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা এভাবে বলবে, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسْبُكَ مُحَمَّدٌ بَارِكُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ ٨٥٨
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى (رَح) قَالَ لَقَيْتَنِي كَغَيْبِ بْنِ
عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً
سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى
فَأَهْدِي لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ
قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ
قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ
 مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ)

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ এর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছ। অবশ্যই তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত।” —[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু মুসলিমেরে বর্ণনায় দুই স্থানের ‘আলা ইব্রাহীমা’ কথাটি উল্লেখিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উভয় হাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ নবীকুলের শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পূর্ব পুরুষ ও পিতৃতুল্যা ছিলেন বলে তাঁর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তদুপরি আমাদেরকে দীনের ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— مَلَأْنَا بَيْتَكُمْ إِبْرَاهِيمَ তাই বলে আমাদের নবীর মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আল ও অহল-এর মধ্যকার পার্থক্য : آل ও اهل উভয়ই সমার্থবোধক। অর্থ— পরিবার বা বংশধর। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—

(ক) آل-এর সম্বন্ধ শুধু বিবেকবানদের সাথে হয়ে থাকে। যেমন— آلُ الرَّسُولِ

আর اهل الله-এর সম্বন্ধ বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয়ের সাথে হয়ে থাকে। যেমন— اهل النبوة

(খ) آل-এর সম্বন্ধ বিবেকবানদের মধ্য হতে শুধু পুংলিঙ্গের সাথে হয়ে থাকে। সুতরাং اهل فاطمة বলা যাবে না। কিন্তু اهل آل-এর সম্বন্ধ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের সাথে হতে পারে।

(গ) آل শব্দটি শুধু সন্তান পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই পার্থিব ব্যাপারে সন্তান হোক, যথা— آلُ فِرْعَوْنَ অথবা পরকালীন জগতের হোক। যেমন— آلُ مُحَمَّدٍ

এর পরিজনের অন্তর্ভুক্ত কারা? : কিছু সংখ্যকের মতে যাদের উপর যাকাত খাওয়া হারাম তারা ই মহানবী ﷺ-এর পরিজন। যেমন— বনী হাশেম, বনী মুত্তালিব, হযরত ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, আলী (রা.)

এবং তাঁর দু’ভাই—জা’ফর ও ‘আকীল এবং ছদ্ম্বুর ﷺ-এর চাচাগণ যেমন— আব্বাস, হারেস ও হাম্‌যা এবং তাঁদের আওলাদসমূহ।

* আবার কারো মতে প্রত্যেক দীনদার মোস্তাকী ব্যক্তিই মহানবী ﷺ-এর পরিজনভুক্ত। হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মিদে সেহলবী (র.) বলেন, উক্ত সঞ্ছোধনের মধ্যে মহানবী ﷺ-এর বিবিগণও शामिल হয়েছেন।

* آل (আল) শব্দের আরেক অর্থ হলো— আনুগত্য করা। এ পর্যায়ে প্রত্যেক মুমিনই মহানবী ﷺ-এর পরিজনভুক্ত। ইমাম মালেক (র.) ও সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখগণ এ অর্থকেই পছন্দ করেছেন। আর এটাই ইমাম নববীর অভিমত।

* কারো মতে আল مُحَمَّد বলতে মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রীগণ, কন্যাগণ, জামাতাগণ ও জামাতাদের সন্তানদেরকে বুঝায়।

এর পরিচয় : আলُ إِبْرَاهِيمَ বলতে হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক (আ.) ও তাঁদের বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে।

আহুস পদটি উহা অহল-এর ই’রাব-এর মফরুল হেতু মানসূব। অথবা مَصَافٍ হেতু। অর্থাৎ يَا اَهْلَ النَّبِيِّ-এর এ’রাব-এর এ’ল-এর মফরুল হেতু মাসনূব; কিন্তু বদল হতে পারে না। কেননা يَذْكُرُ الْاَهْلَ الْاَهْلِ

সাধারণত যমীরে গায়েব হতে হয়, যমীরে মুখাতাব হতে নয়।

عَنْ ٥٩٠ أَيْ حَمِيدِ السَّاعِدِيِّ

(رض) قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ

نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ

وَدُرَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَدُرَيْتِهِ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ مُجِيدٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৫৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুমাঈদ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যে আদ্বাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা বলবে-
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَدُرَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَدُرَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
“হে আদ্বাহ! তুমি মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম আশাঈহিস সালামের পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরগণের প্রতি তোমার কল্যাণ নাজেল করো, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ নাজেল করেছ। অবশ্যই তুমি খুব প্রশংসিত এবং খুব সম্মানিত।”।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٩٠ هَادِيَسِرِ بِحَدِيثِ شَرَحِ الْحَدِيثِ
আসকালামী (রা.) বলেন, নারী হোক কিংবা পুরুষ, মানুষের বংশধরকেই যুররিয়াত বলা হয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রা.) বলেন, কোনো ব্যক্তির কেবলমাত্র স্বীয় কন্যার সন্তানগণ যুররিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ নিজের দুহিতা ও দৌহিত্রীকে যুররিয়াত বলা হয়, কিন্তু তাদের সন্তানগণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

عَنْ ٥٩١ أَيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ

وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৬০. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আদ্বাহ তা’আলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।
-[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٥٩١ هَادِيَسِرِ بِحَدِيثِ شَرَحِ الْحَدِيثِ
আদ্বাহ তা’আলা বলেন, ‘সালাত’ শব্দটি নিষ্পাপ-মাসুম ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট। যেমন- নবী বা ফেরেশতাগণ, তাঁদের সম্মানার্থে ‘সালাত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ফলে তাঁদের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বিশেষাধিকারিত করা হয়। সুতরাং যারা নবী-রাসূল নন, তাদের বেলা ‘সালাত’ শব্দের ব্যবহার মাকরুহ।

* আদ্বাহ ইবনে ‘আদ্বান বলেন, ‘সালাত’ শব্দটি নিষ্পাপ-মাসুম ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট। যেমন- নবী বা ফেরেশতাগণ, তাঁদের সম্মানার্থে ‘সালাত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ফলে তাঁদের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বিশেষাধিকারিত করা হয়। সুতরাং যারা নবী-রাসূল নন, তাদের বেলা ‘সালাত’ শব্দের ব্যবহার মাকরুহ।

* আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘সালাত’ শব্দটি মহানবী ﷺ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট, কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়, বরং অন্যান্য নবী-রাসূলদের প্রতিও সালাত-সালাম পাঠ করা যায়। ইমাম বায়হাকী তাঁর ‘আবু হুমাঈদ সায়েদী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে এ মর্মে একটি নির্ভরযোগ্য মাকরুহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ حَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত নাজিল করেন এবং তার দশটি গুনাহ মার্জনা করা হয় এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় । [নাসাই]

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزَلَى النَّاسُ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে, যে আমার উপর বেশি দরুদ পাঠ করে । -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : এ কথা সর্বাধিকৃত যে, নবী করীম ﷺ-এর উপরে প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে একবার দরুদ পাঠ করা ফরজ । আর যখন তাঁর পবিত্র নাম কেউ উচ্চারণ করে বা করতে শুনে, তখন দরুদ পড়া ওয়াজিব । নবী করীম ﷺ বলেছেন, কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ সে আমার উপরে দরুদ পাঠ করেনি । যদি কোনো মজলিসে বারবার রাসূল ﷺ-এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হয় অথবা বারংবার রাসূল ﷺ-এর নাম শুনে, তা হলে ইমাম তাহাবীর মতে বারংবার দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব । ইমাম কারশী (র.) বলেন যে, একবার পাঠ করা ওয়াজিব, আর অবশিষ্টবার পড়া মোস্তাহাব । অভিজ্ঞ আলিমদের মতানুসারে ফতোয়া ইমাম তাহাবীর কথার উপরই ধার্য করা হয়েছে । নামাজের শেষ বৈঠকে দরুদ শরীফ পাঠ করা ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ । হানাফী মাযহাব মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । কেউ কেউ আবার এই দরুদ শরীফ পাঠকে ওয়াজিব বলেন । সর্বাবস্থায় জিকর হিসাবে রাসূল ﷺ-এর উপরে দরুদ পাঠ করা মোস্তাহাব । শাফেয়ী (র.) নিম্নলিখিত দলিল পেশ করেন-

1. آيَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে নবী করীম ﷺ-এর উপরে দরুদ পৌছানোর আদেশ করেছেন । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদেশ দ্বারা ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয়েছে ।
2. তাঁদের অপর দলিল নবী করীম ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি নামাজে আমার উপরে দরুদ পাঠ করেনি, তার নামাজ হয়নি ।” হানাফী মতাবলম্বী ইমামদের দলিল এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত অমর ইবনে আস (রা.) শ্রমুখ বর্ণিত হাদীসমূহে আছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ তাশাহুদ পরিমাণ বসলেই নামাজ পূর্ণ হবে বলে আদেশ করেছেন, তিনি দরুদ পাঠের শর্ত আরোপ করেননি । যদি দরুদ পাঠ ফরজ হতো, তবে তিনি এর জন্য শর্তাধারণ করতেন । হানাফী মতাবলম্বীদের পক্ষ হতে শাফেয়ীর দলিলের নিম্নলিখিত জবাব প্রদান করেছেন-
1. صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا বাক্যে صَلُّوا আদেশ দ্বারা দরুদ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং আদেশ মোস্তাহাবের জন্য করা হয়েছে ।
2. صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا হাদীসে ‘না-বাচক অব্যয় وَسَلِّمُوا’ দ্বারা তদ্দ না হওয়া বুঝায় না; বরং পরিপূর্ণ না হওয়া বুঝায় । অর্থাৎ “তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়নি, যে ব্যক্তি নামাজে আমার উপরে দরুদ পাঠ করেনি” ।

যেমন মহানবী ﷺ দুনিয়াতে তাঁর জীবদ্দশায় যখন ওহি নাছিল হতো, তখন স্বাভাবিক অবস্থা হতে ভিন্নতর অন্য আরেক অবস্থায় নিমগ্ন থাকতেন, ওহি নাছিল হওয়া তখনকার মতো শেষ হলে তিনি পুনরায় পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতেন। আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থও এটাই।

وَعَنْ ۸۶۵ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْنًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلِيغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না এবং আমার কবরকে উৎসর্গ স্থলে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে। তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছবে তোমরা যেখানেই থাক না কেন। [নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত তোমাদের ঘরসমূহকে কবর না বানানোর তাৎপর্য হলো, তোমরা তোমাদের বাসস্থানকে দরুদ ও আত্মাহর জিকর হতে শূন্য রেখো না, বরং ঘরকেও নফল ইবাদত, আত্মাহর জিকর ও কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা আবাদ রাখ।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম এই যে, ঘরগুলোকে কবর বানাবে না অর্থাৎ মানুষকে ঘরের মধ্যে সমাহিত করো না।

অথবা কবররের উপরে ঘর, সমাধিসৌধ নির্মাণ করো না। এ ব্যাখ্যা খুবই দুর্বল। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের মধ্যে সমাহিত হয়েছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা নবীদের বিশেষত্ব। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণ যেখানে লোকান্তরিত হতেন, তাঁদেরকে সেখানেই সমাহিত করা হতো।

অথবা এর অর্থ হলো- কবরকে বাসস্থানরূপ বানাবে না, মাঝে মধ্যে জেয়ারত করবে মাত্র। অথবা অর্থ এই যে, ঘরকে কেবল নিদ্রাস্থান বানাবে না।

অথবা তোমরা মৃতের ন্যায় হয়ে না, আর ঘরে ইবাদত ব্যতীত খেঁকো না। ইবাদতবিহীন ঘর কবররূপ। অথবা ঘরে আসতে চায় এবং দেখা করতে চায় এমন ব্যক্তিকে বাধা বা নিষেধ করো না।

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْنًا-এর অর্থ : মহানবী ﷺ-এর বাণী "আমার কবরকে আনন্দ উৎসবস্থলে পরিণত করো না"। এর তাৎপর্য এই যে, তোমরা আমার কবর জেয়ারত ঈদের মতো করো না। ঈদ যেমন বৎসরে দু'বার আসে; এতে হাসি-খুশি, আনন্দ-আহলাদ ও সাজসজ্জা হয়ে থাকে, তোমরা ঐভাবে আমার কবর জেয়ারত করে না, সাজসজ্জা ও খুশিতে মেতে উঠো না, বরং কবর জেয়ারত এর বিপরীত। কারণ কবর জেয়ারতে মৃত্যুচিন্তা, পরকাল চিন্তা ও ধ্যান-গভীরতা রয়েছে।

অথবা ঈদ শব্দ দ্বারা عَيْنًا যার অর্থ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া বারংবার আসা। তা হলে বাক্যটির অর্থ হবে, তোমরা আমার কবরের কাছে বারংবার আসায় অভ্যস্ত হয়ে যোয়ো না। কারণ এভাবে ঘন ঘন আসলে আমার কবরের মাহাত্ম্য ও সন্ধান কুঙ্গু হবে। যেহেতু তোমরা সব সময় কবরের শিটচারণ রক্ষা করে চলতে পারবে না।

আত্মা মা তীর্ষী (র.) বলেন যে, এর দ্বারা খুব বেশি বেশি কবর জেয়ারতের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ঈদ যেমন বৎসরে একবার কি দু'বার আসে, ঐরূপ তোমরাও বৎসরে একবার দু'বার মাত্র আমার কবর জেয়ারত করো না, বরং আমার কবর বারংবার জেয়ারত করো। [মিরকাত]

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ أَنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ آذَرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- এই ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় মলিন হোক অর্থাৎ অপমানিত হোক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ সে দরুদ পাঠ করেনি। সে ব্যক্তিরই নাসিকা ধুলায় মলিন হোক যার কাছে রমজান এসেছে, অতঃপর চলেও গেছে, অথচ সে নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারেনি এবং সেই ব্যক্তিরই নাসিকা ধুলায় মলিন হোক বা অপমানিত হোক, যার কাছে তার পিতামাতা বার্ষিক্যে উপনীত হয়েছে অথবা যে কোনো একজন বাধ্যক্যে পৌছেছে অথচ তাকে তাঁরা বেহেশতে প্রবেশ করায়নি অর্থাৎ তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে সে বেহেশত পাওয়ার উযুক্ত হয়নি। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٨٦٧ أَبِي طَلْحَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبَشَرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرَضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْكَ عَشْرًا وَلَا يَسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ عَشْرًا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৬৭. অনুবাদ : হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সেখানে হাজির হলেন, তখন তাঁর চেহারা খুশির ভাব পরিস্ফুট ছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার নিকট জিব্রাঈল (আ.) এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক বলছেন, এটা কী আপনাকে সন্তুষ্ট করবে না যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউই আপনার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আমি তার উপর দশবার রহমত নাজিল করব। আর আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করবে আমি তার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করবো। -[নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ أَنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ آذَرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

যে কেউ একটি পুণ্যের কাজ করে, তার জন্য অনুরূপ দশটি পুরস্কার রয়েছে।" বস্তৃত এটা উম্মত মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক বিশেষ অনুগ্রহ। উল্লিখিত হাদীসটি এ আয়াতটিরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যদি কেউ রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি একবার দরুদ প্রেরণ করে বা সালাম পেশ করে তবে আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন বা দশবার শান্তি বর্ষণ করেন।

وَعَنْ ٨٦٨ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوَتِي فَقَالَ مَا شِئْتُ قُلْتُ الرَّبْعَ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ التَّيْسُفَ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ قَالَتِ ثَلَاثِينَ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَوَتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا يَكْفِي هَمُّكَ وَيَكْفُرُ لَكَ ذَنْبُكَ .
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬৮. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি [একটি নির্ধারিত সময়ে] আপনার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করি, এর কি পরিমাণ সময় আপনার উপর দরুদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব? রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমার ইচ্ছা। আমি বললাম, তা হলে এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি জবাবে বললেন, তা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি আরও অধিক কর, তা হলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তা হলে কি অর্ধেক সময় নির্ধারিত করে নেব? রাসূল ﷺ বললেন, এটা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এটা অপেক্ষা অধিক কর তা হলে তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তা হলে কি দুই-তৃতীয়াংশ সময় নির্ধারিত করে নেব? রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমার ইচ্ছা। আর এর থেকে যদি অধিক কর তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। তখন আমি বললাম, তা হলে সম্পূর্ণ সময়টাই আপনার দরুদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَجْعَلُ لَكَ صَلَوَتِي كُلَّهَا -এর ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, আমি সম্পূর্ণ সময়টাই আপনার প্রতি দরুদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। এর মর্মার্থ হলো, যখনই আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করব তখনই আপনার প্রতি দরুদ পড়ব। অর্থাৎ আপনার প্রতি খুব বেশি বেশি দরুদ পড়ব।

وَعَنْ ٨٦٩ فُضَالَةَ بْنِ عَمِيْدٍ (رض) قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَلْتُ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَعَجَدْتُ فَاحْمِدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ أَدْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلِّ رَجُلٌ آخَرَ بَعْدَ

৮৬৯. অনুবাদ : হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন, তখন এক ব্যক্তি প্রবেশ করল এবং নামাজ পড়ল আর বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং অনুগ্রহ কর। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে নামাজি! প্রার্থনা করতে খুব তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি নামাজ পড়বে আর [প্রার্থনার জন্য] বসবে, তখন আল্লাহ তা'আলার কিছু প্রশংসা করবে, যার তিনি যোগ্য এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, অতঃপর প্রার্থনা করবে। রাবী: ফুযালা বলেন, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এর পরে এসে নামাজ

ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ
 ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا الْمُصَلِّي
 أَدْعُ تُجِيبُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوَى
 أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

পড়ল। সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করল এবং নবী
 করীম ﷺ-এর উপর দরদুদ পাঠ করল, তখন নবী করীম
 ﷺ বললেন, হে নামাজি ব্যক্তি! তুমি আল্লাহর নিকট কিছু
 প্রার্থনা কর করুল করা হবে। [তিরমিযী, আবু দাউদ এবং
 নাসায়ী ও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٨٧٠ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
 (رض) قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيُ وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو
 بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ
 بِالتَّنَائِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الصَّلَاةُ
 عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي .
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ .
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৭০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
 (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নামাজ
 পড়ছিলাম। তখন নবী করীম ﷺ সেখানে উপস্থিত
 হলেন। হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)ও তাঁর সাথে
 ছিলেন। অতঃপর যখন আমি নামাজ শেষে দোয়া করতে
 বসলাম, প্রথমে আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলাম,
 অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দরদুদ পাঠ করলাম,
 অতঃপর নিজের জন্য প্রার্থনা করলাম। এটা শুনে রাসূল
 ﷺ বললেন, তুমি প্রার্থনা কর তোমাকে তা [প্রার্থিত বস্তু]
 দেওয়া হবে, তুমি প্রার্থনা কর তোমাকে তা দেওয়া হবে।

الْفَضْلُ الثَّلَاثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٧١ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ
 بِالْمَكِّيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا
 أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
 مَجِيدٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৮৭১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে
 ব্যক্তি পাল্লা পরিপূর্ণ করে [ছওয়াবা] মেপে নিতে ভালবাসে,
 সে যখন আমার ও আমার পরিজনের উপর দরদুদ পাঠ করে
 তখন যেন এভাবে বলে—
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِينَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ
 الْبَيْتِ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ
 بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
 অর্থাৎ হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মদ, তাঁর বিবিগণ যারা
 মু'মিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর
 অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীমের
 পরিবারের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি
 প্রশংসিত ও সম্মানিত। [আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'اُمِّي' শব্দের অর্থ এবং নবী করীম ﷺ উম্মি হওয়ার অর্থ : সাধারণত 'اُمِّي' 'উম্মী' বলতে অশিক্ষিত ও মুর্থ লোককে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বেলায় এ অর্থ প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি ছিলেন ওহি শ্রদন্ত জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার। মূলত উম্মী শব্দটি আরবী 'উম্ম' শব্দ হতে লেখা হয়েছে। আর 'উম্ম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- মূল, আসল, মা ইত্যাদি। এ পর্যায়ে উম্মী শব্দের অর্থ হবে, যিনি মূল ও আসলের উপর জন্মগতভাবে বহাল রয়েছেন। বহুত কেউ লেখা পড়ায় পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আর 'নবী' শব্দটিকে 'মা' অর্থবোধক শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাধারণত নারীরা লেখা-পড়ায় অভ্যস্ত ছিল না, বিশেষ করে তদানীন্তন আরবসমাজে। মূলকথা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোনো প্রকার আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষা করেনি। বাহ্যত মানুষের মধ্যে কেউই তার শিক্ষাগুরু ছিল না, বরং মায়ের কাছে যা কিছু শিখেছেন, তাই তাঁর বাইরের বিদ্যার সম্বল। এ পর্যায়ে তিনি উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ শ্রদন্ত ওহিজ্ঞান দ্বারা মহাজ্ঞানী হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوَ مِنْ تَلْوَةٍ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَنَّكَ الْبَطُولُ

সবো মতে উম্মি অর্থ মক্কাবাসী। কেননা মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়। এ অর্থে 'اُمِّي' 'উম্মী' বলতে মক্কাবাসী নবী বুঝানো হয়েছে, আর মহানবী ﷺ যেহেতু মক্কার অধিবাসী ছিলেন তাই তাকে উম্মী বলা হয়েছে।

বহুত এটা তাঁর একটি অন্যতম যুক্তিয়া বটে। কেননা তদানীন্তন আরবসমাজ সাহিত্য চর্চায় চরম খ্যাতি লাভ করেছিল, বলতে গেলে পৃথিবীতে তাদের ছুড়ি ছিল না। আর দেড় হাজার বৎসর পরেও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষের যুগেও সে উম্মি নবীর কোনো একটি কথা বা বাক্যকেও আধুনিক বিশ্ব চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না।

وَعَنْ ۸۷۲ عَلِيٍّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّبِيُّ الَّذِي مَن ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)

৮৭২. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরদর পাঠ করে না। -[তিরমিযী] ইমাম আহমদ হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) হতে এহাদীস এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلَّذِي تَرَكِبُ [বাক্যসমূহের বিশেষণ] : اَلَّذِي تَرَكِبُ পদটির 'اَل' টি জ্ঞাতিবাচক। এখানে 'اَل' ব্যবহার করে পরিপূর্ণতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ কৃপণ বা চরম কৃপণ। اَلَّذِي وَاَلَّذِي اِسْمٌ مَوْزُولٌ দুটি একসাথে এসেছে। আল্লামা জীবী (র.) বলেন, দ্বিতীয় মাওসূলটি প্রথম মাওসূল ও তার সিলার মধ্যে তাকিদ হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

ইবনে হাজার (র.)-এর মতে, হাদীসটির আসল ভাষা مَنْ دَرَاهِي। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো নুসখায় اَلَّذِي ও রয়েছে।

وَعَنْ ٨٧٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِبًا بَلَغْتُهُ . (رَوَاهُ النَّبَيْهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৮৭৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে আমার কবরের কাছে এসে, আমি তা সরাসরি শুনতে পাই; আর যে দূরে থেকে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। -[বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই”। হাদীসাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ কবরের মধ্যে জীবিত আছেন। তবে জীবিত থাকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।
এর অর্থ : নবী করীম ﷺ বলেছেন, “যে দূরে থেকে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে, তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়”। হাদীসাংশ দ্বারা এক শ্রেণীর লোকের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তাঁরা মনে করে যে, দরুদ পড়া বা মিলাদ পড়ার সময় রাসূল ﷺ এর রুহ তথায় উপস্থিত হয়। কেননা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, রাসূল ﷺ এর রুহ তথায় উপস্থিত হয়, তবে “আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়” রাসূল ﷺ এর এ উক্তিটি নিরর্থক হয়ে যায়। অতএব এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করা উচিত। কেননা এরূপ ধারণা শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

وَعَنْ ٨٧٤ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَئِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৮৭৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ তার উপর সত্তরবার অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি ইবনে আমর রাসূল ﷺ হতে শুনেই বলেছেন, সাধারণত কোনো নেক কাজের বিনিময়ে কমপক্ষে দশগুণ অবস্থা ভেদে সত্তরগুণ বা তার বেশিও হতে পারে।
অথবা এটাও হতে পারে যে, দরুদের ছওয়াব প্রথমে দশগুণ সোষণা করা হয়েছে, অতঃপর অনুগ্রহ করে সত্তরগুণ বৃদ্ধি করেছেন।

وَعَنْ ٨٧٥ رُوَيْفِعِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৮৭৫. অনুবাদ : হযরত রুওয়াইফি ইবনে সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের প্রতি দরুদ পাঠ করে এবং বলে হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি তাঁকে [মুহাম্মাদ ﷺ-কে] তোমার নিকট সম্মানিত স্থান দান করো। তার জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যিক হয়ে যায়। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : কিয়ামতের দিবসে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ লাভের বিভিন্ন উপায় আছে। তন্মধ্যে এটাও একটা, অর্থাৎ তার প্রতি দরুদ পাঠ করবে এবং উল্লিখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

وَعَنْ ۸۷۬۱ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
 قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا
 فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِبْتُ أَنْ
 يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَوَقَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ
 أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَرْتُ لَهُ
 ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
 لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوَةٌ صَلَّيْتُ
 عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ -
 (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৮৭৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ
 (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ
 জনপদ হতে বের হয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ
 করলেন, অতঃপর সিজদায় রত হলেন এবং এত দীর্ঘ
 সময় সিজদায় পড়ে থাকলেন যে, আমি মনে মনে ভয়
 করছিলাম যে, না জানি আল্লাহ তাঁকে তুলে নিয়েছেন।
 তিনি [আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)] বলেন, আমি
 দেখতে নিকটে আসলাম। তখন রাসূল ﷺ মাথা উঠালেন
 এবং বললেন, কি হয়েছে? [কি দেখছ?] তাঁকে আমার
 ভাবনার কথা বললাম। রাবী বলেন, তখন রাসূল ﷺ
 বললেন, জিব্রাইল (আ.) আমাকে বললেন, আপনাকে কি
 একটি সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ আযযা ও জান্না
 আপনার সম্পর্কে বলেছেন, “যে আপনার প্রতি একবার
 দরুদ পাঠ করে আমি তার প্রতি রহমত নাজিল করি এবং
 যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি শান্তি
 অবতীর্ণ করি।—[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসটি হযরত ওমর (রা.)-এর কথাও হতে পারে, অথবা তিনি হজুর ﷺ হতে শুনে
 বলেছেন। আর নَبِيِّكَ দ্বারা সম্বোধন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ হলেও মূলত উদ্দেশ্য আম বা ব্যাপক।

وَعَنْ ۸۷۷ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ
 قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَرْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَصِلَ
 عَلَى نَبِيِّكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৭৭. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই দোয়া আসমান ও
 জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যে অবস্থান করতে থাকে এর কিছুই
 উপরের দিকে উঠে না [অর্থাৎ গ্রহণ করা হয় না] যে পর্যন্ত
 না তোমরা নবীর উপর দরুদ পাঠ কর।—[তিরমিযী]

بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদের মধ্যে দোয়া

এখানে তাশাহহুদ বলতে নামাজের শেষ বৈঠককে বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রথম বৈঠকে আন্তাহিয়্যাতু ব্যতীত অন্য কোনো দোয়া-দরুদ পড়া জায়েজ নেই। আর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরুদের পর এবং সালামের পূর্বে যে কোনো দোয়া করা মোক্তাভাত্তাহাব, ইহকালীন ও পরকালীন যে কোনো দোয়া করা জায়েজ। যেমন- মুসলিম শরীফে এসেছে যে, **لَمْ يَنْتَحِرْ مِنْهُ** অতঃপর যে কোনো বিষয়ে ইচ্ছা প্রার্থনা করবে।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, **الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ** অর্থাৎ, এ সময়ে কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া ছাড়া অন্য কোনো দোয়া করা জায়েজ নয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে তবে সম্ভবত গ্রন্থকারের বেখেয়ালে অন্য অধ্যায়েরও কিছু হাদীস এতে এসে গেছে।

أَفْضَلُ الْأَوَّلِ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৭৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে (শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে) প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আজাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং কানা দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে পানাহ কামনা করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমারই নিকট আশ্রয় চাই পাপ ও ঋণের বোঝা হতে”। [এটা শুনে] এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন দেনার বোঝা হতে বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন, অবশ্যই কোনো ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বলে তো মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তো তা ভঙ্গ করে [অর্থাৎ ওয়াদা ঠিক রাখতে পারে না]। - [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ-এর শিখানো এ দোয়াটিতে কবরের আজাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়। শেষকালে দাজ্জাল বের হবে, এরও সুস্পষ্ট ঘোষণা এর দ্বারা বুঝা যায়। এটা ছাড়া সব রকমের বিপদ-আপদ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়ার শিক্ষাও এতে রয়েছে এবং এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা রয়েছে। এর দ্বারা এ ধারণা জন্মাত উদ্দেশ্য যে, বিপদ-আপদ হতে মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই উদ্ধার বা রক্ষা করতে পারে না। অতএব এগুলো হতে কেবল তাঁরই নিকট পানাহ চাইতে হবে। শেষ বাক্যে ঋণগ্রস্ততার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলে লোকদেরকে এটা হতে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মুনাফেক হতে বাধ্য হয়। কেননা মিথ্যা কথা বলা ও ওয়াদা খেলাপ করা সুস্পষ্টরূপে মুনাফেকীর লক্ষণ।

الدَّجَالِ -এর অর্থ : فَتَنَةُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ -এর সীগাহ। এর অর্থ- চরম ধোকাবাজ, চরম মিথ্যাবাদী বা চরম প্রতারণক। হাদীসে উল্লিখিত দাজ্জাল দ্বারা নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কিয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবে। সে হবে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারণক। সে সুকৌশলে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের ঈমান হরণ করবে। তার ললাটে 'কাফের' শব্দ লেখা থাকবে। একমাত্র খাটি মুমিনরাই তা দেখতে পাবে। যারা তার অনুসরণ করবে তারা কাফের হয়ে যাবে। দাজ্জালের প্রতারণা হতে বাঁচার পথ হলো আত্মাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। একমাত্র আত্মাহই তার খপ্পর হতে মানুষদেরকে রক্ষা করতে পারেন।

দাজ্জালকে মাসীহ বলায় কারণ : দাজ্জালকে মাসীহ বলায় কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা-

১. مَسِيحٌ অর্থ- অতিক্রমকারী। কথিত আছে যে, দাজ্জাল এত বেশি দ্রুতগামী হবে যে, মাত্র অল্প কয়দিনে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করবে।
২. অথবা এর অর্থ সমস্ত কল্যাণ হতে তাকে দূরে রাখা হবে। এমতাবস্থায় مَسِيحٌ পদটি مَمْسُوحٌ অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ مَبْعُدٌ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ অর্থাৎ مَمْسُوحٌ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ
৩. অথবা তার একটি চক্ষু মুখাবয়বে মিশে একাকার হয়ে থাকবে। এমতাবস্থায়ও শব্দটি مَمْسُوحٌ অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ أَحَدُ عَيْنَيْهِ مَمْسُوحَةٌ

وَعَنْ ٨٧٩ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشْهَدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ سَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৭৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজের শেষ [বৈঠকের] তাশাহুদ পাঠ হতে অবসর হয়, তখন সে যেন আত্মাহ তা'আলার নিকট চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে- (১) জাহান্নামের শাস্তি হতে, (২) কবরের শাস্তি হতে, (৩) জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় হতে এবং (৪) কানা দাজ্জালের অনিষ্ট হতে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٨٠ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে এ দোয়া এ ভাবে শিক্ষা দিতেন। যেভাবে তিনি তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা এভাবে বল, হে আত্মাহ! নিশ্চয়ই তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোজখের শাস্তি হতে, আশ্রয় চাই কবরের আজাব হতে, তোমার কাছে পানাহ চাই কানা দাজ্জালের বিপর্যয় হতে এবং তোমার কাছে রেহাই চাই জীবন ও মরণের পরীক্ষা হতে। -[মুসলিম]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

العَيْنِيبِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 'কুরআনের সূরার ন্যায় শিক্ষা দিতেন' এর অর্থ হলো, একান্ত দৃঢ়তার সাথে গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন। আর কুরআনের সূরা যেমন যেন ডুলে না যায় সেজন্য সতর্ক থাকে তেমনি এই দোয়াটিকেও স্মরণে রাখতে তাকিদ করতেন।

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

৮৮১. অনুবাদ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আমার নামাজের মধ্যে প্রার্থনা করতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, আপনি বলুন, “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর খুব বেশি অবিচার করেছি, তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার মতো আর কেউ নেই। তুমি নিজ ক্ষমাগুণে আমার অপরাধ মাফ কর এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উচ্চৈশ্বর্য হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটি দোয়া'য়ে মাসুরা নামে প্রসিদ্ধ। আমরা হানাফীগণ শেষ বৈঠকের দরুদে পর এ দোয়াটি পাঠ করে থাকি। অন্যান্য দোয়ার চেয়ে এর প্রাধান্য এ কারণে যে, মহানবী ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর প্রশ্নের জবাবে তিনি যখন উক্ত দোয়াটির কথা বর্ণনা করেছেন, তখন এরই প্রাধান্য থাকবে। কেননা হযুরের নিজস্ব আমল কোনো কোনোটি এমনও আছে যে, তা তাঁর জন্য সুনির্দিষ্টও ছিল।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (رض) عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسَلِّمُ عَن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ حَدِيدِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আমের ইবনে সাদ (র.) তাঁর পিতা [সাবাহী] হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখতাম। এমনকি আমি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখতে পেতাম। [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সালামের সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আল-বাহকর রায়েক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, কোনো কোনো ইমামের মতে ছোট মসজিদে এক সালাম এবং বড় মসজিদে দুই সালাম আবশ্যিক।

‘বয়লুল মাজহদ’ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা ইবনে জা'ফরের মতে তিন সালাম ওয়াজিব। কারণ উল্লিখিত আমের ইবনে সাদের হাদীসে দুই সালামের কথা উল্লেখ থাকলেও এ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে সম্মুখের দিকেও এক সালামের কথা উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম মালেক ও আওয়ামী (র.) বলেন, শুধু সম্মুখের দিকে এক সালামই ওয়াজিব। এরূপ মতের সমর্থক হযরত ইবনে ওমর, আনাস, সালামা ইবনে আকওয়া, আয়েশা, হাসান বসরী, ইবনে শিরীন ও ওমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রমুখ ইমামগণ তাঁরা সকলেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসকে এবং হযরত সাদ বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। হযরত সাদ (রা.)ও বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ নামাজে সালাম ফিরাতে একই সালামের দ্বারা।

কিন্তু জমহুর আলেমগণ, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে যুবারক প্রমুখও রয়েছে- তারা বলেন, দুই সালামই শরিয়তসম্মত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক, আলী, ইবনে

মাসউদ, আখার, নাফে, আতা, আলকামা ও শা'বী প্রমুখ মনীষীগণও নামাজে দুই সালাম করতেন বলে ইবনে মনযির বর্ণনা করেছেন। দু' সালামের অনুকূলে উক্ত আমাদের ইবনে সা'দের হাদীস তো রয়েছে, উপরন্তু নিম্নলিখিত হাদীসমূহও এর প্রমাণ; যেমন-

১. ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ডানদিকে এবং বামদিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।
২. হযরত আলকামা ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পাড়ছি, তিনি ডানদিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি এবং বামদিকে সালাম ফিরাতেন বলতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি - [আবু দাউদ]।
৩. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আইনী (র.) বুখারীর শারাহতে বিশজন সাহাবী হতে দুই সালামের সমর্থনে হাদীস উল্লেখ করেছেন।
জমহরের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত দলিলের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করা হয়েছে-
১. আল বাহরক রায়েক গ্রন্থে যে ছোট মসজিদে এক সালাম এবং বড় মসজিদে দুই সালামের কথা কারো কারো অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা একটা ভ্রান্ত অভিমত। কারণ এটা যুক্তি ও কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত।
২. আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা যে বলেছেন, এক সালামের হাদীস এবং দুই সালামের হাদীস পৃথক পৃথক আছে। সবগুলোকে এক সাথে করে তিন সালাম বলা হবে। বয়লুল মাজহিদ গ্রন্থে এ ধারণাকেও ভ্রান্ত ধারণা বলা হয়েছে। কারণ এক সালামের বর্ণনা ও দুই সালামের বর্ণনায় বৈপরীত্য থাকতে তার সমাধানের জন্য তিন সালাম করা একটা ভ্রান্ত ধারণা বৈ কিছুই নয়। কারণ এ তিন সালামের প্রমাণ কোনো সাহাবী তাবয়ীনের নিকট হতে পাওয়া যায়নি।
৩. ইমাম মালেক ও আওয়ামী (র.)-এর দলিলে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হবে إِنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا وَجَهْرًا; অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক সালামকে জোরে বলতেন আর অপর সালাম আস্তে বলতেন। কেননা এক সালাম জোরে বলাতে মুসল্লিরা বুঝতে সক্ষম হতো যে, নামাজ শেষ হয়ে গেছে।
৪. আর সমুখ দিকে এক সালাম বলতেন হাদীসের জবাব হলো, রাসূল ﷺ কেবলার দিকে মুখ রেখে সালামের বাক্য বলা শুরু করতেন।

উল্লিখিত দলিল প্রমাণ দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো যে, নামাজে দুই সালামই আবশ্যিক।

وَعَنْ ۸۸۳ سَمْرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৮৮৩. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো নামাজ পাড়া শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِكْمَةُ اِقْبَالِ الْاِِمَامِ اِلَى الْمَقْبَدِ ইমাম মুক্তাদির দিকে মুখ করে বসার হিকমত : ইবনে হাজার আসাকালানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নামাজের সালাম শেষে কোনো কোনো সময় তার ডান পার্শ্বের মুক্তাদিগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়ে বসতেন, আর বাম পার্শ্বকে কেবলার দিকে রাখতেন, বিশেষ করে ফজর ও আসর নামাজ শেষে। আর এরূপ করে বসার হেকমত হলো-

১. সালাম ফিরানোর পর যদি ইমাম কেবলামুখী হয়ে পূর্বের অবস্থায় বসে থাকে তবে এ সময় নামাজের উদ্দেশ্যে আগত মুসল্লিগণ মনে করবে যে জামাত শেষ হয়নি, ফলে সে জামাতে শরিক হওয়ার চেষ্টা করবে। কোনো ব্যক্তি যাতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় পতিত না হয় এ জন্য তিনি নামাজ শেষে মুক্তাদিগণের দিকে মুখ করে বসতেন।
২. কারো মতে, ফজরের নামাজের পর মহানবী ﷺ মুক্তাদিগণের দিকে মুখ করে বসতেন এ উদ্দেশ্যে যে, রাতের বেলায় কে কিস্তাবে কাটিয়েছেন তা তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কেউ কোনো রপ্ন দেখে থাকলে এর ব্যাখ্যা করতেন এবং নিজে

কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে তাও বর্ণনা করতেন। কাউকেও কোনো অভিযানে প্রেরণ করতে হলে ঐ বৈঠকেই সিদ্ধান্ত দিতেন এবং তার কাজ ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিতেন। আর আসরের নামাজের পর বসতেন সারাদিনের কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য। অতএব আমাদের উচিত উল্লিখিত হাদীসের উপর যথাযথ আমল করা।

وَعَنْ أَنَسٍ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنِ يَمِينِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজ পড়া শেষ করে ডান দিকে মুখ করে বসতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ফরজ নামাজ আদায় করার পর মহানবী ﷺ আর কেবলমুখী হয়ে বসে থাকতেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গেই ডান দিকে আবার কখনও কখনও বাম দিকে ফিরে বসতেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যে নামাজের ফরজের পর সন্নত নেই, মহানবী ﷺ সে নামাজের পর ঘুরে বসতেন। অবশ্য যে নামাজের মধ্যে পরে সন্নত আছে এর জন্য দাঁড়ালেই অবস্থা ও দিকের পরিবর্তন হয়ে যায়।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رَض) قَالَ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِبَلِّطَانٍ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার নামাজের কিছু অংশ শয়তানের জন্য নির্ধারণ করে না রাখে, এই ভেবে যে, এটাই তার জন্য অবধারিত যে, সে ডানদিক ছাড়া আর অন্য কোনো দিকে ফিরবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অনেকবারই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজ কিভাবে শয়তানের জন্য হবে : এখানে প্রশ্ন হয় যে, নামাজের কিছু অংশ আবার শয়তানের জন্য কিভাবে হতে পারে? এর জবাবে বলা হয় যে, যদি কেউ এই ধারণা বা বিশ্বাস রাখে যে, শুধু ডান দিকেই ফিরে বসতে হবে, তখন এটা শয়তানের অংশ হবে। কেননা এটা সন্নতের খেলাফ।

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, যদি ডান দিকের কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো প্রয়োজন থাকত তখন তিনি ডান দিকে ফিরে বসতেন। এমনিভাবে যদি বাম দিকে হযুরের কোনো প্রয়োজন থাকত তখন বাম দিকেই ঘুরে বসতেন। অতএব শুধু ডান দিকেই নির্ধারণ করে নিলে পক্ষান্তরে শয়তানকেই খুশি করানো হলো। এটা করা ঠিক নয়।

وَعَنْ الْبَرَاءِ (رَض) قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ رَبِّ فِينِي عَذَابُكَ يَوْمَ تَبَعْتُ أَوْ تَجَمَّعُ عِبَادُكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮৬. অনুবাদ : হযরত বারী ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে নামাজ পড়তাম, তাঁর ডানদিকে বসতে ভালোবাসতাম [এই আসায় যে, নামাজ শেষে] তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসবেন। হযরত বারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার শান্তি হতে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে (পুনরায়) উঠাবে অথবা তোমার বান্দাদেরকে একত্রিত করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَيْضُ وَكَانَ سَمُوعُ بْنُ جَبَلٍ يَتْلُو فِي صَلَاتِهِ عَنْ ٨٨٧ عَنْ ٨٨٧ أَمَّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَمْنَ وَتَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرَّجَالُ - (رواه البخاري وسندك حديث جابر بن سمرة في باب الصلح إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)

৮৮৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে মহিলাগণ ফরাজ নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই উঠে যেতেন অর্থাৎ উঠে চলে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল পুরুষ নামাজি কিছু সময় বসে থাকতেন আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়াতেন, লোকজনও উঠে দাঁড়াত এবং প্রস্থান করত। -[বুখারী] জাবের ইবনে সামুরার হাদীস ইনশা'আল্লাহ الصلح إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى এ শীঘ্রই বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা এই যে, মেয়েলোকের চলাচল এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা পুরুষদের জন্য মোস্তাহাব। আর নামাজ শেষে যতক্ষণ না ইমাম দাঁড়াবে ততক্ষণ মুক্তাদিদেরও বসে থাকা মোস্তাহাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হতে পারে, ইমাম কোনো জরুরি হুকুম কিংবা অতি প্রয়োজনীয় মাসআলা বর্ণনা করতে পারে।

الدَّفْعُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٨٨ عَنْ ٨٨٨ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ أَخَذَ بِيَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَأَجِبُكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتَ وَأَنَا أَجِبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَدَعُ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعْيَنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ - (رواه أحمد وأبو داود والسنائي إلا أن أبا داود لم يذكر قال مُعَاذٌ وَأَنَا أَجِبُكَ)

৮৮৮. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসি। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে তুমি প্রত্যেক নামাজের শেষে এই কথাগুলো (দোয়া) বলা ত্যাগ করো না। رَبِّ أَعْيَنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণে থাকতে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তোমার ইবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সাহায্য করো"।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : আল্লাহর ইবাদতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) মৌখিক, (খ) আন্তরিক ও (গ) আনুষ্ঠানিক। হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটির মধ্যে তিন প্রকার ইবাদতেরই উল্লেখ রয়েছে। এ তিন প্রকার ইবাদতই সম্পাদন করা

আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আর এ জন্যই আল্লাহর রাসূল প্রতি নামাজের পরে উক্ত সোয়াটি পড়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আর তা হলো—عَلَىٰ وَرَكَرَكَ ১৬০ ধারা মৌখিক ইবাদত, سَكَرَكَ ১৬১ ধারা আন্তরিক ইবাদত এবং عِبَادَتِكَ ১৬২ ধারা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ۸۸۹ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ خَدَّيْهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ خَدَّيْهِ الْأَيْسَرِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَتَمَّ يَذْكُرُ التِّرْمِذِيُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ خَدَّيْهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ)

৮৮৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন, আর বলতেন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি' যাতে তাঁর ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত এবং বাম দিকেও [এমনভাবে] সালাম ফিরাতেন আর বলতেন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি' যাতে তাঁর বাম গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত।—[আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী] কিন্তু তিরমিযী "যাতে তার মুখের শুভ্রতা দেখা যেত" এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। ইবনে মাজাহ ও হাদীসটি সাহাবী হযরত আযার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ۸۹۰ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ كَانَ أَكْثَرَ أَنْصَرَاكِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَلَوَاتِهِ إِلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَىٰ حَجْرَتِهِ - (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

৮৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ শেষে অধিকাংশ সময়ই রাসূল ﷺ-এর নামাজ হতে বাইরে আগমন বাম দিকে তার ঘরের দিকেই হতো।—[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীসটিতে সালাম ফিরানো সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান আলোচিত হয়েছে যথা— (ক) নামাজ শেষে দুই সালাম ফিরাতে হবে। (খ) সালাম নিজের ডানদিকে ও বামদিকে ফিরাতে হবে। (গ) সালাম ফিরানোর সময় মুখমণ্ডল ও ঘাড় ডানে এবং বামে ডালভাবে ফিরাতে হবে। তবে বক্ষ কিবলার দিক হতে ফিরানো যাবে না। (ঘ) সালামের বাক্য হবে—السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَعَنْ ۸۹۱ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنِ الْمُغْبِيرَةِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّيَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّىٰ يَتَحَوَّلَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ لَمْ يَذْكُرِ الْمُغْبِيرَةَ)

৮৯১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা খোরাসানী (র.) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরজ নামাজ আদায় করেছেন সেখানে যেন অন্য নামাজ [সুন্নত, নফল ইত্যাদি] না পড়ে, যে পর্যন্ত না সরে দাঁড়ান। [আবু দাউদ] কিন্তু আবু দাউদ বলেছেন, মুগীরার সাথে আ'তা খোরাসানীর সাক্ষাৎ হয়নি। [কাজেই হাদীসটি মুন্কাতি' বা বিষ্টিন্ন সনদে বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : কোনো রকম সমস্যা বা অসুবিধা না থাকলে, ফরজ নামাজ পড়ার পরে একটু স্থান পরিবর্তন করে সুন্নত বা নফল নামাজ পড়া ইমাম বা মুক্তাদি সকলের জন্যই মোস্তাহাব। কারণ অন্য কোনো নামাজ যেন ফরজের মতো গুরুত্ববহ বৃথা না যায়, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ নামাজ পড়া মাত্রই তার স্থান পরিবর্তন করে নিতেন এবং একটু স্থান পরিবর্তন করে নামাজ পড়তেন।

কারো মতে স্থান পরিবর্তনের কারণ এই যে, আদম সন্তান পৃথিবীর যে যে স্থানে সিজদা করবে কিয়ামতের দিন সে সব স্থান ঐ ব্যক্তির পক্ষে সাফা প্রদান করবে।

আবার কারও মতে এর কারণ এই যে, জামাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো লোক বিলম্বে এসে যেন ধোঁকায় না পড়ে যে, জামাত শেষ হয়নি।

عَنْ ٨٩٢ أَنَسٍ (رَض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ أَنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৮৯২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ﷺ তাদেরকে নামাজের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন এবং নামাজ থেকে তাঁর বাইরে গমনের পূর্বে তাদেরকে বাইরে গমন করতে নিষেধ করেছেন। [আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : নামাজের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের না হয়ে সেখানে বসে কিছু দেওয়া-কালাম পড়ার উদ্দেশ্যেই হযরত রাসূলে করীম ﷺ এ নিষেধ করেছেন। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাদেরকে কিছু বলারও সম্ভাবনা থাকত। তাই তাদেরকে তাঁর আগে বলে যেতে নিষেধ করেছেন।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٩٣ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رَض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلْكَ الثُّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ وَأَسْتَلْكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْتَلْكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَوَسَاتًا صَادِقًا وَأَسْتَلْكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ)

৮৯৩. অনুবাদ : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাজে [তাশাহহুদের পরে] বলতেন- অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংপথে চলার সুদৃঢ় ইচ্ছা প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা করতে এবং তোমার বন্দেগি উত্তমরূপে করতে শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট আরও প্রার্থনা করছি একটি নির্দোষ অন্তর এবং একটি সত্যবাদী রসনা। তোমার কাছে আরও প্রার্থনা করি তা যা তুমি ভাল বলে জান এবং মুক্তি চাই তা হতে, যা মন্দ বলে জান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই [এই সমস্ত গুনাহের জন্য] যেগুলো তুমি জান [অথচ আমি জানি না]।” - [নাসায়ী। আহমদও এর অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٨٩٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَوَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُدِ
أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى
هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৯৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাজের শেষে
তাশাহহুদের পরে বলতেন- অর্থাৎ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাণী
আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হযরত
মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٨٩٤ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে 'الْبَدْنَى' অর্থ- এমন পথ বা রাস্তা যা কাজের দ্বারা কিংবা আচার-ব্যবহার
দ্বারা স্থাপন করা হয় এবং পরবর্তী লোকেরা উক্ত পথ নির্দেশকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে পথে অনুগমন করে। বক্তৃত
রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উত্তম পথ নির্দেশক দ্বিতীয় কেউ নেই। স্বয়ং আল্লাহর বাণী-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

وَعَنْ ٨٩٥ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي
الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَسِيلُ
إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
নামাজের মধ্যে সম্মুখের দিকে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর
ডান দিকে সামান্য মোড় দিতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٨٩٥ إِخْتِلَافُ الْأَيْمَةِ فِي التَّسْلِيمِ
দিকে এক সালাম ফিরানোর মত ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে অপর সকল ইমামগণ এর অর্থ করেন, মহানবী ﷺ এক সালাম শব্দ
করে বলতেন এবং অপর সালাম তুলনামূলক আঙুলে নিচু করে বলতেন।

অথবা সালামের শব্দ সম্মুখের দিক হতে শুরু করে ডানে এবং বামে ফিরাতেন। অন্যথা ডানে-বামে দুই দিকে সালাম
ফিরানোর হাদীসসমূহের কোনো অর্থই থাকে না।

অথবা এটাও হতে পারে যে, ছজুর ﷺ কখনো কখনো শুধু এক সালামই ফিরিয়েছেন।

وَعَنْ ٨٩٦ سَمْرَةَ (رض) قَالَ أَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُرَدَّ عَلَى الْإِمَامِ
وَنَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৮৯৬. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে
ইমামের সালামের জবাব দিতে, পরস্পরকে ভালবাসতে
এবং একে অপরকে সালাম করতে আদেশ করেছেন।
-[আবু দাউদ]

بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের শেষের দোয়া

মহানবী ﷺ নামাজের পর কিছু সময় বিভিন্ন দোয়া-কালাম পড়তেন এবং উম্মতকেও পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। তবে যে সব ফরজ নামাজের পর সুন্নত-নফল নামাজ আছে তাতে সংশ্লিষ্ট আর যে সকল নামাজের পর সুন্নত-নফল নামাজ নেই তাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দোয়া-কালাম পড়তেন। নামাজ শেষে অন্য নামাজের নামাজে অসুবিধা না হলে উচ্চৈঃস্বরেও জিকর বা দোয়া করা জায়েজ আছে। আলোচ্য অধ্যায়ে নামাজের পর যে সব দোয়া পাঠ করা হয় সে সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আলোচিত হচ্ছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ^{٨٩٧}ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ بِالْتَكْبِيرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের পরিসমাপ্তি তাকবীর দ্বারা বুঝতাম।

—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْلَافُ الْأَيَّامِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ নামাজের শেষে উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা প্রসঙ্গে ইমামদের মতভেদ : নামাজাভে উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, আদ্বামা আইনী ও ইমাম নব্বী উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো সালাফের মতে এবং পরবর্তীকালের অনেক ইমাম, যেমন ইবনে হাযম প্রমুখ বলেন, নামাজের পরে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা বা জিকর করা মোত্তাহাব। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল। আদ্বামা ইবনে বাতাল বলেন, চার ইমামের মতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা মোত্তাহাব নয়। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বুখারী শরীফের অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় লোকেরা যখন ফরজ নামাজ শেষ করত তখন উচ্চৈঃস্বরে জিকর-আয়কার ও দোয়া-কালাম পাঠ করত। পক্ষান্তরে হাদীসটির ভাবার্থ হতে বুঝা যায় যে, পূর্বে হতো, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সময় হতো না। কলে ছদ্ম্বরের একটি সুন্নত কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নামাজের পরে বিশেষ নিয়মে এ জাতীয় মোত্তাহাব পর্যায়ের কাজ বা দোয়া-কালাম মহানবী ﷺ সারা জীবন নিয়মিতভাবে করেননি। তাই সাহাবীগণ বুঝে নিয়েছেন যে, এভাবে পাঠ করা অত্যাবশ্যক নয়। আর হযুর ﷺ ও এ আশংকায় তা ত্যাগ করেছেন, যেন লোকেরা তা বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করতে না থাকে।

جَوَابُ لَيْمٍ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, (১) দোয়া-কালামের প্রশিক্ষণের জন্য রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে জোরে জোরে পাঠ করতেন। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন যে, এটা রাসূল ﷺ-এর সার্বজনিক কার্য ছিল না। (২) অথবা এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় ছিল আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহের। ঐ দিনগুলোতে মিনা বা অন্য কোনো স্থানে নামাজ শেষে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা হতো। (৩) অথবা এটাও হতে পারে যে, তাকবীর অর্থে দোয়া-কালামকেই বুঝানো হয়েছে, আর দোয়া-কালামের মধ্যে কখনও দুই একবার আদ্বাহ আকবার বলা হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন ছোট ছিলেন তাই শিখনের সারিতে থেকে অথবা বাইরে থেকে শুধু আদ্বাহ আকবার ধ্বনিই শুনেও শেয়েছিলেন। মুলাত অন্য নামাজের ক্ষতি না হলে কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে দোয়া-কালাম পড়া জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٨٩٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৯৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন, তখন এ দোয়া পাঠ পরিমাণ সময়ের বেশি বসে থাকতেন না- অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি নিজেই শান্তিময়, আর তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপশালী ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকতময়”-[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٩٩ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৯৯. অনুবাদ : হযরত ছাব্বান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তেগফার করতেন, অতঃপর বলতেন- অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি নিজেই শান্তিময় এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপশালী! হে সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকতময়।”-[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

العِدْتِ ھাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষে তিনবার اللَّهُ اسْتَغْفِرُ বলতেন অথবা এটা বলতেন اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ তাই আমাদেরও এসব দোয়া-কালাম পড়া একান্ত আবশ্যিক।

وَعَنْ ٩٠٠ الْمُعَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) أَنَّ التَّيْسِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯০০. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে বলতেন- অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, যার কোনো শরিক নেই তারই সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা, তিনিই সকল কিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ কর, কেউ তা দিতে পারে না। কোনো অর্থশালীকে তার সম্পদ তোমার শান্তি হতে [রক্ষা করার মতো] কোনো উপকার করতে পারে না।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَكْوِينُ ھাদীসের বিশ্লেষণ : صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ -এর সিফাত, وَحْدَهُ পদটি حَالٌ হেতু মানসূব করিয়া ھাদীসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। وَحْدَهُ -এর সাথে. شَرِيكَ -এর সাথে. مَانِعٌ -এর সাথে. مُعْطَى -এর সাথে. مُعْطَى পদগুলো ইসমে জেন্স এবং ক্রিয়া এবং لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -এর সাথে. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ھাদীসের মত।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التَّرِيمِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ হতে সালাম ফিরাতেন, তখন উচ্চস্বরে বলতেন— অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর অধিক ক্ষমতাবান। কারো কোনো উপায় নেই, শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমরা কারও ইবাদত করি না, একমাত্র তাঁরই বন্দেগি করি। যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। একনিষ্ঠভাবে দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি— যদিও কাফেরগণ অশ্রিয় মনে করে। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التَّرِيمِ بِالرُّبُوعِ পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু বকর। হযরত ﷺ তাঁর নানার নামানুসারে এ নামকরণ করেন। এটা ছাড়াও তাঁকে আবু যুবাইব বলা হতো। তাঁর পিতার নাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম। মাতার নাম আসমা বিনতে আবি বকর। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন।
২. জন্ম : তিনি হিজরি প্রথম সনে হযরত যুবাইরের ওরসে এবং হযরত আসমার উদরে কোবা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কার মুহাজিরদের মাঝে তিনি প্রথম সন্তান, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কানে আযান সনে এবং রাসূল ﷺ তাহনীক করেন।
৩. রাসূল ﷺ-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক : প্রথমত তাঁর বংশধারার সাথে রাসূল ﷺ-এর বংশধারা কুসাই পর্যন্ত গিয়ে মিলে যায়। অপর দিকে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভাই আওয়াম-এর পুত্রের ছেলে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর। অর্থাৎ হযরত খাদীজার ভাতৃপুত্রের ঘরের নাতি। আবার হযরত আয়েশার বোন-পুত্র হওয়ার দিক হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভায়রার ছেলে।
৪. দৈহিক গঠন : তাঁর গায়ের রং শ্যামল ছিল। আরবদের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। তাঁর দেহে পশম ছিল খুবই কম। কোনো রকম দাঁড়ি পৌফ তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল না।
৫. ইবাদতে মনোযোগ : সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই ইবাদতে মনোযোগী ছিলেন। তবে কেউ কেউ মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট সাধনা করতেন। তাঁদের মাঝে তিনি একজন। তিনি অত্যধিক রোজা রাখাতেন, রাতে বেশি বেশি জাগতেন। এমনকি তিনি রাতে রুকু সেজদাতে এত মনোনিবেশ করতেন যে, এতে রাত শেষ হয়ে যেত।
৬. ইলমে হাদীসে অবদান : তিনি হুযুরের ইন্তেকালের সময় মাত্র দশ বৎসরের শিশু ছিলেন। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম। তিনি মোট ৩০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর নিকট হতে ৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৭. খেলাফতের দায়িত্ব পালন : হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ছেলে ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরিতে তাঁর হাতে হিজাজ, ইয়ামন, ইরাক, খোরাসান, সিরিয়ার কিয়দংশ খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন।
৮. বায়তুল্লাহর মেয়ামত ও হজ পালন : রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট বায়তুল্লাহর মেয়ামত সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর খেলাফতের সময় বায়তুল্লাহকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বেনার উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষকে নিয়ে আটবার হজ কার্য সমাধা করেন।
৯. শাহাদাত বরণ : তাঁর খেলাফতের আমলে ৭২ হিজরিতে জিলহজ মাসের প্রথম রাতে মক্কা অবরোধ করা হয়। ইতাবসরে তাঁর প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপিত হয় এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন; মৃত দেহকে শূলে লটকানো হয় এবং মাথা কেটে খোরাসনে নিয়া যাওয়া হয়। এভাবে এক মহান নেতার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

وَعَنْهُ سَعْدِ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ
بِنَبِيِّهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِمْ دُبْرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯০২. অনুবাদ : হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ সন্তানদেরকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের শেষে এ দোয়াগুলো পাঠ করে আত্মাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন- অর্থাৎ “হে আত্মাহ! আমি তোমার কাছে ভীকৃত হতে আশ্রয় কামনা করছি। আরও আশ্রয় চাচ্ছি কুপণতা হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জরাজীর্ণ বার্থকা হতে এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি পার্থিব বিপর্যয় ও কবরের শাস্তি হতে। -[বুখারী]

وَعَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ إِنْ
فُقِرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ آتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالُوا قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْذَّرَجَاتِ
الْعُلَى وَالْتَعْنِيمِ الْمَقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ
قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّيُ وَصَوْمُونَ كَمَا
نُصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَنُعْتِقُونَ
وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا
أَعَلِمْتُمْ شَيْئًا تَذَرِكُونَ بِهِ مِنْ سَبَقِكُمْ
وَتَسْبِقُونَ بِهِ مِنْ بَعْدِكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ
أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا
صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
تَسْبِحُونَ وَتُكَيِّمُونَ وَتَحْمِدُونَ دُبْرَ كُلِّ
صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ
فَرَجَعَ فُقِرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا
فَعَلْنَا فَعَمَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৯০৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে আগমন করে বললেন, [হিয়া রাসূলুল্লাহ] সম্পদশালী লোকেরাই তো উচ্চ মর্যাদাসমূহ ও স্থায়ী কল্যাণসমূহ নিয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ বললেন, এটা কেমন কথা? তখন তারা বললেন, তারা আমাদের মতো নামাজ পড়েন, [আমাদের মতো] রোজা রাখেন, কিন্তু তাঁরা দান সদকা করেন, আর আমরা দান সদকা করতে পারি না। তাঁরা দাস-দাসী মুক্ত করেন, আর আমরা [সামর্থ্যের অভাবে] দাস-দাসী মুক্ত করতে সক্ষম হই না। তখন এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দেব না, যার বদৌলতে তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের সমমর্যাদায় পৌছবে যারা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছিল [অথবা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে] এবং যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের পরবর্তীদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবে এবং তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম আর কেউ হতে পারবে না? তবে হ্যাঁ যারা তোমাদের মতো কাজ করবে কেবলমাত্র তারা হ তোমাদের মতো মর্যাদা লাভ করবে। তখন তারা বললেন, জী হ্যাঁ, হে আত্মাহর রাসূল [আমাদেরকে তা বলে দিন]। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাজের পরে তেত্রিশ বার করে ‘সুবহানাল্লাহ, আত্মাহ আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ’ পাঠ করবে। [অধস্তন রাবী] আবু সালেহ বলেন, অতঃপর আর একদিন দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ

ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ
إِلَىٰ آخِرِهِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِي
رِوَايَةٍ لِلْبَخَارِيِّ

تَسْبِيحُونَ فَنِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا
وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتَكْبِيرُونَ عَشْرًا بَدَلًا
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ .

এর সমীপে এসে বললেন, রাসূল! আমাদের ধনী ডাইগণও এটা শুনেছেন এবং আমরা যেক্রপ করি তারাও সেরূপ করতে আরম্ভ করেছেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা আল্লাহর বিরাট দান, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন। [অর্থাৎ এতে তোমাদের হিংসা করার কিছুই নেই।] -[বুখারী, মুসলিম]

রাবী আবু সালেহ হতে পরবর্তী বাক্যগুলো মুসলিম ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি; বুখারীর এক বর্ণনায় তেত্রিশ সংখ্যার পরিবর্তে একরূপ রয়েছে যে, তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর দশবার সুবহানালাহর, দশবার আল-হামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহ আকবার বলবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تُذَكِّرُونَ بِهِ مَنْ سَنِّكُم -এর অর্থ : উক্ত হাদীসসাংশের অর্থ হলো, তোমাদের পূর্বে এ উচ্চতের যে সমস্ত মুসলমানরা অতীত হয়ে গেছে, তোমরা তাদের মর্যাদায় পৌছে যাবে।

অথবা পূর্বে যতসব উচ্চত অতীত হয়ে গেছে, তোমরা তাদের সমমর্যাদায় পৌছে যাবে। আর ভবিষ্যতে যত মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আগমন করবে অথবা তোমাদের যুগের যে সমস্ত লোক তোমাদের পরে আসবে তাদের কেউই তোমাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

وَعَنْ أَبِي
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعْقِبَاتٌ لَا يَخِيبُ
قَائِلُهُنَّ أَوْ قَاعِلُهُنَّ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ
مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ
وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً .
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯০৪. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে বলার মতো কতিপয় কথা আছে। সেগুলো যারা বলবে [রাবীর সন্দেহ] অথবা কতিপয় কাজ আছে, সেগুলো যারা করবে তারা কখনও বিফল মনোরথ হবে না- আর তা হলো- (১) তেত্রিশবার সুবহানালাহ, (২) তেত্রিশবার 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং (৩) তেত্রিশবার 'আল্লাহ আকবার' বলে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : নামাজের পরে উল্লিখিত জিকিরগুলোকে বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে, যা নিম্নরূপ- (১) مَعْقِبَاتٌ শব্দের অর্থ একের পর এক আসা। আর উল্লিখিত শব্দগুলো যথাক্রমে একটির পর আরেকটি উচ্চারণ করা হয়। (২) উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর উচ্চারণকারী হুওয়াব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (৩) একই শব্দকে পর পর বহুবার উচ্চারণ করা হয় বিধায় مَوْجِبَاتٌ বলা হয়। (৪) অথবা, مَعْقِبَاتٌ অর্থ- রহিতকারী। যেহেতু এ শব্দগুলো ওনাহসমূহ রহিতকারী তাই তাকে مَعْقِبَاتٌ বলা হয়। যেমনি আল্লাহর ডাযায় لَمَّا مَعَّبَ لِعَنْبِيٍّ অর্থাৎ অর্থাৎ نَائِبٍ لِعَنْبِيٍّ অথবা (৫) অথবা উক্ত জিকিরগুলো নামাজের পর পর পড়া হয় তাই একে مَعْقِبَاتٌ বলা হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَعَّ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯০৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে তেত্রিশবার সুবহানাত্বাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং তেত্রিশবার আল্লাহ আকবার বলবে, আর এতে মোট নিরানব্বই বার হবে এবং একশত পূর্ণ হওয়ার জন্য বলবে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহ্ ল মুলুকু ওয়া লাহ্ ল হামদু ওয়া হুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।” অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই জন্য বিশ্বের সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান-তার [বিগত] অপরাধ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা [আধিক্যের দিক দিয়ে] সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়। -[মুসলিম]

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ أَبِي أَسَمَةَ (رض) قَالَ قَبِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوَابَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَدُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوباتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯০৬. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দোয়া সর্বাঙ্গে কবুল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের দোয়া এবং ফরজ নামাজসমূহের পরের দোয়া। -[তিরমিযী]

وَعَنْ عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمَعْوَدَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَسَى فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

৯০৭. অনুবাদ : হযরত উক্বা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাজের পরে ‘মুয়াক্বাযাত’ অর্থাৎ اَعُوذُ সূত্রাঘ্য পাঠ করতে আদেশ করেছেন। -[আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী। এ ছাড়াও বায়হাকী ‘দাওয়াতুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : مُحَمَّدَاتٌ বলতে সূরা নাস ও ফালাককে বুঝানো হয়েছে। কেননা مُعَوِّذٌ অর্থ এমন জিনিস, যার দ্বারা কোনো কিছুর মন্দ প্রভাব হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, এক ইহুদি কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য যাদু-টোনা করেছিল, তা হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত সূরা দু’টি নাজিল করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তা পাঠ করে স্বীয় শরীরে হুঁ দেওয়ার পর আরোগ্য লাভ করেন। বুদ্ধগণনে দীনের আমলের কিতাবে উল্লেখ আছে, নামাজের পর উক্ত সূরা দু’টি পড়ে স্বীয় শরীরে দম করলে যাদু-টোনার অনিশ্কারিতা হতে নিরাপদে থাকা যায়। আর যাদু-টোনা করলেও তা ক্রিয়াশীল হয় না। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সূরা ক্বুল হুওয়াল্লাহ এবং নাস, ফালাক তিন তিনবার করে পড়ে নিজের উভয় হাতে ফুক দিতেন এবং মাথা হাতে পা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব হাত দিয়ে মুছতেন।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَإِنَّ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أُرْبَعَةَ مِنْ وُلْدٍ إِسْمَاعِيلَ وَإِنَّ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَيَّ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯০৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যারা ফজরের নামাজের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় [নামাজের স্থানে বসে] আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি ইসমাইল বংশীয় চারজন লোককে আখাদ করা হতেও উত্তম মনে করি। অনুরূপভাবে যারা আসরের নামাজের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বসে আল্লাহকে স্মরণ করে, আমি তাদের সাথে যোগদান করাকে চারজন গোলাম আজাদ করার চেয়েও প্রিয় মনে করি।—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইসমাইল বংশের গোলাম আজাদ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, 'ইসমাইলের বংশধর' দ্বারা কুরাইশদেরকে বৃথানো হয়েছে। এখানে এ প্রশ্নটি বড় জটিলভাবে উত্থাপিত হয় যে, কুরাইশরা কারো গোলাম হওয়ার প্রশ্নই তো উঠে না, বরং আরবরা যখনই কোথাও কয়েদ হয়েছে তখন গোলামে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আজাদ হয়ে গেছে। সুতরাং ইসমাইলের বংশধরের চারজন লোক আজাদ করার চেয়ে উত্তম, এ কথাটি কিভাবে সহীহ হলো? এর জবাবে ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এখানে গোলাম আজাদ করা কথাটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং 'মেনে নেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তারা গোলামে পরিণত হয়েছিল, তবে তারা বংশীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে উত্তম গোলাম হয়ে থাকবে। আর উত্তম গোলাম আজাদ করাও উত্তম কাজ। মূলত রাসূল ﷺ এ উক্তি দ্বারা উক্ত সময়ঘরের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন হয় যে, চারজন আজাদ করার কথা বলা হলো কেন? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আন্বামা মোত্তা আলী কারী (র.) বলেন, উত্তমতা চারটি বিষয়ের সাথে জড়িত— (১) আল্লাহর জিকির করা, (২) জিকিরের উদ্দেশ্যে বসা, (৩) জিকিরের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ও (৪) সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরের সাথে অবস্থান করা। আর এ জন্যই চারজন গোলাম আজাদ করার কথা বলা হয়েছে।

ইবনুল মালিক (র.) বলেন, বিষয় চারটি হলো— (১) জিকিরের জন্য বসা, (২) এমন সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করা যারা জিকির করে, (৩) ফজর বা আসরের পর হতে বসে থাকা, (৪) সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাধারে বসে থাকা।

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَامَةً تَامَةً تَامَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯০৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, অতঃপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর [অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে] দুই রাকাত নফল পড়ে, তার জন্য এক হজ ও এক উমরার সমান ছুঁয়াব রয়েছে। রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, পূর্ণ এক হজ ও এক উমরার, পূর্ণ এক হজ ও এক উমরার, পূর্ণ এক হজ ও এক উমরার।—[তিরমিথী]

মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, ফরজ ও সুন্নত নামাজের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ করা উচিত। প্রভেদ সৃষ্টির কয়েকটি পন্থা রয়েছে। যেমন- (ক) ফরজ নামাজের পর স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র সুন্নত পড়া। (খ) অথবা কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকা। (গ) অথবা কথাবার্তা বলা। (ঘ) অথবা সালামের পর দোয়া-কালাম পাঠ করা।

وَعَنْ ۱۱۱. وَرَدَّ بَيْنَ ثَابِتٍ (رض) قَالَ
أَمَرْنَا أَنْ تُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا
وَتَلْتَمِثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَتَلْتَمِثِينَ وَنُكَبِّرُ
أَرْبَعًا وَتَلْتَمِثِينَ فَاتَى رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ
مِنَ الْأَنْصَارِ فَيَقْبِلُ لَهُ أَمْرُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا
وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَتَابِعِهِ نَعَمْ قَالَ
فَأَجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ وَأَجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا
أَصْبَحَ غَدًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفْعَلُوا . (رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالتَّسَانِئُ وَالذَّارِمِيُّ)

৯১১. অনুবাদ : হযরত য়ায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ হতে আদেশ করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক নামাজের পরে তেত্রিশবার সুবহানালাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আলাহু আকবার পাঠ করার জন্য। আনসারদের এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তাকে বলা হলো, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পরে এতবার তাসবীহ পাঠ করতে আদেশ করেছিলেন? আনসারী স্বপ্নে [স্বপ্নের লোকটিকে অর্থাৎ ফেরেশতাকে] বললেন, হ্যাঁ। স্বপ্নের লোকটি বলল, তোমরা ঐ তিনটি বাক্যের সংখ্যাকে পঁচিশ পঁচিশ করে নির্ধারণ করবে, আর এতে [সমসংখ্যকবার] 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করবে [তাতে মোট একশত বার হবে]। যখন সকাল হলো, খুব ভোরেই তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং স্বপ্নের ঘটনা অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাই কর।-[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত স্বপ্নের মধ্যে আনসারী ব্যক্তির সাথে যিনি কথাপকথন করেছিলেন তিনি ছিলেন ফেরেশতা। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করার সাথে সাথেই তিনি সে অনুযায়ী আমল করতে অনুমতি প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ۱۱২. عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَعْوَادِ هَذَا الْمِنْبَرِ
يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ
صَلَاةٍ لَمْ يَمْتَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا
الْمَوْتَ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ
أَمَّنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ
دَوْرَاتِ حَوْلِهِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ
الْإِيمَانِ وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

৯১২. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এই মিন্বারের কাঠের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে মুক্তা ব্যতীত আর কিছুই বাধা দিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণের সময় এটা [আয়াতুল কুরসী] পাঠ করে, আল্লাহ তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং তার আশে পাশে যতগুলো ঘর আছে, নিরাপদ রাখেন।-[বায়হাকী ও আবুল ইমানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثِ هَادِيَسەر ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ফলে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, মুত্য়া জান্নাতে প্রবেশে বাধাদানকারী, অথচ কোনো কোনো মুত্য়া জান্নাতে প্রবেশের অসিলা হয়। সুতরাং উক্ত হাদীসটির উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে বলা যায়- হাদীসের **رَأَى** কৌনো ঘারা ঈমানবিহীন মুত্য়া উদ্দেশ্য।

অথবা **الْمَوْتُ** মানে **الْمَوْتُ** **أَرْتَأَى** অর্থাৎ বেঁচে থাকা।

অথবা মুত্য়া বাধা দানকারী এই অর্থে যে, মুত্য়া না আসার দরুন হায়াতও শেষ হচ্ছে না। আর এ কারণে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ আসছে না।

অথবা **الْمَوْتُ** **أَرْتَأَى** অর্থ **الْمَوْتُ** **إِلَّا الْجَنَّةَ** অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের জন্য এখন তার মুত্য়াই বাধা রয়েছে।

অথবা কালামটির অর্থ হলো- কোনো কিছু তার জান্নাতে প্রবেশে অন্তরায় হবে না।

অথবা **الْمَوْتُ** **أَرْتَأَى** অর্থাৎ কাফের অবস্থায় মুত্য়াবরণ করাই তার জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র অন্তরায়।

وَعَنْ ٩١٣ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ

(رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَ قَالَ قَبْلَ

أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَتَنِيَّ رَجُلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ

الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَدِيهِ

الْخَيْرُ يَحْيَى وَيَمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ

عَشْرٌ حَسَنَاتٍ وَمَحِيتَ عَنْهُ عَشْرُ

سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ

حِزْبًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَحِزْبًا مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرَكَهُ إِلَّا

الشَّرْكُ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا

رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلُ مِنِّي قَالَ-

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ

أَبِي ذَرٍّ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا الشَّرْكُ وَلَمْ يَذْكَرْ

صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا يَدِيهِ الْخَيْرُ وَقَالَ هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)

৯১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম

(রা.) রাসুলে করীম **ﷺ** এর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম **ﷺ** বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজর

নামাজ শেষে পা প্রসারিত করা ও বাইরে গমনের পূর্বে

[অর্থাৎ নামাজের স্থান হতে উঠার পূর্বে] দশবার পাঠ করবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يَدِيهِ الْخَيْرُ يَحْيَى وَيَمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই জন্য বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্ব,

তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তাঁর হাতেই কল্যাণ। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন, তিনি সমস্ত কিছুর উপরে

অধিক ক্ষমতাবান। তার জন্য প্রতিটি শব্দের জন্য দশটি করে নেকী [তার আমলনামায়] লেখে দেওয়া হবে; তার

দশটি গুনাহ [আমলনামা হতে] মুছে দেওয়া হবে; তার দশ

দফা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এটা ছাড়াও এ তার জন্য প্রত্যেক খারাপ কর্ম হতে রক্ষার কবচস্বরূপ হবে এবং

বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবচ হবে। অধিকন্তু শিরক ব্যতীত কোনো গুনাহই তাকে পাবে না। [অর্থাৎ যখন সে

তাওহীদ ত্যাগ করবে তখন শিরক তাকে ধ্বংস করবে] এবং কর্মফলের দিক দিয়ে সে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য

হবে। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি তার চেয়েও উত্তম হবে, যে ব্যক্তি তার চেয়েও উত্তম দোয়া পাঠ করবে। -[আহমদ]

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস হযরত আবু যার (রা.) হতে "শিরক ব্যতীত" পর্যন্ত বর্ণনা করেন, "এ ছাড়াও মাগরিব নামাজ"

এবং "তার হাতে সব কল্যাণ", শব্দদ্বয়ও বর্ণনা করেননি। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।

وَعَنْ ۱۱۴ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قَبْلَ
 نَجْدٍ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا
 الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا
 بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ
 هَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ
 عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً
 قَوْمًا شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
 فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً.
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
 وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الرَّائِي هُوَ ضَعِيفٌ
 فِي الْحَدِيثِ)

৯১৪. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ নজদের দিকে অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা প্রচুর গণিমতের মাল অর্জন করল এবং ফিরেও এলো খুব তাড়াতাড়ি। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি যিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি তিনি বললেন, আমরা এই অভিযানের তুলনায় দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ও শ্রেষ্ঠ গনিমত লাভকারী কোনো সৈন্যাভিযান দেখিনি। এটা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একদল লোকের কথা বলব না, যারা গনিমত লাভে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাবর্তনেও এদের চেয়েও দ্রুত? তারা সে দল যারা ফজরের জামাতে উপস্থিত হয়েছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করেছে। তাবাই হলো এদের চেয়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী দল এবং এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গনিমত লাভকারী দল। -[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী হাম্বাদ ইবনে আবু হমাইদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বিবেচিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱۱৪ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণ করাকে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এর দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মর্যাদাকে খাটো করা হয়নি। বরং একদু ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই একদু কথা বলা হয়েছে। কেননা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা অতীব ছুওয়াবের কাজ।

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : নামাজের মধ্যে যা করা জায়েজ নয় এবং যা করা জায়েজ

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩١٥ معاوية بن الحكم
(رض) قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصْلَى مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ
فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ
يَابَسَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاتَّكَلَأَ أَمِيَاءَهُ
مَا شَأْنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا
يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا
رَأَيْتَهُمْ يَصْمِتُونَ بَيْنِي لِكَيْتِي سَكَتُ
فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيَامِي هُوَ
وَأَمِي مَارَأَيْتُ مَعَلِمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ
أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا
كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ
هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَضْلَعُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ
كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ
وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ
بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ
قَالَ فَلَا تَأْنِهِمْ قُلْتُ وَمِمَّا رَجُلًا
يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فَنِي

৯১৫. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর
সাথে নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ জনতার মধ্য হতে একব্যক্তি
হাঁচি দিল। তখন আমি বললাম, ইয়ারহামুকাদ্বাহ “আল্লাহ
তোমাকে দয়া করুন”। এটা শুনে, জনতা আমার দিকে
কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কারণ আমি নামাজের মধ্যে হাঁচির
জবাব দিয়েছি। আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের মা
তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কি হলো যে,
তোমরা কেন আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ? লোকেরা নিজ
হস্তদ্বয় তাদের উরুতে মারতে লাগল যেন আমি চুপ থাকি।
যখন আমি বুঝলাম, জনতা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে,
তখন আমি [যদিও নিজের অজ্ঞতা ও তাদের বাড়াবাড়ির
কারণে রাগান্বিত হয়েছিলাম তবুও] চুপ হয়ে গেলাম। যখন
রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলেন- তাঁর প্রতি আমার
পিতামাতা উৎসর্গ হোক, আমি তাঁর পূর্বে বা পরে [তালিমের
দিক দিয়ে] তাঁর চেয়ে কোনো উত্তম শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর
কসম, রাসূল ﷺ আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে
মারলেন না এবং আমাকে মন্দও বললেন না, বরং [শান্তভাবে]
বললেন, এটা নামাজ। একে এমন কথাবার্তা বলা ঠিক নয়,
যা মানুষের সাথে বলা যায়। নামাজ তো আল্লাহর পবিত্রতা
ঘোষণা, মহত্ব বর্ণনা ও কুবআন পাঠের নাম। অথবা রাসূলুল্লাহ
ﷺ এরূপ কিছু বললেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর
রাসূল! আমি এ অল্পদিন আগেও জাহেলিয়াতের অজ্ঞতায়
ছিলাম [অর্থাৎ আমি নতুন মুসলমান হয়েছি]। আল্লাহ
আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। আমাদের ভিতরে এমন
অনেক লোক রয়েছে, যারা গণকের নিকট গমন করে [এবং
ভবিষ্যতের কথা জানতে চায়]। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা
তাদের [গণক ঠাকুরের] কাছে লোক ছেড়ে যেয়ো না। আমি বললাম,
আমাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যারা শুভাশুভ ফল
নির্ণয়ের জন্য পাখি উড়ায়। রাসূল ﷺ বললেন, এটা এমন
একটি বিষয়, মানুষ তাদের অন্তরে অনুভব করে। ভাল বা
মন্দের উপরে এর কোনো প্রভাব নেই। তবে এটা যেন

صَدْرِهِمْ فَلَا يُصَدِّقُهُمْ قَالَتْ وَرِثًا
رَجَالًا يَخْطُونَ قَالَتْ كَانَ نَيْسِيٍّ مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ .
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

قَوْلُهُ لِكَيْتَى سَكَتُ هَكَذَا وَجَدْتُ
فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحَمِيدِيِّ
وَصَحَّحَ فِي جَامِعِ الْأَصُولِ بِلَفْظِهِ كَذَا
فَوْقَ لِكَيْتَى

তাদেরকে সংকল্প হতে বিচ্যুত না করে। বর্ণনাকারী হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম বলেতন, আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর! আমাদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে যারা মাটিতে রেখা টেনে ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে, রাসূল ﷺ বললেন, ইয়া নবীদের মধ্যে একজন এরূপ রেখা টেনে ভবিষ্যতের কথা বলতেন। তবে যার রেখা তাঁর [নবীর] রেখার মতো হয় অবশ্যই তা ঠিক আছে, তাকে করতে দাও। -[মুসলিম]

মাসাবীহ গ্রন্থকার বলেন, لِكَيْتَى سَكَتُ 'লাকিন্নী সাকাতু' অর্থ- 'কিন্তু আমি চুপ হয়ে গেলাম'। এরূপ সহীহ মুসলিম ও হুমাঈদীর গ্রন্থে পেয়েছি। কিন্তু 'জামেউল উসূল' গ্রন্থে لِكَيْتَى শব্দের উপর পর্যন্ত বর্ণনাকে বিতর্ক বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَاهِنٌ -এর অর্থ, عَرَّافٌ ও كَاهِنٌ এর মধ্যকার পার্থক্য এবং এ সম্পর্কিত বিধান : كَاهِنٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন كَاهِنَاتٌ শব্দিক অর্থ হলো- গণক, জ্যোতিষী, তাগয় গণনাকারী। পারিভাষিক অর্থ হলো, যারা হাত দেখে অথবা অন্য কোনোভাবে তাগয়ের তাল মন্দের কথা অনুমান করে বলে তাদেরকে অর্থ বলে।

عَرَّافٌ : আল্লামা তীর্থী (র.) বলেন-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, كَاهِنٌ বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে অনুমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোনো বিষয়ের সংবাদ দেয়। আর عَرَّافٌ বলা হয় যে গণার মাধ্যমে চোরাইকৃত বা হারানো মালের সন্ধান দেয়।

حُكْمُهُ : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গণকঠাকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গণকঠাকুরের নিকট ভবিষ্যত জানার জন্য যেতে নিষেধ করলেন।

জমহুর আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গণকঠাকুরের নিকট যাওয়া এবং অদৃশ্য-বিষয় জানতে চাওয়া হারাম। গণকের কথায় যে বিশ্বাস করে তার মহাপাপ হবে। এমনকি তার এ কাজ কুফরি পর্যায়ের গুনাহ। কারণ গায়েব তো শুধু আল্লাহই জানেন।

অনুরূপভাবে عَرَّافٌ -এর নিকট যাওয়া এবং তার কাছে হারানো মালের সন্ধান চাওয়াও হারাম। মহানবী ﷺ বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ . (أَحْمَدُ)

عَرَّافٌ -এর ব্যাখ্যা : طَيْرٌ একবচন, বহুবচনে طَيْرٌ -এর পাখি। الطَّيْرُ -এর অর্থ- শুভাশুভ ফলাফল জানার জন্য পাখি উড়ানো। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ কোথাও রওয়ানা করতে ইচ্ছা করলে প্রথমে কোনো বস্তু পাখিকে সেখান হতে তড়ু দিয়ে উড়িয়ে দেখত পাখিটি ঐ লোকটির ডান বা বাম দিকে যায়। যদি ডান দিকে যেত তা হলে তার যাত্রা শুভ এবং উদ্দেশ্যের কাজটি তার জন্য মঙ্গলময় বলে শুভলক্ষণের 'ফাল' নিত। আর যদি বাম দিকে উড়ে যেত, তখন যাত্রা অশুভ এবং কাজটি নিজের জন্য অমঙ্গল জনক বলে অশুভ লক্ষণের 'ফাল' নিত। মহানবী ﷺ এভাবে 'ফাল' গ্রহণ করাকে নিরর্থক, ব্রাহ্ম ধারণা ও কুসংস্কার বলে বর্ণনা করেছেন। বর্মভান যুগেও এ জাতীয় বহু অনৈসলামিক-কুসংস্কার আমাদের সমাজে অবধি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীসের আলোকে এগুলো পরিহার করে আমাদের তওবা করা উচিত।

عَرَّافٌ وَرِثًا -এর ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী রেখাঙ্কন বা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আপ্লাহর কোনো নবীও রেখাঙ্কন করতেন, যার রেখা তার মতো হবে, তবে ঠিক আছে মনে করবে। অর্থাৎ এরূপ রেখাঙ্কন তাদের কবনও হবে না, অতএব রেখাঙ্কন করাও যাবে না।

কথিত আছে যে, হযরত ইদ্রীস (আ.) অথবা হযরত দানিয়াল (আ.) রেখাঙ্কন বিদ্যা জানতেন। এটা নবুয়তের মুজিবা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞাবহে এই কথা বুঝা যায় না যে, রেখাঙ্কন বিদ্যা জায়েজ। রাসূল ﷺ-এর উক্তি 'তাশীক বিল মাহাদ' বা অসম্বন্ধ সম্পর্কিত। কারণ যারা নবী নয়, তাদের রেখাঙ্কন নবীদের মতো হওয়া অসম্বন্ধ। আর এই অসম্বন্ধ্যতার কারণেই তা না

জায়েজ। সুতরাং জমহুর আলেমদের মতে জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা কিছু জানা জায়েজ নেই। হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিরস্কারের বক্তা বলেছেন যে, 'যার রেখাখন তার রেখার মতো হয়' অর্থাৎ কারও সাধ্য আছে যে, রেখা নবীর মতো টানবে। কেউ কেউ বলেন যে, বিতর্ক বর্ণনা হতে যদি জানা যায় যে, এই রেখা নবীর রেখার মতো, তা হলে জায়েজ হবে, নতুবা জায়েজ হবে না।

নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বৈধ কিনা? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আওয়ালীসহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে ভুল সংশোধনের লক্ষ্যে নামাজের মধ্যে ইচ্ছায় কথা বলা বৈধ। তাঁরা নিজেদের মতের মধ্যে **ذُو الْمَدِينِ** -এর হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটি হলো, একদা রাসূল ﷺ জোহর বা আসরের নামাজ আদায় করার সময় দু' রাকাতের পর সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, **قَصْرَتِ الصَّلَاةِ** উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, **لَمْ أَتْنُ وَلَمْ** অতঃপর রাসূল ﷺ উপস্থিত মুসল্লিগণকে লক্ষ্য করে বললেন, যুল-ইয়াদাইন যা বলে ব্যাপারটি কি একরূপে উত্তরে সকলে বললেন, হ্যাঁ। পরে রাসূল ﷺ অবশিষ্ট দু' রাকাত নামাজ আগের দু' রাকাতের সাথে মিলিয়ে পড়ে নিলেন। হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে নামাজের মধ্যে কথা বলা বৈধ। যদি বৈধ না হতো তবে রাসূল ﷺ কথা বলা সত্ত্বেও পূর্বের দু' রাকাতের ওপর ভিত্তি করে শেষের দু' রাকাত পড়তেন না।

ইমাম নববী (র.)-এর মতে নামাজের মধ্যে কথা বলা- কোনো প্রয়োজনে হোক অথবা অপ্রয়োজনে, নামাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে ইচ্ছাকৃত হলে নামাজ নষ্ট হবে। ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মত এটাই।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবু সওর, ইবনুল মুনির, হাসান বসরী, আতা ইবনে আবী রাবাহ, উরওয়াহ ইবনে যু'আয়ের, ইবনে আকাস ও ইবনুল যু'আয়ের প্রমুখের মতে নামাজ ব্যক্তি ভুলবশত নামাজের মধ্যে কথা বললে নামাজ নষ্ট হবে না, যদি কথা কম হয়।

তাদের মতে যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে রাসূল ﷺ ভুলবশত কথা বলেছিলেন, আর এ কারণেই নামাজ নষ্ট হয়নি। তদুপরি অন্য হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে- **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَفِعَ عَنْ أُمَّيِّ الْعَطَا وَالنَّيْسَانِ - (ابْنُ مَاجَةَ - دَارُ قُطَيْبٍ)**

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সওরী, ইবনুল মুবারক, ইব্রাহীম নখয়ী ও হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান প্রমুখের মতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জেনে-তনে কিংবা ভুলবশত যে, কোনোভাবেই নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বললে, চাই কথা কম হোক কিংবা বেশি হোক সর্বাবস্থায় নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন-

(১) **قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَيَّبَنَ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ -**
(২) **عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ النَّحْمَكِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِسْمًا هِيَ النَّسْبُوعُ وَالْحَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ - (مُسْلِمٌ)**

(৩) **عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْوَمَ (رَضِيَ) قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِكَلِمِ الرَّجُلِ صَاحِبِهِ وَهُوَ إِلَى حَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ قَوْلُهُمْ لِيَلُو قَاتِيَيْنِ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَتُيَّبِنَا عَنِ الْكَلَامِ - (مُسْلِمٌ)**

(৪) **عَنْ ابْنِ سَعْدٍ (رَضِيَ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَحْدُثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَأَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ -**
(৫) **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ الْكَلَامَ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ لَا الْمَوْضُوءَ - (دَارُ قُطَيْبٍ)**

তারা যুল-ইয়াদাইনের হাদীসের উত্তরে বলেন যে, হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। ইসলামের প্রথম যুগে নামাজে কথা বলা সিদ্ধ ছিল, পরে নিষিদ্ধ হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস এ কথাবার্তাই সমর্থন করে। হাদীসটি হলো, **عَنْ ابْنِ سَعْدٍ (رَضِيَ) قَالَ كُنَّا نَسْلِمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَلِي أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَئِمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَهُ فَوَجَدْتُهُ يَصَلِّيُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ الخ - (أَبُو دَاوُدَ)**

এটা ছাড়াও আলোচ্য হাদীসটির সনদে ও ঘটনার বর্ণনায় অনেক গরমিল রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় **ذُو الْمَدِينِ** আবার কোনো কোনো বর্ণনায় **ذُو الْمَدِينِ** কোথাও জোহর নামাজ, আর কোথাও আসরের নামাজের কথা বলা হয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনা বলা হয়েছে যে, দু' রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো হয়েছিল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি মুযতারিব। অতএব হানাফীদের মতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ كُنَّا نَسْلِمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُرَدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজ পড়তেন, এমন অবস্থায় আমরা তাকে সালাম করতাম এবং তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন; কিন্তু যখন আমরা [হাবাশা হিজরতের পর] নামাজাশীর নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তাকে নামাজ অবস্থায় সালাম করলাম, তিনি তার উত্তর দিলেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগে আমরা আপনাকে নামাজের মধ্যে সালাম করতাম, আর আপনি আমাদের উত্তর দিতেন [এখন তা কেন করেন না?] রাসূল ﷺ বললেন, নামাজের মধ্যে একটি মহৎ কাজ রয়েছে [অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ধ্যান ও তনুয়ত]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الصَّلَاةِ حُكْمُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ নামাজের মধ্যে সালামের বিধান : নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম দেওয়া বা সালামের জবাব দেওয়ায় নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে ভুলবশত একরূপ করলে নামাজ নষ্ট হয় না। যদি কেউ নামাজরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়, তবে এর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে নামাজ শেষে সালামের জবাব দেওয়া মোস্তাহাব, না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই।

النَّجَاشِيُّ مَنْ هُوَ? : নামাজী হাবাশা বা আবিসিনিয়া [ইথিওপিয়া] রাজ্যের বাদশাহর উপাধি ছিল। তিনি নবী করীম ﷺ-এর সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম আসহামা ছিল। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইত্কেকাল করেন। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ পবিত্র মদীনায় থেকে তার জানাজা পড়েছিলেন। কিছু সংখ্যক আলেম এ হাদীস ও ঘটনার প্রেক্ষিতে 'গায়েবী জানাযা' পড়া জায়েজ বলে প্রমাণ গ্রহণ করেন, কিন্তু আত্তামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, উপস্থিত মুসলমানদের জন্য তার লাশ অদৃশ্য থাকলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তার লাশ মদীনায় উঠিয়ে আনা হয়েছিল এবং মহানবী ﷺ চাফুস তার লাশকে দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং 'গায়েবী জানাযা' প্রমাণিত হয় না।

الْهَجْرَةُ إِلَى الْعَمَةِ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْمَدِينَةِ হাবশায় হিজরত ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন : পবিত্র মক্কায় যখন তাওহীদের বাণী ও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল, ফলে এ আদর্শে প্রভাবিত হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন ইসলামের শত্রুরা নিরীহ মুসলমানদের উপর সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার শুরু করল। এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু সংখ্যক নর-নারী মুসলমান রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ও পরামর্শে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানকার রাজা নামাজাশী ছিলেন অত্যন্ত ভাল স্বভাবের নায়কপরাধ গোক। তিনি এ সমস্ত দেশত্যাগী মুসলমানদের সাথে উত্তম আচরণ ও মম্বুর ব্যবহার করেন এবং পরে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তারাও হযুরের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় পবিত্র মদীনায় হিজরত করলেন। কথিত আছে যে, তাঁরা নৌকা যোগে হাবাশা হতে মদীনায় আগমন করেছিলেন, এ জন্য তারা 'আসহাবে সফীনা' বা নৌকার আরোহী নামেও প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তারা মদীনায় আগমন করলে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদেরকে নামাজ পড়া অবস্থায় পেয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত সে সময়ের সালামের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এরই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা নিষেধ ছিল না। পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا -এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই নামাজের মধ্যে একটি কাজ রয়েছে। এখানে কাজ বলতে কেবল পঠন, তাসবীহ ও অন্যান্য দোয়াকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা শُغْلٌ দ্বারা আল্লাহর ধ্যান ও তনুয়ত বুঝানো হয়েছে। কাজেই নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা যাবে না।

وَعَنْ ٩١٧ مُعَيْقِبِ (رض) عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ
حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৭. অনুবাদ : হযরত মুয়াইক্বিব (রা.) নবী করীম
ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যক্তি সম্পর্কে
যে সিজদার সময় সিজদার স্থানের মাটি সমান করে বলেন,
যদি একরূপ করা প্রয়োজনই হয়, তবে শুধু একবার কর।
- [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : সিজদার স্থানের মাটি বা কংকর একবারের বেশি সরালে আমলে কাশীর হিসেবে পরিগণিত
হবে। ফলে তাতে নামাজ ছুটে যাবে।

وَعَنْ ٩١٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَضْرِ فِي
الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রেখে
দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করার রহস্য : নামাজের মধ্যে
কোমরে হাত রাখার ব্যাপারে হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে মুহাম্মাদিসগণ এর নিম্নরূপ কারণ উল্লেখ করেছেন-

- (ক) ইবলিসকে আসমান হতে অভিশপ্ত করে কোমরে হাত রাখা অবস্থায় পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। ইবনু আবি শায়বা এরূপ
একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
(খ) অথবা ইহুদিরা এ কাজটি খুব বেশি বেশি করত। তাই তাদের সাদৃশ্য হতে বাঁচার জন্য মু'মিনদেরকে এরূপ করতে
নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে-

إِنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُوهُ -

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে- لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ -

- (গ) কেউ কেউ বলেন, কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো দোজখীদের শাস্তি হতে সাময়িক নিকৃতি পাওয়ার উপায়। এ কারণে
নামাজে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু আবি শায়বা (রা.) বর্ণনা করেন-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَضَعَ الْيَهُودِيُّ عَلَى الْحَقْوِ اسْتِرَاحَةَ أَهْلِ النَّارِ -

সম্ভবত দোজখীরা শাস্তি হতে সাময়িক নিকৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, কিন্তু তারা নিকৃতি পাবে না।

- (ঘ) অথবা যেহেতু এরূপ করা অহম্মারীদের আচরণ তাই এরূপ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাম্মাব ইবনে আবি সফরা
এরূপ বলেছেন।

حُكْمُ الْخَضْرِ فِي الصَّلَاةِ নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখার বিধান : নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখার
ব্যাপারে ইমামগণের মতান্তর রয়েছে।

আহলে জাহেরের মতে নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখা হারাম। তারা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের
নিষেধাজ্ঞাকে হারাম অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আওযাইদ, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, আয়েশা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে
ওমর প্রমুখের মতে নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরুহ। তারাও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসকে
দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ۱۱۹ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ إِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নামাজের মধ্যে আড়চোখে দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে বললেন, এটা তো হেঁ মেরে নেওয়া। শয়তান বান্দার নামাজের কিছু অংশ [অর্থাৎ কিছু ছওয়াব] হেঁ মেরে নিয়ে যায়। - [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱۱۹ هাদীসের ব্যাখ্যা : এ কথা স্বীকৃত যে, চোখের কিনারা দ্বারা আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালে নামাজের একগমতা বিনষ্ট হয়, নামাজ আদায় হলেও পূর্ণত্ব থাকে না; বরং ছওয়াবের ঘাটতি হয়। এ ছওয়াব হারানোকেই উক্ত হাদীসে রূপক হিসেবে 'শয়তানের হেঁ মারা বলেছেন'। আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালে নামাজ নষ্ট হয় না, মাথা ফিরিয়ে একদিকে তাকালে নামাজ মাকরুহ হয় এবং ঘাড় বা বক্ষ ঘুরিয়ে তাকালে কেবলা পরিবর্তন হয়ে যায় তার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়।

وَعَنْ ۱২০ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯২০. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- অবশ্যই লোকেরা নামাজের মধ্যে দোয়ার সময় আকাশের দিকে চক্ষু উঠিয়ে তাকানো হতে বিরত থাকবে অথবা তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। - [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱২০ هাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজের মধ্যে দোয়াকালে আকাশের দিকে চক্ষু উঠিয়ে তাকানো নিষিদ্ধ। তবে নামাজের বাইরে দোয়াকালে আকাশের দিকে তাকানো বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। কাজী ওরাইহ ও আরো অনেকের মতে দোয়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো মাকরুহ। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে দোয়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো বৈধ। তাঁরা বলেন, "আকাশ দোয়ার কেবলা- যেকোন কা'বা নামাজের কেবলা"। সুতরাং দোয়ার মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো অবৈধ বা মাকরুহ বলা যাবে না।

وَعَنْ ۱২১ أَبِي قَتَادَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَأَمَامَهُ يَنْتُ أَيْ الْعَايِصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَيَاذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَكَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯২১. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মানুষের ইমামতি করতে দেখেছি, তখন আবুল আসের কন্যা উমামা তাঁর [রাসূলুল্লাহর] কাঁধের উপরে ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করতেন তখন তাকে নিচে রেখে দিতেন, আর যখন তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাতেন উমামাকে পুনরায় কাঁধে উঠিয়ে বসাতেন। - [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱২১ هাদীসের ব্যাখ্যা : নামাজের মধ্যে শিওর বহন করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : নামাজের মধ্যে শিওরদেরকে কোঁসে নেওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে- ইমাম মালেক (রা.)-এর অভিমত হলো,

নফল নামাজে শিত কোলে নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু ফরজ নামাজে জায়েজ নয়। কারণ হাদীসে আছে যে, **سُكِّنُوا** الْمَلَوَةَ অর্থাৎ তোমরা নামাজে নীরব ও শান্ত থাকো। শিত কোলে বা কাঁধে নেওয়া নীরবতার বিপরীত। তবে ফরজের তুলনায় নফল নামাজে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামাজে উমামাকে কাঁধে উঠাতেন।

অথবা শিত কোলে নেওয়ার হুকুমই রহিত হয়ে গেছে। আইনী (র.) বাদায়ে হুখ্বকার হতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আযমের মতে যদি কোনো মহিলা নামাজের মধ্যে নিজের বাক্সাকে উঠিয়ে দুধ খাওয়ায়, তবে তার 'আমলে কাসীর' হবে, ফলে তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু শিত কোলে নিলে আর দুধ না খাওয়ালে নামাজ বিনষ্ট হবে না। এরপড়াই ইমাম নববী ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মায়হাব ব্যক্ত করেন যে, কোনো পশুর কবল হতে রক্ষার জন্য নামাজে থেকেও শিতকে কোলে নেওয়া জায়েজ হবে। শিত কোলে নেওয়ার ব্যাপারে আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "একবার আমরা জোহর কিংবা আসরের নামাজে রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, হযরত বেলাল (রা.) নামাজের আযান দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের দিকে আসলেন, তখন উমামা তাঁর কাঁধে ছিল। রাসূল ﷺ নামাজের মুসল্লয় দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর পিছনে একতেনা করলাম। রাসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বললেন, আমরাও তাকবীর বললাম, তখনও উমামা তার পূর্ব স্থানে অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর কাঁধে ছিল। এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যাতে নামাজে শিত কোলে নেওয়া জায়েজ প্রমাণিত হয়।

جَوَابُ لَهَا: জমহুর ওলামাদের পক্ষ হতে জবাব দেওয়া হয় যে, শিত কাঁধে নিয়ে যে রাসূল ﷺ নামাজ আদায় করেছেন, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো যে সহীহ তাতে কোনো দ্বিমত নেই এবং এখানে অন্য কোনো ব্যাখ্যারও অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'নীরবতা বা শান্ত' থাকার ব্যাখ্যা নিয়ে। কেননা যদি নামাজের মধ্যে অদৃশ্য নড়া-চড়া করা নিষিদ্ধ হয় তবে রুকু-সিজদাও তো 'শান্ত নীরবতার' পরিপন্থী। কাজেই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, রাসূল ﷺ হতে যে আমল পাওয়া গেছে তা 'সুকুন' বা শান্ত থাকার বিপরীত ছিল না এবং এর উপরে নিষেধের আদেশও প্রয়োগ হবে না।

'এ হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে' এ কথা বলাও ঠিক হবে না। কারণ **إِنَّ فِي الْمَلَوَةِ لَنُغْفَارًا** এ হাদীসটি বদরের যুদ্ধের পূর্বকার। যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হাবশা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রাসূল ﷺ এবং মুসলমানদেরকে নামাজ পড়া অবস্থায় সালাম করে সালামের উত্তর পাননি, তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন, নামাজ একটি স্বতন্ত্র বিশেষ কাজ। এর ভিতরে থেকে সালাম-কালাম ও কথাবার্তা বলা যায় না। আর যখনবের কন্যা উমামাকে নিয়ে রাসূল ﷺ যে বের হয়েছিলেন এবং লোকদেরকে নামাজ পড়ালেন তা বদরের যুদ্ধের পরের ঘটনা। -[ফাতহুল মুল্হিম ফী শরহে সহীহ মুসলিম]

মোটকথা, শিত কোলে-কাঁধে নিয়ে নামাজ আদায় করাটা একটি আংশিক ব্যাপার মাত্র। প্রকৃত কথা হলো, 'আমলে কাসীর' নামাজকে বিনষ্ট করে 'আমলে কালীল' দ্বারা নামাজ নষ্ট হয় না। অবশ্য 'কাসীর' ও 'কালীল'-এর সংজ্ঞায় মতভেদ আছে-

১. ফতোয়ার কিভাবে আছে, নামাজির যে কাজের কারণে দূর হতে কোনো ব্যক্তি দেখে সন্দেহ হয় যে, ঐ ব্যক্তি নামাজে রত নয়, এটা হলো 'আমলে কাসীর'। আর যদি দর্শক সন্দেহ করে এটা 'আমলে কালীল' তা হলে আমলে কালীল।
 ২. দুই হাতে যে কাজ করা হয় তা 'আমলে কাসীর' এবং এক হাতে যা করা হয় তা 'আমলে কালীল'।
 ৩. উপরূপরি যে কাজ তিনবার করা হয় সে কাজ 'কাসীর', অন্যথা তা 'কালীল'।
 ৪. মুসল্লীর নিজের রায় ও মতের ভিত্তিতে 'কাসীর' নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ যে কাজকে মুসল্লী নিজে 'কাসীর' মনে করবে তা 'কাসীর' অন্যথা 'কালীল'। এ চতুর্বিদ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, শুধু শিত কোলে তুলে নিলে আর দুধ না খাওয়ালে নামাজ ফাসেদ হবে না। কারণ রাসূল ﷺ-এর এ কাজটি জায়েজ বর্ণনার জন্য ছিল।
- অথবা উক্ত শিতটির অন্য কোনো হেফাজতকারী না থাকার কারণে উমামাকে নামাজে থেকেও কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যেমন- কোনো বিষাক্ত সাপ, বিষ্ণু ইত্যাদি নামাজে রত থাকা অবস্থায়ও লাঠি দ্বারা মারলে নামাজ ফাসেদ হবে না। এটাই জমহুর ওলামাদের অভিমত।

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ আবুল আসের সক্ষিপ্ত ঘটনা : রাসূল ﷺ-এর প্রিয়তম মেয়ে হযরত যয়নব (রা.)-এর স্বামী ছিলেন আবুল আস। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে যোগদান করলে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তখন যয়নব (রা.) স্বীয় স্বামীকে মুক্ত করার জন্য গলার সেই হারটি রাসূল ﷺ-এর দরবারে পাঠিয়ে দেন, যা শুভ পরিণয়ের মুহূর্তে হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ হারটি দেখে চোখের অশ্রু সংবরণ করতে

পাল্লেন না। অতঃপর ঐ হারসাহ (সাহাবীদেব পরামর্শে) আবুল আসকে মুক্তি দিয়ে বিনা বাধ্য মক্কায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস মূলত বন্দর যুদ্ধে দলের চাপে পড়ে শরিক হয়েছিল। রাসূল ﷺ আবুল আসকে বিদায়কালে বলে দেন, সে যেন যখনবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। ফলে যখনব অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে মদীনায় এসে পৌছেন। পরবর্তী বছর আবুল আস বাণিজ্য শেষে সিরিয়া হতে মক্কা ফিরে যাওয়ার সময় পুনরায় সাহাবায়ে কেবামের অবরোধের সম্মুখীন হয়। অনেক ভেবেচিন্তে হযরত যখনব (রা.)-এর সুপারিশের শরণাপন্ন হলে হযরত যখনব তাঁকে এই ব্যাপারে অনেকটা সহযোগিতা করেন এবং রাসূল ﷺ যখনবের সুপারিশ রক্ষা করে আবুল আসকে মুক্তি প্রদান করেন; কিন্তু আবুল আস মক্কায় পৌছে ব্যবসার সমস্ত আমানতের সম্পদ-এর মুদ্রা বণ্টন ও লাভের অংক বুকিয়ে দিয়ে গোত্র হতে শেষ বিদায় নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবুল আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ পুনরায় হযরত যখনব (রা.)-কে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন এবং তাদের পূর্বেই বিবাহ বহাল রাখেন। অবশেষে হযরত আবুল আস (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত কালে ইয়ামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَابَحَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - (رواه مسلم) وَفِي رِوَايَةٍ الْبُخَارِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ إِذَا تَشَابَحَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ مَا قِيَامًا ذِكْمًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ -

৯২২. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যদি তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে হাই আসে, তবে সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে রোধ করে অর্থাৎ মুখ বন্ধ করে নেয়। কেননা হাই তোলায় সময় শয়তান মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। -[মুসলিম]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে হাই আসে, সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে হাই বন্ধ করে এবং সে হা করে মুখ খুলে না দেয়। কারণ হাই শয়তানের তরফ হতে আসে, শয়তান এতে হাসতে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَدُخُولِهِ الْمَرَادُ بِضَعِكِ الشَّيْطَانِ وَدُخُولِهِ এর অর্থ হলো, শয়তান এতে সত্ত্বত হয়। স্বাভাবিক দুর্বলতার দরুনই সাধারণত হাই আসে। আর এ দুর্বলতাই আলস্যের সৃষ্টি করে। নামাজের মধ্যে অলসতাই শয়তান কামনা করে। সুতরাং শয়তান নিজের কামা ও কাজিফত বস্তুর উপস্থিতি দেখলেই সত্ত্বত হয়। যে কোনো সময় হাই আসলে নিচের গুণ দ্বারা উপরের গুণকে চেপে ধরবে অথবা বাম হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে রাখবে। নামাজ অবস্থায় এরূপ করলে নামাজ ফাসদ হবে না।

وَعَنْ ٩٢٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عَفَرْنَا مِنَ الْجَنِّ تَفَلَّتِ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى صَلَاتِنَا فَمَا كُنْتِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

৯২৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- [হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বন্দীকৃত] জিনদের মধ্য হতে একটি দেও ছাড়া পেয়ে গভরতে আমার নামাজ নষ্ট করতে আসে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, ফলে আমি তাকে ধরে ফেলি। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের একটি ঝুঁটির সাথে বেঁধে রাখি; যাতে তোমরা সকলে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু

حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَلِّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ
أَخِي سَلِيمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا
يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهَا
خَائِسًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখনই আমি আমার ভাই সুলায়মান নবীর দোয়ার কথা
শ্রবণ করলাম। তিনি এভাবে দোয়া করেছিলেন, 'হে
আমার প্রভু! আমাকে এমন একটি ক্ষমতা দান করো, যে
ক্ষমতা আমার পরে আর কারো জন্য না হয়।' অতঃপর
আমি তাকে ব্যর্থ মনোরথ অর্থাৎ নিরাশ অবস্থায় ছেড়ে
দিলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : জিনদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কি না? এ
ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ- ইমামুল হারামাইন বলেন যে, দার্শনিকগণ, যিনদীক ও
কাদরিয়া সম্প্রদায় জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কারণ তাদেরকে চোখে দেখা যায় না। আব্দুল জব্বার মু'তাহিলী বলেন যে,
অদৃশ্য শরীর প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ কোনো বস্তু অপর বস্তুর নিকট প্রমাণিত হয় না, যতক্ষণ না উভয় বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক থাকবে।

কিন্তু মুসলিম দার্শনিক ও সকল মনীষীগণের বিশ্বাস যে, জিন বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- **لَوْلَا رُؤِيَ إِلَّا مَنْ أَمَّنَا** -
হয়রত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসে জিনের অস্তিত্বের কথা রয়েছে। এরূপ অনেক
আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা জিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীদের জবাব এই যে, জিন যদিও চোখে দেখা যায় না, তবু তাদের অস্তিত্ব নেই বলে বুঝায় না। এ
জনাই হয়রত-কাসেম নানুতুবী (র.) বলেন, দুনিয়ায় প্রত্যেকটি জিনিসেরই গোলা বা কোষাগার থাকে সুতরাং জাগতের ডালে
মন্দের জন্যও একটি গোলা বা কোষাগার থাকা দরকার। সুতরাং ডালের খনি ফেরেশতা এবং মন্দের খনি জিন সম্প্রদায়।
এভাবে যুক্তির নিরিখেও জিন জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ-এর উক্ত বাণী "আমার ভাই সোলায়মান নবীর কথা শ্রবণ
করলাম"-এর অর্থ এই হলো, যদি আমি দৈত্য (জিন) টিকে বেঁধে রাখতাম, তবে সোলায়মান (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়েছিল
বলে প্রমাণিত হতো না। আর কোনো নবীর দোয়া প্রত্যাক্ষ্যত হওয়া জায়েজ নেই। এ জন্য আমি দৈত্যটিকে ছেড়ে দিয়েছি।

শায়খ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদিসে দেহলবী (র.) বলেন, হয়রত সোলায়মান (আ.) উপরোক্ত **لَوْلَا رُؤِيَ إِلَّا مَنْ أَمَّنَا** দোয়ার মাধ্যমে
বাতাস, দৈত্য-দানব ও জিনকে নিজের করায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। এ করায়ত্তকরণ হয়রত সোলায়মানের জন্যই সুনির্দিষ্ট
ছিল। তাঁর দোয়া তাঁর জন্য নিরঙ্কুশ থাকার জন্যই রাসূল ﷺ দৈত্যটিকে ছেড়ে দিলেন, নতুবা দৈত্যকে ধরার মতো পূর্ণশক্তি
আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রদান করেছিলেন। অবশ্য শাইখুল ইসলাম আল্লামা উসমানী এ দোয়ার আয়াতের আর একটি ব্যাখ্যা
করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করো যা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। তিনি আল্লাহর দীনকে
প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করার জন্যই এই দোয়া করেছিলেন। কারণ তখন জোর-জবরদস্তির রাজা পরিচালনার জমানা ছিল।
তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহেরই এ দোয়া করেছিলেন। এতে তাঁর প্রতাপ ও শান-শওকত প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رَضًا) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فَنِي
صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِغْ فَإِنَّمَا التَّصْفِينُ
لِلنِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ التَّسْبِغُ لِلرِّجَالِ
وَالتَّصْفِينُ لِلنِّسَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯২৪. অনুবাদ : হয়রত সাহল ইবনে সা'দ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যদি
কারো নামাজের মধ্যে কোনো ব্যাপার ঘটে (অর্থাৎ কেউ
ডাকে বা কেউ কিছু চায়) তবে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ'
বলে- আর তালি বাজানো মেয়েলোকদের জন্য নির্দিষ্ট।
অপর বর্ণনায় এসেছে যে, 'সুবহানাল্লাহ' বলা পুরুষ
লোকদের কাজ, আর হাতে তালি বাজানো স্ত্রীলোকদের
কাজ। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ بْنِ أَبِي هَانِئَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً نَامًا لَمْ يَسْمَعْ نَجْوَاهُ فَهُوَ كَمَا أَنَّ الْبَعْدِيَّ يَسْمَعُ نَجْوَاهُ» (بخاری، ۱۰۰/۱)। আর মহিলাদের গলার স্বর যেহেতু গায়রে মুহাররাম পুরুষকে শুনাতে নিষেধ, তাই তারা 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে তালি বাজাবে। তবে নামাজ হাতে তালি বাজানোর নিয়ম এই যে, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর মারবে এবং আওয়াজ সৃষ্টি করবে। উভয় হাতের তালুতে তালি বাজানো নিষেধ।

عَنْ ۹۲۵ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَبَرَدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَصَلِّيُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحَدَثَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَصْلُ الثَّانِي

عَنْ ۹۲۶ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يَسْلَمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ التَّسَانِيِيِّ نَحْوَهُ وَعَوَّضٌ بِلَالٍ صُهَيْبٌ)

৯২৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবাশায় আগমন করার পূর্বে নবী করীম ﷺ-কে নামাজে রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনিও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা যখন হাবাশা [আবিসিনিয়া] হতে প্রত্যাবর্তন করলাম, একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম, তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। অতঃপর আমি সালাম করলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না যতক্ষণ না তিনি নামাজ শেষ করলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর যে আদেশকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবার তিনি যে নতুন আদেশ জারি করেছেন তার মধ্যে একটি এই যে, তোমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলবে না। অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নামাজ শুধু কুরআন পাঠ ও আল্লাহর জিকির করার জন্যই। সুতরাং তুমি যখন নামাজে থাকবে তখন তোমার কাজও এরূপই হওয়া চাই। -[আবু দাউদ]

৯২৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবীরা যখন নবী করীম ﷺ-কে সালাম করতেন, আর তিনি নামাজে রত থাকতেন, তখন কিভাবে তিনি তাঁদের সালামের জবাব দিতেন। হযরত বিলাল (রা.) বললেন, তখন রাসূল ﷺ নিজ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। -[তিরমিযী] নাসায়ীর বর্ণনায়ও এরূপই বর্ণিত হয়েছে, তবে বিলাল (রা.)-এর স্থলে সুহাইব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۹۲۷ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً نَامًا لَمْ يَسْمَعْ نَجْوَاهُ فَهُوَ كَمَا أَنَّ الْبَعْدِيَّ يَسْمَعُ نَجْوَاهُ» (بخاری، ۱۰۰/۱)। ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দেওয়ার বিধান : নামাজের মধ্যে ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। হাতের দ্বারা নামাজের মধ্যে সালামের জবাব দেওয়ার নিয়ম হলো, হাতের তালুকে খোশা অবস্থায় নিচের দিকে রেখে হাতের পিঠকে উরুতে রাখা।

ইবনুল মালিক হতে মিরকাতে বর্ণিত আছে, হাত, চোখ কিংবা মাথার ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলে নামাজ নষ্ট হবে না। একরূপভাবে যহিরিয়া গ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে, মাথা, হাত, কিংবা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলে নামাজ ফাসেদ হবে না।

কিন্তু খুলাসাতুল ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে হাত বা মাথার দ্বারা ইশারা করাটা কথাবার্তা বলারই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই ইশারা দ্বারাও নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। সুতরাং যে সমস্ত হাদীসে ইশারায় জবাব দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে তা 'নসখে কালাম'-এর সাথে মানসূখ হয়ে গেছে।

হযরত বিলাল ও সুহাইব (রা.) ইসলামের একেবারে প্রথম যুগের মুসলমান, তাঁরা উভয়ই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, পরে আজাদ হয়েছেন। ইসলামের প্রথম যুগের বহু বিষয় সম্পর্কে তাঁরা যা অবগত ছিলেন, পরবর্তী মুসলমানরা তা জানতেন না। এ কারণে হযরত ইবনে ওমর হযরত বেলাল বা সুহাইবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

وَعَنْ ٩٢٧ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رَضِيَ) قَالَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسْتُ
فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا
مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ
رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
انْصَرَفَ فَقَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ
فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ
يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَ
رِفَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ اسْتَدْرَهَا بِضَعْفَةٍ
وَتَلْتُونَ مَلَكًا أَنَّهُمْ يَضَعُدُ بِهَا -
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ)

৯২৭. অনুবাদ : হযরত রিফা'আহ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে নামাজ পড়লাম। হঠাৎ আমি হাঁচি দিয়ে বললাম, الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, কল্যাণময় প্রশংসা এবং প্রশংসাকারীর জন্য কল্যাণজনক প্রশংসা, যে প্রশংসাকে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন এবং যে প্রশংসায় সন্তুষ্ট হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ শেষ করে অবসর হলেন, তখন আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, নামাজের মধ্যে কে কথা বলল? কিন্তু কেউ কথা বলল না। রাসূলে করীম ﷺ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কোনো কথা বলল না। অতঃপর রাসূল ﷺ তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রিফা'আহ বললেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! ত্রিশের বেশি ফেরেশতা এ শব্দগুলোকে উপরে তুলে নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিল, কে কার পূর্বে তা উপরে তুলে নেবে। - [তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ঘটনাটি নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষেধ হওয়ার পূর্বের। সুতরাং হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য ইবনুল মালিকের মতে হাদীসটির বিধান এখনও কার্যকর আছে।

وَعَنْ ٩٢٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثَّلَاثُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ
الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْظِمْ
مَا اسْتَطَاعَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي أُخْرَى
لَهُ وَلِابْنِ مَاجَةَ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِئِهِ) -

৯২৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- নামাজের মধ্যে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে এসে থাকে। সুতরাং যখনই তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন সাখানুযায়ী রোধ করতে চেষ্টা করে। - [তিরমিযী]

তিরমিযী ও ইবনে মাজার অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন নিজের হাতকে মুখের উপরে রাখে।

وَعَنْ ٩٢٩ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَاخْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكُنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৯২৯. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ অজু করে এবং অজুকে উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, অতঃপর নামাজের সংকল্পে মসজিদের দিকে যায়, সে যেন নিজ আঙ্গুলে আঙ্গুলে প্যাঁচ [তাশবীক] না দেয়। কারণ সে নামাজের মধ্যে আছে। -[আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাশবীকের অর্থ ও তার হুকুম : দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে একসাথে করাকে বাংলায় প্যাঁচ দেওয়া এবং আরবিতে 'তাশবীক' বলে।

ইবনুল মালিক বলেন, "নামাজের মধ্যে তাশবীক করা মাকরুহ। কেননা এটা নামাজের মধ্যে একাধ্রতা ও বিনয়ের পরিপন্থি।" আল্লামা মীরক শাহ বলেছেন, সম্ভবত তাশবীক করতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, এটা ঘরা ঝগড়া-বিবাদ ও বিপর্যয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। যেমন রাসূল ﷺ কিয়ামতের নিকটবর্তী ফিতনা বা বিপর্যয়ের আলোচনা কালে তাশবীক করে দেখিয়েছেন।

আল্লামা তীহী (র.) বলেছেন, "নামাজের মধ্যে 'মাথার চুল গোছান' এবং 'হাই তোলা' যে পর্যায়ের নিষিদ্ধ তাশবীক করাও সেই পর্যায়ের নিষিদ্ধ [অর্থাৎ মাকরুহ তানযীহী]।"

তাশবীক নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইমাম আহমদ আবু সা'দ হতে মারফু' পর্যায়ের একটি হাদীস উল্লেখ করেছে। হাদীসটি হলো-
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكُنْ فِئَانَ التَّنَشِيكِ مِنَ السُّبْطَانِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.

উক্ত হাদীসে তাশবীককে শয়তানের কর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই এটা যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত।

وَعَنْ ٩٣٠ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৯৩০. অনুবাদ : হযরত আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা আপন নামাজে এদিক-ওদিক না তাকায় [একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে সম্মুখে দৃষ্টি অবনত রাখে] ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সন্মানিত ও মহীয়ান বান্দার উপরে রহমতের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন। অতঃপর যখন সে এদিক ওদিক তাকায় তখন আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। -[আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : তিরমিযী শরীফের অপর এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা এটাও বলেন, হে বান্দা! তুমি যেদিকে তাকান, সে দিকে আমার চেয়ে বড় কে আছে যে, তুমি তার দিকে দেখছ? বরং আমার দিকেই তাকাও। এভাবে দু'বার বলেন। তৃতীয় বারও যদি বান্দা অপর দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা আপন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ বান্দার প্রতি কতটুকু অনুগ্রহশীল।

وَعَنْ ١٩١ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصْرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنِ أَنَسٍ بِرَفْعِهِ)

৯৩১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে বললেন, হে আনাস! নামাজে যেখানে তুমি সিজদা কর সেখানেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখ।-[বায়হাকী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, নামাজের সকল অবস্থাতেই সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে; কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন যে, শুধু দাঁড়ানে অবস্থায়ই সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। রুকু অবস্থায় পায়ের পাতার উপরে, সিজদায় নাকের ডগার দিকে এবং তাশাহুদে বসা অবস্থায় নিজের দু' হাঁটুর মাঝে দৃষ্টি রাখতে হবে। এটাই মোস্তাহাব। তবে যার সম্মুখে কা'বা শরীফ থাকবে সে তাশাহুদের শাহাদাতের সময় ব্যতীত সর্বদাই কা'বা ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে।

وَعَنْ ١٩٢ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَنِي إِيَّاكَ وَالْإِنْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِنْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لِأَبْدُ قَفِي النَّطْوَعِ لَا فِي الْغَرِيضَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯৩২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, হে বৎস! নামাজের মধ্যে কখনও এদিক-ওদিক তাকাবে না। কেননা, নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো ধ্বংসের কারণ। আর যদি তাকাতেই হয়, তবে নফল নামাজে, ফরজ নামাজে নয়।-[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث হাদীসের ব্যাখ্যা : নামাজের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো নিষিদ্ধ। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ঘাড় ও বক্ষ না ঘুড়িয়ে তাকানো যেতে পারে। আর নফল নামাজের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। তাই নফলে তাকানো জায়েজ আছে।

وَعَنْ ١٩٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ بِيَمِينِهِ وَشِمَالًا وَلَا يَلُونِي عَنْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৯৩৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে ডানদিকে ও বামদিকে চোখের কিনারা দ্বারা দেখতেন কিন্তু ঘাড় পিছনে পিঠের দিকে ফিরাতেন না।-[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে الصَّلَاةُ (নামাজ) দ্বারা নফল নামাজ উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে এ হাদীসের কোনো দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। কেননা পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনে নফল নামাজে এদিক-ওদিক তাকানোর অনুমতি রয়েছে। অবশ্য كَلَّفُوا দ্বারা ফরজ নামাজও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এমতাবস্থায় পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে আলোচ্য হাদীসের স্পষ্ট দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কেননা পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফরজ নামাজে এদিক-ওদিক তাকানোর অনুমতি নেই।

উক্ত দ্বন্দ্ব সমাধানে হাদীসবিদারদগণ বলেছেন যে, রাসূল ﷺ কখনও কখনও বৈধতা বর্ণনার জন্য এরূপ করতেন। অর্থাৎ তিনি এরূপ করে উম্মতকে জানিয়ে দিতেন যে, এটা নামাজ বিনষ্টকারী নয়।

অথবা রাসূল ﷺ কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ করতেন। তবে ঘাড় পিছনের দিকে ফিরানো বা বক্ষ কেবলা হতে ফিরানো ব্যতীত। কেননা ঘাড় ও বক্ষ কেবলা হতে ঘুরে গেলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

وَعَنْ ۱۳۴. عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (رض) عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ أَلْفَطَّاسُ وَالنُّعَّاسُ
 وَالتَّشَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَبِصُ وَالْقَنَى
 وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯৩৪. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে ছাবিত তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাঁচি, তন্দ্রা এবং নামাজের মধ্যে হাই তোলা এবং ঋতুশ্রাব, বমি আসা এবং নাক হতে রক্ত পড়া [নামাজের মধ্যে কি বাইরে] সব শয়তানের পক্ষ হতে হয়। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত বিষয়গুলো কোনো না কোনোভাবে নামাজে অলসতা আনে, একাধ্রতা নষ্ট করে, এমনকি নামাজ পরিত্যাগ করায়। এ জন্য শয়তান আনন্দিত হয় এবং এগুলোতে সহায়তা করে। النَّبَطَانِ ঘারা উদ্দেশ্য হলো শয়তান হতে স্ট।

আল্লামা জীবী (র.) বলেছেন, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের প্রথমোক্ত তিনটিকে শেখোক্ত তিনটি হতে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়েছে এ জন্য যে, শেখোক্ত তিনটি ঘারা নামাজ বাতিল হয়ে যায়; কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি ঘারা নামাজ বাতিল হয় না। উল্লেখ যে, এখানে হাঁচি ঘারা নামাজের ভিতরের হাঁচি উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ۱৩৫. مُطَرِّبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ
 ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَبِحَرْفِهِ أَزِنَرُ كَارِزِرُ
 الْمَرْجَلِ يَعْنِي بَيْنِي وَبَيْنِي وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ
 النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِنَرُ كَارِزِرُ
 الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى
 النَّسَائِيُّ الرَّوَاةَ الْأُولَى وَأَبُو دَاوُدَ
 الثَّانِيَةَ)

৯৩৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। তাঁর অভ্যন্তর হতে চুলার উপরে তগু ডেসের ফুটন শব্দের ন্যায় আওয়াজ আসছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখলাম তখন তাঁর বক্ষের ভিতরে কান্নার দরুন যাঁতা পেঁষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। -[আহমদ] এ ছাড়া পৃথকভাবে নাসাঈ প্রথম রেওয়য়াতটি এবং আবু দাউদ দ্বিতীয়টি রেওয়য়াতটি উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা : আল্লামা জীবী (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে ক্রন্দন করলে নামাজ বিনষ্ট হয় না। তবে বিতর্ক মত হলো, নামাজের মধ্যে জাহান্নাম বা পরকালীন শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত পাঠ কালে ভয়-বিহ্বল অবস্থায় যদি ক্রন্দন করে এবং কান্নার শব্দ বক্ষের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে নামাজ বিনষ্ট হবে না, আর যদি পার্শ্বিক কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্রন্দন করে তবে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ :

مَرَّسُوهُ ذُو الْعَالِ أَزِنَرُ : অর্থবা মরসুফ পদটি الْعَالِ أَزِنَرُ
 وَبِحَرْفِهِ أَزِنَرُ : অর্থবা বাকার্টি হাল, وَبِحَرْفِهِ أَزِنَرُ : অর্থবা বাকার্টি হাল, وَأَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ : অর্থবা বাকার্টি হাল বা সিমফাত। অতঃপর তা সুবতাদা মুয়াখবার।

وَعَنْ ۹۳۬۶ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৯৩৬. অনুবাদ : হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজের জন্য দাঁড়ায় সে যেন তার সন্মুখের কংকর [সমতল করার জন্য] না মুছে। কারণ আল্লাহর রহমত তখন তার সন্মুখে থাকে। -[আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۹৩৬ হাদীসের ব্যাখ্যা : আল্লাহর রহমত সন্মুখে থাকার অর্থ এই যে, যখন সে একপ্রতিশে নড়াচড়া না করে নামাজ পড়ে, তখন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। নামাজি অন্যমনস্ক হলে আল্লাহ তাঁর বিশেষ দৃষ্টি প্রত্যাহার করে নেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজি ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় তার সিজদার স্থানের কংকর সমতল করার জন্য মুছতে পারবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে একবার মুছা জায়েজ। এ মর্মে আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীসও এসেছে যে,
لَا تَمْسَحُ الْحَصَى وَأَنْتَ تَمْسِكُ فَإِنَّ كُنْتَ لَا بُدَّ نَاعِلًا فَارْجِدْ تَسْرِيَةً لِلْحَصَى.

وَعَنْ ۹৩৭ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَعَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرَبَّ وَجْهَكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯৩৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের এক ক্রীতদাসকে দেখলেন, যার নাম ছিল আফলাহ; সে যখন সিজদা করত, ফুঁক দিয়ে ধুলা সরাত [যাতে ধুলা তার নাকে বা কপালে না লাগে]। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে মাটি লাগাও [অর্থাৎ ধুলাবালি লাগুক, এটা বিনয়ের পরিচায়ক]। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ৯৩৭ হাদীসের ব্যাখ্যা : সিজদার স্থান হতে নামাজরত অবস্থায় ধুলা-বালি সরানো জায়েজ নেই, চেহায়ায় লাগলে তা মুছাও ঠিক নয়। কেননা শরীতে ধুলা-বালি লাগা বিনয়ের পরিচায়ক, তবে সিজদা দিতে একেবারে কষ্টকর হলে একবার সরানো জায়েজ আছে।

وَعَنْ ۹৩৮ ابْنِ عَمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةٌ أَهْلِ النَّارِ. (رَوَاهُ شَرْحُ السُّنَنِ)

৯৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- নামাজের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো দোজখবাসীদের শাস্তি লাভের চেষ্টাভূলা। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ৯৩৮ হাদীসের ব্যাখ্যা : জাহান্নামীরা চরম কষ্টের মাঝেও একটু শান্তি লাভের চেষ্টায় কোমরে হাত রেখে দাঁড়াবে; কিন্তু শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। নামাজের মধ্যে, এমনকি নামাজের বাইরেও কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো দোজখবাসীদের দাঁড়ানোর সাথে তুলনীয়। সুতরাং এভাবে দাঁড়ানো কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো ইহুদি ও নাসারাদের কাজ। আর তারা হবে দোজখী। সুতরাং এখানে দোজখী দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

الصَّلَاةِ فِي الْاِخْتِصَارِ مَثْنَى নামাজের মধ্যে اِخْتِصَارٌ করার অর্থ : নামাজের মধ্যে ইখতিসার করার অর্থ নির্ণয়ে আলমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ- (১) কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো ইহুদিদের অভ্যাস। উক্ত হাদীসে 'দোজখী' দ্বারা ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। (২) বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্তাত প্রাপ্ত অবস্থায় যখন ইব্রলিসকে জমিনে পাঠানো হয় তখন সে কোমরে হাত রেখে অবতীর্ণ হয়েছে। (৩) আবার কেউ কেউ 'ইখতিসার'-এর এ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, নামাজের মধ্যে সূরা এবং কেরাতকে খুব সংক্ষিপ্ত করা। (৪) আবার কেউ বলেছেন, নামাজের- কিয়াম, রুকু ও সিজদা ইত্যাদিকে খুব তড়িৎ বেগে আদায় করতে গিয়ে এগুলোকে সংক্ষিপ্ত করা। (৫) কারো মতে তালাশ করে সিজদার আয়াত পাঠ করে নামাজ পড়া এবং (৬) কারো অভিমত হলো নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে সিজদা না করে রুকু করা। (৭) আরেক দলের মতে খুব তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করা তবে এ অর্থই অধিক মুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْتُلُوا الْأَسْرَدِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ سَابِيَةَ مَعْنَاهُ)

৯৩৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- দুই কালো (শত্রু)-কে নামাজের মধ্যে মেরে ফেলতে পার; সাপ ও বিলু।-[আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী। নাসায়ী ও উক্ত হাদীসের অর্থবোধক একটি রেওয়াজে উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الصَّلَاةِ مَثْنَى بِجَوْرٍ أَنْ يَغْتَلَّ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ فِي الصَّلَاةِ মধ্যে কোনো কোনো মনীষীর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে থেকে এগুলোকে তখনই মারার অনুমতি আছে, যদি খুব বেশি হাঁটাইটি করার প্রয়োজন না হয়। যেমন- উর্ধ্বে তিন কদম, অথবা একাধারে তিনবার আঘাত করা ইত্যাদি। কিন্তু যদি এর বেশি হাঁটতে হয় কিংবা তিনবারের বেশি আঘাত করতে হয় তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা তা 'আমলে কাসীরের' আওতায় গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোনো নিতান্ত দীন-দুর্ভীকে সাহায্য করা, অথবা কেউ ছাদ হতে পড়ে যায়, বা আঙনে পড়ে অথবা পানিতে ডুবে মরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন নামাজের মধ্যে থেকেও তাকে রক্ষা করার অনুমতি আছে, এতে নামাজ ফাসেদ হবে না।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابَ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَحِجَّتْ فَاسْتَفْتَحَتْ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَصَلَّاهُ وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقَبْلَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

৯৪০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামাজ পড়ছিলেন, তখন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। এমতাবস্থায় আমি ঘরে আসবার জন্য দরজা খুলতে চাইলাম। তখন রাসূল ﷺ কিছু হেঁটে আসলেন এবং আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর পুনরায় জায়নামাজে গেলেন [এবং একই নামাজ পড়তে থাকলেন]। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, দরজাটি কেবলার দিকে অবস্থিত ছিল।-[আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী। নাসায়ী ও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّحَابِ الْحَدِيثُ هَادِيَسَرِ الْبَآخْيَا : নবী করীম ﷺ এর দরজা খুলে দেওয়ার উক্ত কাজটিকে 'আমলে কাসীর' বলা যায় না। কেননা তখন হযরত আয়েশার হজরা খুব একটা প্রশস্ত ছিল না, তাই অনুমান করা যায় যে, রাসূল ﷺ সম্ভবত দরজার অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, দুই এক পা অগ্রসর হয়েই দরজাটি খুলে দিয়েছিলেন। আবার নামাজটিও ছিল নফল। অথচ নফল নামাজের মধ্যে ফরজের তুলনায় অনেক শিথিলতা রয়েছে। আর এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, হযরত আয়েশারও তাৎক্ষণিক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার একান্তই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এতসব সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে হযুরের উক্ত কাজটিকে স্বতন্ত্র ঘটনা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

وَعَنْ أَيْدِيٍّ طَلَّقَ بَيْنَ عَلِيٍّ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعِدِّ الصَّلَاةَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةِ وَتَقْصَانٍ)

৯৪১. অনুবাদ : হযরত তাল্ক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজের মধ্যে বাতকর্ম [পশ্চাৎ বায়ু নির্গত] করে, সে যেন নামাজ ছেড়ে চলে যায় এবং অজু করে পুনঃ নামাজ পড়ে। -[আবু দাউদ, তিরমিযী হাদীসটি কিছুটা কম-বেশি বর্ণনা সহকারে উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজে পশ্চাৎ বায়ু নির্গমনের বিষয়ে ইমামদের মতভেদ : নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে 'হদুস' [অজু ভঙ্গের কোনো কারণ] করলে নামাজকে প্রথম হতে পড়তে হবে, এতে কারো হিমত নেই। কিন্তু যদি অনিচ্ছা বশত হদুস হয়ে যায় তখন ইমামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, এ অবস্থায়ও নামাজ প্রথম হতে পড়তে হবে। তাঁদের দলিল- (ع) لِقَوْلِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعِدِّ الصَّلَاةَ আলাচ্য হাদীসে الصَّلَاةُ وَلْيَعِدِّ الصَّلَاةُ ঘারা সুস্পষ্টভাবে নামাজকে পুনরায় শুরু হতে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন, নামাজ প্রথম হতে পড়তে হবে না, বরং 'বেনা' [অর্থাৎ যে পর্যন্ত পড়া হয়েছিল তার পর হতে অবশিষ্ট নামাজ আদায়] করলে চলবে। অবশ্য এর জন্য শর্ত হলো, অজু ভঙ্গের সাথে সাথেই অজু করার জন্য যেতে হবে, কোনো প্রকার কথাবার্তায় কিংবা নিশ্চয়োজন কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। এ হদসটিও অনিচ্ছাকৃতভাবে হতে পারে।

আর আলাচ্য হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, শুরু হতে নামাজ পড়ার নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং উক্ত নির্দেশটি মোস্তাহাব পর্যায়ে। অথবা উত্তমতার জন্য ছিল। অথবা নামাজির মানসিক প্রবোধ ও প্রশান্তির জন্য ছিল।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضًا) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحَدٌ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَاخُذْ بِنَفْسِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯৪২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের মধ্যে কারো নামাজের মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়, সে যেন নিজের নাক ধরে বাইরে চলে যায়। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّحَابِ الْحَدِيثُ هَادِيَسَرِ الْبَآخْيَا : নামাজের মধ্যে বায়ু নির্গত হলে অনেকে লজ্জার ভয়ে বের হয় না, বরং অনেকে নামাজ পড়তে থাকে, অথচ এটা একেবারে শরিয়ত বিরোধী। তাই রাসূল ﷺ নাক ধরে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ মনে করতে পারে যে, তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। এর ফলে সে এক দিকে লোক লজ্জা হতে বাঁচতে পারবে এবং অপরদিকে আত্মাহার অস্বস্তি হতেও বাঁচতে পারবে।

وَعَنْ ٩٤٣. عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَدَكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيٍّ وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ)

৯৪৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমাদের কেউ তাঁর নামাজের শেষ সময়ে বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বক্ষণে অজু ভঙ্গ করে তা হলে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে গেছে। -[তিরমিযী] তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়। এর সনদে বৈপরীত্য ও গরমিল রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْإِنْتِزَافِ فِي إِخْتِطَامِ الصَّلَاةِ নামাজ সমাপ্তির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে যে কোনো কাজের মাধ্যমেই নামাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে। সুতরাং বাতকর্ম হলেও নামাজ সমাপ্ত হয়ে গেল, ফলে নামাজও শুদ্ধ হয়ে গেল।

ইমাম শাফেয়ীর অতিমত হলো, সালাম দ্বারাই নামাজ সমাপ্ত করা ফরজ।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সালাম দ্বারা নামাজ সমাপ্ত করা ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব। তবে যে কোনো কাজ দ্বারাই নামাজ সমাপ্ত করুক না কেন সমাপ্তির নিয়ত থাকতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে বাতকর্ম বা অন্য কিছু করলে নামাজ শেষ হয়ে যাবে। তবে সালাম ফিরানো যেহেতু ওয়াজিব তাই সালাম ছাড়া অন্য কোনো কাজ দ্বারা নামাজ সমাপ্ত করলে উক্ত নামাজ পুনঃ আদায় করতে হবে। আর অনিচ্ছাকৃত অজু ভঙ্গ হয়ে গেলে অজু করে অবশিষ্ট নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট হবে, পুনঃ আদায় করতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) সালামকে ফরজ বলেন, তাঁর মতের পক্ষে কোনো শক্তিশালী দলিল নেই। কেননা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে রাসূল ﷺ নামাজ শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন, إِذَا نَلَّكَ هَذَا أَوْ نَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ (অর্থঃ তশাহুদ পড়লে কিংবা সে পরিমাণ সময় বসে থাকলে তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে।

التَّفْضَلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٤٤. أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَى إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ تَمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَتَسَيَّتُ أَنْ أَعْتَسِلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا)

৯৪৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ নামাজ পড়তে বের হলেন। যখন তাকবীর বললেন, তখন তিনি নামাজ ছেড়ে দিলেন এবং সাহাবীদেরকে এই বলে ইশারা করলেন যে, তোমরা যেভাবে আছ থাক। অতঃপর তিনি মসজিদ হতে বের হয়ে গেলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর পুনরায় ফিরে আসলেন, তখনও মাথা হতে পানি ঝরছিল এবং সাহাবীদেরকে নামাজ পড়ালেন। যখন নামাজ সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি [সাহাবীদের উদ্দেশ্যে] বললেন, আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম; কিন্তু গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। -[আহমদ] ইমাম মালেক (র.) হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ صَلَاةِ الْمُتَقَدِّمِ بِسَلَاةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ইমামের নামাজ নষ্ট হওয়ার পর মুক্তাদির নামাজের বিধান : ইমাম শাকেরী (র.) বলেন, কোনো কারণে ইমামের নামাজ ফাসেদ হলেও মুক্তাদির নামাজ ফাসেদ হবে না। আলোচ্য হাদীসই তাঁর দলিল। তিনি বলেন, হাদীসের ভাষা বুঝা যাচ্ছে যে, মহানবী ﷺ পুনরায় এসে যখন নামাজের তাকবীর বলেছেন তখন মুক্তাদিগণ নড়নড়ভাবে কোনো তাকবীর বলেননি। এটা হতে বুঝা যায় যে, তাদের নামাজ নষ্ট হয়নি। ইমাম আবু হানীফা তথা হানাফীগণ বলেন, ইমামের নামাজ ফাসেদ হলে মুক্তাদিদের নামাজও ফাসেদ হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন, অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, صَلَاةُ الْإِمَامِ صَلَاةُ لِمَنْ خَلْفَهُ এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মুক্তাদির নামাজ ইমামের নামাজের উপরেই নির্ভরশীল। সহীহ হওয়া কিংবা নষ্ট হওয়া উভয় অবস্থায় ইমামের নামাজের উপর নির্ভর করে। আর আলোচ্য হাদীসে 'মুক্তাদিগণ পুনরায় তাকবীরে তাহরীমা বলেননি' বলেও কোনো শব্দ বা ইঙ্গিত নেই। অতএব এটাও হতে পারে যে, তাঁরা পুনরায় তাহরীমা বলেছেন, আর সংক্ষিপ্ততার দরুন তা হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি।

وَكُلُّ النَّسَائِلِ الْمُنْتَبِطَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ উক্ত হাদীস হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য হাদীস হতে সুস্পষ্টভাবে কতিপয় মাসআলা নির্গত হয়। যেমন- (১) কোনো ব্যক্তি জুনুবী হওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক গোসল করা তথা পবিত্রতা অবলম্বন করা ওয়াজিব বা জরুরি নয়, অবশ্য পূর্ণ একটি ফরজ নামাজের সময় অতিক্রম হলে তখন ফেরেশতা তাকে লানত করতে থাকে, সুতরাং তা হারাম। (২) জুনুবী অবস্থায় জমিনের উপর চলাফেরা করা, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি জায়েজ আছে। (৩) জুনুবী অবস্থায় চলাফেরা করতে অজ্ঞ কিংবা তায়ামুম করতে হবে না, করলে উত্তম, না করলেও কোনো ক্ষতি নেই ইত্যাদি।

وَعَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذُ قُبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِيَتَبَرَّدَ فِي كَفِّي أضعفها لِحَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

৯৪৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি জোহর নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে পড়তাম। একমুষ্টি কংকর আমি হাতে তুলে নিতাম, যাতে আমার হাতের শীতলতায় ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত গরমের কারণে [নিজেকে উত্তপ্ততা হতে বাঁচানোর জন্য] তা আমার সিঁজদার স্থানে রেখে তার উপর সিঁজদা করতে পারি। - [আবু দাউদ] নাসায়ীও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رَضِيَ) قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَلَاتِي فَمِغْنَا يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَعْنِكَ يَلْعَنَةُ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَرَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ

৯৪৬. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে দাঁড়ান। এমন সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম যে, 'আউয়ুবুল্লাহি মিন্কা। অর্থ-আমি তোমার থেকে আত্মাহর নিকট পানাহ [আশ্রয়] চাই। অতঃপর তিনবার বললেন, আল'আনুকা বিলা'নাতিল্লাহি। অর্থাৎ 'আত্মাহর অভিসম্পাত দ্বারা আমি তোমার উপরে অভিশাপ করি।' আর নিজ হাত এমনভাবে সখুখে প্রসারিত করলেন যেন তিনি কিছু ধরতে চাচ্ছেন। যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আত্মাহর রাসূল! আমরা আপনাকে এই নামাজের মধ্যে এমন কিছু কথা বলতে

بَابُ السَّهْوِ

পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে সাহ্

الْغَفْلَةُ عَنِ الشُّرْكِ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো- ভুলে যাওয়া অথবা এর অর্থ হলো- تَصَرَّرَ বাবে السَّهْوِ শরীয়তের পরিভাষায় নামাজের মধ্যে ভুলবশতঃ কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা কোনো ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা অতিরিক্ত হলে শেষ বৈঠকে আন্তাহিয়াযু শেষ করে ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে যে দুটি সেজদা করতে হয় তাকে সিজদায়ে সাহ্ বলে।

এক বা একাধিক ভুলের জন্য একবারই সাহ্ সেজদা করতে হয়। ইমামের সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হলে মুক্তাদিরও সাহ্ সিজদা করতে হবে, আর মুক্তাদির ভুল হলে ইমাম মুক্তাদি কারো উপর সাহ্ সিজদা আবশ্যিক হবে না।

উল্লেখ্য যে, সাহ্ সিজদা কেবল ওয়াজিবের ব্যাপারেই অনুমোদিত। কিন্তু কোনো ফরজ ছুটে গেলে সাহ্ সিজদা করলে চলবে না; বরং নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে সাহ্ সিজদা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٤٨
أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ
يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيَسَّ عَلَيْهِ
حَتَّى لَا يَذَرِي كَمَّ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ
أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৪৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার নিকটে আসে এবং তার নামাজের মধ্যে গোলযোগ ঘটায় তথা তাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কখনো বলতে পারে না যে, নামাজ কত রাকাত পড়েছে। সুতরাং যখন তোমাদের কারো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন সে যেন দুই সিজদা [সাহ্] করে, যখন সে শেষ বৈঠকে থাকে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَسَةَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيَسَّ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذَرِي كَمَّ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে সর্বদা মানুষকে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা করে, এমনকি নামাজের মধ্যেও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। সুতরাং কেউ যদি নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে রাকাত সম্পর্কে সন্দিহা হয়ে পড়ে তবে তার হুকুম এই যে, যদি এরূপ ঘটনা জীবনে প্রথমবারের মতো হয়, তা হলে সে নতুন করে প্রথম হতে নামাজ শুরু করবে; কিন্তু যদি তার এরূপ সন্দেহ প্রায়শ সৃষ্টি হয় তবে সে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে এবং সাহ্ সিজদা করবে। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর মন দৃঢ় না হয় তবে কম সংখ্যাকে ধরে নিয়ে অবশিষ্ট নামাজ আদায় করবে এবং সাহ্ সিজদা করবে। এভাবে তার নামাজ সমাপ্ত করবে।

وَعَنْ ١٤٩ عطاءِ بْنِ يسارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَيَّ مَا اسْتَبَقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ مُرْسَلًا وَفِي رِوَايَتِهِ شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ)

৯৪৯. অনুবাদ : [তাযেযী] হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যদি তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, আর সে বলতে পারে না যে তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত? তখন সে যেন সন্দেহ দূর করে [অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত রাকাতকে বাদ দিয়ে দেয়] এবং নিশ্চিত রাকাতের উপর ভিত্তি স্থাপন করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দুই [সাহ] সেজদা করে। যদি সে পাঁচ রাকাতই পড়ে ফেলে, তা হলে তার এ দুই সেজদা তার বেজোড় রাকাতকে জোড়া অর্থাৎ ছয় রাকাত করবে। আর যদি বাস্তবে পূর্ণ চার রাকাতই পড়ে ফেলে, তা হলে এ দু' সেজদা শয়তানের অপমানস্বরূপ হবে। —[মুসলিম] মালেক (র.) আতা হতে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনায় আছে যে, যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকাতই পড়ে থাকে তবে এ দু' সেজদা ঘারা তাকে জোড় [অর্থাৎ ছয় রাকাত] করে নিবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَثَرِ فِي مَحَلِّ سَجْدَتِي الشَّهْرِ :

সিজদায়ে সাহুর স্থান সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : সাহ সিজদা কখন দেওয়া হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; যা নিম্নরূপ—

ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র.)-এর মতানুসারে নামাজে কোনো রোকন কম হওয়ার কারণে যদি সাহ সিজদা করতে হয় তবে সালামের পূর্বে সিজদা করতে হবে। আর যদি কোনো রোকন বেশি হওয়ার কারণে সাহ সিজদা দিতে হয়, তবে সালামের পরে সিজদা করতে হবে। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন— সালাম পূর্বে সিজদা করার দলিল :

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْبَنَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ - (بُخَارِيُّ)
(٢) رَوَى الْمُؤَيَّرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَامَ فِي مَثْنَى مِنْ صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتِي الشَّهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ .

সালামের পরে সিজদা করার দলিল :

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتِي الشَّهْرِ بَعْدَ السَّلَامِ .
ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজের কোনো অঙ্গ কম হোক কিংবা বেশি উভয় অবস্থাতে তাশাহুদের পর সালামের পূর্বেই সাহ সিজদা করতে হবে। তাঁর দলিল—

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْبَنَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ দু'টি সাহ্ সিজদা করেছেন। তারপর সালাম ফিরিয়েছেন।
 (২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رَضِيَ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَأَلْتُ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাযলের অভিমত : ইমাম আহমদ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ হতে সর্বমোট চার স্থানে ভুলের দরুন সাহ্ সিজদা করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো- (১) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে শেষ রাকাতের পর পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। (২) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দু' রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন। (৩) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিয়েছিলেন। (৪) সূরা ফাতিহার পর কুরআন-এর আয়াত পাঠ না করে রুকু করেছিলেন। সুতরাং তিনি বলেন, এ সকল জায়গাতে মহানবী ﷺ যেভাবে সাহ্ সিজদা করেছিলেন, যদি কেউ এ জাতীয় কোনো ভুল করে, সেই ভাবেই সাহ্ সিজদা করতে হবে। অর্থাৎ যদি সালামের পূর্বে করা প্রমাণিত হয়, তবে তদনুযায়ী সালামের পূর্বেই করতে হবে। আর যদি সালামের পর করা প্রমাণিত হয়, তবে পরেই করতে হবে। আর উল্লিখিত স্থান ব্যতীত যদি অন্য কোনো প্রকারের ভুল হয়, তবে সালামের পূর্বেই সাহ্-সিজদা করতে হবে। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন। এ অবস্থায় তাঁর ও ইমাম শাফেয়ীর মায়হাব একই। ইমাম শাফেয়ীর যে দলিল, তাঁরও সে একই দলিল।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, নামাজের ওয়াজিব তরক করার মত যে কোনো প্রকারের ভুলের জন্য সালামের পরে অর্থাৎ একদিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহ্ সিজদা করবে। পরে তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া ইত্যাদি পাঠ করে নামাজ শেষে সালাম ফিরাবে। যেভাবে আমরা করে থাকি। তাঁর দলিল-

رَوَى تَوْوَابٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ غَيْرِ قَضَائِ بَيْنَ الرَّبَاةِ وَالنَّقْصَانِ

অর্থাৎ হযরত ছাওবান (রা.) মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক ভুলের জন্য সালামের পরে দু'টি সাহ্ সিজদা করতে হয়। অথচ এ হাদীসে নামাজের কোনো অঙ্গ 'কম বা বেশি' হওয়ার ব্যাপারে কোনো তারতম্য করেননি। যে রূপ ইমাম মালেক (র.) বলে থাকেন। এতদ্বিল্লি এমন বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সাহ্ সিজদা এক সালামের পর করতে হবে।

ইমাম মালেক (র.)-এর উক্তি, তথা নামাজের 'কমবেশির' ত্রুটির দরুন তিনি যে প্রভেদ বলেছেন, তাঁর এ কথা সঠিক ও সমর্থিত নয়। কথিত আছে যে, একবার ইমাম আবু ইউসুফ (র.) মালেক (র.)-কে খলিফা মনসুরের সম্মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, আশ্চা বলুন তো! যদি কোনো ব্যক্তি একই নামাজে একটি 'কম' ও আরেকটি 'বেশি' উভয় প্রকারের ভুল করে, তখন সে কিভাবে সাহ্ সিজদা করবে? অথচ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একই নামাজে এক বা একাধিক ভুলের জন্য সাহ্ সিজদা কেবল মাত্র একবারই করতে হয়। এ কথা শুনে ইমাম মালেক নির্বাক ও হতচর্চিত হয়ে পড়েছিলেন।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায় যে, হাদীসে উল্লিখিত সালামের পূর্বে অর্থ হলো নামাজ সমাপ্তির সালামের পূর্বে, একদিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে নয়। কেননা যদি কোনো ব্যক্তি এক সালামের পূর্বে সাহ্ সিজদা আদায় করে মেলে এরপরে যদি সে এক বা একাধিক ভুল করে তখন সে কি করবে। অথচ এটা সর্বস্বীকৃত যে, একাধিক সাহ্ সিজদা জায়েজ নেই। কাজেই এক সালামের পরে সাহ্ সিজদা করাই যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهَرَ حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ حَمْسًا فَسَجَدَ

৯৫০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো হজুর! জোহরের নামাজ কি [আব্দুল্লাহর পক্ষ হতে] এক রাকাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হজুর ﷺ বললেন, সেটা আবার কি কথা? লোকেরা বলল, হজুর! আপনি যে পাঁচ রাকাত পড়লেন? এটা শুনে হজুর ﷺ সালাম ফিরাবার পর দু'টি

وَعَنْهُ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ إِحْدَى صَلَوَاتِي الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ
 سَيْرِينَ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ
 نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
 سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي
 الْمَسْجِدِ فَأَتَاكَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَ
 وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ
 بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ وَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى
 ظَهْرِ كِفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ سَرَعَانَ الْقَوْمِ
 مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قُصِرَتْ
 الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي
 الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو
 الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتُ أَمْ
 قُصِرَتْ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ
 فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ
 فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ
 وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
 وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ
 أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ
 سَلَّمَ فَيَقُولُ نَبِئْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ حُصَيْنٍ

৯৫১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইবনে সীরীন (র.)
 হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি
 বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্নের দুই নামাজের
 মধ্যে কোনো এক নামাজ আমাদেরকে পড়ালেন। ইবনে
 সীরীন (র.) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সে
 নামাজের নাম [জোহর কিংবা আসর] বলেছিলেন, কিন্তু
 আমি তা ভুল গেছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,
 তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে [চার রাকাতের স্থলে] দু'
 রাকাত পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর
 মসজিদের মধ্যে এলোপাতাড়ি রাখা একটি কাঠ খণ্ডের
 সাথে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন তিনি খুব
 রাগান্বিত আছেন। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের
 উপর রাখলেন এবং উভয় হাতের অঙ্গুলি পরস্পরের মধ্যে
 প্রবেশ করালেন। তাঁর ডান গণ্ডেশ বাম হাতের পিঠের
 উপর স্থাপন করলেন। [এই ধারণাবশত যে, তিনি নামাজ
 হতে অবসর হয়েছেন।] এদিকে দ্রুতগামী জনতা
 মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল। লোকেরা
 বলাবলি করতে লাগল, নামাজ সংক্ষিপ্ত করা হলো না কি?
 জনতার মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর
 (রা.) ছিলেন। তাঁরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এই বিষয়ে
 কথা বলতে ভয় [সংকোচ] করছিলেন। লোকদের মধ্যে
 এক ব্যক্তি ছিলেন যার দুই হাত কিছুটা দীর্ঘ ছিল। তাকে
 'যুল ইয়াদাইন'; [লম্বা হাতওয়ালা] বলা হতো। তিনি
 বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না
 [আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে] নামাজ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে?
 রাসূল ﷺ বললেন, আমি ভুলিনি এবং নামাজও সংক্ষিপ্ত
 করা হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে
 বললেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তাই কি ঠিক? তাঁরা
 বললেন, জি হ্যাঁ। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে
 সম্মুখে গেলেন এবং বাকি নামাজ পড়ালেন, যা ছেড়ে
 দিয়েছিলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর
 বললেন এবং সিজদা করলেন নামাজের [সাধারণ] সিজদার
 মতো অথবা এর চেয়েও কিছু দীর্ঘ সময়। অতঃপর মাথা
 উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। অতঃপর পুনরায়
 তাকবীর বললেন এবং নামাজের সাধারণ সিজদার মতো
 কিংবা তার চেয়েও দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা
 উঠালেন এবং "আল্লাহু আকবার" বললেন। রাবী ইবনে
 সীরীনকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আবু হুরায়রা কি এটাও
 বলেছেন? "অতঃপর হজুর সালাম ফিরালেন।" তখন

وَعَمْرُوهُ ٩٥٤ الْمَغْبِرَةَ بِنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ
 قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ
 فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ
 اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجُدْ سَجْدَتِي
 السُّهُوِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৯৫৪. অনুবাদ : হযরত মুশীরাহ ইবনে শো'বা (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ
 করেছেন- যখন ইমাম দু' রাকাত পড়েই [না বসে]
 দাঁড়িয়ে যায় আর যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই
 শ্রবণ করে, তবে সে যেন বসে পড়ে। আর যদি
 সোজা হয়ে যায় তবে যেন না বসে। আর যেন [এই
 ভুলের জন্য] দু'টি [সাহ] সিজদা করে। -[আবু দাউদ
 ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْحَدِيثُ هَادِي السَّرِّحِ بِأَنَّهَا : চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম বৈঠক ওয়াজিব এবং শেষ বৈঠক ফরজ। কোনো
 ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহ সিজদা করতে হয়। তবে এ কথা শ্রবণ রাখতে হবে- দ্বিতীয় রাকাতের পর না বসে উঠে যেতে
 লাগলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে অর্থাৎ জমিন হতে উঠার অবস্থাটি নিকটবর্তী হলে শ্রবণে আসার সাথে সাথে বসে যাবে
 এবং পরে সাহ সিজদা করবে। কিন্তু যদি অবস্থাটি দাঁড়ানোর কাছাকাছি হয় কিংবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর শ্রবণ হলে
 বসবে না, বসলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ নামাজে 'কিয়াম' ফরজ। আর প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব
 রক্ষা করার জন্য কোনো ফরজকে ত্যাগ করা জায়েজ নেই। তাই মহানবী ﷺ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আর বৈঠকের দিকে
 ফিরে আসেননি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ ٩٥٥ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض)
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ
 فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ
 إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخُرْسَانُ وَكَانَ فِي
 يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ
 صَنِيعَهُ فَخَرَجَ غَضَبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى
 انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا
 قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ
 سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৫৫. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের
 নামাজ পড়ালেন এবং তিন রাকাত পড়েই সালাম
 ফিরালেন। অতঃপর [মসজিদ সংলগ্ন] নিজ ঘরে প্রবেশ
 করলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গেল যার নাম ছিল
 খিরবাক। তাঁর হাত দু'টি ছিল কিছুটা লম্বা। সে বলল, হে
 আল্লাহর রাসূল! এ বলে সে রাসূল ﷺ কে নামাজের ঘটনা
 শ্রবণ করিয়ে দিল। এটা শুনে রাসূল ﷺ [দুঃখে] রাগান্বিত
 হয়ে আপন চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং
 লোকজনের কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন, এ ব্যক্তি কি
 সত্য বলছে? সাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ
 [অবশিষ্ট] এক রাকাত পড়লেন; তারপর সালাম ফিরালেন
 এবং দু'টি [সাহ] সিজদা করলেন এবং সর্বশেষ সালাম
 ফিরালেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفَ دُرُ الْبَدِينِ : 'যুল-ইয়াদাইন' হিজ্রার বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি। তার প্রকৃত নাম উমাইর বা খিরবাক।
 কনিয়াত বা উপনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। তবে তিনি 'যুল-ইয়াদাইন' নামে পরিচিত। তার হস্তদ্বয় স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা

কিছুটা লম্বা ছিল অথবা দানশীলতায় তার হস্তদয় প্রশস্ত ছিল, অথবা হস্তশিল্প তার পেশা ছিল, ইত্যাদি কারণে তাকে যুল-ইয়াদাইন বলা হতো।

كَيْفَ صَعَتِ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْوِيمِ কথা বলার পরও কিভাবে নামাজ বিতণ্ডক হলো : আলোচ্য হাদীস ও উপরে এর একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ কথা বলার পর সাহ সিজদা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, এখানে নবী করীম ﷺ ভুলে কথা বলেছিলেন। সুতরাং তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর ন্যায় কথা বলার পর সাহ সিজদা করা যেতে পারে।

মালেকী ফিকহবিদগণ বলেন যে, রাসূল ﷺ যেহেতু নামাজ সংশোধন সম্পর্কীয় কথাবার্তাই বলেছেন, সেহেতু তাঁদের মতে এরূপ অর্থাৎ নামাজ সংশোধন সম্পর্কীয় কথা বলার পর সিজদা দেওয়া জায়েজ আছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। কেননা সাহাবী খিরবাক যুল-ইয়াদাইন ইসলামের প্রথম যুগে দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সুতরাং এটা দ্বিতীয় হিজরির পূর্বকাল ঘটনা। ইসলামের প্রথম যুগে নামাজে কথা বলা জায়েজ ছিল, পরে নিষিদ্ধ হয়েছে।

وَعَنْ ٩٥٦
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (رَض)
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى
صَلَاةً يَشْكُ فِي النَّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى
يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৯৫৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ল আর তার এই সন্দেহ হলো যে, সে নামাজ কম পড়েছে, তবে সে যেন আরও কিছু [অর্থাৎ এক রাকাত] পড়ে নেয়, যাতে সন্দেহ হয় যে, সে এক রাকাত বেশি পড়ল। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَاكَاةً مِّنْ شَيْءٍ فِي زَعْدَاوِ الرُّكْعَةِ রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির বিধান : যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ তিন রাকাত পূর্ণ হয়েছে, না চার রাকাত- এ সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে পড়ে, তবে তার বিধান কি? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

আওয়ামী, শাহ'বী প্রমুখ ইমামের মতে সর্বাবস্থায় তার নামাজ পুনঃ পড়তে হবে। হ্যা, যদি রাকাতের কোনো সংখ্যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়, তবে নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ সমাণ্ড করবে।

হাসান বসরী (র.)-এর মতে রাকাতের কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করা হোক বা বেশি সংখ্যার উপর ভিত্তি করা হোক ; উভয় অবস্থায়ই সাহ সিজদা করতে হবে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের মতে কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ ঘটনা যদি নামাজি ব্যক্তির জীবনে প্রথমবারের মতো হয়, তবে সে প্রথম হতে পুনরায় নামাজ পড়বে; কিন্তু যদি এরূপ সন্দেহ তাঁর বারবার সৃষ্টি হয় তবে সে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে। অর্থাৎ তিন রাকাত পড়েছে বলে প্রবল ধারণা হলে তিন রাকাতকে ভিত্তি করে আর এক রাকাত পড়ে নেবে এবং সাহ সিজদা করবে।

بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

পরিচ্ছেদ : কুরআনের সিজদা

سُجُودٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- الْأِنْجِنَا বা ফুকে যাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হলো- وَضَعَ الْجَبْهَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَيَبِيتُ الْعِبَادَةَ مَعَ الطَّهَارَةِ অর্থাৎ পবিত্রতা সহকারে ইবাদতের নিয়তে চেহারা মাটিতে রাখা। এখানে الْقُرْآنِ سُجُودٌ ধারা সিজদায়ে তিলাওয়াত বুঝানো হয়েছে।

তিলাওয়াতে সিজদার সংখ্যা : তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-
مَذْهَبُ أَبِي هَانِيْفَا وَ إِمَامِ شَاْفِعِي (র.)-এর মতে সিজদার আয়াত ১৪টি। ইমাম আহমদ, ইসহাক, লায়স, ইবনে ওহাব, ইবনুল মুনির প্রমুখের মতে সিজদার আয়াত ১৫টি। ইমাম মালেক, হাসান বসরী, ইবনে মুসায়্যিব, ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস প্রমুখের মতে সিজদার আয়াত ১১টি।

তিলাওয়াতের সিজদার বিধান : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আওয়ামী ও দাউদ যাহেয়ী প্রমুখের মতে তিলাওয়াতের সিজদা সন্নত। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় আছে যে, নামাজের মধ্যে ওয়াজিব, নামাজের বাহিরে ওয়াজিব নয়।

তিলাওয়াতের সিজদার পদ্ধতি : এ সিজদা তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই করতে হয়। এটা আদায় করার নিয়ম হলো, নামাজের সিজদার ন্যায় পবিত্রতার সাথে দু' তাকবীরের মাঝখানে একটি সিজদা করা। আলোচ্য অধ্যায়ে তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٥٧
ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ سَجَدَ
النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ
وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরা আন নাজমে সিজদা করেছেন এবং তার সাথে মুসলমান, মুশরিক, জিন এবং মানব সকলে সিজদা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُشْرِكُونَ মুশরিকগণ কেন সিজদা করেছিল : মুসলমানগণ নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে সিজদা করেছিলেন। কাফের মুশরিকগণ কেন সিজদা করেছিল এ বিষয়ে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কারো মতে উক্ত আয়াতে লাত, মানাত, উযায প্রভৃতি দেবতার নাম উল্লেখ ছিল এজন্য ঐ নাম শুনে তারা দেবতাদের সম্মানে সিজদা করেছিল।

শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাম্মিদে দেহলবী (র.) বলেন, ঐ আয়াত তিলাওয়াতের সময় আত্মা তাঁর কুদরতী নূরে প্রকাশিত হয়েছিলেন যে, তার সম্মোহনী শক্তিতে সকলেই এমন অভিভূত হয়েছিল যে, ভক্তি গদগদ চিত্তে সিজদা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। তখন বৃক্ষরাজিও সিজদা করেছিল। এ সময় মুশরিকগণ আয়তের সম্মোহনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে অভিভূত অবস্থায় সিজদা করেছিল। তবে বদবখত উমাইয়্যা ইবনে খালফ একমুঠি কব্বের নিয়ে নিজ কপালে লাগিয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এখানে একটি কথা বহুল প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরায়ে "নাজমের" এ আয়াতটি الرَّسْمُ اللَّاتِ أَنْزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ তেলাওয়াত করলেন, তখন কে বা কারা আত্মাহর নবীর স্বরের সাথে স্বর মিলিয়ে বলে উঠল أَنْزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ وَنَسَّأَ النَّالِيَةَ الْأَخْرَى অর্থ- এটা সবই উচ্চ মর্যাদাশালী দেবতা; অরশাই তাদের সুপারিশের আশা করা যায়। [নাইযু বিলাহ] এ কথাটি যে সম্পূর্ণ বাতুলতা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না; বরং যদি কেউ এরূপ আকিদা পোষণ করে তা হবে প্রকাশ্য কুফরি। আবার কারো মতে দ্বিতীয় ছন্দটি ফুসলবশত মহানবী ﷺ-এর মুখ হতে প্রকাশ হয়ে গেছে। এ

وَعَنْ ١٥٩. ابْنِ عُمَرَ (رَض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقرأُ السُّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزِدُجُم حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا لِنَجِبَهُمْ مَرَضًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদার আয়াত পাঠ করতেন, আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, যখন তিনি সিজদা করতেন আমরাও তাঁর সাথে সাথে সিজদা করতাম। তখন এমন ভিড় পড়ত যে আমাদের কেউ কেউ সিজদায় কপাল রাখার মতো স্থান পেত না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিলাওয়াতের সিজদাসহ আদায় করা ওয়াজিব।

وَعَنْ ١٦٠. زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رَض) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّجْمُ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬০. অনুবাদ : হযরত যায়ের ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সূরা 'আন নাজম' পাঠ করলাম। কিন্তু তিনি তাতে সিজদা করলেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কেন সিজদা করলেন না : সিজদার আয়াত শ্রবণ করা সবেও নবী করীম ﷺ কেন সিজদা করলেন না। ইমামগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পেশ করেন, যা নিম্নরূপ—

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সিজদা পরিহার করাও যে বৈধ তা বর্ণনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়। উক্ত হাদীস-ই তার প্রমাণ।

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজুবিহীন অবস্থায় ছিলেন এ জন্য তখন সিজদা করেননি। পরে সিজদা আদায় করেছেন।

অথবা তখন ছিল নিষিদ্ধ সময় তাই তিনি সিজদা করেননি। কেননা নিষিদ্ধ সময় সিজদা করা বৈধ নয়।

অথবা যাতে লোক একে ফরজ মনে না করে সেজন্য কখনও সিজদা করতেন, আবার কখনও পরিত্যাগ করতেন।

অথবা তিলাওয়াতের সিজদা তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরেও আদায় করা যায়- তা প্রমাণ করার জন্য মহানবী ﷺ তখন সিজদা করেননি।

মোটকথা, হানাফীদের মতে হাদীসটি দ্বারা কোনো মতেই প্রমাণিত হয় না যে তিলাওয়াতের সিজদা সন্নত; বরং তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব।

وَعَنْ ١٦١. ابْنِ عَبَّاسٍ (رَض) قَالَ سَجْدَةٌ صَّ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ (رَض) مَا سَجَدَ فَنِي صَّ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ

১৬১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'সাদ'-এর সিজদা গুরুত্বপূর্ণ সিজদাসমূহের অন্তর্গত নয়, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আমি [আমার গুস্তাদ] ইবনে আব্বাসকে বললাম, আমি কি সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করব? তখন তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, অর্থাৎ তার

وَسَلِيمَانَ حَتَّىٰ آتَىٰ فَيَهْدُهُمْ لِقَابِهِمْ فَسَبَّحُوا لَهُ بَدْرًا لَمُتًا
فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ أَمْرِ
أَنْ يُّقْتَدَىٰ بِهِمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

[ইব্রাহীমের] বংশধরণের মধ্য হতে দাউদ ও ইব্রাহীম
রয়েছেন। সুতরাং তাদের আদর্শের অনুসরণ কর। তারপর
বললেন, তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁদেরই একজন- এ
আয়াতে যাদের আদর্শের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।
-[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُورَةُ صَ الْجِنِّ সূরা 'সাদ' এর সিজদা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : সূরায় সঁ সিজদা সম্পর্কে
ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এখানে কোনো সিজদা নেই। তবে সূরায় হজের উভয় সিজদাই স্বীকৃত। সূরা 'সোয়াদ' সম্পর্কে
তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَابَ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ অর্থ-
“অতঃপর তিনি তাঁর [তুলের জন্য] নিজের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিমুখী হলেন।”
এটা একটি সংবাদ মাত্র সরাসরি নির্দেশ নয়। অতএব তিনি একে সিজদার মধ্যে গণ্য করেন না।

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এটাও ওয়াজিব। তাঁর দলিল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী ﷺ
'সোয়াদের' মধ্যে সিজদা করেছেন। মুজাহিদ (র.) বলেন, ইবনে আব্বাসকে সোয়াদের সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে,
উত্তরে তিনি বলেছেন نَحْنُ أَقْبَدُهُمْ فَيَهْدِيهِمْ فَسَبَّحُوا لَهُمْ অর্থ- যখন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ কে পূর্ববর্তী
নবীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং আমাদেরও হজুরের অনুকরণে সিজদা করা উচিত। প্রণাকারী জবাবে
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাটিই বলেছেন, তাঁর অনুসরণে তোমারও সিজদা করা বাঞ্ছনীয়।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে হানাফীগণ বলেন, কুরআনের মধ্যে এমন বহু আয়াত আছে যেখানে 'মাগফিরাতের' কথা
উল্লেখ আছে, যেমন হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে (الْأَيَةُ) অর্থ এখানে সিজদার
কোনো কথা উল্লেখ নেই এবং হজুর ﷺ ও এতে সিজদা করেননি। অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, এখানে [সোয়াদের] সিজদা
আল্লাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নয় বরং 'চেলাওয়াতের' দরুন ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর হযরত ইবনে আব্বাস
(রা.)-এর কথা السُّجُودِ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ এটা তার নিজস্ব উক্তি বা অভিমত। মহানবী ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী নয়। এসব
কারণে সোয়াদের সিজদা ওয়াজিব।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٦٢ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رَضًا) قَالَ
أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً
فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُقْصَلِ وَفِي
سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৯৬২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে
কুরআন শরীফের পনেরোটি সিজদা পড়ালেন।
তন্মধ্যে তিনটি সিজদা 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহের মধ্যে
এবং দু'টি সিজদা সূরা হজের মধ্যে।- [আবু দাউদ ও
ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تِلْكَ الْإِيمَةُ فِي عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ سَجْدَةُ الْبَلَاوَةِ

ইমাম আহমদ, ইসহাক, লায়স, ইবনে ওহাব ও ইবনুল মুনিযিরের মতে
কুরআনের মধ্যে ১৫টি সিজদার আয়াত রয়েছে। যথা- (১) সূরা আ'রাফে, (২) রা'দে, (৩) নাহলে, (৪) বনী ইসরাঈলে,

(৫) মারযামে, (৬ + ৭) হাজ্জে দু'টি, (৮) ফুন্নকানে, (৯) নামলে, (১০) আলিফ-লাম-হীম তানবীলে, (১১) সাদে, (১২) হামীম আস সিজদাত্তে, (১৩) আন-নজমে, (১৪) ইনশিকাকে ও (১৫) ইকরাতে। তাঁদের মতে সূরা হাজ্জে দুই সেজদা। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এক সিজদা। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন-

(১) قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الْحَجِّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا .

(২) رَوَى عُثَيْبُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ (ع) نَعَمْ . (أَبُو دَاوُدَ . تَرْمِذِيُّ)

ইমাম মালেক, হাসান বসরী, ইবনুল মুসায়্যিব, ইবনুল জ্বায়ের, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস প্রমুখের মতে কুরআনের মধ্যে ১১টি সিজদার আয়াত আছে। তারা সূরা আন-নাজম, ইনশিকাক ও ইকরা: আয়াতসমূহকে এবং সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদার আয়াতটিকে সিজদার আয়াত হিসেবে গণ্য করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে সিজদার আয়াতের সংখ্যা ১৫ - (১ + ১ + ১ + ১) = ১১টি। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল পেশ করেন-

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) أَنَّ الشَّيْخَ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ . (أَبُو دَاوُدَ)

উল্লেখ্য যে, সূরা النَّجْمِ - الْقُرْآنُ وَ الْإِنشِقَاقِ - الْتَجَمَّ হয়।

(২) عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ التَّجَمَّ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا . (أَبُو دَاوُدَ)

ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরআনের মধ্যে সিজদার আয়াত সংখ্যা ১৪টি। অবশ্য তাঁদের মধ্যে ১৪টি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী হজের উভয় সিজদার আয়াতকেই সিজদার আয়াতরূপে গণ্য করেন। তবে তাঁর মতে সূরা 'সাদ'-এর মধ্যে সিজদা নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, 'সাদ'-এর মধ্যে সিজদা আছে। অপর পক্ষে তিনি সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদার আয়াতটিকে সিজদার আয়াতরূপে গণ্য করেন না।

الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِينَ :

الْجَوَابُ عَنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ : আহমদ ও ইসহাক প্রমুখ ইমামগণ সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদা প্রমাণ করার জন্য প্রথম যে দলিলটি তথা আয়াতটি আনয়ন করেছেন এর উত্তর তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদাটি নামাজের সিজদা, তিলাওয়াতের সিজদা নয়। কেননা এখানে সিজদা করার নির্দেশটি রুকুশ নির্দেশের সাথে সংযুক্ত। আর এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, রুকুশ সাথে সিজদার নির্দেশ থাকলে সেখানে উক্ত সিজদা ঘারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আরাহর বাণী - يَأْمُرُكُمْ أَتَيْتُمْ لِرَبِّكُمْ وَأَسْجُدُوا وَأَرْكِعُوا مَعَ الرَّكُوعِينَ - এখানে সিজদা ঘারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য।

তাঁরা যে দ্বিতীয় দলিলটি পেশ করেছেন তার উত্তরে ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন - لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ - আর তাঁদের উপস্থাপিত তৃতীয় দলিলের তথা হাদীসটির উত্তরে আব্দুল হক মুহাম্মিদ দেহলবী ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন যে, হাদীসটি দুর্বল।

ইমাম মালেক (র.)-এর পেশকৃত ইবনে আক্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে আব্দুল হক মুহাম্মিদ দেহলবী (র.) বলেন- هَذَا إِنَّ الشَّيْخَ ﷺ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ تَا حَاقًا هَيْرَتِ وَأَبُو هَيْرَةَ (رَأَى) هَذِهِ بَرْنِيتِ آخِةَ بِأَنْتَوِي أَنْتَوِي অথবা উত্তর এই যে, ইবনে আক্বাস (রা.)-এর এ সম্পর্কে জানা ছিল না, তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী বলেছেন।

তাঁদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় হাদীসের জবাব এই যে, রাসূল ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। পরে সিজদা করেছেন। যেমন বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে- أَنَّهُ السَّيِّدُ ﷺ سَجَدَ بِالتَّجَمِّ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ - হতে বর্ণিত আছে-

الْعَرَانِيَةُ أَرْبَعَ لَمْ تَنْزِلْ . ثُمَّ السَّجْدَةُ . التَّجَمُّ رَافِعًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .

وَعَنْ ١٦٣ عُمَةَ بْنِ عَامِرٍ (رَضًا) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالتِّرْمِذِيِّ وَفِي الْمَصَابِيحِ فَلَا يَقْرَأُهَا كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ)

৯৬৩. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সূরায় হজের মর্যাদা বেশি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাতে দুটি সিজদার আয়াত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তি ঐ দু' সিজদা না করে সে যেন ঐ দু' আয়াতই না পড়ে। -[আবু দাউদ ও তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র শক্তিশালী নয়। মাসাবীহ গ্রন্থেও শরহে সুন্নাহর অনুরূপ 'ফালা ইয়াকরাহা' অর্থাৎ "অতএব সে যেন তা না পড়ে" কথাটি রয়েছে।

وَعَنْ ١٦٤ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكِعَ فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯৬৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজে একটি সিজদা করলেন এবং দাঁড়ালেন, অতঃপর [নিয়মিত] রুকু করলেন- এতে সাহাবীগণ মনে করলেন যে, রাসূল ﷺ সূরা 'তানযীলুস সিজদা' পাঠ করেছেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُورَةُ الْحَجِّ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে যে, কেবল জেহরী পড়া হোক কিংবা নীরবে পড়া হোক, তেলাওয়াতের মধ্যে সিজদার আয়াত আসলে তা পাঠের পর সিজদা করতে হবে। যেমন- রমজানের তারাবীহের 'জেহরী' কেবলতে আমরা হাফেজ ইমামের পিছনে সিজদা করে থাকি। আর এখানে সাহাবীগণ 'ইখফা' নামাজে হজুরের পিছনে সিজদা করেছেন।

وَعَنْ ١٦٥ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فِإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯৬৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُورَةُ الْحَجِّ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক (র.) বলেন, সিজদার জন্য তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলা আবশ্যিক। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও অভিমত এটাই। ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে অপর একটি রেওয়াজ আছে যে, সিজদায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে না, বরং আয়াতটি পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আবার কেউ উল্লেখ করেছেন যে, সিজদার শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে সিজদার শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বলতে হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফের মতে বলতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দুই হাত উত্তোলন করে ইহরামের জন্য তাকবীর বলতে হবে, অতঃপর সিজদার জন্য তাকবীর বলতে হবে। সিজদা দাঁড়িয়ে করা মোত্তাহাব। হযরত আয়েশা (রা.) হতে একপই বর্ণিত আছে। তবে কারো মতে সিজদা দাঁড়িয়ে করা মোত্তাহাব নয়। -[মিরকাত]

وَعَنْ ۱۹۬۶ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّكِيبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىٰ أَنْ الرَّكِيبَ لَيَسْجُدُ عَلَىٰ يَدِهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯৬৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর একটি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন সমস্ত লোক সিজদা করল। তাদের মধ্যে কেউ সওয়ারীর উপরই সিজদা করল, আর কেউ জামিনের উপর সিজদা করল এমনকি কোনো কোনো সওয়ার ব্যক্তি আপন হাতের উপর সিজদা করল। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُجُّ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে প্রথমত এটা বুঝা যায় যে, সিজদায়ে তিলাওয়াত অবশ্যই আদায় করতে হয়, নতুবা লোকেরা যে কোনো অবস্থায় সিজদা করতে বাধ্য হতো না।

দ্বিতীয়ত, 'হাতের উপরে সিজদা করেছেন' এ কথা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য সওয়ারি হতে জমিনে অবতরণ করা আবশ্যিক নয়। সওয়ারির পিঠের গদীর উপর হাত রেখে সেই হাতের উপর বাঁড়কে একটু খুকালে সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এটা হানাফীদের অভিমত। শাফেয়ীগণ বলেন, হাতের উপর বা সওয়ারির উপর থেকে সিজদা করা জায়েজ নেই, অবশ্যই জমিনে অবতরণ করতে হবে।

وَعَنْ ۱۹۬۷ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضًا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমনের পর 'মুফাসসালে' সূরাসমূহের কোনো সূরায়ই সিজদা করেননি। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دُعُوعُ السَّعَارِضِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যকার ঘন্দ্বের সমাধান : পূর্বে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমরা মহানবী ﷺ এর সাথে 'মুফাসসালের' অমুক অমুক সূরায় সিজদা করেছি। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস এর বিপরীত। হাদীসবিশারদগণ এর জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটিকে বিভিন্ন কারণে অধিক বিতর্ক বলে মত প্রকাশ করেছেন। (১) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের সাত বছর পর মদীনায় আগমন করে উক্ত সপ্তম হিজরিতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর তিনিই বলেন, আমরা হুন্দের সাথে মুফাসসালের অমুক অমুক সূরায় সিজদা করেছি। (২) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ছাড়াও বহু সংখ্যক সাহাবী বলেন, মুফাসসালে' সিজদা আছে। (৩) উসূল বা সূত্রের কথা : ইতিবাচক ও নেতিবাচকের মধ্যে বিরোধ হলে ইতিবাচককে গ্রহণ করাই উত্তম।

جَرَأُ لَمْ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার। শায়খ আব্দুল হক দেহলবী (র.) তাঁর 'আহকাম' গ্রন্থে বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়। অধ্যায়ের প্রথম হাদীসেই ইবনে আব্বাস (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ সূরায় 'আন নাজম' তেলাওয়াত করে সিজদা করেছেন, অথচ এটা মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে, মহানবী ﷺ 'মুফাসসালে' সিজদা করেছেন এটাই সঠিক। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অবগত ছিলেন না; বরং নিজের অবগতিটাই বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার পর হাদীসঘরের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجْدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقَسْرَتِهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

৯৬৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তিলাওয়াতে সিজদায় এ দোয়া পাঠ করতেন, যার অর্থ : “আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার জন্য সিজদা করল, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে।” [আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশা (রা.) রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দোয়া পড়তে শুনেছেন বলে তিনি রাতের বেলার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দিনেও এরূপ দোয়া পড়া যেতে পারে। আর সিজদার নিয়মিত দোয়া ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ পড়তেও চলে।

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ (رَض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أَصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدْتُ فَسَجَدْتُ الشَّجَرَةَ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَأَجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ دُخْرًا وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكَرْ وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

৯৬৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাতে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেকে [স্বপ্নে] দেখলাম, যেন আমি একটি বৃক্ষের পিছনে নামাজ পড়ছি। তখন আমি তেলাওয়াতের সিজদা করলাম। বৃক্ষটিও আমার সাথে সিজদা করল। তখন আমি বৃক্ষটিকে বলতে শুনলাম যার অর্থাৎ “হে আল্লাহ! এই সিজদার বিনিময়ে তুমি আমার জন্য ছুওয়াব লিখে রাখ এবং এর কারণে আমার পাপসমূহ দূর করে দাও, একে আমার জন্য তোমার দরবারে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখ এবং তা আমার পক্ষ হতে গ্রহণ কর, যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ হতে গ্রহণ করছ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর এটা শুনে নবী করীম ﷺ এক সিজদার আয়াত পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। তখন আমি শুনলাম যে, তিনি এভাবে দোয়া পাঠ করছেন, যেভাবে ঐ লোকটি বৃক্ষের ঘটনা বর্ণনা করেছিল। অর্থাৎ তিনিও সেই একই দোয়া পাঠ করলেন। [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। তিরমিযী আরও বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَى فِي النَّيَمِ سُمُودَ الشَّجَرَةِ وَمَا مِنَ الرَّاقِعَةِ
সে ঘটনাটি কি? অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যিনি স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)। ইবনে মালিক বলেছেন, হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে যেভাবে বৃক্ষ কথা বলেছিল, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা এ দৃষ্টান্তকেও বাকশক্তি দান করেছিলেন। আল্লামাহ শায়খ জাযীরী বলেন, উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা সহজে মেনে নেওয়া যায় না যে, তা কোনো ফেরেশতা ছিলেন- যা বৃক্ষের আকৃতিতে কথা বলেছে। কেননা মানুষ স্বপ্নে যা কিছু দেখে তা একটি ধারণা প্রসূত ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এটা তাবিল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। কাজেই তা বৃক্ষই ছিল। আর সূরায় 'সোয়াদ'-এর সিদ্ধান্ত আয়াতটি হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গেই কুরআনে এসেছে। সুতরাং এজন্যই দোয়াতেও হযরত দাউদের উল্লেখ হয়েছে। পক্ষান্তরে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সূরা সোয়াদের সিদ্ধান্তটি তিলাওয়াতের সিদ্ধান্ত।

بَيَانَ الرَّاقِعَةِ مَعَ دَاوُدَ (ع.)
হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার বর্ণনা : বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.) তাঁর নিজের জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করেছিলেন। আর সে সময়সূচি হিসেবেই তিনি স্বীয় কার্যাদি সমাধা করতেন। যেমন- সপ্তাহে একদিন তিনি দরবারে বসতেন আবার একদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকতেন। আর একদিন আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। আর ঐ সময় তাঁর সাথে কারো সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না। এ অভ্যাস অনুশারে তিনি একদিন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল ছিলেন, এমনভাবে স্থায়ী কয়েকজন লোক প্রাচীর উপকিয়ে তাঁর সমুখে এসে দাঁড়ায়। তখন তিনি এই আকস্মিক ঘটনার দরুন ঘাবড়ে যান, তিনি ভাবলেন- এত উঁচু দেয়াল কেমন করে তারা ডিঙ্গাতে সক্ষম হলো? আর কি তাদের উদ্দেশ্য? ফলে হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে নিমগ্নতা আর অবশিষ্ট ছিল না; বরং তিনি ইবাদত ছেড়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। হযরত দাউদ (আ.)-কে এমন বিচলিত অবস্থায় দেখে লোকেরা এ বলে সাধুনা দিল যে, আমরা মূলত একটি বিবাদের মীমাংসা করতে এসেছি। সুতরাং আপনার ভয়ের কোনোই কারণ নেই; বরং আমাদের বিবাদটি কোনো রকম কালক্ষেপণ না করে সুবিচারের মাধ্যমে মীমাংসা করে দিন। মোটকথা, ইনসাফ বা সুবিচার কাকে বলে তা অবগত হওয়ার জন্যই আজকে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তাদের কথাবার্তার এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে হযরত দাউদ (আ.) আশ্চর্যান্বিত হলেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِنَا الْخ. (ص. ২২ - ২১)
অতঃপর তারা বলল-

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَجْعَةً وَلِي نَجْعَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. (ص. ২৩)

অর্থঃ "এ ব্যক্তি আমার ভাই। তার ৯৯টি জেড়ী রয়েছে, আর আমার রয়েছে মাত্র একটি। সে আমার এই একটিও তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে এবং বাধ্য করছে। অথচ সে সম্পদ, বাকপটুতা তথা সার্বিক ক্ষেত্রে আমার অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ। আবার মানুষও তার সাথে হাত মিলায়। তাই সে সর্বদাই আমার উপর অত্যাচার করে থাকে।" তখন হযরত দাউদ (আ.) বললেন- (২৪. ص.) نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ
অর্থঃ "তোমার দুর্ঘাটিকে তার দুর্ঘার সাথে মিলানোর আবেদন করে সে তোমার উপর অবিচার করেছে।"

এরপর হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারলেন যে, এটা তার বিরতি একটি পরীক্ষা মাত্র এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সতর্কবাণী রূপে। আর এ খেলাপ আসা মাত্র হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দরবারে ক্ষমার জন্য ঝুঁক পড়েন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুল এটাই ছিল যে, তিনি ইবাদতের জন্য একটি দিন নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যে দিনটিতে তিনি শুধুমাত্র ইবাদতই করবেন, অন্য কোনো কাজ করবেন না, এ জন্য নবী হিসেবে তাঁর মধ্যে পূর্ব ছিল। আর এ গর্বাটাই তাঁর ভুল হয়েছিল। এমনকি ঘরের সবার জন্য ২৪ ঘণ্টা ভাগ করে কোন কোন ঘটনায় ইবাদত করবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আর এ সুন্দর নিয়মতান্ত্রিকতার দরুন স্বাভাবিকভাবেই তিনি কিছুটা গর্ববোধ করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, হে দাউদ! কোথায় সুন্দর ব্যবস্থাপনা, আর কোথায়ই বা তোমার ইবাদতের নিমগ্নতা, জানো সবইতো মহান সন্তোষের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। এতে বান্দার কোনোকোন গর্ববোধ করার মতো কিছু আছে কি? সুতরাং তোমার ঐ কৃতকর্মের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো ও সিদ্ধান্ত অবনত হও।

التَّالِيَةُ : التَّالِيَةُ

عَنْ ٩٧. ابْنِ مَسْعُودٍ (رَضًا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنْ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِنِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قُبُلِ كَافِرًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ أَمِيَّةُ بِنِ خَلْفٍ) .

৯৭০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সূরা 'আন নাজম' পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদা করলেন এবং যারা তাঁর কাছে ছিল [মুসলমান ও অমুসলমান] সকলই সিজদা করল। কিন্তু কুরাইশদের একবৃদ্ধ সিজদা করল না। সে একমুষ্টি কংকর অথবা মাটি হাতে নিয়ে নিজ কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, 'আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ ঘটনার পর আমি তাকে [বদর প্রান্তরে] কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। -[বুখারী ও মুসলিম] বুখারী তাঁর বর্ণনায় আরও বর্ধিত করে বলেছেন, সে বৃদ্ধ লোকটি হলো উমাইয়া ইবনে খালফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরাইশের বৃদ্ধ লোকটির পরিচয় : হাদীসে উল্লিখিত কুরাইশ বৃদ্ধটির পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে- ইমাম বুখারী (র.) নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, উক্ত কাফের বৃদ্ধ লোকটি ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। কিন্তু হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) বলেছেন যে, তাঁর নামে মতভেদ রয়েছে- (১) কারো মতে সে হলো ওয়ালাদ ইবনে মুগীরা। (২) অন্য এক দলের মতে সাঈদ ইবনুল আস। (৩) আরেক দলের মতে আবু লাহাব।

عَنْ ٩٧١. ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضًا) قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَا وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَرَبَّةً وَتَسَجَدَهَا شُكْرًا - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৯৭১ অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরায় 'সোয়াদে' সিজদা করলেন এবং বললেন, হযরত দাউদ (আ.) এতে সিজদা করেছিলেন 'তওবা' স্বরূপে। আর আমরা সিজদা করছি তওবা কবুলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপে। -[নাসাই]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ٩٧١. ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضًا) قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَا وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَرَبَّةً وَتَسَجَدَهَا شُكْرًا - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আব্বাস ইবনে হাজর (র.) বলেন, তওবা কবুলের শোকরিয়া অর্থ- আমাদের নবীর বা আমাদের নিজেদের তওবা কবুলের শোকরিয়া নয়, বরং হযরত দাউদ (আ.)-এর তওবা কবুল। কেননা 'নবীগণ সবই এক ব্যক্তি সাদৃশ্য'। একজনের উপর আল্লাহর নিয়ামত বর্ধিত হওয়া পক্ষান্তরে সকলেই সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার অঙ্গভুক্ত। তাই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদা করছি। এ ব্যাখ্যা হতে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, সূরা সোয়াদের সিজদা ওয়াজিব।

بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ

পরিচ্ছেদ : নিষিদ্ধ সময়সমূহ

شَدِيدٌ শক্তি বহুবচন, একবচনে, رَنْتٌ শাদিকি অর্থ হলো- সময় তথা দিন বা রাতের অংশ বিশেষ।

সাধারণত যে সব সময়ে নামাজ, তেলাওয়াতের সিজদা বৈধ নয় সে সময়কে النَّهْيُ বলা হয়, এ সব সময়ে নামাজ পড়া হারাম: সূর্য উদয়, অস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় কোনো নামাজই জায়েজ নেই।

আর হানাবীদের মতে ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া মাকরুহ। এ সময়ে জানাযার নামাজ এবং তিলাওয়াতের সিজদাও বৈধ নয়। কিন্তু যদি তখন জানাজা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় সিজদার আয়াত পাঠ করা হয়, তবে উক্ত মাকরুহ সময়েও জানাজা ও তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা জায়েজ আছে। এমনিভাবে সেই দিনকার আসরের নামাজ সূর্যাস্তের সময়ও আদায় করা জায়েজ আছে, তবে তা মাকরুহে তানযীহী হিসাবে পরিগণিত হবে। আলোচ্য অধ্যায়ে নিষিদ্ধ সময়সমূহের হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٧٢
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فِصْلِي عِنْدَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَفِي رِوَايَةٍ
قَالَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ
حَتَّى تَبْرُزَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا
الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحِينُوا بِصَلَاتِكُمْ
طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ
قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সূর্যোদয়ের সময় নামাজ পড়তে ইচ্ছা না করে, আর সূর্যাস্তের সময়ও নামাজ পড়তে ইচ্ছা না করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, সূর্যের গোলকটা যখন উদয় হতে থাকে, তখন নামাজ ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আর যখন সূর্যের চাকতিটা অস্ত যেতে থাকে, তখন নামাজ ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তা পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তোমরা তোমাদের নামাজকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেরি করো না। কেননা, তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে উদিত হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَائِهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত الشَّيْطَانِ কথাটি মূলত রূপকার্থবোধক একটি উপমা। কেননা শয়তানের প্রকৃতপক্ষে কোনো শিং নেই। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় শয়তান সূর্যকে পিছনে রেখে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সূর্যরশ্মি তার মস্তকের উভয় পার্শ্ব দিয়ে বিক্ষুরিত হতে থাকে। তখন সূর্য পূজারী কাফির-মুশরিকরা সেই দিকে মুখ করে পূজা-অর্চনা করে, আর শয়তান তাদের অভিবাদন গ্রহণ করতে থাকে। সুতরাং তাদের অনুকরণে সেই সময় কোনো সালাত বা সিজদা আদায় না করার জন্য মহানবী ﷺ বীয উখতকে নিষেধ করেছেন।

কারো মতে শয়তানের প্রকৃতই দুটি শিং রয়েছে, সে সূর্য উদয়ের সময়ে উদয়স্থলে গিয়ে দাঁড়ায় যাতে সূর্য তার দুই শিংয়ের মধ্যখানের উদিত হয়।

وَعَنْ عُمَةَ بْنِ عَامِرٍ (رَضًا) قَالَ
 ثَلُثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ
 نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حَتَّى
 تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِأَزْغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَجِبْنَ
 يَقُومَ قَائِمَ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ
 وَجِبْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى
 تَغْرُبَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৭৩. অনুবাদ : হযরত উক্বা ইবনে আমের (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময়ে আমাদেরকে
 নামাজ পড়তে এবং আমাদের মৃতকে দাফন করতে
 [অর্থাৎ জানাজা পড়তে] রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ
 করতেন। যেমন— (১) যখন সূর্য কিরণময় হয়ে উদয়
 হতে থাকে, যতক্ষণ না তা কিছু উপরে উঠে যায়।
 (২) যখন দুপুরের ছায়া স্থির হয়ে দাঁড়াই যতক্ষণ না
 এর ছায়া কিছুটা চলে পড়ে। (৩) যখন সূর্য অস্তমিত
 হতে থাকে, যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে
 যায়।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে যে, দাঁউদ
 যাহেরীর মতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ঠিক দ্বি-প্রহর, ফজরের পর এবং আসরের পর এই পাঁচ সময় সাধারণতঃ সকল ধরনের নামাজ
 পড়া বৈধ। তাঁর যুক্তি হলো, কেননা এ পাঁচ সময় নামাজ পড়ার বৈধতা সম্পর্কে একদল সাহাবীদের অভিমত বিদ্যমান রয়েছে;
 কিন্তু জমহর ওলামা এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এদের মাঝেও মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মত
 দলিলসহকারে প্রদত্ত হলো—

- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন— যে নামাজের জন্য কোনো সবব বা কারণ নেই, সাধারণত উপরিউক্ত পাঁচ সময়— সে নামাজ
 পড়া বৈধ নয়। অবশ্য যে নামাজের কারণ রয়েছে, যেমন মানতের নামাজ এবং কাযা নামাজ তা আদায় করা এ
 সময়গুলোতে জায়েজ। তার দলিল হলো হযরত কুরাইব বর্ণিত হাদীস, যা তিনি হযরত উম্মে সালামা হতে বর্ণনা করেছেন।
 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضًا) حَيْثُ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ
 يُصَلِّيَهُمَا فَأَرَسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَتَانِي تَأْسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَتَغْلَوْنِي عَنِ
 الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فُهَذَا هَاتَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
- ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উক্ত নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামাজ পড়া হারাম।
 কিন্তু ফরজ নামাজ পড়া হারাম নয়। তাঁদের দলিল হলো— إِذْ ذُكِرَ مَا
 أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ تَبِعَ عَنِ صَلَاةٍ فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذُكِرَ مَا
 إِيمَانُ أَبِي حَنِيفَةَ
 ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর মতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় কোনো ধরনেরই
 নামাজ পড়া বৈধ নয়। চাই তা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, কাজা বা মানত যাই হোক না কেন। তিনি নিজ অভিমতের
 পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন।
- عَنْ عُمَةَ بْنِ عَامِرٍ (رَضًا) قَالَ ثَلُثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ
 مَوْتَانَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِأَزْغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَجِبْنَ يَقُومَ قَائِمَ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ
 الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَضَيَّفُ الشَّمْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
- عَنْ أَبِي عَمْرٍ (رَضًا) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْرَى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا الْخ. (مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ)
- عَنْ عَائِشَةَ (رَضًا) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১. হযতে সে সাহাবীগণ নিষিদ্ধ সময় নামাজ পড়ার ব্যাপারে রাসূলের নিষেধের কথা শুনেনি।

২. অথবা তাঁদের নিকট রাসূল ﷺ এর নিষেধ পৌছানোর পূর্বেই তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সে অনুযায়ী নিজেরাও
 আমল করেছেন।—[ফাতহুল মুলহিম]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত কুরাইব হতে বর্ণিত উমে সালামার যে হাদীসটি দলিল হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন এর প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, এটা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ছিল।

অথবা রাসূল ﷺ তা জীবনে একবারই করেছিলেন।

ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.)-এর দলিলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.) فَلَمَّسَهَا إِذَا ذَكَرَهَا হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে, যখন মুবাহ এবং হারাম একত্রিত হবে তখন হারামকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর নিষিদ্ধ হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. অথবা এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হাদীসের তুলনায় দুর্বল বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. অথবা এর উত্তরে বলা যায় যে، وَتَلَمَّسَهَا إِذَا ذَكَرَهَا-এর অর্থ হলো যখন স্মরণ আসবে তখন নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য সময় নামাজ আদায় করবে।

وَعَنْ ١٧٤ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭৪. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজরের নামাজের পর আর কোনো নামাজ নেই যতক্ষণ না সূর্য কিছু উপরে উঠে যায় এবং আসরের নামাজের পরও কোনো নামাজ নেই যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اٰخِلَاتٌ اَلَا تَمُرُّنِي الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ হানাফী মতাবলম্বী আলিমগণ বলেন, হযরত কায়েস (রা.)-এর হাদীস [৯৭৭ নং হাদীস] তাকরীরী বা সামর্থনমূলক হাদীস। হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর কাওলী হাদীসের তুলনায় তা দুর্বল। এ ছাড়া আসরের পরে দু' রাকাত নফল পড়া নবী করীম ﷺ-এর বিশেষত্ব ছিল। কেননা তাহাবী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন হযরত উমে সালামা (রা.) নবী করীম ﷺ-কে আসরের ও ফজরের পরে নামাজ পড়তে দেখেছেন, তখন প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও কি পড়ব? তখন রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। মেশকাত শরীফে আছে, হযরত ওমর (রা.) আসরের পরে নফল নামাজ পাঠকারীদেরকে নিষেধ করতেন। অনেক সময় তরবিয়াতের জন্য প্রহার করতেন।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এক সময় ফরজ নামাজ জায়েজ আছে, তবে ওয়াজিব ও নফলসমূহ জায়েজ নেই। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নফল জায়েজ নেই, মক্কার হোক বা মক্কার বাইরে হোক; কারণ সম্বলিত হোক বা না হোক। তবে তাঁর মতে তওয়াফের দুই রাকাত, কাজা ও মানত নামাজ জায়েজ আছে।

وَعَنْ ١٧٥ عَمْرٍو بْنِ عَبَّسَةَ (رَض) قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَتْ الْمَدِينَةَ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَ يَنْدُبُ يَسْجُدُ لَهَا

৯৭৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, আমিও মদীনায় আসলাম এবং রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, [হে রাসূল ﷺ!] আমাকে নামাজের সময় সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ফজরের নামাজ পড়বে অতঃপর সূর্য উদয় হতে থাকলে নামাজ হতে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না তা কিছুটা উপরে উঠে। কারণ সূর্য যখন উদয় হয়, তখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে উদয় হয়। ঐ সময় কাফেরগণ তাকে পূজা করে। অতঃপর [ইশ্রাক] নামাজ

الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلَّى فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ
 مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ بِالرَّمْعِ
 ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ جِنْتَيْدَ تَسْجُرُ
 جَهَنَّمَ فَإِذَا أَقْبَلَ النَّفْيُ فَصَلِّ فَإِنَّ
 الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَصَلِّيَ
 الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى
 تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي
 الشَّيْطَانِ وَجِنْتَيْدِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ
 قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ حَدَّثَنِي
 عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَغْتَرِبُ وَضُوءَهُ
 فَيَمَضِيضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْشِرُ إِلَّا
 خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِينِهِ ثُمَّ
 إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ
 خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ
 ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ
 خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ
 يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ
 أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ
 إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ
 مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى
 فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالذَّنِي
 هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَرَعَّ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ
 مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

পড়বে। কেননা তখনকার নামাজে ফেরেশতাগণ হাজির
 হয়ে থাকেন এবং সাক্ষ্য হন- যতক্ষণ না বর্শার ছায়া
 সংক্ষিপ্ততম পর্যায়ে পৌঁছে [অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহর হয়] তখন
 নামাজ হতে বিরত থাকবে। কেননা ঐ সময় দোজখকে
 উত্তপ্ত করা হয়। অতপর বর্শার ছায়া যখন ঢলে পড়বে
 তখন নামাজ পড়বে, যতক্ষণ না আসর নামাজ পড়বে।

কেননা তখন ফেরেশতা হাজির হয়ে থাকেন এবং সাক্ষ্য
 হন। অতঃপর নামাজ হতে বিরত থাকবে যতক্ষণ না সূর্য
 অস্তমিত হয়। কেননা সূর্য অস্তমিত হয় শয়তানের দুই
 শিং-এর মধ্যে। তখন কাফেরগণ একে পূজা করে। রাবী
 হযরত আমার (রা.) বলেন, আমি পুনরায় বললাম, হে
 আল্লাহর নবী! এবার অজু প্রসঙ্গ, আমাকে অজুর ফজিলত
 সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যে
 কেউই অজুর পানি সংগ্রহ করে কুলি করে, নাকে পানি
 দেয় এবং নাক ঝাড়ে নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের যাবতীয়
 গুনাহ, তার মুখ গহ্বর ও নাকের অভ্যন্তর ভাগের
 গুনাহসমূহ হরে যায়। অতঃপর যখন সে এমনভাবে নিজ
 মুখমণ্ডল ধৌত করে যেরূপ ধোয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ
 দিয়েছেন, তখন তার মুখমণ্ডলের যাবতীয় গুনাহ তার
 দাড়ির পার্শ্ব দিয়া পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন
 সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার দুই হাতের
 যাবতীয় গুনাহ তার হাতের আঙ্গুলের পার্শ্ব দিয়ে পানির
 সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে নিজ মাথা মাসাহ
 করে, তখন তার মাথার গুনাহসমূহ চুলের পার্শ্ব দিয়ে
 পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন দুই গোড়ালি পর্যন্ত
 ধৌত করে, তখন তার দুই পায়ের গুনাহসমূহ অঙ্গুলির
 পার্শ্ব দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন
 নামাজের জন্য দাঁড়ায় এবং একাধ্র মনে নামাজ পড়ে,
 আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, আল্লাহ মর্যাদা ঘোষণা
 করে যার প্রকৃত অধিকারী তিনি এবং নিজের অন্তরকে
 আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করে তাহলে সে অবশ্যই তার
 গুনাহসমূহ হতে পবিত্র হয়ে যায় সেদিনের ন্যায়, যেদিন
 তার মা তাকে প্রসব করেছিল।- [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

‘كَيْوَمَ وَلَدَتْنَا أُمُّ’-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে অজু করে, সে ব্যক্তির অজুর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে ওনাহ করে যায় এবং এ ব্যক্তি সেই দিনের ন্যায় নিশাপ হয়ে যায়, যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। এর দ্বারা একথা বুঝা ঠিক নয় যে, তার কবীরা ওনাহও মাফ হয়ে যায়। শুধুমাত্র সগীরা ওনাহের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। অবশ্য তাও তখন যখন তার কবীরা ওনা থাকে না। কেননা সগীরা ওনাহ তখনই মাফ হয়, যখন কবীরা ওনাহ থাকে না। আর কবীরা ওনাহ তওরা বাতীত মাফ হয় না। সুতরাং হাদীসাংশের অর্থ এই যে,- যে ব্যক্তির কবীরা ওনাহ নেই সে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করার কারণে সদা প্রস্তুত নিশাপ বাকার মতো হয়ে যায়।

وَعَنْ ١٧٦ كُرَيْبِ (رَحِمَهُ اللهُ) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أُرْسِلُوا إِلَى عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْنَا السَّلَامَ وَسَلِّمْ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أُرْسِلُونِي فَقَالَتْ سَلِّ أُمَّ سَلْمَةَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ فَرَوَّزَنِي إِلَى أُمَّ سَلْمَةَ فَقَالَتْ أُمَّ سَلْمَةَ سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ثُمَّ دَخَلْتُ فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْلِي لَهُ تَقُولُ أُمَّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتِكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا قَالَ يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَأَيْتِ أَنَا نِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَسُغِّلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَمَا هَاتَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭৬. অনুবাদ : [তাবেহী] হযরত কুরাইব হতে বর্ণিত। একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মিসওয়রা ইবনে মাখরামা ও আব্দুর রহমান ইবনে আযহার (রা.) এই কয়জন সাহাবী তাঁকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তারা বললেন, তুমি তাঁকে আমাদের সালাম বলবে এবং আসরের পরে দু' রাকাত নামাজ পড়া সম্পর্কে [তাঁর কি মতামত] তা জিজ্ঞাসা করবে। বর্ণনাকারী কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং সাহাবীত্রয় যে উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠিয়েছেন তা বললাম। তখন তিনি বললেন, এ সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি তাদের [সাহাবীত্রয়ের] কাছে ফিরে গেলাম। তখন তাঁরা আমাকে উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ দু' রাকাত পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। এরপর একদিন আমি দেখছি তিনি ঐ দু' রাকাত পড়ছেন। পরে যখন তিনি ঘরে পৌছলেন, তখন আমি আমার এক দাসীকে তাঁর খেদমতে পাঠালাম। তাকে এ কথা বলে পাঠালাম যে, তুমি গিয়ে হজুর ﷺ-কে এই কথা বল যে, উম্মে সালামা বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এই দু' রাকাত নামাজ পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি, অথচ আমি আপনাকে ঐ দু' রাকাত পড়তে দেখলাম [এর কারণ কি]? তখন হজুর ﷺ বললেন, হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পর দু' রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ [যা আজ তুমি আমাকে পড়তে দেখেছ]। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আব্দুল কায়স গোত্রের কিছু লোক [অদা] আমার কাছে এসেছিল, তাদের সাথে [দীনি আলোচনায়] ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন জোহরের পরের দু' রাকাত থেকে গেল। আর তাই সেই দু' রাকাত [যা আমি আসরের পরে পড়েছি]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْلَافَ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ :

আসরের পর নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামসের মতভেদ : আসরের পর নামাজ পড়া জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামসের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে আসরের পর ফরজ নামাজ আদায় করা বৈধ; কিন্তু নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কেননা ফরজের গুরুত্ব অত্যধিক। ইমাম আহমদ (র.) ও এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
২. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আসরের পর মানত ও কাজা এই জাতীয় নামাজ আদায় করা বৈধ। তিনি বীয অভিমতের স্বপক্ষে বর্ণিত হযরত কুরাইব (রা.)-এর হাদীসসহ নিম্নের হাদীসগুলো পেশ করেন।

(الف) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) مَا تَرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(ب) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ مَا تَرَكَهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدْوِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আসরের পরে সূর্যাস্তের পূর্বে নফল, মানত নামাজ সবই হারাম। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলা ইবনে যিয়াদ প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

أَلْعَارُضُ بَيْنَ الْحَوَيْتَيْنِ وَ دَفْعُهُمَا :

দু'টি হাদীসের মধ্যে ষনু ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত **انه كان يصليهما دائما** ইমামসের মধ্যে ষনু ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত **انه كان يصليهما دائما** এই দু' রাকাত নামাজ সদা সর্বদাই পড়তেন। অথচ উম্মে সালামার হাদীসে মাত্র একদিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর জবাবে ইবনুল মালাক বলেছেন, এটা মহানবী **ﷺ**-এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই স্বয়ং নিজে পড়তেন এবং অন্যের জন্য নিষেধ করতেন। এ প্রসঙ্গে আত্তামা ত্বাহাবী সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) হজুর **ﷺ**-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আত্তামাহ রাসূল! আমি কি উক্ত দুই রাকাত পড়ব? উত্তরে হজুর **ﷺ** বললেন, না। তাই ইবনে হাজর বলেন, হযরের এই উত্তরের অর্থ হলো, 'এটা আমার বিশেষত্ব'। আর আমি যখন কোনো আমল শুরু করি, তখন তা সদাসর্বদা করতে থাকি।

أَلْمَسَلَةُ الْمَسْتَبَطَةُ مِنْ هَذَا الْعَوْبِي :

উক্ত হাদীস হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য হাদীস হতে প্রথমত দু'টি বিষয় প্রতিষ্ঠাত হয়। [প্রথমত] দীনের দাওয়াত ও দীনের তালিমের কাজ সুলত নামাজ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ব্যক্তিগতভাবে দীনের কাজ সম্পাদন করার চেয়ে দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা অনেক উত্তম আমল। (দ্বিতীয়ত) ওয়াক্তের ভিতরে হোক কিংবা বাইরে হোক সুলত মুয়াক্কাদা নামাজ কাছা করা উচিত। এটাই ইমাম শাফেয়ীর অভিমত। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, সুলতের কাছা আবশ্যকীয় নয়। তবে ওয়াক্তের ভিতরে হলে কাছা করা যেতে পারে। সুতরাং উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণিত সে দিনকার জোহরের পরের দু' রাকাত শুরু করেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন, এ পর্যায়ে শুরু নামাজ তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে পড়েছিল যা তিনি আসরের পরে কাছা করেছেন।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (رحم)
 عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ رَأَى النَّبِيَّ
 ﷺ رَجُلًا يَصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
 رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ
 الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ
 إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ
 قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ . (رواه أبو داود و روى الترميذی
 نحوه) وَقَالَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ
 بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ
 يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَفِي شَرْحِ
 السُّنَّةِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ
 قَهْدٍ نَحْوَهُ

৯৭৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম
 [সাহাবী] হযরত কায়েস ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণনা
 করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে
 ফজরের পরে দু' রাকাত নামাজ পড়তে দেখে বললেন,
 ফজরের নামাজ দু' রাকাত, দু' রাকাত? [অর্থাৎ ফরজ দু'
 রাকাতের পরে কি আরও দু' রাকাত পড়ছ?] সে ব্যক্তি
 উত্তরে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ফজরের পূর্বের দু'
 রাকাত [সুন্নত] পড়িনি, তাই তা এখন পড়ে নিলাম।
 [কায়েস বলেন] এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন।
 -[আবু দাউদ]

.কিন্তু তিরমিযী এর অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, এ
 হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে
 ইব্রাহীম স্বয়ং কায়েস হতে এটা শুনেননি। এতদ্ব্যতীত
 শরহে সুন্নাহ ও মাসাবীহ-এর বিভিন্ন সংস্করণে কায়েস
 ইবনে আমরের পরিবর্তে 'কায়েস ইবনে কাহদ' থেকে
 এরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الفজরের সুন্নতের কাজা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে তা
 কাজা করতে হবে কি না? এই ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে এর কাজা পড়া
 আবশ্যিক। তাঁরা উক্ত হাদীস দ্বারাই দলিল গ্রহণ করেন। যদি ফজরের সুন্নত ফজরের পূর্বে না পড়া যায়, তা হলে অবশ্যই পরে
 কাজা পড়বে। তবে শাফেয়ীদের মতে সূর্যোদয়ের পূর্বে কাজা পড়া জায়েজ আছে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে
 সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাজা পড়া যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গেলে আর কাজা
 পড়া যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি শুধু ফজরের সুন্নত ছুটে যায়, তাহলে
 কাজা পড়া আবশ্যিক নয়। সূর্যোদয়ের পূর্বে হোক বা পরে; কিন্তু যদি ফরজসহ এক সঙ্গে কাজা হয়ে যায়, তা হলে সূর্য পশ্চিম
 আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে সুন্নতসহ কাজা পড়বে। এরূপ যদি জোহরের সুন্নত ছুটে যায় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর
 মতে পরের রাকাতগুলোর পূর্বেই কাজা করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পরের দু' রাকাতের শেষে কাজা
 করবে। এটাই সহীহ অভিমত। শায়খাইন (র.)-এর মতে এ হাদীসটি দুর্বল বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَايَ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا النَّبِيِّ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

৯৭৮. অনুবাদ : হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবদে মনাফের বংশধরগণ! তোমরা কাউকেও এ ঘর [পবিত্র কা'বা] তওয়াফ করতে বাধা দিয়ো না এবং রাতে বা দিনে যে কোনো সময় [তওয়াফের নফল] নামাজ পড়তে চায়, নিষেধ করো না। - [তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক- নিদর্শিত করার কারণ : মহানবী ﷺ নিম্নলিখিত কারণে আবদে মানাফের বংশধরগণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন-

১. প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র তারা ই হবে। এ জন্য বনু আবদে মানাফকে খাস করে উল্লেখ করেছেন।
২. অথবা কুরাইশদের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় আবদে মানাফের বংশধরগণ নেতৃত্বান্বী ছিল এবং হজের মৌসুমে হাজীদেরকে পানি পান করানো সহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত ছিল। আর এ জন্যই রাসূল ﷺ হাদীসে বিশেষভাবে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

নিষিদ্ধ সময়ে হারাম শরীফে নামাজ পড়া সম্পর্কে মতভেদ : পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফের পর দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়, তা মাকরুহ সময়ে পড়া জায়েজ আছে কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁর মতাবলম্বীগণ বলেন, হেরেম তথা মক্কাভূমিতে সকল সময়ই নফল নামাজ পড়া যায়। নিষিদ্ধ সময় এর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। তিনি স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর হাদীসসহ নিজের হাদীসটিও দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন-

(۱) فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَيَّ دَرَجَةُ الْكَعْبَةِ وَمِنْ عَرَفَتِي فَقَدْ عَرَفْتِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِسَكَّةٍ أَوْ بِسَكَّةٍ أَوْ رَيْنٍ أَحْمَدُ وَرَيْنٌ

১. মَذْهَبُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, তওয়াফের দু' রাকাত নফল যে কোনো সময় জায়েজ আছে; কিন্তু অন্য নামাজ নিষেধের হাদীস অনুসারে জায়েজ নেই।

২. مَذْهَبُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ حُنَيْنٍ ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, মক্কার হকুম অন্যান্য শহরের মতোই হবে। অর্থাৎ তিন সময়ে নামাজ পড়া হারাম, চাই তা যেখানেই পড়া হোক না কেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। এর কয়েকটি নিম্নরূপ-

(الف) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَهَانُ أَنْ نَعْلِمِي فِيهِنَّ - الْحَدِيثُ

(ب) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ عَلِمَهُ السَّلَامُ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيَّبَ الشَّمْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাবসমূহ নিম্নরূপ-

১. প্রথমতঃ হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি হারাম বা নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।
২. তার উত্তরে আল্লামা তুসেবিত্তী (র.) বলেন, কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্র বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে বসবাস করত এবং তাদের প্রত্যেক কাবিলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা ছিল। বহিরাগত লোক তাদের উক্ত দরজা দিয়ে বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। এ জন্য তারা বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে রাতে তা বন্ধ করে দিত। যার পরিস্থিতিতে লোকেরা বাইতুল্লাহর জিয়ারত এবং তওয়াফ করা হতে বঞ্চিত হতো। একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ গনে তাদেরকে কখনই দরজা বন্ধ না রাখার নির্দেশ দিলেন। এটাই হলো জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য।

৩. অথবা হাদীসে উল্লিখিত **سَاعَةَ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ** -এর অর্থ হবে **سَاعَةَ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ** [অর্থাৎ অনির্দিষ্ট যে কোনো সময়]।
১. হযরত আবু যার (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করা হয়েছে এর জবাব হলো, হযরত আবু যার (রা.)-এর হাদীসটি হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট বিভিন্ন দোষে দুষ্ট বিধায় তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
২. অথবা হাদীসে নাহীর মোকাবিলায় হযরত আবু যার (রা.) -এর হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা হাদীসে নাহীর ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই।
৩. অথবা আদেশ ও নিষেধ একসাথে হলে নিষেধের হুকুমকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

وَعَنْ ٧٧٨
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

৯৭৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যাহ্ন সময়ে অর্থাৎ ঠিক দুপুরে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না সূর্য কিছুটা ঢলে যায়- জুমার দিন ব্যতীত।
 -[শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَإِخْتِلَافُ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ ইমামদের মতভেদ : জুমার দিনে যি-প্রহরের সময় নামাজ পড়া বৈধ কি না? সে সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জুমার দিন ঠিক যি-প্রহরের সময় তাহিয়াতুল অজু ও দুখুলুল মসজিদ এ জাতীয় নফল পড়া নাজায়েজ নয়। তারা নিজেদের বপক্ষে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসসহ নিম্নের দলিল উল্লেখ করেন।

(١) عَنْ أَبِي الْخَلَيْلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

এটা ছাড়াও তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনে লোকদেরকে তাড়াতাড়ি মসজিদে গিয়ে নামাজে মাশগুল থাকার উপদেশ দিতেন এবং উপাসিত করতেন।

২. পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, জুমার দিন যি-প্রহরের সময় নফল নামাজ জায়েয নেই। আর দলিল হলো-

(١) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَلِكُ سَاعَاتِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِمْ وَأَنْ نَغْتَبِرَ فِيهِمْ مَوْتَانَا جِبْنَ تَطْلُعِ الشَّمْسِ بَارِغَةً وَجِبْنَ تَقُومُ قَائِمِ الظُّهَيْرِ وَجِبْنَ تُضَيَّفُ لِلْفَرُوقِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এটা ব্যতীত তিনি আরো অনেক হাদীস দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

অন্যান্যদের উপস্থাপিত হাদীসের জবাব : ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিলসমূহের জবাব নিম্নরূপ-

প্রথমত তারা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার মধ্যে **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** বাক্য রয়েছে। নাহ্দিদের কায়দা অনুযায়ী এটা **مُنْقَطِعٌ** হয়েছিল, যা **إِنَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ** -এর হুকুম অনুযায়ী হবে।

দ্বিতীয়ত যেমনটি আহনাফ বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মূলত এর অর্থ হলো **يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي نِصْفِ النَّهَارِ بِغَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ** অতএব নিষিদ্ধের হুকুম **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** ব্যতীত হাদীসের অন্য অংশের সাথে **إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ** অংশের সাথে আদৌ নেই। সুতরাং **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** হাদীসের এ অংশের হুকুম অন্যান্য নিষিদ্ধ হাদীসের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত হাদীসের উল্লেখ যেনা যায় যে, তাঁদের এ সমস্ত হাদীসের তুলনায় হাদীসে **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** অধিক জোরালো ও শক্তিশালী বিধায় তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

عَنْ ٩٨. أَبِي الْخَلِيلِ (رَحِمَهُ اللهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَقَالَ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَصْلُ الثَّلَاثُ

عَنْ ٩٨١. عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَائِحِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَارْتَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَارْتَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

৯৮০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আবুল খলীল [সাহাবী] হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক দুপুরে নামাজ পড়াকে অপ্রিয় ভাবতেন, যতক্ষণ না সূর্য কিছুটা হেলে পড়ে কেবলমাত্র জুমার দিন ব্যতীত। তিনি আরও বলেন, জুমার দিন ব্যতীত অন্য দিনে মধ্যাহ্ন সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। [আবু দাউদ]

আবু দাউদ বলেন যে, আবুল খলীল হযরত আবু কাতাদার সাক্ষাৎ পাননি। সুতরাং হাদীসটি মুনকাতে।

৯৮১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবহী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—যখন সূর্য উদয় হতে থাকে, তখন তার সাথে শয়তানের শিংও থাকে। যখন কিছুটা উপরে উঠে তখন শয়তান তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর যখন সূর্য মধ্যাহ্নে স্থির হয়, তখন শয়তান সূর্যের সাথে মিলিত হয়, আর যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন সে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যখন সূর্য ডুবতে থাকে তখন শয়তান এসে তাতে মিলিত হয়। এরপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। [রাবী বলেন,] এ সময়গুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। [মালেক, আহমদ ও নাসায়ী]

عَنْ ٩٨٢. أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَخْمَصِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلَيَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُومًا فَمَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ التَّجْمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৮২. অনুবাদ : হযরত আবু বাসরা গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। তারপর বললেন, এটা এমন একটি নামাজ যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সামনেও পেশ করা হয়েছিল। (অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছিল) কিন্তু তারা একে নষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একে যথাযথ রক্ষা করবে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু পরে 'শাহেদ' উদিত হওয়া পর্যন্ত আর কোনো নামাজ নেই। আর শাহেদ হলো তারকা। [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَمَنْ حَاطَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, আসরের নামাজের ফরজিয়াত পূর্ববর্তী জাতি ইহুদি নাসারাদের উপরও ফরজ ছিল। এ জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন আত্মাহ বলেন, حَاطَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ، যেমন আত্মাহ বলেন, حَاطَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ -এর ব্যাখ্যা صَلَاةٌ দ্বারা ই করেছেন; কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে আদায় করেনি। সুতরাং উক্ত মুহাম্মদীর মধ্যে যারা আসরের নামাজ পড়বে তাদের জন্য দ্বিগুণ ছুওয়াব রয়েছে। আলোচ্য হাদীসাংশে এ কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য এর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন-

১. কারো মতে একটি ছুওয়াব হলো এই কারণে যে, পূর্ববর্তী ইহুদি-নাসারাদের বিপরীতে এর সংরক্ষণ করেছেন এবং দ্বিতীয় ছুওয়াব হলো স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য নামাজের ন্যায় এটা আদায়ের জন্য।
২. আত্মাহ তীর্থী এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি ছুওয়াব হলো, স্বাভাবিক ইবাদতের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো, নামাজের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করার কারণে। কেননা আসরের সময়টি হলো কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার সময়।
৩. আত্মাহ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, একটি ছুওয়াব হলো, আসরের বিশেষ ফজিলতের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো, তা ঠিকমত আদায়ের জন্য।

وَعَنْ ٩٨٣ مَعَاوِيَةَ (رض) قَالَ إِنَّكُمْ لَتَتَّصِلُونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯৮৩. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমারা নিশ্চয়ই এমন [দু' রাকাত] নামাজ পড়ে থাক, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে ছিলাম, অথচ তাঁকে এ দু' রাকাত নামাজ পড়তে কখনো দেখিনি; বরং তিনি তা পড়তে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ আসরের পরে দু' রাকাত নামাজ পড়া।-[বুখারী]

وَعَنْ ٩٨٤ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ وَقَدْ صَوَدَ عَلِيٌّ دَرَجَةَ الْكُفْبَةِ مِنْ عَرَفَيْنِ فَقَدْ عَرَفْنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِزْنُ)

৯৮৪. অনুবাদ : হযরত আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে চিনেছ, সে তো চিনেছই অর্থাৎ আমার নাম জেনেছই। আর যারা আমাকে চিননি, তারা জেনে রাখ আমি জুনদুব [যে সদা সত্যবাদী]। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই, তদ্রূপে আসরের পরেও সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই, তবে একমাত্র মক্কাতে, একমাত্র মক্কাতে, একমাত্র মক্কাতে। [অর্থাৎ আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্বে এবং ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে একমাত্র মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কোনো নামাজ পড়া যাবে না]।-[আহমদ ও রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَرَاتِ زَيْنَارَ -এর দু' রাকাত নামাজ পড়া যাবে কি না? এই বিষয়ে পূর্বের এক হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ : জামাত ও তার ফজিলত

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো নামাজ, সাধারণত এর মাধ্যমেই মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। মহান আষ্টাহর দরবারে বিনয়ী হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো এই নামাজ। জামাতের মাধ্যমেই এই নামাজ ফরজ হয়, তাই ইসলামি শরিয়তে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিণীম। এর জন্য ছুওয়াবও রয়েছে অনেক বেশি। মহানবী ﷺ বলেছেন, জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ফজিলত একাকী নামাজ আদায় করা অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি।

জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব :

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মাদিসে দেহলবী (র.) বলেন, নামাজের মতো এত উত্তম আর কোনো ইবাদত নেই, সুতরাং এর প্রসারের জন্য সমবেতভাবে নামাজ আদায় করাই বাঞ্ছনীয়।
 ২. মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোক বিদ্যমান রয়েছে; এরা অনেকেই নামাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, এদেরকে সমবেত করে শিক্ষা না দিলে অজ্ঞ থেকে যাবে, তাই জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে তা যথাযথভাবে শিখতে সক্ষম হবে।
 ৩. মানুষ হিসাবে রাজা, প্রজা, উচ্চ-নীচ সকলেই একই স্তরের, এ কথা বুঝানোর জন্যই ইসলামি শরিয়ত জামাতের মাধ্যমে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে।
 ৪. ইসলামি সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই ফুটে উঠে।
 ৫. দৈনন্দিন পাঁচবার জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে একে অপরের খোজ-খবর নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে পরস্পরের মাঝে হৃদয়তার ভাব সৃষ্টি হয়।
 ৬. দৈনিক পাঁচবার জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মানুষ তার কাজ-কর্মে সচতেন হয় এবং নিয়মানুবর্তী হয়, এ ছাড়াও আরো অনেক ফজিলত রয়েছে।
- আলোচ্য অধ্যায়ে জামাতে নামাজ পড়া সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٨٥
ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ
الْفِدْيِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জামাতের সাথে নামাজ একাকী নামাজের চেয়ে সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : উল্লিখিত হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে জামাতে নামাজ পড়ার ছুওয়াব একাকী পড়া হতে ২৭ গুণ বেশি বলা হয়েছে। অথচ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে ২৫ গুণের কথা বলা হয়েছে, এ উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ—

১. এর সমাধানে বলা যায় যে, **عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدْيِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً** অর্থাৎ বন্ধ সংখ্যার উল্লেখ আধিক্যকে নিষেধ করে না। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো **تَعَارُضٌ** নেই। আঙ্গামা শাওকানী এ সমাধানটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন।
২. অথবা রাসূলে কারীম ﷺ প্রথমত **عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدْيِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً** বলেছেন। পরে আঙ্গামা তা'আলা তাঁকে জামাতের অধিক ছুওয়াব সম্পর্কে অবহিত করেছেন বিধায় তিনি পরে **عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدْيِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً** বলেছেন।
৩. অথবা সম্পূর্ণ নামাজ জামাতে পেলে ২৭ গুণ, পক্ষান্তরে কিছু নামাজ পেলে ২৫ গুণ।

৪. অথবা জামাতে লোক বেশি হলে ২৭ গুণ আর কম হলে ২৫ গুণ।
৫. অথবা ফজর ও ইশার নামাজে ২৭ গুণ আর এটা ব্যতীত অন্যান্য নামাজে ২৫ গুণ।
৬. অথবা ফজর ও আসরের জন্য ২৭ গুণ আর অন্যান্য নামাজের জন্য ২৫ গুণ।
৭. অথবা যে নামাজের কোরাত জ্বারে পড়া হয় সে নামাজের ছওয়াব ২৭ গুণ, আর যে নামাজে আন্তে কোরাত পড়া হয় সে নামাজের জন্য ২৫ গুণ।
৮. অথবা ইমামের মর্যাদার কারণে এ ছওয়াবেরও ব্যবধান হতে পারে।
৯. অথবা ২৫ গুণ হবে যদি মসজিদ নিকটবর্তী হয় আর ২৭ গুণ হবে যদি মসজিদ দূরবর্তী হয়।
১০. অথবা এ তারতম্য মুসল্লির উপর ভিত্তি করে। মুসল্লি যদি অধিক খোদাতীরা এবং নামাজের পূর্ণ সংরক্ষণকারী হয় তা হলে তার জন্য ২৭ গুণ নতুবা ২৫ গুণ।
১১. অথবা নামাজ আদায়ের স্থানের পার্থক্যের কারণে ছওয়াবেরও পার্থক্য হবে। যেমন- মসজিদে জামাতসহ আদায় করলে ২৭ গুণ আর অন্য স্থানে আদায় করলে ২৫ গুণ।
১২. অথবা নামাজের জন্য যে ব্যক্তি অপেক্ষায় থাকবে তার জন্য ২৭ গুণ, আর যে অপেক্ষায় থাকবে না তার জন্য ২৫ গুণ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطْبٍ فَيَحْطَبُ ثُمَّ أَمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرُ رَجُلًا فَيُؤَمِّرُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رَجُلٍ وَوَيْ رَوَايَةَ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ)

৯৮৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি কিছু লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দেব, আর তা জমা করা হবে। অতঃপর নামাজের আযান দিতে আদেশ করব, আর আযান দেওয়া হবে। তারপর আমি কাউকে হুকুম দেব লোকদের ইমামতি করতে, সে লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি সেই সমস্ত লোকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দেখব।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, যারা নামাজে হাজির হয়নি, তাদের সহ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তাদের কেউ যদি জানত যে, মসজিদে একটা গোশতযুক্ত হাড়ি কিংবা দুই টুকরা ভাল খুর পাবে, তাহলে সে অবশ্যই ইশার নামাজে উপস্থিত হতো।—[বুখারী] আর মুসলিমের বর্ণনাও প্রায় এরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَامِعَاتِهِمْ هَكَذَا جَامَاةً هَكَذَا : জামাতে নামাজ পড়ার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে—

১. دُعِيَ أَهْلَ الطَّرَافِ وَأَهْلَهُ يَاهِرِينَ هَكَذَا جَامَاةً هَكَذَا : আহলে যাহেরদের মতে জামাত গুয়াজিব এবং নামাজ শুক হওয়ার জন্য শর্ত। তাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস—

(١) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَبَّحَ التَّنَادَى فَلَمْ يَسْنَعْهُ مِنْ إِيَّابِهِ عَذْرًا لَمْ يُغْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ أَلَيْسَ صَلَاةً كَمَا فِي التَّحْلِيْقِي .

২. **مَنْ فِي الْعَيْنِ وَالْفَتْحِ** ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জামাতে নামাজ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। ইবনে খুযাইমা, ইবনুল মুনির, আতা, আওয়ামী, আবু সওর প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

كَمَا فِي الْعَيْنِ وَالْفَتْحِ

৩. **مَنْ فِي الْعَيْنِ وَالْفَتْحِ** ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম কারবী এবং ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর মতে জামাতে নামাজ পড়া ফরজে কেফায়া। যারা জামাতকে ফরজে আইন এবং ফরজে কেফায়া বলেছেন তারা নিজেদের দাবির সমর্থনে একই ধরনের দলিল পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

(الف) قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ . (الآية)

(ب) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْعَارِضِيُّ)

(ج) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَجُلًا أَعْلَى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِي آخِرِ الْعِدِيثِ فَرَّخَصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْعُو حُضُورَ الْجَمَاعَةِ فَمَا وَلَّى دَعَاؤُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِبْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এগুলো ব্যতীতও তার উপরে বর্ণিত যহরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসও দলিল হিসাবে পেশ করেন।

৪. **مَنْ فِي الْعَيْنِ وَالْفَتْحِ** ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জামাতে নামাজ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। **كَمَا فِي الْعَيْنِ وَالْفَتْحِ**—

তাদের দলিল সে সব হাদীস যাতে জামাতের ফজিলতের বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি পেশ করা হলো—

(الف) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(ب) عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَخَيْرٌ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَتْ فَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعَارِضِيُّ)

(ج) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَضِعَ عَشَاءٌ لِأَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رَضِيَ) يُوَضِّعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرَغَ وَهُوَ سَبِيحٌ قِرَاءَةَ الْإِسْمَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . (هَذَا كُلُّهُ فِي الْعَيْنِ وَ أَوْجَزَ الْمَسَالِكِ)

প্রতি পক্ষের দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং অন্যান্যরা সালাতুর খাওফের আয়াত দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন, এর উত্তরে বলা যায় যে, এতে সালাতুল খাওফের কাইফিয়াত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, জামাত ফরজ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়।

যহরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত **فَأُحِرُّ عَلَيْهِمْ بِمَوْتِهِمْ** হাদীস দ্বারা যে দলিল নেওয়া হয়েছে এর জবাবে আল্লামা বাজী বলেন, এ হাদীসটি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য। এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

অথবা এ ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সেই সম্প্রদায় উদ্দেশ্য যারা নামাজই পরিহার করে থাকে।

প্রতিপক্ষ **لَا صَلَاةَ لِمَنْ** হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন, এর উত্তরে বলা যায় যে, জামাত ব্যতীত একাকী নামাজ আদায় করলে নামাজ পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং পুরা ছওয়াব পাওয়া যাবে না। **لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ** এ হাদীসের জন্যও এ একই উত্তর প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْ ١٩٨٧ قَالَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ نَيْسَ لِي فَإِنِّي يَقْرُونِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ التَّنْدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৮৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সমীপে এক অন্ধ ব্যক্তি [আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম] আসলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার এমন কোনো সহায়তাকারী লোক নেই, যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই অনুমতি প্রার্থনা করলেন যেন তিনি [মসজিদে না এসে] নিজ গৃহে নামাজ আদায় করতে পারেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আযানের ফ্রনি শুনতে পাও? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তা হলে সে ডাকে তুমি সাড়া দাও অর্থাৎ মসজিদে [কষ্ট করে হলেও] হাজির হও। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রী হাদীসের ব্যাখ্যা : সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, যে অন্ধকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো লোক নেই, তার পক্ষে মসজিদে উপস্থিত হওয়া জরুরি নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, নেওয়ার মতো লোক থাকলেও ওয়াজিব নয়। কিন্তু সাহেবাইন বলেন, তখন হাজির হওয়া ওয়াজিব। ইমাম সাহেব বলেন, এখানে জামাতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য হজ্বুর ﷺ এ অন্ধ সাহাবীকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আদেশ করেছেন। যেন অন্যান্য লোকেরা বুঝতে পারে যে, নামাজের জামাত কত জরুরি।

১৯৮৭. অনুবাদ : আলোচ্য হাদীসে رَجُلٌ أَعْمَى তথা অন্ধ ব্যক্তি দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٨٨ أَبِي عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ أَدْنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَبِحَ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ذَاتِ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক শীত ও ঝড়-তুফানের রাতে তিনি আযান দিলেন, তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, শোন, তোমারা নিজ নিজ আবাসস্থলে নামাজ পড়। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিতেন। যখন শীত ও বর্ষা-বাদলের রাত হতো তখন সে যেন ডেকে বলে- শোন তোমারা যার যার আবাসস্থলে নামাজ পড়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রী হাদীসের ব্যাখ্যা : আরব ও মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় সাধারণত গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না; বরং ভূমধ্য সাগরীয় আবহাওয়ার কারণে শীতকালে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়। তখনকার বৃষ্টি ও হিলে হাওয়ায় এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলোচ্য হাদীসের মর্মানুসারে শীত, বর্ষা, বান ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জামাত তরক জায়েজ হবে, তবে আমাদের নতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সাধারণত বৃষ্টি বা শীত তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে বন্যা-তুফান বা প্রাবনের সময় যদি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে ঐ সময় জামাত তরক করা জায়েজ হবে।

একটি **تَعَارُضٌ** ও তার সমাধান : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, **عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ** হতে বর্ণিত আছে যে, **لَطْعَامٍ وَلَا لَعْبَةٍ** এটা ঘাড়া বুকা যায় খাওয়া বা অন্য কিছুর জন্য নামাজ বিলম্ব করা যাবে না। এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত। **فَانْدَرُوا بِالْمَسْأَلَةِ** উভয় হাদীসের পরিপন্থি। উভয় হাদীসের মধ্যে **تَعَارُضٌ** সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানে বলা হয়েছে যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসটি যমীক। এটা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অথবা বলা যেতে পারে- নামাজের সময় যখন সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং খাওয়া খেল নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে **عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ** হাদীস প্রয়োগ হবে। আর যদি খাবার খাওয়ার পরও নামাজের সময় বাকি থাকে সে অবস্থায় **فَانْدَرُوا بِالْمَسْأَلَةِ** এ হাদীস প্রয়োগ হবে।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدْفَعُ الْأَخْبَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খাদ্য উপস্থিত হওয়ার পর নামাজ পড়া যাবে না। অন্ধ্রপভাবে যখন সে দুই 'হদস' অর্থাৎ- পেশাব পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস ঘাড়া বুকা যায় যে, খাবার সম্মুখে এলে নামাজের সময় বাকি থাকলে জামাতাত পরিচয় করে খাওয়া শেষ করে নেওয়া উত্তম, তবে নামাজের শেষ ওয়াক্ত হলে তখন খাওয়া রেখে নামাজ পড়ে নিতে হবে।

এমনিভাবে নামাজের সময় থাকা অবস্থায় পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামাজ পড়া মাকরুহ।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** ইরশাদ করেন- যখন জামাতের জন্য একামত বলা হয় তখন ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ নেই। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জামাতের সময় সন্নত বা নফল নামাজের বিধান : জামাত শুরু হয়ে গেলে সন্নত বা নফল পড়া জায়েজ আছে কি না এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

ইমাম যায়দী (র.) বলেন, ফজরের সন্নত ব্যতীত অন্যান্য সন্নত নামাজ যদি ইমামের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে শেষ করা সম্ভব হয় তা হলে সন্নত সমাধা করে ইমামের একতেন্দা করতে হবে; কিন্তু যদি প্রথম রাকাত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সন্নত ছেড়ে জামাতে শরিক হবে।

আহলে জাহেরদের মতে ফজরের সন্নত অথবা অন্য কোনো নফল নামাজ শুরু করার পর যখন ফরজ নামাজের একামত নেওয়া হয় তখন সন্নত বাতিল হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল হলো রাসূল **ﷺ** এর এই হাদীস-

عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

জামাত পেশার মতে একামতের পর সেই সন্নত ও নফল বাতিল হয়ে যাবে না। তাঁদের দলিল হলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

উল্লেখ্য, জমহর ওলামা ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, আবু হুর, ইবনে সীরীন, উরওয়াহ, সাঈদ ইবনে যুশাইর প্রমুখের মতে ইমাম সাহেব ফজরের নামাজ শুরু করে দিলে সুন্নত পড়া মাকরুহ। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন-

(الف) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا السُّكُوتَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
(ب) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَجَذَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرَبَعًا.

(ج) عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ جِئْنَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ فَقَالَ أَسَلَّانَ مَعًا فَهَنَى أَنْ تُصَلِّيَا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

(د) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا السُّكُوتَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا رَكَعَتِي الْفَجْرِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا رَكَعَتِي الْفَجْرِ.

ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), আওয়ামী এবং সাওরীর মতে মসজিদের বাইরে ফজরের সুন্নত পড়াতে কোনো ক্ষতি নেই। আবশ্য এদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ফরজের দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নত পড়ে নিতে হবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, প্রথম রাকাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নত পড়তে হবে। ইমাম সাওরী এ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু তিনি মসজিদের ভিতরে সুন্নত পড়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ۹۹۲ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْتَعِنَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে [জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে] যেতে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন সে যেন তাকে বাধা না দেয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত : জামাতে শরিক হওয়া মহিলাদের জন্য বৈধ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে-

مَنْعُ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তিনি ইবনে ওমরের এই হাদীসটিসহ নিজের হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا امَاةَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ. (كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْهَيْدَايَةِ عَنِ النَّبَايَةِ)

مَنْعُ الصَّاحِبِينَ : সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঈদের জামাতে মহিলাদের হাজির হওয়া যেমনিভাবে বৈধ, তেমনিভাবে বৃদ্ধা মহিলাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে হাজির হওয়া বৈধ। কেননা তাদের ক্ষেত্রে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইমাম মালেক (র.)-ও একে বৈধ বলেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, বৃদ্ধা মহিলাদের ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাতে হাজির হওয়া অবৈধ নয়। এ তিন ওয়াক্তকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

أَنَّ الْفَسَاءَ نَائِمُونَ فِي الْفَجْرِ وَالنِّسَاءَ وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُولُونَ وَفِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ مُنْتَشِرُونَ فَلَا يَخْرُجْنَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ. (كَمَا فِي الْهَيْدَايَةِ)

অর্থাৎ ফাসেকরা ফজর ও এশায় ঘুমিয়ে থাকে এবং মাগরিবের সময় খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত থাকে। জোহর, আসর এবং জুমার সময় তারা বাইরে চলাফেরা করতে থাকে। অতএব মহিলারা যেন জোহর, আসর ও জুমার সময় বের না হয়।

※ ইমাম আবু হানীফা, মালেক এবং সাহেবাইন (র.) বলেন, যুবতী মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া মাকরুহ। কেননা তাদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে।

ওলামায়ে মুতায়্যখবেয়ীন বলেন, বৃদ্ধা-যুবতী সকল মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া মাকরুহ। এর উপরই ফতোয়া।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দু'টি হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করেছেন এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়—

১. এ ধরনের সমস্ত হাদীস সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া বৈধ ছিল। পরবর্তী সময় ফেতনা সৃষ্টির কারণে এর হুকুম রহিত করা হয়।
২. অথবা বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলারা শরিয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের জন্য জামাতে উপস্থিত হতেন। বর্তমানে শরিয়তের অহকাম সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হওয়ার কারণে সে প্রয়োজন আর নেই বিধায় মহিলাদের জামাতে হাজির না হওয়াই শ্রেয়।

وَعَنْ ۱۹۳ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسِّي طَيْبًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে [মহিলাদেরকে] বলেছেন, যখন তোমাদের স্ত্রী সমাজের [কেউ মসজিদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন কোনো সুগন্ধি জিনিস স্পর্শ না করে [অর্থাৎ, না লাগায়। কেননা এটা পুরুষদের মনকে প্রলুব্ধ করে]। -[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۹۴ ابْنِ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মহিলাই বাখুর [সুগন্ধি] লাগাবে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার নামাজে উপস্থিত না হয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমাম হাদীসের ব্যাখ্যা : بَخُورٌ 'বাখুর' এমন জিনিসকে বলা হয়, যা আতনে পোড়ালে সুগন্ধ বের হয়, যেমন- চন্দন কাঠ, লোবান বা আগর বাতি ইত্যাদি। তৎকালীন মহিলা সমাজ 'বাখুর' নামীয় কাঠকে জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া গায়ে লাগাত। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মাগরিবের নামাজকে 'এশায়ে উলা' বা প্রথম এশা এবং ইশার নামাজকে 'এশায়ে আখিরা' বা দ্বিতীয় এশা বলত। আর এ সময়ের নামাজে মহিলাদেরকে সুগন্ধি গায়ে মেখে আসতে নিষেধ করার কারণ বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্ভাগ্যবশত লোকদের দ্বারা এ সময়ে অঘটন বা বিপর্যয় ঘটান সম্ভাবনা বেশি থাকে।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۹۵ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيَوْمَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৯৯৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে বাধা দিও না, তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম স্থান। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ الْحَوْنِثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, যৌনাক্রম দ্বারা যেমন জেনা হয় তদ্রূপ চক্ষু ও হাত প্রভৃতি দ্বারা জেনা হয়ে থাকে। চক্ষুর জেনা কাম নজরে দেখা, হাতের জেনা স্পর্শ করা এবং অন্তরের জেনা হলো তার আকাঙ্ক্ষা করা। পরস্পর প্রতি বা পরপুরুষের প্রতি কামভাবে বা কামুক দৃষ্টিতে তাকানো জেনারই শামিল।

আর সুগন্ধি ব্যবহার করে অন্তপুরে পর্দার আড়ালে থেকেও পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বললে সুগন্ধি তাকে প্রলুব্ধ করে। সম্মুখে আসলে বা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে তো কথাই নেই, চক্ষু তখন সৈদিকে আকৃষ্ট হয়। দুঃচরিত্রী স্ত্রীলোকের ঘরাই একরূপ কার্য হয়ে থাকে। মূলত এটাই জেনার প্রাথমিক সূচনা। সুতরাং এটাও জেনার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ অবস্থায় কোনো মহিলায় মসজিদে যাওয়া জায়েজ নেই। অথচ আজকাল নারী সম্প্রদায় কত প্রকারের প্রসাধনী ব্যবহার করে রাস্তায় তথা জনসমাগমের ভিড়ের মধ্যে যাওয়াটা গর্ববোধ করে। তিরমিযীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত— **قَالَ الْمَرْءُ عَوْرَةَ الشَّيْطَانِ**—এর ব্যাখ্যা : ব্যভিচার একটা মারাত্মক অপরাধ। এটা যেমন যৌনাক্রম দ্বারা হয়ে থাকে তেমনি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও হতে পারে। বর্ণিত হাদীসে প্রত্যেক চক্ষুকে ব্যভিচারী বলা হয়েছে। কামভাবে দৃষ্টিতে পরস্পর অথবা পরপুরুষের প্রতি তাকালে এটাও ব্যভিচারের মধ্যে শামিল। কেননা চক্ষুর দৃষ্টি অন্তরে সঙ্গমের প্রবল ইচ্ছার উদ্বেগ করে। যাকে জেনার প্ররোচনা বলা চলে। অন্য হাদীসে এসেছে যে, যৌনাক্রম দ্বারা যেমন জেনা হয় তদ্রূপ চক্ষু ও হাত প্রভৃতির দ্বারাও জেনা হয়। এ হাদীসটি বর্ণিত উজিরই পরিপূরক ও সম্পূরক। সুতরাং কামভাবপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَالَ عَسَى زَانِيَةٌ—এর ব্যাখ্যা : ব্যভিচার একটা মারাত্মক অপরাধ। এটা যেমন যৌনাক্রম দ্বারা হয়ে থাকে তেমনি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও হতে পারে। বর্ণিত হাদীসে প্রত্যেক চক্ষুকে ব্যভিচারী বলা হয়েছে। কামভাবে দৃষ্টিতে পরস্পর অথবা পরপুরুষের প্রতি তাকালে এটাও ব্যভিচারের মধ্যে শামিল। কেননা চক্ষুর দৃষ্টি অন্তরে সঙ্গমের প্রবল ইচ্ছার উদ্বেগ করে। যাকে জেনার প্ররোচনা বলা চলে। অন্য হাদীসে এসেছে যে, যৌনাক্রম দ্বারা যেমন জেনা হয় তদ্রূপ চক্ষু ও হাত প্রভৃতির দ্বারাও জেনা হয়। এ হাদীসটি বর্ণিত উজিরই পরিপূরক ও সম্পূরক। সুতরাং কামভাবপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَالَ عَسَى زَانِيَةٌ—এর মর্মার্থ : মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হলে অথবা এ অবস্থায় গৃহের অভ্যন্তরে পর্দার অন্তরালে বসে যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলে তা হলে এটাও ব্যভিচারের সমান অপরাধ। কেননা সুগন্ধির ঘ্রাণে পরপুরুষ স্বভাবতই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং যৌন ভোগের প্রবল ইচ্ছা অন্তরে সৃষ্টি হবে। মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে যেহেতু এ অবস্থার সূচনা হলো সেহেতু জেনার অপরাধের বিরাট একটা অংশ তার ঝুঞ্জেই অর্পিত হবে। এ কথাই আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الصُّبْحِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاهِدُ فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَوَتَيْنِ اثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْرًا عَلَى الرُّكْبِ وَأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَنِكُو وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ

৯৯৯. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একদিন ফজরের নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবীগণ আরজ করলেন, না হুযুর! রাসূল ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর অমুক উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বললেন, জি না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় এই দু'টি নামাজ [অর্থাৎ ফজর ও ইশা] মুনাফিকদের পক্ষে খুব কঠিন নামাজ। যদি তোমরা জানতে এ দুই নামাজের মধ্যে কি মাহাত্ম্য রয়েছে, তা হলে তোমরা হাঁটুতে হামাঙড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাজে হাজির হতে। [এটাও জেনে রাখ] নামাজের প্রথম সারি ফেরেশতাদের সারির তুল্য। যদি তোমরা এর ফজিলত সম্পর্কে জানতে তা হলে কার আগে কে আসবে চেষ্টা করতে। [আরও জেনে রাখ] কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে একমুখে নামাজ পড়া

وَحَذَهُ وَصَلَوْتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَرْكَى مِنْ
صَلَوْتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ قَهْوُ أَحَبِّ
إِلَى اللّٰهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُ)

তার একাকী নামাজ পড়া হতে উত্তম। আর তার দুই ব্যক্তির সাথে নামাজ পড়া, এক ব্যক্তির সাথে নামাজ পড়া হতে উত্তম। এভাবে নামাজের লোক যতই অধিক হবে, ততই তা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয়তর হবে। -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রথম সারিতে স্থান লাভের জন্য পূর্বেই মসজিদে আসা উচিত। পরে এসে প্রথম সারির ফজিলত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ ঠেলে সামনের সফে যাওয়া পাপের কাজ। এরপূর্ণভাবে প্রথম এসে প্রথম সারিতে জয়গা বালি রেখে পিছনে গিয়ে বসাও শুনাহ। তবে সামনের সফে খালি জায়গা থাকলে এমতাবস্থায় লোক ঠেলে সামনের সারিতে গেলে শুনাহ হবে না। কোনো ব্যক্তি মসজিদে পরে এসে সামনের সারি হতে কাউকে সরিয়ে উক্ত স্থানে নিজে বসা বা সামনের সারির কোনো ব্যক্তি স্থয়ং পিছনের সারিতে গিয়ে পরে আগমনকারীকে নিজের স্থানটি ছেড়ে দেওয়া উভয়টি অনুচিত। কেননা, সম্মুখের সারির লোকটি নিজের স্থানটি ছেড়ে পক্ষান্তরে এটাই বুঝা যায় যে, তার অধিক ছুওয়াবের প্রয়োজন নেই। আর 'কোনো ব্যক্তির ছুওয়াব বা নেকের প্রয়োজন নেই' এমন ধারণা পোষণ করা শুনাহ। অবশ্য কোনো সম্মানিত ব্যক্তির একরামের উদ্দেশ্যে উঠলে তা জায়েজ হবে।

إِنْ مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ : দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. প্রকাশ থাকে যে, إِنْ مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ -এর মধ্যে এক ওয়াক্তের উল্লেখ- এ হাদীসেই রয়েছে। আর তা হলো ফজরের নামাজ। এর উপর ভিত্তি করে হাদীস বিশারদগণ বলেন, দ্বিতীয় ওয়াক্ত ইশা-ই হবে। কেননা ফজর হলো দিনের প্রথম নামাজ, আর দিনের শেষ নামাজ হলো ইশার নামাজ।
২. অথবা مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ দ্বারা ফজরের দু' রাকাত ফরজ নামাজকে বুঝানো হয়েছে।
৩. অথবা ফজরের দু' রাকাত সন্নত ও দু' রাকাত ফরজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي
قَرْبِي وَلَا يَدُوٍّ لَا تُعَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا
قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ
بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ
- (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُ)

১০০০. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- এমন তিন ব্যক্তি- চাই তারা লোকালয়ে থাকুক বা জন-বিরল জঙ্গলে থাকুক- যারা নিজেদের মধ্যে জামাত কায়েম করে না, নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান আধিপত্য লাভ করবে। সুতরাং তোমরা জামাত কায়েম করবে। কেননা, দলছুট মেঘকেই নেকড়ে বাঘ ভক্ষণ করে [অর্থাৎ জামাত ছাড়া একা একা নামাজ পড়লেই শয়তানের খপ্পরে পড়তে হয়]। -[আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ثَلَاثَةٍ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ثَلَاثَةٍ শব্দ দ্বারা তিনজন পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। এতে মহিলা অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া এবং ইমামতি করা মাকরুহ। এখানে তিন সংখ্যা উল্লেখের মাধ্যমে শুধু তিনজনের মাঝেই জামাতকে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর বেশি হলে ছুওয়াবও বেশি হবে। সম্ভবত গ্রামের স্বল্প লোকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ثَلَاثَةٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

فَانَسَا يَأْكُلُ الْبُنْبُ الْفَانَسَا -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ এ বাকো জামাতবিহীন নামাজ আদায়কারীকে দশছুট মেঘের সাথে তুলনা করেছেন। মেঘের পাল ছেড়ে যে মেঘ একাএকা বিচরণ করে সে এক সময় রাখালের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ফলে অন্যায়সই নেকড়ে বাঘ তার উপর আক্রমণ করতে পারে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি জামাত পরিহার করে একা একা নামাজ পড়ে, অল্পতেই সে শয়তানের কু-প্ররোচনার খপ্পরে পতিত হয় এবং শয়তান তার নামাজ নষ্টের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। একসময় দেখা যায় সতাই তার নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা শয়তান সর্বদাই মানুষের ভাল কাজের পিছনে বেগে থাকে।

فَانَسَا -এর অর্থ : الْفَانَسَا 'আল-কাসীয়াহ' অর্থ- ঐ মেঘ-বকরি, যা রাখাল হতে দূরে এবং দল হতে বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করে। আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, কমপক্ষে তিন ব্যক্তি হলে অবশ্যই জামাত কায়ম করতে হবে এবং এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, নামাজের জামাত কায়ম করা সুনতে মুয়াক্কাদ বা ওয়াজিব।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُتَادِي فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرُ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ النَّبِيُّ صَلَّى - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّرَقَطْنِيُّ)

১০০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের আযান শুনল অথচ এর অনুকরণ করে জামাতে হাজির হতে কোনো 'ওজর' তাকে বারণ করল না, [তথাপি সে যথারীতি জামাতে হাজির হলো না; বরং একা একা নামাজ পড়ল] তার একা একা পড়া নামাজ কবুল করা হবে না। সাহাবীগণ আরজ করলেন, [ইয়া রাসূলুল্লাহ] ওজর কি? রাসূল ﷺ বললেন, শত্রুর ভয় অথবা রোগ-ব্যাদি। -[আবু দাউদ ও দারকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَانَسَا يَأْكُلُ الْبُنْبُ الْفَانَسَا -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি বিনা কারণে জামাত পরিত্যাগ করে একাকী নামাজ পড়ে তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তির নামাজ আঞ্জাহর দরবারে গৃহীত হয় না। এর অর্থ হলো, তার নামাজ পরিপূর্ণ হয় না এবং সে পূর্ণ হওয়াব হতে বঞ্চিত হয়। অবশ্য নামাজের ফরমিয়াত তার আদায় হয়ে যায়। ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন, জামাতে নামাজ পড়া ফরজ; কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে জামাতে নামাজ পড়া ফরজ নয়। বড়জোর ওয়াজিব হতে পারে। কেননা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হতে পারে না। পরিশেষে বলা চলে فَانَسَا يَأْكُلُ الْبُنْبُ الْفَانَسَا দ্বারা জামাতের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ (رَضَا) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدَكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَائِي نَحْوَهُ)

১০০২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন নামাজের ইকামত বলা হয় আর তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ অনুভব করে, তখন সে যেন প্রথমে তার প্রয়োজন সেরে নেয়। -[তিরমিধী। আর ইমাম মালেক, আবু দাউদ এবং নাসামীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ثَوْبَانَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يُؤْمِنَنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخْصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنَّ فَعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنَّ فَعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَصَلِّي وَهُوَ حَقِيحٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

১০০৩. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি কাজ করা কারো জন্য বৈধ নয়- (১) এমন কোনো ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে না, যে নিজের জন্য নির্দিষ্টভাবে দোয়া করবে, অথচ তাদের জন্য দোয়া করবে না। যদি কেউ এরূপ করে তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করল। (২) কেউ কারো অন্দের মহলের দিকে তাকাবে না, তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের পূর্বে, যদি সে এরূপ করে, তা হলে সে তাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করল। (৩) এবং কোনো ব্যক্তি প্রশ্রাব বা পায়খানার বেগ ধারণ করে আছে, এমতাবস্থায় নামাজ পড়বে না। যতক্ষণ না সে তা হতে অবসর হয়ে হালকা হয়। -[আবু দাউদ। তিরমিযীও এর এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য বাক্যটি উক্ত হাদীসে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে যে, ইমাম সাহেব শুধু নিজের জন্য দোয়া করল কিন্তু অন্যান্য মুসল্লীদের জন্য দোয়া করল না, সে যেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। কেননা ইমাম মুসল্লিদের ঘরাই নির্বাচিত এবং তিনি তাদেরই প্রতিনিধি। আর মুসল্লিদের তুলনায় ইমাম আল্লাহর নৈকটা লাভে আগ্রহী। সুতরাং সে যদি মুসল্লিদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের জন্যই আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তা হলে সে যেন মুসল্লিদের প্রদত্ত আমানতের খেয়ানত করল। অতএব তাকে বিশ্বাসঘাতক বলাই যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, যদি কেউ কারো ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে তাকাল অথবা প্রবেশ করল, সে যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। কেননা অপরিচিত ব্যক্তি কারো ঘরে অনুমতি ব্যতীত তাকানো শরিয়ত সম্মত নয়। এটা একপ্রকার হুকুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সে ব্যক্তি হুকুল ইবাদ পালন না করার অপরাধে অপরাধী হবে। হাদীসের ভাষায় এ ব্যক্তিকেও বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে।

وَعَنْ جَابِرٍ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ - (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

১০০৪. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমরা নামাজকে বিলম্ব করবে না। চাই খাওয়া-দাওয়ার জন্য হোক বা অন্য কোনো [পার্শ্বি] প্রয়োজনে হোক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ দুই হাদীসের মধ্যে ধনু ও তার উত্তর : আলোচ্য লَطَعَامٍ হাদীসটির সাথে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত ৯৮৯ নং হাদীসটির ধনু দেখা যায়। কারণ তাতে فَأَبْدَأُوا بِالْمَسَاءِ বাক্যটি রয়েছে। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন খাবারের জন্য জামাত বর্জন করা জায়েজ আছে। অথচ আলোচ্য হাদীসটিতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর সমাধানে বলা যায় যে, (ক) হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসটিতে তাবিল করা হয়েছে لِطَعَامٍ অর্থ-অর্থ لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ অর্থ-আহারের জন্য নামাজ কাজা করে না। (খ) لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ অর্থ-আহারের জন্য খানার আশায় আশায় বসে থেকে নামাজ কাজা করবে না। যদি খানা এসে যায়, তবে বিলম্ব করবে।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْسِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَدَا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يَنَادِي بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحَسِّنُ الطَّهَوْرَ ثُمَّ يَغْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০০৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের সাহাবীদল সম্পর্কে জানি [তারা কখনও জামাত ত্যাগ করেন না] নামাজের জামাত তরক করে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিকরাই অথবা রোগী। আর আমি এটাও দেখেছি যে, রোগী দুই ব্যক্তির মধ্যখানে [তাদের সাহায্যে] পথ চলেছে যাতে মসজিদে নামাজ লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে 'সুনানে-হুদা' শিক্ষা দিয়েছেন। আর আযান হয় এমন মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা 'সুনানে হুদা'রই অন্তর্গত।

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল [কিয়ামতে] পূর্ণ মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে; সে যেন এই পাঞ্জেশানা নামাজের [জামাতের] প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে এই আযান দেওয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানে হুদা' নির্ধারণ করেছেন। আর এ পাঞ্জেশানা নামাজ জামাতে আদায় করাও সুনানে হুদা'রই অন্তর্গত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে-বাড়িতে নামাজ আদায় কর, যেভাবে এ জামাত বরখোলাফকারী তার ঘরে আদায় করে, তা হলে তোমরা তোমাদের নবীর সুনাত ত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুনাত ত্যাগ কর তা হলে নিশ্চয়ই গোমরাহ হয়ে যাবে। [অতঃপর তিনি বললেন,] আর যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করে এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করে এ মসজিদসমূহের মধ্যে কোনো মসজিদের দিকে গমন করে, তাহলে সে যে সকল পদক্ষেপ দেয় তার প্রত্যেক কদমেই তার জন্য আল্লাহ একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা উন্নত করেন, এতদ্ব্যতীত তা দ্বারা তার একটি গুনাহও মার্জনা করে দেন। খোদার কসম! আমি তাদেরকে [সাহাবীদলকে] দেখেছি [তারা কখনও জামাত ছাড়তেন না] জামাত ছাড়ে কেবল প্রকাশ্য-মুনাফিকরাই। নিশ্চয়ই পূর্বে এরূপ ব্যক্তিও দেখা যেত যাকে দুই ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের গায়ে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হতো, যাতে তাকে নামাজের ছকে দাঁড় করানো যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِلَّا مُتَانِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ -এর ব্যাখ্যা : আলাচা হাদীসংশের ফলে একটি প্রশ্ন হয় যে, মুনাফেকী প্রকাশ্যভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে শরয়ী কোনো বিধান প্রয়োগ করা হয় না কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত দুর্বল ঈমানদারগণ অপবাদ রটাতে পারে- رَأَى مُحَمَّدًا يُقْسِلُ أَصْحَابَهُ - "মুহাম্মদ ﷺ আপন লোকদেরকে হত্যা করছেন"। যেমন রাসূল ﷺ হদায়বিষয়ার দিন মক্কা আক্রমণ করেননি। কারণ এ সময় মক্কায় মুসলমানগণও ছিল। তখন অন্যান্যভাবেও যদি কোনো মুসলমান মারা যেত তবুও কাফিররা অপপ্রচার করতে সুযোগ পেত যে, - "মুহাম্মদ ﷺ তার সাথীদেরকে হত্যা করেছেন।"

দ্বিতীয়ত এটা রাসূল ﷺ-এর উন্নত চরিত্রের কারণও হতে পারে, যেমন- عَطَنَ عَلَيْهِ تِي بَاقُو -এর অর্থ : অর্থাৎ সাহাবীগণ কখনো কাউকে কট্টর মুনাফিক বলতেন না; বরং কখনো ধারণা করতেন মাত্র। কেননা ঈমান থাকা সত্ত্বেও অলসতা বশত ত্রুণ جَسَاعَتٌ হতে পারে। এ জন্য মুনাফিকদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন কিন্তু জ্বালাননি।

سُنُّنُ الْهُدَى -এর অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'সুনানে হদা' শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লামা তীবী (র.) 'সুনানে হদা'-র অর্থ বর্ণনায় বলেন-الْوَصَابُ وَالْهُدَى وَالصَّوَابُ অর্থ- সুনানে হদা হলো সত্য ও সঠিক পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ গোটা জীবনেই মানুষদেরকে সরল সঠিক ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ জন্যই ধরার বৃকে শ্রেণণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাকে 'রাহমাতুল লিল আলামীন' তথা বিশ্ব জগতের 'রহমত' হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَأَنَّكُمْ -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ কর তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এ বাক্যে সুন্নত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। মূলত এর দ্বারা একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনাই উদ্দেশ্য। শুধু রাসূল ﷺ-এর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বুঝানোই উদ্দেশ্য নয়। রাসূল ﷺ-এর ভরিকা মানেই হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ পরিহার করা আল্লাহর নির্দেশিত পথ পরিহার করারই নামান্তর। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِيَةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فَتَيَانِي يَحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১০০৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যদি ঘরসমূহে স্ত্রীলোকগণ এবং সন্তান-সন্ততিগণ না থাকত তবে আমি এশার নামাজের জামাত কায়েম করতাম। অতঃপর আমার যুবকদেরকে আদেশ দিতাম, যেন ঘরে যা আছে সবকিছু তারা আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয়। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীস থেকেও জামাতের অপরিহার্যতা বুঝা যায়।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَوُّوْا بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَصَلِّيَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১০০৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যখন কেউ মসজিদে থাকবে, আর এমতাবস্থায় নামাজের জন্য আযান দেওয়া হবে তখন তোমাদের কেউ যেন মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ না নামাজ শেষ করে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الَّذَانَ حَكْمَ السَّجْدِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَا نِ آযানের পর মসজিদ হতে বের হওয়ার বিধান : আযান দেওয়ার পর মসজিদ হতে বের হওয়ার বিষয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা নিম্নরূপ—

আবু দাউদ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাযিয়াব তাবেরী হতে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, **قَالَ لَا يَخْرُجُ** অর্থাৎ আযানের পর মসজিদ হতে মুনাফিকই বের হয়ে থাকে। অবশ্য যদি কেউ কোনো প্রয়োজনে বের হয় এবং পুনরায় ফিরে আসার নিয়ত করে তখন তার কোনো দোষ হবে না এবং আলিমদের কাছে সাঈদ ইবনে মুসাযিয়াবের মুরসাল গ্রহণীয়। কিছু সংখ্যক আলিম আরাে বলেছেন, যদি সে ব্যক্তি অন্য কোনো মসজিদের ইমাম হয় কিংবা তার দ্বারা অন্য কোনো স্থানে জামাতের এন্ট্রেন্স বা আয়োজন হয়ে থাকে, তখন আমাদের মাফ্যাব মতে এমন ব্যক্তির চলে যাওয়া মাকরুহ বা নিষেধ নয়। আর যদি সে ব্যক্তি আগে একবার নামাজ পড়ে থাকে এমন ব্যক্তিরও আযানের পর মসজিদ হতে চলে গেলে কোনো দোষ হবে না। কেননা ফজর আসরের পর নফল পড়া মাকরুহ, মাগরিবের পর তিন রাকাত নফল পড়া মাকরুহ। আর জোহর ও এশা একবার পড়ার দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ হয়ে গেছে। অবশ্য এ ধরনের লোককে একামত গুরু হওয়ার পূর্বেই চলে যেতে হবে। অন্যথা একামত গুরু হওয়ার পর বের হলে প্রকাশ্যে জামাত তরক করার হুকুম তার উপর বর্তাবে। এতে অন্যান্য মুসল্লিগণ তার প্রতি খারাপ ধারণা করবে।

وَعَنْ أَبِي الشَّعْبَاءِ (رَحَد) قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه (رواه مسلم)

১০০৮. অনুবাদ : [তাবেরী] হযরত আবুশ শা'ছা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আযান দেওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে গেল। এ দেখে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, এ লোকটি আবুল কাসেম হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে অমান্য করল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثِ هَادِيَسের পটভূমি : ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত অনেক মুহাদিস উক্ত হাদীসটি হযরত আবুশ শা'ছা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে, একদা কয়েকজন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে আসর নামাজের আযান দেওয়া হলে তখন এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে গেল ফলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে অমান্য করল।

وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَقَّانٍ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَهُ الْإِذَا نِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يَرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ - (رواه ابن ماجه)

১০০৯. অনুবাদ : হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে থেকে আযান পেয়েছে অর্থাৎ মসজিদে থাকতেই আযান দেওয়া হয়েছে, অতঃপর সে বের হয়ে পড়েছে কিন্তু অতীত প্রয়োজনীয় কোনো কাজে বের হয়নি, আর পুনরায় মসজিদে ফিরে আসার ইচ্ছাও পোষণ করে না তবে সে ব্যক্তি মুনাফিক। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهُوَ مُنَافِقٌ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আযানের পর নামাজ না পড়ে মসজিদ হতে বের হয়ে গেল কোনো প্রয়োজন ব্যতীত এবং মসজিদে ফিরে আসারও ইচ্ছা নেই সেই ব্যক্তি মুনাফিক। এখানে মুনাফিক বলতে প্রকৃত মুনাফিক বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সে যে গুনাহগার এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অথবা বলা যায় যে, সে ব্যক্তি জামাত তরক করার ক্ষেত্রে মুনাফিকের ন্যায় কাজ করেছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَمِعَ الشَّيْءَ فَلَمْ يُعِجِبْهُ فَلَا صَلَوةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ - (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ)

১০১০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে অথচ জামাতে হাজির হয়নি, তার নামাজ হয়নি। কিন্তু যদি তার কোনো গ্রহণীয় ওজর থাকে তা হলে তার একাঙ্গী নামাজ পড়া কবুল হবে। -[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আযানের জবাবের অর্থ ও তার প্রকারভেদ : আযানের জবাব দু' প্রকারে হতে পারে। একটি **قَوْلِي** এবং অপরটি **نَعْلِي** কাওলী হলো, হাই'আলাতাইন ব্যতীত আযানের বাকি বাক্যগুলো মুয়াজ্জিন যা বলে শ্রোতা তার জবাবে অবিকল সেই বাক্যগুলোই মুখে উচ্চারণ করবে এবং হাই'আলাতাইনের জবাবে লা হাওলা বলবে। আর এটা বলা সন্নত এবং ফেঈলী জবাব হলো কোনো ওজর না থাকলে মসজিদে তথা জামাতে হাজির হওয়া। এটা ওয়াজিব। আর হাদীসের বাক্য 'যে জবাব দেয়নি' এর অর্থ- যে [নামাজে] মসজিদে উপস্থিত হয়নি তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়নি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (رض) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسَّبَاعِ وَأَنَا صَرِيحُ الْبَصْرِ فَهَلْ تَجِدُنِي مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَتَّى عَلَى الصَّلَوةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَتَّى هَلَا وَلَمْ يُرْخِصْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي)

১০১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনায বহুল পরিমাণে সরীসৃপ ও হিংস্র জন্তু রয়েছে, অথচ আমি একজন অন্ধ। আপনি কি আমাকে [অপারগ মনে করে নিজ গৃহেই নামাজ পড়ার] অনুমতি প্রদান করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি হাইয়্যা আলাস সালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ শুনেতে পাও? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি উপস্থিত হও, তাকে তিনি অনুমতি দিলেন না। -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ امَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَتَهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০১২. অনুবাদ : হযরত উম্মে দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার স্বামী আবুদ দারদা (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে আপনাকে এতটা রাগান্বিত করল? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের পরিচয় এটা ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে করি না যে, তারা সমবেতভাবে [জামাতে] নামাজ পড়ে। [কিন্তু আজ দেখছি তার কতেক উম্মত জামাত ত্যাগ করে চলে গেছে।] -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-এর অর্থ : আল্লামা তীসী বলেন, এ বাক্যটি **مَا أَغْضَبَكَ** -এর উত্তরে বলা হয়েছে। এখানে "مَا" শব্দটি **أَشْفَاهُمْ** এবং কসমের জন্য এসেছে। হযরত একবার আবুদ দারদা (রা.) রাগত অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তাঁর রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এমন একটি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে রাগান্বিত হয়েছি

যা দীনে মুহাম্মদীর মৌলিক কোনো বিষয় না হলেও এর গুরুত্ব অপরিণীম এবং যার ছওয়াব অত্যধিক। তা হলো জামাতে নামাজ আদায় করা। আর এটা হলো উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ পরিচয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো উম্মতে মুহাম্মদীর কেউ কেউ এখন জামাত ত্যাগ করতে চলেছে। আর এ জন্যই আমি মনে মনে এত রাগান্বিত।

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي حَنَمَةَ (رَحِمَهُ اللهُ) قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) فَقَدْ سَلَّمَ سَلِيمَانَ بْنَ أَبِي حَنَمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَنَّ عُمَرَ عَدَا إِلَى السُّوْقِ وَمَسَّكَ سَلِيمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوْقِ فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ، أَمَّ سَلِيمَانَ فَقَالَ لَهَا لِمَ أَرَسَلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০১৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবু বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আবী হাছমাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) [আমার পিতা] সুলায়মান ইবনে আবু হাছমাহকে ফজরের নামাজে দেখতে পেলেন না। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) সাত সকালে বাজারের অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সুলায়মানের ঘর মাসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। যখন তিনি সুলায়মানের মাতা বিবি শাফার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি তাকে [বিবি শাফাকে] জিজ্ঞেস করলেন, ফজরের নামাজে সুলায়মানকে তো দেখলাম না? তিনি বললেন, সে তো সারারাত নামাজ পাড়েছে, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, অবশ্যই ফজরের জামাতে আমার উপস্থিত হওয়া আমার নিকট সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ [নফল] পড়ার চেয়ে অধিক প্রিয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উচ্চ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, রাত জেগে নফল নামাজ বা তাহাজ্জুদ পড়া যদি ফজরের নামাজ কাজ বা জামাত হারানোর কারণ হয় তা হলে নফল বা তাহাজ্জুদ ত্যাগ করাই উত্তম।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّنِ إِنْسَانٍ فَمَا فَرَّقَهُمَا جَمَاعَةٌ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১০১৪. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন দুই বা তদুর্ধ্ব লোক হলেই জামাত পূর্ণ হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমামের সাথে কমপক্ষে একজন মুক্তাদি হলেও জামাত হয়ে যায়।

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ

১০১৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত বেলাল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যখন মহিলাগণ তোমার নিকট মসজিদে যেতে অনুমতি চায় তখন তাদেরকে যেতে নিষেধ করো না। যেন তারা মসজিদে নিজ অংশ লাভ করতে পারে। তখন বেলাল বললেন, আল্লাহর

لَمَنَعْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ لَمَنَعْنَهُمْ
 وَفِي رَوَايَةٍ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَقْبَلَ
 عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهَ سَبًّا مَا سَمِعْتَهُ
 سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرَكَ عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَمَنَعْنَهُمْ -
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

কসম! আমি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করব। এটা শুনে
 হযরত আব্দুল্লাহ [রাগান্বিত হয়ে] বললেন, আমি তোমাকে
 বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [তাদেরকে নিষেধ করে] না।
 আর তুমি বলছ, “আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নিষেধ করব”।

সালেমের বর্ণনায় আছে যে, তিনি বললেন, বেলালের
 কথা শুনে আমার পিতা আবদুল্লাহ তার উপরে রেগে গেলেন
 এবং তাকে খুব মন্দ বললেন। এমন ভর্ৎসনা করলেন, যা
 আমি আর কখনও শুনিনি। আর বললেন, আমি তোমাকে
 রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী শুনাচ্ছি; আর তুমি কি না বলছ
 “আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নিষেধ করব”।
 -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِوَالِ اللَّهِ مَا لَمْ تَمْنَعْ بِلَالًا أَنْ تَخْضَرَ التِّسَاءُ فِي الْجَمَاعَةِ
 হযরত বেলালের দৃঢ়তার সাথে শ্রীলোকদের মসজিদে গমনে বাধা দেওয়ার কথা প্রকাশ করাটা [নিউমুবিলাহ] রাসূল ﷺ-এর
 হাদীসের মোকাবিলায় ধৃষ্টতা পোষণ করা নয়; বরং যখন মানুষের চরিত্রের অবক্ষয় এবং নানা ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদের জামান
 পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন আর মহিলাদের ঘরের বাইরে গমনাগমন নিরাপদ নয়। অন্যথা হযরত আব্দুল্লাহ যে রাসূলের হাদীস
 বর্ণনা করেছেন, বেলালও তা স্বীকার করেন। তবে স্থান কাল বিশেষে মহিলাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে হুাম
 বলেন, শ্রীলোকদের নামাজের উদ্দেশ্যে বর্তমান যুগে মসজিদে যাওয়া মাকরুহ, ওলামাগণও এ মতই ব্যক্ত করেছেন।

وَدَعَا بِلَالًا وَتَابَ عَلَيْهِمْ : أَلَا تَرَى بِلَالًا يَأْتِيهِمْ فِي الْمَسْجِدِ
 হযরত বেলাল ও তাঁর সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে
 বাধা দেওয়া নিষেধ করেছেন। অথচ তাবেয়ী বেলাল (র.) ব্যক্তিগত অভিমত অনুযায়ী মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ
 করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এখন বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের সাথে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের বিরোধ হয়ে
 যায়। এর সমাধান হলো, তাবেয়ী বেলাল (র.) মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন, সামাজিক অবক্ষয় এবং নারীঘটিত বিভিন্ন
 ফিতনা-ফ্যাসাদের পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত আয়েশা (রা.)-এর অতিব্যক্তির মধ্যে
 প্রতিভাত হয়ে উঠে। তিনি বলেন, لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى مَا أَحَدَتْ التِّسَاءُ لَمَنَعْنَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا فِي مُسْلِمٍ
 অর্থাৎ, রাসূল ﷺ যদি রমণীদের দ্বারা সংঘটিত ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রত্যক্ষ করতেন তা হলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে
 যেতে বাধা দেতেন। অতএব যুগ সঙ্কটের বিবেচনায় রাসূল ﷺ-এর হাদীস তাবেয়ী বেলালের অভিমতের পরিপন্থী নয়।
 এর দ্বারা রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা বুঝা না।

وَعَنْ ۱۰۱۱۬ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَمْرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ
 رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنُ
 لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ فَإِنَّا تَمْنَعُهُمْ فَقَالَ
 عَبْدُ اللَّهِ أَحَدْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ
 حَتَّى مَاتَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১০১৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মুজাহিদ হতে
 বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
 বলেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
 বলেছেন, “কোনো ব্যক্তি যেন তার পরিবারকে মসজিদে
 আসতে বাধা না দেয়।” এটা শুনে হযরত আব্দুল্লাহর এক
 পুত্র [বেলাল] বলে উঠলেন, “নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে
 বাধা দেব”। তখন হযরত আব্দুল্লাহ রাগান্বিত হয়ে বললেন,
 আমি তোমাকে শুনাচ্ছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, আর তুমি
 বল এটা? বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন, তারপর হযরত
 আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা
 বলেননি। -[আহমদ]

بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ : কাতার সোজা করা

জামাতে নামাজ পড়ার জন্য কাতার সোজা করার গুরুত্ব অপরিমিত। পূর্ব যুগের উম্মতের ইবাদতের কাতার ছিল গোলাকার, উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজের কাতার হলো লম্বাখালি। ইসলাম একটি শৃঙ্খলার নাম। বিচ্ছিন্নতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা ইসলাম সমর্থন করে না। নামাজের কাতার সোজা করার মধ্যে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। যেমন হাদীসে এসেছে—

النَّامِزَةُ كَاتَارٌ سَوِيٌّ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ مِنْ حَسَنِ الصَّلَاةِ
নামাজের কাতার সোজা করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, কারো মতে এটা সুন্নত। তাঁরা উপরোক্ত হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন। অপর একদলের মতে ওয়াজিব, তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন যে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

আরেক দলের মতে এটা মোস্তাহাব। তবে জামাতের সারিকে সোজা করা যে, ইমামের উপর ওয়াজিব এটা দূররে মুখতার গড়ে উল্লিখিত হয়েছে, আর এটা পরিত্যাগ করা মাকরুহে তাহরীমী, চাই ইমাম নিজে করুন বা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিন। নিজে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১০১৭. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সারিসমূহ সোজা করতেন এমনভাবে, যেন তার সাথে তিনি তীর সোজা করতেন। তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ না তিনি বুঝতে পারতেন যে আমরা বিষয়টি তার নিকট হতে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। একদা তিনি ঘর হতে বের হয়ে আসলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন, এমনকি তাকবীরে তাহরীমা বলতে উদ্যত হলেন, এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি হতে সম্মুখে সিনা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা তোমাদের সারি সোজা করে দাঁড়াবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। —[মুসলিম]

عَنْ ١٠١٧
التَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ
(رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي
صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّما يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ
حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ
يَوْمًا فَنَاقَمَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَيِّبَ فَرَأَى رَجُلًا
بَادِيًا صَدْرَهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ
لَتَسُونَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
وَجْهِكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَاتَارٌ কাতার করার অর্থ : প্রকাশ থাকে যে, تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ বা কাতার সোজা করার দু'টি অর্থ হতে পারে— প্রথমতঃ এটা দ্বারা হয়তো সফে যারা আছে তাদেরকে সোজাভাবে একমুখী হয়ে দাঁড়ানোর কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাতারের মধ্যে যেই দোষত্রুটি আছে যেমন ফাঁক থাকা অথবা কাতার আকাবাকা হওয়া ইত্যাদি দোষত্রুটি মুক্ত করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় كَاتِمًا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ এ হাদীশের মধ্যে।

এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটিকে তাশবীহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এ বাক্যটি তৎকালীন আরবের একটি প্রচলিত বাগধারা। كَاتِمًا অর্থ তীর। অর্থাৎ একেবারে তীরের মতো কাতার সোজা করা। কেননা তীর দ্বারা

উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে লক্ষ্যবস্তু স্থির করে তা সোজা করে নিক্ষেপ করা অপরিহার্য। অদ্রুপভাবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হলে কাতার সোজা করে একাধিষ্ঠিত্তে নামাজ আদায় করা উচিত।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ سَوَاءِ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ إِذَا سَأَلُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ سَوَاءٌ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمَا بَيْنَ وَجْهِهِمْ وَأَخْبَلَتْ الظُّلُمَاتُ سَبَبَ الْإِخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ - এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের নামাজের সারিসমূহ সোজা করে দাঁড়াবে নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। মুখমণ্ডলে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যা নিম্নরূপ-

প্রথমত বাক্যটি হয়তো তার হাকীকী অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডল যেখানে রয়েছে তথা হতে পরিবর্তন করে গর্দানের উপর স্থাপন করা হবে।

দ্বিতীয়ত এর দ্বারা মাজাযী বা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। ইমাম নববী বলেন, এর অর্থ হলো যারা কাতার সোজা করবে না তাদের মধ্যে শকুতা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অঙ্গরের মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে-

لِأَنَّ مَخَالَفَتَهُمْ فِي الصُّفُوفِ مُخَالَفَةٌ فِي ظُهُورِهِمْ وَأَخْبَلَتْ الظُّلُمَاتُ سَبَبَ الْإِخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ -

অর্থাৎ তাদের কাতারের পার্থক্য তাদের প্রকাশ্য পার্থক্যেরই পরিচায়ক আর প্রকাশ্য পার্থক্য হলো আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কারণস্বরূপ।

তৃতীয়ত এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তাদের মুখমণ্ডলের আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া হবে।

وَعَنْ أَنَسِ (رَضًا) قَالَ أَقْبِمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْبَلْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقْبِمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فَيَأْتِي أَرَاكُم مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِي - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِي الْمَتَّفِقِ عَلَيْهِ قَالَ أَيْمُونَا الصُّفُوفِ فَيَأْتِي أَرَاكُم مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِي -

১০১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একদা নামাজের একামত বলা হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পিছনের দিকেও দেখতে পাই। -[বুখারী]

বুখারী ও মুসলিম উভয়টির সম্মিলিত বর্ণনায় রয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সফসমূহকে পূর্ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখতে পাই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ أَنَسِ (رَضًا) قَالَ أَقْبِمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْبَلْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقْبِمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فَيَأْتِي أَرَاكُم مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِي - এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ পিছনেও সম্মুখের ন্যায়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। এ কথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-

১. রাসূল ﷺ বলেছেন পিছনেও সফসমূহের ন্যায়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। এ কথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-
১. রাসূল ﷺ বলেছেন পিছনেও সফসমূহের ন্যায়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। এ কথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-
১. রাসূল ﷺ বলেছেন পিছনেও সফসমূহের ন্যায়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। এ কথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-
১. রাসূল ﷺ বলেছেন পিছনেও সফসমূহের ন্যায়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। এ কথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-
২. হয়তো বা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখের চক্ষু দ্বারা পিছনেও সমভাবে দেখতেন, যা ছিল তাঁর মুজিব্যার বহিঃপ্রকাশ। এ অর্থে হাদীসটি এর হাকীকী অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। আল্লামা ইবনুল মুনাযির বলেন, এর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই।
৩. অথবা বলা যেতে পারে যে, হাদীসটি মাজাযী অর্থে প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ এলহামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনে দেখতে পেতেন।
৪. অথবা বলা যেতে পারে যে, নবী করীম ﷺ-এর পিছনেও সম্মুখের ন্যায় চক্ষু ছিল যার দ্বারা তিনি দর্শন করতে পারতেন।

كَمَا ذَكَرَ مُخْتَارٌ مِنْ مَعْمَدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَنَ كَتِفَيْهِ عَيْنَانِ مِثْلَ سِمِّ الْعِبَابِ فَكَانَ يَبْصُرُ بِهِمَا وَلَا يَغْتَجِبُ لِهَيْمَا النَّيَابِ . (كَمَا فِي الْعَيْنِينَ)

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوَّوْا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ - (مَتَّقَ عَلَيْهِ) إِلَّا أَنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَعَامٍ الصَّلَاةِ .

১০১৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা নামাজের সারিসমূহকে সোজা কর। কেননা সারি সোজা করা নামাজ প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত। - (বুখারী ও মুসলিম) আর মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, সফ সোজা করা নামাজ পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ -এর ব্যাখ্যা : মিরকাত গৃহে الصَّلَاةِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ -এর ব্যাখ্যা বলা হয়েছে যেন ঠিক। অর্থঃ নামাজের কাতার সোজা করা তা পরিপূর্ণ হওয়ারই পূর্বশর্ত। অর্থঃ নামাজ শুদ্ধ ও সহীহ হওয়ার জন্য কাতার সোজা করা অপরিহার্য।

অথবা নামাজ শুদ্ধ ও সুন্দর হওয়ার যে সমস্ত বিধি-বিধান রয়েছে নামাজের কাতার সোজা করাও তার অন্তর্ভুক্ত, যেমনিভাবে আরাহর এ বাণীর মধ্যে নামাজের যাবতীয় আরকান, আহকাম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মোস্তাহাব সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَبْصَارِيِّ (رَضًا) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالتُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَانْتَمَ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২০. অনুবাদ : হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে দাঁড়ালে আমাদের বাহুমূলসমূহ স্পর্শ করে পরস্পর মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ে না, তাহলে তোমাদের অন্তরসমূহও প্রভেদ হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণ ও বিজ্ঞ তারা যেন আমার কাছাকাছি অর্থঃ প্রথম সারিতে দাঁড়ায়। অতঃপর যারা বয়স ও বিজ্ঞতায় তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়ায়, তারপর বয়স ও জ্ঞান কম অনুসারে তৎপরবর্তীগণ দাঁড়ায়। আবু মাসউদ দুঃখ করে বলেন, আজ তোমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিভিন্নমুখী। - [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَبْصَارِيِّ (رَضًا) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ -এর অর্থ : আলামা তীবী (র.) বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্তর অঙ্গসমূহের অধীন। যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হবে, তখন অন্তরেরও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। অন্তরে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, আর এ বিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও দেখা দেবে। কারণ অন্তর হলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালক। প্রকৃতপক্ষে অন্তর হলো নেতা এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর অধীন। আর অন্তর যা করতে চায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাই করে। অন্তর বিতর্ক হলে বাহ্যিক অঙ্গের কার্যাবলি বিতর্ক হতে বাধ্য। যেন শাসক স্থিতিশীল হলে প্রজাণদের মধ্যেও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। দৃষ্টান্তরূপে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখযোগ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন-

إِلَّا إِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ فِي الْقَلْبِ

সাবধান! তোমাদের দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে যখন তা শুদ্ধ হয়ে যায় তখন সর্বাসই সঠিকভাবে কাজ করে, আর তাতে যখন বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তখন সর্বাসে বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই মাংসপিণ্ডটি হলো কলব বা হৃদপিণ্ড। সুতরাং বাহ্যত এ

হাদীসের সাথে উপরোক্তিত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণিত হাদীসের বিরোধ দেখা যাচ্ছে। অতএব এর সমাধান হলো, প্রকৃতপক্ষে অন্তরই আধিপত্যকারী, অন্তরই সকল কাজের উৎস। তবে অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে এক অতুত ও সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলে একে অপরের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়। যেমন- প্রজ্ঞাপন অকারণে বিন্দোহ করলে শাসকের মন কিছুটা প্রভাবিত হয়, কখনও শাসক দুর্বল হন বা ক্ষিপ্ত হন। অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা অন্তরও প্রভাবিত হয়। যেমন কোনো দৃশ্য যদিও চোখ দর্শন করে, কোনো সুমিষ্ট স্বর যদিও কান শ্রবণ করে তবু এটা অন্তরের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। যদিও কার্যবলির উপরে অন্তরেরই একক আধিপত্য থাকে।

أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে 'উলুল আহলাম ওয়ান নুহা' শব্দ এসেছে। 'আহলাম' ও 'নুহা'-এর একই অর্থ, অর্থাৎ জ্ঞানবান। ইবনে সায়েদুনুসাই (র.) বলেন, সমার্থক শব্দ দুটি পাশাপাশি আসাতে এর অর্থ হবে বিভিন্ন। যথা- প্রবীণ ও জ্ঞানবান। প্রবীণ, যারা পরিপক্ব বয়সের কারণে জ্ঞানলাভ করেছেন; আর জ্ঞানবান, যারা প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে জ্ঞানলাভ করেছেন।

ইমাম নববী বলেন, প্রবীণ ও জ্ঞানবানদেরকে প্রথম সারিতে এবং প্রবীণত্ব ও জ্ঞানক্রম অনুসারে পরবর্তী সারিগুলোতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে; এ জন্য যে, ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য শৃঙ্খলা বজায় থাকে। মর্যাদাক্রম অনুসারে নেতৃত্বের ধারা চলতে থাকে। এটা ছাড়াও কখনো কখনো ইমাম তাঁর নিকটবর্তী সারির উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। ইমামের ভুল হলে সম্মুখের সারির মুসল্লিগণই প্রথম লোকমা দিয়ে থাকেন। ইমামের অপ্রত্যাশিতভাবে অজু বিনষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট পিছনের সারি হতেই ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে ইত্যাদি। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রবীণ ও জ্ঞানবান লোকদেরকে সম্মুখের সারিতে এবং তৎপরবর্তী সারিগুলোতেও বয়ঃ ও জ্ঞানক্রম অনুসারে দাঁড়াতে বলেছেন।

حُكْمُ تَسْوِيَةِ الصُّوفِيَةِ কাতার সোজা করার বিধান : নামাজের কাতার সোজা করার হুকুমের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে-

إِنَّمَا هِيَ إِحْسَانٌ وَإِنْ عَجَلْتُمْ عَلَيْهِ شِئْرًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَالصَّلَاةُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ تَمْنَعُ الْعَذَابَ -এর ব্যাখ্যা : ইমামের কাতার সোজা করা ফরজ। তিনি দলিল হিসাবে الْقَامَةَ الصَّيِّبَةَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, নামাজ কয়েম করা যেমনিভাবে ফরজ, তদ্রূপভাবে নামাজ কয়েম করতে যা কিছুই প্রয়োজন, সবই ফরজ। অবশ্য এ যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাতার সোজা করা সুন্নত। কেননা এটা নামাজ পরিপূর্ণ ও সুন্দর হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃবৃদ্ধ প্রবীণ ও জ্ঞানবান তারা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়, অতঃপর যারা বয়সে ও জ্ঞানে তাদের কাছাকাছি তাঁরা দাঁড়ায়। একরূপে তিনি কথটি তিন বার বলেছেন তারপর বললেন, সাবধান! মসজিদে বাজারের ন্যায় হৈ টৈ করা হতে বেঁচে থাকবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنْفَرُوا عَنْ مَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ -এর ব্যাখ্যা : وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ এটা تَحْذِيرٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ مَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা أَدَابُ عِبَادَةِ اللَّهِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা অর্থ হলো বাজারে যেমন ছোট-বড় ধনী-গরিবের কোনো তারতম্য থাকে না, ঠিক তেমনি নামাজে তোমরা এমন হয়ো না; বরং বড় বড়দের সাথে আর ছোট ছোটদের সাথে দাঁড়াবে।

وَعَنْ ١٠٢٢ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَض) قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَحْضَابِهِ تَأَخَّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا وَأَتَمُّوا إِلَيَّ وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২২. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে নামাজে পিছনে থাকার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করলেন তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও এবং আমার অনুসরণ কর, যাতে পশ্চাতের লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। একদল লোক সর্বদাই পিছনে থাকার মনোভাব পোষণ করে, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে [আপন রহমত ও বরকত হতে] পিছনে রাখেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَأَخَّرًا -এর অর্থ : تَأَخَّرًا পদ দ্বারা صُوتِبِ الصَّلَاةِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রথম সফে যোগদান না করা। অথবা تَأَخَّرًا দ্বারা تَأَخَّرَ عَنْ الْعِلْمِ উদ্দেশ্য। প্রথম অর্থানুযায়ী মর্মার্থ হবে- ওলামায়ে কেরাম যেন প্রথম কাতারে দাঁড়ায় যাতে তাঁরা যাহের আহকামের অনুসরণ করতে পারে। আর تَأَخَّرًا দ্বারা تَأَخَّرَ عَنْ الْعِلْمِ উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে, তোমাদের সকলেই যেন শরীয়া আহকাম শিখতে পারে। মোদাক্বা, ওলামায়ে কেরাম যেন প্রথম কাতারে দাঁড়ায়। কেননা তাঁরা রাসূল ﷺ -এর আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আর এতে অন্যদের জন্য সুবিধা হবে।

حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ -এর ব্যাখ্যা : যে সমস্ত লোক সর্বদা নামাজের পিছনের কাতারে দাঁড়াবার মনোভাব পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য তারা অর্জন করতে পারবে না। আল্লামা নববী এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা আল্লাহর রহমত, বরকত, সুমহান মর্যাদা প্রভৃতি বস্তু হতে বঞ্চিত হবে।

وَعَنْ ١٠٢٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رَض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَرَانًا حَلْقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ الْآ تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلِيكََةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلِيكََةَ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২৩. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং দেখলেন আমরা বৃত্তাকারে [গোল হয়ে] দলে দলে বসে আছি। তখন তিনি বললেন, তোমাদেরকে কেন পৃথক পৃথকভাবে দেখছি? এ ঘটনার পর আর একদিন তিনি আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা কেন এমনভাবে সারিবদ্ধ হও না যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের নিকটে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা প্রথমে আগের সারিগুলোকে পূর্ণ করে [এবং তারপর পরবর্তী সারিগুলো]। আর সারিতে একে অপরের সাথে মিশে দাঁড়ায়। -[মুসলিম]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا شَرُّهَا أَوْلَاهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- পুরুষ লোকের [নামাজের] সারিসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সারি হলো প্রথম সারি, আর সর্বনিকৃষ্ট সারি হলো শেষ সারি। আর মহিলাদের সর্বোৎকৃষ্ট সারি হলো তাদের শেষ [পিছনের] সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট সারি হলো তাদের প্রথম সারি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : পুরুষদের প্রথম সারি উত্তম হওয়ার কারণ হলো, এতে ইমামের কেরাত শোনা এবং তার যাবতীয় কার্যক্রম নিকট হতে সরাসরি দেখার সুযোগ লাভ হয়। আর মহিলাদের সর্বশেষ সারি উত্তম হওয়ার কারণ হলো, এতে ফিতনা বিপর্যয় হতে বেঁচে থাকা এবং পর্দা রক্ষা করার মধ্যে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। সুতরাং নামাজের কাতারে মহিলাদের পিছনে হটানোর চেষ্টা করা উচিত।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ أَنَسٍ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমারা সারিসমূহে পরস্পর মিশে দাঁড়াও। সারিগুলোকে কাছাকাছি রাখ এবং তোমাদের ঘাড়গুলোকে সমভাবে সোজা রাখ। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে সারির ফাঁকে প্রবেশ করে, যেন কালো ভেড়ার বাচ্চা। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَادُوا بِالْأَعْنَاقِ -এর অর্থ : অর্থাৎ অহঙ্কার প্রকাশপূর্বক কেউ যেন উপরে না দাঁড়াও বরং সমানভাবে একীভূত হয়ে দাঁড়াও। কেননা أَعْنَاقُ শব্দটি এখানে এ অর্থেই প্রযোজ্য, কারণ মানুষ লম্বা এবং বেঁটে হয়, কাজেই উভয় কাঁধ বরাবর হতে পারে না। كَاتَبَا الْحَدْفُ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজের কাতারে ফাঁক থাকলে শয়তান কালো ভেড়ার বাচ্চার আকার ধারণ করে তাতে প্রবেশ করে। হেজাযে এক ধরনের ছোট ছাগলকে الْحَدْفُ বলা হয়। অথবা الْحَدْفُ এক ধরনের টিউডকে বলে যার শরীরে রক্ত এবং মেহে কান নেই। উল্লেখ্য, الْحَدْفُ যেহেতু খ্রীলিঙ্গ সে হিসাবে حَاتَبَهَا -এর যমীর খ্রীলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে। অথবা الْحَدْفُ -এর মধ্যে وَالَّذِي لَا تَمُوتُ টি জিনসী, যা বহুবচনের হুকুম রাখে। সে হিসাবে এর যমীর খ্রীলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে (كَتَابِي الْبِرِّقَاتِ)

عَنْ أَنَسٍ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمِيمُوا الصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ تَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمَوْجِرِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০২৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমারা প্রথমে সম্মুখের সারি পূর্ণ করবে। অতঃপর তার সংলগ্ন পিছনের সারিকে পূর্ণ করবে। যদি কমতি-খাটটি কিছু থাকে, তা থাকবে সর্বশেষ সারিতে। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ١٠٢٧
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض)
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَيَّ الَّذِينَ يَلُونُ
الصُّفْرَ الْأُولَى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ
اللَّهُ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا بِصِلٍ بِهَا صَفًّا .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০২৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, নিশ্চয়ই
আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ 'সালাত' প্রেরণ করেন ঐ
সমস্ত লোকের প্রতি যারা প্রথম সারিগুলোর কাছাকাছি,
আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সে পদক্ষেপের মতো এত
বেশি প্রিয় আর কোনো পদক্ষেপই নেই, যে পদক্ষেপ
নেওয়া হয় সারি মিলানোর জন্য বা পূর্ণ করার জন্য।
-[আবু দাউদ]

وَعَنْ ١٠٢٨
عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ
عَلَيَّ مِمَّا مِثْرِي الصُّفْرَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০২৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ
তা'আলা ও ফেরেশতাগণ সারির ডান দিকের প্রতি
'সালাত' পেশ করেন।-[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানোর মধ্যে অধিক ফজিলত রয়েছে। কিন্তু বাম দিকে লোক কম থাকলে সেদিকেই দাঁড়াবে।

وَعَنْ ١٠٢٩
التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض)
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسُورِي صُفْرَنَا
إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০২৯. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নামাজের উদ্দেশ্যে
দাঁড়াই, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সারি সোজা
করতেন। আর যখন আমরা সোজা হয়ে যেতাম তখন
তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।-[আবু দাউদ]

وَعَنْ ١٠٣٠
أَنَسِ بْنِ (رض) قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ إِعْتَدِلُوا
سُورُوا صُفْرُوكُمْ وَعَنْ يَسَارِهِ إِعْتَدِلُوا
سُورُوا صُفْرُوكُمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৩০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকের
নামাজীদেরকে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও,
তোমরা তোমাদের সারি সোজা কর" এবং বামদিকের
নামাজীদেরকে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও,
তোমাদের সারি ঠিক কর"।-[আবু দাউদ]

وَعَنْ ١٠٣١
ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنْ كَبَّرَ
فِي الصَّلَاةِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের
মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিরাই, যারা নামাজের মধ্যে
বাহ্‌সমূহকে নরম রাখে। [অর্থাৎ বাহুতে ধরে কেউ
মিলাতে চাইলে সহজেই মিলে যায়]।-[আবু দাউদ]

الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْنَا
بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْبِ يَعْنِي أَوْلَادَ
الضَّانِّ الصَّغَارِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

রাখবে [অর্থাৎ কেউ ধরে সোজা করতে চাইলে তার আনুগত্য করবে] এবং তোমাদের মধ্যকার ফাঁকসমূহকে ভরে ফেলবে। কেননা শয়তান তোমাদের মধ্যে হাফফের মতো ঢুকে পড়ে। হাফফ হলো ছোট কাশো ভেড়ার বাচ্চা।
-[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اللَّصُّ الْأَوَّلُ : সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা : اللَّصُّ الْأَوَّلُ বা প্রথম সারি মূলত কোনটি সে ব্যাপারে ওলামাগণ কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন, যা নিম্নরূপ-

- আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেন, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে আসবে সে যে কোনো কাতারেই দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করুক না কেন তার জন্য তাই হলো প্রথম সারি। চাই তা সর্বশেষ কাতার হোক না কেন। আল্লামা আইনী একে ভিত্তিহীন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে উক্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। হাদীসটি হলো- **وَأَنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صُفُوفُ الرِّجَالِ الْمُتَمِّمِ وَرَثَمَا الْمُؤَخَّرِ** অর্থাৎ পুরুষের জন্য উত্তম সারি হলো প্রথম সারি এবং নিকট সারি হলো সর্বশেষ সারি।
- কারো মতে যে কাতারটি পরিপূর্ণ হবে এবং তার মধ্যে কোনো ক্রটি-বিচ্ছাদি থাকবে না সেই কাতারটিই হলো প্রথম কাতার।
- আবার কেউ বলেন, ইমাম সংলগ্ন পিছনের কাতারটিই হলো প্রথম কাতার। ইমাম নববী বলেন, এ অভিমতটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ। ওলামায়ে কেরাম এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আল্লাম আইনীও এ একই অভিমত পেশ করেছেন।

وَعَنْ ۱۰۳۴
ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ
وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسَدُّوا الْخَلَلَ
وَلْيَسْتَوُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا
فُرْجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا
وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْهُ قَوْلَهُ
وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا إِلَىٰ آخِرِهِ)

১০৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাজের সারিসমূহকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের বাহুমূলসমূহ এবং পরস্পরকে সমান কর। সারির মধ্যে ফাঁকসমূহ ভরে ফেল। তোমাদের ভাইদের হাতে নিজেদের বাহুকে নরম রাখ। [অর্থাৎ সারি সোজা করার জন্য তোমাকে সম্মুখে কিংবা পিছনের দিকে টানলে তার আনুগত্য কর।] এবং শয়তানের জন্য সারির মাঝখানে ফাঁক রেখো না। যে ব্যক্তি সারিকে মিলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন রহমতের সাথে মিলান। আর যে ব্যক্তি সারিকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলা ও তাকে আপন রহমত হতে বিচ্ছিন্ন রাখেন। -[আবু দাউদ। এ হাদীসটি নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'যেই ব্যক্তি সারিকে মিলান' হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لْيَسْتَوُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসটির অর্থ হলো, কেউ হাত ধরে অগ্রপন্থা করতে চাইলে তার আনুগত্য করবে, অথবা পিছন হতে কেউ টানলে তার সাথে হেঁটে দাঁড়াবে। এতে নম্রতা অবলম্বন করাতে তাতে নামাজ বিনষ্ট হবে না।

وَعَنْ ۱۰۳۵ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ - (رواه ابوداود)

১০৩৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ভোমরা ইমামকে মধ্যস্থলে রাখবে এবং পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক পূর্ণ করবে। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ۱۰৩৬ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَسَاخَرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ - (رواه أبو داود)

১০৩৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- একদল লোক সর্বদা প্রথম সারি হতে পিছনে থাকবে, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে জাহান্নামে পিছিয়ে দেবেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এম্ম ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা প্রথম সারি হতে সর্বদা পিছনে থাকবে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে জাহান্নামে পিছিয়ে দেবেন। এই বাক্যের কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. এর অর্থ হলো, যারা সর্বদা নামাজের পিছনের কাতারে থাকবে তাদেরকে শান্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
২. অথবা এর ব্যাখ্যা হলো যাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামের শাস্তি হতে উত্তোলন করা হবে তাদের সাথে এদেরকে উত্তোলন করা হবে না।
৩. অথবা এর অর্থ হলো, জান্নাতে প্রবেশকারীদের নিকট হতে তাদেরকে দূরে রাখা হবে এবং তাদেরকে প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।
৪. অথবা ইয়াহুইয়ী মু'মিনদের জন্য যে স্থান নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে এর সর্বনিকট স্থানে এদের স্থান হবে।

وَعَنْ ۱۰৩৭ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ (رض) قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بَصَلَى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَّه قَامِرَهُ أَنْ يُعْبَدَ الصَّلَاةَ - (رواه أحمد والتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)

১০৩৭. অনুবাদ : হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সারির পিছনে একাকী নামাজ পড়তে দেখলেন। সুতরাং তিনি তাকে পুনরায় নামাজ পড়তে আদেশ দিলেন। -[আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়ার বিধান : কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে কি না, সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে-

مَذَهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا :

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক, হাম্মাদ, ইবনে আবী লায়লা, ওয়াকেদী, নাখয়ী (র.) প্রমুখের মতে কাতারের পিছনে একাকী নামাজ শুদ্ধ হবে না। তাঁরা নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে উপরে বর্ণিত হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) -এর হাদীসই নিম্নের হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ فَرَوَّفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ اسْتَقْبِلْ صَلَوَاتِكَ فَلَا صَلَوةَ لِمَنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

২. পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, হাসান বসরী, আওয়ামী (র.) এককথায় জমহুর ওলামার মত হলো, কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে মাকরুহ সহকারে আদায় হবে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ—

(۱) حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ إِنتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ زَادَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ)

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত আবু বাকরা (রা.) কাতারের পিছনে একাকী তাকবীরে তাহরীমার পর রুকু করেছেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে পুনরায় নামাজ পড়তে আদেশ করেননি। অতএব এর দ্বারা বুঝা যায়, কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُكِعُ عَلَى عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ وَوَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَتَشَى مُعْتَرِضًا عَلَى شِقْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَعْتِدُّ بِهَا أَى يَهْدِيهِ الرُّكْعَةَ أَنْ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ أَوْ لَمْ يَصِلْ . (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

বিরাহ্ববাদীদের দলিলের জবাব : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে, এতে পুনরায় পড়ার যে নির্দেশ রয়েছে এটা ছিল শাসনমূলক, তাহীহস্বরূপ এবং মাকরুহ হতে পরিত্রাণের নিমিত্তেই। নামাজ বাতিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আর হযরত ইবনে শায়বান (রা.) বর্ণিত হাদীসে যে খলফে লিমন্বায়ে বলা হয়েছে, তার উত্তরে বলা যায় যে, এতে নামাজ পরিপূর্ণ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَلَا وَضَوْءَ لِمَنْ لَمْ يَسِّمْ وَلَا صَلَوةَ لِمَنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে, বরং এর উদ্দেশ্য হলো আরকান ও সুন্নতের বিবেচনায় উক্ত নামাজ পরিপূর্ণ হবে না।

بَابُ الْمَوْقِفِ

পরিচ্ছেদ : ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

الْمَوْقِفُ এটি طَرْفٌ একবচন, বহুবচনে مَوَاقِفٌ শাব্দিক অর্থ- অবস্থানের স্থান বা দাঁড়ানোর স্থান। এখানে موقف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজের মধ্যে ইমাম ও মুসল্লিদের দাঁড়ানোর স্থান। আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম ও মুসল্লিদের নামাজে দাঁড়ানোর স্থান বিষয়ে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٣٨ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ
قَالَ بَيْتٌ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةٌ فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ
فَاخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلْتَنِي كَذَلِكَ
مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ - (مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ)

১০৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনার গৃহে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠলেন এবং নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আমিও তাঁর বাম পাশে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন রাসূল ﷺ তাঁর পিছনের দিকে হাত বের করে আমার হাত ধরলেন এবং ঐভাবে পিছন দিক দিয়েই টেনে ডান পাশে নিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الإمام ইমামের নিয়ত করার হুকুম : ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা আবশ্যিক কি না সে ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়-

- ইমাম ছাওরীর মতে এবং আহমদ ও ইসহাকের এক বর্ণনা মতে ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত। ইমাম যদি এ নিয়ত না করেন তা হলে মুক্তাদির জন্য পুনরায় নামাজ আদায় করা অপরিহার্য। কেননা নিয়ত ব্যতীত ইমামের ইমামতি এবং মুক্তাদির একতেনা জায়েজ হবে না।
 - ইমাম আহমদের অপর এক বর্ণনা মতে কেবলমাত্র ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে ইমামতির নিয়ত শর্ত, নাওয়াফিলের জন্য নয়।
 - ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং যুফার (র.)-এর মতে মুক্তাদি নারী হোক অথবা পুরুষ কোনো অবস্থাতেই ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়।
 - ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইবনুল কাসিমের মতে মুক্তাদি পুরুষ হলে ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত শর্ত নয় কিন্তু যদি মহিলা হয় তা হলে নিয়ত করা শর্ত।
- إِذَا سَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمَسْجِدِ فَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ
ইমামের সাথে শুধুমাত্র একজন মুক্তাদির দাঁড়ানোর মাসআলা :
মুক্তাদি একজন হলে সে ইমামের কোন পার্শ্বে দাঁড়াবে এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
- ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মুক্তাদি ইমামের বাম পার্শ্বে দাঁড়ালে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।
 - ইমাম নাখয়ী (র.) বলেন, মুক্তাদি যদি একজন হয় তা হলে সে ইমামের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইতোমধ্যে অন্য কোনো মুক্তাদি আসলে সকলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে নতুবা সে ইমামের রুকুত সময় তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে।
 - ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে একজন মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَمَنْ سَكَنَهُ لِمَلَلُوهُ) وَصَفَّتْ أَنَا وَالْبَيْتِيمَ خَلْفَهُ وَالْعَجْمُزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

বিবোধীদের দলিলের উত্তর : ইমাম আবু ইউসুফ (র.) প্রথমে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল উপস্থাপন করেছেন এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়-

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) যে দু'জন মুক্তাদির মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন- তা জাগরণ সংকীর্ণতার কারণেই হয়েছিল।
২. অথবা সহীহ হাদীস বিন্যাসন থাকারদ্বারা কোনো সাহাবীর কর্ম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কর্ম পরিত্যাজ্য হবে।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বর্ণিত : দ্বিতীয় দলিলের উত্তরে আবু ওমর বলেন, এটা মারফু' হাদীস নয়, বরং উহা মওকুফ হাদীস, যা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ একদল ইমাম বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি মনসূখ হয়ে গেছে।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ صَلَّى أَنَا وَبَيْتِيمَ فَمَنْ بَيْنَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمَّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৪০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একদা আমি এবং এক অনাথ আমাদের ঘরে নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, আর [আমার মাতা] উম্মে সূলাইমও আমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْتِيمَ দ্বারা উদ্দেশ্য : بَيْتِيمَ -এর শাব্দিক অর্থ হলো- অনাথ, পিতৃহীন তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পিতৃহীনকে এতিম বলা হয়, তবে এখানে بَيْتِيمَ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে, যথা-

কেউ কেউ বলেন, এতিম এক ব্যক্তির নাম। যিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা.)-এর ডাই। আত্তাম্মা মীরক বলেন, তাঁর নাম হলো سُمَيْرَةُ [সুমায়া]। আত্তাম্মা ইবনুল হায্বা এতিমের নাম আব্দুল মালেক ইবনে হুবাইব উল্লেখ করেছেন। এর চেয়ে তিনি আর কিছু বেশি বলেননি। আত্তাম্মা ইবনে হুমাম বলেন, এতিমের নাম হলো সুমায়া ইবনে সা'দ আল-হিমইয়ারী। ইমাম নববীও এ একই কথা বলেছেন।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمَّهُ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৪১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে, তাঁর মাকে এবং তাঁর খালাকে নামাজ পড়ালেন। হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং মহিলাদেরকে আমাদের পিছনের সারিতে দাঁড় করালেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٠٤٢ أَنَسٍ (رض) بَكَرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৪২. অনুবাদ : হযরত আবু বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছলেন, তখন রাসূল ﷺ রুকুতে ছিলেন। তখন [নামাজের সারিতে] মিলিত হওয়ার পূর্বেই [তুখু তাকবীরে তাহরীমা] বলে রুকুতে গেলেন অতঃপর একটু হেঁটে সফে মিলিত হলেন। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বলা হলো। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আত্তাহ হতোমার [নামাজের প্রতি] অগ্রাহ বুদ্ধি করুন। পুনরায় এমনটি করো না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لا تَعُدُّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসের সর্বশেষ শব্দ لا تَعُدُّ -এর হরকতের বিভিন্নতার ফলে অর্থের মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ-

১. لا تَعُدُّ -এর ত বর্ণে যবর এবং عَيْن বর্ণে পেশ। এ অবস্থায় এর উৎপত্তি হবে الْمُؤَدُّ মাসদার হতে; তখন এর অর্থ হবে-
لا تَعُدُّهُ تَعُدُّهُ مِثْلَ مَا قَعَلْتَهُ ثَانِيًا অর্থাৎ তুমি যা করলে এরূপ দ্বিতীয়বার আর করো না।
২. لا تَعُدُّ -এর মসব্ব বর্ণ সাকিন এবং ৯ বর্ণে পেশ। তখন এটা الْمُدْرُكُ হতে নির্গত হবে। আর এর অর্থ হবে- لا تَعُدُّهُ مِثْلَ مَا قَعَلْتَهُ ثَانِيًا অর্থাৎ তুমি যা করলে এরূপ দ্বিতীয়বার আর করো না।
৩. لا تَعُدُّ -এর ত বর্ণে পেশ এবং عَيْن বর্ণে যের। তখন এটা الْإِعَادَةُ হতে নির্গত হবে। আর এর অর্থ হবে لا تَعُدُّهُ مِثْلَ مَا قَعَلْتَهُ ثَانِيًا অর্থাৎ তুমি যে নামাজ পড়েছ তা আর পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।
ইমাম নববী (র.) এর তিনটি অর্থ করেছেন- (১) নামাজে শরিক হওয়ার জন্য দোড়ে এসো না। (২) দ্বিতীয়ত لا تَعُدُّهُ مِثْلَ مَا قَعَلْتَهُ ثَانِيًا অর্থাৎ নামাজে আসতে বিলম্ব করো না, যাতে ইমামের সাথে কোনো রাকাত ছুটে যায়। (৩) لا تَعُدُّهُ مِثْلَ مَا قَعَلْتَهُ ثَانِيًا অর্থাৎ কাতারের পিছনে থাকতেই নামাজের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে না। আগাম মীরক বলেন, এ তৃতীয় অর্থটিই হাদীসের সাথে সঙ্গতিশীল এবং যথার্থ। এটা ব্যতীতও এ সম্পর্কে অনেক মতামত রয়েছে।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رَضِيَ) ١٠٤٣
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً
أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১০৪৩. অনুবাদ : হযরত সাযরা ইবনে জুনদব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন নামাজে তিনজন হই তখন আমাদের মধ্য হতে যেন একজন সম্মুখে অগ্রগামী হয়ে যায়। -[তিরমিযী]

وَعَنْ عَمَّارٍ (رَضِيَ) ١٠٤٤
بِالْمَدَائِينِ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّيُ وَالنَّاسُ
أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ
فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حَدِيثُهُ فَمَا فَرَعَ
عَمَّارٌ مِنْ صَلَوَتِهِ قَالَ لَهُ حَدِيثُهُ أَلَمْ
تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ
لِقَوْمٍ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ

১০৪৪. অনুবাদ : হযরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি মাদায়েনে মানুষের ইমামতি করলেন। তিনি উঁচু একটি জয়গায় একা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াচ্ছিলেন, অথচ মানুষ তাঁর চেয়ে নিচে দাঁড়িয়েছিল। হযরত হুযাইফা (রা.) আগে অগ্রসর হয়ে তাঁর হাত ধরলেন, আম্মার তাঁর অনুসরণ করলেন। হযরত হুযাইফা (রা.) তাঁকে নিচে নামিয়ে আনলেন। হযরত আম্মার যখন নামাজ হতে অবসর হলেন, হযরত হুযাইফা (রা.) তাকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একথা বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন কোনো ব্যক্তি জনতার ইমামতি করে, সে যেন মুক্তাদিদের দাঁড়াবার স্থানের

أَوْ نَحْرَ ذَلِكَ فَقَالَ عَمَّارٌ لَذَلِكَ أَتَبَعْتَكَ
حِينَ أَخَذْتَ عَلَيَّ يَدَيَّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

তুলনায় উঁচু স্থানে নাদাঁড়ায়” অথবা এ কথার অনুরূপ কথা বলেছেন। তখন যখনত আযার (রা.) বললেন, এ জনাই তো আমি আপনার অনুসরণ করছি, আপনি যখন আমার হাত ধরে নামিয়েছেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুজাদি অপেক্ষা ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর বিধান : ইমাম ও মুজাদির দাঁড়ানোর স্থানে পার্থক্য হলে সাধারণত নামাজ মাকরুহ হয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান এক হাতের কম উঁচু হলে তাতে নামাজ মাকরুহ হবে না। অবশ্য বিনা ওজরে ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরুহ। কেননা এটা আহলে কিতাবের আচরণ। আর ইমামের সাথে কিছু মুজাদি দাঁড়ালে তখন মাকরুহ হবে না। ইমাম ত্বাহাবী বলেন, জমিন সাধারণত কিছু না কিছু উঁচু-নিচু হয়েই থাকে, কাজেই এক হাতের কম পরিমাণ উচ্চতাকে উঁচু হিসাবে সাব্যস্ত করা হয় না। আর যদি স্থানের সংস্কীর্ণতা অথবা লোকদেরকে নামাজের নিয়ম-কানুন বাস্তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় তখন মাকরুহ হবে না। দৃষ্ণে মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমামের একাকী উচ্চ স্থানে দাঁড়ানো মাকরুহ বা নিষেধ।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ مِنْ أَيِّ شَرَعِ الْمَنِيْبِرِ فَقَالَ هُوَ
مِنْ أَقْلِ الْغَابِيَةِ عَمِلَهُ فَلَانَ مَرْوَى فَلَائِهِ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ حِينَ عَمِلَ وَوَضَعَ فَاسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَرَأَوْا
رَكَعًا وَرَكَعًا النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ
رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ
عَادَ إِلَى الْمَنِيْبِرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ
رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ
بِالْأَرْضِ - (هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي الْمَتَّفَقِ
عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ
هَذَا لِيَتَأْتَمُوا بِنِي وَلِيَتَعَلَّمُوا صَلَوَاتِي -

১০৪৫. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ সালেদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর মিন্বার কিসের তৈরি ছিল? তিনি বললেন, তা জঙ্গলের খাউ গাছের তৈরি ছিল, যা অমুক মহিলার মুক্ত করা কৃতদাস অমুক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তৈরি করেছিল। যখন তা তৈরি করা হয়েছিল এবং মসজিদে স্থাপন করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বললেন, জনতা তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল ﷺ কেরাত পাঠ করলেন এবং রুকু করলেন, আর জনতা তাঁর পিছনে রুকু করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মাথা উঠালেন এবং পিছনে হেঁটে আসলেন [অর্থাৎ জমিনে নেমে আসলেন] এবং জমিনের উপরে সিজদা করলেন, অতঃপর মিন্বারের উপরে পুনরায় উঠলেন। অতঃপর কেরাত পাঠ করলেন, তারপর আবার রুকু করলেন; অতঃপর মাথা উঠালেন, তারপর পিছনের দিকে নেমে আসলেন এবং জমিনের উপরে সিজদা করলেন। -[বুখারী]

বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের বর্ণনায়ও প্রায় একরূপই রয়েছে। তবে শেষের দিকে রয়েছে, যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন, জনতার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, “হে লোক সকল! আমি এজন্য একরূপ করলাম, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং নামাজ পড়া সম্পর্কে জানতে পার।”।

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٤٧
 أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَرِيِّ
 (رض) قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلْوَةِ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ
 الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ
 صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ
 هَكَذَا صَلْوَةٌ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا
 أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمَّتِي - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৪৭. অনুবাদ : হযরত আবু মালেক আশআরী
 (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা জনতার উদ্দেশ্যে
 বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ
 কিরূপ ছিল, তা বলব না? পরবর্তী রাবী বলেন, তিনি [আবু
 মালেক আশআরী] নামাজ কায়েম করলেন, [প্রথমে] পুরুষ
 লোকদেরকে সারিবদ্ধ করলেন এবং তারপর তাদের
 পিছনে বালকদেরকে সারিবদ্ধ করলেন, অতঃপর তিনি
 তাদের নামাজ পড়ালেন এবং এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ
 ﷺ-এর নামাজের বর্ণনা দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন,
 এরূপই ছিল তার নামাজ। পরবর্তী রাবী আব্দুল আল্লা
 বলেন, তিনি এটা ছাড়া আর কিছু বলেছেন বলে আমি মনে
 করি না যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, এরূপই আমার উম্মতের
 নামাজ। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٠٤٨
 أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَرِيِّ
 (رض) قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلْوَةِ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ
 الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ
 صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ
 هَكَذَا صَلْوَةٌ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا
 أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمَّتِي - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৪৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কায়স ইবনে
 উবাদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি
 মসজিদে নামাজের প্রথম সারিতে ছিলাম, হঠাৎ আমার
 পিছনে হতে এক ব্যক্তি আমাকে সজোরে টেনে আমাকে
 আমার স্থান হতে সরিয়ে দিল। অতঃপর সে আমার স্থানে
 দাঁড়াল। খোদার কসম! রাগে আমি আমার নামাজ পর্যন্ত
 ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। যখন সে
 [আমাদের সাথে] নামাজ শেষ করল, তখন দেখি, তিনি
 সম্মানিত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। তখন
 তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আল্লাহ তোমাকে
 দুঃখিত না করুন। [অর্থাৎ আমার এ কাজ বা আচরণের
 দরুন তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হযো না।] অবশ্য এটা
 আমাদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
 উপদেশ, "আমরা যেন তাঁর অর্থাৎ, ইমামের নিকটবর্তী

عَنْ ١٠٤٨
 أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَرِيِّ
 (رض) قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلْوَةِ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ
 الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ
 صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ
 هَكَذَا صَلْوَةٌ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا
 أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمَّتِي - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৪৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কায়স ইবনে
 উবাদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি
 মসজিদে নামাজের প্রথম সারিতে ছিলাম, হঠাৎ আমার
 পিছনে হতে এক ব্যক্তি আমাকে সজোরে টেনে আমাকে
 আমার স্থান হতে সরিয়ে দিল। অতঃপর সে আমার স্থানে
 দাঁড়াল। খোদার কসম! রাগে আমি আমার নামাজ পর্যন্ত
 ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। যখন সে
 [আমাদের সাথে] নামাজ শেষ করল, তখন দেখি, তিনি
 সম্মানিত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। তখন
 তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আল্লাহ তোমাকে
 দুঃখিত না করুন। [অর্থাৎ আমার এ কাজ বা আচরণের
 দরুন তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হযো না।] অবশ্য এটা
 আমাদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
 উপদেশ, "আমরা যেন তাঁর অর্থাৎ, ইমামের নিকটবর্তী

فَقَالَ هَلْكَ أَهْلَ الْعَقْدِ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ
 ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْنِهِمْ أَسَى
 وَلَكِنْ أَسَى عَلَيَّ مَنْ أَضَلُّوا قُلْتُ يَا
 أَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِي بِأَهْلِ الْعَقْدِ
 قَالَ الْأَمْرَاءُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

হয়ে দাঁড়াই।” অতঃপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনবার বললেন, খানায় কা'বার রবের কসম! আহলে আকদ ধ্বংস হয়েছে। তারপর বললেন, আন্নাহর কসম! আমি তাদের [অর্থাৎ জনসাধারণের] উপর দুঃখিত নই, বরং দুঃখিত সে সমস্ত লোকদের উপর যারা জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু ইয়াকুব! আহলে আকদ বলতে আপনি কাদেরকে বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, আমীর তথা শাসকমণ্ডলীকে। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَفَلْتُ صَلَاتِي -এর অর্থ : একদা তাবেয়ী কায়স ইবনে উবাদা (র.) ইমামের পিছনে সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রা.) পিছন হতে তাঁকে টেনে সেই স্থানে তিনি দাঁড়ালেন। এতে কায়স মনে মনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এমনকি তিনি বলেন, আমার রাগ এত প্রবল হয়েছিল যে, আমি কিভাবে নামাজ শেষ করেছি এবং কয় রাকাত পড়েছি তা কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনি; কিন্তু নামাজ শেষে যখন তিনি সাহাবীর পরিচয় লাভ করলেন এবং তাকে পিছনে নেওয়ার কারণ বুঝতে পারলেন তখন তাঁর আর রাগ থাকল না।

هَلْكَ أَهْلِ الْعَقْدِ -এর ব্যাখ্যা : হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) পবিত্র কা'বার প্রতিপালকের শপথ করে বলেন, 'আহলে আকদ ধ্বংস হয়েছে।' কথাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যারা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদায় সমাসীন তাদেরকেই আহলে আকদ বলা হয়। রাষ্ট্র ও জনগণের সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু তদানীন্তন সময়ের কোনো কোনো শাসক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নামাজের সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উদাসীন ও অমনোযোগী ছিলেন। তাদের প্রতি আক্ষেপ করেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) هَلْكَ أَهْلِ الْعَقْدِ এ বাক্যটি বলেছেন।

অথবা 'আহলে আকদ' ঘারা হযরত উবাই (রা.) ইমামদেরকে বুঝিয়েছেন। কেননা শ্রেণী মতো সারিবদ্ধভাবে লোকদেরকে দাঁড় করানো ইমামেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। বস্তুত হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) একজন শ্রেণী সাহাবী। তাঁর অভিমত অনুযায়ী এখানে নামাজের প্রতি অমনোযোগী শাসকগণই উদ্দেশ্য।

بَابُ الْإِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : ইমামতি করা

একাধিক মুসল্লি একত্রিত হলেই জামাতে নামাজ পড়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর জামাতের জন্য ইমাম একান্ত অপরিহার্য। উল্লেখ যে, খোদাভীরু, পরহেজগার, আলোমে দীন এবং নামাজের যাবতীয় মাসআলা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। কেননা ইমামের উপরই মুসল্লিদের দায়-দায়িত্ব বর্তায়, আর এ জন্যই ইমামের দায়িত্ব অপরিসীম। ইমাম হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম এবং কার পরে কে ইমাম হওয়ার যোগ্য সে সম্পর্কে আলোচ্য অধ্যায়ে হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٤٩
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رَضِيَ) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ
لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ
سَوَاءً فَاعْلَمَهُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي
السَّنَةِ سَوَاءً فَاقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي
الهِجْرَةِ سَوَاءً فَاقْدَمَهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمَنُ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي
بَيْتِهِ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ)

১০৪৯. অনুবাদ : হযরত আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— মানুষের ইমামতি করবে সেই, যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তাহলে যে সূন্যাহ বেশি জানে। যদি সূন্যাহও সমান হয়, তা হলে যে প্রথমে হিজরত করেছে সে। যদি হিজরতেও সমান হয়, তাহলে যে বয়সে বেশি। কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের আসনে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত।—মুসলিম, তার অপর বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পরিবারে যেন ইমামতি না করে।

সংশ্লিষ্ট আপোচনা

ইমামতির জন্য সর্বোত্তম কে? : ইমাম হওয়ার জন্য সবচেয়ে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য এবং উত্তম সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে—

- ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু ইউসুফ, সওরী, ইবনে সীরীন ও আহনাফ ইবনে কায়সের মতে ইমামতির জন্য ফিকহবিদের ভুলনায় কারী বেশি উত্তম। তারা বর্ণিত আবু মাসউদের হাদীসসহ নিম্নের হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেন—
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَزِمَهُمْ أَحَدَهُمْ وَأَحْفَقَهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَاهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
- ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, মুহাম্মদ এককথায় জমহুর ওলামার মতে ইমামতির জন্য কারীর চেয়ে বিদ্বান ফকীহ অগ্রগণ্য। তারা নিম্নোক্ত হাদীস ও যুক্তি দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন—
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ مَرِضٌ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

হাদীসটি একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ অসুস্থ রোগের সময় হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমামত করতে বলেছিলেন, অথচ সেখানে বহু হাফেজে কুরআন ও কারী উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে হযরত উবাই ইবনে কা'ব যাকে নবী করীম ﷺ সাহাবীদের কারী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন; কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি। সুতরাং এর দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, ইমামতির বেলায় কারীর চেয়ে বিদ্বান ব্যক্তিই অগ্রগণ্য।

এ ছাড়া তাদের পক্ষে যুক্তি হিসাবে ইমাম নববী এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, কেবরাত শুধুমাত্র নামাজের একটি অংশ কয়ামের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইলমের সম্পর্ক নামাজের সকল অংশের সাথে জড়িত। কেননা কোনো একটি অংশের মধ্যে ক্রটি দেখা দিলে গোটা নামাজই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় কেবরাতের অভিজ্ঞতা থাকলেই একজন বিদ্বান ব্যক্তি ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবে।

তাদের দশিলের উত্তর : যে সব হাদীসে কারীদেরকে ইমামতির জন্য অগ্রগণ্য বলা হয়েছে এর উত্তরে বলা যায় যে, তাতে অর্থাৎ ঘারা মূলত 'أَعْلَمُ' অর্থাৎ বিদ্বান বুঝানো হয়েছে। কেননা সে সময় যারা কুরআনের কারী ছিলেন তারা শরিয়তের আহকামের আদেম এবং ফকীহও ছিলেন। সুতরাং এখানে শুধু তাজবীদ জানা ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَىٰ مَنْ يَدْعُونَ ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا وَإِلَٰهًا أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ شَاكِرُونَ ۝ إِنَّمَا يَدْعُوا وَإِلَٰهًا أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ شَاكِرُونَ ۝

ইমামতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসআলা : এ কথা সর্ববিকৃত যে বেদুইন, গোলাম, ফাসক, বিদ'আতী, অন্ধ এবং জারজ ব্যক্তির ইমামতি মাকরুহে তান্বীহী। এদের থেকে ভালো লোক থাকলে তাকে ইমাম বানানো উচিত। অন্যথা এদের পিছনে একতেন্দা করার চেয়ে একাকী নামাজ পড়া উত্তম। আর এমন লোককে ইমাম বানানো মাকরুহ, যাকে মুক্তাদিগণ বিভিন্ন ক্রটির দরুন অপছন্দ করে। আর মুক্তাদিদের উপর যে ইমাম অসন্তুষ্টি তার ইমামতিও মাকরুহ হবে। অথবা যাকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছে এমন ব্যক্তির ইমামতিও মাকরুহ। নাবালেগ ছেলের নামাজ নফল হয়ে থাকে। কাজেই এমন ছেলের পিছনে বয়স্কদের একতেন্দা করা জায়েজ নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, জায়েজ হবে। বলবের মাশায়েখগণ বলেন, তারাবীহ বা সুন্নতের মর্যাদা সম্পন্ন নামাজে নাবালেগ ছেলেকে ইমাম বানানো জায়েজ আছে। কিন্তু হানাফী মাশায়েখদের মতে জায়েজ নেই। ইমাম আবু ইউসুফের মতে নফল নামাজে নাবালেগ ছেলের ইমামতি জায়েজ আছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মতে নফলেও জায়েজ নেই। ফতোয়ায় শামী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নাবালেগের পিছনে কোনো প্রকারের নামাজই জায়েজ নেই।

لَا يُوَسِّرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ۖ -এর তাৎপর্য : আলাচ্য হাদীসে এসেছে যে, কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাহলে ইমামতি না করে। অর্থাৎ যেখানে যার অধিকার রয়েছে এবং যার হুকুম যেখানে প্রয়োগ হয়ে থাকে সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীমা এবং এর মাঝে মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হওয়ার জন্যই ইসলামে জামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি অন্য কারো স্থানে গিয়ে অনুমতি ব্যতীতই ইমামতি করে তবে তাকে অসম্মান করা হবে। যার ফলে সম্পর্ক বৃদ্ধির পরিবর্তে অবনতিই ঘটবে এবং শত্রুতা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে, যা জামাত কায়ম করার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

وَعَنْ ١٠٥٠ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَاهُمْ. (رواه مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحَوَارِثِ فِي بَابِ بَعْدَ بَابِ فَضْلِ الْأَذَانِ)

১০৫০. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমাম হয়। ইমামতির সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে অধিক বিদ্বান অথবা কুরআন অধিক ভাল পড়ে। -[মুসলিম]

এ প্রসঙ্গে মালেক ইবনে হুওয়াইরিছের হাদীস আযানের মাহাত্মা অধ্যায়ের পরে বর্ণনা করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٥١
ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُؤَدِّنَ لَكُمْ خِيَارَكُمْ
وَلِيُؤَمِّمَكُمْ قُرَأَكُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে উত্তম সে আযান দেবে, আর যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পাঠ করে সে ইমামতি করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٠٥١ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে সে আযান দেবে। রাসূল ﷺ-এর এই বাণীর মধ্যে বিশেষ একটা হিকমত নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি আযান দেবে, সে যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হয়, তার মধ্যে যদি বেহায়াপনা, অঙ্গীলতা এবং চরিত্রহীনতা বিদ্যমান থাকে তা হলে সে ব্যক্তির উপর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকতে পারে না, এ ব্যক্তির আহ্বানেও মানুষ সাড়া দেবে না, তার ঘোষণার প্রতি মানুষের আকর্ষণও থাকবে না। আর উত্তম গুণের মধ্যে মিষ্টি-মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়াও অন্তর্ভুক্ত। কেননা সুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অতএব রাসূল ﷺ-এর উপরোক্তিত বাণীর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

عَنْ ١٠٥٢
ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى
مُصَلَّاتِنَا وَتَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
يَوْمًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةٍ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمَ
فَصَلَّ قَالَ لَنَا قَدِمْنَا رَجُلًا يَنْكُمُ بَصَلِي
يَكُمُ وَسَاحِدَتِكُمْ لِمَ لَا أَصْلِي بِكُمْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ زَارَ
قَوْمًا فَلَا يُؤَمِّمُهُمْ وَلِيُؤَمِّمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيُّ إِلَّا
أَنَّهُ افْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ النَّبِيِّ ﷺ)

১০৫২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবু আতিয়া উকাইলী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা.) আমাদের মসজিদে আসতেন এবং আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসসমূহ বর্ণনা করতেন। একদা এমতাবস্থায় নামাজের সময় হয়ে গেল। আবু আতিয়া বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম, হুজুর! আগে যান এবং নামাজ পড়িয়ে দিন, তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য হতেই আগে একজনকে বাড়িয়ে দাও, সে তোমাদের নামাজ পড়াবে। তবে আমি তোমাদেরকে এখনই বলব, কেন আমি তোমাদের নামাজ পড়াব না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের [সম্প্রদায়ের] মধ্য হতেই যেন কেউ ইমামতি করে। -[আবু দাউদ, তিরমিধী ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী কেবল নবী কবরীম ﷺ-এর বাণী টুকুই উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٠٥٢ -এর ব্যাখ্যা : আগন্তুক ব্যক্তির ইমামতি সম্পর্কে মতপার্থক্য : কেউ কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করলে সে তাদের ইমামতি করতে পারবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে—
عَنْ ١٠٥٢ : ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতে আগন্তুক ব্যক্তির ইমামতি করা বৈধ নয়, যদিও তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না কেন? তিনি দলিল হিসাবে আবু আতিয়ার এ হাদীসটি পেশ করেন—

عَنْ أَبِي عَظِيْبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مَصَلَاتِنَا ... سَعَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمِنُهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

জমহুর ওলামার মতে আগত্বক ব্যক্তির জন্য অনুমতি সাপেক্ষে ইমামতি করা বৈধ। তবে নির্ধারিত ব্যক্তিই উত্তম। তাঁরা দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীসটি পেশ করেন-

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رَضِيَ) أَنَّهُ عَلَيْنِهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَنِي سُلْطَانِيهِ وَلَا يَتَمَدَّدْ فَنِي بَيْنِيهِ عَلَى تَكْرِمَتِيهِ إِلَّا بِإِذْنِي . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: ইমাম ইসহাক (র.) আবু আতিয়া উকাইলীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল প্রদান করেছেন এর জবাব হলো, সাহাবী হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা.) অনুমতি পাওয়ার পরেও ইমামতি না করার কারণ হলো, তিনি সতর্কতা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকাশ্য হাদীসের উপর আমল করেছেন- নাজায়েজের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। কেননা অনুমতি সাপেক্ষে ইমামতি করা যে বৈধ, তা হাদীসের ভাষ্যেই সুস্পষ্টভাবে অনুমেয়। অতএব মালেক ইবনে হুয়াইরিছের আমল শুধুমাত্র সতর্কতার উপরই সীমাবদ্ধ।

অতএব বলা যায় যে, সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকার পর হযরত আবু আতিয়াহ উকাইলীর হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (কَمَا فِي بَيْدِ السَّجُودِ وَمَقَدِّمَةِ إِعْلَانِ السُّنَنِ)।

وَعَنْ ١٠٥٣ أَنْسَسِ (رَضِيَ) قَالَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৫৩. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাবুক যুদ্ধে গমনকালে] সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের ইমামতি করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ।- [আবু দাউদ]

সহশ্রিষ্ট আলোচনা

অন্ধ ব্যক্তির ইমামতির ব্যাপারে মতপার্থক্য: আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা অন্ধের ইমামতি বৈধ হিসাবে গণ্য হয়। এ ব্যাপারে সকল আলিমের একই মত। তবে অন্ধের ইমামতি মাকরুহ কি না, সে ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

* একদল ওলামা বলেন, অন্ধের ইমামতি মাকরুহ নয়। তাঁরা হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত উপরোল্লিখিত উম্মে মাকতূমের ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

* অন্য একদল ইমামের মতে অন্ধের ইমামতি সাধারণত মাকরুহ। কেননা তারা অন্ধদের কারণে অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে পারে না।

* অপর আর একদল ওলামা বলেন, অন্ধের চেয়ে সুস্থ ও অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়ে না থাকে তা হলে অন্ধের জন্য ইমামতি করা মাকরুহ হবে না। আর যদি তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তা হলে অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরুহ হবে।

وَعَنْ ١٠٥٤ أَبِي أَمَامَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْأَبِيحُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ إِمَامٌ قَرِمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১০৫৪. অনুবাদ: হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাহ আল্লাইহি ওয়া সালাম্বাহ বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না। (অর্থৎ কবুল হয় না) (১) পলাতক দাস যতক্ষণ না সে [তার মালিকের নিকট] ফিরে আসে। (২) সেই রমণী, যে রাত যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর [ন্যায়সঙ্গতভাবে] অসন্তুষ্ট এবং (৩) কোনো সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকেরা [সঙ্গত কারণে] পছন্দ করে না।- [তিরমিযী। কিন্তু তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ١٠٥٦
(رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَاعَى أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يَصَلِّي بِهِمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১০৫৬. অনুবাদ : হযরত সালামা বিনতে হর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, মসজিদে সমবেত নামাজিগণ একে অপরকে ঠেলবে অর্থাৎ ইমামত করার জন্য আহ্বান করবে; কিন্তু তাদের নামাজ পড়তে পারে এমন কোনো ইমাম পাবে না।
- [আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٠٥٧ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ-এর আলোচ্য বাণীর অর্থ হলো, মসজিদে সমবেত নামাজিগণ একে অপরকে ইমামতি করার জন্য আহ্বান করবে। রাসূলে কারীম ﷺ একে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। অবশ্য হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন—
প্রথমত দ্বানُع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে সমবেত নামাজিগণ প্রত্যেকেই নিজেকে ইমামতির অযোগ্য মনে করে বলবে, নামাজ শুধু হওয়ার যথার্থ ইলম আমার নেই।

দ্বিতীয়ত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একে অপরকে ইমাম হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে দাফা দেবে অথবা মিহরাবের দিকে ঠেলে দেবে; কিন্তু হলে ইলমের কারণে সে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটাই হবে মুখতার চরম টিকানা এবং কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।
তৃতীয়ত দ্বানُع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো ইমাম পাওয়া যাবে না যিনি পারিশ্রমিক বা তীর্থ নামাজ পড়তে সম্মত হবেন : এর উপর ভিত্তি করে ওলামায়ে মুতায়্যখ্বিরীন ইমামতি করে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

وَعَنْ ١٠٥٩
(رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةَ وَاجِبَةً عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةَ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৫৯. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ প্রত্যেক নেতার সহযোগে, চাই সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক; যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। নামাজ তোমাদের উপর ফরজ যে কোনো মুসলমানের পিছনে, চাই সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে এবং প্রত্যেক মুসলমান মৃতের জানাযা পড়া ফরজ, চাই সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। - [আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামতি করার মতো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না গেলে কে ইমামতি করবে? আলোচ্য হাদীস অনুসারে অধিকাংশ ওলামা বলেন, ভালো লোক পাওয়া না গেলে বা তাকে ইমাম করা সম্ভবপর না হলে ফাসেক লোকের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ আছে, তবুও জামাত তরক করা যাবে না। অবশ্য তার পাপাচার কুফরি সীমায় যেন না পৌঁছে। আমাদের বুদ্ধার্গানে দীনের কার্যকলাপ হতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা জালিম শাসকের পিছনে নামাজ পড়তেন। শায়খাইন বর্ণনা করেছেন, হযরত আবুদুদুহাই ইবনে ওমর (রা.)-ও হাম্বলি ইবনে ইউসুফের পিছনে নামাজ পড়তেন। হযরত আনাস (রা.)-ও তার পিছনে নামাজ পড়তেন।
উক্ত হাদীস হতে এটাও বুঝা যায় যে, কোনো মুমিন কবীরা গুনাহ করলে সে ইসলামের গতির বিধিভূত হয়ে যায় না। আর কোনো মুসলমান আত্মহত্যা করলে সমাজের ইমাম বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য লোকেরা তার জানাযা পড়তে পারে। কেননা এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না।

التَّالِثُ : تَتِيْثُ اَنُوحِدُ

عَنْ ١٠٥٨ عَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ (رض) قَالَ كُنَّا بِمَاءِ مَمَرِ النَّاسِ بِمُرُ بِنَا الرُّكْبَانَ نَسْأَلُهُمْ مَا لِنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَانَتَا يَغْرَى فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الْجَرْبُ تَلْرُمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتَحَ فَيَقُولُونَ أَتْرَكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهَرَّ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَيْنَى قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حَيْثُ كَذَا وَصَلُّوهُ كَذَا فِي حَيْثُ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءًا فَتَنْظُرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قِرَاءًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ اتَّلَقْتُمُ مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدِمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سَيْتٍ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

১০৫৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লোক চলাচলের পাশে এক জলাধারের নিকটে বাস করতাম। আমাদের এখান দিয়ে আরোহী যাত্রীগণ যাতায়াত করত। আমরা পথচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের কি হলো? [লোকেরা কি বলে?] [আলোচিত] লোকটি কে? [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ নামে যে লোকটি নতুন দীন প্রচার করছেন তাঁর সম্পর্কে লোকেরা কি বলছে?] আর তাঁর প্রচারিত দীন সম্পর্কে তাদের কি খেয়াল? তখন তারা বলত, সে ব্যক্তি মনে করে, তাকে আদ্বাহ নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতি এরূপ ওহী নাজিল করেছেন। তখন [তাদের কাছে শুনা] ওহী বা বাণীটি আমি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম, যেন তা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত, কিন্তু আরবগণ তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে [মুসলমানদের মক্কা] বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। আর তারা বলছিল যে, তাকে [মুহাম্মদ ﷺ-কে] তাঁর গোত্রের সাথে লড়তে দাও। যদি সে তার গোত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে তা হলে বুঝবে যে, সে সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয় সংঘটিত হলো, তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করল, [কাদের আগে কারা ইসলাম গ্রহণ করবে] আমার পিতা আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের আগেই তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন নিজ গোত্রে ফিরে আসলেন, বললেন- আদ্বাহর কসম! আমি এক সত্য নবীর কাছ হতে তোমাদের কাছে আসলাম। তিনি বলে থাকেন, এই নামাজ এই সময় পড়বে, ঐ নামাজ ঐ সময় পড়বে। যখন নামাজের সময় হবে, তোমাদের মধ্য হতে যেন একজন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ভাল কুরআন পাঠ করে, সে যেন ইমামতি করে। তখন আমাদের গোত্রের লোকেরা চিন্তা- ভাবনা করল এবং দেখল, আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানা আর কেউ নেই। কেননা আমি আরোহী পথিকদের কাছ হতে তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম।

وَكَاثَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ
تَقَلَّصْتُ عَيْتِي فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ
الْآتِعُطُونَ عَنَّا إِسْتِ قَارِنِكُمْ فَاشْتَرَوْا
فَقَطَعُوا لِي قَيْصًا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ
فَرِحَ بِذَلِكَ الْقَيْصِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তখন লোকেরা আমাকে ইমাম বানিয়ে সম্মুখে দিল, অথচ তখন আমি ছয় সাত বৎসরের বালক মাত্র। তখন আমার গায়ে শুধু একটি চাদর ছিল। যখন আমি সিজদা করতাম তা শরীর হতে উপরের দিকে উঠে যেত। এটা দেখে গোত্রের এক মহিলা লোকজনকে বলল, তোমরা কি তোমাদের ইমামের নিতহ আমাদের দৃষ্টি থেকে ঢাকবে না? তখন তারা কাপড় ক্রয় করল এবং আমার জন্য একটি জামা বানিয়ে দিল। এই জামা পেয়ে আমি যতটা আনন্দিত হয়েছি ইতঃপূর্বে আর কোনো কিছুতে এত আনন্দিত হইনি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নফল নামাজে নাবালেগের ইমামতির হুকুম : নফল নামাজে নাবালেগের ইমামতি জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

নাবালেগের ইমামতি জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে উভয় অভিমত রয়েছে। হেদায়া কিতাবে বলবের প্রবীণ ও বিজ্ঞ মাশায়েখগণ তারাবীহ, সাধারণ নফল ও সুন্নত নামাজে নাবালেগের ইমামতি জায়েজ বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদও এ মত সমর্থন করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, কোনো প্রকারের নামাজেই বালকের ইমামতি জায়েজ নেই। হানাফী মাযহাবে এ অভিমতই গ্রহণযোগ্য। কেননা কোনো বয়স লোক নফলের নিয়ত করলেই তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোনো কারণে সে নফল নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় তা কাজ করা ওয়াজিব হয়, কিন্তু কোনো বালকের নামাজ কোনো অবস্থাতেই ওয়াজিব হয় না। সুতরাং কোনো অবস্থায়ই বালক ইমামতের যোগ্য নয়। অতএব তার পিছনে একতেন্দা করা জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী ও বুখারী (র.) আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, নাবালেগের ইমামতি জায়েজ। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নাবালেগ হলেও ভাল-মন্দে তারতম্য-জ্ঞান হওয়া আবশ্যিক।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ, ইসহাক, আওয়ামী ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামতি জায়েজ নেই। তাঁরা দলিল পেশ করেন যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, **إِلْمَامٌ** অর্থাৎ ইমাম হলেন জামিনদার। বালকের নামাজ হলো নফল। অতএব সে ফরজ নামাজের জামিনদার হতে পারে না। কেননা জামিনদার যার জামিন হবে সে অন্যদের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য হতে হবে। বালকের বেলায় তা পাওয়া যায় না।

এ ছাড়া হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, **كَلِمَاتٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ لَا يُزْمُ الْفَلَامُ** কোনো বালক প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ইমামত করবে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, **لَا يُزْمُ الْفَلَامُ الَّذِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ** এমন বালক ইমামতি করবে না যার উপরে 'হদ' ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ শরিয়তের অনুশাসন প্রযোজ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী ও বুখারী (র.) বলেন, আমর ইবনে সালামার হাদীসটি যঈফ। সুতরাং এর দ্বারা কোনো দলিল কায়ম হতে পারে না। অবশেষে আমাদের মূল কথা হলো, একটি বালকের কথা হতে দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না, যে বলেছেন, নামাজের সময় তার সতর প্রকাশ পেল। অথচ সকলের মতে সতর ঢাকা ফরজ। এটা ছাড়াও আমর ইবনে সালামাকে তার গোত্রের লোকেরা ইমাম বানিয়েছিল। এতে হুজুর ﷺ-এর কথা বা কাজ কিংবা সখতি কিছুই ছিল না। গোত্রের লোকদের মনোনীত ও নির্বাচিত ইমাম। অথচ এ নির্বাচন সম্পর্কে হুজুর ﷺ অবগত ছিলেন না। বড় জোর এটা গোত্রের লোকদের চিন্তা-ভাবনা বা ইজ্তেহাদ। কিন্তু ওহী নাজিল হওয়ার যুগে এই ধরনের ইজ্তেহাদ দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ۱۰۵۹ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ الْمَدِينَةَ
كَانَ يَوْمَهُمْ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حَذِيفَةَ
وَفِيهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ .
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [নবী করীম ﷺ-এর হিজরতের
প্রাকালে] মুহাজিরদের প্রথম দল যখন মদীনায়া পৌছল,
তখন আবু হুযাইফার গোলাম হযরত সালেম (রা.) তাদের
নামাজের ইমামতি করতেন, অথচ তাদের মধ্যে হযরত
ওমর ও আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ [-এর ন্যায় বিজ্ঞ
লোক]-ও বিদ্যমান ছিলেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিখ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ইসলামের সাম্য নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,
বংশ-মর্যাদা বা আভিজাত্য নয়; বরং তোমাদের মধ্যে খোদাভীরুতায় যে শ্রেষ্ঠ, সে প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তি। হযরত সালেম
একজন ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত ওমর ও আবু সালামা প্রমুখ সম্মানিত সাহাবীদের ইমামত করেছেন। তারা
সালেমের ইমামতিকে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে বরণ করেছেন। হযরত সালেম এক দিকে যেমন অত্যধিক কুরআন সম্পর্কে
জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অপর দিকে তেমনি বড় কারীও ছিলেন। মহানবী ﷺ যে চার ব্যক্তির নিকট হতে জনগণকে কুরআন
শিক্ষা করতে বলেছেন, হযরত সালেম তাদের অন্যতম।

وَعَنْ ۱۰৬০ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَتُرْفَعُ لَهُمْ
صَلَوَتُهُمْ فَرَوْهُ وَسِيَهُمْ شُبْرًا رَجُلًا أُمَّ
قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَأَمْرًا بَاتَتْ وَ
زَوْجَهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ مَتَصَارِمَانِ .
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১০৬০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— তিন ব্যক্তি আছে যাদের
নামাজ তাদের মাথার এক বিষত উপরেও উঠানো হয় না
[অর্থাৎ আত্মাহ কবুল করেন না] (১) যে ব্যক্তি মানুষের
ইমামতি করেন অথচ তারা [ন্যায়সঙ্গত কারণে] তার উপর
নাখোশ। (২) যে স্ত্রীলোক রাত যাপন করল অথচ তার
স্বামী [ন্যায়সঙ্গত কারণেই] তার উপর অসন্তুষ্ট থাকল এবং
(৩) সেই দুই ভাই, যারা [পরস্পর কলহের কারণে]
পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসের অর্থ— হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— তিন ব্যক্তি আছে যাদের নামাজ তাদের মাথার এক বিষত উপরেও উঠানো হয় না
[অর্থাৎ আত্মাহ কবুল করেন না] (১) যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করেন অথচ তারা [ন্যায়সঙ্গত কারণে] তার উপর
নাখোশ। (২) যে স্ত্রীলোক রাত যাপন করল অথচ তার স্বামী [ন্যায়সঙ্গত কারণেই] তার উপর অসন্তুষ্ট থাকল এবং
(৩) সেই দুই ভাই, যারা [পরস্পর কলহের কারণে] পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা : হাদীসের অর্থ— হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— তিন ব্যক্তি আছে যাদের নামাজ তাদের মাথার এক বিষত উপরেও উঠানো হয় না
[অর্থাৎ আত্মাহ কবুল করেন না] (১) যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করেন অথচ তারা [ন্যায়সঙ্গত কারণে] তার উপর
নাখোশ। (২) যে স্ত্রীলোক রাত যাপন করল অথচ তার স্বামী [ন্যায়সঙ্গত কারণেই] তার উপর অসন্তুষ্ট থাকল এবং
(৩) সেই দুই ভাই, যারা [পরস্পর কলহের কারণে] পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা : হাদীসের অর্থ— হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— তিন ব্যক্তি আছে যাদের নামাজ তাদের মাথার এক বিষত উপরেও উঠানো হয় না
[অর্থাৎ আত্মাহ কবুল করেন না] (১) যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করেন অথচ তারা [ন্যায়সঙ্গত কারণে] তার উপর
নাখোশ। (২) যে স্ত্রীলোক রাত যাপন করল অথচ তার স্বামী [ন্যায়সঙ্গত কারণেই] তার উপর অসন্তুষ্ট থাকল এবং
(৩) সেই দুই ভাই, যারা [পরস্পর কলহের কারণে] পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। -[ইবনে মাজাহ]

بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ : ইমামের কর্তব্য

ইমাম হলেম মুসলিম মিল্লাতের নেতা, এই নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক, বিশেষ করে নামাজে তাকবীরে তাহরীমা বাধার পর মুসল্লিদের সকল দায়-দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয় তখন মুক্তাদিদের উপর লক্ষ্য রাখা তাঁর উপর একান্ত কর্তব্য, তাদের অবস্থা ও সময়ের দিকে লক্ষ্য করে নামাজ সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘায়িত করা ইমামের উচিত। অনেক সময়ে জামাতে অনেক দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক উপস্থিত হয়, এ সময়ে কেরাআত, রুকু, সেজদা প্রভৃতি দীর্ঘায়িত করলে মানুষ জামাতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কাজেই এ সব দিকে লক্ষ্য রেখেই ইমামকে নামাজ পড়াতে হবে, মহানবী ﷺ ও প্রয়োজনে একরূপ করতেন। আলোচনা অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرَأَى إِمَامًا قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ অপেক্ষা কোনো ইমামের পিছনে এত সংক্ষেপ অথচ এত পরিপূর্ণ নামাজ কখনও পড়িনি [তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে,] যখন তিনি [নামাজের মধ্যে থেকে] কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনতেন, তখন তার মা উদ্বিগ্ন হবে এ আশঙ্কায় নামাজ সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَلِمَاتٌ لَا يَكْفُرُ بِهَا الْمَرْءُ حَتَّى يَمُوتَ كَلِمَاتٌ لَا يَكْفُرُ بِهَا الْمَرْءُ حَتَّى يَمُوتَ كَلِمَاتٌ لَا يَكْفُرُ بِهَا الْمَرْءُ حَتَّى يَمُوتَ কোনো আগন্তুকের জন্য রুকু দীর্ঘায়িত করা জায়েজ আছে কি না? কোনো আগন্তুক মুসল্লির জন্য রুকু দীর্ঘ জায়েজ আছে কি না? এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা নিম্নরূপ-

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো শাফেয়ী আলিম বলেন, রুকু অবস্থায় ইমাম যদি মনে করে যে কেউ নামাজে শরিক হতে চায় তা হলে ইমাম রুকু কিছুটা দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আগত ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং ঐ রাকাতটি ও জামাতের সাথে পড়ার ফজিলত লাভ করতে পারে। কেননা যদি দুনিয়াবী ব্যাপারে মানবীয় কারণে নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, তবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ব্যাপারে নামাজকে দীর্ঘায়িত করা তো জায়েজ হবেই! ইমাম শাবী, হাসান বসরী ও ইবনে আবু লায়লা এ মতের অনুসারী।

ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আবু সাওর বলেন, এটুকু অপেক্ষা করা যাবে যেন অন্যান্য নামাজিদের অসুবিধা না হয়।

ইমাম আযম, মালেক, শাফেয়ী ও আওযায়ী প্রমুখ বলেন যে, আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। কারণ, এতে অপরাধের মুসল্লিদের কষ্ট হবে। তারা একরূপ অপেক্ষা করাকে মাকরুহ মনে করেন। ইমাম আযম (র.) বলেন যে, ইমাম আগন্তুক ব্যক্তির সুবিধার্থে রুকু দীর্ঘায়িত করলে তার উপরে একটা বড় পাপ অর্থাৎ শিরক বর্তানোর আশঙ্কা করছি। তবে আগত মুক্তাদি ব্যক্তিটি যদি অত্যন্ত বদমেজাজী হয় তা হলে কিছুটা বিলম্ব করা জায়েজ আছে, তবে সর্বদা একরূপ করা জায়েজ হবে না।

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعْ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَرَّزْ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أَبِيهِ مِنْ بَكَائِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৬২. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমি অনেক সময় নামাজে প্রবেশ করি এবং ইচ্ছা করি যে, তাকে দীর্ঘায়িত করব। আর যখনই কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনি, তখন আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করি; কেননা, আমি জানি যে, শিশুর ক্রন্দনে তার মাতার মনের উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। -[বুখারী]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيَخَفِفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَبْطِرْ مَا شَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ মানুষের নামাজ পড়ায়, সে যেন নামাজকে সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রুগ্ন, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকেরাও থাকে। আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নামাজ পড়ে তখন সে যে পরিমাণ ইচ্ছা দীর্ঘায়িত করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আপোচনা

الْحَدِيثُ هَادِي السَّيْرِ : আলোচ্য হাদীসে সংক্ষিপ্ত করার ঘরা কোনো অঙ্গকে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তকরণ নয়, বরং কেবল, রুকু সেজদাকে সংক্ষেপকরণ, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়।

وَعَنْ قَنَسِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ (رَض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَن صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ فَايُكْمُ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَرَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬৪. অনুবাদ : [ভাবেয়ী] হযরত কয়েস ইবনে আবু হাযেম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু মাসউদ আনসারী [সাহাবী] আমাকে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি অমুকের কারণে ফজরের নামাজ খুব বিলম্ব করে ফেলি। কারণ, সে আমাদেরকে খুব দীর্ঘ নামাজ পড়ায়। [রাবী বলেন, এই নালিশের পরে] সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ওয়াজে এত রাগান্বিত দেখেছি যে, এরূপ আর কখনও দেখিনি। অতঃপর রাসূল ﷺ উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নামাজকে দীর্ঘায়িত করে মানুষকে [জামাতের প্রতি] বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। অতঃপর তোমাদের যে কেউ কোনো মানুষকে যে কোনো নামাজই পড়াক না কেন, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে। -[বুখারী ও মুসলিম]

التَّالِثُ : ۳তম অনুচ্ছেদ

عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
(رض) قَالَ أَخِرُ مَا عَاهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا أَمَّتْ قَوْمًا فَأَخِيفَ لَهُمُ الصَّلَاةَ .
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ لَهُ أَمْ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ أَدْنُهُ
فَاجْلِسْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي
صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلُ
فَرَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيْ ثُمَّ
قَالَ أَمْ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمْ قَوْمًا فَلْيَحْزِنُ
فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ
وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا
النَّحَاةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحَدَّهُ
فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ .

১০৬৬. অনুবাদ : হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল এই যে, যখন তুমি কোনো জনতার ইমামতি করবে তখন নামাজকে সংক্ষেপ করে পড়াবে। -[মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার গোত্রের ইমামতি করো। উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার মনে একটু ভীতি উপলব্ধি করি ইমামতের দায়িত্বের ব্যাপারে অন্তরে ভয় অনুভব করি। রাসূল ﷺ বললেন, আমার কাছে আস। তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। অতঃপর তাঁর হাত আমার বক্ষের মধ্যখানে রাখলেন। তারপর বললেন, পিঠি ফিরাও। অতঃপর তিনি আমার পিঠের মধ্যখানে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, তুমি তোমার গোত্রের ইমামতি করো। আর যে ব্যক্তিই কোনো জনতার ইমামতি করে, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক থাকে, তাদের মধ্যে রুগ্ন লোক থাকে, তাদের মধ্যে দুর্বল লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কর্মব্যস্ত লোকও থাকে। আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নামাজ পড়ে, তখন সে যেকোন ইচ্ছা পড়বে। [অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নামাজকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَبَكَ وَأَلْحِكْمَةُ فَمُ وَضَعَ كَفَّ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ
হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রা.)-কে নিজ সম্প্রদায়ের নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ইমামতের দায়িত্বের ব্যাপারে অন্তরের ভীতির কথা রাসূল ﷺ-কে জানালেন। তখন রাসূল ﷺ প্রথমে তাঁর বক্ষে এবং পরে পিঠে হাত রেখে তাকে সাহস প্রদান করেন। এর তাৎপর্য সম্পর্কে আত্তামা তীবী (র.) বলেন, বিভিন্ন প্রকার সংশয়-সন্দেহ এবং কুরআন, মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে গভীর ধারণা না থাকায় উসমান ইবনে আবিল আস (রা.) ইমামতির যাবতীয় শর্ত আদায়ের ব্যাপারে অন্তরে একটা ভয় অনুভব করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বরকতময় হাত হযরত উসমান (রা.)-এর বক্ষে ও পিঠে রেখেছিলেন যাতে তার অন্তর হতে এসব দূরীভূত হয়ে যায়।

ইমাম নববী (র.) এর তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন, হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রা.)-এর অন্তরের অহঙ্কার সৃষ্টির সজ্জাবনা দূরীভূত করার জন্যই রাসূল ﷺ তার বক্ষে ও পিঠে হাত রেখেছিলেন। (كَمَا فِي التَّغْلِيْقِ الصَّيْبِ)।
 -এর ব্যাখ্যা : شَيْئًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমামতির পূর্ণ দায়িত্ব ও শর্তাবলি পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে না পারে। হতে পারে এর কারণ ওয়াসওয়াসা বা সংশয় ; কুরআন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্পর্কে অবহিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَعَنْ ١٠٦٧
 ابْنِ عُمَرَ (رَضًا) قَالَ كَانَ
 النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَيُؤْمِنُنَا
 بِالصَّافَاتِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১০৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে
 নামাজ সংক্ষেপ করতে আদেশ করতেন, আর তিনি নিজে
 সূরা সাফফাত দ্বারা আমাদের ইমামতি করতেন।-[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি تَعَارُضٌ এবং তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নামাজ সংক্ষেপ করার নির্দেশ দিতেন। অথচ তিনি নিজে সূরায় সাফফাত দ্বারা নামাজ পড়াতেন। এ সূরাটি দীর্ঘ বিধায় নামাজও দীর্ঘ হতো। এখন রাসূল ﷺ এর কথা এবং কাজের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে হাদীস বিশারদগণ বলেন, নবীয়ে কারীম ﷺ -এর কেবল শ্রোতাদের কাছে এত মধুর লাগত যে, দীর্ঘ কেবলও সংক্ষিপ্ত মনে হতো। আরও কিছুক্ষণ নামাজে দাঁড়িয়ে কেবল শোনার জন্য সাহাবীগণের মন ব্যাকুল হয়ে থাকত। রাসূলে কারীম ﷺ এর কণ্ঠস্বরও ছিল আকর্ষণীয়। তিনি কথার মতো করে তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। রাসূল ﷺ সূরা সাফফাত-এর মতো সূরা পড়লেও লোকের কাছে সংক্ষিপ্ত মনে হতো, অথচ অন্য লোকে সেই সূরা পড়লে ক্লান্তি-বিরক্তি বোধ করত। সুতরাং রাসূল ﷺ এর কথা ও কাজে কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মাদিস দেহলবী (র.) বলেন যে, মুক্তাদিদের আত্মহের উপর ভিত্তি করে নামাজ সংক্ষেপ বা দীর্ঘায়িত করাই বর্ণিত হাদীসের মূল অর্থ।

بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمَتَابَعَةِ وَحُكْمُ الْمَسْبُوقِ

পরিচ্ছেদ : মুক্তাদির আনুগত্যের অপরিহার্যতা ও মাসবুকের বিধান

ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদির একান্ত কর্তব্য। তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত যাবতীয় কর্মে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদির জন্য ফরজ, এটা নামাজ বিতর্ক হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত, এর ব্যতিক্রম হলে মুক্তাদির নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। ইমামের অনুসরণ তিন প্রকারে হতে পারে, যথা-

১. الْمُتَعَارَفَةُ بِفِعْلِ الْإِمَامِ তথা ইমামের সাথে সাথেই মুক্তাদির কাজ করা।
 ২. الْمُتَعَارَفَةُ بَعْدَ فِعْلِ إِمَامِهِ অর্থাৎ ইমামের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দেরি না করে কাজ শুরু করা।
 ৩. الْمُتَعَارَفَةُ عَنْهُ অর্থাৎ ইমামের কাজ শেষ হওয়ার পরে কাজ শুরু করা। সকলের ঐকমত্যে এর মধ্যে তৃতীয়টি জায়েজ নেই। সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ীর মতে দ্বিতীয় প্রকারের অনুসরণ উত্তম, আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম প্রকারের অনুসরণ উত্তম, তবে এ অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা ও সালাম ফিরানোর সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- সিওয় মাসবুক : যে মুক্তাদি ইমামের সাথে প্রথম হতেই শরিক হতে পারেনি, তথা নামাজের প্রথম দিকে কিছু ছুটে যায় তাকে মাসবুক বলে। এরূপ ব্যক্তি ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর বাম দিকে সালাম ফিরানো শুরু করলে তখন দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট নামাজ আদায় করবে।
- আলোচ্য অধ্যায়ে মুক্তাদির কর্তব্য এবং মাসবুকের করণীয় সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٦٨
الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رَضِيَ)
قَالَ كُنَّا نَتَّبِعُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَاذَا
قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ
مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَبْصَعَ النَّبِيُّ ﷺ
جِبْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬৮. অনুবাদ : হযরত বারী ইবনে আয়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়তাম। রাসূল ﷺ যখন 'সামি' আলাহ্ লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন আমাদের কেউই [সিজদার জন্য] পিঠ ঝুঁকাত না যতক্ষণ না, নবী করীম ﷺ তাঁর কপাল [সিজদায়] জমিনে রাখতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুক্তাদিদের ইমামের অনুসরণের উত্তমতার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমামের অনুসরণের বেলায় মুয়াকাবা অর্থাৎ ইমামের কার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে কাজ শুরু করা এবং মুকারানা অর্থাৎ ইমামের কাজের সাথে সাথে মুক্তাদিরও কাজ করা- এই দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ-
مُدَّعَى السَّائِعِي وَالسَّاجِدِينَ : ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে মুয়াকাবা পদ্ধতি উত্তম। তাঁরা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে বর্ণিত বারী ইবনে আয়েব (রা.)-এর হাদীসসহ নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন-

- (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعُنَا بِقَوْلِ لَا تَبَادُرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
- (٢) عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) يَلْفِظُ فَاذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تُرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ . (الْحَدِيثُ)

তাঁরা আকবী যুক্তিবদ্ধ বলেন, মুক্তাদিরা হলো ইমামের তাবে বা অনুসারী : একটি কাজ শেষ হলেই তাঁর অনুসরণ হয়ে থাকে। এখানে মুকারানা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হলে ইমামের বাস্তব অনুসরণ করা হবে না। সুতরাং মুয়াকাবা পদ্ধতিই উত্তম।

فَارْكَعُوا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ -
قَالَ الْحَمِيدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا
فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ التَّيْسِيُّ ﷺ جَالِسًا
وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ
وَإِنَّمَا يُؤَخِّدُ بِالْآخِرِ فَلَاخِرٍ مِنْ فِعْلِ
النَّبِيِّ ﷺ - (هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَاتَّفَقَ
مُسْلِمٌ إِلَى أَجْمَعُونَ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَا
تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)

মাথা উঠান তখন তোমরাও সাথে সাথে মাথা উঠাবে।
আর ইমাম যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন তখন
তোমরা বলবে, 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' এবং ইমাম যখন বসে
নামাজ পড়েন তোমরাও সকলে বসেই পড়বে।

[ইমাম বুখারী বলেন, আমার শায়খ] হুমাইদী
বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর বাণী 'ইমাম যখন বসে নামাজ
পড়েন, তোমরাও বসেই নামাজ পড়বে', এটা তাঁর পূর্ব
রোগকালীন বাণী। অতঃপর নবী করীম ﷺ [কোনো
কোনো সময়] বসে নামাজ পড়েছেন আর লোক তার
পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, অথচ তিনি তাদেরকে বসে
পড়ার নির্দেশ দেননি। নিয়ম হলো এই যে, নবী করীম
ﷺ-এর পর পর কার্যসমূহের শেষটিরই অনুসরণ করতে
হয়। এটা ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য। ইমাম
মুসলিম 'সকলে বসে পড়বে' শব্দ পর্যন্ত তাঁর অনুরূপ
বর্ণনা করেছেন; কিন্তু অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি
শেষের দিকে এই বাক্যটি বাড়িয়ে বলেছেন [অতঃপর
রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন] "আর ইমামের বিরুদ্ধাচরণ
করবে না এবং যখন ইমাম সিজদা করেন তোমরাও
সিজদা করবে"।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে একতেন্দা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে
সক্ষম ব্যক্তি বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে একতেন্দা করা জায়েজ আছে কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ
রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَنْعَبُ جَمْهُرِ الْأَكْبَرَةِ : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও অধিকাংশ ওলামার মায়হাব হলো, যদি ইমাম দাঁড়াতে অক্ষম হন এবং
বসে ইমামতি করেন, তবে মুক্তাদিদের মধ্যে যারা দাঁড়াতে সক্ষম তারা দাঁড়িয়ে পড়বে। ইমাম মালেক (র.)-ও এক বর্ণনায়
এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

مَنْعَبُ إِسْمَاعِيلَ : ইমাম মালেক দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, যারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম তাদের দাঁড়িয়ে বা বসে কোনো
ভাবেই মাজ্বর ইমামের পিছনে একতেন্দা করা জায়েয নেই।

مَنْعَبُ الْأَمَامِ أَحْمَدَ وَالْأَزْهَرِيِّ : ইমাম আহমদ ও আওযায়ী (র.) বলেন, বসে নামাজ আদায়কারী ইমামের পিছনে বসে
বসেই একতেন্দা করতে হবে, যদিও মুক্তাদি দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে একতেন্দা করলে নামাজ সহীহ
হবে না। তারা আলোচ্য হাদীসের বাক্য أَجْمَعُونَ দ্বারা ই দলিল গ্রহণ করেন।

প্রথমোক্ত দলের ভ্রামণ : ইমাম আবু হানীফা (র.) শাফেয়ী ও জমহুর ওলামা নবী করীম ﷺ-এর অস্তিম অবস্থায় রোগকালীন
কার্যাবলি দ্বারা দলিল পেশ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ فِي حَدِيثٍ مَرَّضَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ
فِي نَفْسِهِ غَمَّةً نَجَاعًا حَتَّى جَلَسَ عَنْ بَيْتَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيُ قَائِمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيُ قَائِمًا
بِقَدِيدِي أَبُو بَكْرٍ يُصَلُّوهُ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ يُصَلُّوهُ أَبِي بَكْرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ বেড়ে গেল তখন হযরত বেলাল তাকে নামাজের সংবাদ দিতে এলো। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, আবু বকরকে বল [মানুষদের নামাজ পড়িয়ে দিতে] সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.) সে কয়দিনের নামাজ পড়ালেন। অতঃপর একদিন রাসূল ﷺ কিছু সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলে কাশীর মতঃঃঃ-এর পদধ্বনি শুনে পেয়ে নিজে পিছনে আসতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে না সরতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবু বকরের বাম দিকে বসে গেলেন। তখন হযরত আবু বকর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। আর রাসূল ﷺ বসে [ইমামরূপে] নামাজ পড়তে থাকলেন। [অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাসূল ﷺ-এর নামাজের একতেন্দা করলেন এবং লোকজন হযরত আবু বকর (রা.)-এর নামাজের অনুসরণ করল।]

বিরোধীদের উত্তর: “যখন ইমাম বসে নামাজ পড়েন তোমরাও বসে নামাজ পড়” এ হাদীসের জবাবে জমহর ইমামগণ বলেন যে, উক্ত হাদীস হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কারণ রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ কাফি গৃহীত হবে, প্রথম দিককার আমল নয়।

وَعَنْ ١٠٧٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا
ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُوَدِّنُهُ
بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرَرَا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَصَلِّيَ
بِالنَّاسِ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ
بِهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاءَ تَحَطَّانَ فِي
الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ
أَبُو بَكْرٍ حَسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَى إِلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَنْ يَتَأَخَّرَ فَجَاءَ حَتَّى
جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ
أَبِي بَكْرٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا
يَسْمَعُ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيرَ)

১০৭২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, [হেঁচকালের পূর্বে] যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ খুব কঠিন হয়ে পড়ল, একদা হযরত বেলাল এসে হুজুর ﷺ-কে খবর দিল নামাজের সময় হয়েছে। তখন মহানবী ﷺ বললেন, আবু বকরকে লোকদের নামাজ পড়িয়ে দিতে বল। সে মতে হযরত আবু বকর (রা.) সে কয়দিনের নামাজ পড়ালেন। অতঃপর হুজুর ﷺ একদিন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবু বকর মহানবী ﷺ-এর আগমন অনুভব করলেন, তখন নিজে পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিছনে সরে না যেতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর হুজুর ﷺ এসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাম পাশে বসলেন। হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন এবং হুজুর ﷺ বসে [ইমাম রূপে] নামাজ পড়তে থাকলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের একতেন্দা করলেন, আর লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর একতেন্দা করল। অর্থাৎ তাঁর নামাজের অনুসরণ করল। [বুখারী ও মুসলিম। উভয়ের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) লোকদেরকে তাকবীর শুনাতেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূল ﷺ অস্তিম অসুস্থতার সময় ইমাম ছিলেন নাকি মুক্তাদি? রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অস্তিম রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন তিনি লোকদেরকে ইমামরূপে নামাজ পড়িয়েছেন নাকি অন্য কারো পিছনে মুক্তাদিরূপে নামাজ আদায় করেছেন, এই ব্যাপারে দু' ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস এবং নিম্নোক্ত হযরত ইবনে আকাস

(রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্তিম রোগ অবস্থায় ইমাম হিসাবে নামাজ পড়িয়েছেন। ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীসটি হলো-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ (رض) وَلَمْ يَقْرَأْ أَبُو بَكْرٍ (رض) بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ الصَّلَاةُ فِيمَا بَحْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ .

পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্তিম রোগ অবস্থায় মুক্তাদির মুক্তাদি হিসাবে নামাজ আদায় করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত আশেশা (রা.) এবং হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস দু'টি পেশ করা যেতে পারে-

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِيَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (رض) قَاعِدًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحًا)

(٢) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ أَخْرَجْتُ صَلَاةَ صَلاَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّعًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (رض) . (رَوَاهُ الشَّيْخَانِيُّ)

এখানে উভয় প্রকার হাদীসে দু' ধরনের তথ্য পাওয়া যায়, ফলে প্রকাশ্যত হাদীস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে কেউ কেউ এক প্রকার হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করেছেন।

আবার কেউ কেউ এই দু' ধরনের হাদীসের অনুকূলে পৃথক পৃথক দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী বলেন, যে নামাজে রাসূল ﷺ ইমাম হয়ে নামাজ পড়েছেন, তা ছিল শনিবার অথবা রবিবারের জোহরের নামাজ। এ নামাজে তিনি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা.)-এর কাঁধে ভর করে মসজিদে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে নামাজে রাসূল ﷺ মুক্তাদি হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিছনে নামাজ আদায় করেছিলেন তা ছিল সোমবারের ফজরের নামাজ। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ নামাজ। এই আলোচনা দ্বারা উভয়ের মধ্যে কোনো তَعَارُضُ অবশিষ্ট থাকে না।

إِقْبَادًا الْمُتَّقِدِ بِالْمُتَّقِدِ এক মুক্তাদির পেছনে অন্য মুক্তাদির একতদা করা : আলোচ্য হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, মুক্তাদিগণ হযরত আবু বকর (রা.)-এর একতদা করেছেন, আর হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ-এর একতদা করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মুক্তাদিগণের আর এক মুক্তাদির একতদা কিভাবে জায়েজ হতে পারে? এর দু'টি জবাব হতে পারে-

প্রথমত যে সময় রাসূল ﷺ মসজিদে গমন করেছেন, ঐ সময় হযরত আবু বকর (রা.) নামাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। কাজেই সকল মুক্তাদি তার পিছনে একতদা করেছেন। ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ যখন মসজিদে আগমন করলেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইমামে পরিণত হলেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেন, এটা নবী করীম ﷺ-এর বিশেষত্ব ছিল। শাফেরী মাযহাবের মতে এভাবে ইমাম বদল করা জায়েজ আছে। আলোচ্য হাদীস হতে তাঁরা দলিল গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত রাসূলে কারীম ﷺ যখন মসজিদে আগমন করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামাজ শুরু করেননি। রাসূলে কারীম ﷺ ইমাম হয়েছেন, হযরত আবু বকর মুকাব্বির হয়েছেন মাত্র। তখন রাসূল ﷺ বসා ছিলেন, আর অসুস্থতা ও শরীরিক দুর্বলতার কারণে তার গলায় স্বর নিম্ন ছিল। এ জন্য হযরত আবু বকর (রা.) মুকাব্বির হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাকবীর অনুযায়ী তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলেছেন। আর মুক্তাদিগণ তার আওয়াজ অনুযায়ী আমল করেছেন। দ্বিতীয় জবাবের অনুকূলে বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় স্পষ্ট উক্তি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর অসুস্থ অবস্থায় সতেরো ওয়াক্ত নামাজে ইমামতি করেছেন।

وَعَنْ ١٠٧٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৭৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে [কিন্তু বা সিদ্ধদায়] মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দেবেন? -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَ حِمَارٍ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রুকু বা সিজদা হতে ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করে, আত্মা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন। এখন প্রশ্ন হলো, আত্মা তার মাথা কি সত্যি সত্যিই তা করবেন? না হাদীসের অন্য কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে, অর্থাৎ হাদীসটি কি হাকীকী অর্থের উপর প্রযোজ্য, নাকি মাজহাবী অর্থে প্রযোজ্য; সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম গাযালী (র.), কাজী আবু বকর, ইবনুল আরাবী এবং আত্মা তীবী প্রমুখ বলেন- إِنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَ حِمَارٍ বাক্যটি মাজহাবী বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা গাধা হলো বোকার প্রতীক। বোকা লোক উপহাসের পাত্র। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মুক্তাদিদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে বোকার মধ্যেই শামিল। পরকালে সে এই বোকামির জন্য অসম্মানিত হবে এবং উপহাসের পাত্র হবে।

তবে ইমাম খাত্তাবী সহ অনেক আলিমের মতে উক্ত বাক্যটি حَنْفِيٌّ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তথা প্রকৃতপক্ষে তার মুখমণ্ডলকে গাধার মুখের মতো করে দিবেন এবং এই পরিবর্তন বাস্তবে দুনিয়াতে হতে পারে। কথিত আছে যে, এক সময় এক ব্যক্তি দামেশুকের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন তার কাছে হাদীস অধ্যয়ন করলেন বটে, কিন্তু তাঁর ও শিক্ষকের মধ্যখানে আড়াল থাকত। অথচ শাগরেদ কোনো দিনই উত্তাদের চেহারা দেখতে পেত ন্দু। উত্তাদ যখন দেখলেন, হাদীস শিক্ষা গ্রহণের প্রতি শাগরেদটির একান্তই জোঁক হঠাৎ একদিন উত্তাদ নিজেই পর্দাটি সরিয়ে শাগরেদের সামনে উপস্থিত হলেন। শাগরেদ দেখলেন উত্তাদের চেহারাটি গাধার আকৃতিতে পরিবর্তিত। তখন উত্তাদ শাগরেদকে লক্ষ্য করে বললেন, বৎস! নামাজের রুকু সেজদায় ইমামের আগে গমন করো না। আর আমার ঘটনা হলো এই যে, এ হাদীস অধ্যয়নকালে আমি এই হাদীসটিকে অবান্তর ও অসম্ভব মনে করে পরীক্ষামূলকভাবে এক সময় বেষ্টিয় নামাজের মধ্যে রুকু সেজদায় ইমামের আগে গিয়েছিলাম। পরিণামে তখন হতে আমার চেহারাখানা গাধার চেহায়ায় পরিণত হয়ে গেছে, যা তুমি এখন প্রত্যক্ষ করছ। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াতেও আত্মা তার মাথা উত্তাদের চেহারা বিকৃত করে দিতে পারেন। সুতরাং আমাদের সকলকে এই ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং কখনো ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো উচিত নয়।

الْفَصْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১০৭৪. অনুবাদ : হযরত আলী ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজে হাজির হয়, আর ইমাম যে কোনো অবস্থায় থাকেন, তখন সে যেন তাই করে ইমাম যা করেন।- [তিরমিযী]। তবে তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِيئَةً -এর ব্যাখ্যা : জামাতে হাজির হতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সেখানেই শরিক হতে হবে, এর অন্যথা করা ঠিক হবে না।

وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سَجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১০৭৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমারা নামাজে আসবে, আর আমরা যদি সিজদায় থাকি, তোমারাও সিজদা করবে; কিন্তু একে রাকাত হিসাবে গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এক রাকাত পেল, সে পুরা নামাজের ছওয়াবই পেল।- [আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الصلوة: -এর ব্যাখ্যা : "যে জামাতে এক রাকাত পেল সে পূর্ণ নামাজ পেল" এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে, প্রথমত রাকাত অর্থে রুকু এবং নামাজ অর্থে রাকাত। তা হলে বাক্যটি হবে "যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেল, সে ব্যক্তি সে রাকাতটি পেল"। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি এক রাকাত ইমামের সাথে পেল সে জামাতে পেল, সুতরাং পুরা জামাতের হওয়াব সে পারে।

হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, যে ব্যক্তি জোহর নামাজে এক রাকাত ইমামের সাথে পেল, আর তিন রাকাত পেল না, তবে সে জোহরকে জামাতের সাথে আদায় করল না। অর্থাৎ সে একথা বলতে পারবে না যে, আমি জোহরকে জামাতের সাথে আদায় করেছি, বরং সে শুধু জামাতের হওয়াব পারে। তবে জুমার নামাজের ব্যাপার স্বতন্ত্র। কেননা জুমার ব্যাপারে হানাফী মাযহাব এই যে, যে ব্যক্তি ইমামকে জুমার নামাজে পেল তা হলে সে পূর্ণ জুমার নামাজই পেল। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, জুমার নামাজের ভিত্তিতে সে জোহর নামাজেরও শেষ রাকাত পেলে সে জামাতে পেয়েছে বলে দর্ভব্য হবে।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لِيَّهِ أَنْ يُعِينَنِي يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يَذْرُوكُ التَّكْمِيمَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بِرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১০৭৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি একমাত্র আদ্বাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন যাবৎ জামাতে নামাজ পড়ে, প্রথম তাকবীর অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হয়ে তার জন্য দু'টি মুক্তি লিপিবদ্ধ হয়- (এক) জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি। (দুই) নিফাক বা কপটতা হতে মুক্তি। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ-এর বিশ্লেষণ : যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরিক হয়ে জামাতে নামাজ আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তি রয়েছে। এর প্রথমটি হলো, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ করে, জাহান্নামের আগুন সে প্রবেশ করবে না। আর দ্বিতীয়টি হলো, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে কপটতার কলুষতা হতে মুক্তি লাভ করবে। আদ্বাহা তীবাী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে ব্যক্তি মুনাক্ফদের কার্যবলির ন্যায় খারাপ কার্য হতে নিরাপদ থাকবে এবং তার কাজ ভাল লোকদের কাজের ন্যায় হবে। আর পরকালে মুনাক্ফদেরকে যে জন্য শাস্তি দেওয়া হবে তা হতে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করবে।

أثر الأتيمين في الإنسان মানুষের মধ্যে চল্লিশ দিনের প্রতিক্রিয়া : মানব জীবনে চল্লিশ দিনের একটি গুরুত্ব রয়েছে, যেমন- মাতৃগর্ভে তরুণবিন্দুর প্রত্যেক চল্লিশ দিন পর পর এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। যেমন- প্রথম ৪০ দিন তরুণবিন্দু, পরের ৪০ দিন জন্মট রক্ত এবং পরের ৪০ দিন মাংসপিণ্ড। এভাবে ছয়টি স্তর অতিক্রম হওয়ার পর সপ্তম স্তরে জীবন্ত ও পরিপূর্ণ একটি মানব আকৃতি পৃথিবীতে আসে। বহুত মানুশের মৌলিক সৃষ্টির মধ্যেই প্রত্যেক চল্লিশ দিনের ব্যবধানে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনেও রয়েছে, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَابٍ مِّنْ صَلَاجٍ مِّنْ طِينٍ (الأنبياء)। তার সাধারণ স্বভাবের পরিণত হয়ে যায়। এখানেই চল্লিশের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। এ আয়তের অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে আসোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাজ যার মজাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, সে দুনিয়াতে মানুষের কাছে কপট-মুনাক্ফিক বলে চিহ্নিত হয় না, বরং মু'মিন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

وَعَنْ ١٠٧٧. آيِسَىٰ مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْصَلُّوا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَضَّرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا. (رواه أبو داودَ وَالتَّسَانِيُ)

১০৭৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যে ব্যক্তি অজু করল এবং ভালভাবেই অজু সম্পন্ন করল, অতঃপর মসজিদের দিকে গেল, আর দেখল যে, জনগণ নামাজ শেষ করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার সমতুল্য ছওয়াব দান করবেন, যে জামাতে উপস্থিত হয়েছে এবং জামাতের সাথে নামাজ পড়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াব হতে কিছু অংশ কমানো হবে না।—[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ١٠٧٧. آيِسَىٰ مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْصَلُّوا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَضَّرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا. (رواه أبو داودَ وَالتَّسَانِيُ) এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করল আর যে জামাতে শরিক হওয়ার জন্য বের হলো অথচ জামাত পেল না, উভয়ে সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, যে ব্যক্তি জামাত পেল আর যে জামাত পেল না উভয়ের ছওয়াব কি করে সমান হতে পারে? আল্লামাতীর্ষী বলেন, দু'টি কারণে এটা হতে পারে।

প্রথমত: رَبِّهِ الْمُوْمِنِيْنَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ অর্থাৎ কোনো কাজের জন্য মু'মিন ব্যক্তিদের নিয়ত তা পালন করার চাইতে উত্তম। অবশ্য একথা ঘরা মু'মিনদের মর্খাদা বর্ণনা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত : বলা যায়, সে জামাত না পাওয়ার কারণে অন্তরে যে ব্যথা অনুভব করেছে এবং আফসোস করেছে, এর জন্যও তাকে ছওয়াব প্রদান করা হবে। তবে অলসতার দরুন যদি কেউ জামাত পরিত্যাগ করে তবে সে ছওয়াব তো দূরের কথা শাকাহের অধিকারী হবে। বরং চেষ্টা করে না পেলেই ছওয়াবের অংশীদার হবে।

وَعَنْ ١٠٧٨. آيِسَىٰ سَعِيْدِ الْخَدْرِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَّصِدُقُ عَلَيَّ هَذَا. فَيَصَلِّي مَعَهُ فَيَقَامُ رَجُلٌ فَصَلِّي مَعَهُ. (رواه التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

১০৭৮. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসল, অথচ তখন রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি নেই, যে এই লোকটিকে জামাতের। ছওয়াব দান করে? অর্থাৎ তার সাথে নামাজ পড়ে? অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে নামাজ পড়ল।—[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ١٠٧٨. آيِسَىٰ سَعِيْدِ الْخَدْرِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَّصِدُقُ عَلَيَّ هَذَا. فَيَصَلِّي مَعَهُ فَيَقَامُ رَجُلٌ فَصَلِّي مَعَهُ. (رواه التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) এটা কোন ওয়াক্তের নামাজ ছিল : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এটা ছিল আসরের নামাজ। অবশ্য এটা আমাদের বিবেচনায় সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা আসরের পরে নফল নামাজ পড়া আমাদের মাযহাব মতে মাকরুহ। আগত্বক ব্যক্তির সাথে যিনি নামাজ পড়েছিলেন তা তার জন্য ছিল নফল। তাই এটা আসরের নামাজ হতে পারে না। এরূপভাবে ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়ার পর ফরজ নামাজ আদায় না করে সফল ধরনের নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। তা ছাড়া মাগরিবের নামাজ পড়ার পর আবার কোনো মাগরিবের ফরজ পালনকারীর শেরনে নফলের নিয়তে তিন রাকাতের নিয়ত করাও সঠিক নয়। কেননা তিন রাকাত নফল শরিয়াতে অনুমতি নয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত নামাজ এই তিন ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াক্তের নামাজ হবে।

وَعَنْ ١٠٧٨. آيِسَىٰ سَعِيْدِ الْخَدْرِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَّصِدُقُ عَلَيَّ هَذَا. فَيَصَلِّي مَعَهُ فَيَقَامُ رَجُلٌ فَصَلِّي مَعَهُ. (رواه التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) এর মধ্যে رَجُلٌ ষায়া উদ্দেশ্য : ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসের মধ্যে رَجُلٌ ষায়া উদ্দেশ্য হলো হযরত আবু বকর (রা.)। ষায়াহাকীর বর্ণনায় তাই রয়েছে।

التَّائِبُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَبْدُ اللَّهِ
قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ (رض) فَقُلْتُ أَلَا
تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى
النَّاسُ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ
يَنْتَظِرُونَكَ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي
الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاعْتَسَلَ
فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغِمِّي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ
أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً وَنِي
الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ
لِيَنُوءَ فَأُغِمِّي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى
النَّاسُ قُلْنَا لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ
فَقَعَدَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغِمِّي
عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا
لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ
عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ
لِصَلْوَةِ الْعِشَاءِ الْأُخْرَى فَارْسَلِ النَّبِيُّ ﷺ
إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَاتَاهُ
الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِكَ أَنْ

১০৭৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আসলাম এবং আরজ করলাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর [ইহুদাম ত্যাগকালীন] রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন- হ্যাঁ, [নিচয় বর্ণনা করব]। যখন নবী করীম ﷺ-এর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল, তিনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম- না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম [গামলায় পানি ঢাললাম]। তখন রাসূল ﷺ গোসল করলেন, যখন রাসূল ﷺ উঠতে চেষ্টা করলেন, বেহুশ হয়ে গেলেন, অতঃপর কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরল; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ উঠে বসলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর উঠতে চেষ্টা করলেন; আবারও তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাসূল ﷺ আবারও বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। রাসূল ﷺ উঠে বসলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর উঠতে চাইলেন এবারও তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অতঃপর যখন তার সন্ধি ফিরল তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। অথচ তখনও লোক মসজিদে অবস্থান করছিল এবং নবী করীম ﷺ-এর সাথে শেষ এশার নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট লোক পাঠালেন যেন তিনি মানুষের নামাজ পড়িয়ে দেন। যখন বার্তাবাহক হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আসল এবং বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে মানুষকে নামাজ পড়িয়ে দিতে আদেশ করেছেন তখন হযরত আবু বকর হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! আপনিই মানুষের

تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ
رَجُلًا رَقِيظًا - يَا عَمْرُؤُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ
عَمْرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ يَلِكُ
الْأَيَّامِ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ
خِيفَةً وَخَرَجَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ
لِيُصَلِّوا الظُّهْرَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ
إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِإَنَّ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ
أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَاجْلِسَا إِلَى جَنْبِ
أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ فَأَعَادَ وَقَالَ عُبَيْدُ
اللَّهِ فَدَخَلَتْ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي
عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ
مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلُ
الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ
عَلِيٌّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

নামাজ পড়িয়ে দিন। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন খুব কোমল হৃদয় ব্যক্তি। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, এই [দায়িত্বের] জন্য আপনিই অধিকতর যোগ্য। তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেই কয়দিনের নামাজ পড়ালেন। অতঃপর [একদিন] নবী করীম ﷺ নিজ শরীয়ে কিছুটা সুস্থতাবোধ করলেন এবং দু' ব্যক্তির সহায়তায় জোহরের নামাজের জন্য বের হলেন, তাদের একজন হলেন হযরত আক্বাস (রা.)। তখন হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ-এর আগমন উপলব্ধি করলেন, তখন পিছনে সরে যেতে চাইলেন; তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি পিছনে সরে না যান। রাসূল ﷺ [সাথীদ্বয়কে] বললেন, আমাকে তার [আবু বকরের] পার্শ্বে বসিয়ে দাও। তখন তারা উভয়ে রাসূল ﷺ-কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। আর নবী করীম ﷺ বসেছিলেন [অর্থাৎ বসে বসেই নামাজ আদায় করলেন]।

রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন, [হযরত আয়েশা (রা.) হতে এ ঘটনা শোনার পর একদিন] আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা.)-এর নিকট আসলাম। তাঁকে বললাম, আমি কি আপনাকে সে হাদীস বর্ণনা করব না যা হযরত আয়েশা (রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন- বর্ণনা করুন। আমি তার সমীপে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবৃত হাদীস বর্ণনা করলাম। এটা শুনে তিনি এর কোনো অংশই অস্বীকার করলেন না। তিনি শুধু এটা জিজ্ঞাসা করলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) কি আপনাকে সেই ব্যক্তির নাম বলেছেন, যিনি হযরত আক্বাস (রা.)-এর সাথে ছিলেন? আমি বললাম, না, বলেননি। আব্দুল্লাহ বললেন, তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা.)। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَاغِيَمِي عَيْنِي -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তেকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে জামাতে শরিক হওয়ার জন্য প্রকৃতি নিতে গিয়ে তিনি বারবার বেহেঁশ হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বেহেঁশ হয়ে পড়েছিলেন এর মধ্যেও একটি হিকমত রয়েছে। এটা হলো নবী রাসূলগণের উপরও যে বেহেঁশী আসতে পারে এর বাস্তব প্রমাণ। আর এর মধ্যে সাধারণ মানুষদের প্রবেশও রয়েছে। কেননা অসুস্থতা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের বেলায় নয়; বরং এটা নবী রাসূলদেরও হতে পারে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হযরত আলী (রা.) নাম উল্লেখ না করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগাক্রান্ত অবস্থায় দু' ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেছিলেন। তাদের একজন হলেন হযরত আক্বাস (রা.) এবং অপরজন ছিলেন হযরত আলী (রা.)। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আক্বাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন না কেন? হাদীস বিশারদগণ এর দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন-

প্রথমত কস্বা মতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর কিছুটা মনোমালিন্য ছিল; আর এর কারণ হলো, ইফ্রাকব ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর যেই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, এর বিরোধিতায় অন্যান্য সাহাবীরা যে চরমভাষ প্রকাশ করেছিলেন, হযরত আলী (রা.) ততটা করেননি। হযরত আলী (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু এ অভিমত সত্য নয়। কেননা ইফ্রাকের ঘটনার পরও হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নাম সন্ধানের সাথে বহু স্থানে স্মরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত বলা যায়, আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) এ জন্য হযরত আব্বাসের সাথে অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি যে, অপর পার্শ্ব পর্যায়ক্রমে লোক বদল হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমে হযরত আলী (রা.) তারপর হযরত ফজল ইবনে আব্বাস একতঃপন হযরত উসামা ইবনে যায়দ প্রমুখ সাহাবীগণ ছিলেন। আর এক পার্শ্বে শুধু হযরত আব্বাস (রা.)-ই ছিলেন। বর্ণনা সংক্ষেপে জনা তিনি শুধু এক পার্শ্বে থাকা হযরত আব্বাস (রা.)-এর কথাই বলেছেন।

وَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

وَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৮০. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি [নামাজের জামাতে] রুকু পেয়েছে, সে সিজদা অর্থাৎ পূর্ণ রাকাত পেয়েছে। আর যে ব্যক্তির সূর্যয়ে ফাতিহা ছুটে গেছে তার বহু ভাল জিনিসই [অর্থাৎ ছুয়ায়] ছুটে গেছে। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

وَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৮১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে [নামাজের মধ্যে] মাথা উঠায় কিংবা মাথা নামায় নিশ্চয়ই তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে। [অর্থাৎ শয়তানই তাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করছে, ফলে সে শয়তানের ক্রীড়নক]। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

وَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرًا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَرَّتَيْنِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক নামাজ দু'বার পড়ল

কোনো ব্যক্তি একই নামাজ দু'বার পড়লে তথা কেউ নিজ গৃহে বা কোথাও ফরজ নামাজ আদায় করার পর মসজিদে গমন করে যদি দেখে যে, ঐ ওয়াক্তের জামাত চলছে এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য জামাতে শরিক হতে হবে কি না? আর শরিক হলে তার এই নামাজ কোন পর্যায়ের হবে, এ বিষয়ে অধ্যায়ের হাদীসসমূহ উপস্থাপিত হচ্ছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ مُعَاذُ
بْنِ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي
قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৮২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) প্রথমে নবী
করীম ﷺ এর সাথে নামাজ পড়তেন, অতঃপর নিজ
গোত্রের নিকট গমন করতেন এবং তাদেরকে নামাজ
পড়াতেন। - [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেন্দার হুকুম :
নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেন্দা বৈধ কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ :
১. **مُنْفَرِضٌ** -এর একতেন্দা জায়েজ
আছে। তাঁর দলিল হচ্ছে এই—

عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ
قَالَ جَابِرٌ (رَضِيَ) هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ -
قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنَ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَرَّتَيْنِ -

এ কথা সর্ব স্বীকৃত যে, হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর উপর নামাজ ফরজ ছিল না, তিনি **مُنْفَرِضٌ** হয়ে ইমামতি করেছেন
আর রাসূল **مُنْفَرِضٌ** ছিলেন।

২. **مُنْفَرِضٌ** -এর পিছনে **مُنْفَرِضٌ** -এর একতেন্দা সর্হ হয় না। কেননা- (ক) রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ -

অতএব মুক্তাদি কর্তৃক বাহ্যিক আমল ও নিয়ত উভয় ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। **مُنْفَرِضٌ** ও **مُنْفَرِضٌ** -এর
একতেন্দা এক রকম নয়। (খ) হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন— **الْإِمَامُ ضَامِكٌ وَالْمُؤَدُّنُ مُؤْتَمِرُونَ** -একথা পরিষ্কার যে, নফল
পাঠকারী ফরজ পাঠকারীর জামিন হতে পারে না। (গ) এমনকি, এটা কিয়াস বিরোধী। কেননা দু'র্বলের উপর সবলের ভিত্তি
হয় না। (ঘ) যদি এটা জায়েজ হতো, তা হলে হুজুর ﷺ কে **صَلَاةُ الْغُرَبِ** কে দু'ভাগ করতেন না; বরং প্রথম দলের সাথে
পুরা নামাজ পড়ে নিতেন এবং **مُنْفَرِضٌ** হয়ে দ্বিতীয় দলের ইমামতি করতেন।

الْجَوَابُ عَنْ أَوْلَى الشَّافِعِيِّ :

১. হযরত মুয়ায (রা.) বরকত হাসিলের জন্য রাসূলের পিছনে এশার নামাজ **نَفَلَ** হিসেবে পড়েছেন, পরে আপন গোত্রীয়
লোকদেরকে নিয়ে ফরজ হিসেবে এশার ইমামতি করেছেন। এটা জীবনে মাত্র একবার হয়েছে।

২. অথবা বলা যায় যে, হযরত মুয়ায (রা.) রাসূল ﷺ-এর পেছনে **صَلَوَةُ النَّهَارِ** পড়তেন আর আপন গোত্রীয় লোকদের সাথে **صَلَوَةُ اللَّيْلِ** পড়তেন। যেমন, বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে— **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ**—এখানে এমন কথা উল্লেখ নেই যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর পিছনে এশার নামাজ পড়তেন।
৩. অথবা হযরত মুয়ায (রা.) রাসূল ﷺ-এর পিছনে মাগরিবের নামাজ আর নিজ গোত্রের গিয়ে এশার নামাজ পড়তেন।
৪. অথবা বলা যায় যে, হযরত মুয়ায (রা.)-এর এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাসূল ﷺ-এর জানা ছিল না। জানার পর রাসূল ﷺ তাকে নিষেধ করেছেন। যেমন— **يَا مَعَاذُ إِمَّا أَنْ تَصَلِّيَ مَعِيَ وَإِمَّا أَنْ تَخْتَفِيَ عَنْ قَوْمِكَ (طَبَاوَرُ)**—এটা হযরত জাবের (রা.)-এর উক্তি— **وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَخْبَى أَنْ لَا تَكُونَنَّ مَحْفُوظَةً**—এই উক্তির অর্থ— **هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ قَرِيبَةٌ**।
৫. **أَيْتِي جِبْرَائِيلُ**—এর উত্তরে বলা যায় যে, সে সময় হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে **مُكَلِّفٌ بِالصَّلَاةِ** বানানো হয়েছে। উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেনা বৈধ নয়।

وَعَنْ ١٠٨٣
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَصَلِّيَ بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَخَارِيُّ)

১০৮৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) মহানবী ﷺ-এর সাথে এশার নামাজ পড়তেন। অতঃপর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং তাদেরকে এশার নামাজ পড়াতে। অথচ এটা ছিল তাঁর নফল নামাজ।—[বায়হাকী ও বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ—এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, অথচ তাঁর নামাজ ছিল নফল—এ বাক্যটি হযরত জাবের (রা.)-এর বাক্য বলে মাহুযুজ বা রক্ষিত নয়। কারো মতে এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরই বাক্য। তিনিও এ হাদীসের একজন রাবী। পরবর্তী রাবী তার বাক্যকে হযরত জাবের (রা.)-এর বাক্য বলে জুল করেছেন। আর এ হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান পেলেও বুখারী বা মুসলিমে নেই। শায়খ দেহলবী (র.) এ হাদীসকে বায়হাকী ও দারাকুতনীর বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন।

الدَّفْعُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٨٤
بِزَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ (رَضٍ) قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَوَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَوَتَهُ وَأَنْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يَصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فِجْنِي

১০৮৪. অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে আস্-ওয়াদ

(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর সাথে (মিনার) 'মসজিদে খায়ফে' ফজরের নামাজ পড়লাম। যখন তিনি নামাজ শেষ করে পিছনে ফিরলেন, তখন দেখলেন, দু'জন লোক জনতার শেষ প্রান্তে রয়েছে যারা তাঁর সাথে নামাজ আদায় করেনি। তখন হুযর ﷺ বললেন, তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে

بِهَمَا تَرَعَدَ فَرَأَيْتَهُمَا فَقَالَ مَا
 مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي
 رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا
 فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ
 فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالتَّسَائُفِيُّ)

আস। তখন তাদেরকে আনা হলো অথচ তাদের কাঁধের মাংস [ভয়ে] কাঁপছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের সাথে নামাজ পড়তে তোমাদের কিসে বাঁধা দিল? তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের বাড়িতে নামাজ পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [দ্বিতীয় বার] এরূপ করবে না। তোমরা যখন তোমাদের বাড়িতে নামাজ পড়, অতঃপর জামাত হচ্ছে এরূপ মসজিদে উপস্থিত হও তখন তোমরা তাদের সাথে পুনঃ নামাজ পড়বে। এটা [অর্থাৎ দ্বিতীয় নামাজটি] তোমাদের জন্য নফল হবে।—[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِعَادَةِ النَّجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَذَابِيبِ الْأَنْبِيَةِ وَبِهِ

আলোচনা এবং এতে ইমামদের মাহহাবসমূহ: যদি কোনো ব্যক্তি একাকী ফজরের নামাজ পড়ে ফেলে, পরে আবার যদি কোথাও জামাতে পড়ার সুযোগ পায় তবে জামাতের শরিক হয়ে নামাজ পুনরায় পড়বে কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জামাতে অংশগ্রহণ করবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জামাতের সাথে পুনরায় নামাজ পড়বে। তিনি এশ্রে উল্লিখিত ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদের হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করেন। কেননা এ হাদীসে ফজরের নামাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় নামাজ পড়তে আদেশ করেছেন।

আবু হানীফা ও মালেক (র.)-এর দলিল :

১। নবী করীম ﷺ এর হাদীস—

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْفِعَ الشَّمْسَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"ফজরের পরে নামাজ পড়ো না! যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়, আসরের পরেও নামাজ পড়বে না যতক্ষণ না সূর্যাস্ত হয়"

২। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا صَلَّيْتَ فِي أَمْلِكِ ثُمَّ أَدْرَكْتَ فَصَلِّيْهَا إِلَّا النَّجْرَ وَالْمَقْرَبَ

"যখন তোমরা নিজ গৃহে নামাজ পড়ে ফেল পরে জামাতে পড়ার সুযোগ পায়, তবে ফজর ও মাগরিব ছাড়া অন্য নামাজ পুনরায় জামাত সহকারে পড়বে"।

তারা ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদের হাদীসের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন—

- হযরত ইয়াযীদের হাদীস ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। যখন একই ফরজ নামাজ দু'বার পড়ার অনুমতি ছিল। পরে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে।
- আবু হানীফা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, নিষেধাজ্ঞার হাদীস হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সঞ্চলিত হাদীসটিই প্রাধান্য পাবে।
- উসুলের সাধারণ নিয়ম এই যে, হারাম হওয়া ও হালাল হওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে হারাম হওয়াই প্রাধান্য পায়। সুতরাং আমাদের দলিলই প্রাধান্য পাবে।

একই নামাজ দু'বার পড়লে কোনটি ফরজ হিসাবে গণ্য হবে সে ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : নায়লুল আওতার এছহ ইমাম শাওকানী লেখেন, যে নামাজ দু'বার পড়া হয়েছে তার কোনটিকে ফরজ এবং কোনটিকে নফল হিসাবে গণ্য করতে হবে সে ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে-

হাদী, আওযায়ী এবং কতক শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, দ্বিতীয়বারের নামাজ যদি জামাত সহকারে আদায় করা হয়, তবে তা ফরজ হিসাবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয়বারের নামাজ যদি একাকী আদায় করা হয় তা হলে প্রথমটি ফরজ হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমের বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি-

فَإِذَا جُنْتُ الصَّلَاةَ فَرَجَدْتُ النَّاسَ يَصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَكُنْ لَكَ نَائِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ .
(رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِي)

শাফেয়ী মায়হাবের অন্যান্য কিছু ওলামায়ে কেলাম বলেন, উভয় নামাজের মধ্যে যেটি অধিক পরিপূর্ণ হবে তাই ফরজ হিসাবে পরিগণিত হবে।

ইমাম গাযালী (র.) এবং অন্য একদল শাফেয়ীর মতে উভয় নামাজের মধ্যে যে নামাজটি অধিক পরিপূর্ণ হয়েছে আদ্বাহ রাক্বুল আলামীন তাকেই ফরজ হিসাবে গণ্য করবেন। যেমন হাদীস এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ أَيُّهَا أَجْعَلُ صَلَاتِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) ذَلِكَ إِلَيْكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ أَيُّهَا شَاءَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

আর একদল শাফেয়ী আলিম বলেন, উভয় নামাজই ফরজ হিসাবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে উভয় নামাজের মধ্যে প্রথমটিই ফরজ হিসাবে গণ্য হবে। চাই তা জামাতে আদায় করা হোক অথবা একাকী আদায় করা হোক। তাঁরা উল্লিখিত হযরত ইবনে আসওয়াদ (রা.)-এর হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّلَاثُ

عَنْ ١٠٨٥
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَادَّيَنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمَجْنَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَصَلِيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأَمِنْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ)

১০৮৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত বুসর ইবনে মিহজান তাঁর পিতা মিহজান (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক মসলিসে ছিলেন; তখন নামাজের আযান হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন, যখন তিনি নামাজ সম্পন্ন করলেন এবং বৈঠকে ফিরে আসলেন তখন দেখলেন, বর্ণনাকারী মিহজান তার পূর্ব স্থানেই বসে রয়েছেন। এবার হুজুর ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকদের সাথে জামাতে নামাজ পড়তে তোমাকে কিসে বারণ করল? তুমি কি মুসলমান নও?' মেহজান বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু আমি যে নিজ ঘরে নামাজ পড়ে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যখন তুমি ঘরে নামাজ পড়ার পর মসজিদে আস আর তখন মসজিদে নামাজ শুরু হয় তখন তুমি [পুনরায়] লোকদের সাথে [জামাতে] নামাজ পড়বে, যদিও তুমি [ঘরে] নামাজ পড়ে থাক। -[মালেক ও নাসারী]

قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسَلَمْتُ قَالَ
وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي
صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي
مَنْزِلِي أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا
جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ
وَأَنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ
مَكْتُوبَةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে তুমি লোকদের সাথে নামাজে शामिल হলে না কেন? আমি বললাম, হুযূর আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ে নিয়েছি। আর আমি ধারণা করেছি আপনারা নামাজ পড়ে ফেলেছেন। তখন হুযূর ﷺ বললেন, যখন তুমি কোনো নামাজের স্থানে পৌঁছবে আর লোকদেরকে নামাজ পড়তে দেখবে, তখন তাদের সাথে নামাজে शामिल হয়ে যাবে। যদিও তুমি ইতঃপূর্বে নামাজ পড়ে ফেলেছ। তোমার এ নামাজ 'নফল' হবে এবং ঐ নামাজ 'ফরজ' হবে।—[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ—হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের বাক্যাংশ مَكْتُوبَةٌ—এর অনুবাদে “তোমার এ নামাজ নফল হবে এবং ঐ নামাজ ফরজ হবে” এ তরজমা করা হয়েছে এজন্য যে, এটা অন্যান্য হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কেননা, প্রথম নামাজ ফরজ পালন করার উদ্দেশ্যেই পড়া হয়েছিল কিন্তু “ঐ নামাজ নফল এবং এ নামাজ ফরজ হবে।” এরূপ অর্থ করাই আরবি ব্যাকরণে দৃষ্টিতে অধিক সমীচীন। এরূপ অর্থ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে এই যে, প্রথম নামাজ ঘরে একা পড়ার কারণে তার কোনো মূল্য নেই। কেননা, নামাজ জামাতে পড়াই নিয়ম। সুতরাং তার ঘারা ফরজ আদায় হয়নি। এই শেষ নামাজের দ্বারাই ফরজ আদায় হল। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ফরজ নামাজ জামাতে পড়াই ফরজ। সুতরাং তাঁদের মতে আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপই।

وَعَنْ ١٠٨٨
ابْنِ عُمَرَ (رَضَا) أَنَّ رَجُلًا
سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَصَلَيْتُ فِي بَيْتِي ثُمَّ
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ
أَفَأَصَلِي مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ
أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ
ذَلِكَ الْبَيْتِ؛ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হযরত! আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ি, অতঃপর মসজিদে এসে ইমামের সাথেও জামাতে নামাজ পাই। সুতরাং এখন আমি কি পুনরায় ইমামের সাথে নামাজ পড়ব? উত্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ পড়। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, এমতাবস্থায় এই দুই নামাজের মধ্যে আমি কোনটিকে ফরজ মনে করব? উত্তরে হযরত ইবনে উমর বললেন, এটা কি তোমার কাজ? বরং এটাতো একমাত্র আল্লাহর কাজ, তিনি এ দুই নামাজের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরজ রূপে গণ্য করবেন।—[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ—এর ব্যাখ্যা : “তিনি উভয়ের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরজরূপে গণ্য করবেন” এ বাক্যাটির ব্যাখ্যা হলো, কোনো জিনিস কবুল হওয়া না হওয়া তা আল্লাহর মোহরবানীর উপর নির্ভর করে, বান্দা তা হতে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র ও অসহায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেবলম যদিও বলেন যে, প্রথম নামাজটিই ফরজ হবে। তবে এরও সম্ভাবনা আছে যে, কোনো কারণে প্রথম নামাজটি নষ্ট হয়ে গেলে দ্বিতীয় নামাজটি আল্লাহ তা’আলা উক্ত ফরজের স্থলে কবুল করে নেবেন। আল্লামা: ইবনে হাজার বলেন, উল্লিখিত কথাটির হযরত ইমাম গাজালী (র.)—এর কথোত্তা হতেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, উভয় নামাজের কোনো একটিকে ফরজ কিংবা নফল হিসাবে নির্দিষ্ট না করাই শ্রেয়। অবশ্য ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন—

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّذِينَ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ صَلَاةً مَعَهُمْ نَائِلَةٌ

অর্থাৎ "যদি তোমাদের শাসকগণ নামাজ দেরি করে পড়তে থাকে তখন তোমরা ওয়াস্তের মধ্যে নিজেদের নামাজ পড়ে নিও এবং পরে তাদের সাথে নফল হিসেবে পড়ো।" এর ঘারা বুঝা যায় যে, পরের নামাজটি নফলই হবে।

وَعَنْ ١٠٨٩٠ سَلِيمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ

(رض) قَالَ آتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ

وَهُمْ يَصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تَصَلُّونَ مَعَهُمْ قَالَ

قَدْ صَلَّيْتُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ لَا تَصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ -

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১০৮৯. অনুবাদ : হযরত মাইমুনা (রা.)-এর আযজদকৃত গোলাম [তাবেয়ী] হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বালাত নামক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট আসলাম, তখন তাঁরা নামাজ পড়ছিলেন। [কিন্তু তিনি তাতে শামিল ছিলেন না] আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাদের সাথে নামাজ পড়ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন- আমি নামাজ পড়ছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন- কোনো নামাজ একদিনে দু'বার পড়বে না। -[আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْبَلَاطُ : শব্দে 'বা' বর্ণ যবর বিশিষ্ট। 'বালাত' এক প্রকার পাথরকে বলা হয়, যা দ্বারা জমিন সমতল করা হয়। অতঃপর একটি স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে 'বালাত'। এটা মসজিদে নববীর নিকটে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। হযরত ওমর (রা.) এটা নির্মাণ করেছিলেন। মুসল্লিরা এ স্থানে বসে নামাজের আগে ও পরে আলাপ-আলোচনা করত।

একটি تَعَارُضٌ এবং তার সমাধান : উপরে হযরত সুলাইমান (তাবেয়ী)-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, لَاتَصَلُّوا صَلَاةً অর্থাৎ তোমরা কোনো নামাজ একদিনে দু'বার পড়বে না। অথচ ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস ঘারা বুঝা যায় যে, একই নামাজ দু'বার পড়া বৈধ। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এর সমাধানে হাদীস বিশারদগণ বলেন-

- প্রথমত বলা যেতে পারে, যে হাদীসে فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ 'আর অন্যান্য যে সমস্ত হাদীসে একই নামাজ দু'বার পড়ার হুকুম এসেছে, এটা সেই সকল ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য হবে, যারা প্রথমবার একাকী নামাজ আদায় করেছে। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে আর কোনো تَعَارُضٌ অবশিষ্ট থাকে না।
- অথবা সুলাইমানের হাদীসটি একাকী পড়ার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যদি কেউ প্রথমবার জামাতে নামাজ আদায় করে পরে একাকী তার পুনরায় নামাজ পড়তে হবে না।
- অথবা যে সমস্ত হাদীসে দু'বার নামাজ পড়ার হুকুম এসেছে তা জোহর ও এশার নামাজের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে হাদীসে لَاتَصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ রয়েছে তা বাকি তিন ওয়াক্ত অর্থাৎ ফজর, আসর ও মাগরিবের সাথে সম্পৃক্ত।

وَعَنْ ١٠٩٠٠ نَافِعِ (رض) قَالَ إِنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى

الْمَغْرِبِ أَوْ الصُّبْحِ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ

الْإِمَامِ فَلَا يَعِدُّ لَهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৯০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, যে ব্যক্তি মাগরিব কিংবা ফজরের নামাজ [একবার] পড়েছে, অতঃপর উক্ত দু' নামাজকে ইমামের সাথে পেয়েছে সে যেন [সেই দিন] ঐ দু' নামাজ [পুনরায়] না পড়ে। -[মালিক]

بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلِهَا

পরিচ্ছেদ : সুন্নত নামাজ ও তার ফজিলত

السُّنَنِ تَعْرِيفُ : সুন্নতের সংজ্ঞা : السُّنَّةُ শব্দটি السُّنُّ -এর বহুবচন, শাদিক অর্থ হলো- নিয়ম-পদ্ধতি, পথ, তরিকা ইত্যাদি। মোস্তা আলী কারী (র.) বলেন, সুন্নত, নফল, মানদূব এবং মোস্তাহাব এ সব সবগুলো সমার্থবোধক।

আল্লামা: শামী রুদ্দুল মুহতারে লেখেন যে, শরিয়তের বিধান সর্বমোট চার শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা- (১) ফরজ, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নত এবং (৪) নফল। যা অকাটা প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো ফরজ, আর যা দলিলে যন্নী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তা: ওয়াজিব, আর সুন্নত হলো যার উপর শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি এবং যার উপর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ অটল ছিলেন। আর কোনো আমলের মধ্যে স্থায়িত্ব পাওয়া না গেলে তাকে নফল বলা হয়।

السُّنَّةُ সুন্নতের প্রকারভেদ : উল্লেখ্য যে, ইমামগণ সুন্নতকে দু' ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত সুন্নাতুল হুদা অর্থাৎ এমন সুন্নত যা পরিত্যাগ করা মাকরুহ। এটাকে সুন্নতে মুয়াফ্ফাদাও বলা হয়। যেমন- জামাত, আযান, ইকামত ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত সুন্নতে যায়েদা অর্থাৎ অতিরিক্ত সুন্নত। যেমন- নফল বা মানদূব নামাজ এবং রাসূল ﷺ -এর লেবাস-পোশাক ও উঠা-বসার সুন্নতসমূহ।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى مِنِّي فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

১০৯১. অনুবাদ : হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকাত নামাজ পড়ে, তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করা হয়। চার রাকাত জোহরের [ফরজের] পূর্বে, দু' রাকাত তার পরে, দু' রাকাত মাগরিবের [ফরজের] পরে, দু' রাকাত এশার [ফরজের] পরে এবং দু' রাকাত ফজরের [ফরজের] পূর্বে। -[তিরমিযী]

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি উম্মে হাবীবা। বলেছেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান বান্দা প্রত্যেক দিন একমাত্র আল্লাহর (সত্ত্বটির) জন্য ফরজ ব্যতীত বারো রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করেন অথবা [রাবীর সন্দেহ, তিনি বলেছেন] তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সুন্নতের ফজিলত : আল্লামা ইবনু দাকীকিল ঈদ (র.) বলেন, ফরজ নামাজের পূর্বে ও পরে সুন্নত নামাজ চালা করার মধ্যে বিরাত টাৎপর্য বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হলো স্বাভাবিকভাবে মানুস সর্বদা বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের অন্তরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে সে খুশ-খুশর সাথে নামাজ পড়তে সক্ষম হয় না, অথচ নামাজের জন্য একমাত্রিত্তা একান্ত অপরিহার্য,

তাই সন্নত নামাজের মাধ্যমেই একাধ্বতা সৃষ্টি হয় এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে ফরজ নামাজ সৃষ্ট ও সুন্দরভাবে আদায় করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া ফরজ নামাজে ক্রটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তা নফল ধারাই পূর্ণ করে দেওয়া হয়। যেমন, হাদীসে এসেছে—
 قَانَ انْتَقَصَ مِنْ كَرِيْمَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى اُنْظُرُوا هَلْ يَعْْبِدُنِي مِنْ تَطَوُّعٍ يَكْمَلُ بِهٖ مَا اَنْتَقَصَ مِنْ الْغَرِيْمَةِ.

وَعَبْرَاتُ ١٠٩٢
 قَالَ صَلَّى
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ
 رَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
 فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي
 بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثْتَنِي حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ
 يَطْلُعُ الْفَجْرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে
 তার গৃহে জোহরের [ফরজের] পূর্বে দু' রাকাত, এর পরে
 দু' রাকাত এবং মাগরিবের [ফরজের] পরে দু' রাকাত
 নামাজ পড়েছি এবং তার গৃহে এশার [ফরজের] পরেও দু'
 রাকাত নামাজ পড়েছি। তিনি আরও বলেন, হযরত হাফসা
 (রা.) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ
 ﷺ সংক্ষিপ্ত দু' রাকাত নামাজ পড়তেন যখন ফজরের
 আলোক উদ্ভাসিত হতো [অর্থাৎ সুবহে সাদেক হলে
 ফজরের ফরজের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন।
 -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সন্নতে রাওয়াজি কত রাকাত ও কি কি? : উল্লেখ্য যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগে ও পরের সন্নতে মুয়াক্কাদকে সন্নতে রাওয়াজি বলে। এটা মোট কয় রাকাত সে বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে—

مَذْعَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র.)-এর মতে সন্নতে রাওয়াজিবে মোট দশ রাকাত। তাঁরা জোহরের পূর্বের চার রাকাত সন্নতের পরিবর্তে দুই রাকাত ধরেন। তাঁদের দলিল ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
 مَذْعَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَسْحَابِهِ : ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং তাঁর সাথীদের মতে সন্নতে রাওয়াজিবে মোট বারো রাকাত। তাঁরা জোহরের পূর্বে চার রাকাত সন্নত ধরেছেন। ইমাম তিরমিযী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম ইসহাক, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণের অভিমত এই একই ধরনের। তারা হযরত উম্মে হাবীবা বর্ণিত হাদীসসহ নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন—

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَنَّهَا قَالَتْ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ - (كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالتِّرْمِذِيِّ)
 (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

তাঁদের দলিলের জওয়াব : ইমাম শাফেয়ী (র.) তথা দু' রাকাতের সমর্থকদের দলিলের নিম্নোক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।
 ফলে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না—

১. আলামা দাউদী বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে জোহরের পূর্বে দু' রাকাতের কথা রয়েছে অথবা হযরত আয়েশা ও উম্মে হাবীবা (রা.)-এর হাদীসে চার রাকাতের কথা বলা হয়েছে। বর্ণনার বিভিন্নতা এ জন্য হয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেভাবে দেখেছেন ঐ ভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। আসল ব্যাপার এই যে, রাসূল ﷺ কখনও দু' রাকাত কখনও চার রাকাত পড়েছেন।

২. অথবা এ দু' রকম বর্ণনা দু' সময়ের। রাসূল ﷺ কখনো মসজিদে সংক্ষেপে দু' রাকাত পড়তেন এবং ঘরে চার রাকাত পড়তেন।
৩. অথবা রাসূল ﷺ ঘরে দু' রাকাত পড়ে মসজিদে গেছেন এবং মসজিদে গিয়ে আবার দু' রাকাত পড়েছেন। ইবনে ওমর মসজিদে দেখা দু' রাকাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হযরত আয়েশা উভয় নামাজকে যোগ করে মোট চার রাকাতের কথা বলেছেন।
৪. জোহরের পূর্বে চার রাকাত হওয়ার আরও সুস্পষ্ট দলিল ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন, অতঃপর মসজিদে দিকে বের হতেন। সম্ভবত তিনি ঘরে সুনত চার রাকাত পড়েছেন, তার বর্ণনা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ দিয়েছেন। আর সম্ভবত তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু' রাকাত মাসজিদে পড়েছেন তা হযরত ইবনে ওমর (রা.) দেখে বর্ণনা করেছেন।
- প্রকাশ থাকে যে, আমাদের উম্মতের নিকট শরিয়তের আহকামগুলো চার রকমের হয়। যথা- (১) ফরজ, (২) ওয়াজিব, (৩) সুনত ও (৪) নফল, কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর শানে তা তিন প্রকার- ফরজ, ওয়াজিব ও নফল। তিনি নফল হিসাবে যে আমলগুলো সচরাচর বা নিয়মিত করেছেন, তাই আমাদের নিকট সুনত। এ জন্যই কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে কোনো কোনো নামাজ تَطَوُّعٌ বা মানদুব ইত্যাদি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলোই আমাদের মতে সুনত। وَدَعَا وَدَعَا একটি দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : হযরত ইবনে ওমর এবং পূর্বোল্লিখিত হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, জোহরের পর দু' রাকাত সুনত। অথচ আবু দাউদ শরীফে উম্মে হাবীবা হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (رض.) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَن حَانَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জোহরের পর চার রাকাত সুনত। এখন উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধানকল্পে মুহাদ্দিসগণ বলেন, জোহরের পর দু' রাকাত অথবা চার রাকাত পড়া যে বৈধ, এটা সাব্যস্ত করার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ধরনের আমল করেছেন।

অথবা বলা যায় যে অধিকাংশ সন্থী হাদীসে জোহরের পর দু' রাকাত সুনতের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দুই রাকাত বিশিষ্ট হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অথবা এর সমাধান হলো, যে সমস্ত রেওয়ায়েতে জোহরের পর চার রাকাত সুনতের উল্লেখ রয়েছে এর মধ্যে দু' রাকাতকে সুনতে মুয়াক্কাদা এবং বাকি দু' রাকাতকে গায়ের মুয়াক্কাদা ধরতে হবে। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো কোনা تعارض বা দ্বন্দ্ব থাকে না।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৯৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার পরে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়তেন না। অতঃপর ঘরে এসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَخْبَلًا أَيْتَمَةً نِسِ عَدَدِ السَّنَنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَطَرِيقَةَ آدَابِهَا জুমার পরে সুনতের রাকাত ও তা আদার করার ব্যাপারে মতভেদ : জুমার নামাজের পর কত রাকাত সুনত পড়তে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

مَدْعَبُ السَّانِيَةِ وَأَمْعَدُ وَالسَّخِيمِ : ইমাম শাফেরী, আহমদ, ইব্রাহীম নাখরীসহ কিছুসংখ্যক আদিমের মতে জুমার পর সুনত দু' রাকাত আর তা গৃহে পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো-

- (১) عَنْ أَبِي عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ -
 (২) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য অপর বর্ণনানুযায়ী জুমার পরে যত বেশি নামাজ পড়বে ততই উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য অপর বর্ণনানুযায়ী জুমার পরে যত বেশি নামাজ পড়তে হবে। তবে প্রথমে দু' রাকাত এবং পরে এক সালামে চার রাকাত পড়তে হবে। তারা নিম্নের হাদীসগুলো দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন-

- (১) عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)
 (২) رَوَى إِسْحَقُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عُمَرَ (رض) الْجُمُعَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ -

ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ছয় রাকাত। তবে তাঁরা বলেন যে, প্রথমে চার রাকাত এবং পরে দু' রাকাত পড়তে হবে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজের মধ্যে সমঝই সাধিত হবে। কেননা, তাঁর বাণী এভাবে বর্ণিত হয়েছে عَنْ أَبِي عُمَرَ - قَالَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَرَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا وَرَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ - এবং তাঁর আমর সম্পর্কে বলা হয়েছে- عَنْ جُرَيْشِ بْنِ مَحْرَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَواتِهِمْ

অর্থাৎ, কোনো নামাজের পরে তার সমপরিমাণ অন্য নামাজ পড়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন। তাই জুমার ফরজ দু'রাকাতের পরে প্রথমে সুন্নত দু'রাকাত না পড়ে বরং সুন্নত চার রাকাত আগে পড়বে।

ইমাম আজম, ইসহাক, আলকামা ও নাখয়ীর মতে জুমার পর এক সালামে চার রাকাত পড়বে। তার দলিল-

- (১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) مَرْفُوعًا مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
 (২) عَنْ أَبِي سَعْدٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)
 জুমার সুন্নত মাসজিদে পড়তে হবে, না ঘরে : অধিকাংশ ইমামদের মতে জুমার পরের সুন্নত মাসজিদে না পড়ে নিজ গৃহে পড়াই উত্তম। ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক এবং আহমদ (র.) প্রমুখ এ মতই বাজ্ঞ করেছেন। তাদের দলিল হলো নিম্নের হাদীসটি-

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ صَلَوةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার পরের সুন্নত নিজ গৃহে পড়তেন।

عَنْ ١٠٩٤
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
 قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) عَنْ صَلَوةِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ
 يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
 يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ
 فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
 الْمَغْرِبِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ

১০৯৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তিনি আমার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয়ে গিয়ে লোকদেরকে নামাজ পড়াতেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। রাসূল ﷺ লোকদেরকে মাগরিবের নামাজ পড়াতেন, অতঃপর ঘরে এসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর

يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي
فِيصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ
اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ وَكَانَ
يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا
قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ
وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ
وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ صَلَّى
رَكَعَتَيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ
يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ)

লোকদেরকে এশার নামাজ পড়াতে। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। আর তিনি রাতে নয় রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে বিতর নামাজও থাকত। তিনি কোনো কোনো সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় বসেও নামাজ পড়তেন। কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে কেবল পাঠ করতেন তখন রুকু সিজদাও দাঁড়িয়ে করতেন এবং যখন বসে বসে কেবল পাঠ করতেন তখন রুকু সিজদাও বসেই করতেন। আর যখন সুবহে সাদেক অর্থাৎ আকাশে উষার আবির্ভাব হতো, তখন তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। —মুসলিম। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এ কথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং লোকদেরকে ফজরের নামাজ পড়াতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে ঈদু ও সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ যখন যে অবস্থায় কেবল পাঠ করতেন তখন ঐ অবস্থা হতেই রুকু ও সিজদা করতেন। অপর দিকে হযরত উরওয়ার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উরওয়া একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে হজুরের নামাজের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, “মহানবী ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর কখনো কখনো বসে বসে কেবল পাঠ করতেন। যখন সূরার ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তিনি তখন দাঁড়াতে এবং দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট অংশগুলো পাঠ করতেন, তারপর রুকু সিজদা করতেন।” এটা হতে উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর জবাবে বলা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীকের হাদীসে কেবল বলতে পূর্ণ কেবল বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ কেবল দাঁড়ানো অবস্থায় পাঠ করে শুধু রুকু বা সিজদার সময় বসতেন না। আবার সম্পূর্ণ কেবল বসা অবস্থায় পাঠ করে শুধু রুকু ও সিজদার জন্য দাঁড়াতে না। মূলত নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করে কেবলতের কিছু অংশ পাঠ করে অতঃপর বাকি অংশ পাঠের জন্য বসে যাওয়া এবং সে বসা অবস্থায় রুকু-সিজদা করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে বসা অবস্থায় নামাজ ও কেবলত শুরু করে পরে দাঁড়িয়ে বাকি অংশ পাঠ করে সে অবস্থা হতে রুকু সিজদা করাও জায়েয আছে। মোটকথা, মহানবী ﷺ সাধারণত তিন অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন। যথা—

১. অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন এবং দাঁড়ানো অবস্থা হতেই রুকু-সিজদা করতেন।
২. বসে বসে নামাজ আদায় করতেন এবং সেই অবস্থা হতেই রুকু সিজদা করতেন।
৩. বসে নামাজ আরম্ভ করতেন এবং কেবলত শেষে দাঁড়িয়ে কিছু পাঠ করে রুকু সিজদা করতেন। আবার দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করতেন এবং শেষলগ্নে বসে যেতেন এবং কেবলতের কিছু অংশ পাঠ করে রুকু সিজদা করতেন। বলা যায় অত্র আলোচনার ফলে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো ঈদু বা বিরোধ নেই।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে রাতের নামাজ বলতে তাহাজ্জদের নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ বিষয় পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

وَعَنْتَ ١٠٩٥ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ لَمْ
يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا
مِنْهُ عَلَى رُكْعَتِي الْفَجْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ নফল নামাজসমূহের মধ্যে
সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতেন ফজরের পূর্বের দু' রাকাত
নামাজের প্রতি। অর্থাৎ ঐ নামাজ তিনি সর্বদাই পড়তেন।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْتَ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেননা এ
দু' রাকাত কষ্টকর সময়ে পড়া হয়। তাই এ দু' রাকাত নামাজ অন্যান্য সকল সুন্নত ও নফল হতে গুরুত্ববহ। সুন্নতসমূহের
মধ্যে সর্বাঙ্গীক্ষা অধিক মুয়াক্কাদা সুন্নত হলো ফজরের পূর্বের দু' রাকাত সুন্নত। তারপর দু' রাকাত এবং জোহরের
পূর্বে চার রাকাত।

وَعَنْهَا ١٠٩٦ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا
وَمَا فِيهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৯৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ফজরের
পূর্বের দু' রাকাত নামাজ দুনিয়া ও উহার সমস্ত জিনিস হতে
উত্তম। -[মুসলিম]

وَعَنْتَ ١٠٩٧ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رَض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ
شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً -
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল
(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ
বলেছেন- তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ
পড়ো, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়ো,
কিন্তু তৃতীয়বার বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এটা
তিনি এজন্য বলেছেন, যাতে মানুষ সেই দুই রাকাত
নামাজকে সুন্নত [মুয়াক্কাদা] না বানিয়ে ফেলে। -[বুখারী ও
মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْتَ হাদীসের ব্যাখ্যা : মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মাগরিবের
ফরজের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়া জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—
عَنْتَ হাদীসের ব্যাখ্যা : একদল সাহাবী, তাবেয়ী ও ফকীহের মতে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ
মোত্তাহাব। ইবনে বাত্তাল বলেন, ইমাম আহমদ ও ইসহাকেরও এটাই অভিমত। ইবনে হাযম বলেন, সাহাবী হযরত আব্দুর
রহমান ইবনে আওফ, আনাস, উবাই ইবনে কা'ব ও জাবের (রা.) প্রমুখও এটাই বলতেন। আলোচ্য হাদীসকেই তাঁরা
আমলযোগ্য মনে করতেন।

عَنْتَ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত
সুন্নত নেই। তাঁরা নিজেদের অনুকূলে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেন—

১. আবু দাউদে হযরত তাউস হতে বর্ণিত আছে যে, (رض) سَيْلُ ابْنِ عَمْرٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ التَّغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا سَمَّارَةً جِئْتُهَا سَاحِرًا هَلْ تَعْلَمُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ একবার হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে মাশরিবের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মহানবী ﷺ-এর যুগে আমি কাউকে এ দু' রাকাত পড়তে দেখিনি।
২. আবু বকর ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, اِخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيهِ وَكَمْ يَنْعَلُهُ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ. উল্লিখিত নামাজের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ পড়েছেন, আবার কেউ পড়েননি। কিন্তু তাবেরীদের কেউই পড়েননি।
৩. ইবরাহীম নাখরী বলেছেন, কুফার শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ যথা- হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, আন্নার, আবু মাসউদ প্রমুখ কাউকে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত পড়তে দেখেনি। মোটকথা, খোলাফায় রাশেদাহসহ সাহাবীদের এক বিরাট জামাত এ নামাজ পড়েননি। অপরদিকে এটা পড়তে গেলে একদিকে মাগরিবের ফরজ নামাজের দেরি হবে, অথচ এ নামাজের সময় বুঝই সংকীর্ণ। অথবা ইমামের সাথে ডাকবীরে উলায় শরিক হওয়াই সম্ভব হবে না। এমনকি অনেক সময় ইমামের সাথে ফরজ নামাজের অধিকাংশ পড়া হতে বঞ্চিত হতে হবে। কাজেই ইবনে মুগাফফালের হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ নামাজ পড়া হতো। কেউ কেউ পড়তেন, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। যেমন উনাইদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আযান ও একামতের মধ্যখানে নামাজ আছে, কিন্তু মাগরিবে নেই।
- * ইবনুল আরাবীও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসকে রহিত হওয়ার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ سِنَّةٌ كَثَاتِيرٌ অর্থ হলো- شَرِيْعَةٌ وَطَرِيقَةٌ لِأَرْبَعَةٍ তা এমন আমল বা কাজ, যা ফরজের সমপর্যায় পড়ে। তথা মানুষ যাতে একে অত্যাবশ্যকীয় মনে না করে।

وَعَنْ ١٠٩٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَصِلْ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

১০৯৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুমার নামাজের পরে নামাজ পড়ে সে যেন চার রাকাত নামাজ পড়ে। -[মুসলিম]

তার অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাজ আদায় করে, সে যেন তারপর চার রাকাত নামাজ পড়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٠٩٨ هَادِئَةَ هাদীসের ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি জুমার ফরজের পর চার রাকাত সুন্নতের প্রমাণ বহন করেছে। এয় অনুকূলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও একটি মত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ছয় রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, প্রথমত চার রাকাত এবং পরে দু' রাকাত পড়বে। কেননা জুমার পর এর সম রাকাত বিশিষ্ট কোনো নামাজ পড়া উচিত নয়; এ সম্পর্কে বিতারণিত আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে কতক শাফেয়ী মতালমী বলেন, জুমার ফরজের পূর্বে কোনো সুন্নত নামাজ নেই। তাঁরা বলেন, এটা বিদ'আত। মূলত এই অভিমত ঠিক নয়। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا -

عَنْ ابْنِ سَعْدٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

এ সমস্ত হাদীস বিদ্যমান থাকার কতক শাফেয়ী মতালমীদের অভিমত সঠিক হতে পারে না। -[মিরকাত]

الفصل الثاني : ١٠٩٩

عَنْ ١٠٩٩ أُمِّ حَبِيبَةَ (رض) قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ
عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ
بَعْدَهَا حَرَمَهُ عَلَى النَّارِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১০৯৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি জোহরের [ফরজের] পূর্বের চার রাকাত ও পরে চার রাকাত নামাজ [অর্থাৎ দু' রাকাত সন্নতে মুয়াক্কাদা আর দু' রাকাত মোস্তাহাব] নামাজের হেফাজত করে [অর্থাৎ খুব যত্ন সহকারে নিয়মিত আদায় করে] তাকে [স্পর্শ করা] আত্মাহ তা'আলা দোজখের আগুনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।- [আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١١٠٠ هَادِيسَةٍ بِرِوَايَةِ : আলোচ্য হাদীসে জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাতের কথা বলা হয়েছে। মূলত জোহরের পর দু' রাকাত সন্নতে মুয়াক্কাদা আর অবশিষ্ট দু' রাকাত মোস্তাহাব।

عَنْ ١١٠٠ ابْنِ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تَفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ - (رَوَاهُ ابُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১০০. অনুবাদ : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জোহরের [ফরজের] পূর্বে চার রাকাত নামাজ যার মধ্যখানে কোনো সালাম নেই [অর্থাৎ এক সালামে চার রাকাত নামাজ] এ নামাজের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়।- [আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

عَنْ ١١٠١ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاجِبٌ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِ عَمَلٌ صَالِحٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন, এটা এমন একটি সময় যাতে [রহমত নাজিলের জন্য] আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। সুতরাং আমি ভালো মনে করি যে, এ সময় আমার একটি ভাল কাজ তথায় উঠিয়ে নেওয়া হোক।- [তিরমিযী]

عَنْ ١١٠٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجِمَ اللَّهُ أَمْرًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا -

১১০২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আসরের [ফরজের] পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়ে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ الْحَدِيثِ ১১০৩. হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে যে চার রাকাতের কথা বলা হয়েছে তা সুন্নত হিসাবে গণ্য কবতে হবে।

وَعَنْ ۱۱۰۳. عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْضِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের [ফরজের] পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। এ চার রাকাতের মধ্যখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের ও তাঁর অনুসারী বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে বিভক্ত করতেন। [অর্থাৎ দুই সালামে চার রাকাত পড়তেন।] —[তিরমিধী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ الْحَدِيثِ ১১০৪. হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন এবং প্রত্যেক দু' রাকাতের মধ্যখানে নিকটবর্তী ফেরেশতাদের ও বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে বিভক্ত করতেন। ইমাম বাগাবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত 'তাসলীম' শব্দ দ্বারা সালাম উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা তাশাহুদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁর মতে রাসূল ﷺ এক সালামেই চার রাকাত শেষ করতেন। আর দু' দু' রাকাত করে পড়তেন এ কথা গ্রহণ করলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূল ﷺ এ নিয়মেই নামাজ পড়তেন।

وَعَنْ ۱۱۰৪. عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১০৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পূর্বে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। —[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ الْحَدِيثِ ১১০৫. হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ আসরের পূর্বে কখনো দু' রাকাত আবার কখনোও চার রাকাত নফল নামাজ পড়েছেন। অথবা চার রাকাতকে সুন্নতে যায়েদা এবং দু' রাকাতকে তাহিয়াতুল মসজিদও বলা যায়।

وَعَنْ ۱۱۰৫. أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُورَةٍ عِدْلَنْ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَنْعَمٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَفَهُ جَدًّا)

১১০৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নামাজ পড়েছে এ নামাজগুলোর মধ্যখানে কোনো মন্দ কথা বলেনি তার সেই নামাজগুলো বারো বছরের [নফল] ইবাদতের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে। —[তিরমিধী]

তিরমিধী আরও বলেন যে, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমি ওমর ইবনে আবু খাসয়াম রাবী ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনা সূত্র হতে জানতে পারিনি এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বশতে শুনেছি যে, হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এ রাবী মুনকার অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি এ রাবীকে নেহায়েত যরীফ অভিহিত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : এ নামাজকেই 'আওয়াবীন' নামাজ বলা হয়ে থাকে। হাদীসে কোথাও এ নামাজকে এ নামে উল্লেখ করা হয়নি; বরং চাশতের নামাজকেই 'সালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়েছে। তবে বুজ্জর্গানে দীন এ নামাজ সব সময় পড়েন। মিরকাত প্রণেতা বলেন, مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মাগরিবের দু' রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাও এ ছয় রাকাতের অন্তর্ভুক্ত।

عُدْلُ لَهُ بِعِبَادَةِ بِنْتِي عَمْرَةَ سَنَةً -এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের ফরজের পর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একমুচিগ্রে ছয় রাকাত নামাজ পড়ল, তার সে নামাজ বারো বছরের নফল ইবাদতের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে। আল্লাহ মা তীবী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা মূলত নফল ইবাদত পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য। কারো মতে এ হাদীসের উদ্দেশ্য: এটাও হতে পারে যে, অল্প ছওয়াবকে অধিক ছওয়াবে পরিণত করা হবে। এটা ছাড়াও অনেক অভিমত পাওয়া যায়।

وَعَنْ ۱۱۰۬ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَعْدَ
الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর বিশ রাকাত [নফল] নামাজ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। -[তিরমিথী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটিতে মাগরিবের পরে বিশ রাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়ে, তার জন্য আল্লাহ রাকুল আলামীন জ্ঞান্নাতে একখানা গৃহ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য এ সমস্ত হাদীস দ্বারা নফল নামাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই উদ্দেশ্য, তবে হাদীস বিশারদদের মতে উল্লিখিত হাদীসটি যঈফ পর্যায়ের।

وَعَنْ ۱۱۰۷ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ
إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১০৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এশার নামাজ পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি চার রাকাত কিংবা ছয় রাকাত নামাজ পড়তেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রসিদ্ধ রেওয়ায়তসমূহে এশার নামাজের পর হযরত আয়েশার ঘরে হজুর ﷺ দু' রাকাত নামাজ পড়তেন এটাই বর্ণিত আছে, ছয় বা চার রাকাতের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীসে 'এশা' অর্থ মাগরিব হবে। কেননা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা মাগরিবকে 'প্রথম এশা' এবং এশাকে 'দ্বিতীয় এশা' বলতো। এ হিসাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস এ কথার সমর্থন করে যে, হজুর ﷺ মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়ার জন্য লোকদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অথবা এটা এশার পরে হজুরের কোনো কোনো সময়ের আমল হতে পারে; নিত্যকার আমল ছিল দু' রাকাত।

وَعَنْ ۱۱۰۸ **عَبَّاسِ بْنِ عَبَّاسٍ** (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ بَارَ النَّجُومَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِذْ بَارَ السُّجُودِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— [কুরআনে পাকের সূরা তুরে] তারকারাজির অন্ত যাওয়ার কালে যেই إِذْ بَارَ النَّجُومَ নামাজ আদায় করার কথা বলা হয়েছে, তা হলো ফজরের [ফরজের] পূর্বের দু' রাকাত এবং إِذْ بَارَ السُّجُودِ অর্থাৎ সূরায়ে কাফে নামাজের পর যে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো মাগরিবের ফরজের পর দু' রাকাত সুন্নত।—[তিরিমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

النُّجُومُ অর্থ— তারকাসমূহ। إِذْ بَارَ : এর মর্মার্থ : إِذْ بَارَ : শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ : এর মাসদার। এর অর্থ হলো— প্রস্থান করা, গমন করা। النَّجُومُ অর্থ— তারকারাজি। শব্দটি কুরআন মাজীদে অর্থাৎ তারকারাজির প্রস্থান হতে আনয়ন করা হয়েছে। যেন— আল্লাহ তা'আলা বলেন, (الطور) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَإِذْ بَارَ النَّجُومَ - অর্থাৎ "আর আপনি [নিদ্রা হতে] উঠার সময় নিজ রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করুন এবং রাতেও তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর নক্ষত্ররাজির অন্তের পরও।"—[তুর]

রাতে শেষভাগে তারকারাজির আলো স্কীণ হয়ে আসতে থাকে। মনে হয় যেন গগন থেকে তারকারাজি বিদায় নিচ্ছে। অতএব إِذْ بَارَ النَّجُومِ দ্বারা এখানে ফজরের সুন্নতকে বুঝানো হয়েছে।
السُّجُودِ : এর অর্থ : إِذْ بَارَ السُّجُودِ অর্থ— সিজদার পর। আর এখানে السُّجُودِ দ্বারা মাগরিবের নামাজ উদ্দেশ্যে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَإِذْ بَارَ السُّجُودِ

উপরে বর্ণিত হাদীসে إِذْ بَارَ السُّجُودِ দ্বারা মাগরিবের সুন্নত নামাজকে বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّالِثُ

عَنْ ۱۱০৯ **عُمَرَ** (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحَسَّبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحْرِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَسْبِغُ اللَّهُ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ يَتَفَيَّؤُ ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِرَبِّهِ وَهُمْ دَاجِرُونَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَسَاكِرَ) فِي شُعَيْبِ الْإِيمَانِ

১১০৯. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন— [জোহরের নামাজের পূর্বে] সূর্য হলে যাওয়ার পরে চার রাকাত নামাজ ছুওয়াবের বেলায় শেষ রাতের চার রাকাত [তাহাজ্জুদ] নামাজের সমান। ঐ সময় কোনো বস্তুর আশ্রয় তাগাবীহ পাঠ ব্যতীত থাকে না। অতঃপর রাসূল ﷺ আয়াত পাঠ করলেন, অর্থাৎ "তারা কি আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করে না? যার ছায়াসমূহ ডানে ও বামে ঢলে থাকে আল্লাহর সিজদায়, আর তাঁরই বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে।"—[তিরিমিযী]। বায়হাকী এ হাদীস শু'আবুল ইমানে উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّرَادُ بِصَلْوَةِ السَّرِّ নামাহের নামাজ ঘারা উদ্দেশ্য : 'সালাতুস সাহর' ঘারা অধিকাংশ ওলামার মতে তাহাজ্জুদ নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা এ শব্দটি [সাহর]-এর অর্থ বুঝানোর জন্য বেশি উপযোগী। সিফরুস সা'আদাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আট রাকাত নামাজ পড়তেন এবং তিনি বলতেন এ নামাজ রাতে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার ছওয়াবের সমতুল্য। এর ঘারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'সালাতুস সাহর' অর্থ তাহাজ্জুদের নামাজই। কেননা 'কিয়ামুল লাইল' ঘারা তাহাজ্জুদ বা 'সালাতুল লাইল' বুঝানো হয়ে থাকে; সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে 'সূর্য হেলে পড়ার পর আদায়কৃত চার রাকাত নামাজ ছওয়াবের দিক থেকে তাহাজ্জুদ নামাজের সমান।'

কোনো কোনো ইমাম এর অন্তর্নিহিত এ রহস্য বর্ণনা করেছেন যে, দিবসের অর্ধেকের পর এবং রাতের অর্ধেকের পর [শেষ রাত পর্যন্ত] এ দুই সময়ে আত্মাহূর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে, কাজেই এ দুই সময় নামাজ পড়লে ছওয়াবও উভয় নামাজের সমান হবে।

আত্মামা জীবী (র.) বলেন, কারো মতে [সালাতুস-সাহর] অর্থ-ফজরের দু' রাকাত সুন্নত ও দু' রাকাত ফরজ। তখন হাদীসটির অর্থ হবে, ষি-এহরের সূর্য ঢলে পড়লে তখনকার চার রাকাত নামাজ ফজরের সুন্নত ও ফরজের সমান ছওয়াবের মর্যাদা রাখে। তবে আমরা পূর্বেই বলেছি, 'তাহাজ্জুদ' হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ
مَا تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي
رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ
مَاتَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ .

১১১০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর আমার ঘরে দু' রাকাত নামাজ পড়া কখনো ত্যাগ করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম] বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই সন্তার কসম, যিনি তাকে নিয়ে গেছেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّرَادُ بِصَلْوَةِ السَّرِّ হাদীসসমূহের মধ্যে ঘদ্দ ও তার সমাধান : অনেক হাদীসে এ কথা রয়েছে যে, নবী ﷺ তাঁর উম্মতকে আসরের পর নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ উক্ত হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুমূর ﷺ নিতাই আসরের পরে দু' রাকাত নফল পড়তেন। এর সমাধানে হযরত উম্মে সালামার হাদীসের আলোকে কেউ কেউ বলেন, একবার হুমূর ﷺ-কে উক্ত দু' রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, আব্দুল কায়েস গোম্বের কয়জন প্রতিনিধি আমার নিকট এসেছিল, তাদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম বিধায় জোহরের পরে দু' রাকাত মুযাক্কাদা তখন পড়তে পারিনি। সুতরাং আসরের পরে তা আদায় করে নিলাম। আবার কারো মতে জোহরের পরে হুমূর ﷺ গনিমতের মাল বিতরণ করতে বসে গেলেন ফলে দু' রাকাত সুন্নত পড়তে পারেননি আসরের পরে তা আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের ওলামাদের কথা হলো, উল্লিখিত কারণে জোহরের সুন্নতকে আসরের পরে পড়ে থাকলেও বহু হাদীসের ঘারা প্রমাণিত যে, তিনি সর্বদাই তা পড়তেন। এটা ছিল তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। কাজেই বলতে হবে যে, আসরের পরে দু' রাকাত পড়া শুধু তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়েছে।

وَعَنْ ۱۱۱۱ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلَيْلٍ
(رَحْمَةً) قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رَضِيَ
عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ
عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ
الْعَصْرِ وَكُنَّا نَصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا قَالَ كَانَ
يَرَانَا نَصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ
يَنْهَنَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১১১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মুখতার ইবনে
ফুলফুল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে আসরের পরে
নফল নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি
বললেন, হযরত ওমর (রা.) যারা আসরের পরে নামাজে
দাঁড়াতেন, তাদের হাতে আঘাত করতেন [অর্থাৎ তিনি
আসরের পরে নামাজ পড়তে নিষেধ করতেন]। অথচ
আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পরে মাগরিব
নামাজের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়তাম। [রাবী বলেন,]
অতঃপর আমি হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম,
রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ দু' রাকাত নামাজ পড়তেন? তিনি
বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঐ দু' রাকাত নামাজ
পড়তে দেখতেন অথচ তিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন
না, নিষেধও করতেন না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দু'টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর
দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। যে কারণেই হোক এটা একমাত্র তাঁর জন্যই বাস ছিল। উম্মত মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য
নয়। সম্ভবত হযরত ওমর (রা.) এ কারণেই আসরের পরে নামাজ আদায়কারীদেরকে নিষেধ করতেন। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে
কেরাম সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের ফরজের পূর্বে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল;
কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ۱۱۱۲ أَنَسِ (رَضِيَ) قَالَ كُنَّا
بِالْمَدِينَةِ فَرَأَا أَدْنَ الْمُؤَدِّنِ لَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ
إِنْتَدَرُوا السَّوَارِي فَرَكَعُوا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى
أَنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ
فِيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ
كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১১২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমরা তখন মদীনাতে ছিলাম, যখন মুয়াজ্জিন
মাগরিবের নামাজের আযান দিত, তখন লোকেরা তাড়াহুড়া
করে মসজিদের ঝুঁটিসমূহের দিকে যেতেন এবং দু'
রাকাত নামাজ পড়তেন। এমনকি কোনো নবাগত
আগন্তুক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করলে সে
নামাজরতদের সংখ্যাধিক্য দেখে মনে করত যে, সম্ভবত
জামাত শেষ হয়ে গেছে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মাগরিবের পূর্বে যে দু' রাকাত নামাজ পড়া হতো তা
ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। পরবর্তীকালে তা ইজমারে উম্মতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(رَحْمَةً) قَالَ أَتَيْتُ عَقِبَةَ الْجَهَنِّيَّ (رَضًا)
فَقُلْتُ أَلَا أَعَجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ
رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّا
كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১১৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সাহাবী হযরত উকবা আল-জুহানী (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি কি আপনাকে [তাবেয়ী] আবু তামীম সম্পর্কে [একটি আজব ঘটনা শুনিয়ে] বিশ্বয়ে ফেলব না? তিনি মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়ে থাকেন। তখন হযরত উকবা (রা.) বললেন, আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এ রকম করতাম। আমি বললাম, তা হলে এখন তা করতে আপনাকে কিসে বারণ করল? তিনি বললেন দুনিয়াদারীর কর্মব্যস্ততা। -[বুখারী]

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ إِنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ
الْأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا
قَضَا صَلَاتَهُمْ رَأَاهُمْ يَسْبِحُونَ بَعْدَهَا
فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْبَيَّوتِ - (رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ
قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيَّوتِ)

১১১৪. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ বনি আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে আগমন করলেন এবং সেখানে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। লোকেরা যখন নামাজ শেষ করল, তখন রাসূল ﷺ দেখলেন যে, তারা সকলেই নামাজের পরে নফল নামাজ পড়তে শুরু করেছে, তখন রাসূল ﷺ বললেন, এটা তো ঘরের নামাজ। -[আবু দাউদ। তিরমিযী ও নাসায়ীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, কিছু লোক নফল নামাজ পড়তে দাঁড়াল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এই নামাজ ঘরে পড়া উচিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيَّوتِ ঘরে নামাজ পড়ার হুকুম : ঘর বেশি দূরে না হলে কিংবা ঘরে কোনো প্রকার অসুবিধা না থাকলে সুন্নত, নফল ইত্যাদি নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম। অপর এক হাদীসে এসেছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থান বানাও না। অর্থাৎ কবরস্থানে যেক্রপ নামাজ পড়া হয় না, অনুরূপভাবে তোমাদের ঘর সমূহকেও নামাজ হতে খালি রেখ না। এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, ফরজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম।

এর ব্যাখ্যা : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে আগমন করে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। ফরজ শেষে নফল নামাজ পড়তে দেখে রাসূল ﷺ লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এটা তো ঘরের নামাজ। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইলেন যে, কোনো অসুবিধা না থাকলে নফল নামাজ ঘরে পড়াই শ্রেয়। কেননা ঘরে বসে একাকী নফল নামাজ পড়লে রিযা বা অহম্মার জাহত হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না; বরং বেশি একগ্রহতা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মসজিদে বসে বহু লোকের মধ্যে নফল নামাজ আদায় করলে স্বভাবত আত্মগর্ভ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই রাসূল ﷺ বলেছেন, هَذِهِ صَلَاةُ الْبَيَّوتِ, অর্থাৎ এটাতো ঘরের নামাজ।

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ (رَضًا) قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ
أَهْلُ الْمَسْجِدِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কখনও কখনও] মাগরিবের পর দু' রাকাত নামাজে কেবল এত দীর্ঘ করতেন যে, ততক্ষণে মসজিদের লোকজন চলে যেত। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَرَّحَ الْعَيْنِ هাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্নত ও নফল নামাজ মসজিদে পড়াও জায়গা আছে।

وَعَنْ أَبِي مَكْحُولٍ يَبْلُغُ بِهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ
الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي
رَوَايَةٍ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَوَتُهُ فِي
عِلِّيَّينَ مَرْسَلًا .

১১১৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মাক্হুল (র.) নিম্নোক্ত বর্ণনাকে মুরসাল হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের [ফরজের] পরে কোনো কথাবার্তা বলার পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়ে, অন্য বর্ণনায় আছে, চার রাকাত নামাজ পড়ে তার এ নামাজ 'ইল্লিয়ীনে' উঠানো হয়। -[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عِلِّيَّينَ শব্দটি মু'মিনদের আত্মা ও আমলনামা রাখার জায়গার নাম। عِلِّيَّينَ শব্দটি এর ব্যাখ্যা : رُفِعَتْ صَلَوَتُهُ فِي عِلِّيَّينَ -এর ব্যাখ্যা : মু'মিনদের আত্মা ও আমলনামা রাখার জায়গার নাম। عِلِّيَّينَ শব্দটি এর ব্যাখ্যা : رُفِعَتْ صَلَوَتُهُ فِي عِلِّيَّينَ -এর ব্যাখ্যা : মু'মিনদের আত্মা ও আমলনামা রাখার জায়গার নাম। عِلِّيَّينَ শব্দটি এর ব্যাখ্যা : رُفِعَتْ صَلَوَتُهُ فِي عِلِّيَّينَ -এর ব্যাখ্যা : মু'মিনদের আত্মা ও আমলনামা রাখার জায়গার নাম।

وَعَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ
فَكَانَ يَقُولُ عَجَلُوا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُمَا تَرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ .
(رَوَاهُمَا رِزِينَ وَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الزِّيَادَةَ
عَنْهُ نَحْوَهَا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

১১১৭. অনুবাদ : হযরত হুয়াইফা (রা.)ও পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এটা বর্ণিত করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলতেন, তোমরা মাগরিবের পরের দু' রাকাত শীঘ্রই পড়বে। কেননা এ দু' রাকাতও ফরজের সাথে উপরে উঠানো হয়। -[এই দু'টি হাদীসকে রাযীন বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীও বর্ণিত অংশটুকু উক্ত রাযী হতে অদ্রপভাবে ও আবুল ইমান এত্বে বর্ণনা করেছেন।]

عَنْ ۱۱۱۸
عَمْرُو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ إِنَّ
نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ
يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي
الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ
فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ
فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ
إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعْدُ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ
الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّيَهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى
تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا
بِذَلِكَ أَنْ لَا نُصَلِّ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ
أَوْ نَخْرُجَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১১৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আমার ইবনে আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [তাবেয়ী] হযরত নাফে' ইবনে জুবাইর (র.) তাকে [অর্থাৎ আমরকে] সাহাবী হযরত সায়েব (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, তাঁর [সায়েবের] নামাজ সম্পর্কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যা দেখেছিলেন বলে জনশ্রুতি বা কথিত আছে, তা সত্য কি না? জবাবে হযরত সায়েব বললেন, হ্যাঁ। একবার আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে 'মাকসুরায়' জুমার নামাজ পড়লাম। যখন ইমাম সালাম ফিরালেন আমি আমার ফরজ পড়ার স্থানেই দাঁড়িয়ে সন্নত নামাজ আদায় করলাম। যখন তিনি [মুয়াবিয়া] ঘরে চলে গেলেন, তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আপনি যা করলেন তা আর পুনরায় করবেন না। যখন আপনি জুমার নামাজ পড়বেন এর সাথে অন্য কোনো সন্নত বা নফল নামাজ মিলিয়ে পড়বেন না, যতক্ষণ না কোনো কথাবার্তা বলেন অথবা তথা হতে অন্য স্থানে চলে না যান। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন এক নামাজকে অপর নামাজের সাথে মিলিয়ে না পড়ি, যতক্ষণ না মধ্যখানে কিছু কথাবার্তা বলি অথবা সেই স্থান হতে অন্যত্র চলে যাই। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱۱১৯
عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمْرِو
إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا وَإِذَا
كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ
إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ

হাদীসের ব্যাখ্যা : মাকসুরাহ হলো মসজিদের ভিতরে নিরাপদ প্রকাঠ। আমিরদের জন্য মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান। খোলাফায় রাশেদার পরে হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-ই সর্বপ্রথম এই প্রথা চালু করেন, যাতে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। আলোচ্য হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো ফরজ, সন্নত ও নফলের মধ্যখানে কিছুটা বিরতি দেওয়া। যেন ফরজের সমান গুরুত্ব সন্নত নফলে দেওয়া না হয়।

১১১৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যখন মক্কাতে জুমার [ফরজ] নামাজ পড়া শেষ করতেন [নিজের স্থান হতে] তখন কিছুটা সামনে অগ্রসর হতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর আরও কিছু আগে বাড়তেন এবং চার রাকাত নামাজ পড়তেন। আর যখন তিনি [নিজ স্থায়ী আবাস] মদীনায় থাকতেন, তখন তিনি জুমার [ফরজ] নামাজ পড়ে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন

فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي
 رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى
 بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ
 ذَلِكَ أَرْبَعًا)

করতেন। অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়তেন, মসজিদে
 তিনি নামাজ পড়তেন না। তাঁর নিকট এর কারণ জানতে
 চাওয়া হলে [তিনি সুন্নত মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়তেন
 কেন?] জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ
 করতেন। -[আবু দাউদ। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় এ
 শব্দগুলো রয়েছে যে, রাবী হযরত আতা (র.) বলেন,
 হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে জুমার [ফরজের] পরে
 প্রথমে দু' রাকাত, তারপর চার রাকাত নামাজ পড়তে
 দেখেছি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার নামাজের পরে সুন্নত কত রাকাত : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমার পরে সুন্নত ছয় রাকাত। প্রথমে দুই ও
 পরে চার রাকাত। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর এক বর্ণনায় আছে, জুমার পর সুন্নত ছয় রাকাত। এ বর্ণনা অনুসারে ইমাম
 আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, জুমার পরে সুন্নত ছয় রাকাত, তবে অন্যান্য হাদীসে দেখা যায় যে, হুজুর ﷺ প্রথমে চার
 রাকাত ও পরে দু' রাকাত পড়তেন। আমরা হানাফীরা এভাবে আমল করে থাকি। বস্তুত এটাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা অন্য
 হাদীসে আছে, ফরজের পরে তদ্রূপ রাকাত বিশিষ্ট নামাজ নেই, সুতরাং জুমার ফরজ দু' রাকাত শেষ করে সুন্নত চার রাকাতই
 আগে পড়তে হবে। অন্যথা 'ফরজ ও সুন্নত' একই রকম হয়ে যাবে। অথচ এরূপ হওয়া মাকরুহ। উল্লেখ্য যে, জুমার পরের
 সুন্নতসমূহ ঘরে পড়াই উত্তম।

بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের নামাজ

صَلَاةِ اللَّيْلِ বারা তাহাজ্জুদ ও বিতরের নামাজ বুঝানো হয়, তবে এখানে সালাতুল লাইল বলতে তাহাজ্জুদের নামাজ উদ্দেশ্য। কেননা রাতের শেষভাগে নীরব নিতক্ক পরিবেশে এ নামাজ পড়া হয়।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলতঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল। মহানবী ﷺ এ নামাজ সর্বদাই পড়তেন, কিন্তু উম্মতের উপর কষ্টকর হবে বিধায় পরবর্তীতে এর ফরযিয়্যাত রহিত করা হয়। তথাপি এর গুরুত্ব ও ফজিলত আদৌ কমেনি। যেমন—আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন, **وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ** অর্থাৎ, আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ুন। এটা হবে আপনার জন্য অতিরিক্ত। যারা সর্বদা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** অর্থাৎ, তারা রাতে খুব কমই ঘুমাতো এবং তারা রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। অপর আয়াতে এসেছে যে, **تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَامِعِ** তথা খোদাতীকদের পার্শ্বদেশ বিহানো হতে পৃথক থাকে। এ ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, নিজে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ হচ্ছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱۲ عَائِشَةَ (رَضَا) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْقِعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقْبِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَدِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এশার নামাজ সম্পন্ন করার পর হতে ফজর নামাজ পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দু' রাকাতের পরে সালাম ফিরাতেন। [এর মধ্যে কোনো এক নামাজের সাথে] এক রাকাত মিলিয়ে তাকে বেজোড় [বা বিতর] করতেন। ঐ নামাজের সিজদা তিনি এ পরিমাণ দীর্ঘ করতেন, যাতে তোমাদের যে কেউ তাঁর মাথা তোলার পূর্বে পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে। যখন মুযাজ্জিন ফজরের আযান শেষ করে থামতেন উষার আলো উদ্ভাসিত হতো তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়তেন। অতঃপর তিনি ডান পাঁজরের উপর কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করতেন যতক্ষণ না মুযাজ্জিন নামাজের একামত বলার অনুমতি গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে আসতো। অতঃপর তিনি ফরজ পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন।—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الإخْلَافُ بَيْنَ عَدْوِ رَكَعَاتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে মতপার্থক্য : তাহাজ্জুদ নামাজ মোট কত রাকাত অথবা রাসূলপ্লাহ ﷺ কয় রাকাত পড়েছেন এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত সাদ ইবনে হিশাম

বর্ণিত হয়রত আয়েশা (রা.)-এর এক হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছেন। হয়রত উবওয়া বর্ণিত হয়রত আয়েশা (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল ﷺ এগারো রাকাত পড়েছেন। এর মধ্যে বিত্বের নামাজও ছিল। অপর এক বর্ণনায় তেরো রাকাতের উল্লেখ রয়েছে যার মধ্যে ফজরের দু' রাকাত সন্নতও অন্তর্ভুক্ত। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায়ও তেরো রাকাতের উল্লেখ রয়েছে। উপরোক্ত বিভিন্ন রেওয়াজে সম্পর্কে কাজী ইয়ায (র.) বলেন, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো, রেওয়াজেতের এ বিভিন্নতা হয়রত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ হতে হয়েছে নতুবা রাবীদের পক্ষ হতে। এ ছাড়া এর সামঞ্জস্য বিধানে বহু উত্তর দেওয়া হয়েছে। স্বল্প পরিসরের কারণে তা সন্নিবেশিত করা গেল না।

লম্বা সিজদা ঘারা উদ্দেশ্য : আলাউতা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূদ্বাহ ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজের শেষে সেজ্জা এত দীর্ঘ করতেন, রাবী আয়েশা (রা.) বলেন যে, সে সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করা যেত। হাদীস বিশারদগণ বলেন, এর ঘারা কোন সিজদা উদ্দেশ্য তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

শাফেয়ী মতাবলম্বী কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর ঘারা সিজদায়ে শোকের উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ যে **صَلَاةُ اللَّيْلِ** বা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পেরেছেন এর শুকরানা স্বরূপ তিনি একটি দীর্ঘ সিজদা করতেন।

অথবা এর ঘারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদের সকল সিজদা এতটুকু দীর্ঘ করতেন, যে সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করা যেতো।

অথবা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ বিত্বের সিজদাসমূহের মধ্যে একটি সিজদা এত দীর্ঘ করতেন যে, এর মাঝে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করা যেতো। **(كَمَا فِي التَّبْدِيلِ)**

ثُمَّ اضْطَمَعَ عَلَى شَيْئِهِ الْيَمِينِ -এর বিশ্লেষণ : রাসূল ﷺ ফজরের সন্নতের পর ডান কাতে শুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিতেন। এ বিশ্রামের হুকুম সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে হায়ম বলেছেন, ফজরের সন্নতের পরে ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করা ওয়াজিব। তিনি দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন যে,

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَمِعْ عَلَى يَمِينِهِ - (رواه أبو داود والترمذي)

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ اضْطَمَعَ - (رواه ابن ماجة)

ইমাম মালিক, সাঈদ ইবনে মুসায্যাব ও সাঈদ ইবনে জুবাইর প্রমুখের মতে এভাবে শুয়ে বিশ্রাম করা মাকরুহ ও বিদ'আত।

তাদের দলিল নিম্নরূপ-

(١) قَالَ ابْنُ مَسْرُودٍ (رض) مَا بَالَ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ يَتَمَعُّكَ كَمَا يَتَمَعُّكَ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ إِذَا سَلَّمَ فَقَدْ نَوَّلَ .

অর্থাৎ হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, মানুষের কি হলো যে, যখনই ফজরের দু' রাকাত সন্নত পড়ে তারপরই জীবজন্তু ও গাধার মতো শুয়ে পড়ে! অথচ যখন সে সালাম ফিরায তখনই দু' নামাজের মধ্যে স্বাধ্বাধন রচিত হয়ে যায়।

(٢) رَوَى ابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّ ابْنَ عَسْرٍ (رض) رَأَى رَجُلًا يَصَلِّيُ الرَّكَعَتِي الْفَجْرِ ثُمَّ اضْطَمَعَ فَقَالَ ابْنُ عَسْرٍ مَا حَسَلَكُ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِنَّهَا (أَيُّ الصُّجُوعَةِ) سُنَّةٌ قَالَ ابْنُ عَسْرٍ (رض) بَلْ بَدَعَةٌ - (كَمَا فِي النَّفِيحِ)

* কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর মতাবলম্বীগণ বলেন, এটা সন্নত। সাহাবী ও তাবয়ীদের একদল একে মোত্তায্যাব বলেছেন। সাহাবীদের মধ্যে হয়রত আবু মুসা আশ'আরী, রাকে ইবনে শাদীজ, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখ এবং তাবয়ীদের মধ্যে ইবনে সীরীন, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও ওরওয়া ইবনে যুবাইর প্রমুখ রয়েছেন।

তিরমিযী শরীফের হাদিসায় আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন, খানিকটা আরামের জন্য ও রাত জাগরণ জ্বিন্তি ক্রান্তি দূর করার জন্য ফজরের সন্নতের পর কিছুটা শুয়ে বিশ্রাম করা উত্তম। রাসূল ﷺ ও এ কারণেই এটা করতেন। তাঁরা উপরে বর্ণিত হয়রত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস ঘারা ই দলিল গ্রহণ করেন। আর রাসূল ﷺ সব সময় একপ করতেন না, বহু মাঝে-মাঝে করতেন।

الْحَوَابِّ عَنْ وَبِيلِ الْأَنْصَارِيِّ: ইবনে হামমের জবাবে বলা যায় যে, আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে যে সীগায়ে আমর বা আদেশসূচক শব্দ রয়েছে ইমামগণ বলেন, এ আদেশ ঘারা উত্তমতা বুঝাবে। কারণ এর ঘারা ওয়াজিহ এ জন্য বুঝাবে না যে, রাসূল: ﷺ নিজেও সব সময় এরূপ করতেন না।

ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমামগণ যারা এরূপ কাজকে মাকরুহ বা বিদ'আত মনে করেন, তাঁদের জবাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা.)-এর কথাকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। সম্ভবত ফজরের সুন্নতের পরে শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম করা সম্পর্কে রাসূল: ﷺ-এর কাজ বা আদেশ সম্পর্কে কখনও তাদের জানা ছিল না। নতুবা সহীহ ও মারফু' হাদীসের উপস্থিতিতে তাঁরা কেমন করে এটাকে বিদ'আত বলতে পারেন?

وَعَنْهَا ١١٢٢ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَبْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ফজরের দু' রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন [আমার দিকে মনোযোগ দিতেন] আমি যদি সজাগ থাকতাম, তবে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, নতুবা তিনি [খানিকটা] শুয়ে বিশ্রাম করতেন।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফজরের সুন্নত নামাজের পর কথা বলার হুকুম : ফজরের সুন্নত নামাজের পর কথাবার্তা বলা বৈধ কি না? সে ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

আইনী ও ফতহুল মুলাহিম গ্রন্থে এসেছে যে, কাজী ইমাম বলেন, কুফাবাসীদের মতে ফজরের সুন্নতের পর উত্তম কথা বাতীত অথবা কথা বলা মাকরুহ। কেননা সুন্নতের পর ফরজের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু হলো দোয়া ও ইস্তিগফারের সময়। সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও জমহুর ওলামার মতে ফজরের সুন্নতের পর কথা বলা মুবাহ। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত *فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَبْقِظَةً حَدَّثَنِي* হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেন।

وَعَنْهَا ١١٢٢ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقْوِهِ الْأَيْمَنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১২২. অনুবাদ : উক্ত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ফজরের দু' রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন, তখন ডান পাজরের উপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন।—[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَا ١١٢٣ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রাতে তেরো রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে বিত্র ও ফজরের দু' রাকাত সুন্নতও থাকত।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ডান পাজরের উপর শোয়ার তাৎপর্য : রাসূল: ﷺ ফজরের সুন্নতের পরে ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন। এর কারণ বা হিকমত সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, মানুষের কলব বা আত্মা বক্ষের বাম পার্শ্বে থাকে। বাম কাতে শুইলে খুব বেশি ঘুম এসে পড়বে এবং আরাম পূর্ণ হবে বটে, তবে ফজরের ফরজ কাজ হয়ে যাওয়ার সজাবনা থাকে। আর ডান পার্শ্বের উপর শুইলে

কলব সুলত থাকে। এতে গভীর নিদ্রা আসার সম্ভাবনা থাকে না এবং ফরজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

অথবা রাসূল ﷺ সর্বদা اَلتَّيْمَانُ বা ডানকে পছন্দ করতেন বিধায় তিনি ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। অবশ্য কেউ যদি ওজরের কারণে ডান পার্শ্বের উপর শুইতে সক্ষম না হয়, তা হলে সে বাম পার্শ্বের উপরই শুইবে। এতে ক্ষতির কিছুই নেই।
-আইনী, ফতহুল মুলহিম]

وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
(رض) عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ
فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১২৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মাসরুক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রিকালীন নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু' রাকাত ব্যতীত তা সাত, নয় ও এগারো রাকাত ছিল। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণে নামাজ পড়তেন এটা তার সময় ও স্বভাবগত রুচির উপর নির্ভর করতো। তবে বিতরসহ তেরো রাকাতের বেশি পড়েছেন কি না? তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এখানে বিতরসহ সাত, নয়, এগারো রাকাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ
اِفْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ -
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ যখন রাতে নামাজ পড়তে উঠতেন তখন দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা তা শুরু করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحَدِيثُ-এর বিশ্লেষণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় যখন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠতেন তখন তিনি প্রথমে দু' রাকাত নামাজ আদায় করতেন এবং তা খুব সংক্ষেপ করতেন। ওলামায়ে কেরাম এ দু' রাকাত নামাজকে তাহিয়াতুল অজু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এটা তাহাজ্জুদের মধ্যেই শামিল, যা তাহিয়াতুল অজুর স্থলাভিষিক্ত। কেননা অজুর জন্য ভিন্ন কোনো নামাজ নেই। আত্মা মা তীবী (র.) বলেন, এ দু' রাকাত নামাজকে সংক্ষিপ্ত করার তাৎপর্য হলো, এর মাধ্যমে প্রথমে নামাজের প্রতি অগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর প্রথমে অগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেলে পরে নামাজকে দীর্ঘায়িত করতে সমস্যা হয় না। -[মিরকাত]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ
اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাজ পড়তে উঠে তখন সে যেন দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা শুরু করে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۱۲۸ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَدَأَتْ
عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّجْمُ ۞
عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَتْ رَسُولَ اللَّهِ ۞ مَعَ أَهْلِهِ
سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخْرُ
أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ
"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
....." حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى
الْقُرْبَةِ فَاطَّلَقَ شِقَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي
الْجَفَنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ حَسَنًا بَيْنَ
الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَقَامَ
فَصَلَّى فَقُمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ
يَسَارِهِ فَاخَذَ يَأْذُنِي فَاذَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ
فَتَعَامَتُ صَلَوَتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ
اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ
نَفَخَ فَأَذَنَهُ بِإِلَاقٍ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي
قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي
نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا

১১২৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার ঘরে রাত যাপন করলাম। আর নবী করীম ﷺ তাঁর [মায়মূনার] ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সাথে অর্থাৎ মায়মূনার সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লেন যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকল অথবা এর কিছু কম রাত বাকি থাকল, তখন রাসূল ﷺ উঠে বসলেন, অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে এ আয়াত পাঠ করলেন—
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে, এমনকি তিনি পড়তে পড়তে সূরা [আলে ইমরান] শেষ করে ফেললেন। অতঃপর পানির মশকের উদ্দেশ্যে গেলেন এবং এর মুখের ঢাকনা খুললেন, অতঃপর পিয়ালায় পানি ঢেলে উত্তমরূপে অজু করলেন, পানি কম বা বেশি ব্যয় করলেন না [অর্থাৎ পানি স্বাভাবিক ব্যয় করলেন] কিন্তু অজুর অঙ্গসমূহে ঠিকমতো পানি পৌছালেন। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। এটা দেখে আমিও উঠলাম এবং অজু করে তাঁর বাম পার্শ্বে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ আমার কানে ধরলেন এবং বাম দিক হতে ডান দিকে নিয়ে গেলেন। তারপর রাসূল ﷺ তাঁর তেরো রাকাত নামাজ পড়া সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি [ডান কাতে] শুয়ে আরাম করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁর নাক ডাকতে লাগল। রাসূল ﷺ যখনই ঘুমাতে, তাঁর নাক ডাকত। অতঃপর বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাজের সংবাদ দিল। তখন রাসূল ﷺ উঠে নামাজ পড়ালেন কিন্তু [নতুন করে] অজু করলেন না। তিনি [সুন্নত ফরজসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে] যে দোয়া পাঠ করতেন তা ছিল নিম্নরূপ, اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে আলো দান কর, আমার চোখে আলো দাও, আমার কানে আলো দাও, আমার ডান দিকে, আমার বাম দিকে, আমার উপরে,

وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا
 وَخَلْفِي نُورًا وَأَجْعَلْ لِي نُورًا وَزَادَ
 بَعْضُهُمْ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَذَكَرَ وَعَصَبِي
 وَلَحْمِي وَدَمِي وَسَعْرِي وَشَرِي - (مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا وَأَجْعَلْ فِي نَفْسِي
 نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمٍ
 اللَّهُمَّ أَعْظِنِي نُورًا)

আমার নিচে, আমার সম্মুখে ও আমার পিছনে আলো দান কর এবং আমার জন্য আলো সৃষ্টি কর। কোনো কোনো রাবী এ দোয়াতে এবাক্যও বর্ধিত করেছেন, وَفِي لِسَانِي نُورًا অর্থাৎ আমার রসনায় নূর দান কর। আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ... وَعَصَبِي وَلَحْمِي ... অর্থাৎ আমার ধমনীতে, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার পশমে ও আমার চর্মে [নূর তৈরি করে নাও]।—[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, وَأَجْعَلْ وَفِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রাণে নূর সৃষ্টি কর এবং আমার জন্য নূরকে মহান কর। اللَّهُمَّ أَعْظِنِي نُورًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَصَلَّى رَمَّ يَرَمًا-এর বিশ্লেষণ : আলোচ্য হাদীসাংশ ঘারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ঘুম হতে জেগে অজু না করে নামাজ পড়েছেন। বাহ্যত ব্যাপারটা কেমন মনে হলেও মূলত কথা হলো, নিদ্রার কারণে অজু উঙ্গ না হওয়া নবী করীম ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- عَيْنَايَ تَمَامَانِ وَلَا يَتَامُ قَلْبِي- অর্থাৎ আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত এই দোয়াটিকে দোয়ায় তবীল বা দীর্ঘ দোয়া বলা হয়। এ দোয়ার ঘারা যে কেউই দোয়া করেছে সে-ই অন্তরে নূর লাভ করেছে। অবশ্য আলোচ্য দোয়ায় বর্ণিত নূর ঘারা কি বুঝানো হয়েছে? সে ব্যাপারে কিছু মতামত পাওয়া যায়-

- * আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হাদীসে যে নূরের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে সন্ধ্যত এর ঘারা প্রকাশ্য নূর বা আলোই উদ্দেশ্য। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট এই নিবেদন জানানো হয়েছে যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন নূরে নূরান্বিত হোক যা ঘারা কিয়ামতের ভয়াবহ অন্ধকারে আলো পাওয়া যায়।
- * আল্লামা কুরতুবী (র.) পরিশেষে বলেন, এখানে নূর ঘারা রূপকভাবে ইলম ও হিদায়েতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহ রাক্বুল আলামীন বলেছেন- وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ- অর্থাৎ 'আর আমি তাকে এমন এক নূর (ঈমান) দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে।' তা'লীক প্রণেতা বলেন, নূর ঘারা উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার নূর উদ্দেশ্য হতে পারে।
- * আল্লামা তীহী (র.) বলেন, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে নূর বা আলোর প্রার্থনা করার অর্থ হলো, যেন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্য ও মারফাতের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে মূর্খতা ও গোমরাহীর অন্ধকার হতে মুক্ত থাকে যায়।—[মিরকাত]

تَرْكِيْبُ النَّبْلِ :

بِاِكْتِشَافِ النَّبْلِ عِنْدَ خَالَتَيْ مَبْنُوْنَةٍ-এর টিপে বিশিষ্ট।

النَّبْلُ الْأَخْرَجُ مِنَ النَّبْلِ أَوْ بَعْضُ النَّبْلِ-এর সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ الْخَالِجِ مِنْ سَمَاءٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ لَوْنٍ

وَعَنْ ۱۱৩ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقَلَّ كَانَ
أَكْثَرَ صَلَوَاتِهِ جَالِسًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স বার্ধক্যে পৌঁছল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর অধিকাংশ নফল নামাজ বসেই পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱۱৩ هাদীসের ব্যাখ্যা : قَالَ শব্দটি ১-এর উপর তাশদীদযুক্ত যবর অথবা শুধু যবর দ্বারা পড়া যায়। তাশদীদ যোগে হলে অর্থ হবে বয়স বেশি হওয়া ও বয়স বৃদ্ধির কারণে শরীর ভারী হওয়া, আর শুধু যবর যোগে হলে অর্থ হবে শরীরে গৌশত বেশি হওয়া। এখানে প্রথমটিই হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা শরীরে গৌশত জনিত কারণে রাসূল ﷺ -এর শরীর ভারী হয়নি।

وَعَنْ ۱۱৩ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
(رَضِيَ) قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ
عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمَفْصَلِ عَلَى
تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
أُخْرَى حَمَّ الذُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মাজীদের ১১ সূরাগুলো সম্বন্ধে অবগত, যেগুলো একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐগুলোকে একসঙ্গে [তাহাজ্জুদে] পাঠ করতেন। পরবর্তী রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নিজের সংকলিত কুরআন হতে মুফাসসাল সূরাসমূহের প্রথম হতে শুরু করে বিশটি সূরার কথা বর্ণনা করেন, যাদের দু'টি করে রাসূল ﷺ একসঙ্গে প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করতেন সেই বিশটি সূরার শেষ দু' সূরা হলো 'হা-মীম আদ-দুখান' ও 'আম্মা ইয়াতাসায়ালুন' সূরাদ্বয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانَ سُورَةِ الْمَفْصَلِ মুফাসসাল সূরার বর্ণনা : সূরায়ে হুজরাত হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সকল সূরাকে 'মুফাসসাল সূরা' বলা হয়। আবার এই মুফাসসাল সূরাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন (এক) সূরায়ে 'হুজরাত' হতে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত ১৩০ সূরা 'মুফাসসাল'। (দুই) 'বুরূজ' হতে সূরা 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত ১৩ সূরা 'আওসাতে মুফাসসাল'। (তিন) 'লাম-ইয়াকুন' হতে সূরা 'নাস' পর্যন্ত ১৩ সূরা 'কিসারে-মুফাসসাল'।

تَرْتِيبُ الْآيَاتِ وَالسُّورِ فِي الْقُرْآنِ কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাসক্রম : কুরআন মাজীদের আয়াত ও সূরাসমূহের ভারতী বা বিন্যাসক্রম ওহির দ্বারা ই নির্দিষ্ট হয়েছে। কুরআনের যে আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) তা কোন সূরার কোন আয়াতের আগে বা পরে বসবে তা বলে দিয়েছেন। তদনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নির্ধারিত ওহী লেখক বা লিপিকারদেরকে বলে দিয়েছেন। তারা একে সেভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। সকল উষ্মতে মুহাম্মাদ ই ব্যাপারে একমত যে, সে বিন্যাসক্রম অনুসারেই এখনও কুরআন পাক আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে ও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। একে ভারতীবে উসমানী বলা হয়।

عَنْ ۱۱৩ هাদীসের সাদৃশ্যপূর্ণ যে বিশটি সূরার কথা বলা হয়েছে, যা এক রাকাতে দুই দুই সূরা করে পড়া হতো তা হলো (১-২) 'আর-রাহমান' ও 'আন-নাজম' (৩-৪) 'ইকতিরাব' ও 'আল-হাক্বাহ' (৫-৬) 'আত-তুর' ও 'আয-যারিযাত' (৭-৮) 'ইয়া ওয়াক্বাত' ও 'নূন' (৯-১০) 'সাত্বাল সায়েলুন' ও 'নাঘিআত' (১১-১২) 'আযফফযীন' ও 'আবাসা' (১৩-১৪) 'মুদাসসির' ও 'মুযাযিল' (১৫-১৬) 'হাল আতা' ও 'লা-উকসিমু বি ইয়াওমিল কিয়ামাহ' (১৭-১৮) সূরা 'নাবা' ও 'মুররসলাত' (১৯-২০) সূরা 'তাক্বীর' ও 'দুখান'।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱۳۲ حَدِيثِنَا (رَضًا) أَنَّهُ رَأَى
النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُولُ
اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَرَأَى
الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِمَّنْ
قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ
رَبِّي الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِمَّنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ لِرَبِّي
الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِمَّنْ
قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ
رَبِّي الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
وَكَانَ يَتَعَدُّ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا
مِمَّنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ
اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيهِنَّ
الْبَقْرَةَ وَالْإِنشَاءَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوْ
الْأَنْعَامَ شَكَ شُعْبَةَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১৩২. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি একদা নবী করীম ﷺ-কে রাতে নামাজ পড়তে দেখলেন। তিনি তিনবার আদ্বাহ্ আকবার বলতেন, অতঃপর বলতেন “যুল মালাকূতি ওয়াল জাবারুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আযমাতি” অর্থাৎ “সার্বভৌমত্বের মালিক, প্রতাপের অধিকারী, মহামহিম ও সম্মানের অধিকারী”। অতঃপর [তাকবীরে তাহরীমা বলে ও সুবহানা কা ইত্যাদি প্রারম্ভিক দোয়া পাঠ করে] নামাজ শুরু করতেন এবং সূরা বাকার পাঠ করতেন। অতঃপর রুকু করতেন, তাঁর রুকু তাঁর কেয়ামের মতো [দীর্ঘ] হতো। তিনি রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম বলতেন। অতঃপর রুকু হতে মাথা উঠাতেন [এবং দাঁড়াতেন]। তার এক কেয়াম [দৈর্ঘ্যে] রুকুর সমান হতো। এ সময় বলতেন, ‘লিরাব্বিয়াল হামদু’ অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন তাঁর এই সেজদা তার কিয়ামের সমপরিমাণ [দীর্ঘ] ছিল। তিনি সেজদায় বলতেন— সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা অর্থাৎ “আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের”। অতঃপর তিনি সিজদা হতে মাথা তুলতেন। তিনি উভয় সিজদার মাঝখানে তাঁর এক সিজদার সমপরিমাণ সময় বসতেন এবং বলতে থাকতেন, ‘রাব্বিগফিরলী’, ‘রাব্বিগফিরলী’। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা করে। হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে। এভাবে তিনি চার রাকাত নামাজ পড়তেন। এ রাকাত গুলোতে তিনি যথাক্রমে সূরা বাকারাহ, আলে-ইমরান, আন-নিসা ও মায়েদা অথবা আল-আন’আম পাঠ করলেন শো’বা সন্দেহ পোষণ করেছেন। —[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُحُ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ‘রুকুর’ মধ্যে ‘কেয়ামের’ সমপরিমাণ সময় অপেক্ষা করে দীর্ঘায়িত করার অর্থ হলো, স্বাভাবিক নিয়মে যেভাবে রুকু সিজদা ইত্যাদিতে সময় ব্যয় করতেন, সেই রাতের নামাজে হজুর ﷺ-এর চেয়ে দীর্ঘ করেছেন। এভাবে নামাজের প্রত্যেক অঙ্গকে দীর্ঘায়িত করেছেন। অন্যথা কেয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদিতে সমপরিমাণ লক্ষ করা চন্দ্র সূর্য গ্রহণের নামাজের মধ্যে করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ আছে। মোটকথা, হজুর ﷺ মাঝে মাঝে তাহাজ্জদের নামাজেও যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন তা উক্ত হাদীস ঘরা প্রমাণিত হয়।

وَعَمَّا ۱۱۳۳ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يَكْتَبَ مِنْ
الْعَافِيَيْنِ وَمَنْ قَامَ بِسِتِّينَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ
الْقَائِمِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ
الْمُقْتَدِرِينَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১৩৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে নামাজে দাঁড়িয়ে দশটি
আয়াত পাঠ করে তাকে গাফেলীন বা অলসদের মধ্যে গণ্য
করা হবে না, আর যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে একশত
আয়াত পাঠ করে তাকে [আল্লাহর প্রতি] অনুগতদের মধ্যে
গণ্য করা হয় এবং যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে এক হাজার
আয়াত পাঠ করে তাকে পুণ্যের দিক দিয়ে সফল ব্যক্তিদের
মধ্যে গণ্য করা হয়। - [আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمَّا ۱১৩৩-এর মর্মাৰ্খ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে
তাকে গাফেলীন অর্থাৎ অলস ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। এখানে مَنْ قَامَ-এর অর্থ হতে পার- যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ
নামাজে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একমুত্তার সাথে দশটি আয়াত পাঠ করে অথবা নামাজ ছাড়াই তা পাঠ করে, এ দশ আয়াত দু' রাকাত
অথবা ততোধিক রাকাতে পাঠ করে। উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই দশ আয়াত সূরা ফাতিহা ব্যতীত হতে হবে।
অবশ্য সুস্পষ্ট কথা হলো, এটা দ্বারা নামাজের সর্বনিম্ন মরতবা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, যা সূরা ফাতিহার সাত আয়াত এবং বাকি
অন্য তিন আয়াতের দ্বারাও নির্দেশ করা হয়ে যায়।

عَمَّا ১১৩৩-এর মর্মাৰ্খ : মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে একশত আয়াত পাঠ করে তাকে আল্লাহর
প্রতি অনুগতদের মধ্যে গণ্য করা হয়। عَمَّا ১১৩৩-এর বহুবচন, যা الْفَافِيْنَ হতে উদ্ভূত, الْفَافِيْنَ অর্থ-
الطَّاعَةُ বা অনুগত্য। আলোচ্য হাদীসংশের দু'টি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমত الطَّاعَةُ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থ-
তিরস্বাহী অনুগতদের মধ্যে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত الْعِبَادَةُ عَلَى الْعِبَادَةِ অর্থ- ইবাদতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ
কিয়ামকারীদের মধ্যে পরিগণিত করা হয়।

عَمَّا ১১৩৩-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসের শেখাংশে আরো বলেন, যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে
এক হাজার আয়াত পাঠ করে তাকে পুণ্যের দিক দিয়ে সফল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এ ব্যক্তি অধিক ছুঁয়াবের
অধিকারী হয়। الْمُقْتَدِرِينَ শব্দটি الْمُقْتَدِرُ-এর বহুবচন যা أَلْفُ مُقْتَدِرٍ হতে নির্গত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রচুর মাল-সম্পদকে وَخَنَزَارٌ বলা হয়। আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আরবরা 'কেনতার' - এর সঠিক সংজ্ঞা প্রদান
করেনি এবং এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণও বর্ণনা করেনি। অবশ্য কারো মতে চার হাজার দিনারকে 'কেনতার' বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, গরুর চামড়ার পরিপূর্ণ স্বর্ণকে 'কেনতার' বলা হয়।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজ্ঞাত পরিমাণ প্রচুর মালকে 'কেনতার' বলা হয়।

আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, 'কেনতার' হলো সত্তর হাজার দিনার।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বারো আওকিয়ায় হলো এক
কেনতার। আর আওকিয়া হলো, আসমান ও জমিনের মধ্যে উত্তম বস্তু। [হাদীসটি ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন।] হযরত
মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক হাজার দু'শত আওকিয়ায় হলো এক কেনতার। আর
আওকিয়া হলো আসমান ও জমিনের মধ্যে উত্তম বস্তু। এটা ব্যতীতও আরো অনেক অভিমত পাওয়া যায়।

وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ
كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ
طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১০৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর রাতের নামাজের কেরাআত ছিল, [ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ] কখনো উচ্চঃস্বরে পাঠ করতেন, আবার কখনো নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ
قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ
مَنْ فِي الْحَجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১০৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর রাতের নামাজের কেরাআতের স্বর এই পরিমাণ উঁচু ছিল যে, যখন তিনি ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তেন তখন বারান্দায় যারা থাকতেন তারা তাঁর আওয়াজ শুনতে পেতেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُحَبِّتِ হাদীসের ব্যাখ্যা : তাহাজ্জুদ নামাজে রাসূলে করীম ﷺ যখন যে পরিমাণ আওয়াজ উঁচু করার প্রয়োজন হতো তখন ঠিক সেই পরিমাণই উঁচু-নিচু করতেন। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত [১১০৪ নং] হাদীসটিই মূল। অর্থাৎ হজ্জুর ﷺ কখনও স্বর কিছুটা উঁচু করতেন, আবার কখনো নিচু করতেন।

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ إِنْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فِإِذَا هُوَ بِأَيِّ
بَكْرٍ يُصَلِّيُ يُخَفِّفُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ
بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّيُ رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ
فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا
أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيُ تُخَفِّفُ
صَوْتَكَ قَالَ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ
تُصَلِّيُ رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَوْقِظْ النَّوْسَانَ وَأَطْرُدِ الشَّيْطَانَ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ ازْوَغْ مِنْ

১১০৬. অনুবাদ : হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ঘর হতে বের হলেন। যখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামাজ পড়ছেন এবং খুব নিম্নস্বরে কেয়াত পাঠ করছেন। তারপর তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট দিয়ে গমন করলেন [দেখলেন] তিনিও নামাজ পড়ছেন এবং উচ্চঃস্বরে কেয়াত পাঠ করছেন। [রাবী আবু কাতাদা] বলেন, যখন তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে একত্র হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [হযরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে] বললেন, হে আবু বকর! আমি আপনার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, দেখলাম আপনি নামাজ পড়ছেন, আর নিম্নস্বরে কেয়াত পাঠ করছেন [এর কারণ কি]। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন তাঁকে শুনিয়েছি যার সাথে আমি সংগোপনে কথা বলেছি [তিনি তো চোপে বললেও শুনে, তাঁকে উচ্চঃস্বরে বলার প্রয়োজন নেই]। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! আমি আপনার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, [দেখলাম] আপনি নামাজ পড়ছেন আর উচ্চঃস্বরে কেয়াত পাঠ করছেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! [এভাবে] আমি অলস

صَوْرَتِكَ شَيْنًا وَقَالَ لِعُمَرَ اِخْفِضْ مِنْ
صَوْرَتِكَ شَيْنًا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম।
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু বকর! আপনার
স্বরকে আপনি কিছুটা উঁচু করুন। হযরত ওমর (রা.)-কে
বললেন, আপনি আপনার স্বরকে কিছুটা নিচু করুন।
-আবু দাউদ। তিরমিযীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَوْقَطُ الْوَسَّانَ وَاطْرُدُ الشَّيْطَانَ -এর মর্মার্থ: হযরত ওমর (রা.)-কে তাহাজ্জুদ নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেঁরাত পাঠ করতে
দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আমি অলস ঘুমন্তদেরকে জাগ্রত করার এবং
শয়তানকে বিভাড়িত করার জন্য এরূপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা আয়োজ্য কমানোর জন্য হযরত ওমর (রা.)-কে
উপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট বসে উচ্চৈঃস্বরে জিকির
করা বা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা ঠিক নয়, তবে হযরত ওমর (রা.) কিভাবে এটা করলেন, এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকম
জবাব দেওয়া হয়েছে-

১. কেউ যদি অসুস্থতার কারণে নিদ্দা যায় তবে তার নিকট বসে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা বা কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েজ
নেই। কিন্তু সুস্থ সর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজ্য নয়।
২. অথবা হাদীসে উল্লিখিত وَاسْتَانَ ঘারা ঘুমের বিভোর নয় এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গভীর নিদ্দায় নিমগ্ন নয়; বরং
সামান্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছে এমন ব্যক্তিকে জাগানো দৃষ্ণীয় নয়। হাদীসে এ ধরনের ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে।
৩. অথবা এমন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা উদ্দেশ্য, যিনি ইবাদতের সময় অসতর্কতাবশত নিদ্দায় বিভোর রয়েছেন অথচ তার
জাগ্রত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল।
৪. শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মিদে দেহলবী (র.) বলেন, আমি কোনো কোনো শায়খের নিকট শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সর্বদা
তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে সে যদি কোনো কারণবশত জাগ্রত না হতে পারে তবে তাকে জাগিয়ে দেওয়া দৃষ্ণীয় নয়;
কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে না তাকে জাগানো সমীচীন নয়। তদানীন্তন সময় প্রায় সকল লোকই তাহাজ্জুদ নামাজ
পড়তেন। আর এ জন্যই সকল মানুষকে জাগানোর উদ্দেশ্যেই হযরত ওমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে কেঁরাত পাঠ করতেন, যা
আদৌ দৃষ্ণীয় ছিল না।
আর রজনীর শেষভাগে হযরত বেলাল আযান সম্পর্কে বুখারী শরীফে এসেছে যে, শেষ রজনীতে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করার আয়োজন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই
করতেন। বর্ত্তত রাতের শেষভাগ ঘুমানোর সময় নয়; বরং তা হলো ইবাদতের সময়। সুতরাং এ আলোচনার দ্বারা হযরত
ওমর (রা.)-এর কর্মের সাথে শরিয়তের বিধানের কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ۱۱۳۷
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ بِأَيَّةِ الْآيَاتِ
تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ
فِيَاكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১৩৭. অনুবাদ : হযরত আবু যার গিফারী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ
নামাজে দাঁড়ালেন এবং একটি মাত্র আয়াত [বারবার] পাঠ
করতে করতে সকাল করে ফেললেন। আয়াতটি হলো-
..... [إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ].....
যদি তাদেরকে শাস্তি দাও [দিত্তে পার] তারা তোমারই
বান্দা; আর যদি ক্ষমা করো [করতে পার] কেননা তুমি
পরাক্রমশালী ও বিধানদাতা। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, নফল নামাজে ভাবে তনুয়তার কারণে একই আয়াতকে
বারবার পড়া জায়েজ আছে। হাদীসে উক্ত আয়াতের মূলকথাটি ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর। তিনি একথা বলে আশ্রায়ের নিকট
ঠাঁচ উম্মতদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এটাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে। সম্ভবত আমাদের নবী করীম ﷺ -ও এই
আয়াত পাঠকালে নিজ উম্মতের কথা স্মরণ করে তনুয়তায় একই আয়াত বারংবার পাঠ করেছেন।

عَنْ ۱۱۳۸
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
 رَكَعَتِي الْفَجْرَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَيَّ يَمِينِهِ -
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

১১৩৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন
 তোমাদের কেউ ফজরের সুন্নত দু' রাকাত নামাজ পড়ে,
 তখন সে যেন ডান কাতে শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে।
 -[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আশোচনা

ফজরের সুন্নতের পর বিশ্রামের বিধান : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ
 ফরজ ছিল। রাতে জাম্বুত থাকার দরুন যে ক্লাস্তি অনুভব করতেন তা দূর করার জন্য তিনি ফজরের সুন্নতের পর কিছুক্ষণ
 বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। ইবনুল মালিক বলেন, তাহাজ্জুদে জাম্বুত ব্যক্তিদের জন্য এভাবে খানিকটা বিশ্রাম করা মোস্তাহাব।
 এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইবনে হায্ম ও জাহেরিমাগণ বলেন, এভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করা ওয়াজিব।
 তবে এটাও স্বরণ রাখতে হবে যে, তাহাজ্জুদ নামাজ মসজিদে বা লোক সম্মুখে পড়ার চেয়ে ঘরের মধ্যে চুপে চুপে আদায় করাই উত্তম।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱৩৯
 مَسْرُوقٍ (رَحِمَهُ اللهُ) قَالَ سَأَلْتُ
 عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَيَّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ قَائٍ
 حِينَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ
 يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِحَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মাসরুক (র.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা
 (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন কাজটি রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিকতর প্রিয়
 ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, যে কাজ সর্বদা করা হয়। আমি
 পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, রাতের ইবাদতের [তাহাজ্জুদের]
 জন্য তিনি কখন উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগ
 ডাকার শব্দ শুনতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আশোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, যে ইবাদত সর্বদা করা হয় তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে
 অধিকতর পছন্দনীয়, যদিও তা পরিমাণে সামান্যই হয়। আর সাধারণত মোরগ মধ্য রাতের পরই ডাকতে থাকে। কিন্তু
 আমাদের ইমামদের অভিমত হলো সর্বস্থানের মোরগের ডাক একই সময় হয় না; বরং দেখা যায় যে, কোনো কোনো স্থানের
 মোরগ রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা আরো অনেক পরেই ডাকতে থাকে। কাজেই এখানে এ কথাই বুঝতে হবে যে সর্বদা হযর
 ﷺ-এর সেই যুগে আরবের মোরগ মধ্য রাতের পরেই ডাকতো। আর হযরত আয়েশা (রা.) হজুর ﷺ-এর রাত
 জাগরণের সময়টা মধ্য রাতের পরেই হতো বলে প্রশ্নকারীকে জানালেন।

عَنْ ۱۱৪০
 أَنَسِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ مَا كُنَّا
 نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ
 مَضْجِبًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا
 إِلَّا رَأَيْنَاهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১৪০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, যখনই আমরা রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
 নামাজে রত দেখতে চাইতাম, তখনই তাঁকে নামাজে
 দেখতে পেতাম। আর যখনই আমরা তাঁকে ঘুমন্ত
 দেখতে চাইতাম; তখন তাঁকে ঘুমন্তই দেখতে পেতাম।
 অর্থাৎ তিনি ঘুমাতেও এবং রাত্রে জেগে নামাজও
 পড়তেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الرَّحْمَنِ الْحَرِيْبِ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : হযরত আনাস (রা.) রাসূল ﷺ-এর রাতের বেলায় ইবাদতের ধরন উল্লেখ করে বলেন, যখনই আমরা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজে রত দেখতে ইচ্ছা করতাম, তখনই তাঁকে নামাজে দেখতে পেতাম। আর যখনই আমরা তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতাম, তখনই তাঁকে ঘুমন্ত দেখতাম। হযরত আনাস (রা.)-এর এ কথার উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ অত্যন্ত ইবাদত-গুজার হলেও তিনি কখনই সীমাতিরিক্ত করতেন না; বরং সর্বদা তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়তেন। আত্মা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিদ্দা এবং নামাজ রাতের বিভিন্ন সময়ে হতো। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত ছিল না; বরং রাতের উপযোগী সময়ই রাসূল ﷺ উঠে নামাজ পড়তেন। -[মিরকাত]

وَعَنْ ۱۱۴۱ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (رَح) قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّوْ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأَفْئِ فَقَالَ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا" حَتَّى بَلَغَ إِلَى "أَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمَيْعَادَ" ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سَوَاكًا ثُمَّ أَقْرَعَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرًا مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَمَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلًا مَا قَالَ فَعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْتَّ مَرَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১১৪১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য হতে একজন বললেন, আমি [আমার বন্ধুদেরকে অথবা মনে মনে] বললাম, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম- আত্মাহর কসম! আজ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর [রাতের] নামাজ পর্যবেক্ষণ করই। [যাতে আমি তাঁর কার্যক্রম দেখতে পারি।] [এবং সেই হতে আমল করতে পারি।] [দেখলাম,] তিনি যখন এশার নামাজ যাকে 'আতামা'ও বলা হয় পড়লেন, তখন তিনি রাতের একটা দীর্ঘ অংশ শুয়ে ঘুমালেন। অতঃপর সজাগ হলেন এবং দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কুরআনের এ আয়াত- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا - অর্থাৎ "হে আমার প্রভূ! তুমি এই সমস্ত বৃথা সৃষ্টি করোনি" - হতে لَأُخْلِفَنَّ الْجَمْعَاءَ - অর্থাৎ "নিশ্চয়, তুমি কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না" পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন বিছানার দিকে গেলেন এবং সেখান হতে মেসওয়াক বের করলেন। এরপর তাঁর কাছে থাকা একটি পাত্র হতে পেয়ালায় পানি ঢাললেন এবং মেসওয়াক করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়লেন। এতে আমি মনে করলাম যে, তিনি যতটা সময় ঘুমিয়েছেন ততটুকু সময় ধরে নামাজ পড়েছেন। তারপর তিনি আবার শুয়ে ঘুমালেন এতক্ষণ সময় ঘুমালেন যে, আমি মনে করলাম, তিনি যত সময় ধরে নামাজ পড়েছেন সেই পরিমাণ সময়ই ঘুমিয়েছেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সজাগ হলেন এবং প্রথবার যেক্ষণ করেছিলেন এবারও সেক্ষণই করলেন এবং প্রথমবারে যা পাঠ করেছিলেন এবারও সেক্ষণ আয়াত পাঠ করলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্বে তিনবার করলেন। -[নাসাঈ]

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ রাতে উঠলে যে দোয়া পাঠ করতেন

হুজুর : ﷺ এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল, তাই তিনি সর্বদা এ নামাজ আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য যখনই রাসুল ﷺ জাগ্রত হতেন তখনই নামাজের ভিতরে ও বাইরে রাসুলে করীম ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱۴۳
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَسِيمُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
الْحَقُّ وَعَدَدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ
حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ
وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ
اسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَالَيْسِكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَنْتُ وَالْبَيْتُ
حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
مِنْنِي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৪৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন—اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَسِيمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ তোমারই। তুমি আসমানসমূহ ও জমিন এবং তাদের মধ্যখানে যা কিছু আছে তার প্রতিষ্ঠাকারী ও রক্ষাকারী। তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, তার নূর বা আলো। তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিনের এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার একমাত্র সার্বভৌম মালিক এবং যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য। তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাও সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, [আমি] মুহাম্মদও সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই উপর নির্ভর করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করলাম, তোমারই সাহায্যে [শত্রুর সাথে] লড়াই করি, আর তোমারই কাছে ফয়সালা প্রার্থনা করি। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর, যে সমস্ত পাপ আমি আগে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার থেকে বেশি জান। তুমি কাউকে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাগামী করো, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।—[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

النَّحْوِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদ নামাজান্তে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমিই তো আসমানসমূহ ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যখানে যা কিছু আছে তার প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকারী। اَلْأَرْضِ -এর অর্থ অর্থ্যাৎ যিনি সৃষ্টিকুলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা এবং সর্বাবস্থায় সমগ্র জাহান পরিচালনা করতে সক্ষম তাকেই কায়্যাম বলা হয়। আর এ গুণের অধিকারী মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহই।

النَّحْوِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহ আসমান জমিনের নূর বা আলো। কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- পবিত্র কুরআনে এসেছে اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থ্যাৎ আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর। বক্তৃত আল্লাহর মৌলিক সত্তাই নূর বা আলো। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أُنَّى أَرَاهُ

অর্থ্যাৎ একদা হযরত আবু যার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করেছিলেন যে, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ নূর। আমি তাঁকে দেখেছি অথবা কি করে আমি তাঁকে দেখব। তবে 'নূর' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়-

- * হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত نُورٌ অর্থ مُنُورٌ বা আলো প্রদানকারী। অর্থ্যাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের আলো প্রদান করেছেন এবং এর মধ্যে যারা আছে তারা সেই আলো দ্বারাই পথের নির্দেশনা পেয়ে থাকে।
- * আবার কারো মতে اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -এর অর্থ হলো عَيْنٌ كُلُّ عَيْنٍ অর্থ্যাৎ আপনি (আল্লাহ) দোষত্রুটি হতে পূত্র-পবিত্র। যেমন বলা হয়- فَلَانَ مُنُورٌ এর অর্থ كُلُّ عَيْنٍ অর্থ্যাৎ অমুক ব্যক্তি দোষ হতে মুক্ত।
- * কারো মতে হাদীসে বর্ণিত 'নূর' অর্থ مُوجِدٌ বা প্রতিষ্ঠাতা। যেমন বলা হয় اللَّهُ مُوجِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থ্যাৎ আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিষ্ঠাতা। মানতেকীদের পরিভাষায় এটা 'মাজাযে মুরসাল' হিসাবে হয়েছে।
- * রুহুল মা'আনীতে نُورٌ -এর তাফসীর করা হয়েছে اَلطَّاهِرُ بِذَاتِهِ مَطْهَرٌ لِرَفِيعِهِ অর্থ্যাৎ যিনি সন্তানগতভাবে বিকাশমান ও অন্যের বিকাশকারী। এটা কোনো ব্যাখ্যা-বিশেষণ ছাড়াই আল্লাহর জন্য বলা যেতে পারে। দার্শনিক আল্লামা ইমাম গাযালী (র.)-ও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

* আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রা.) ফাওয়ানেদে কুরআনে اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে نُورٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর অন্যান্য সিফাত বা গুণাবলির বাস্তব আকৃতির যেমন ধারণা করা বৈধ নয় তদ্রূপভাবে 'নূর' বা আলোরও অনুরূপ আকৃতির কল্পনা করা বিতর্ক নয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচা হাদীসে উল্লিখিত وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِفْتَتَحَ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ -এ কথাই সর্বস্বত্বের উল্লেখ এসেছে, তদুপর ভিন্নভাবে -এর পুনরাবৃত্তি কেন করা হলো, এর সমাধান করলে আল্লামা মীরাক বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিশেষভাবে উল্লেখপূর্বক وَالنَّبِيُّونَ -এর উপর আত্বফ করে এ কথাই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সকল নবী-রাসূলদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন বিশেষ গুণাবলিতে সকল নবী-রাসূলের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। গুণের প্রাধান্য মূলত সত্তার প্রাধান্যেরই নামান্তর। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِفْتَتَحَ صَلَوَتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأِسْرَافِيلَ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ

১১৪৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে নামাজ পড়তে উঠতেন তখন নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে নামাজ শুরু করতেন- اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأِسْرَافِيلَ অর্থ- হে আল্লাহ! জিব্রাঈল, মীকাঈল

وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ
الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ও ইসলামীলের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করবে; যে বিষয় নিয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করছে। তুমিই আমাকে তোমার অনুগ্রহে সঠিক পথ দেখাও। যা নিয়ে মতভেদ করা হচ্ছে। নিচয় যাকে ইচ্ছা তুমিই সোজা পথ প্রদর্শন কর।” —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَبَيَّنَ تিন ফেরেশতার উল্লেখের কারণ ও তাদের মাঝে তারতীব : আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুর রব ও প্রতিপালক, এতে কারো দ্বিভিত নেই। তবু আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 'তিন ফেরেশতার প্রভু' বঙ্গার কারণ হলো, এ তিনজনের মর্যাদা সমস্ত ফেরেশতাকুলের উপরে। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, হযরত জিব্রাইল (আ.) হলেন আসমানের সমস্ত কিতাবসমূহের আমীন বা তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং দীনের যাবতীয় কার্যসমূহ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে, তাই তার মর্যাদা সকলের উপরে। এ তিন জনের মধ্যে ইসরাফীল (আ.)-কে সর্বশেষ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি লাওয়ে মাহফুয়ের তত্ত্বাবধায়ক, 'শিক্ষা' তাঁর আয়ত্তে। ইহ ও পারলৌকিক সব কিছু রক্ষা বা ধ্বংস করা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আর হযরত মীকাইল (আ.)-এর মর্যাদা উভয়ের মধ্যখানে। কেননা তিনি ষষ্টি বর্ষণ ও ফসলাদি জন্মানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের কার্যকলাপ আগ্রাম দেওয়ার জন্য যেই রিজিক ও খাদ্যসমূহের প্রয়োজন এর তত্ত্বাবধায়ক হলেন তিনি। অবশ্য এ মর্যাদা বিন্যাসের মধ্যেও মতভেদ আছে।

وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رَض)
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَارَى مِنَ
اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا
اسْتَجِيبْ لَهُ فَيَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قِيلَتْ
صَلَوْتُهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৪৫. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে সজাগ হয় এবং এ দোয়া পাঠ করে, اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ..... আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁরই সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোনো শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই। বা অতঃপর বলে, رَبِّ اغْفِرْ لِي অর্থ- হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমায় ক্ষমা করো, অথবা [রাবীর সন্দেহ] তিনি বলেছেন, তারপর যে কোনো দোয়া করে, আল্লাহ তা'আলা তার সেই প্রার্থনা কবুল করেন এবং সে যদি অজ্ঞ করে নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তার সেই নামাজ কবুল করেন। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ مَنْ تَعَارَى শব্দের অর্থ : হাদীসে উল্লিখিত مِنَ اللَّيْلِ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হয়। مَنْ تَعَارَى শব্দের বর্ণিত তামসীদযুক্ত। তার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ التَّوَضُّعُ مِنْ اللَّيْلِ অর্থ- নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া। আবার কারো মতে এর অর্থ تَقَلُّبٌ فِي فِرَاشِهِ অর্থ- বিছানায় উলট পালট খাওয়া। আল্লামা

ইবনুল মালিক বলেন, আওয়াজ সহকারে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়াকে **لَيْلٍ مِّنَ اللَّيْلِ** বলে। যেমন- বলা হয় **نَمَارَ الرَّجُلِ** আর এটা তখনই বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম হতে চিৎকার দিয়ে জাগ্রত হয়। অথবা **نَمَارًا** শব্দটি **عَرَّأُ الظِّلْمِ** হতে উৎকলিত। উটপাখির আওয়াজকে **عَرَّأُ الظِّلْمِ** বলা হয়।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٤٦ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَنْزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১৪৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতের বেলায় ঘুম হতে জাগতেন, তখন বলতেন- **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** কোনো উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমারই প্রশংসা সহকারে। আমি তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার গুনাহের জন্য এবং তোমারই কাছে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শনের পরে আমার অন্তরকে বক্র পথে পরিচালিত করো না এবং তোমার পক্ষ হতে আমাকে রহমত প্রদান করো। কেননা তুমিই সর্ববীক দাতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١١٤٦ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَنْزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

এর বিশ্লেষণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাজাতে বলতেন, হে আল্লাহ আমি আমার কৃত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ প্রার্থনার মধ্যে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, তা হলো রাসূল ﷺ তো জন্মলগ্ন হতেই মাসুম বা নিষাপ, কোনো গুনাহ বা অপরাধ তাঁর ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজের কৃত অপরাধের জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন—

প্রথমত হতে পারে, এটা তিনি উম্মতকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে করেছেন। যেন তারা কৃত অপরাধের জন্য এভাবে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানায়।

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তোবা এই প্রার্থনা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও মহত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে সর্বশক্তিমান সকল ক্ষমতার উৎস, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই— এটা বুঝানোর জন্যই রাসূল ﷺ উপরোক্ত প্রার্থনা করেছেন।

তৃতীয়ত প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ-এর কোনো অপরাধ ছিল না; বরং তিনি মাঝে মধ্যে উত্তম কর্ম পরিত্যাগ করতেন, এটা পূর্ণ আনুগত্যের পরিপন্থী ছিল বিধায় একেই **ذَنْبٍ** বা অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

চতুর্থত রাসূল ﷺ নিজেকে খুব অনুগত বান্দা হিসাবে উপস্থাপনের জন্য এরূপ প্রার্থনা করতেন।

عَنْ ١١٤٧ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمِينُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ)

১১৪৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান পাক-পবিত্র অবস্থায় [অর্থাৎ অজু সহকারে] আল্লাহকে স্মরণ করে রাতে শয্যা গ্রহণ করে এবং রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো ভালো জিনিস প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে সে জিনিস দান করেন। -[আহমদ ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُرُحُ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পবিত্র হয়ে ঘুমানো সুন্নত, আর কেউ আল্লাহর জিকির করতে করতে ঘুমালে সেটি তার সারা রাত ব্যাপী বন্দেগি হিসাবে লিখিত হয়, অধিক রাতে জেগে উঠে আল্লাহর দরবারে কাতর মিনতি করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

وَعَنْ ۱۱۴۸ شَرِيْقِ الْهَزْرَتِي (رحا) قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ
فَقَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَسَأَلْتَنِي عَنْهُ
أَحَدٌ قَبْلُ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ
عَشْرًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرًا وَهَلَّلَ
اللَّهُ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ
ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا
ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১৪৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শারীক হাওযানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে জাগতেন, তখন কি কাজের মাধ্যমে [ইবাদত-বন্দেগি] শুরু করতেন? হযরত আয়েশা (রা.) জবাবে বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, যা তোমার পূর্বে [আজ পর্যন্ত] আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। রাসূল ﷺ যখন রাতে ঘুম হতে জাগতেন -দশবার 'আল্লাহ আকবার' বলতেন, দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতেন, দশবার বলতেন, 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' [অর্থাৎ 'আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে'], দশবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' [অর্থাৎ 'পবিত্র বাদশাহের পবিত্রতা ঘোষণা করছি'] বা ক্বা বলতেন, দশবার বলতেন- আস্তাগফিরুল্লাহ [অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'] এবং দশবার বলতেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই]। অতঃপর তিনি দশবার বলতেন- 'আল্লাহুয়া ইন্নী আউযুবিকা মিন যাইকিদদুনইয়া ওয়া যাইকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ' [অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা হতে']। অতঃপর তিনি নামাজ [তাহাজ্জুদ] পড়তে আরম্ভ করতেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا الخ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক রাতে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজের পূর্বে দশ-দশবার করে সাতটি দোয়া পড়তেন। এর সর্বশেষ দোয়াটিতে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা হতে। ضَيْقِ الدُّنْيَا বা পার্থিব জগতের সংকীর্ণতার অর্থ হলো, কষ্ট-মসিবত, দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথা-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি। কেননা মানুষ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথবা কারো মাথায় ঝপের বোঝা চাপানো থাকে, অথবা কেউ যদি চরম নির্ধাতন-নিশেষণ ও অত্যাচারের শিকার হয় তবে সে ব্যক্তির কাছে বাস্তবিক পক্ষেই দুনিয়া সংকীর্ণ বা সংকোচিত মনে হবে। মনে হবে এই স্বার্থপর পার্থিব জগতে তার কোনো সাহায্যকারী নেই; নেই কোনো আশ্রয়দানকারী অথবা সমবেদনা প্রকাশকারী। আর ضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতার অর্থ হলো, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা। দুনিয়ার অশান্তি আর পরকালের শান্তি উভয়টিই মানুষের জন্য দুর্ভিষ যন্ত্রণা। এটা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। মূলত এর দ্বারা তিনি উম্মতদেরকেই প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছেন।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ نَفْخِهِ وَنَفْسِهِ (رواه التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَقْرَأُ .

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ رَيْبَعَةَ بِنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَيْمَنَ عِنْدَ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْهَوِيُّ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيُّ . (رواه النَّسَائِيُّ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ رَيْبَعَةَ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসুলে কারীম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। হযরত রাবীয়া ছিলেন আহলে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। তাই তিনি রাসুলের রাত জাগরণের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করতেন। সাহাবীদের মধ্যে যিনি যা অবগত হয়েছেন, তিনি তাই বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীসে একটি শব্দ الْهَوِيُّ উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটির 'হরফে যবর ও বা' হরফে যের এবং 'আ' তাশদীদুক্ত এবং নসব বিশিষ্ট। ইবনুল আছীর তাঁর 'নিহায়াম' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, الْهَوِيُّ-এর অর্থ-الرَّطْبُ مِنَ الطَّرِيقِ وَالرَّطْبُ مِنْ الرِّمَانِ অর্থাৎ দীর্ঘ সময় কারো কারো মতে, এটা কেবল রাত্রিকালের জন্য প্রযোজ্য।

১১৪৯. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন প্রথমে আল্লাহ আকবার বলতেন। তারপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার নাম বরকতময়, সুউচ্চ তোমার মহত্ত্ব, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই"। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ আকবার কাবীরান [আল্লাহ অতি বড় মহান] তারপর বলতেন, أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ অর্থাৎ, আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে; তার কু-পরামর্শ, তার অহমিকা প্রদান এবং তার অকল্যাণকর ফুক হতে। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। কিন্তু আবু দাউদ, 'গাইরুকা' শব্দের পরে এ বাক্যটি বর্ধিত করেছেন, অতঃপর রাসূল ﷺ তিনবার বলতেন, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং হাদীসের শেষ অংশ বর্ধিত করেছেন, অতঃপর রাসূল ﷺ কেবল পাঠ শুরু করতেন।

১১৫০. অনুবাদ : হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর হুজরা যুবরকের নিকটেই রাত যাপন করতাম। অতএব তিনি যখন রাতে [নামাজের জন্য] উঠতেন তখন তাঁকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বলতে শুনতাম 'সুবহানা রাকিবল 'আলামীন'। অর্থ- আমি দো জাহানের প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অতঃপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বলতে শুনতাম 'সুব্বহানায়াহু ওয়া বিহামদিহী'। অর্থ- আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে। [নাসায়ী] তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ التَّخْرِيفِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের বেলায় ইবাদতের জন্য উৎসাহ প্রদান

التَّخْرِيفُ শব্দটি বাবে تَعْيِيلِ-এর মাসদার, حَرَضُ মূলধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো- উৎসাহ প্রদান করা, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, অগ্রাহ তৈরি করা। পরিভাষায় উত্তম ও কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের প্রতি অগ্রাহ সৃষ্টি করাকে تَخْرِيفُ করা বলা হয়। আর اللَّيْلُ وَيَامُ اللَّيْلِ বলতে রাতের বেলায় ইবাদত তথা তাহাজ্জুদ নামাজকেই বুঝানো হয়। অতএব উক্ত অধ্যায়ের অর্থ হলো তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল, উম্মতের উপর কঠকর বিধায় পরবর্তীতে এর ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায়, তথাপিও এর গুরুত্ব ও ফজিলত যথায়থই থেকে যায়। এমনভাবে রাসুলের জন্যও এ নামাজ ফরজ ছিল। রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে এটা আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عَقْدَةٍ عَلَيْكَ لَبَلٌ طَوِيلٌ فَأَرْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَلَا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপরে মোহর মারে, [ঘুমন্ত ব্যক্তির মনে একথা ছড়ায় যে,] এখনও অনেক রাত বাকি আছে, তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে থাক। যদি সে সজাগ হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তার একটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে অজ্ঞ করে, তখন আর একটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে নামাজ পড়ে, তখন তার শেষ গিরাটিও খুলে যায় এবং সকালে খুশি মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে উঠে নতুবা সে কলুষিত অন্তর ও অলস দুর্বল চিন্তা নিয়ে সকালে উঠে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -এর ব্যাখ্যা : গিরা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এটা প্রকৃতিগত গিরা। যেমন- কোনো যাদুকর যাদুটোনায গিরা দিলে তা যাদুকৃত ব্যক্তির উপর প্রতিফলিত হয়। যে ধরনের গিরা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সূরা ফালাকেও বলা হয়েছে- وَمَنْ شَرَّ النَّفْثَاتِ نَبِيَّ الْعُقُودِ

কেউ বলেন, গিরা শব্দটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শয়তানের কাজগুলো যেন যাদুকরের কার্যাবলির মতো। যাদুকর যেমন যাদুটোনার সময় মন্ত্র পড়ে ও গিরা লাগায়, তদ্রূপ শয়তানও মানুষের জন্য স্থানে স্থানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার কু-প্রভাচণায় মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে পড়ে। এক একটি বাধার স্থানকেই রূপক হিসাবে একটি গিরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর একদল বলেন, হতে পারে এটা বাস্তব গিরা, শয়তান মাথার পশ্চাৎ দিকে বাস্তবিকপক্ষেই গিরা দিয়ে থাকে। এর তত্ত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.) অবগত ছিলেন- আমরা অবগত নই।

অথবা 'ওকদাহ' (গিরা) বলতে যদি জড়তা বা প্রতিবন্ধকতা অর্থ হয়, তা হলে এর অর্থ হবে- শয়তান তিনটি স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন- হযরত মুসা (আ.) বলেছেন, وَأَخْلَلْتُ عَقْدَةً مِنْ لَيْسَانِي [হে আল্লাহ! তুমি আমার বাক-প্রতিবন্ধকতা দূর করে দাও।

عَنْهُ -এর তাৎপর্য: পিরাকে তিনের মধ্যে কেন সীমাবদ্ধ করা হলো, এ সম্পর্কে আত্তামা বায়যাবী (রা.) বলেন, তিন সংখ্যাটিকে শুধুমাত্র তাকিদের জন্যই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা তিন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার হেতু হলে, তিনটি পিরা ছাড়া তিনটি বস্তু হতে ফিরিয়ে রাখাকে বুঝান হয়েছে। এটা হলো- (১) জিকির, (২) অজু এবং (৩) নামাজ। শয়তান তিনটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যুমস্ত ব্যক্তির ঘাড়ে তিনটি পিরা দিয়েছে। প্রথমটি দিয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, সে যেন আত্তাহর নাম স্মরণ করতে না পারে। দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টির উদ্দেশ্য হলো, যথাক্রমে অজু ও নামাজ হতে বিরত রাখা।

وَعَنْ ۱۱۵۲ الْمُنِيرَةَ (رَض) قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَعْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا سُكُورًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫২. অনুবাদ: হযরত মুণীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মহানবী ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে গেল। সাহাবীদের কেউ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কেন এরূপ করেন? অথচ আপনার তো বিগত ও ভবিষ্যত তথা গোটা জীবনের সমস্ত গুনাহই মাফ করে দেওয়া হয়েছে? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, তা হলে আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا سُكُورًا -এর বিশেষণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাহাজ্জুদ নামাজে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার কদম মোবারক ফুলে উঠত। এটা দেখে কতক সাহাবী সবিনয় আরজ করলেন, হুয়ূ! আল্লাহতো আপনার পূর্বাপর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তদুপরি আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا سُكُورًا অর্থাৎ আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে পরিগণিত হবো না? অর্থাৎ আমার অপরাধ ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ যে নিয়ামত আমাকে প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য নিয়ামতাবলি যা কিছু আমাকে দিয়েছেন এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই আমি এত অধিক ইবাদত করে থাকি। অবশ্য হাদীস বিশারদগণ এ বাক্যটির আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

* আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রা.) শরহশ শামায়িল গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় লেখেন أَلَسَى الْكُلْفَةَ نَظْرًا أَلَسَى الْغُفُورَ فَلَا أَكُونُ عَبْدًا سُكُورًا لَا بَلَّ لِرُؤْمِهَا وَإِنْ غُفِرَ لِي لَأَكُونُ عَبْدًا سُكُورًا . অর্থাৎ ক্ষমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কি এ কষ্টকে পরিহার করব? আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? এটা হতে পারে না; বরং আমি তা অপরিহার্য করে নেব, যদিও আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর এর মাধ্যমে অবশ্যই আমি (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দা হবো।

* আল্লামা মীরাক এর অর্থ বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেন আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, অথচ তিনি আমাকে কল্যাণ দান করেছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে আমাকে উত্তমরূপে নির্বাচন করেছেন। -[মিরকাত]

وَعَنْ ۱۱۵۳ ابْنِ مَسْعُودٍ (رَض) قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -এর সমীপে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো এবং তার ব্যাপারে বলা হলো যে, সে সর্বদা সারারাত ঘুমিয়ে থাকে, নামাজের জন্য উঠে না, এমনকি প্রভাত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করেছে অথবা [রাবীর সন্দেহ] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তার দু' কানে [শয়তান প্রস্রাব করেছে]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْأُنَّ شَرَّاتَانِ كَانَةَ عِنْدَ مَا كَرَّرَ الْبَابَ الْوَعْدَ : আন্তামা ইবনে হাজ্জার আসকালানী (র.) বলেন, "শয়তান প্রস্রাব করে"- এ কথাটির অর্থ নির্ধারণে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আন্তামা কুমতুযী ও কাজী ইয়াম (র.) বলেন, শয়তান প্রকৃতই প্রস্রাব করে; এটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা শয়তানের শাওরা, পান করা, পচাখাবাদু নির্গত করা ইত্যাদি হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং সে 'প্রকৃতই' পেশাব করে, এ কথা যেনে নিতে কোনো বাধা নেই।

আন্তামা আযহাবী (র.) বলেন, এভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি শয়তানের অনুশত হয়ে পড়েছে, শয়তান তার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে শয়তানের গোলামে পরিণত হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন যে, শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে; এখানে 'প্রস্রাব করা' কথাটি একটি রূপক উদাহরণ মাত্র। ফলে তার কান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আন্তাহর কোনো ডাক, মুয়াজ্জিনের আয়ান তার কানে পৌঁছে না। আর যখন সে পরে ঘুম হতে জেগে উঠে তখন অশ্লীল কথাবার্তা ও শয়তানী আলোচনা তার কানে খুব ভালভাবে শুনেতে পায়, যেন সত্যের আহবান হতে তার কান বধির হয়ে গেছে।

আন্তামা জুরেশুত্বী বলেন, শয়তানের প্রস্রাব করা ঘারা তার কানকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে; কেননা যে জিনিসকে লোকের তুচ্ছ মনে করে সেটির উপরে প্রস্রাব করে।

* আন্তামা জীবী (র.) বলেন, ঘুমের সাথে আপাত দৃষ্টিতে চোখের সম্পর্ক থাকে সত্ত্বেও হজুর ﷺ কানের কথা উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, নিদ্রার গভীরতা মূলত কানের সাথেই বেশি সম্পর্কিত।

وَعَبَّرَ ١١٥٤ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضًا) قَالَتْ
اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَرِغًا يَقُولُ
سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنْ
الْخَرَاتِينِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ
صَوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ بَرِيْدًا أَرْوَاجَهُ لِكَيْ
يُصَلِّيْنَ رَبِّ كَاسِيَةً فِي الدُّنْيَا عَارِبَةً
فِي الْآخِرَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৫৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ত্রস্ত ও বিব্রত অবস্থায় ঘুম হতে জাগ্রত হলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! এই রাতে কত যে রহমত নাযিল হলো এবং কত বিপদও সাথে নাযিল হলো! কে আছে এমন যে, এই অন্তঃপুরবাসিনীদেরকে জাগাবে! 'অন্তঃপুরবাসিনী' দ্বারা তাঁর বিবিগণকে বুঝিয়েছেন, যাতে তারা উঠে নামাজ পড়তে পারে। হায়! দুনিয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদে শুশোভিতা কত রমণী আবেরাতে সম্পূর্ণ উলসিনী হবে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَاذَا أَنْزَلَ الْخَرَاتِينُ وَفَاتِنُهَا : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাড়াহুড়া করে জেগে উঠে বললেন مَاذَا أَنْزَلَ الْخَرَاتِينُ وَفَاتِنُهَا অর্থ এই রাতে কত যে রহমত অবতীর্ণ করা হলো, আর কত যে বিপর্যয় আর্পিত হলো। এখানে الْخَرَاتِينُ দ্বারা রহমত এবং الْفَاتِنُ দ্বারা ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় বুঝানো হয়েছে। অর্থঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাতের কথা বলেছেন, সে রাতের একদিকে যেমন অগণিত রহমত ও কল্যাণ এই দ্বারা বুকে অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমনি অপনদিকে বহু ফিতনাও নাযিল হয়েছে। এ অফুরন্ত রহমত অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং বিপর্যয় হতে পরিব্রাণের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হীয বিবিগণকে রাতের নামাজ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আন্তামা জীবী (র.) উপরোক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে যথার্থ ও সঠিক বলে অভিভূত ব্যক্ত করেছেন।

رُبُّ كَاسِيَةً فِي الدُّنْيَا عَارِبَةً فِي الْآخِرَةِ -এর ব্যাখ্যা : এর মর্মার্থ হলো দুনিয়াতে পোশাকে শুশোভিতা অনেক রমণী আবেরাতে উলসিনী হবে। অর্থঃ দুনিয়াতে এমন বহু স্ত্রীলোক রয়েছে যারা আকর্ষণীয় বিভিন্ন রং-এর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহার করে শুশোভিত হয়ে থাকে, আর নিজের সৌন্দর্যকে লোক সম্মুখে প্রকাশ করে। অর্থ

পরকালের চিন্তা-ভাবনা তাদের অন্তরে আদৌ নেই এবং এর জন্য কোনো নেক আমলও করে না। এ সমস্ত রমণীগণই আখেরাতে সম্পূর্ণ উল্লসিত হয়ে উঠবে। তাদের দেহে কোনো বস্ত্র বা অলঙ্কার থাকবে না।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে رَبُّ د্বারা অধিক সংখ্যক বুঝানো উদ্দেশ্য। কারো মতে رَبُّ كَاتِبِيَّةٍ দ্বারা রাসূল ﷺ-এর أَزْوَاجِ مَطْهُرَاتٍ-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলতে চেয়েছেন যে, তাদের জন্য ইবাদত হতে উদাসীন থাকা সঙ্গত নয়। রাসূলের পরিবার বলে আল্লাহর জীতি পরিহার করা তাদের জন্য অনুচিত। মূলত أَزْوَاجِ مَطْهُرَاتٍ-কে বলা মানেই পৃথিবীর সকল নারীসমাজকে সতর্ক করে দেওয়া। তাই সবার সতর্ক হওয়া উচিত।

وَعَنْ ١١٥٥ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضد) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزِلَ رَيْنًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ يَقْرُضْ غَيْرَ عَدُوِّمْ وَلَا ظُلْمٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

১১৫৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের পরওয়ারদিগার তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দান করব? এবং কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব? -[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু' হাত পেতে দেন এবং বলতে থাকেন, 'কে আছ যে ঋণ দেবে এমন মহান সত্তাকে যে দরিদ্র নয় এবং অত্যাচারীও নয়।' উষার আলো তথা সুবহে সাদেক পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ١١٥٥ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। "আমার প্রভু দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন" - হাদীস বিশারদগণ এ বাক্যটির নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

※ ইমাম মালেক এবং অন্যান্যরা বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর রহমত অথবা ফেরেশতাগণ দুনিয়ার প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবতীর্ণ হন না। এর অনুকূলে বিদ্বান হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْهَلُ حَتَّى يَسْمَعِيَ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَأْمُرُ سَادِيًا بِسَادِيٍّ يَقُولُ هَلْ مِنْ أُمَّةٍ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ. (الْمَدِينِيُّ) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতঃপর কোনো আহবানকারীকে আহবান করার জন্য আদেশ প্রদান করেন এবং সে আহবানকারী এই বলে আহবান করতে থাকে যে, কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি না? কেননা তার প্রার্থনার মঞ্জুর প্রদান করা হবে।

এর দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা হলো, উক্ত বাক্যটি রূপক হিসাবে আনা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা রহমতের মাধ্যমে কবুল করে নেন। যেমনিভাবে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি অথবা রাজন্যবর্গ কোনো দুর্বল অসহায়-অনাথের প্রার্থনাকে কবুল করে থাকে। -[মিরকাত]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হাত বলতে আল্লাহর করুণা-অনুগ্রহের কুদরতী হাত। দরিদ্র নয় এবং অত্যাচারীও নয় অর্থাৎ আল্লাহ দরিদ্র নন যে, ঋণ শোধ করতে পারবেন না এবং অত্যাচারী নন যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ শোধ করবেন না। আর ঋণ দেওয়ার অর্থ হলো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পাওনাদার হওয়া।

وَعَنْ حَايِبٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يَرِيقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَ ذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. (رواه مُسْلِمٌ)

১১৫৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি তা লাভ করে এবং ঐ সময়ে আত্মাহর নিকট ইহ ও পরকালের কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই আত্মাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। আর এ বিশেষ মুহূর্তটি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে। -মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক রাতে এমন একটা বরকতময় সময় রয়েছে, ভাগ্যক্রমে যদি কেউ সেই মুহূর্তে আত্মাহর নিকট ভাল কিছু প্রার্থনা করে তবে আত্মাহ সেই প্রার্থনা অবশ্যই মঞ্জুর করেন। এ সময়টি কোনো রাতের সাথে অথবা রাতের কোনো বিশেষ মুহূর্তের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং যে কোনো রাতের যে কোনো সময় এটা হতে পারে। শবে কদর বা শবে মিসাজ বা অন্য কোনো বিশেষ রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর একে অশ্লিষ্ট রাখার কারণ হলো, মানুষ যেন এর অন্বেষণে সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং কোনো সময়কে যেন নির্দিষ্ট করে না নেয়। উল্লেখ্য, যারা দিনের চাইতে রাতকে মর্যাদাশীল বলে ধারণা করেন, তারা এই হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং বলেন, রাতের বেলায় যেহেতু একটি বিশেষ বরকতময় সময় রয়েছে যা দিনের বেলায় নেই, তাই রাতই উত্তম।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الصَّلَوَاتِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَمَا كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَغُفَّرُ يَوْمًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আত্মাহ তা'আলাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় নামাজ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ এবং সবচেয়ে প্রিয় রোজাও ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি [দাউদ (আ.)] অর্ধেক রাত ঘুমাতে, তারপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাজে কাটাতেন, পুনরায় রাতের এক-ষষ্ঠাংশ আরাম করতেন। এমনভাবে তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজা রাখতেন না। -বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ -এর আমলের সাথে হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলের তুলনা : উক্ত হাদীসের ভাষে বুঝা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক নফল নামাজ ও রোজা আদায় করাই আত্মাহর কাছে পছন্দনীয়। অথচ আমাদের নবী ﷺ সর্বদা এই মোতাবেক আমল করেননি। এর জবাবে বলা হয় যে, হযরত : তাই আমল করেছেন যা তার জন্য প্রয়োজ্য ছিল। অবশ্য উম্মতের জন্য হযরত দাউদ (আ.)-এর আমল মোতাবেক অনুসরণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। যেন উম্মতের সবল ও দুর্বল সর্বস্তরের শোক সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে তা অনুসরণ করতে পারে। আর রাত জাগরণের ক্লাস্তি দূর করার জন্য রাতের শেষ এক-ষষ্ঠাংশ বিশ্রাম বা নিদ্রা যেতেন।

وَعَنْ ۱۱৫৮ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ كَانَ
تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ
وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ
عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ جُنُبًا وَثَبَّ فَاقْضَ
عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ
لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে
সাধারণত ঘুমাতে এবং শেষ ভাগে জাগ্রত থাকতেন।
অতঃপর [কিছু ইবাদতের পরে] নিজের পরিবারের প্রতি
কোনো আকর্ষণ থাকলে তা পূর্ণ করতেন, অতঃপর
[কিছুক্ষণ] ঘুমাতে। আযানের প্রাক্কালে নাপাক অবস্থায়
থাকলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠতেন এবং গোসল করতেন।
আর নাপাক অবস্থায় না থাকলে নামাজের জন্য অজু
করতেন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়তেন।—[বুখারী ও
মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ 'প্রথম আহ্বান'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসবিশারদদের কেউ কেউ বলেন, الْأَوَّلُ দ্বারা হযরত
বেলাল (রা.)-এর আযান উদ্দেশ্য। রাতের দ্বি-প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত বেলাল (রা.) এ আযান দিতেন। আর
النِّدَاءِ الثَّانِي দ্বারা অক্ষ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান উদ্দেশ্য। তিনি সুবহে সাদেকের সময় আযান
দিতেন। অবশ্য প্রকৃত কথা হলো, الْأَوَّلُ দ্বারা আযান এবং الثَّانِي দ্বারা একামত উদ্দেশ্য।

سَهْرَ السَّهْرِ পর ঘুমানোর হুকুম : স্ত্রী সহবাসের পর কখনো কখনো নবী করীম ﷺ 'বিশেষ
অঙ্গ' ধৌত করত অজু করে ঘুমাতে। এমনকি গোসলের পূর্বে তিনি কিছু খাওয়া-দাওয়াও করতেন। এর ফলে ফকীহগণ
বলেছেন, নাপাক বা জুনুবী হওয়ার পর সাথে সাথেই গোসল করা ওয়াজিব বা ফরজ নয়। 'বিশেষ অঙ্গ' ধৌত করে এবং
ভালভাবে অজু করে ঘুমানো কিংবা কিছু খাওয়া-দাওয়া করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। তবে অকারণে দেরি করে গোসল করা
উচিত নয়। অবশ্য যদি কোনো জুনুবী একটি ফরজ নামাজ ও তার ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পরও গোসলবিহীন অবস্থায় থাকে,
তখন ফেরেশতা ও জমিন প্রভৃতি তাকে লানত করতে থাকে।

الدَّفْعُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱৫৯ أَبِي أُمَامَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ
فِيَّهِ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ
لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ
وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১৫৯. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
তোমরা রাতে জেগে [তাহাজ্জুদ] নামাজ পড়াকে
বাধ্যতামূলক করে নিও। কারণ, এটা তোমাদের
পূর্বকালের নেক লোকদের নিয়ম। আর এটা [রাত জেগে
নামাজ পড়া] তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের
উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং অপরাধ হতে
প্রতিরোধকারী।—[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِيَّهِ دَابُّ الصَّالِحِينَ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী তথা উম্মতগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তোমরা রাতের
বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়াকে নিজাদের উপর অপরিহার্য করে নেবে। কেননা এটা তোমাদের পূর্বকালের নেক লোকদের নিয়ম।

আল্লাহা জীহী (র.) বলেন, **أَدْبَابُ أَرْبَ-أَمَادَةٍ** [অভ্যাস] ও **السُّنَانُ** [মর্যাদা]। আর **الصَّالِحِينَ** বলতে সেই সমস্ত নেক আমলকারীদেরকে বুঝায় যারা অধিকাংশ সময় নেক কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে। এখানে এর দ্বারা নবীগণ এবং ওলি-আল্লাহগণ উদ্দেশ্য। যেমন বর্ণিত হয়েছে, **كُنَّا بِأَدْبَابِ دَاوُدَ** অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ.)-এর অনুসারীরা রাতে [তাহাজ্জুদ] নামাজ পড়তেন। হযরত আবু উমায়্য (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসাংশে সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হলো এতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে এ কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমারা এটা হলে অতীত সকল উম্মতের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং এই উত্তম কাজ হতে দূরে থাকা তোমাদের সমীচীন নয়। এতে আরো বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে না সে পরিপূর্ণ নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

سَكَرَةً لِّلسِّنَاتِ وَمَنْهَا عَنِ الْآثِمِ এর ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসাংশে তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ দুটি মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তাহাজ্জুদ নামাজ হলো অন্যান্য নফল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। প্রথমত এটা সমস্ত অপরাধকে ঢেকে দেয় এবং পাপকে দূরীভূত করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْمِرْنَ السَّيِّئَاتِ** অর্থাৎ ভাল কর্মসমূহ অপরাধকে দূরীভূত করে। দ্বিতীয়ত তাহাজ্জুদ নামাজ হলো যাবতীয় অপরাধের প্রতিরোধকারী। এ নামাজ মানুষকে অপরাধ করা হতে দূরে সরিয়ে রাখে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**, নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কর্ম হতে বিরত রাখে।

عَنْ ۱۱৬
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَض)
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ
اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يَصَلِّي
وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَرُوا فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا
صَفَرُوا فِي قِيَالِ الْعَدُوِّ. (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

১১৬০. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার লোক রয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ খুশি হন। (এক) কোনো ব্যক্তি যখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেন। (দুই) জনসমষ্টি যখন তারা নামাজের জন্য সাহিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং (তিন) আল্লাহর পথের যোদ্ধা সম্প্রদায়, যখন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সাহিবদ্ধ হয়। -শরহে সুন্নাহ্

عَنْ ۱১৬
عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ (رَض)
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ
الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ
فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا)

১১৬১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ আপন বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। অতএব সে বিশেষ সময় যারা আল্লাহর ইবাদত করে, তুমি যদি তাদের দলভুক্ত হতে পার, হতে চেষ্টা কর। [তিরমিযী। তবে তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সনদের বিবেচনায় হাসান সহীহ গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা: রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে দুনিয়ার সব মানব-দানব যুমে বিভক্ত থাকে, তাই এ সময়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

এ অংশটি কি হয়েছে? এ অংশটি **أَقْرَبَ** হতে **غَيْرُ** হবে অথবা **رُبُّ** হতে **حَالَ** হয়েছে, তখন বাক্যটি হবে **فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِنَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ** অথবা এটি **الْعَبْدِ** হতে **حَالَ** হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَعَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبِي نَضَعَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. (رواه أبو داود و الترمذی)

১১৬২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আত্মাহ রহমত বর্ষণ করুন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে ব্যক্তি রাতে উঠে নামাজ পড়ে অতঃপর নিজের স্ত্রীকেও জাগিয়ে এবং সেও নামাজ পড়ে। আর যদি সে (স্ত্রী) উঠতে অস্বীকার করে তবে তার চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আত্মাহ রহমত বর্ষণ করুন সেই মহিলার প্রতি, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। ফলে সেও নামাজ পড়ে। আর যদি সে [স্বামী] উঠতে অস্বীকার করে তার চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।—[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসে দু' ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণের জন্য আত্মাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন। প্রথমত এমন পুরুষ যে, রাতে জাহত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং সাথে সাথে স্ত্রীকেও নামাজের জন্য সজাগ করে। দ্বিতীয়ত এমন রমণী যে, রাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও নামাজের জন্য উঠায়। রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, দু'জনের কেউ যদি গভীর নিদ্রার কারণে অথবা অলসতাবশত উঠতে না চায়, তবে যেন একে অপরের শরীরে পানি ছিটিয়ে দেয়। 'এটা হবে উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। উত্তম কাজে একে অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। যেমন আত্মাহ বলেন, اَلرَّحْمَةُ عَلَى الْاَبْرِ وَالرَّقْوَى اর্থৎ তোমরা নেকী ও পরহেজগারিতে একে অন্যের সাহায্য করতে থাক। আত্মাহা ইবনুল মালিক বলেন, উত্তম কর্মপালনের জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং মোস্তাহাব। এ হাদীসটিই এর বাস্তব প্রমাণ।

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَبِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوَّفَ اللَّيْلَ الْأَخْرَ وَدُبَّرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ. (رواه الترمذی)

১১৬৩. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আত্মাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া দ্রুত কবুল হয়? হুজুর ﷺ বললেন, রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া এবং প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরবর্তী দোয়া।—[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, দু' সময়ের দোয়া আত্মাহর নিকট কবুল হয়, প্রথমত রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরের দোয়া। উক্ত সময়ঘণ্টে দোয়া কবুল হওয়ার কারণ হলো তখন মানুষের অন্তরে একাগ্রতা থাকে, আর একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করলে তা কবুল হবেই।

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ فِى الْجَنَّةِ عُرْقًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا

১১৬৪. অনুবাদ : হযরত আবু মালেক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন সব স্বচ্ছ প্রকোষ্ঠ বা বালাখানা রয়েছে, যার বাইরের বস্তুসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের বস্তুসমূহ বাইরে থেকে দেখা যায়। এ সমস্ত বালাখানা

وَيَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ
الآنَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ
الصَّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ -
(رَوَاهُ النَّبَيْهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيِّ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَتِهِ
لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ)

আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষের জন্য নির্মাণ করেছেন, যে [লোকের সাথে] বিন্দ্র ভাষায় কথা বলে, [ক্ষুধার্তকে] খাদ্য দান করে, উপযুক্ত রোজা রাখে এবং রাত জেগে নামাজ পড়ে অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে।- [বায়হাকী, শু'আবুল ইমান]। তিরমিযী হযরত আলী (রা.) হতে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্ণনায় 'বিন্দ্র ভাষায় কথা বলে'-এর স্থলে 'সুমিষ্টভাষায় কথা বলে' কথাটি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত করেক প্রকার মানুষের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে তাদের জন্য এমন সুন্দর ও নয়নাভিরাম অট্টালিকা তৈরি করে রেখেছেন, যার বাইরের বক্ষসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের বক্ষসমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সে সকল লোকেরা হলো-

১. যারা মানুষের সাথে বিন্দ্র ভাষায় কথা বলে, মিষ্টি স্বরে কথা বলা রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর বহিঃপ্রকাশ মু'মিনদের মধ্যেও ঘটেছিল। যেমন আল্লাহ রাসূল আলামীন বলেন, **وَأَدَا خَاطِبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا** অর্থাৎ আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা শান্তি বজায় রেখে কথা বলে। [সূরা ফুরকান] (الْفُرْقَانُ)
২. যারা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে।
৩. যারা উপযুক্ত রোজা রাখে। বাহ্যত এর ঘারা **وَصَوْمٌ** বা ধারাবাহিক রোজার কথা বুঝার অবকাশ থাকলেও মূলত এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ অব্যাহতভাবে রোজা রাখা হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এটা দ্বারা বেশি বেশি রোজা রাখার কথা বুঝানো হয়েছে।
৪. আর যারা নিখর-নিস্তর রাজনীতে যখন মানুষ গভীর ঘুমে বিভোর থাকে, তখন জাগ্রত হয়ে নামাজে মশগুল থাকে। মূলত হাদীসে এ অংশের সাথেই শিরোনামের সম্পর্ক রয়েছে। যারা রাতের নামাজে নিমগ্ন থাকে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, **وَالَّذِينَ يَسْتَهْوُونَ رَبَّيَهُمْ سَجْدًا وَوَيْسَامًا** (الْفُرْقَانُ) অর্থাৎ যারা রাতের বেলায় নিজেদের প্রভুর সম্মুখে সিজ্দা ও কিয়াম অবস্থায় [নামাজে] মশগুল থাকে তারা ই হলো আল্লাহর প্রকৃত বান্দা।

التَّفْصِيلُ الثَّلَاثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
النَّعَاصِ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ
يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অম্মকের মতো হয়ো না, যে ব্যক্তি আগে রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠত, এখন রাতে উঠা ত্যাগ করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : মূলত সর্বোত্তম ইবাদত হলো যা সর্বদা করা হয়, এ বিষয়ে রাসূলে করীম ﷺ বলেন- **هَدَى اللَّهُ أُمَّةً** অর্থাৎ সর্বোত্তম আমল হচ্ছে যা ধারাবাহিকতার সাথে করা হয় যদিও তা সামান্যই হয় না হাদীস। কাজেই আমল যা করা হয় তা নিয়মিত করা উচিত। উক্ত হাদীসের ভাষ্যেও তা বুঝা যায়।

وَعَنْ ۱۱৬৬. عُمَانَ بْنِ أَبِي النَّاصِرِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১১৬৬. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, হযরত দাউদ (আ.)-এর রাতে একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, সে সময় তিনি নিজ পরিবারের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাউদ পরিবারের লোক সকল! তোমরা উঠ এবং নামাজ পড়। কেননা এটা [এখন] এমন একটি সময় যে সময়ে আত্মাহ [আয্যা ওয়াজ্জালা] যাদুকার ও অন্যায্যভাবে কর আদায়কারী ব্যতীত সকলের প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ صَفَةَ آار ۱-এর সَاعَةٌ يَقُولُ فِيهَا : বাক্য বিশ্লেষণ : বাক্যটি পরবর্তী সَاعَةٌ আর আগের সَاعَةٌ টি ইসْم كَانَ আর مِنَ اللَّيْلِ তার বয়ান।

وَعَنْ ۱۱৬৭. أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১১৬৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱۱৬৮. عَزَّ وَجَلَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَاذًا أَصْبَحَ سَرَقٌ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

উত্তম সূন্নতের বর্ণনা : শাফেয়ী মাযহাব মতাবলম্বী ইমাম আবু ইসহাক মারওয়যী বলেন, 'তাহাজ্জুদ' নামাজ 'সূন্নতে মুয়াক্কাদা' হতেও উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাগণ বলেন, সূন্নতে মুয়াক্কাদাই উত্তম। প্রকৃতপক্ষে উভয় মতামতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা দু' দৃষ্টিকোণ হতে দু'টি উত্তম। যেমন- শরীরের উপর অধিক কষ্ট বা রিয়া বা লৌকিকতা হতে অনেকটা মুক্ত, এই হিসাবে 'তাহাজ্জুদ নামাজ' উত্তম। আর ফরজ নামাজসমূহের ক্রটি-বিঘ্নাতি পরিপূরক হিসাবে 'সূন্নতে রাওয়াতবেই' উত্তম। তবে প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত এই যে, 'তাহাজ্জুদ' নামাজই উত্তম। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এর উত্তমতার দলিল বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাজ অধিক কষ্টকর ইবাদত। কেননা চরম শাস্তির ঘুম পরিত্যাগ করে রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই قَدْ نَزَرْنَا عَلَيْكُمْ عَلَىٰ جُرْحِكُمْ نীতির ভিত্তিতে তাহাজ্জুদ নামাজ উত্তম।

وَعَنْ ۱۱৬৮. عَزَّ وَجَلَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَاذًا أَصْبَحَ سَرَقٌ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

১১৬৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সমীপে হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, অথচ যখন প্রভাত হয় সে চুরি করে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, অদূর ভবিষ্যতে নামাজই তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখবে, যার কথা তুমি বললে। -[আহমদ ও বায়হাকী] ৩/আবুল ইমান গ্রন্থে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَأَى الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْغَفَاءِ, হাদীসের ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে যে, যখনই ঘুমিয়ে পড়তে চান বা ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিন। (সূরা মুম্বিন: ১৯)। এ হাদীসের মর্ম হলো যে, যখনই ঘুমিয়ে পড়তে চান বা ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিন। (সূরা মুম্বিন: ১৯)। এ হাদীসের মর্ম হলো যে, যখনই ঘুমিয়ে পড়তে চান বা ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিন। (সূরা মুম্বিন: ১৯)।

وَعَنْ ۱۱৬৯. **عَنْ** أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَرْثَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَبْقَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّ يَا أَوْ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُنْبًا فِي الدَّاكِرِينَ وَالدَّاكِرَاتِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১৬৯. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত । তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ পরিবারকে অর্থাৎ স্ত্রীকে রাতে নামাজের জন্য জাগায় এবং উভয়ে নামাজ পড়ে অথবা [রাবীর সন্দেহ রাসূল ﷺ বলেছেন] উভয়ে একত্রে দু' রাকাত নামাজ পড়ে, তারা দু'জনেই আল্লাহর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হন ।
-[আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱১৭০. **عَنْ** ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةٌ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ . (رَوَاهُ النَّبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

১১৭০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে তারাই সবচেয়ে সজ্জন [অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী] যারা কুরআন বহনকারী [কুরআন শিখেছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে] এবং রাতে জাগরণকারী [তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারী] । -[বায়হাকী, শু'আবুল ইমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱১৭১. **عَنْ** ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةٌ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ . (رَوَاهُ النَّبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

১১৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে তারাই সবচেয়ে সজ্জন [অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী] যারা কুরআন বহনকারী [কুরআন শিখেছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে] এবং রাতে জাগরণকারী [তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারী] । -[বায়হাকী, শু'আবুল ইমান]

أَصْحَابُ اللَّيْلِ : অসহাবুল লাইল-এর অর্থ : বা রাতে জাগরণকারী বলে সেই ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা গভীর রজনীতে নিখর-নিপ্তর পরিবেশে একপ্রতিশ্বে তাহাজ্জুদ নামাজে মশগুল থাকে। একাকী সকলের অগোচরে নামাজ আদায়ের কারণে তাদের অন্তরে কোনো রিয়ার সৃষ্টি হয় না। আর এ জ্ঞানই রাসূল (সা.) তাদেরকে আশরাফুল উম্মত হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আব্বায়া তীযী (র.) বলেন, أَصْحَابُ اللَّيْلِ শব্দটিকে-এর দিকে সষক করে অধিক নামাজ আদায় করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন অধিক পথ অতিক্রমকারীকে إِنَّ السَّيْلَ এবং সময়ের সঠিক অনুসারী ও এর প্রতি যথার্থ গুরুত্বারোপকারীকে إِنَّ الْوَقْتَ বলা হয়ে থাকে।

১১৭১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রা.) রাতে উঠে নামাজ পড়তেন, আব্বায়া তাঁকে যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য দিতেন। যখন রাত শেষ হয়ে আসত, তিনি নিজ পরিবারকে নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে বলতেন, নামাজ পড়। অতঃপর কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করতেন بِالصَّلَاةِ وَأُصْطَبِرَ وَأَمْرًا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأُصْطَبِرَ وَأَمْرًا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَعَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى অর্থাৎ নিজ পরিবার-পরিজনকে নামাজের জন্য নির্দেশ দিন এবং নামাজ পাঠে খুব ধৈর্যধারণ করুন। আমি আপনার নিকট রিজিক প্রার্থনা করছি না; বরং আমিই আপনাকে রিজিক দান করে থাকি এবং (উত্তম) পরিণাম তো পরহেজগারদের জন্যই অবধারিত।—[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : যিনি পরিবারের কর্তা বা অভিভাবক, তার কর্তব্য যে, নিজের অধীন সকলকে নেক আমলে উৎসাহী করে তোলা। আব্বাহর কালামেও এ নির্দেশ রয়েছে যে, جَاهِلِيَّتِكُمْ وَأَهْلِيَّتِكُمْ نَارًا তাহাজ্জুদের আশন হতে নিজেও বাঁচ এবং পরিবারের সবাইকে বাঁচাও। আবার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى অর্থ— তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল [শাসক] এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনদের সঙ্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ব্যক্তি [স্বামী] তার পরিবারের রাখাল।

بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ

পরিচ্ছেদ : কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱۷۲ أَنَسِ (رَضٍ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَظَنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى يَظَنَّ أَنْ لَا يَفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ الْكَيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৭২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসের কিছু অংশে রোজা ছেড়ে দিতেন। যাতে মনে করা হতো যে, তিনি এ মাসে আর রোজা রাখবেন না। আবার রোজা রাখা শুরু করে দিতেন, যাতে মনে করা হতো যে, তিনি এ মাসে আর রোজা ছাড়বেন না। এরূপভাবে তুমি যদি তাঁকে রাতের বেলায় নামাজে রত দেখতে চাইতে, অবশ্য তাঁকে নামাজ রত দেখতে, আর যদি তাঁকে নিদ্রিত দেখতে চাইতে অবশ্যই নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে; -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ১১৭৩ هَادِيَسِ (رَضٍ) هَادِيَسِ ۖ مَهَانَبِي ۖ پুরো মাস রোজা রাখতেন না, আবার সারা মাস রোজা ছেড়েও থাকতেন না। এমনিভাবে তিনি সারা রাত জেগে নামাজ পড়তেন না, আবার নামাজ ছাড়া সারারাত ঘুমিয়েও থাকতেন না। সর্বাবস্থায় রাসূল ﷺ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন।

আলোচ্য হাদীসে 'عَائِشَةَ' শব্দ বাহ্যত নফী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মাটা তীবী (র.) বলেন, তারকীবে (বাক্য গঠনে) এটা 'বদল' এর 'ইসতিছনা' হয়েছে। ইসবাতে অর্থাৎ হা বাচকে বাক্যটি হবে একরূপ, 'رَأَيْتَهُ مَهْمَدًا رَأَيْتَهُ' এবং 'إِنْ تَشَاءُ رَأَيْتَهُ مَهْمَدًا رَأَيْتَهُ' বাকো তুমি বলে সম্বোধন করা এটা একটি আরবি বাকরীতি। এর প্রকৃত মর্মার্থ এই যে, যদি আমরা তাঁকে নামাজরত দেখতে চাইতাম, অবশ্য নামাজরত দেখতাম। আর যদি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম তবে তাঁকে ঘুমন্ত দেখতাম। উল্লেখ্য যে, একরূপ বাকরীতি বাংলা ভাষায়ও চালু আছে।

عَنْ ۱۱۷۳ عَائِشَةَ (رَضٍ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْرَمَهَا وَإِنْ قَلَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আত্মাহর নিকট সব চেয়ে প্রিয় আমল তা-ই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ১১৭৩ هَادِيَسِ (رَضٍ) هَادِيَسِ ۖ কোনো নেক আমল অধিক পরিমাণে এক দু' বার করার চেয়ে স্বল্প পরিমাণে নিয়মিত করাই উত্তম, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয়।

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَذُوا الْأَعْمَالَ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সে পরিমাণ কাজ গ্রহণ কর, যা তোমরা [সর্বদা] করতে সক্ষম হও। কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনো ছওয়ার দানে বিরক্ত হন না, যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْهَا হাদীসের ব্যাখ্যা : সাধের বাইরে কোনো কাজ করা উচিত নয়। কেননা এতে সে বিরক্ত হয়ে এক সময় তা ছেড়ে দেবে, ফলে সে ছওয়ার হতে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর বিরক্ত হওয়ার অর্থ হলো ছওয়ার বা দেওয়া।

وَعَنْ أَنَسِ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نِشَاطَةً وَإِذَا فَرَ فَلْيَقْعُدْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ [যখন নামাজ পড়ে] যেন ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়ে, যতক্ষণ তার মনে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা থাকে। যখন সে ক্লান্তিবোধ করে, তখন সে যেন বসে পড়ে [অর্থাৎ মনের বিরুদ্ধে আরও নামাজে প্রবৃত্ত না হয়]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْهَا হাদীসের ব্যাখ্যা : নফল ইবাদত করার নিয়ম হলো, মনে যতক্ষণ প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা থাকে এবং বিরক্তি বোধ জন্মত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকা উচিত। কিন্তু যখন এর প্রতি সামান্যতম অস্বাভাব বা বিরক্তির সৃষ্টি হয় তখন সাথে সাথে নফল ইবাদত ত্যাগ করা উচিত। আর ক্লান্তিবোধ দূরীভূত করার জন্য কিছু কথাবার্তা বলা যেতে পারে অথবা ঘুমানো যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও নফল ইবাদতের মাঝে বিশ্রাম নিতেন এবং তাঁর বিবিদের সাথে কথা বলতেন। যেমন তিনি একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন: كَلِّبِي بِأَحْسَرًا: অর্থাৎ হে হমাইরা [হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপাধি] তুমি আমার সাথে কথা বলে।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذَرُنِي لَعَلَّهُ يَسْتَفِيرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কারো নামাজ পড়া অবস্থায় তন্দ্রা আসে, তখন সে যেন গুয়ে পড়ে যতক্ষণ না তার ঘুম দূরীভূত হয়। কারণ তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়ে, তখন সে জানতে পারে না যে, সে কি বলছে। সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْهَا হাদীসের ব্যাখ্যা : তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়া ঠিক নয়। কেননা এ অবস্থায় নামাজি কি পড়ল সে অনুধাবন করতে পারে না। উদাহরণত, যদি সে তন্দ্রাবস্থায় اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي -এর স্থানে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي পড়ে তথা এ-এর স্থলে ع পড়ে তখন এর অর্থ হবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধ্বংস করে। এতে নামাজি নিজে নিজের বিরুদ্ধে বদদোয়া করল, এ জন্য রাসূল করীম ﷺ তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدِّينَ بُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ فَسَيْدُوا وَقَارُوا وَأَبْشَرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْقُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدَّلِجَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৭৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- নিচয়ই দীন সহজ। যে কেউই দীনকে কঠোর করবে, দীন তার উপরে বিজয়ী হবে। অর্থাৎ তার জন্য কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং [তোমরা বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে] মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে। সকাল, বিকাল এবং রাতের কিয়দংশ ইবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাবে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের জন্য যে সমস্ত বিধানাবলি নির্ধারণ করেছেন এক কথায় একেই দীন বলা হয়। আল্লাহ প্রদত্ত দীনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। সকলের পালনের উপযোগী করে আল্লাহ তা প্রণয়ন করেছেন। কুরআনের বহু আয়াতে এবং অনেক হাদীসে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজতার ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না।

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলেছেন- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আর [আল্লাহ] তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংকট রাখেননি। -[সূরা হজ]

অন্য হাদীসে এসেছে যে, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُوتِيَ رَحْصَةً لِمَا يُحِبُّ أَنْ تُوتِيَ عَزَائِمَهُ, এ সব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্মের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য : الْغُدْوَةُ অর্থ- প্রাতঃভ্রমণ وَرَوْحَةٌ অর্থ- সন্ধ্যাভ্রমণ এবং الدَّلِجَةُ অর্থ- শেষ রাতে ভ্রমণ। আলোচ্য হাদীসে এ তিনটি শব্দ দ্বারা উক্ত তিন সময়ের ইবাদতকে বুনানো হয়েছে। কারো ধারণা মতে এ শব্দ তিনটি হাদীসের প্রথমংশের সাথে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে; প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ প্রচণ্ড গরমের সময় আরবরা দিনের বেলায় চলাচল করত না; বরং সন্ধ্যা, সকালে ও শেষ রাতে ঠাণ্ডার সময় আরামে পথ অতিক্রম করত। সুতরাং ইবাদতের ব্যাপারেও এরূপ পন্থা অবলম্বন করে নিজের সুবিধা ও রুচি মতো নফল ইবাদত করতে বলা হয়েছে। অহেতুক কঠোর পন্থা অবলম্বন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের কিছু সময় ইবাদত করবে এবং বাকি অংশ ঘুম ও বিশ্রামে কাটাবে।

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِّ جِزِيَهُ أَوْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَاتِمًا قَرَأَ مِنْ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৭৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি রাতে নিদ্রাগ্রু থাকার কারণে তার নিয়মিত কাজ [ইবাদত] অথবা তার কিছু অংশ সম্পন্ন করতে পারেনি, অতঃপর তা ফজর ও জোহর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেছে, সেটি তার আমলনামায় এভাবে লেখা, যেন সে তা রাতেই আদায় করেছে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَانَتْ قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ -এর ব্যাখ্যা : রাত ও দিন একটি অপরটির পরিপূরক। কারো যদি গভীর নিশ্বাস কারণে নিয়মিত ইবাদত যেমন নামাজ অথবা কুরআন মজীদ তেলাওয়াত অথবা কোনো দোয়া অথবা জিকির-আয্কার বাদ পড়ে যায়, তবে এটা জোহরের পূর্বে আদায় করলে সে ব্যক্তি রাতের মতোই সমান ছুওয়াবের অধিকারী হবে। এতে কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন، لَيْسَ فِي التَّوَمِّ تَفْرِيطٌ অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে কোনো সীমালঙ্ঘন নেই। আর রাত যে দিনের পরিপূরক, এর বাস্তব প্রমাণ আমরা পাই আগত আয়াতের মধ্যে। আয়াহ বলেছেন، وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، "আর তিনি এমন সত্তা যিনি রাত এবং দিবসকে একে অন্য়ের পশ্চাতে গমনাগমনকারী করে বানিয়েছেন সে ব্যক্তির জন্য যে অনুধাবন করতে চায়, অথবা শোকর করতে ইচ্ছা করে"। [সূরা-ফুরকান]

* আয়াতমা কাজী ইয়ায (র.) বলেন, রাত এবং দিন যেহেতু একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত সেহেতু রাতের ছুটে যাওয়া ইবাদত দিনে এবং দিনের বাদপড়া ইবাদত রাতে সম্পাদন করা যাবে। এ অভিমত হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান ও সালমানসহ অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।

* এখানে উল্লেখ্য যে, রাতের ছুটে যাওয়া ইবাদত ফজর হতে জোহরের পূর্ববর্তী সময়ে আদায়ের সাথে কেন নির্দিষ্ট করা হলো। এর সমাধানে বলা যায় যে, জোহরের পূর্ববর্তী সময়কে সাধারণত রাতের মধ্যেই পরিগণিত করা হয়। আর এ কারণেই সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোজার নিয়ত করা বৈধ।

* অথবা বলা যায় যে, কোনো বস্তুর নিকটবর্তী বস্তু এর হকুমেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং ফজরের পরবর্তী সময় যেহেতু এর পূর্বের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত উভয়টিই একই হকুমের পর্যায়ভুক্ত।

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فِقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৭৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হসাইন

(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— নামাজ দাঁড়িয়ে পড়, যদি তাতে অপারগ হও তবে বসে বসে পড়। আর যদি তাতেও অপারগ হও, তবে কাত হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় কর। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِيَسের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো অবস্থাতেই নামাজ পরিত্যাগ করা যাবে না। অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থাতেই নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى تَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইমরান ইবনে হসাইন

(রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, যদি সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, তবে তাই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে নামাজ পড়ে সে দাঁড়িয়ে যে নামাজ পড়ে তার অর্ধেক ছুওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামাজ পড়ে সে বসে যে নামাজ পড়ে, তার অর্ধেক ছুওয়াব পাবে। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বসে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বসে নামাজ পড়লে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অর্ধেক ছুওয়াব হবে এবং শুয়ে নামাজ পড়লে বসে নামাজ পড়ার অর্ধেক ছুওয়াব হবে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য নির্ধারণে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। এ হাদীসটি কি ফরজ নামাজ আদায়কারী সম্পর্কে, না নফল আদায়কারী সম্পর্কে? যদি ফরজ আদায়কারী সম্পর্কে হয়ে থাকে তবে এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তার জন্য তো ওজর ব্যতীত বসে পড়া বৈধ নয়। আর যদি ফরজ আদায়কারী ওজরের কারণে বসে নামাজ পড়ে তবে তার তো অর্ধেক নয়; বরং পুরা ছুওয়াবই মিলবে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে যদি এ হাদীস নফল আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে বিশ্লেষণ করতে হবে যে, বিনা ওজরে নফল নামাজ শুয়ে পড়া বৈধ কিনা। এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম হাসান বসরী (রা.) বলেন, দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ শুয়ে পড়া জায়েজ রয়েছে। তাঁর দলিল হলো ইমরান ইবনে হুসাইনের উক্ত হাদীস।

ইমাম আবু হানীফা (র.) সহ অন্য তিন ইমামের মতে বিনা ওজরে নফল নামাজ শুয়ে পড়া জায়েজ নেই।

ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসের জ্ঞাবহ : আত্মা খাতাবী (র.) বলেন, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সেই অসুস্থ ফরজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কষ্টের সাথে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন। এ ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া বৈধ হলেও দাঁড়ানোর প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে বলা হয়েছে যে, বসে নামাজ পড়া দাঁড়ানোর অর্ধেক ছুওয়াব।

হযরত আত্মা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) বলেন, হাদীসটি মূলত অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে যে ছুওয়াব পাওয়া যেত, এ অবস্থায় বসে পড়লে এর অর্ধেক মিলবে। সুস্থ অবস্থায় অর্ধেক নয়; বরং সুস্থ অবস্থার সমান ছুওয়াব পাবে।

আত্মা সিন্ধী (র.) বলেন, হযরত ইমরান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা নামাজ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা একটির উপর অপরটির ফজিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব হাদীসের মর্মার্থ হবে, নামাজ ফরজ হোক বা নফল সুস্থ অবস্থায় বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার চাইতে অর্ধেক ছুওয়াব পাবে।

الدَّفْعُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٨١
أَيِّ أَمَامَةٍ (رَض) قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَوَى إِلَى
فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى يَذُرَّكَ
التُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ
يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ذَكَرَهُ الشَّوْرَى فِي
كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرَوَايَةِ ابْنِ السَّيْتِيِّ .

১১৮১. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় [অর্থাৎ অজু সহকারে] শয্যা গ্রহণ করে এবং আত্মাহর নাম-কালাম পড়তে থাকে, যে পর্যন্ত না তাকে তন্দ্রা অভিভূত করবে এবং রাতে যে কোনো সময় ডানে-বামে পাশ ফিরাতে আত্মাহর নিকট ইহ ও পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা করে, আত্মাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন। [কিতাবুল আযকার-নববী ইবনু সুননী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ঘুমানোর সময় পবিত্র হয়ে আত্মাহর জিকির সহকারে ঘুমানো একান্ত আবশ্যিক। কেননা এতে সে ব্যক্তি সারা রাত ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হয়।

عَنْ ١١٨٢
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
(رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجِبَ
رَتْنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ تَارَ عَنْ وَطَانِهِ

১১৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ

(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের প্রভু দু' প্রকার লোকেরা ব্যাপারে খুব সন্তুষ্ট হন— (১) এমন ব্যক্তি যে, তার নরম বিছানা ও গরম লেপ ত্যাগ

وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حُجَيْبٍ وَآهْلِهِ إِلَى
 صَلَوةٍ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَالِكِ كَيْتَبُهُ أَنْظَرُوا
 إِلَى عِبْدِي ثَارَ عَن فِرَاشِهِ وَوِطَانِهِ
 مِنْ بَيْنِ حُجَيْبٍ وَآهْلِهِ إِلَى صَلَوةٍ رَغْبَةً
 فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي وَ
 رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْتَهَزَمَ مَعَ
 أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْتِهَامِ
 وَمَالَهُ فِي التَّرْجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى
 هُرِقَ دَمَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَالِكِ كَيْتَبُهُ
 أَنْظَرُوا إِلَى عِبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا
 عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي (رَوَاهُ فِي
 شَرْحِ السُّنَنِ)

করে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী ও আপন পরিবারের নিকট হতে নামাজের জন্য সাগ্রহে উঠে গেল, আত্মা তা'আলা সেই ব্যক্তিকে দেখিয়ে নিজের ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার দিকে দেখ। সে তার নরম শয্যা ও গরম লেপ ত্যাগ করে তার প্রিয়তমা স্ত্রীলোকের ও তার পরিবারের নিকট হতে নামাজের জন্য উঠে এসেছে, আমার নিকট যে জিনিস আছে তার আগ্রহে [অর্থাৎ ছুওয়াবের আগ্রহে] এবং আমার নিকট যে জিনিস আছে [অর্থাৎ শান্তি] তার ভয়ে। আর (২) যে ব্যক্তি শুধু আত্মাহর উদ্দেশ্যে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরাজিত হয়ে নিজের সঙ্গীদের ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করেছে, অতঃপর সে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শনে কি অপরাধ রয়েছে এবং জিহাদে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কি ছুওয়াব রয়েছে, অতঃপর জিহাদের দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছে এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তাতে তার রক্তপাত হয়েছে [শহীদ হয়েছে], তখন আত্মাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে দেখ, আমার নিকট যে জিনিস [পুরস্কার] আছে, তার আগ্রহে এবং আমার নিকট যে জিনিস [শান্তি বা তিরস্কার] আছে, তার ভয়ে সে জিহাদের দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছে [শেষ পর্যন্ত তার রক্তপাত হয়েছে অর্থাৎ সে শহীদ হয়েছে]। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَانِيسَةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْتَهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْتِهَامِ وَمَالَهُ فِي التَّرْجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى هُرِقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَالِكِ كَيْتَبُهُ أَنْظَرُوا إِلَى عِبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

হানীসে বিন্ত হানীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দু'টি জিহাদের ফজিলত ও মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো আত্মা বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ। অন্য হাদীসে একে কঠোরতম জিহাদ বলা হয়েছে; যেমন— **أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ** হানীসে বর্ণিত প্রথমটি হলো এটাই। আর দ্বিতীয়টি হলো শরীয় জিহাদ যা জান মাল সহকারে কাফিরের বিরুদ্ধে লড়াইতে হয়। সার কথা কাজ উভয়টিই কঠোর। কেমন দৃঢ় প্রত্যয়ের ইমানের অধিকারী হলে এ দু'টি কাজ করা সম্ভব হয় তা সহজেই অনুমেয়। তাই আত্মাহ তা'আলা এদের প্রতি অভিশয় সম্বলিত প্রকাশ করেন।

التَّفَضُّلُ الثَّلَاثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۱۸۳ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (رَضِيَ
 قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَوةُ
 الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَوةِ قَالَ فَاتَيْتُ
 فَوَجَدْتَهُ يَصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي
 عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالِكُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

১১৮৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া [ছুওয়াবের বেলোয়] দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম, দেখলাম তিনি বসে বসে নামাজ পড়ছেন। এটা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাঁর মাথার উপর হাত রাখলাম। তখন হজুর ﷺ বললেন, কি

عَمِرُو قُلْتُمْ حَدِيثُ يَارَسُوَلِ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتُمْ
صَلْوَةَ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلْوَةِ
وَاَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالِ اَجَلٌ وَلَكِنِّي
لَسْتُ كَاَحَدٍ مِنْكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হে! আমরের পুত্র আব্দুল্লাহ! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি না কি বলেছেন, কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়ায় তার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অর্ধেক ছুঁয়াব, অথচ আপনি নিজেই বসে বসে নামাজ পড়ছেন। হুজুর ﷺ বললেন, অবশ্যই [তুমি যা বলেছ তা সত্য] তবে [আমার ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।] আমি তোমাদের কারো মতো নই। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : কথা বলার সময় হাতে হাত দেওয়া, কাঁধে বা মাথায় হাত রাখার নির্দেশ ও নিঃসংকোচ রীতি-নীতির প্রচলন আরব দেশে আবহমান কাল হতেই চলে এসেছে। এমনকি আজকালও এটা প্রচলিত আছে। তবে আল্লাহর রাসূলের মাথার উপর হাত রাখা বেয়াদবির অন্তর্গত নিশ্চয়ই এবং এটাও সত্য যে, যে কোনো সাহাবীই হুজুর ﷺ -কে সঙ্গম করতেন। কোনো সময় কেউই হুজুর ﷺ -এর কাঁধে বা মাথায় হাত রাখতেন না। তবে এখানে আব্দুল্লাহর এই আচরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সম্ভবত আব্দুল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, আত্মকর্মে অভিতুত হয়েই হুযুরের পবিত্র মাথার উপরে হাত রেখেছিলেন। যেহেতু তখনকার দিনে বিম্বয় প্রকাশের প্রতীকই ছিল মাথায় হাত রাখা। এ কারণে হুজুর ﷺ একে স্বাভাবিক আচরণ হিসাবেই ধরে নিয়েছেন এবং সক্রিয়তার সাথে গ্রহণ করেছেন। হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, হুজুর ﷺ -এর নামাজ পড়া শেষ হওয়ার পরই আব্দুল্লাহ হুযুরের মাথার উপরে হাত রেখেছিলেন।

আর আমি তোমাদের কারো মতো নই এ কথাই মর্মার্থ হলো, আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ হলেও আমি একজন নবী। তাই আমি বসে পড়লেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে দাঁড়িয়ে পড়ার ছুঁয়াব দান করবেন।

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْفَرِ
(رَضًا) قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ خُرَاعَةَ لَيْتَنِي
صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَانَتْهُمْ عَابُوا ذَلِكَ
عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بَلَاءُ أَرِحْنَا بِهَا -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১১৮৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সালেম ইবনে আবুল জা'দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি একদা বলল, 'যদি আমি নামাজ পড়তে পারতাম, তবে আরাম পেতাম।' উপস্থিত লোকেরা যেন তার এ কথাই মध्ये দোষের সন্ধান পেল। এটা উপলব্ধি করে সে তাদের ভুল ধারণা নিরাসনের জন্য বলল, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলালকে বলতেন, হে বেলাল! নামাজের একামত বা আযান দাও এবং এটা ঘারা আমাকে শান্তি দান কর। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দু' ধরনের শান্তি বা আরাম পাওয়া যায়, প্রথমত ফরজ নামাজ আদায়ের ফলে কর্তব্য সম্পাদনের ফলে মনে আরাম ও শান্তি অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত নামাজে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হলে দুনিয়ার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে মনে শান্তির সৃষ্টি হয়।

بَابُ الْوَتْرِ

পরিচ্ছেদ : বিতর নামাজ

الْوَتْرُ শব্দটি 'রাতের উপর যবর অথবা নিচে ঘের দিয়ে উভয়ভাবে পড়া জায়েজ'। এটি একবচন, বহুবচনে وَتْرًا শাব্দিক অর্থ- বেজোড়া। এর বিপরীত শব্দ হলো نَفْتَةٌ এখানে বিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিতর নামাজ। বিতর নামাজ সম্পর্কে অনেকগুলো মাসআলা রয়েছে, যা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٨٥
ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى
مَثْنِي فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى
رُكْعَةً وَاحِدَةً تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের নামাজ দু' দু' রাকাত করে জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা করে সে এক রাকাত নামাজ [শেষের দিকে] পড়বে। এটা তার পূর্বে আদায়কৃত জোড়া নামাজকে বিতর অর্থাৎ বেজোড়া করে দেবে। -বুখারী ও মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতর নামাজ সম্পর্কে মতভেদ : বিতর নামাজ মোট কয় রাকাত এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, আইম্মানে সালাসা অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেকের অভিমত হলো, বিতর নামাজ এক হতে সাত রাকাত পর্যন্ত পড়া জায়েজ, এর অতিরিক্ত নয়। এ ইমামদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একাই কয়েকটি মত রয়েছে। যেমন- (১) বিতর নামাজ এক রাকাত। (২) বিতর নামাজ দু' সালামের সাথে তিন রাকাত। (৩) বিতর নামাজ তিন রাকাত, এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী। (৪) ইমাম শাফেয়ীর চতুর্থ অভিমত হলো, নামাজ ইচ্ছানুযায়ী এক রাকাত, তিন রাকাত, পাঁচ রাকাত, সাত রাকাত, নয় রাকাত বা এগারো রাকাত পড়তে পারবে।

* উল্লেখ্য ইমাম মালেক (র.)-কে বিতর নামাজ এক রাকাত প্রবক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মুয়াত্তায়ে মালেকে দেখা যায় যে, বিতর নামাজ এক রাকাত পড়া তাঁর নিকট জায়েজ নয়। মুয়াত্তায় হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে بِوَاحِدَةٍ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ এর পরেই ইমাম মালেকের কথা এভাবে এসেছে যে,

وَلَيْسَ عَلَيَّ هَذَا الْعَمَلِ وَلَكِنْ أَدْنَى الْوَتْرِ ثَلَاثٌ

* ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমত ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুকূলে হলেও মাআরেফুস সুন্নাহের (৪র্থ খণ্ড- ২২০ পৃ.) মধ্যে ইমাম নববী উল্লেখ করেন যে, ইমাম আহমদ (রা.)-এর এক অভিমত ইমাম আবু হানীফার অনুকূলে। অতএব ইমাম শাফেয়ী বাতীল আর কেউই জোরালোভাবে এক রাকাতের প্রবক্তা নয়।

ইমাম আবু হানীফা, সুফয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক প্রমুখের মতে বিতর নামাজ এক সালামে তিন রাকাত। এটা নির্ধারিত। এক রাকাত পড়লে তা আদায় হবে না। সাহাবী, তাবয়ী ও ফোকাহাদের মধ্যে যারা এ মতে ছিলেন তাঁরা হলেন আমর (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), হযায়ফা (রা.), উবাই ইবনে কা'ব (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আনাস (রা.), আবু উমামা (রা.), ওমর ইবনে আব্দুল আশীয (র.), সাজান ফোকাহা (الْمَنْفَعَةُ السَّبْعَةُ) ও কৃষাবাসীগণ।

প্রথম পক্ষের দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁর সমর্থকগণ সে সমস্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেছেন যাতে
 أَوتِرَ بِرَكْعَةٍ هَذِهِ أَوْتِرَ بِسَبْعٍ হতে অট্র ব্রক'এ শব্দ রয়েছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

- (১) عَنِ ابْنِ عَمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَوَةُ اللَّيْلِ مَعْنَى مَفْنَى إِذَا حَشَى أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْتِرَ لَهُ مَا قَدَّ صَلَّى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
- (২) عَنِ ابْنِ عَمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَعْنَى مَفْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)
- (৩) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَسَلَّمَ أَوْتِرَ بِرَكْعَةٍ . (رَوَاهُ دَارَقُطْنِي)
- (৪) عَنْ عَائِشَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِرَكْعَةٍ وَسَجْدٌ بِسَجْدَتَيْ النَّعْرِ قَدِيمٌ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা নিম্নতরের অভিমতের পক্ষে দলিল পেশ করেন-

- (১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْلِمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوَيْتِ .
- (২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَسْلِمُ إِلَّا فِي أُخْرَاهِنَّ .
- (৩) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوَيْتِ النَّهَارِ أَوْ كَصَلَوَةِ الْمَغْرِبِ .
- (৪) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ اسْمٌ وَقُلَّ بِأَيُّهَا الْكُافِرُونَ وَقُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يَسْلِمُ إِلَّا فِي أُخْرَاهِنَّ . (رَوَاهُ التَّسَانِيُّ)
- (৫) عَنْ عَلِيٍّ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)
- (৬) عَنِ الشُّسُورِيِّ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ دَفَعْنَا أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا فَقَالَ عَمْرٌ (رض) إِنِّي لَمْ أَوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَعْنَا وَرَأَتْهُ فَصَلَّى بِثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَسْلِمْ إِلَّا فِي أُخْرَاهِنَّ .
- (৭) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ لِعَائِشَةَ (رض) بِحَمَّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسَبْعٍ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
- (৮) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبْعٍ اسْمٌ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ يَقُلُّ يَا أَيُّهَا الْكُافِرُونَ وَفِي الثَّلَاثَةِ يَقُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعْمُودَتَيْنِ .

উল্লেখ্য যে, বিতর নামাজ যে তিন রাকাত উপরোক্ত হাদীসমূহ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। এছাড়াও তিন রাকাতের অনুকূলে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে পরিত্যাগ করা হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে জবাব : ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ যে দলিল প্রদান করেছেন, তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের উত্তরে বলা যায় যে, তাতে অট্র ব্রক'এ কথা রয়েছে, এর দ্বারা একথা বুঝান উদ্দেশ্য নয় যে, বাসুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র এক রাকাত পড়ে বিতর আদায় করতেন; বরং এর উদ্দেশ্য হলো তিনি দু' দু' রাকাত করে পড়তেন এবং শেষের দু' রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর বা বেজোড় করতেন। আর এ জন্যই বলা হয়েছে تَوْتِرَ لَهُ مَا قَدَّ صَلَّى

৪. চতুর্থ দলিলে 'দারাকুতনী'তে বর্ণিত অট্র ব্রক'এ হাদীস নেওয়া হয়েছে। এর উত্তর হলো, দু' রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিত করে বিতর বা বেজোড় করতে হবে।

عَنْ ۱۱৮৬ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,
বিতর হলো এক রাকাত নামাজ রাতের শেষাংশে।
-[মুসলিম]

عَنْ ۱۱৮৭ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ كَانَتْ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ
عَشْرَةَ رَكْعَةً يَوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا
يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৮৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে [কখনো
কখনো] তেরো রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে পাঁচ
রাকাত বিতর পড়তেন, যার শেষ রাকাত ছাড়া তিনি আর
কোথাও বসতেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱১৮৬ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তেরো রাকাত নামাজ
পড়তেন এবং এর শেষ পাঁচ রাকাত এক সালামে সমাণ্ড করতেন। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাহাজ্জুদ নামাজ
আদায় করতেন। আর অন্যান্য হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক দু' দু' রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন। অথচ এই
হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি পাঁচ রাকাতের মধ্যে কোথাও বসতেন না। অতএব স্বভাবতই হাদীসগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য
লক্ষ্য করা যায়। হাদীস বিশারদগণ এর সমাধান নিম্নরূপ প্রদান করেছেন-

عَنْ ۱১৮৬ -এর দ্বারা সে সমস্ত হাদীসের ভাষা রহিত করা উদ্দেশ্য, যাতে বর্ণনা
করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন এবং প্রত্যেক রাকাত সালাম ফিরাতেন।

দ্বিতীয়ত আলোচ্য হাদীস দ্বারা এক বৈঠকে এবং এক সালামে পাঁচ রাকাত নামাজ সমাণ্ড করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা
উদ্দেশ্য হলো উক্ত পাঁচ রাকাতের প্রথম তিন রাকাত হলো বিতরের এবং বাকি দু' রাকাত বিতর-পরবর্তী নফল। আর এ দু'
রাকাত বিতরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে রাসূল ﷺ তিন রাকাতের পর না বসেই পাঁচ রাকাত আদায় করে ফেলেতেন।
উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা আরম্ভ শাযীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত পাঁচ রাকাতের প্রথম তিন রাকাত ছিল বিতরের
এবং দু' রাকাত বিতরের পরের নফল নামাজ, যা তিনি একই সালামে সমাণ্ড করতেন।

عَنْ ۱১৮৮ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ (رَحِمَهُ) قَالَ
إِنْ طَلَفْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ قَالَتْ أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلْتُ بَلَى
قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ
الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي
عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نَعْبُدُ
لَهُ سِرَاكَةً وَطَهْرَةَ فَيَبْعُثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ

১১৮৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সা'দ ইবনে
হিশাম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি
হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ
ﷺ আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে কিছু অবহিত করুন। জবাবে
তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? উত্তরে আমি
বললাম, হ্যাঁ-নিশ্চয়ই পড়ি। তিনি বললেন, নবী করীম
ﷺ -এর আখলাক-চরিত্র ছিল কুরআন। [অর্থাৎ কুরআনে যে
উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, এর সবই তাঁর চরিত্রে
ছিল।] অতঃপর আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল
মু'মিনীন! এবার আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكَ وَيَتَوَضَّأُ
وَيُصَلِّيَ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا
إِلَّا فِي الثَّمَانَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ
وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يَسْلِمُ فَيُصَلِّيُ
التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ
وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَسْلِمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ
يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَمَا يَسْلِمُ وَهُوَ
قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَأْتِي
فَلَمَّا أَسَنَّ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْ تَرَ يَسْبِغُ
وَصَنَعَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ فِي
الْأُولَى فَتِلْكَ تِسْعَ يَأْتِي وَكَانَ نَبِيُّ
اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلْوَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ
عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلِبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ عَنْ
قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ
عَشْرَةَ رَكَعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ
الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى
الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ
رَمَضَانَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বিতর নামাজ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তার মেসুওয়াক এবং অজুর পানি প্রস্তুত রাখতাম এবং আল্লাহ তা'আলা রাতে যখন চাইতেন তাঁকে উঠিয়ে দিতেন এবং তিনি মেসুওয়াক করতেন এবং অজু করতেন। তারপর নয় রাকাত নামাজ পড়তেন, যার অষ্টম রাকাত ব্যতীত আর কোথাও বসতেন না। অষ্টম রাকাতে বসে তিনি আল্লাহর জিকির, হাম্দ ও ছানা এবং দোয়া করতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে যেতেন-সালাম ফিরাতেন না। তারপর নবম রাকাত পড়তেন এবং বসতেন আর আল্লাহর জিকির, হাম্দ, ছানা ও দোয়া করতেন অতঃপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর [অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পর] বসে বসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। এই মিলিয়ে মোট এগারো রাকাত হতো। হে বৎস! যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বয়োবৃদ্ধ হলেন এবং শরীর ভারি হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদ সহ সাত রাকাতে বিতর নামাজ পড়তেন এবং দু' রাকাত পূর্বের ন্যায় বসে বসে আদায় করতেন, এই সহ মোট নয় রাকাত হতো। হে প্রিয় বৎস! নবী ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন কোনো নফল নামাজ পড়তেন তা নিয়মিত পড়তে ভালবাসতেন এবং যখন নিদ্রার প্রভাবের কারণে অথবা কোনো রোগের দরুন রাতে নামাজ হতে বিরত থাকতেন, তখন দিনের বেলায় বারো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন। এটা ছাড়া আমি অবগত নই যে, মহানবী ﷺ কখনও এক রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছেন অথবা ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাত নামাজে কাটিয়েছেন; না রমজান মাস ব্যতীত কোনো পূর্ণমাস রোজা রেখেছেন। -[যুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُلُوُّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ -এর ব্যাখ্যা : "নবী করীম ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন"- মুহাম্মদসগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ কথার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—

- আল্লামা জীহী (র.) বলেন, এর দ্বারা কুরআনের সেই সমস্ত আয়াতাবলিকে বুঝানো হয়েছে, যাতে আল্লাহ রাসূল আলামীন রাসূল ﷺ-কে উত্তম চরিত্র গ্রহণের এবং খারাপ চরিত্র হতে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, حُذِرْ، الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالتَّعَرُّبِ وَأَعْرَضَ عَنِ التَّجَاهِلِينَ অর্থাৎ বাহ্যিক [দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে] আচরণ [সমীচীন মনে হয় তা] গ্রহণ করুন আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মুর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন। [আ'রাফ : ১৯৯] এ ধরনের আরো অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যথা—

১. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَضْرِبْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ ۝ ۧ [সোফকমান : ১১৭]

২. قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ (الآيَة) [নাহল : ৯০]

৩. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْتَبِرْهُمْ وَأَصْفَح ۝ ۧ [মায়দা : ১৩]

৪. وَأَدْفَعْ بِالْيَسْرِ هِيَ أَحْسَنُ [হা-মীম-আস সাজ্জদা : ৩৪]

৫. وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ [আলে ইমরান : ১৩৪]

২. অথবা হযরত আয়েশা (রা.) কَانَ خُلْفُهُ الْقُرْآنُ ঘারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূল ﷺ ছিলেন আদ্যাহর চরিখে চরিখবান। অর্থাৎ আদ্যাহর নির্দেশিত পথই ছিল রাসূলের চরিখ।

৩. যে সমস্ত উত্তম চরিখ, শিষ্টাচার উল্লিখিত হয়েছে এর আলোকে এক কথায় বলা যায়, কুরআনে বিবৃত যাবতীয় উত্তম চরিখের সমন্বয় ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে। যার সুস্পষ্ট ইশারা পাওয়া যায় রাসূল ﷺ-এর নিহোক্ত উক্তিৰ মাখে। রাসূল ﷺ বলেন, لاَ يَفِيضُ لَكُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি উত্তম চরিখের পরিপূর্ণতার জন্য শ্রেিত্রিত হয়েছি।

৪. কারো মতে এর অর্থ হলো, কুরআনেই তাঁর চরিখ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যেমন- আদ্যাহ জা'আলা এরশাদ করেন, وَأَشَدُّ رَأْفَةً لَكُمْ أَنِّي كُنْتُ خُلْفَةَ الْقُرْآنِ অর্থাৎ নিচয়ই আপনি মহৎ চরিখের উপর অধিষ্ঠিত।

৫. আদ্যাহা যুবকানী (র.) বলেন, কুরআনের হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে, এর শিষ্টাচারে শিষ্টাচারী হওয়ার বেলায় এবং এতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত ও ঘটনাসমূহ অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারে কুরআন হলো রাসূল ﷺ-এর চরিখ।

৬. আদ্যাহা শাকীর আহমদ উসমানী (র.) কَانَ خُلْفُهُ الْقُرْآنُ-এর অর্থ বর্ণনায় বলেন, কুরআনের আহকাম ও তার শিক্ষা রাসূল ﷺ-এর সেই স্বভাবগত চরিখের ন্যায়, যার উপর রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সংক্ষেপে বলা চলে, কুরআন হলো জ্ঞানভাগার, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন, সেই ভাগারের যথার্থ ও বস্তব অনুসারী।

‘অষ্টম রাকাত ছাড়া তাশাহহুদের জন্য বসতেন না’ বাকটি ‘সিয়াকে কালাম’ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ এর অর্থ বলেন যে, তাশাহহুদের জন্য বসার অর্থই হলো সালাম ফিরিয়ে নামাজ সমাপ্ত করা। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি মোটেই বসতেন না। বরং অর্থ এই যে, তিনি বসতেন, কিন্তু সালাম ফিরিয়ে নামাজ সমাপ্ত করতেন না। নতুবা এ হাদীসটি সহীহ হাদীস সমূহের বিপরীত হয়ে পড়ে। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক দু’ রাকাতের পরে বৈঠক আছে। দু’ রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হোক, বা তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজই হোক, আট রাকাত নামাজ একসাথে পরলেও প্রতি দু’ রাকাতে বৈঠক হবে।

‘অতঃপর দু’ রাকাত বসে পড়তেন’ এর ঘারা উদ্দেশ্য হলো বিতরকে রাতের শেষ নামাজ বলা হলেও এরপর নফল পড়া যে জায়েজ তা আমাদেরকে বুঝাবার জন্যই কখনো কখনো উক্ত দু’ রাকাত বিতরের পর পড়েছেন।

বিতরের পর দু’ রাকাত নামাজের হুকুম : বিতরের পর দু’ রাকাত নামাজ পড়া জায়েজ কিনা এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

إِمْلَعُوا أُخْرَىٰ ۖ إِنَّ أَوْلَىٰ لِغَيْرِكُمْ فِي هَذِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [সূরা বাকার : ১৮৫] অর্থ ইমামদের মতে বিতরের পর দু’ রাকাত নামাজ পড়তে হবে না। তিনি রাসূলের হাদীস أَخْرَىٰ ۖ إِنَّ أَوْلَىٰ لِغَيْرِكُمْ فِي هَذِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ উল্লেখ করে বলেন, রাসূল ﷺ এ হাদীস ঘারা রাতের শেষ নামাজ বিতর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিতরের পর কোনো নামাজ নেই।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, বিতরের পরের দু’ রাকাত নামাজ আমি পড়ি না, অবশ্য কেউ পড়লে তা আমি নিষেধ করি না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এ সম্পর্কে কোনো অভিমত পাওয়া যায়নি। কিন্তু মূল কথা হলো, বিতরের পরে দু’ রাকাত নামাজ বহু হাদীস ঘারা প্রমাণিত হয়। জমহুর ওলামা এ কথাই বলেছেন। এ কথার সমর্থনের হাদীসগুলো নিম্নরূপ-

(১) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي بَعْدَ الْوَيْتْرِ رَكْعَتَيْنِ .

(২) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي بِهَا بَعْدَ الْوَيْتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلَّ

بَابُهَا الْكُفْرُونَ . (طَبَاوِي . بَابُ الطَّلُوعِ بَعْدَ الْوَيْتْرِ)

(৩) عَنْ عَابِثَةَ (رض) تَبَدَّلَتْ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي ثِنْتَانَ رُكْعَاتٍ ثُمَّ يُؤْتِي رُكْعَةً رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَائِسٌ مَاذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَأَمَّ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَيْنَ التَّلَاةِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ . (مُسْلِمٌ) . (بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ)

(৪) عَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَيَقْلُ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدَكُمْ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ (سُنُّنُ دَارِ قُطَيْبٍ) . (بَابُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُتْرِ)

(৫) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَائِسٌ وَيَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِآيَةِ الْقُرْآنِ مَاذَا زُلْزِلَتْ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ .

ভাঁদের জবাব : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বিতর দ্বারা রাতের নামাজ শেষ করতে বলেছেন, পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতরের পরে দু' রাকাত নামাজ রয়েছে। উভয় হাদীসের সমাধান নিম্নে প্রদান করা হলো-

- সহীহ হাদীস দ্বারা বিতরের পর দু' রাকাত নামাজ সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে **وَتَرَا** অর্থ সমাধান এভাবে দেওয়া যায় যে, উক্ত হাদীসের নির্দেশ দ্বারা মোস্তাহাব বুঝানো হয়েছে, ওয়াজিব বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ রাতে সর্বশেষে বিতর নামাজ পড়া মোস্তাহাব।
- অথবা এর উত্তরে আত্তাম্মা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, শেষের দু' রাকাত পড়া হয় বিতরের পরিপূর্ণতার জন্য। সুতরাং এ দু' রাকাত বিতরেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ দু' রাকাতের মাধ্যমে নামাজ শেষ করলে মূলত বিতর দ্বারাই শেষ করা হয়েছে বলা যাবে। আত্তাম্মা ইবনুল কায়েমও একরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- আত্তাম্মা ইমাম নববী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে শেষে দু' রাকাত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু জায়েজের ভিত্তিতেই হয়েছে। রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে তা পড়তেন, সর্বদা তিনি এটা আদায় করতেন না।

وَعَنْ أَبِي عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَوَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৮৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের রাতের শেষ নামাজকে বিতর বা বেজোড় করবে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۱۹۰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُتْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৯০. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.), রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা সুবেহ সাদেকের পূর্বেই তাড়াতাড়ি বিতর পড়ে নেবে।

وَعَنْ ۱۱۹۱ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوْلَهُ وَمَنْ طَمَعُ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৯১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির এ আশঙ্কা রয়েছে যে, শেষ রাতে উঠতে পারবে কি-না, সে যেন প্রথম রাতেই বিতর নামাজ পড়ে নেয়। যার শেষ রাতে উঠার নিশ্চয়তা আছে সে যেন শেষ রাতেই বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামাজে [আপ্লাহর রহমত নিয়ে] রহমতের ফেরেশতাগণ হাজির থাকেন। এটাই [অর্থাৎ বিতর শেষ রাতে পড়াই] হলো উত্তম কাজ। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতরের সময় নিয়ে মতপার্থক্য : বিতরের নামাজের সময় সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে— ইমাম শাফেঈ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) সহ যারা বলেন, বিতর নামাজ সুন্নত, তাঁদের মতে বিতরের ওয়াক্ত হলো এশার পর। এশার সাথে সাথে নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এশার যে সময় বিতরেরও ঠিক একই সময়। উভয় মাযহাব মতে এশার পূর্বে বিতর নামাজ আদায় করা বেধ নয়।

উল্লেখ্য যে, বিতরের মূল ওয়াক্ত যখনই হোক না কেন এর মোত্তাহাব সময় হলো শেষ রাত। কেননা এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا سُلِّتَ عَنْ وَتْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ تَارَةً يُؤْتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَتَارَةً فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَتَارَةً فِي آخِرِ اللَّيْلِ .

শেষ রাতের বিতর সে ব্যক্তির জন্য মোত্তাহাব, যার ঘুমের কারণে বিতর ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, আর যদি ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এশার পর পরই পড়া ওয়াজিব।

—এই ব্যাখ্যা : শেষ রজনীতে নামাজে লিপ্ত থাকা অতি উত্তম আমল। এ সময় আত্মাহর রহমতের ফেরেশতাগণ নামাজির নিকট উপস্থিত থাকেন এবং এ ব্যক্তির জন্য তাঁরা আত্মাহর নিকট রহমত ও মাগফিরাতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজকে শেষ রজনীতে পড়ার কথা আলাচ্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مِنْ كَمَلِ اللَّيْلِ أَوْتِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، إِنَّتَهُى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৯২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের প্রত্যেক অংশেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ পড়েছেন। রাতের প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে এবং এর শেষ ভাগে; তাঁর বিতরের শেষ সময় ছিল রাতের শেষ অর্থাৎ সাহরীর সময় পর্যন্ত। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উচ্চ হাদীসের ব্যাখ্যা : এশার নামাজের পর হতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বিতর নামাজের ওয়াক্ত বিদ্যমান সূত্রাং এর মধ্যে যে কোনো সময়ে পড়লেই তা আদায় হয়ে যাবে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كَمَلِ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنْامَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৯৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন— (১) প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখতে। (২) দু' রাকাত চাশতের নামাজ পড়তে এবং (৩) ঘুমাবার পূর্বে বিতর নামাজ আদায় করতে। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উচ্চ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলাচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে তিনটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন— প্রথমত প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখা; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোজা, এই তিন দিনকে আইয়্যামে বীজ বলা হয়।

কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাসের প্রথম মধ্যম ও শেষ তারিখের রোজা।

কারো মতে প্রথম দশ দিনের মধ্যে পালিত রোজা।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সাধারণভাবে মাসের যে কোনো তিন দিনের রোজাকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত সর্বনিম্ন দু' রাকাত চাশতের নামাজ পড়া।

তৃতীয়ত ঘুমাবার পূর্বে বিতরের নামাজ পড়ে নেওয়া।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٩٤ غَضِيْفِ بْنِ الْحَارِثِ (رح) قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رض) أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يَوْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يَخْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفِئُ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَّتْ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْفَضْلُ الْأَخِيرُ)

১১৯৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত গুদাইফ ইবনে হারেছ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাকির গোসল [তাড়াতাড়ি] প্রথম রাতেই করতেন, নাকি শেষ রাতে করতেন। তিনি জবাবে বললেন, অনেক সময় তিনি প্রথম রাতে গোসল করতেন এবং অনেক সময় তিনি শেষ রাতে গোসল করতেন। আমি বললাম অর্থাৎ 'আল্লাহ অতি মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন'। আমি পুনরায় আরজ করলাম, রাসূল ﷺ কি প্রথম রাতে বিতর পড়তেন, না শেষ রাতে পড়তেন? তিনি [আয়েশা (রা.)] বললেন, তিনি অনেক সময় প্রথম রাতে বিতর পড়তেন, আবার অনেক সময় শেষ রাতে বিতর পড়তেন'। আমি বললাম, 'আল্লাহ আকবার, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।' আমি আবারও আরজ করলাম, রাসূল ﷺ কি [তাহাজ্জুদ] নামাজের কেরাত সশব্দে পাঠ করতেন, নাকি নিঃশব্দে পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি অনেক সময় সশব্দে কেরাত পাঠ করতেন। আবার অনেক সময় নিঃশব্দে কেরাত পাঠ করতেন। আমি বললাম, 'আল্লাহ আকবার। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।' -[আবু দাউদ। ইবনে মাজাহ্ হাদীসটির শেষাংশ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : রাবী গুদাইফ ইবনে হারেছ হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূল ﷺ -এর তিনটি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর তা হলো- (১) রাসূল ﷺ ফরজ গোসল কখন করেন, (২) বিতর নামাজ কখন পড়েন এবং (৩) রাতের [তাহাজ্জুদ] নামাজে তিনি কোন ধরনের কেরাত পাঠ করেন। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ গোসল কখনও রাতের প্রথমভাগে করতেন, আবার কখনো শেষ রাতে করতেন। বিতর নামাজ তিনি

বাতের প্রথম এবং শেষ উভয় সময়ই পড়তেন। আর তাহাজ্জুদ নামাজে মাঝে মাঝে কেবল সজ্জার পঠি করতেন, আবার নীরবেও পড়তেন। এটা শুনে রাবী প্রত্যেক বারই বলেছেন, “আল্লাহ আকবার, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার, যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।” মূলত শরিয়তের যাবতীয় আহকামই আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সহজে পালনীয় করে প্রণয়ন করেছেন। যেমন- অন্য হাদীসে এসেছে যে, **أَلَيْسَ يُسْرًا** অর্থাৎ, দীন ও শরিয়ত সহজ ও সরল। আর এরই জুলুস প্রমাণ হলো এ অধ্যায়ের বর্ণিত হাদীসটি।

وَعَنْ ١١٩٥
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ
قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رَضِيَ) بِكُمْ كَمَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ
بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ
وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقِصَ مِنْ
سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ. (رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ)

১১৯৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কায়েস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আরজ করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাকাত বিতর নামাজ পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, কখনো তিনি চার রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে বেজেড় করতেন, কখনো ছয় রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে, কখনো আট রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে, আবার কখনো দশ রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে বেজেড় করতেন। কিন্তু কখনো [তাহাজ্জুদসহ] সাত রাকাতের কম বিতর পড়তেন না এবং তেরো রাকাতের অধিকও পড়তেন না।
-[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উইট হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামাজ তিন রাকাত আর বাকিগুলো হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। তবে এখানে রূপকভাবে বিতরকে তাহাজ্জুদ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

وَعَنْ ١١٩٦
أَبِي أَيُّوبَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْوَتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১৯৬. অনুবাদ : হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিতর প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জরুরি। অবশ্য যে পাঁচ রাকাত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে। আর যে তিন রাকাত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে এবং যে এক রাকাত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে। [আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতরের নামাজ ওয়াজিব না সন্নত : বিতরের নামাজের হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, বিতর নামাজ ওয়াজিব। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবু ওবায়দা, যাহ্বাক, মুজাহিদ প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, বিতর নামাজ সন্নত। সাহেবাইন (র.)-ও এ মত সমর্থন করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমতের অনুকূলে দলিল হিসেবে বহু হাদীস উপস্থাপন করা যায়, যার কিছু নিম্নরূপ-

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

আলোচ্য হাদীসে বিতর অনাদায়কারীকে ফলিস মনা বলে বারবার উল্লেখ করেছেন, কাজেই বিতর ওয়াজিব, এটা এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُدَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيَصِلْهُ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ)

এতে বিতরের কাজা পড়ার নির্দেশ রয়েছে। অথচ ওয়াজিব ব্যতীত সন্নতের কোনো কাজা নেই।

(৩) عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَ يُحِبُّ الْوُتْرَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৪) عَنْ ابْنِ مَسْرُودٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْوُتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৫) عَنْ أَبِي أَرْبَابٍ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْخ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও সাহেবাইনের দলিল :

(১) رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ كُنِمَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمُ الْوُتْرُ وَالصُّحُفُ وَالْأَضْحَى .

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَابِلَةً خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

(৪) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَبِي أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ صَلَوَاتٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ)

(৫) قَالَ عَلِيُّ (رض) الْوُتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

এ সকল হাদীস-স্বারা বিতির নামাজ সন্নত প্রমাণিত হয়।

হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব : ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলসমূহের জবাব-

১. তাঁদের প্রথম দলিল كُنِمَتْ عَلَيَّ-এর জবাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা বিতরের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে; ওয়াজিবকে নয়। কেননা كُنِمَتْ শব্দটি ফরজকে বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়, যেমন কুরআনে এসেছে-

كُنِمَتْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

২-৩. তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলিলের জবাবে বলা যায় যে, এগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত আর কোনো ফরজ নামাজ নেই, যা আমাদেরও অভিমত, কিন্তু এর দ্বারা বিতর নামাজ যে ওয়াজিব নয় তা সাব্যস্ত করে না।

৪. চতুর্থ দলিলের জবাবে বলা যায় যে, এখানে لَيْسَ بِحَتْمٍ অর্থ كُنِمَتْ بِغَرَضٍ বাক্য পরবর্তী বাক্য كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ-এর সম্পষ্ট প্রমাণ, অর্থাৎ বিতর অন্যান্য ফরজ নামাজের মতো নয়।

وَعَنْ ۱۱۹۷
اللَّهُ ﷻ إِنَّ اللَّهَ وَتَرَ يُحِبُّ الْوُتْرَ فَأَوْتِرُوا
يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ)

১১৯৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ স্বয়ং বেজোড়, তিনি ভালবাসেন বেজোড়কে। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারী সম্প্রদায়! মুসলমানগণ! তোমরা বেজোড় [বিতর] নামাজ পড়ো। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَا أَهْلَ الْبُرْجَانِ -এর মর্মার্থ : 'আহলুল কুরআন' দ্বারা সাধারণভাবে সে সকল মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান এনেছে। চাই তা পড়তে সক্ষম হোক আর নাই হোক। অথবা যে ব্যক্তি এটা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেছে অথবা মুখস্থ করেছে, এর মর্মার্থ উপলব্ধি করেছে, এর হুকুম-আহকাম যথাযথ পালন করেছে এবং এর সীমারেখার অনুসরণ করেছে, সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ حَارِجَةَ بِنِ حُدَافَةَ (رَضَا) قَالَ
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ
أَمَدَكُمْ بِصَلْوَةِ هَمِي خَيْرَ لَكُمْ مِنْ حَمْرِ
النَّعَمِ الْوَتِيرِ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ
صَلْوَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ -
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

১১৯৮. অনুবাদ : হযরত খারেজা ইবনে হযাফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নামাজের দ্বারা সাহায্য করেছেন [অর্থাৎ পাঁচ নামাজ হতেও আরও অতিরিক্ত একটি নামাজ দান করেছেন] এটা তোমাদের জন্য লাল উট হতেও শ্রেয়। তা হলো বিতর নামাজ। আল্লাহ তা'আলা এটা তোমাদের জন্য এশার নামাজ এবং সুবেহ সাদেক উদিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, লাল উট আরবদের কাছে অতি প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ। তাই তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (رَحَا) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَن وَتِيرِهِ
فَلْيَصِلْ إِذَا أَصْبَحَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

১১৯৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [কোনো কারণবশত] বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে যেন সকাল বেলায় তা কাযা আদায় করে। -[তিরমিধী মুরসাল হিসাবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতর নামাজ কাযা করার হুকুম : কারো বিতর নামাজ ছুটে গেলে তা যে কাযা পড়তে হবে, এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীনগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে আদায়ের সময় ও পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কাযার পক্ষে যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারা হলেন সাহাবীদের মধ্যে- হযরত আলী (রা.), সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), ইবনে ওমর (রা.), উবাদা ইবনে সামেত (রা.), আমের ইবনে রাবীয়া (রা.), আবুদ দারদা (রা.) মু'আয ইবনে জাবাল (রা.), মুজালা ইবনে উবাইদ (রা.) ও ইবনে আক্বাস (রা.)। তাবেয়ীদের মধ্যে- আমার ইবনে ওরাহ্বীল, উবাইদাতুস সালামানী, ইবরাহীম নাখরী, মুহাম্মদ ইবনে মুনতশির, আবুল আলিয়া ও হাম্বাদ ইবনে আবী সুলাইমান (র.)। ইমামদের মধ্যে- ইমাম আবু হানীফা, সুফয়ান সাওরী, আওয়ামী, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসাহক (র.) প্রমুখ।

إِخْتِلَافٌ أَلَيْسَ فِي وَتِيرِ النَّصَا: কাযা আদায়ের সময় সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : বিতর নামাজ কাযা হয়ে গেলে তা কখন আদায় করতে হবে এই বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. হযরত ইবনে আক্বাস (রা.), আতা ইবনে আবী রবাহ, মাসরূক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখরী, মাকছল, কাতাদা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসাহক (র.) প্রমুখের মতে ফজর নামাজ আদায়ের পূর্বে বিতর নামাজ কাযা করতে হবে।
২. ইমাম নাখরীর অপর আর একটি অভিমত হলো, সূর্য উদয়ের পূর্বে বিতর কাযা করতে হবে, চাই তা ফজর নামাজের পরে হোকনা কেন।

عَاقِبَتِ وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي
فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِي سِرِّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ
تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ
وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . (رواهُ
التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ
وَالدَّارِمِيُّ)

তুমি আমাকে পথপ্রদর্শন কর এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কর
যাদেরকে তুমি পথপ্রদর্শন করেছ। আমাকে শান্তি দান
কর, তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি শান্তি দান
করেছ। তুমি আমার অভিভাবক হও, তাদের অন্তর্ভুক্ত কর
যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি যা কিছু আমাকে দান
করেছ তাকে আমার জন্য কল্যাণকর কর। যাতে তুমি
অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছে তার অকল্যাণ হতে
আমাকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই আদেশ করতে পার,
তোমার উপরে আদেশ করা যেতে পারে না। নিশ্চয় যাকে
তুমি বন্ধু করেছ সে কখনও অপমানিত হয় না। হে আমার
প্রতিপালক তুমি বরকতময় ও মহীয়ান।—[তিরমিযী, আবু
দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতরের নামাজে কনুতের মাসআলা : বিতরের নামাজে দোয়ায় কনুত পড়ার কয়েকটি
মাসআলা রয়েছে, যা নিম্নরূপ— (১) পুরা বছর বিতরের নামাজে কনুত পড়তে হবে কি না? (২) কনুত রুকু পূর্বে না পরে?
(৩) দোয়ায় কনুত মূলত কোনটি। নিয়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

সব সময় বিতরের নামাজে কনুত পড়তে হবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিতর নামাজের কনুত সব সময়
পড়তে হবে। এর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইসহাক এই একই অভিমত ব্যক্ত
করেছেন। ইমাম আবু হানীফার দলিল হলো নিম্নের হাদীসটি—

رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلَى وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُمْ قَالُوا رَبَّنَا صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ يَا لَيْلِ لَيْلِ فَتَنَنْتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
ইমাম মালেক (র.)-এর মতে শুধুমাত্র রমজানের বিতর নামাজে দোয়ায় কনুত পড়তে হয়।

ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে এবং ইমাম আহমদের মতে বিতরের কনুত সারা বছর পড়তে হবে না; বরং রমজানের
শেষ অর্ধেক বিতর নামাজে কনুত পড়তে হবে। তিনি নিম্নের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন—

(১) رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ عُمَرَ (رض) أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ
الشَّهْرِ بَعَثَ رَمَضَانَ وَلَا يَقْتَتُ بِهِمْ إِلَّا فِي التَّصْفِ الْبَاقِي .
(২) رَوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَمَّهُمْ وَكَانَ يَقْتَتُ فِي التَّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

কনুত রুকু পূর্বে না পরে : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিতর নামাজের কনুত রুকু পূর্বে পড়তে হবে। ইমাম
মালেক, সুফয়য়ান সাওরী, আবুদ্বাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম ইসহাক প্রমুখ এই অভিমত পেশ করেছেন।

তাঁদে দলিল হলো—
(১) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ نَبْتَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ . (رواهُ ابْنُ مَاجَةَ)
(২) وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ (رض) وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَفْتَنُونَ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ইবনে সীরা প্রমুখের মতে রুকু পূর্বে কনুত পড়া সুলত। তাঁদের দলিল হলো, হযরত
আদী (রা.)-এর নিম্নোক্ত আমলটি। .

ইতর নামাজে যে দোয়ায় কনুত পড়া হয় মূলত তা কোনটি : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দোয়ায় কনুত হলো—

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِي سِرِّ مَا
قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَابَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দোয়ায়ে কনুত হলো-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَتُؤْمِنُ بِكَ وَتَعَوَّلُ عَلَيْكَ وَتُشْفِي عَلَيْنَا الْخَيْرَ وَتَشْكُرُكَ وَلَا تَكْفُرُكَ وَتَخْلَعُ وَتَنْزِعُ مَنْ عَمَّرَكَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ وَلَكَ نَسْأَلُكَ وَنَسْتَجِدُكَ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفَى وَنَرْجُو وَحَمَتَكَ وَتَخْفَى عَدَابَكَ إِنَّ عَدَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ -

وَعَنْ ١٢٠٢ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) وَزَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَبِيلٌ وَفِي رَوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنَ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

১২০২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই বিতরের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন, সুব্বহানালা মালিকিল্ কুদ্দুস। অর্থ- আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সার্বভৌম মহাসম্রাটের যিনি অতি পবিত্র।-[আবু দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী একথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, হুজুর ﷺ এটা তিন বার দীর্ঘ ভাবে বলেছেন। নাসায়ীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্বা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা আব্বা বলেছেন, হুজুর ﷺ যখন বিতর নামাজের সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেন, 'সুব্বহানালা মালিকিল কুদ্দুস'। তৃতীয় বারে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।

وَعَنْ ١٢٠٣ عَلِيٍّ (رض) قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتَرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَيَمَعَا فَاتِكَ مِنْ عَقْرَبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

১২০৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বিতর নামাজের শেষে বলতেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ الْخ - হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে, তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি হতে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার [অভিসম্পাত] হতে। আমি তোমার প্রশংসার হিসাব-নিকাশ করার ক্ষমতা রাখি না। তুমি তদ্রূপই যেক্রপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।-[আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসাংশে মহান রাক্বুল আলামীনের সীমাহীন গুণাবলির বর্ণনা করে বলেন, "আমি তোমার প্রশংসার হিসাব-নিকাশ করার ক্ষমতা রাখি না। তুমি তদ্রূপই, যেক্রপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।" এ কথার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কত মহান, কতই না মর্যাদার আসীনে সমাসীন। তিনি অতুলনীয়, তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ ﷺ-ও এ ব্যাপারে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা মীরাক বলেন, কারো মতে كَانَ এর মধ্যের كَانَ বর্ণটি অতিরিক্ত। তখন এর অর্থ হবে أَنْتَ الَّذِي أَثْنَيْتَ عَلَيَّ - অর্থাৎ তুমি এমন যে, তুমি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছ।

আবার কেউ বলেন, كَسَّ -এর মধ্যে كَ অবয়বটি মাওসুফা অথবা মাওসুফা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর يَنْفِلُ اَرْثَ كُنَى ہا উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত। তখন এর অর্থ হবে, তুমি এমন সত্তা যার রয়েছে সুমহান মর্যাদা ও মহা সম্মান। পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কুদরত তারই রয়েছে। তুমিই তোমার প্রশংসা নির্ধারণ করেছ। উল্লেখ্য এ প্রশংসা قَوْلِي হতে পারে এবং فِعْلِي -ও হতে পারে।

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٠٤ ابنِ عَبَّاسٍ (رض) فَيَلَّ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَنَا بِوَأَحِدَةٍ قَالِ أَصَابَ أَنَّهُ فَيَقِيهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالِ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَوْتَرَتْ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَخَبَّرَهُ فَقَالَ دَعْنِي فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আমীরুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি যে বিতরের নামাজ শুধু এক রাকাত পড়েন? জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তিনি ঠিকই করেন। কারণ তিনি একজন ফিকহবিদু [যারা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে ভাল জানেন]।

অপর এক বর্ণনায় আছে, [তাবেয়ী] ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এশার নামাজের পরে এক রাকাত বিতর পড়লেন, তখন তাঁর কাছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুক্ত করা গোলামও উপস্থিত ছিল। সে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে এসে এ খবর জানাল। এটা শুনে তিনি [ইবনে আব্বাস] বললেন, তার ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। তিনি নিজেই নবী করীম ﷺ -এর একজন সম্মানিত সাহাবী। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٢٠٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) هَيَّرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (را.) -এর আজাদকৃত গোলামের নাম : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যে গোলামটি আজাদ করেছিলেন এবং যার উল্লেখ উক্ত হাদীসে রয়েছে তাঁর নাম হলো কুরাইব।

عَنْ ١٢٠٥ بَرِيْدَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২০৫. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- বিতর নামাজ অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বিতর পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর অপরিহার্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়। বিতর নামাজ অপরিহার্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٢٠٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ বলেছেন, যে বিতর নামাজ পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং আমাদের পথ ও সত্যের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। এর দ্বারা বিতর নামাজ পরিহারকারীকে ইসলামের গণি হতে বের করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং তার দ্বারা বিতরের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। বিতর নামাজ শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত। বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায়,

রাসূল ﷺ ওয়াজিব ছাড়াও فَلَيْسَ مِنَّا -এর বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন-সুন্নত বর্জনকারী সম্পর্কে তিনি বলেন-
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي النَّبِيُّ نَسِيًّا نَسِيَ رَجَبًا عَنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -এর মধ্যে مِن হলে সম্পর্ক
 জাপক অব্যয়। যেমন আত্মাহ্বল বলেন- فَيَنْتَسِي النَّبِيَّ وَالْمَنَابِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ -এর মধ্যে مِن হলে সম্পর্ক জাপক অব্যয়।

وَعَنْ ١٢٠٦
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ
 نَسِيَهِ فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ .
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১২০৬. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে
 ব্যক্তি বিতর নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা পড়তে
 ভুলে যায়, যখনই তার স্মরণ পড়ে অথবা যখনই সজাগ হয়
 তখনই যেন সে তা পড়ে নেয়। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও
 ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٢٠٧
 مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
 ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ اجِبَ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَوْتَرَ
 الْمُسْلِمُونَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَرُدُّ عَلَيْهِ
 وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ
 أَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . (رَوَاهُ الْمُوطَّأُ)

১২০৭. অনুবাদ : ইমাম মালেক (রা.) হতে বর্ণিত।
 তাঁর নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি হযরত
 ইবনে ওমর (রা.)-কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এটা
 কি ওয়াজিব? তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন,
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ পড়েছেন, আর মুসলমানগণও
 বিতর নামাজ পড়েছেন। লোকটি বারবার এ কথাই
 জিজ্ঞাসা করতে থাকল, হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বারবার
 বলতে থাকলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ পড়েছেন
 এবং মুসলমানগণও বিতর নামাজ পড়েছেন -[মুয়াত্তা
 ইমাম মালেক]

وَعَنْ ١٢٠٨
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يقرأ فِيهِنَّ
 بِتَسْبِيعِ سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يقرأ فِي كُلِّ
 رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ أُخْرَهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১২০৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ তিন রাকআত
 পড়তেন। এতে তিনি কিসারে মুফাস্সাল সূরাসমূহের
 নয়টি সূরা পাঠ করতেন, প্রত্যেক রাকআতে তিনটি করে
 সূরা পাঠ করতেন, যার সর্বশেষ সূরাটি হতো 'ইখলাস' বা
 কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, রাসূলে করীম ﷺ বিতরের নামাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূরা পড়েছেন। যেমন- অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে,
 তিনি প্রথম রাকআতে সূরা কদর, তাক্বীর ও যুশযীলাত, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আসর, নদর ও কাওছার এবং তৃতীয় রাকআতে
 কাকেরুন, লাহাব ও ইখলাস পড়তেন।

عَنْ نَافِعٍ (رض) قَالَ كُنْتُ
مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيَّبَةٌ
فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ
انْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ
بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.
(رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২০৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত (রা.) নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি মক্কায় হযরত [আব্দুল্লাহ] ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে ছিলাম। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভোর হয়ে গেছে আশঙ্কায় এক রাকাত বিতর পড়ে নিলেন। যখন আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল, তিনি দেখলেন রাতের এখনও বাকি আছে। তখন তিনি এক রাকাত পড়ে বেজোড়কে জোড় করে নিলেন। অতঃপর দু' দু' রাকাত করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লেন। আবার যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করলেন এক রাকাত বিতর পড়ে নিলেন। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতরের নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : হযরত ইবনে ওমরের কার্যবলি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বিতর এক রাকাত পড়েছিলেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম ইসহাক বলেন, যদি কেউ প্রথম রাতে বিতর নামাজ পড়ে থাকে। অতঃপর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠে। তখন তাহাজ্জুদের শুরুতে এক রাকাত নামাজ পড়ে প্রথম রাতের বিতর বা বেজোড় নামাজকে জোড়া করে এবং সন্ধ্যা রাতের বিতরকে বাতিল করে দেবে। অতঃপর তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে এবং তাহাজ্জুদের শেষ যথারীতি বিতর নামাজ পড়বে।

ইবনে মুনিফির বলেন, হযরত উসমান, আলী, সা'দ, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকের মাহযাব এটাই ছিল। তারাও এভাবে এক রাকাত মিলিয়ে সন্ধ্যা রাতের বিতরকে বাতিল করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত এই হাদীস তাদের প্রমাণ। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হতো বিতর সম্পর্কে তিনি বলতেন, আমরা যখন সন্ধ্যা রাতে ঘুমানোর আগে বিতর পড়তাম এবং পরে শেষ রাতে যদি তাহাজ্জুদ পড়তে মনস্থ করি তখন এক রাকাত নামাজ পড়ে শুরুতেই সন্ধ্যা রাতের তিন রাকাত বিতরকে জোড়া পূর্ণ করে নেই। তারপর দু' দু' রাকাত করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ি। পরে তাহাজ্জুদ শেষ করে উক্ত দু' রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর বা বেজোড় করে নেই। কেননা হুজুর ﷺ আমাদেরকে তাহাজ্জুদের পরে বিতর পড়তে আদেশ করেছেন যে, যেন আমরা আমাদের রাতের নামাজ [তাহাজ্জুদের] শেষে বিতর পড়ি।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক এমনকি জ্ঞানহর সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতে প্রথম রাতে যে বিতর পড়া হলো, তাহাজ্জুদের সময় তাকে বাতিল করতে হবে না; বরং দু' রাকাত করে সুবেহে সাদেক পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়বে। কাজী ইয়ায বলেন, নামাজ বাতিল করা বৈধ নয়। কারণ কুরআন মাজীদে আছে যে, رَأَيْتُمْ لِرَبِّكُمْ وَلَا تُظِلُّوا, তোমরা তোমাদের কৃত ইবাদতকে বাতিল করো না। এ ছাড়া প্রথম রাতের বিতরের পরে নিন্দা, হদস, কথাবার্তা ও অন্যান্য নামাজ ভঙ্গ হওয়ার মতো কার্যবলি পাওয়া যাওয়ার পরেও এটা কোনোমতেই সম্ভব নয় যে, শেষ রাতের এক রাকাতকে প্রথম রাতের বিতরের সাথে মিলানো বা সংযুক্ত করা যায়। কারণ উভয়টি পৃথক দু' নামাজ।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ
جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ
ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ
ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ
الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২১০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [নফল নামাজ] বসে পড়তেন, আর এতে কেবলও বসেই পাঠ করতেন। যখন তাঁর কেবলও পাঠ ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকত, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় [অবশিষ্ট] কেবলও পাঠ করতেন। অতঃপর রুকু করতেন তারপর সেজদায় যেতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাততেও তিনি এর [প্রথম রাকাতের] অনুরূপ কাজ করতেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۲۱۱. أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكَعَتَيْنِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ حَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)

১২১১. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বিতরের নামাজের পর দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। -[তিরমিযী]

কিন্তু ইবনে মাজাহ্ এ কথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত দু' রাকাত ছিল সংক্ষিপ্ত তিনি এবং বসে পড়তেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱২১২. عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ يقرأ فِيهِمَا هُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعُ قَامَ فَرَكَعَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর পড়তেন এক রাকাত। অতঃপর দু' রাকাত [নফল] নামাজ বসে বসে পড়তেন। এই দু' রাকাতে কেবরাতও পড়তেন। যখন তিনি রুকু করতে ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কেবরাত পাঠ করে রুকু করতেন। -[ইবনে মাজাহ্]

১২১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর পড়তেন এক রাকাত। অতঃপর দু' রাকাত [নফল] নামাজ বসে বসে পড়তেন। এই দু' রাকাতে কেবরাতও পড়তেন। যখন তিনি রুকু করতে ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কেবরাত পাঠ করে রুকু করতেন। -[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱২১৩. ثَوْبَانَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّهْرَ جَهْدٌ وَيُقَلَّ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ فَإِنَّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَالْأَكَاثِمَاتِ لَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ)

১২১৩. অনুবাদ : হযরত ছাব্বান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় এই রাত্রি-জাগরণ খুব কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যখন তোমাদের কেউ বিতর নামাজ পড়ে, সে যেন দু' রাকাত নামাজ পড়ে। অতঃপর যদি সে রাতে উঠে নামাজ পড়তে পারল, ভাল কথা- অন্যথা তার দু' রাকাত নামাজই রাতের নামাজ হিসেবে যথেষ্ট হবে। -[তিরমিযী ও দারেমী]

১২১৩. অনুবাদ : হযরত ছাব্বান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় এই রাত্রি-জাগরণ খুব কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যখন তোমাদের কেউ বিতর নামাজ পড়ে, সে যেন দু' রাকাত নামাজ পড়ে। অতঃপর যদি সে রাতে উঠে নামাজ পড়তে পারল, ভাল কথা- অন্যথা তার দু' রাকাত নামাজই রাতের নামাজ হিসেবে যথেষ্ট হবে। -[তিরমিযী ও দারেমী]

وَعَنْ ۱২১৪. أَبِي أَمَامَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي بِهِنَّمَا بَعْدَ الْوُتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يقرأ فِيهِمَا إِذَا زَلَّزَلَتْ وَقُلَّ بِأَيْهَا الْكُفْرُونَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১২১৪. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজের পরে বসে বসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। এ রাকাতদ্বয়ে তিনি যথাক্রমে সূরা 'ইয়া যুলখিলাতিল আরদু ও সূরা কুল ইয়া আযুহাল কাফিরন' পাঠ করতেন। -[আহমদ]

بَابُ الْقُنُوتِ

পরিচ্ছেদ : দোয়ায়ে কুনূত

فُنُوتٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার, যার মূল অক্ষর হলো (ن.ن.ت) এর অনেক গুলো শাব্দিক অর্থ রয়েছে- যথা, আনুস্য করা, নীরব থাকা, দোয়া করা, একাধচিত্ততা অবলম্বন করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায় বিতর নামাজের শেষ রাকাতে যে বিশেষ দোয়া পাঠ করা হয় তাকে فُنُوتٌ دُعَاً বলা হয়।

মূলত কুনূত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

1. فُنُوتٌ نَارِيَةٌ একে فُنُوتٌ فِي الْفَجْرِ -ও বলা হয়। এটি মসিবত বা বিপদের সময় ফজরের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু'র পরে পড়া হয়। মহানবী ﷺ বীয়ে মাউনার ঘটনার পর দীর্ঘ একমাস যাবৎ কাফিরদেরকে বন্দদোয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটা পাঠ করেছেন।
2. فُنُوتٌ نَبِيِّ الْوَتْرِ এটা প্রত্যেক বিতরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু'র পূর্বে পড়া হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে কুনূত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢١٥
أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَا) أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ
أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَّتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيمًا
قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَالِدَيْنِ الرَّيْئِدِ
وَسَلْمَةَ بَنِ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ
اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا
سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ
يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِ اللَّهُمَّ الْعَن
فُلَاتًا وَفُلَاتًا لِأَخْيَائِي مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى
أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (الْأَبِيَةَ) -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২১৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো বিপক্ষে বা পক্ষে দোয়া করার ইচ্ছা করতেন তখন রুকু'র পরে দোয়া কুনূত পড়তেন। অনেক সময় যখন 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন, [তৎপর] বলতেন- হে আল্লাহ! মুক্তি দান কর ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে, সালমা ইবনে হিশামকে ও আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীয়া'কে। হে আল্লাহ, কঠোর কর তোমার শাস্তি 'মুযার' গোত্রের প্রতি, একে তাদের জন্য ইউসুফ (আ.)-এর দুর্ভিক্ষের অনুরূপ কর। এটা তিনি উচ্চঃস্বরে বলতেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর কোনো কোনো নামাজে আরবের কোনো কোনো গোত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি অভিসম্পাত কর অমুক অমুককে! যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজেল করলেন, [হে নবী!] এ ব্যাপারে আপনার কোনো অধিকার নেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

دُعَاً দোয়ার ঘটনা : আলোচ্য হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ব্যক্তির জন্য কাফেরদের প্রতি বন্দদোয়া করেছেন, যার ঘটনা নিম্নরূপ-

'ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ' ইনি ইসলামের বীর সেনানী, আল্লাহর তলোয়ার হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদদের সহোদর ভাই। কাফের অবস্থায় বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। ভাইগণ যুদ্ধপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করেন এবং মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার তাঁকে 'জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যুদ্ধপণ পরিশোধ করার পূর্বে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি কেন? উত্তরে বললেন, যদি আমি তখন ইসলাম গ্রহণ করতাম তাহলে লোকেরা ধারণা করত যে, আমি কয়েদী জীবন হতে উীতংশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার প্রতি লোকের এরূপ ধারণা জন্মানোকে আমি পছন্দ করিনি। ফলে তিনি মক্কার কাফেরদের হাতে বন্দী হন।

'সালামা ইবনে হিশাম' আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দূশমন আবু জাহলের সহোদর ভাই। আবু 'আইয়্যাশ ইবনে আবু রাবীয়া' আবু জাহলের বৈপিত্রয়ে ভাই। এরা উভয়ই মক্কার অধিবাসী এবং ইসলামের প্রথম যুগ হতেই মুসলমান ছিলেন। তাঁরা প্রথমে হাবশায় পরে মদীনায় হিজরত করেন, মদীনায় হিজরত করার পূর্বে কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে কঠোর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। হুজুর ﷺ এ সমস্ত অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দোয়া করেছিলেন। ফলে হুজুরের ﷺ দোয়ায় তাঁর তিন জনই মক্কা হতে পলায়ন করে মদীনায় হুজুর ﷺ-এর নিকট হিজরত করতে সক্ষম হন।

وَعَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ (رَض) قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ إِتْمَا قَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ أَنَسًا يَقُولُ لَهُمُ الْقُرَاءُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَصَابُوا فَنَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَيْهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২১৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আসেম আহওয়াল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, একদা আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে নামাজের কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন, কুনূত রুকুর আগে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু এক মাসকাল রুকুর পরে কুনূত পাঠ করেছিলেন সুনির্দিষ্টভাবে। এর কারণ এই ছিল যে, একবার তিনি 'বীরে-মা'উনার' দিকে ৭০ [সত্তর] জন লোক পাঠিয়ে ছিলেন- যাদেরকে স্থায়ী বলা হতো। তাদেরকে তথায় শহীদ করে দেওয়া হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবৎ রুকুর পরে কুনূত [কুনূতে-নাযিলা] পাঠ করেছিলেন। যাতে তিনি তাদের [হত্যাকারীদের] জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দোয়ায় কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে : হানাফী মাজহাব মতে ফজর নামাজে যে কুনূত পাঠ করা হয়, তাকে কুনূতে নাযেলা বলে। এটা সর্ব সখ্যাতিক্রমে রুকুর পরে পাঠ করতে হয়। এটা শুধু মুসলমানদের বিপদ-বিপর্যয়ের সময় পড়তে হয়। আর বিতরের নামাজে যে কুনূত পাঠ করা হয়, এটা রুকুর পূর্বে না পরে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

ইমাম শাফেরী ও আহমদ (র.)-এর অভিমত : তাঁদের মতে এ কুনূত রুকুর পর পাঠ করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত আনাস ও হাসান ইবনে আলীর হাদীস।

ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র.)-এর অভিমত : তাঁদের মতে কেবরাত শেষে রুকুর পূর্বে এ কুনূত পড়তে হবে। তাদের দলিল হলো-

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজে রুকুর আগেই দোয়ায় কুনূত পাঠ করতেন।
২. এরূপভাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুর পূর্বেই বিতর নামাজের কুনূত পাঠ করতেন। এরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে ওমরের হাদীসেও রয়েছে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : জবাবে বলা হয় যে, হাসান ইবনে আলীর হাদীসে যে কনুতের কথা উল্লেখ রয়েছে তা 'কনুতে নাযিলা'। কাজেই তা বিতরের কনুত নয়। তদ্রূপ হযরত আনাসের হাদীসেও কনুতে নাযিলায় কথা বলা হয়েছে, যা হজুর ﷺ এক মাস যাবৎ বীরে মা'উনার ঘটনাকে লক্ষ্য করে পড়েছিলেন। তাহাবী শরীফ, কাওকাবে দুররী, ইবনে মাজাহয় রেওয়ামাত হেদায়া কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রুকুয় পরের কনুত হলো নাযিলা, বিতরের কনুত নয়।

كُونُوتٌ فِي أَيِّ صَلَوةٍ يَتَرَأَى الْقُنُوتَ কোন নামাজে দোয়ায় কনুত পড়তে হবে : এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মতে ফজর নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুয় পরে, সেজদায় যাওয়ার আগে সর্বদা দোয়া কনুত পাঠ করা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু রমজান মাসের শেষার্ধে বিতর নামাজে দোয়ায় কনুত পাঠ করবে। আর কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে প্রত্যেক নামাজেই 'কনুতে নাযেলা' পড়া জায়েজ আছে।

হানাফীদের মতে বিতর নামাজের তৃতীয় রাকাতে কে-রাআত সমাপ্ত করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে সর্বদা দোয়ায় কনুত পাঠ করবে। আর ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোনো এলাকায় যে কোনো বিপদ-বিপর্যয় দেখা দিলে- শুধু ফজরের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুয় পরে দাঁড়িয়ে 'কনুতে নাযিলা' পাঠ করবে।

دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর দলিল :

۱. عَنْ أَنَسٍ (رض) مَا زَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا - (رَوَاهُ الدَّارُ الْقُطَيْبِيُّ وَغَيْرُهُ) হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ ইত্বেকাল পর্যন্ত ফজর নামাজে দোয়ায় কনুত পাঠ করতেন।

۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَرُكُوعِهِ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَالِدَ بْنَ الْوَالِدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু রমজানের শেষার্ধে দোয়ায় কনুত পড়ার অনুকূলে দলিল পেশ করেন যে, হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) [রমজানের তারাবীর জন্য] লোকজনকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে সমবেত করেন। আর তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ তাদের নামাজ পড়াতে; কিন্তু [রমজানের] শেষার্ধে ছাড়া কোনোদিন কনুত পাঠ করতেন না।

৩. হযরত বারুয়া (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ফজর নামাজে দোয়ায় কনুত পাঠ করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু রমজানের শেষার্ধে দোয়ায় কনুত পড়ার অনুকূলে দলিল পেশ করেন যে, হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) [রমজানের তারাবীর জন্য] লোকজনকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে সমবেত করেন। আর তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ তাদের নামাজ পড়াতে; কিন্তু [রমজানের] শেষার্ধে ছাড়া কোনোদিন কনুত পাঠ করতেন না।

دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ হানাফীদের দলিল :

১. হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজের শেষে বলতেন, আল্লাহুমা ইন্নী আউমু।

২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কনুতের বাক্য শিখিয়েছেন, যা আমি বিতরের কনুতে পাঠ করতাম 'আল্লাহুমা হাদিনী ফী মান হাদাইতা....' ইত্যাদি। এ দু'টি বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণত বিতর নামাজেই দোয়ায় কনুত পড়তে হবে। সুতরাং এটা সারা বৎসরই পড়তে হবে।

৩. হযরত আলকামা (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বিতর নামাজে রুকুয় পূর্বে কনুত পাঠ করতেন। বিতর নামাজে দোয়ায় কনুত পড়া সম্পর্কে আরও অনেক দলিল রয়েছে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : তাঁদের দলিলের জবাবে বলা যায় যে,

১. হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী। তিনি এক হাদীসে বলেন, হজুর ﷺ সারা বছর ফজরের নামাজে কনুত পাঠ করেছেন। আবার আরেক হাদীসে বলেন, হজুর ﷺ মাত্র একমাস কনুত পাঠ করেছেন, পরে তা ত্যাগ করেছেন। এমতাবস্থায় سَكَطًا سَكَطًا উভয় হাদীসই পরিহারযোগ্য বিবেচিত হবে।

২. আবু মালেক আশজায়ীর হাদীস যা সামনে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর পিতাকে ফজরের নামাজে কনুত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পিতা একে 'নতুন আবিষ্কৃত' তথা বিদ্'আত বলেছেন।

৩. হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) শুধু ফজর নামাজে কনুত পাঠ করাকে বিদ্'আত বলেছেন। আর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) শুধু রমজানের শেষার্ধে যে কনুত পাঠ করেছেন তা তার ব্যক্তিগত আমল। মারফু' হাদীসের মোকাবিলায় তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উপরের বিস্তারিত আলোচনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সারা বছর বিতর নামাজে দোয়ায়

কনূত পাঠ করতে হবে। আর ফজরের নামাজে হুজুর ﷺ যে এক মাস দোয়ায় কনূত পাঠ করেছিলেন, তা সাধারণ কনূত নয়, বরং 'কনূতে নাখিলা' বা মুসলমানদের বিপর্যয়ের সময় পড়া মোতাহাব। আর হুজুর ﷺ এটা বীরে মাউনার কারীদের উদ্দেশ্যে পাড়েছিলেন।

تَعْرِيفُ الْفُرَّاءِ السَّبْعِينَ সত্তরজন কারীর পরিচয় : আলোচ্য হাদীসে যে সত্তরজন লোকের কথা বলা হয়েছে তাঁরা সকলেই আহলে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন। দিনে কাঠ বিক্রয় করে নিজেদের ও সুফফাবাসীদের খাদ্য সংগ্রহ করতেন এবং রাতে কুঠআন আলোচনা করতেন। রাসূল ﷺ তাঁদেরকে চিঠি দিয়ে বীরে মাউনা নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানকার রেয়াল, যাকওয়ান ও উমাইয়া গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করে। রাসূল ﷺ এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। এ সত্তরজনের মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি মৃতপ্রায় অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়, আর এক ব্যক্তি নরশিশাদদের হাতে বন্দী থাকে। রাসূল ﷺ এ সকল গোত্রের জন্য কনূতে নায়েলায় বদদোয়া করেন।

وَإِعْمَةُ بَيْتِ مَعُونَةَ বীরে মাউনার ঘটনা : প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে চতুর্থ হিজরির সফর মাসে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়। আবু বারায়ী আমের রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন; কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত না হলেও ইসলামের প্রতি কোনোরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষও ব্যক্ত করেনি; বরং সে বলল, হে রাসূল! আপনি যদি কিছু লোক নজদে প্রেরণ করেন তবে সন্মত তারা ইমান গ্রহণ করতে পারে। রাসূল ﷺ এতে সন্দেহ প্রকাশ করলে সে বলল, আমি নিজ দায়িত্বে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করব। অতঃপর রাসূল ﷺ তার সাথে ৭০ জনের একটি জামাত পাঠিয়ে দেন। তারা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছেলে তারা নিজেদের একজনকে রাসূল ﷺ-এর পত্রসহ আমের ইবনে তুফাইল-এর নিকট প্রেরণ করলে সে রাসূল ﷺ-এর পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা, তাঁর পত্রবাহককে হত্যা করতে একজনকে ইস্তি প্রদান করে। অতঃপর সাহাবীদেরকে আক্রমণের জন্য বনী আমেরকে পরামর্শ দিলে তারা বলল, আমরা আবুল বারায়ী-এর অঙ্গীকারকে মিথ্যা হতে দিতে পারি না। অতঃপর তারা বনু সালীমের গোত্রে রেয়াল, যাকওয়ান ও বনু লাহুইয়ানকে উৎসাহিত করলে তারা আক্রমণের জন্য প্রতুতি গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা সাহাবীদেরকে ঘেরাও করলে সাহাবীগণ বলেন, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি; বরং আমরা রাসূল ﷺ-এর একটি পত্র নিয়ে এসেছি, নজদ যাচ্ছি; কিন্তু তারা সে কথার প্রতি জল্পেপ না করে বর্বরোচিত হামলা চালায়, যা ইতিহাসের পাতায় এক মর্মান্তিক অধ্যায় হিসেবে পরিচিত।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَمْرَةَ ١٢١٧
ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلْوَةِ
الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ
الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى يَدْعُو عَلَى أَحِبَّاءٍ مِنْ بَنِي
سُلَيْمٍ عَلَى رَعْلٍ وَ ذَكْوَانَ وَعَصِيْمَةَ وَيُؤْمِنُ
مَنْ خَلْفَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২১৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস যাবৎ এক নাগাড়ে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামাজের শেষ রাকাতে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ্ বলার পরে কনূত [নায়েলা] পাঠ করতেন। এতে তিনি বনী সলাইম গোত্রের রেয়াল, যাকওয়ান ও উসাইয়া শাখার প্রতি বদদোয়া করতেন। আর যারা রাসূল ﷺ-এর পিছনে থাকতেন সকলেই আমীন আমীন বলতেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কাজরের কনূত সর্বদা পড়তে হবে কি না? : ফজরের নামাজে সর্বদা কনূত পড়তে হবে কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

وَعَنْ ١٢١٩ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَا أَيْتَ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ قَالَ أَيْ بَنَى مُحَدَّثٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১২১৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবু মালেক আশ্জাজারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আকা! আপনি আমায় পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আকা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান এবং এখানে কুফায় প্রায় পাঁচ বছর যাবত হযরত আলী (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছেন। তাঁরা কি কনুত পড়েছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! এটা নতুন আবিষ্কৃত। -[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর যুগ হতে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত একমাত্র বিতিরের নামাজেই কনুত পড়া হতো, অন্য কোনো নামাজে কনুত পড়া হতো না। সম্ভবত তখনকার কোনো কোনো লোক সব সময় সব নামাজে কনুত পড়তে শুরু করেছিল। তাই তিনি সেটাকে বিদআত বলেছেন। অন্যথা অন্যান্য হাদীসে বিতর নামাজে কনুত পড়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّالِثُ

عَنْ ١٢٢٠ الْحَسَنِ (رحا) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّيَ بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَيَأْذَا كَانَتِ الْعِشْرُ الْأُخْرَى يَتَخَلَّفُ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِمْ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَى أَبِي - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَسَيَّلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَوَعَدَهُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২২০. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) লোকজনকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে [তারাবীহ নামাজের জন্য] জমায়েত করেন। তিনি তাদেরকে বিশদিন যাবৎ নামাজ পড়াতেন, কিন্তু [রমজানের] শেষাৰ্ধ ব্যতীত কোনোদিন কনুত পাঠ করতেন না। রমজানের শেষ দশদিন তিনি [মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে] বিরত থাকতেন; বরং নিজের ঘরেই নামাজ পড়তেন। এতে লোকেরা বলাবলি করত, উবাই পাণিয়েছে। -[আবু দাউদ] একদা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে দোয়ায়ে কনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু'র পরে কনুত পাঠ করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রুকু'র পূর্বে ও রুকু'র পরে [অর্থাৎ উভয় প্রকারেই পড়েছেন]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَبْنَیُّ-এর ব্যাখ্যা : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে নামাজ পড়াতেন না; বরং তিনি একাকী ঘরে নামাজ পড়তেন। আর এ জন্য লোকেরা তাকে أَبْنَیُّ [অর্থাৎ, উবাই পালিয়েছে] বলে আলোচনা করত।

১. আদ্যমা (র.) তীবী (র.) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সম্পর্কে أَبْنَیُّ-শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দনীয় ও অসৌজন্যমূলক বিধায় একে عَدُوُّ أَبْنِیِّ (পলাতক গোলাম)-এর সাথে তালবীহ বা সামঞ্জস্য বিধান করে أَبْنَیُّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় শত্রুর অনুমতি ব্যতীত স্বদেশ পরিত্যাগ করলে তাকে সোধান করে মহান রাক্বুল আলামীন বলেন, يَا كُرْرَانَءِ الْمَشْحُونِ إِذْ أَبَىٰ إِلَى الْغُلُوْلِ الْمَشْحُوْرِنِ এখানে মজাবীহ বা রূপক হিসাবে أَبْنَیُّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
২. অথবা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সম্পর্কে أَبْنَیُّ শব্দটি কৌতুকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত উবাই (রা.) কেন রমজানের শেষ দশদিন মসজিদ ত্যাগ করতেন? এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যেতে পারে- (১) হযরত উবাই (রা.) এটা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণার্থে করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ মাঝে মধ্যে তারাবীহের নামাজ একাকীও পড়তেন। আর এর কারণ ছিল, সর্বদা তাঁর জামাতের সাথে পড়ার কারণে এটা যেন ফরজ হয়ে না যায়। জামাত পরিহারের উদ্দেশ্য উভয়ের এক ও অভিন্ন না হলেও হযরত উবাই (রা.) রাসূল ﷺ-এর অনুসরণার্থেই এটা করেছেন। (২) অথবা হযরত উবাই (রা.)-এর রমজানের শেষ দশদিন জামাতে উপস্থিত না থাকা ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধার জন্য হতে পারে। (৩) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, শেষ দশদিন একাকী নিভৃত পরিবেশে নামাজ আদায়ের জন্য হযরত উবাই (রা.) হয়ত জামাত পরিত্যাগ করেছেন।
কুনুতে নাযিলা : নিম্নোক্ত দোয়াটি কুনুতে নাযেলা হিসাবে পরিচিত-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيْسَمَنْ هَدَيْتَ - وَعَافِنِيْ فَيْسَمَنْ عَافَيْتَ - وَتَوَلَّيْنِيْ فَيْسَمَنْ تَوَلَّيْتَ - وَبَارِكْ لِيْ فَيْسَمَا اَعْطَيْتَ وَقِيْرِيْ شَرًّا مَا فَضَيْتَ . فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُعْطَىٰ عَلَيْكَ . وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مِنْ وَاَلَيْتَ . وَلَا يَعْزُزُّ مِنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

ভারতীয় উপমহাদেশের কেউ কেউ উল্লিখিত দোয়ার সাথে কিছু বর্ধিত করে এ দোয়াটিকে سَأَلْتَنِيْ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فَيْسَمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فَيْسَمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنَا فَيْسَمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فَيْسَمَا اَعْطَيْتَ وَقِيْرَنَا شَرًّا مَا فَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُعْطَىٰ عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مِنْ وَاَلَيْتَ وَلَا يَعْزُزُّ مِنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَتَتَرَبَّأُ اِلَيْكَ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاٰلِ فَبَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَاصْرَفْهُمْ عَلٰى عَذُوْبِكَ وَعَذُوْبِهِمْ . اَللّٰهُمَّ لَتَهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ . اَللّٰهُمَّ اَلْمُنَّ الْكَفْرَةَ وَالْمَشْرِكِيْنَ وَالْمُنْجِدِيْنَ وَالشُّبُوْعِيِّيْنَ وَالْبُهُوْدَ وَالنَّصَارَى وَالنَّحْرُسَ وَالْهِنْدُوْسَ وَالرَّوَابِضَ وَالْقَابِلِيَّيْنِيْنَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِكَ وَكَذَّبُوْنَ رُسُلَكَ وَتَعَالَىٰ زَوْلِ اَوْلِيَاءِكَ . اَللّٰهُمَّ شَحِيْحَتْ شَمْلُهُمْ وَمَعْرِزُ جَمْعُهُمْ وَدَمِيْرُ دِيَارِهِمْ وَخَالِفُ بَيْنَ كَلِمَتِيْهِمْ وَ زَلْزَلُ اَقْدَامِهِمْ وَاَنْزَلُ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ .

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ : রমজান মাসে তারাবীহের নামাজ আদায়

আলোচনা অধ্যায়ে رَمَضَانَ شَهْرٍ وَمَا شَهْرُ رَمَضَانَ এর বহুবচন। এর শাস্তিক অর্থ হলো— আরাম বা বিশ্রাম করা, রমজানের এ নামাজে প্রতি চার রাকাত পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা হয় বিধায় একে تَرَاوِيعُ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে তারাবীহের নামাজ সম্পর্কে তিনটি আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। যথা— (১) তারাবীহের নামাজের বিধান, (২) তা কত রাকত এবং (৩) এটা জামাতে পড়ার বিধান।

১. তারাবীহের নামাজের বিধান : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, তারাবীহের নামাজ 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'। একদা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে মূল তারাবীহের নামাজ এবং হযরত ওমর (রা.) যে, হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর পিছনে সকলকে জামাতবন্দী করার ব্যবস্থা করেছিলেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, তারাবীহের নামাজ 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'। হযরত ওমর (রা.) যা করেছেন তা তার মনগড়া নয় বা নিজে একাকী করেন নি; বরং বহু সংখ্যক সাহাবীদেরকে নিয়ে তাঁদের উপস্থিতিতেই করেছিলেন। এ হিসেবে একে 'ইজমায়ে উমত'-ও বলা যায়। এ ছাড়া হাদীসেও এসেছে যে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنْ فَرَّضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ - (فَتْحُ الْقَدِيرِ)

২. তারাবীহের নামাজ কয় রাকাত : তারাবীহ-এর নামাজ কয় রাকাত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

ইমাম মালেক (রা.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ ৩৬ রাকাত, এর মধ্যে বিতর शामिल নয়। তিনি মদীনাবাসীদের আমল দ্বারা দলিল পেশ করেন। ইসহাক (র.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ ৪১ রাকাত।

ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রা.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত। কাজী ইয়ায (র.) বলেন, বিশ রাকাত হওয়াই জামহুর ইমামদের অভিমত। তাঁরা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন—

(১) رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى بِإِسْنَادٍ صَوِّحَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ قَالَ كَانُوا يَقْرَأُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -

(২) رَوَى الْمُوطَّأُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) يَقْرَأُونَ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى وَالثَّلَاثُ هُوَ الْوَيْتَرُ -

(৩) عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَمَرَ رَجُلًا بِصَلَاةٍ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً - (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مَصْنُوفِهِ، وَاسْتَأْذَنَهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ)

(৪) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُوَيْعٍ قَالَ كَانَ أَبُو بَرٍّ كَعْبٌ بِصَلَاةٍ بِالثَّلَاثِ فِي رَمَضَانَ بِالثَّلَاثِ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَوَيْتَرُ بِثَلَاثٍ - (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مَصْنُوفِهِ وَاسْتَأْذَنَهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ)

(৫) وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ بِصَلَاةٍ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوَيْتَرِ - (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْتَأْذَنَهُ حَسَنٌ)

(৬) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عِشْرِينَ رَكْعَةً -

জুয়াইলু : ইমাম মালেক (র.) যে দলিল পেশ করেন তার জবাবে বলা যায় যে, সাহাবা ও তাবয়ীনের শেষ আমল সব সময় বিশ রাকাতের উপরই ছিল, কাজেই সেটাই হবে অগ্রগাথ।

৩. তারাবীহের নামাজ জামাআতে পড়ার বিধান : তারাবীহের নামাজ একাকী পড়াও জায়েজ আছে, তবে জামাআতে পড়াই উত্তম। মহানবী ﷺ সর্বদা এটা জামাআতে না পড়লেও হযরত আবু যার গিফারীর হাদীসে [যা সামনে বর্ণিত হবে] দেখা যায় যে, তিনি কিছুদিন এটা জামাআতে পড়েছিলেন এবং ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পরে জামাআত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁর ওফাতের পর যখন আর ফরজ হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেল তখন হযরত ওমর (রা.) এটার জন্য নিয়মিত জামাআতের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এটা কখনও সুন্নতের খেলাফ নয়। অবশ্য কেউ কেউ তারাবীহের জামাআতকে সুন্নতে উমরী'-ও বলে থাকেন। তবে রাজহে অভিমত হলো, তারাবীহের জামাআতও সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং রাসুলের সুন্নত।

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ شَابِثِ (رَضِيَ عَنْهَا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا لَيْلَى حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ قَدَّوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَّنَعُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى حَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُنْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَوةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَوةَ الْمَكْتُوبَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২২১. অনুবাদ : হযরত যাইয়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। একবার রমজানে মহানবী ﷺ মাসুর দ্বারা মসজিদে একটি প্রকোষ্ঠ বানালেন এবং এর মধ্যে কয়েক রাত [নফল] নামাজ পড়লেন- এতে লোকজন তাঁর কাছে জমায়েত হতে লাগল। অতঃপর এক রাত্তে সাহাবীগণ তাঁর কোনো সাড়া শব্দ পেলেন না, এতে তাঁরা ধারণা করলেন যে, সম্ভবত তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন তাদের কেউ কেউ জোরে জোরে গলা খাকুরাতে লাগলেন যেন তিনি জাগ্রত হয়ে [জামাতের জন্য] তাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি তোমাদের স্ব সময়কার [আশ্রহের আধিক্যতা] লক্ষ্য করেছি। এতে আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা তোমাদের উপরে ফরজ হয়ে যায় না কি? আর যদি তা তোমাদের উপরে ফরজই হয়ে যায়, তখন তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা নফল নামাজ তোমাদের নিজ নিজ ঘরেই পড়। কেননা কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ, তবে ফরজ নামাজ ব্যতীত। [অর্থাৎ ফরজ নামাজ মসজিদেই পড়বে।] - [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ-এর সার্বক্ষণিক আমলের দ্বারা কিভাবে রাতের নামাজ ফরজ হতে পারে : সাধারণত কোনো কাজ ফরজ হয় কুরআনের অকাটা দলিল দ্বারা, তবে কিভাবে রাসুল ﷺ-এর সার্বক্ষণিক আমলের দ্বারা তারাবীহের নামাজ জামাআতের সাথে ফরজ হতে পারে, এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে, যা নিম্নরূপ-

১. আত্মা মুহিববুদ্দীন আতুত্‌তাবারী এর উত্তরে বলেন, সম্ভবত আত্মাহর পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী এসেছিল যে, আপনি যদি রাতের নামাজ (তারাবীহ) সকল সময় জামাআতের সাথে আদায় করেন তবে আমি তা মানুষদের উপরে ফরজ করে দেব। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ উচ্চতের আসানির প্রতি লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি সর্বদা এটা জামাআতে পড়া ত্যাগ করেছেন।
২. অথবা তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে এ ধারণার উদ্বেক হয়েছিল যে, সার্বক্ষণিকতার কারণে হয়তো তা ফরজ হয়ে যেতে পারে। আর এ জন্যই তিনি মুয়াজ্জাবাত পরিহার করেছেন।

مَنْ حَسَنَ وَهُنَّ حَسَنُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰٓ اِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَدَعَىٰ التَّعَارُفِ
এর যারা হুঁচকি হওয়ায় আশঙ্কা করেছেন, এর সমাধান নিম্নরূপ-
নামাজ ফরজ হওয়ার আশঙ্কা করেছেন, এর সমাধান নিম্নরূপ-

- আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰٓ اِسْتِغْنَاءِ এ হাদীস দ্বারা শুধু এ কথা পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে যে, পীচ ওয়াজের কম আঁর করা হবে না; কিন্তু এর চেয়ে যে বেশি করা হবে না সে কথা বলা হয়নি। অতএব বেশি হওয়ার যখন সম্ভাবনা রয়েছে, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভীতির কারণ বিদ্যমান ছিল।
- অথবা মিরাজের রাতে বলা হয়েছে لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰٓ اِسْتِغْنَاءِ কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনকাল ছিল বিধানাবলির নাসেখ ও মনসূখের সময়; আর এ জন্য তারা বীরের নামাজ ফরজ করার সম্ভাবনাকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি বলেন, حَسِبْتُمْ اَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْخُ
- অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র রমজান মাসের রাতের নামাজ ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অন্তরে পোষণ করেছিলেন। যেমন- সুফইয়ান ইবনে হুসাইনের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

حَسِبْتُمْ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَيْكُمُ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ اَوْ شَهْرٍ رَّمَضَانَ

তারা বীরের নামাজ ঘরে না মসজিদে পড়া উত্তম, এ ব্যাপারে মতানৈক্য; তারা বীরের নামাজ ঘরে একাকী পড়া উত্তম না মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা উত্তম সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক (র.), ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী আলিম বলেন, তারা বীরের নামাজ একাকী ঘরে পড়া উত্তম। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন-

(۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي رَبِيعٍ (رض) أَنَّهُ عَلِمَ السَّلَامَ قَالَ أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّسُولِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
(۲) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي رَبِيعٍ (رض) أَنَّهُ عَلِمَ السَّلَامَ قَالَ صَلَاةُ الرَّسُولِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِهِ
هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং কিছুসংখ্যক মালেকী মাযহাবভুক্ত আলিম বলেন, তারা বীরের নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করাই উত্তম। তাঁরা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে যুক্তিপূর্ণ দর্শন করতে গিয়ে বলেন, হযরত ওমর (রা.) ও সাহাবায়ে কেহাম জামাতের সাথেই তারা বীরের নামাজ আদায় করেছেন এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের আমল এর উপরই অব্যাহত রয়েছে।

তাঁরা আরো বলেন, তারা বীরের নামাজ شَمَائِلِ الرَّسُولِ বা দীনের প্রতীক হওয়ার কারণে তা ঈদের নামাজের মতো। আর এ জন্যই তা জামাতে আদায় করা শ্রেয়।

তাদের দলিলের উত্তর: যদিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল নামাজ ঘরে বসে পড়াই উত্তম; কিন্তু তারা বীরের নামাজ জামাতে পড়া সকল সাহাবী এবং তাবয়ীদের আমল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এটা দীনের প্রতীক হওয়ার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য নফলের নিয়মের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। তারা বীরের নামাজ ঘরেও যে পড়া বৈধ সেটা বর্ণনা করাও হাদীসের উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ۱۲۲۰ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فَيُوعِزْنِمَةً فَيَقُولُ مَنْ
قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১২২২ অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে রমজান মাসে তারা বীরের নামাজ কায়েম করার জন্য উৎসাহিত করতেন, তবে তিনি [সরাসরি] তাকিদ সহকারে আদেশ করতেন না; বরং তিনি এভাবে বলতেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের সাথে ও ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে রমজান মাসে নামাজ কায়েম করে [অর্থাৎ তারা বীর পড়ে] তার বিগত যত [সগীরা] গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, অবস্থা

وَالْأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
عَلَىٰ ذَٰلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ঐভাবেই চলল [অর্থাৎ যার ইচ্ছা তারাবীহ একা একা পড়ল]
অন্তঃপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালেও
অবস্থা এভাবেই চলছিল এবং হযরত ওমর (রা.)-এর
খেলাফত আমলের প্রথম ভাগেও অবস্থা ঐভাবেই চলছিল
[কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত ওমর তারাবীহের জন্য জামাত
কায়েম করেন]। - [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَيْرَ - এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসসংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সগীরা-কবীরা সব ধরনের গুনাহই এ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত, এর
সমাধান নিম্নরূপ-

১. ইবনুল মুনাযির অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, নেক আমল দ্বারা সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।
২. ইমাম নববী (র.) বলেন, প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, নেক আমল দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। ইমামুল
হারামাইনও এ মতকেই সমর্থন করেছেন। কাজী ইয়াজ (র.) বলেন, এটা আহলে সুন্নতের মাহযাব।
৩. কারো মতে যদি তার সগীরা গুনাহ না থাকে তবে কবীরা গুনাহ কমিয়ে দেওয়া হয়।

وَعَنْ ۱۲۲۳ جَابِرِ (رَضًا) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ
فِي مَسْجِدٍ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ
صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ
صَلَاتِهِ خَيْرًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২২৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের
কেউ [ফরজ] নামাজ মসজিদে আদায় করে, সে যেন তার
নামাজ হতে একটা অংশ ঘরের জন্য রেখে দেয়। কেননা
আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তার ঘরে তার এই নামাজের
কারণে কল্যাণ প্রদান করেন। - [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে কিছু নামাজ ঘরে পড়ার কথা বলা হয়েছে, আর তা হলো সুন্নত ও
নফলসমূহ। বক্তৃত এ সব নামাজ ঘরে পড়ে গৃহকে আবাদ করা একান্ত আবশ্যিক। কেননা অন্যস্থানে রাসূল ﷺ বলেছেন-
لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا

الثَّانِي : الْفَضْلُ الْثَانِي

عَنْ ۱۲۲۴ أَبِي ذَرٍّ (رَضًا) قَالَ صُنْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا
مِنَ الشَّهْرِ حَتَّىٰ يَمُوتَ سَبْعَ فِقَامٍ بِنَا
حَتَّىٰ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتْ
السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ

১২২৪. অনুবাদ : হযরত আবু যার গিফারী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রমজান মাসে] আমরা
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোজা রাখলাম; কিন্তু তিনি
মাসের অধিকাংশ সময়ই আমাদের সাথে [নফল] নামাজ
জামাতে পড়েননি, মাসের যখন মাত্র সাত রাত অবশিষ্ট
থাকল অর্থাৎ মাসের তেইশ তারিখে তিনি আমাদের নিয়ে
রাতের নামাজ পড়তে থাকলেন, যাতে রাতের
এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। সমাপ্তির ষষ্ঠ দিনে
অর্থাৎ রমজানের চব্বিশ তারিখে তিনি আমাদের সাথে
জামাতে নামাজ পড়লেন না। [শেষ হওয়ার পূর্বে] পঞ্চম :

شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقْفَرُ لِأَكْثَرِ
مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَأَبْنُ مَاجَةَ وَزَادَ رَزِينُ مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَغْنَى
الْبُخَارِيُّ يَضَعِفُ هَذَا الْحَدِيثَ)

আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে
অবতীর্ণ হন এবং বনী কালবের মেঘ পালের পশমের
সংখ্যারও অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন। [অর্থাৎ
অগণিত-অসংখ্য পাপীকে ক্ষমা করেন; আজ সেই রাত]।
- [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ; রাযীন এ কথাটুকু বেশি
বর্ণনা করেছেন যে, "[আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত
লোকদের পাপ মাফ করেন] যারা জাহান্নামের উপযুক্ত
হয়েছে।" ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি ইমাম
বুখারীকে এ হাদীসটি যমীফ বলে আখ্যায়িত করতে শুনেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّرَ تَمْرًا لِيَوْمِ شَعْبَانَ - এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসংশিট মহানবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে
বলেছিলেন, অর্থাৎ তুমি কি এ আশঙ্কা করছ যে, আমি তোমার হক নষ্ট করব, তা কখনো সম্ভব নয়। আর এখানে আল্লাহ
কথাটি উল্লেখ করার কারণ হলো যে, আল্লাহর নিকট রাসূল ﷺ -এর মর্যাদা অপরিমিত, যেমন পবিত্র কুরআনেও একরূপ
উল্লিখিত হয়েছে- **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ -**
অথবা বাকের সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

أَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّرَ تَمْرًا لِيَوْمِ شَعْبَانَ - এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন। [সূরা নূর] এর
দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আনুগত্য এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ও অভিন্ন।
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّرَ تَمْرًا لِيَوْمِ شَعْبَانَ - এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী
আসমানে আগমন করেন। আল্লাহর এ আগমন সওগাত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নূর বা জ্যোতি, তাঁর
অপরিমিত রহমত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّرَ تَمْرًا لِيَوْمِ شَعْبَانَ - এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী
আসমানে আগমন করেন। আল্লাহর এ আগমন সওগাত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নূর বা জ্যোতি, তাঁর
অপরিমিত রহমত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّرَ تَمْرًا لِيَوْمِ شَعْبَانَ - এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী
আসমানে আগমন করেন। আল্লাহর এ আগমন সওগাত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নূর বা জ্যোতি, তাঁর
অপরিমিত রহমত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

১২২৬. অনুবাদ : হযরত য়ায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-
কোনো ব্যক্তির নিজের ঘরে নামাজ পড়া আমার এই
মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষা শ্রেয়, অবশ্য ফরজ নামাজ
ব্যতীত। - [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَيَّرَ تَمْرًا لِيَوْمِ شَعْبَانَ - এর ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত বিষয়ের হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে ইমাম মালেক, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)
প্রমুখ ইমামগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, তারাবীহের নামাজ একা একা ঘরে পড়াই উত্তম। জামাতে পড়া জায়েজ।
কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণ জামাতে পড়াকেই উত্তম বলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও অন্যান্য
সাহাবীগণ ও তাই বুঝেছিলেন। এ জন্য তারা তারাবীহের নামাজ জামাতে পড়াকেই উত্তম বলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)
ও অন্যান্য সাহাবীগণ ও তাই বুঝেছিলেন। এজন্য তারা তারাবীহের জামাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে অলসতার কারণে
তারাবীহ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে না।

الفصل الثالث : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
الْقَارِي قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ
لَيْلَةً إِلَى الْمَسْجِدِ فَاذًا النَّاسُ أَوْزَاعُ
مُتَفَرِّقُونَ يَصُلي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيَصُلي
الرَّجُلُ فَيَصُلي بِصَلْوَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَمْرُ
إِنِّي لَوْ جَعَلْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاجِدٌ لَكَانَ
أَمْثَلٌ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ
كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى
وَالنَّاسُ يَصُلون بِصَلْوَةِ قَارِيَتِهِمْ قَالَ عَمْرُ
نِعْمَتِ الْيَدْعَةِ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا
أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يَرِيدُ الْآخِرَ اللَّيْلِ
وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২২৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কারী আব্দুর রহমান ইবনে আব্দ (র.) বলেন, [রমজান মাসের] এক রাতে আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে মসজিদে নববীতে পৌছে দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একা নিজের নামাজ পড়ছে, আর কারো পিছনে ক্ষুদ্র এক দল নামাজ পড়ছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি এদেরকে আমি একজন ইমামের পিছনে একত্র করে দেই তবে অনেক ভালো হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব সাহাবীর পিছনে নামাজ পড়ার জন্য একত্র করে দেন। আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর আমি আরেক দিন তাঁর সাথে মসজিদে গিয়ে দেখলাম, সকল লোক তাদের ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা.) বলেন, এটা কি উত্তম বিদআত [নতুন আবিষ্কার]! তৎপর তিনি বললেন, লোক সকল! তোমরা যে সময় ঘুমিয়ে থাক সে সময়টি হচ্ছে ঐ সময় হতে উত্তম, যাতে তোমরা নামাজ পড়ে থাক। [আব্দুর রহমান বলেন,] 'উত্তম সময়' অর্থে তিনি শেষ রাতকে বুঝিয়েছেন। তখন লোকেরা প্রথম রাতেই তারাবীহ পড়ত। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَدْعَةُ বিদ'আতের পরিচয় ও তার প্রকারভেদ : يَدْعَةُ শব্দের শাব্দিক অর্থ- নতুন সৃষ্টি তথা যা ইতঃপূর্বে কখনো ছিল না এমন কাজ। যেমন কুরআনে এসেছে- **يُؤَيِّعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**-

আল্লাহ নব্বী বলেন, **يَدْعَةُ** অর্থাৎ বিদ'আত হলো এমন এক নতুন উদ্ভাবিত কার্য, যা ইতঃপূর্বে আর কখনও করা হয়নি। শরিয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলতে এমন সব কার্যকে বুঝানো হয়, যা মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন -এর যুগে ছিল না এবং যা শরিয়তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের মধ্যে এমন নতুন কাজের উদ্ভাবন করা, যা কুরআন কিংবা হাদীসে নেই। এমনকি হাদীসের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সনদেও নেই, তাই হলো বিদ'আত।

يَدْعَةُ বিদ'আতের প্রকারভেদ : বিদ'আত দু' প্রকার। যথা- **يَدْعَةُ سَيِّئَةٌ** "বিদ'আতে সায়েয়া" এবং **يَدْعَةُ حَسَنَةٌ** "বিদ'আতে-হাসানা"। যে সব কাজের ভিত্তি শরিয়তের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা বিদ'আতে 'সাইয়া' এবং যে সব কাজের ভিত্তি শরিয়তের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিদ'আতে 'হাসানা'। বক্তৃত হযরত ওমর ফারুকের **يَدْعَةُ**

يَدْعَةُ سَيِّئَةٌ বা **يَدْعَةُ حَسَنَةٌ** বাক্য হতেই প্রমাণিত হয় যে, বিদ'আত দু' প্রকার- **يَدْعَةُ حَسَنَةٌ** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুরআন, হাদীস ও ইজমা বিরোধী যা কিছুই নতুন উদ্ভাবন করা হয় তাই গোয়রাহী। আর যা এ সমস্তের বিরোধী নয়, এরূপ ভালো জিনিস উদ্ভাবন নির্দ্বিধিত নয়। বরং উত্তম ও প্রশংসিত। আর **يَدْعَةُ سَيِّئَةٌ** এ বাক্যের মধ্যে **كُلُّ** এই শব্দটি **عَامٌ** শব্দটি **مِنْهُ** অর্থাৎ "যে ব্যাপকতার মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমতা স্বীকৃত" উপরস্থ

কিছু নতুন আবিষ্কৃত জিনিস ওয়াজিবের মর্যাদায় পৌছেছে। যেমন- আরবি ইসলামি আইনের মূলনীতিশাস্ত্র শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, বাতিল পছিন্দের দাখল মুক্তিকে খণ্ডন করা ইত্যাদি।

এরূপভাবে কিছু কিছু বিদ্‌আতে হাসানা বিরাট ছুঁয়াবের কাজও বাটে। যেমন- দীন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, তারাবীহের জামাত কায়ম করা, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করা ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু বিদ্‌আত আছে মুবায্ব অর্থাৎ এতে না পাপ না পুণ্য। যেমন- মসজিদকে সুন্দর করে সাজানো, খানা ও পানীয় বস্তুর হাদ বৃদ্ধি করা, বাসস্থান প্রশস্ত করা ইত্যাদি। আর বিদ্‌আতে 'সায়োআ'-এর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু সরাসরি হারাম, যেমন- জাবরিয়া, কাদরিয়া, মুরজিয়া এবং মুজাস্‌সিমাহ ইত্যাদি বাতিল ফেরকাহ্‌সমূহের আকীদা পোষণ করা। আবার কিছু কিছু মাকরুহ, যেমন-শাফেয়ীদের মতে মসজিদকে খুব সুন্দর করে সাজানো। হানাফীদের মতে ফজর ও আসরের নামাজের পর পারম্পরিক মুসাফাহা অর্থাৎ করমর্দন করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত নতুন উদ্ভাবিত কার্যবলি শরিয়তের মূল শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঐগুলোকে যদি বিদ্‌আত বলা হয়, তখনই বিদ্‌আত দু' প্রকার হয় **حَسَنَةٌ** ও **سَيِّئَةٌ** আর যে সবগুলো শরিয়তের উৎস হতে গবেষণা করে উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার ভিত্তি শরিয়তের মূলনীতিশাস্ত্র, সেগুলো মূলত বিদ্‌আত নয়; বরং সেগুলোকে শরিয়তের প্রতিষ্ঠাতা হতে প্রমাণিত বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় বিদ্‌আত দু' প্রকার হবে না, বরং সবগুলো বিদ্‌আতই 'সায়োআ' হবে এবং **كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ** হাদীসটির ব্যাপকতা আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। তখন একে **الْبَعْضُ مِنْهُ الْبَعْضُ** বলা যাবে না।

عَمْرٌ বলেছেন, "সমস্ত বিদ্‌আতই গোমরাহী"। অথচ হযরত ওমর (রা.) একটি বিদ্‌আত সম্পর্ক বললেন, "এটা কি উত্তম বিদ্‌আত"। এর জবাব হলো, হযরত ওমর (রা.) বিদ্‌আত দু' প্রকার মনে করতেন, বিদ্‌আতে সায়োআহ ও বিদ্‌আতে হাসানা এবং **كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ** এ হাদীসকে **الْبَعْضُ مِنْهُ الْبَعْضُ** বলা মনে করেছেন, আর হুজুর **عَمْرٌ** দ্বারা "প্রত্যেক বিদ্‌আতে সায়োআহ" কে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ হাদীসের বাক্যের মধ্যে **سَيِّئَةٌ** শব্দটি উহ্য আছে মনে করতে হবে। তখন বাক্যটি হবে **كُلُّ بَدْعٍ سَيِّئَةٌ ضَلَالَةٌ** এমতাবস্থায় হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কথায় কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না এবং হুজুর **عَمْرٌ**-এর বাক্যের সাথেও কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَمْرٌ ١٢٢٨ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ (رَض)
قَالَ أَمْرٌ عَمْرٌ أَيْ بِن كَعْبٍ وَتَمِيمًا
الدَّارِيُّ أَنْ يَقْرَمًا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ
بِأَخَذِي عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ
بِالنَّمِيْنِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا
مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي
فُرُوعِ الْفَجْرِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২২৮. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম দারী (রা.)-কে রমজান মাসে লোকদেরকে এগারো রাকাত নামাজ পড়াতে আদেশ করেছেন। ঐ সময় কারী হিমায নামাজে ঐ সকল সূরা পড়তেন যাতে একশত আয়াতেরও বেশি আয়াত রয়েছে। যাতে আমরা দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়ানোর কারণে লাঠিতে ভর দিতে বাধ্য হতাম। তখন আমরা ফজরের কাছাকাছি সময় ব্যতীত সেই নামাজ হতে অবসর হতাম না।- [মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمْرٌ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে তারাবীহের নামাজ এগারো রাকাতের কথা এসেছে। অবশ্য এর মধ্যে বিতর তিন রাকাতও অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিতর বাদে তারাবীহের নামাজ হয় আট রাকাত। অন্যদ্য রেওয়ামাতে বিশ রাকাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর সমাধানে বলা যায়, সম্ভবত হযরত ওমর (রা.) প্রথমে বিতরসহ তারাবীহের নামাজ এগারো রাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীতে তাঁরই সময় তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত নির্ধারিত হয়। অথবা বলা যেতে পারে তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাতই ছিল; কিন্তু মাঝে মধ্যে আট রাকাত পড়া হতো। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ যে মোট কত রাকাত এটা নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ۱۲۲۹ الْأَعْرَجِ (رحم) قَالَ مَا
أَذْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ
فِي رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ
سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِينَ رَكْعَاتٍ وَأَذَا
قَامَ بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى
النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২২৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবদুর রহমান
আ'রাজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা
লোকদেরকে [অর্থাৎ সাহাবীদেরকে] এক্রপ পেয়েছি যে,
তারা রমজান মাসে দোয়ায় কুনূতে কাফিরদেরকে
অভিসম্পাত করতেন এবং আরও দেখেছি যে, ইমাম আট
রাকাতে সূরা বাকারা পাঠ করতেন। যখন বারো রাকাতে
তা পড়তেন, তখন লোকেরা মনে করত যে, তিনি খুব
হাল্কা তথা সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। -[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَبْرَأَ - এর ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে তখনকার কাফির মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের
সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করত, এমনকি বিভিন্ন বাহানায় মুসলমানদেরকে নিয়ে শহীদ করে দিত, ফলে সাহাবীগণ রমজান
মাসে বিতরের নামাজে ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে দোয়া এবং কাফিরদের ধ্বংসের নিমিত্তে বদদোয়া করতেন।
আল্লামা জামারী দোয়ায় কুনূত সম্পর্কে লিখেন যে,

اللَّهُمَّ اغْبِرْنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصِرْهُمْ
عَلَى عُدُوِّهِمْ وَعُدُوِّكَ اللَّهُمَّ الْعَيْنَ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَيَكْفُرُونَ بِرِسْلِكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ
خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزَلْ أقدامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرُمِينَ .

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রমজানের অর্ধেক হলে কাফিরদের জন্য বদদোয়া করা হতো।

وَعَنْ ۱۲۳۰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (رحم)
قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي
رَمَضَانَ مِنَ الْيَمَامِ فَتَسْتَعِجِلُ الْخَدَمُ
بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ فَوْتِ السَّحُورِ وَفِي
أُخْرَى مَخَافَةَ الْفَجْرِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২৩০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে
আবু বকর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি
বলেন, আমরা রমজান মাসে তারাবীহের নামাজ হতে
অবসর হয়ে আসতাম এবং সাহুরী খানার সময় ফউত হয়ে
যাওয়ার আশঙ্কায় খাদেমদেরকে তাড়াতাড়ি খানা প্রস্তুতের
জন্য তাকিদ করতাম। অপর এক বর্ণনায় আছে, ফজর বা
জোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। -[মালেক]

وَعَنْ ۱۲৩১ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ هَلْ تَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ
بَعْنِي لَيْلَةَ التَّصْفِي مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ
مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فِيهَا أَنْ
يَكْتَتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ
السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يَكْتَتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ

১২৩১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন,
[আয়েশা] তুমি কি জান এই রাতে অর্থাৎ শাবানের অর্ধ
রাতে [বা পনেরো তারিখের রাতে] কি কি ঘটে? তিনি
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাতে কি ঘটে তখন রাসূল ﷺ
বললেন, এ রাতে লিপিবদ্ধ হয় এ বছর যত আদাম সন্তান
জন্মলাভ করবে। এ রাতেই লিপিবদ্ধ করা হয় এ বছর যত
আদাম সন্তান মৃত্যুবরণ করবে। এ রাতেই মানুষের

بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تَرَفَعَ
 أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنَزَّلَ أَرْزَاقُهُمْ فَقَالَتْ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا
 بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ
 يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى
 ثَلَاثًا قُلْتَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَضَعَ
 يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ
 يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

আমলসমূহ [আসমানে] উঠানো হয় এবং এ রাতেই
 মানুষের রিজিকসমূহ অবতীর্ণ করা হয়।

তারপর হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া
 রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত [নিজের
 আমলের জোরে] কোনো ব্যক্তি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে
 পারবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার করে বললেন, আল্লাহ
 তা'আলার রহমত ছাড়া কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ
 করতে পারবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ!
 আপনিও না? [এটা শুনে] রাসূলে কারীম ﷺ নিজ হাত
 আপন পবিত্র মাথায় স্থাপন করলেন এবং বললেন, আমিও
 আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না,
 তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের ছায়ায় আমাকে ঢেকে
 নেন। এই বাক্য তিনি তিনবার বললেন।- [বায়হাকী
 দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি জান এই রাতে
 অর্থাৎ শাবানের অর্থ রাতে কি কি বৃহত্তর কার্যাবলি সংগঠিত হয়ে থাকে? উল্লিখিত বাক্যের মধ্যে بَنِي آدَمَ অর্থ আদমের
 বা সাবান্দমূলক প্রশ্নবোধক অবয়ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত
 ইসতিহামে তাকবীরী দ্বারা এ রাতের সীমাহীন শুকুহু এবং এ রজনীতে যা কিছু সংগঠিত হয় তার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।
 بَنِي آدَمَ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুশ্লিষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শাবানের মধ্যবর্তী রজনীতে
 আগামী এক বছরের জীবন মৃত্যুর হিসাব লেখা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয়বার লেখা হয়। কেননা প্রথমবার লাওহে
 মাহফুযে লেখা হয়েছে। আর এখানে বিশেষভাবে বনী আদমের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, মানবজাতি যে, اَسْرَأُ
 الْمَخْلُوقَاتِ এ বিশেষত্ব বুঝাবার জন্যই তাদেরকে উল্লেখ করেছেন, অন্যথা সব সৃষ্টির বিষয়ও তো এ রাতে লেখা হয়।
 دَعْوَةُ السَّامِئَانَ - হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত আলোচ্য হাদীস দ্বারা শ্লিষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শাবান মাসের
 পনেরো তারিখের রাতে পরবর্তী এক বছরের জীবন-মৃত্যুর হিসাব করা হয়, আমলনামা আসমানে উত্তোলন করা হয় এবং
 রিজিক অবতীর্ণ করা হয়। এক কথায় সকল শুকুহুপূর্ণ কর্মের পুরোপুরি সিদ্ধান্ত করা হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে এসেছে যে,
 فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এটা কদরের রাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যা রমজান মাসের শেষ দশককে কোনো এক বেজোড়
 রজনীতে বিদ্যমান। এখন বাহ্যত কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিশুদ্ধিত হয়। এর সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ
 বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

এর সমাধান হলো, কদরের রাত্রিতে যা কিছু প্রকাশ ঘটে অর্থ শাবানের রাতেই এর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ হয়ে থাকে।

অথবা তা দুই রজনীর এক রজনীতে মৌলিকভাবে এবং অপর রজনীতে বিস্তারিতভাবে প্রত্যেক কর্মের মাঝে পার্থক্য করা হয়।

অথবা উভয় রজনীর এক রজনীতে পার্থক্য জগতের ক্রিয়াকর্মের এবং অপর রজনীতে পরজগতের ক্রিয়াকর্মের যাবতীয় সিদ্ধান্ত
 গ্রহণ করা হয়।

কুরআনের সাথে আলোচ্য হাদীসের বিরোধ ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে,
 আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অথচ আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
 أُورَثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ যে [নেক] আমল তোমরা করবে এর দ্বারা ই তোমরা জান্নাতের অধিকারী হবে। এ
 আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহর রহমতের কোনো উল্লেখ নেই। বাহ্যত হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। এর
 সমাধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন-

১. আমল হলো জান্নাতে অনুপ্রবেশের বাহ্যিক অবলম্বন মাত্র। বস্তৃতপক্ষে প্রকৃত অবলম্বন হলো আত্মাহর অনুগ্রহ-অনুকম্পা ও তাঁর মেহেরবানী। আমল যতই ভাল থাকুক না কেন আত্মাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
২. কারো মতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আত্মাহর অনুগ্রহেই প্রবেশ করবে। তবে আমলের তারতম্যের কারণে তাদের মর্যাদার তারতম্য হবে।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
(رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
أَوْ مُشَاهِدِينَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَفِي
رَوَايَتِهِ إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاهِدِينَ وَقَاتِلِ نَفْسِ)

১২৩২. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন
যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আত্মাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের
রাতে [অর্থাৎ শবে বরাতের] সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি
মনোযোগ দেন এবং মুশরিক ও বিদেহপূর্ণ ব্যক্তি ছাড়া
সকল সৃষ্টিকুলকে মাফ করে দেন। [ইবনে মাজাহ] কিন্তু
ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, উক্ত বর্ণনায়
রয়েছে, 'তবে দু' ব্যক্তি ব্যতীত— বিদেহ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ও
প্রাণহত্যাকারী'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : "শাবানের মধ্যবর্তী রজনীতে আত্মাহ তা'আলা বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন বা স্বয়ং অবতীর্ণ
হন" এর অর্থ হলো, বান্দার প্রতি বিশেষ রহমত নাজিল করেন। আর এ হাদীসে যদিও দুই শ্রেণীর লোককে ক্ষমা হতে বহির্ভূত
রাখা হয়েছে; কিন্তু এ প্রসঙ্গে অন্যান্য সহীহ হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ-সুরা পানকারী,
জুলুম-নির্যাতনকারী, যাদুকর, গনক-ঠাকুর ও বাজনা-বাদক প্রভৃতিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, উভয় প্রকারের
হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে একটি অপরটির বিপরীত নয়। কারণ পরিস্থিতি ও উপস্থিত শ্রোতার অবস্থা
অনুসারে হুজুর ﷺ পর্যায়ক্রমে কোথাও কয়েক শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আবার কোথাও সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনা করেছেন।
হাদীসে এ ধরনের নজির অনেক রয়েছে।

وَعَنْ ۱۲۳۳
عَلِيِّ (رض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ فَقَوْمُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا
يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا
لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ
الْأَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ الْآمِنْ مُسْتَرْزِقٍ
فَأَرْزُقْهُ الْآمِنْ مُتَلَبِّئٍ فَأَعِافِيهِ الْآ كَذَا الْآ
كَذَا حَتَّى يَطَّلِعَ الْفَجْرُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২৩৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন অর্ধ শা'বানের
রাত বা শবে বরাতের রজনী আসে সে রজনীতে তোমরা
অবশ্যই নফল নামাজ পড়ো এবং দিনে রোজা রেখো।
কেননা সে রাতে সূর্যাস্তের পর পরই আত্মাহ তা'আলা
দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, কোনো
ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করে দেব!
কোনো রিজিক প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি রিজিক
প্রদান করব এবং কোনো বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত আছে কি যাকে
আমি বিপদমুক্ত করব এবং এভাবে আরো আরো ব্যক্তিকে
ফজর হওয়া পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।—ইবনে মাজাহ

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

পরিচ্ছেদ : সালাতুয যোহা

সূর্যোদয়ের পর হতে বেলা বাড়তে থাকাকে الضُّحَى বলা হয়। আত্মা মা জীবী (র.) বলেন, দিনের প্রথম ভাগে যখন সূর্য উদিত হয় এবং তার কিরণ পূর্ণ বিকশিত হয় সে সময়কে যোহা বলা হয়, যেমন- পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, وَالشُّعْرِ وَمُغْنَمًا وَآخِرًا سُرْيَرِ الشَّوْخِ يَخْبَنُ تَا آتَالُوكِيتِ هَي .

কারো মতে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব সময়ের চার ভাগের এক ভাগ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময়কে الضُّحَى বলা হয়। আর এ সময়ে যে নামাজ পড়া হয় তাকে الضُّحَى صَلَاةٌ বলা হয়। একে এশরাক ও চাশতের নামাজও বলা হয়। صَلَاةٌ وَقْتِ الضُّحَى -এর পূর্বে وَقْتُ مُحَمَّدٍ রয়েছে, তাই পূর্ব বাক্যটি হলো- صَلَاةٌ وَقْتِ الضُّحَى

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٣٤ أُمِّ هَانِي (رض) قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُبِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ ذَلِكَ ضُحَى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৩৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর [উম্মে হানীর] ঘরে আসলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর আট রাকাত নামাজ পড়লেন। উম্মে হানী বলেন, এ নামাজ হতে সংক্ষিপ্ত নামাজ আমি আর কখনও দেখিনি। তবে তিনি রুকু ও সজ্জদা পুরোপুরিভাবে আদায় করেছেন। উম্মে হানী অপর এক বর্ণনায় বলেছেন তা যোহার সময় ছিল। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضُّحَى صَلَاةٌ এর সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নলিখিত- বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আইনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, দিনের প্রথম ভাগে সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই الضُّحَى صَلَاةٌ এর সময় আরম্ভ হয়- لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُعْجِزُنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ -ইমাম নববী (র.) এর الروضة গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যোহার নামাজ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আরম্ভ হয়, তবে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব।

ضُّحَى صَلَاةٌ এর উত্তম সময়।

মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ الضُّحَى صَلَاةٌ গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এ নামাজ দু' সময় পড়তেন। প্রথমত যখন সূর্য উপরে উঠে যেত তখন তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। একেই মাশায়েখে কেবরাম এশরাকের নামাজ নামে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়ত সূর্য যখন পূর্বাকাশের চারিভাগের একভাগ উপরে উঠে যেত তখন রাসূল ﷺ চার রাকাত নামাজ পড়তেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَتْ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا قَبْدَ رَمْعٍ أَوْ رَمْعَيْنِ كَفَّرَ صَلَاةَ الضُّحَى مِنْ فَرِيضَتَا صَلَاتِي رَمْعَيْنِ ثُمَّ أَهْبَلَ حَتَّى إِذَا أَرْتَعِ الضُّحَى صَلَاتِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ . (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّيْسَانِيُّ وَابْنُ سَابَةَ)

صَلْوَةُ الضُّحَى যোহার নামাজের হুকুম : যোহার নামাজের হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কিছু সংখ্যকের মতে صَلْوَةُ الضُّحَى রাসূল ﷺ-এর উপর ওয়াজিব ছিল। এ অভিমত সঠিক নয়। কেননা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা উক্ত অভিমত অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, بِسَبْعِ سَبْعَةِ الضُّحَى অবশ্য রাসূল ﷺ যে যোহার নামাজ পড়েছেন এটা প্রমাণিত হয়। তবে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব না হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

কারো মতে صَلْوَةُ الضُّحَى-রাসূল ﷺ-এর বিশেষত্ব অবশ্য ছিল- এ অভিমতও যথার্থ নয়। কেননা তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

কেউ কেউ صَلْوَةُ الضُّحَى বলে যে কোনো নামাজ আছে এটাই অস্বীকার করেছেন। এমনকি একে কতক লোক বিদ'আত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা নিজেদের সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন-

(۱) إِنْ أَيْنَ عَمَرَ (رض) قَالَ إِنَّهَا بَدْعَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ (رض) مَرَّةٌ يَمَعَتِ الْبِدْعَةُ وَقَالَ مَرَّةٌ اسْتَبَدَعَ السُّلَيْمُونَ بَدْعَةً أَفْضَلَ .

(۲) رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قَبِي بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) النَّتَةَ كُلَّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا الضُّحَى .

(۳) قَالَ أَنَسُ (رض) صَلْوَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ نَفَعِ مَكَّةَ كَانَتْ سَنَةَ الْفَتْحِ لَا سَنَةَ الضُّحَى .

বজলুল মাজহুদ, ফাতহুল বারী এবং আশরাফুল লুমাত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে যে, হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীসহ অধিকাংশ আলেমদের মতে صَلْوَةُ الضُّحَى মোত্তাহাব। তাঁরা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে নিম্নোক্ত হাদীসসহ বহু দলিল উপস্থাপন করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلْوَةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে আদ্বায়া ইবনুল কায়িম صَلْوَةُ الضُّحَى সম্পর্কে কয়েকটি বক্তাবোর সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেছেন-

১. صَلْوَةُ الضُّحَى বা চাশতের নামাজ মোত্তাহাব।
২. কোনো কারণ ব্যতীত এর সূচনা হয়নি। অর্থাৎ এটা বিশেষ কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৩. মূলত এটা মোত্তাহাব নয়।
৪. কখনও কখনও এটা পড়া মোত্তাহাব এবং কখনও কখনও তা পরিহার করাও মোত্তাহাব। অর্থাৎ এটা সদাসর্বদা আদায় করা যাবে না। ইমাম আহমদ (র.)-এর এ ধরনের একটি অভিমত রয়েছে।
৫. এটা বিদ'আত বা নতুন উদ্ভাবিত। যা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অভিমত।
৬. এটা ঘরে পড়া মোত্তাহাব। (هَذَا كُلُّهُ فَيُتَعَمَّرُ الْمَلُومُ وَالْبَدْرُ وَالْعَيْنِي وَالْتَعْلِيْقِي وَأَنْتَعَمَّرُ اللَّمَعَاتِ) এটা ঘরে পড়া মোত্তাহাব। صَلْوَةُ الضُّحَى কে-বিদ'আত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ইবনে ওমরের উক্তি উল্লেখ করেছেন এর বিভিন্ন উত্তর প্রদান করা হয়েছে-
১. صَلْوَةُ الضُّحَى বা চাশতের নামাজ প্রকাশ্যে মসজিদে পড়া বিদ'আত, ঘরে বসে পড়া বিদ'আত নয়। এটা হলো হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উক্তির ব্যাখ্যা।
২. অথবা এর উত্তর হলো ওয়াজিব নামাজের ন্যায় তা সদাসর্বদা আদায় করা বিদ'আত।

وَعَنْ ۱۲۳۵ مَعَادَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلْوَةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৩৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] বিবি হযরত মুয়াযা (র.)

বলেন। আমি একদা হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহা বা চাশতের নামাজ কত রাকাত পড়তেন? তিনি বললেন, চার রাকাত। তবে যখন আদ্বায়া তৌফিক দিতেন তখন আরও কিছু বেশি পড়তেন।
-মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الصُّحَىٰ ۖ قَالَ صَلَوَةُ الصُّحَىٰ : إِمَامُ الدُّعَاةِ إِخْلَافًا أَيْمَهُ فِي رُكْعَاتِ الصُّحَىٰ
মোট কত রাকাত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ-

- * কিছু সংখ্যকের মতে চাশতের নামাজ দু' রাকাত, যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে এসেছে যে,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَرَسَانِي خَلِيلِي بِسَلَاتِ صِيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرُكْعَتِي الصُّحَىٰ وَأَنْ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ أَنْتَمَّ .
কিন্তু ফী হাদীথ নুعمত قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَغْرُبْنِي مِنْ أَرْبَعِ رُكْعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ .
- * কারো মতে চার রাকাত, যথা-
كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِي الصُّحَىٰ سِتَّ رُكْعَاتٍ -
* কারো মতে ছয় রাকাত যেমন-
كَمَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حُرَّةٍ فَصَلَّى الصُّحَىٰ ثَمَانِ رُكْعَاتٍ .
- * আরেক বর্ণনায় বারো রাকাতের কথা উল্লেখ আছে । উক্ত সকল রাকাতের কথা একই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । হাদীসটি হলো-
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ (رض) يَقُولُ لَأَبِي ذَرٍّ (رض) أَوْسَيْنِي قَالَ سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى الصُّحَىٰ رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا لَمْ يَلْعَقْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . (كَمَا فِي الْعَيْنِي)

তবে অধিকাংশ ওলামার পছন্দনীয় অভিমত হলো, সালাতুয যোহা চার রাকাত । ইমাম হাকিম বলেন, আমি বহু সংখ্যক হাদীসের হাফিজ ও ইমামের সাথে ছিলাম, তারা চার রাকাতের অভিমতটি অবলম্বন করতেন । কেননা, চার রাকাত সম্পর্কে সহীহ হাদীসমূহ মুতাওয়াজিত সূত্রে বর্ণিত । এছাড়াও আঞ্জাহ তা'আলার বাণী وَأَيُّرَاهِمُ النَّبِيُّ وَفِي -এর ব্যাখ্যায় নবীকরীম ﷺ বলেন, তোমারা কি জান এখানে -فِي-এর ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তিনি নিয়মিত চার রাকাত সালাতুয যোহা পড়তেন । [আইনী, ফাতহুল মুসলিম, আশিয়ায়্যাতুল ধূমআত]

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْبِحُ عَلَيَّ كُلِّ سَلَامِي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَبِحُرِّيٍّ مِنْ ذَلِكَ رُكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَىٰ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৩৬. অনুবাদ : হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-সকাল হতেই তোমাদের প্রত্যেকটি হাড়ের জন্য একটি সদকা করা আবশ্যিক হয়। তবে [জেনে রাখবে] প্রত্যেকবার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা এক একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এক একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'আল্লাহ আকবার' বলা এক একটি সদকা, ভাল কাজের জন্য আদেশ করা একটি সদকা এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদকা বিশেষ এবং এ সমস্ত কিছুর পরিবর্তে যোহর দু' রাকাত নামাজ পড়াই যথেষ্ট হয়। -মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَلَامِي -এর অর্থ : سَلَامِي 'সুলামা' অর্থ - অসুলির হাড়। তবে এখানে গোটা শরীরের হাড় বা হস্তি উদ্দেশ্য । এটা বহুবচন, একবচনে سَلَامَتِي 'সালামাতুন্' । আবার কারো মতে এর একবচন ও বহুবচন উভয়টির মধ্যেই سَلَامِي ব্যবহৃত হয় । عَلَيَّ 'এলি' বাক্য দ্বারা যদিও ওয়াজিবের অর্থ বুঝায় প্রকৃতপক্ষে এখানে মোস্তাহাব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ।
وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ -এর অর্থ : আমাদেরকে আঞ্জাহ তা'আলা সুস্থ রাখা করেছেন । আমরা একে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিত্যক্ত করত পারি । অনেক লোক এমনও আছে যে, পূর্ণ আঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগাতে পারে না । এটাও আঞ্জাহর মেহেরবানি যে, তিনি আমাদের তাসবীহ-তাহলীলকে সদকা হিসাবে কবুল করে থাকেন । তাই আমাদের তা আদায় করা উচিত ।

وَعَمَّا ۱۲۳۷ زَنَدَ بِنَ أَرْقَمَ (رض) أَنَّهُ
رَأَى قَوْمًا يَصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ
عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ
أَفْضَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ
الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَيْصَالُ .

১২৩৭. অনুবাদ : হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা কিছু লোককে যোহর নামাজ পড়তে দেখে বললেন, এরা জানে যে, এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে যোহর নামাজ পড়া আরও বেশি উত্তম কাজ [অর্থাৎ এরা যোহর নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়ছে। এর চেয়ে সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে যোহর নামাজ পড়া উত্তম]। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আউয়ায়ীনের নামাজ তখনই [পড়তে হয়] যখন উটের বাচ্চাগুলো রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَمَّا ۱২৩৭ زَنَدَ بِنَ أَرْقَمَ (رض) أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَيْصَالُ . -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এ লোকগুলো দৈর্ঘ্যধারণ করেনি এবং এ নামাজের উত্তম ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই তাড়াহুড়া করে প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করছে। বহুত বর্ণনাকারী তাদের এ কাজটিকে অপছন্দ করেছেন। কেননা দিনের প্রত্যেক এক-চতুর্থাংশে যে কোনো একটি নামাজ বাস্তবায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এটা সূর্য বেশ কিছুদূর উপরে উঠে গেলে পড়লেই সাবাত হতে পারে। কাজেই প্রথম ওয়াক্তের চেয়ে শেষ ওয়াক্তে পড়াই উত্তম। অথচ তারা জানে যে, এটা জায়েজ ওয়াক্ত বটে, তবে উত্তম ওয়াক্ত নয়।

وَعَمَّا ۱২৩৭ زَنَدَ بِنَ أَرْقَمَ (رض) أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَيْصَالُ . -এর অর্থ : উল্লেখ্য যে, الْأَوَّابِينَ শব্দটি الْأَوَّابُ হতে গঠিত। আন্নামা তীবী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো, তওবা বা অনুশোচনার মাধ্যমে অপরাধ হতে আন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

কারো মতে এর অর্থ হলো আনুগত্যকারী।

আবার কেউ বলেন, এর অর্থ হলো তাসবীহ পাঠকারী।

কোনো কোনো সুফীবিদগণ বলেন, الْكِرْبُ অর্থ- ভগবান মাধ্যমে অপরাধ হতে ফিরে আসা। আর الْأَوَّابُ অর্থ- তওবার মাধ্যমে গাফলত বা অমনোযোগী হতে প্রত্যাবর্তন করা। উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত صَلَاةُ الضُّحَى দ্বারা صَلَاةُ الضُّحَى বা চাশতের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। মাগরিবের নামাজের পরবর্তী নফল নামাজের সালাতুল আউয়ায়ীন নামকরণ কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

وَعَمَّا ۱২৩৭ زَنَدَ بِنَ أَرْقَمَ (رض) أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَيْصَالُ . -এর অর্থ : الْفَيْصَالُ শব্দটি الْفَيْصَالُ -এর বহুবচন। এর শাব্বিক অর্থ- উষ্ট্রের বাচ্চা। যে বাচ্চা তার মা হতে দুধ ছেড়ে পৃথক হয়ে গেছে তাকে تَمَيْلُ বলা হয়। تَرْمَضُ এটা رَمَضُ ধাতু হতে নির্গত, অর্থ- উত্তপ্ত হওয়া। সূর্যের তাপ বালুর উপর পতিত হওয়ায় যে গরম হয় তাকে الرَّمَضُ বলা হয়। এখানে অর্থ রৌদ্রের উত্তাপে উটের বাচ্চার পা পুড়তে থাকা। এ হাদীসাংশের উদ্দেশ্য হলো, যখন সূর্য একটু উপরে উঠবে এবং রৌদ্র কিছুটা প্রখর হবে তখনই صَلَاةُ الضُّحَى বা চাশতের নামাজ পড়তে হবে।

الْفَضْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَمَّا ۱২৩৮ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ (رض)
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعِ
رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ . (رَوَاهُ

১২৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দু দারদা ও আবু য়ার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আন্নাহ তাবারক ও তা'আলার পক্ষ হতে বলেছেন- আন্নাহ তা'আলা বলেন, হে আদাম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমার্শে আমার উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামাজ পড়, দিনের শেষার্শে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ দিনের দ্বিতীয়ার্শেই আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। -[তিরমিযী : কিন্তু

السَّيِّئِيَّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ
نُعَيْمِ بْنِ عَمَّارِ الْعَطْفَانِيِّ وَاحْتَدَّ عَنْهُمْ

আবু দাউদ ও দারেমী উক্ত হাদীস নোয়াইম ইবনে আন্নার গাত্ফানী হতে এবং ইমাম আহমদ তাদের সকলের নিকট হতে [অর্থাৎ তিনজন : আবুদ দারদা, আবু যার ও নোয়াইম ইবনে আন্নার গাত্ফানী হতে] বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الرَّامِدُ صَلَوةُ أَوْلَى النَّهَارِ শিবসের প্রথমার্শের নামাজ ঘারা উদ্দেশ্য : দিবসের প্রথমভাগের নামাজ ঘারা কোন নামাজ উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. অধিকাংশের মতে এর ঘারা صَلَوةُ الضُّحَى বা চাশতের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
২. কারো মতে এর ঘারা এশরাকের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
৩. অন্য একদল বলেন, এর ঘারা ফজরের সুন্নত ও ফরজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিতর্ক।

وَعَنْ ۱۲۳۹
بُرَيْدَةَ (رَضَ) قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثٌ
مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَفْصَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّصِقَ
عَنْ كُلِّ مَفْصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ
يُطِيقُ ذَلِكَ يَأْتِيَهُ اللَّهُ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي
الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّبُهُ عَنِ
الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكَعْتَا الضُّحَى
تُجْزِيكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২৩৯. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মানুষের শরীরে মধ্যে তিনশত ষাটটি জোড়া বা এস্থি রয়েছে, মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য এক একটি সদকা করা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! একুশ [সদকা করার] সামর্থ্য কার আছে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা ধুধু মাটিতে পুঁতে রাখা সদকা সমতুল্য এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও সদকা সমতুল্য। যদি এর কোনোটিই করার সুযোগ না পাও, তবে যোহর দু' রাকাত নামাজই তোমার জন্য যথেষ্ট। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجُزَيْلَةُ صَلَوةِ الضُّحَى وَجُزَيْلَةُ الْعَامَّةِ যোহর নামাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজের কজিলত : উক্ত হাদীস হতে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে জানা যায়। একটি হলো যোহা বা চাশতের নামাজ ন্যূনতম পক্ষে দু' রাকাতও পড়া যায়, তবে চার রাকাত পড়াই উত্তম। আর দ্বিতীয়টি হলো, নফল নামাজ হতে জনকল্যাণমূলক কার্য উত্তম। মসজিদের ধুধু মাটিতে পুঁতে ফেলা, রাস্তার কৃতিকারক বস্তু সরিয়ে ফেলা, এগুলো কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্গত। এ ধরনের কাজ আর্থিক সদ্কার সমতুল্য। কোথাও দু' দলের মধ্যে ঝগড়া-কাঁটি হতে দেখলে তা মীমাংসা করে দেওয়া, রাস্তায় পুল বা সাঁকো নির্মাণ বা মোরামত করে দেওয়া, ময়শা পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশন ও পরিষ্কার করা ইত্যাদি হাজারো রকমের সমাজকল্যাণমূলক কাজ রয়েছে যা নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম কাজ। তবে শর্ত হলো এ সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করতে হবে। এ সমস্ত কাজের কোনো সামর্থ্য না থাকলে হস্তের সন্তুষ্টি যোহর দু' রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে বলেছেন। যেটুকু হাদীসের তাৎপ্য বুঝা যায় যে, নফল ইবাদতের চেয়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

وَعَنْ ١٢٤٠ أَنَسِ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحَىٰ بُنِيَ عَشْرَةٌ
رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ -
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ)

১২৪০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি যোহার
বারো রাকাত নামাজ পড়বে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা
জান্নাত স্বর্গ দ্বারা একটি ইমারত নির্মাণ করেন। -[তিরমিযী
ও ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি
গরীব। কেননা এ বর্ণনা সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্র আমার
জানা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ١٢٤١ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ
فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَوةِ
الصُّبْحِ حَتَّى يَسْمِعَ رَكْعَتِي الضُّحَىٰ لَا
يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ
أَكْثَرَ مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২৪১. অনুবাদ : হযরত মুয়ায ইবনে আনাস জুহানী
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ শেষ করে অবসর হয় এবং
নিজের নামাজের স্থানে [সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত] বসে থাকে
এবং দু' রাকাত যোহার নামাজ পড়ে এবং ইত্যবসরে
উত্তম কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা না বলে, তার
যাবতীয় [ছোটখাট] গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা
সমুদ্রের ফেনার চেয়েও অধিক হয়। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ١٢٤٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافِظٌ عَلَى
شُفْعَةِ الضُّحَىٰ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ
كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

১২৪২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি
যোহার দু' রাকাত নামাজের প্রতি যত্নবান হয়, তার
যাবতীয় [সগীরা] গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও
[আধিকার দিক দিয়ে] তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।
-[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

الْفَصْلُ الثَّلَاثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ١٢٤٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافِظٌ عَلَى
شُفْعَةِ الضُّحَىٰ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ
كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

وَعَنْ عَائِشَةَ (رَضَ) أَنَّهَا كَانَتْ
تُصَلِّي الصُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ
لَوْ نَشِرَ لِي أَبُوَاي مَاتَرَكْتَهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২৪৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যোহার নামাজ আট রাকাত পড়তেন এবং বলতেন আমার পিতামাতাকেও যদি এই সময় জীবিত করে দেওয়া হয়, তবু [তাদের একবার দেখার জন্যও] আমি এ নামাজ ত্যাগ করব না। -[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُئِلَ هَادِيَسَةُ الْبَاهِيَا : هَيَرَت آيَيشَا (رَا.) بَلَن، ؤ نَامَآجِ آمَارِ نِيكَتِ ؤتِ بَرِيْءِ وَ ُؔكْرُؤُطُورْ يَه، آمَارِ پِيَتَامَاتَاكَه جِيْبِيَتِ كَرَه آمَارِ كَاَه نِيَه آسَا هَي تَبَه تَادَهَرِ ؤكِ نَجْرِ دَهَارِ ؤهَه ؤتَايَ آمَارِ كَاَه اَدِيَكِ بَرِيْءِ : هَيَرَت آيَيشَا (رَا.)-ءَرِ ؤكْتِي هَتَه ؤتَايَ بَرْتِيْءِمَانِ هَي يَه، ؤ نَامَآجِ فَرَجِ نَامَآجَهَرِ ؤهَه كَمِ ُؔكْرُؤُطُورْ نَه، يَدِيْءِ ؤ مَانِغَتَابَه ؤتَا فَرَجِ نَه : كَارِغِ فَرَجِ نَامَآجِ فُؤْتِ هَلَه تَارِ جَنَى كَايَا آدَاغَهَرِ بَارِهْشَا آهَه، آثَءِ ؤرِ كَاَجَا نَهِيْ : آرِ فَرَجِ هَلَه آتْلَاهَرِ هُكْرُمِ ؤبَه ؤتَا هَلَه فَرَجَهَرِ كْرِيَتِ-بِيْءِيَتِيَرِ پَرِيْءُورِكِ ؤبَه پِيَتَامَاتَاكَه پَرَه ؤ دَهْشَا يَارَه :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رَضَ) قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الصُّحَى حَتَّى
نَقُولَ لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا
يُصَلِّيَهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১২৪৪. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহার নামাজ [এমনভাবে] পড়তে থাকতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি বৃষ্টি আর এ নামাজ ত্যাগ করবেন না। যখন তিনি এ নামাজ ছেড়ে দিতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি আর তা পড়বেন না। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُئِلَ هَادِيَسَةُ الْبَاهِيَا : يَوهَارِ نَامَآجِ رَآسُؤْلِ ﷺ -ءَرِ نِيكَتِ اَدِيَكِ بَرِيْءِ هِءِءَا سَبْءُه مَآءَه مَآءَه تَا هَهءَه دِيَتَه، ؤتَا فَرَجِ هَيَه يَابَارِ آشِءْكَآيِ هَهءَه دِيَتَه، يَارَه كَرَه ؤمَّءَهَرِ ؤپَرِ كَوْنَه بِيْءِءِ كِطْكَرِ هَيَه نَا دَاؤِيَا :

وَعَنْ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ (رَحَا)
قَالَ قُلْتُ لِإِنِّ عَمَرَ تَصَلِّي الصُّحَى قَالَ
لَا قُلْتُ فَعَمَرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ
لَا قُلْتُ فَالِنَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا إِخَالَءَ - (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

১২৪৫. অনুবাদ : [তাবেরী] হযরত মুয়্যাররিক ইজলী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি যোহার নামাজ পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তবে হযরত ওমর (রা.) [পড়তেন কি?] উত্তরে বললেন, তিনিও না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে হযরত আবু বকর (রা.) পড়তেন কি? তিনি বললেন, তাও না। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে মহানবী ﷺ পড়তেন কি? উত্তরে বললেন, আমার মনে হয় তিনিও পড়তেন না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُئِلَ هَادِيَسَةُ الْبَاهِيَا : هَيَرَتِ اِءَبْنَه ؤمَرِ (رَا.)-ءَرِ كِطَارِ ؤءْءَهْشَا هَلَه، تَارَا كَهْءِءِ ؤ نَامَآجِ نِيْمَانِيَتِ پَءْءَرْنِي : بَرُءُتِ دَبَرِي كَرِيْمِ ﷺ يَه ؤ نَامَآجِ پَءْءَهْنَه تَا ؤپَرَه ؤئِيْءِيَتِ هَادِيَسَسُمُهَه بَرْنِيَتِ هَيَههَه :

بَابُ التَّطَوُّعِ

পরিচ্ছেদ : নফল নামাজ

التَّطَوُّعُ শব্দটি বাবে تَفَعَّلُ -এর মাসদার টَوْعٌ মূলধাতু হতে নিগর্ত। শাব্দিক অর্থ হলো- আনুগত্য প্রকাশ করা। শরিয়তের পরিভাষায় যাবতীয় নফল বা অতিরিক্ত ইবাদত পালন করাকে تَطَوُّعٌ বলা হয়। যেমন- তাহিয়্যাতুল অজু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে সে সব নামাজ ও দোয়ার হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۲۴۶۰
أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي
الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَدَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ
يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى
عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَطَهَّرْ طَهْرًا فِي سَاعَةٍ
مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الظُّهُورِ
مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصِلَى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৪৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফজরের নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে বেলাল! বল দেখি, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর এমন আশাযাজক কি আমল করেছ, যার বিরাট ছওয়ারের আশা তুমি করতে পার? কেননা আমি জান্নাতে আমার সম্মুখে তোমার পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। উত্তরে হযরত বেলাল (রা.) বললেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি এটা ছাড়া এমন কোনো কাজ করিনি, যার বিরাট ছওয়ারের আশা করা যেতে পারে। তা হলো আমি রাত বা দিনে যখনই পবিত্র হয়েছি অর্থাৎ অজু করেছি তখনই সে অজু দ্বারা আমি নামাজ পড়েছি, যে পরিমাণ নামাজের [আম্বাছ কর্তৃক] আমাকে তৌফিক দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এস মর্মার্থ : মহানবী ﷺ কিভাবে এবং কখন হযরত বেলালের জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. কারো মতে তিনি মি'রাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণের সময় শুনতে পেয়েছেন।
২. অথবা রাসূল ﷺ নিদ্রাবস্থায় শুনতে পেয়েছেন।
৩. কেউ বলেন যে, তিনি সজাগ অবস্থায় তা অনুধাবন করেছিলেন।
৪. অথবা অন্য কোনো সময় রূহানী মি'রাজে তিনি তা শুনছেন।

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ قَالَ وَسُمِّيَ حَاجَتَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

সংক্ষিপ্ত আশোচনা

الحديث شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : 'ইস্তিখারা' একটি উত্তম কাজ। মুসলমানের কোনো কাজ যার ভাল কিংবা মন্দ স্পষ্ট নয় তার জন্য ইস্তিখারা করা মোতাহায। নামাজের পর খুব বিনয়ের সাথে দোয়া করতে। অতঃপর আর কোনো অধ্যবর্তী না বলে পাক-পবিত্র বিছানায় ডান কাতে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে থাকবে এবং যে কাজের জন্য ইস্তিখারা করছে তা মনে মনে কল্পনা করতে থাকবে। আশা করা যায় তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা দেখতে পাবে। ইস্তিখারা কোনো ধপু দেখা মাওড়া আবশ্যিক নয়; বরং ইস্তিখারা করার পর যেদিকে মন দাঁত হই সেটাকেই কল্যাণকর মনে করবে।

১২৪৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সকল কাজে [আল্লাহ তা'আলার নিকট] ইস্তিখারা করার নিয়ম ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআন মজীদে কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সে যেন ফরজ নামাজ ব্যতীত দু' রাকাত নামাজ পড়ে, অতঃপর বলে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে ভাল দিক [জ্ঞাত হওয়া] প্রার্থনা করছি। তোমারই কুদরতের দ্বারা তোমারই নিকট [এর অর্জনের] ক্ষমতা চাচ্ছি; আমি তোমার মহান অনুগ্রহ হতে ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমি সমস্ত কিছুই উপর ক্ষমতাবান; অথচ আমি কোনো কিছুতে ক্ষমতা রাখি না। তুমি [আমার ইল্লিত বস্তুর] জ্ঞান রাখ; অথচ আমি এর কিছুই জানি না। তুমি [অদৃশ্য বস্তু] গায়েবসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আমি যে কাজ করতে চাই এই কাজটি যদি আমার জন্য ভাল হবে জান- আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবনধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে, অথবা তিনি বলেছেন [রাবী সন্দেহ] 'আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে' তবে তুমি তা আমার জন্য ব্যবস্থা কর এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য এতে কল্যাণ দান কর। আর যদি এই কাজ আমার জন্য খারাপ বা অকল্যাণকর জান-আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে অথবা রাসূল ﷺ বলেছেন- 'আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে' তাহলে তুমি একে আমার নিকট হতে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও তা হতে ফিরিয়ে রাখ। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর, তা যেখানেই আছে। অতঃপর তুমি আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখ। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, সে [প্রার্থনাকারী] যেন নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ের নাম করে। -[বুখারী]

رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَّثَ قَطُّ إِلَّا
تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ أَنْ لِلَّهِ عَلَيَّ
رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا .
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

রাসূলুল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু' রাকাত নামাজ পড়েছি। আর যখনই আমার অজু ভঙ্গ হয়েছে, তখনই আমি অজু করেছি এবং নিজের উপরে এটা আবশ্যিক ভেবেছি যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার দু' রাকাত নামাজ পড়তে হবে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ দু' কাজের বদৌলতেই অথবা এ দু' রাকাতের বদৌলতেই [তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে ছিলে]।

وَعَنْ ١٢٥١ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ
حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ
فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُقِنَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا
غَفَرْتَهُ وَلاَهُمَا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلاَ حَاجَةَ هِيَ
لَكَ رِضَى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১২৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট অথবা কোনো আদম সন্তানের নিকট কোনো প্রয়োজন রয়েছে [অর্থাৎ দীন বা দুনিয়াবী কোনো হাজত থাকে] সে যেন অজু করে এবং উত্তমভাবে অজু সম্পন্ন করে, অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়ে। তারপর আল্লাহ তা'আলার কিছু প্রশংসা করে এবং নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দরদ পাঠ করে এবং এ দোয়া পাঠ করে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (অর্থাৎ) আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও দয়ালু। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর- যিনি মহান আরশের প্রভু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। [হে আল্লাহ!] আমি তোমার নিকট এমন কাজ প্রার্থনা করি, যার বদৌলতে তোমার রহমত আমার উপরে অবধারিত হবে এবং এমন কাজের সংকল্প করতে প্রার্থনা করি- যার বদৌলতে তোমার ক্ষমা অবধারিত হবে, প্রতিটি সংকাজের উৎকৃষ্ট সুযোগ এবং প্রত্যেকটি গুনাহের কাজ হতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে সকল অনুগ্রহকারী বড় অনুগ্রহকারী আল্লাহ! তুমি আমার কোনো গুনাহকেই ক্ষমা ব্যতীত ছেড়ে দিও না। আমার কোনো বিপদকেই দূর করা ব্যতীত বাকি রেখো না। আমার যে কোনো প্রয়োজন- যা তোমার পছন্দনীয় তা পূর্ণ করা ব্যতীত বাকি রেখো না। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তবে ইমাম তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব]।

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

পরিচ্ছেদ : সালাতুত তাসবীহ

عَمْرُو ١٢٥٢
 ابْنِ عَبَّاسٍ (رضاً) أَنَّ
 النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ
 إِلَّا أَمْنَحُكَ أَلَا أُخِيرُكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ
 خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ
 ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَاهُ
 وَعَمَدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ أَنْ
 تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ
 قَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ فَإِذَا قَرَعْتَ مِنْ
 الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَفَّعَ
 فَتَقَوَّلَهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرَفَّعَ
 رَأْسَكَ مِنَ الرَّكُوعِ فَتَقَوَّلَهَا عَشْرًا ثُمَّ
 تَهَوَّى سَاجِدًا فَتَقَوَّلَهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ
 عَشْرًا ثُمَّ تَرَفَّعَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ
 فَتَقَوَّلَهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقَوَّلَهَا
 عَشْرًا ثُمَّ تَرَفَّعَ رَأْسَكَ فَتَقَوَّلَهَا عَشْرًا
 فَذَلِكَ خَمْسَ وَسِتِّمِئَاتٍ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ
 تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ
 اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً

১২৫২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ [আমার পিতা] হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে বললেন, হে আব্বাস, হে চাচাজান! আমি কি আপনাকে দেব না, আমি কি আপনাকে দান করব না, আমি কি আপনাকে সংবাদ দিব না, আমি কি আপনার সাথে দশটি সংকাজ করব না; [অর্থাৎ দশটি উত্তম তাসবীহ শিক্ষা দিব না] যখন আপনি তার আমল করবেন তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের, পুরাতন, নতুন, সকল প্রকার গুনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, সগীরা গুনাহ, কবীরা গুনাহ, গুণ্ড ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দেবেন? আপনি চার রাকাত নামাজ পড়বেন এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করবেন এবং যে কোনো একটি সূরা মিলাবেন। প্রথম রাকাতে যখন কেরাত পাঠ সম্পন্ন করবেন, তখন আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পনেরো বার, অতঃপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় [উক্ত তাসবীহ] দশবার পাঠ করবেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠবেন, [দাঁড়ানো অবস্থায়] উক্ত তাসবীহ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজদায় মাথা নত করবেন এবং সিজ্দা অবস্থায় দশবার তা পাঠ করবেন। তারপর সিজ্দা হতে মাথা উঠাবেন এবং [বসা অবস্থায়] উক্ত তাসবীহ দশবার পাঠ করবেন, তারপর পুনরায় সিজ্দা করবেন এবং সিজদায় দশবার তা পাঠ করবেন, অতঃপর সিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে ও দশবার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবেন। এ তাসবীহ প্রত্যেক রাকাতে পঁচাত্তরবার হলে। চার রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে এভাবে করবেন। এভাবে যদি প্রত্যেক দিন একবার এই নামাজ পড়তে সক্ষম হন,

فَاعْمَلْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَيُنَى كُلِّ جُمُعَةٍ
 مَرَّةً فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَيُنَى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِن
 لَّمْ تَفْعَلْ فَيُنَى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلْ فَيُنَى عُمُرِكَ مَرَّةً - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ
 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ)

তবে পড়বেন। আর যদি সক্ষম না হন, তবে প্রত্যেক
 জুমার দিনে একবার পড়বেন। তাও যদি না পারেন তবে
 প্রত্যেক মাসে একবার পড়বেন। তাও যদি না পারেন তবে
 প্রত্যেক বছরে একবার পড়বেন, আর যদি তাও না পারেন
 তবে আপনার জীবনে অন্তত একবার পড়বেন। -[আবু
 দাউদ, ইবনে মাজাহ্। বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীরে বর্ণনা
 করেছেন। তিরমিযী হযরত আবু রাফে' হতে উক্ত
 হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পড়া হয় سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ হাদীসের ব্যাখ্যা : যে নামাজে বারবার الْحَمْدُ لِلَّهِ
 তাকে صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলা হয়। এ নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও কিছু সংখ্যক হাদীস বিশারদ উক্ত হাদীসকে দুর্বল
 বলেছেন, তথাপি অধিকাংশ ইমাম এ হাদীসের উপর আমল করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। জীবনে অন্তত একবার صَلَوَاتُ
 اللَّهُ عَلَيْهِ পড়া আবশ্যিক। তিরমিযীর অপর একটি হাদীসে এ নামাজের আর একটি নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত
 হাদীসের নিয়মটিই প্রসিদ্ধ।

وَعَنْ ١٢٥٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَى مَا
 يَحْسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ
 صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ
 وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ
 مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ
 فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ
 ثُمَّ يَكُونُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي
 رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَخَّذُ
 الْأَعْمَالُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ)

১২৫৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
 কিয়ামতের দিন বান্দার যে সমস্ত কার্যাবলির হিসাব-নিকাশ
 গ্রহণ করা হবে, তন্মধ্যে প্রথম হবে তার নামাজের হিসাব।
 নামাজ শুদ্ধ হলে সে কৃতকার্য হবে এবং রেহাই পাবে।
 নামাজে বিপর্যয় হলে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি
 ফরজ নামাজের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে
 প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকাতা ওয়া তা'আলা
 ফেরশতাদেরকে বলবেন, তোমরা দেখ, আমার বান্দার
 কোনো সন্নত-নফল ইবাদত আছে কি না; [যদি থাকে] তা
 দ্বারা ফরজের ঘাটতিগুলো পূরণ করা হবে। অতঃপর এ
 পদ্ধতিতে তাঁর সকল কার্যাবলির হিসাব-নিকাশ গ্রহণ
 করা হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তারপর যাকাতের
 ব্যাপারেও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর সকল
 কার্যাবলির এ নিয়ম অনুসারে হিসাব গ্রহণ করা হবে।
 -[আবু দাউদ আর আহমদ জনৈক আজ্ঞাতনামা
 ব্যক্তির সূত্রে]

بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরের নামাজ

سَفَرٌ শব্দটি মাসদার : যার শাব্বিক অর্থ হলো অতিক্রম করা, পর্যটন করা, ভ্রমণে বের হওয়া, শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পথ অতিক্রমকারীকে মুসাফির বলা হয়।

এ সময়ের হুকুম ষাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। নিম্নে মুসাফিরের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কিত হাদীস পেশ করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٥٥ أَنَسِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ صَلَّى النَّظَرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِبَنِي الْحَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মদীনায়ে জোহরের নামাজ চার রাকাত পড়েছেন এবং যুল হলাইফায় আসরের নামাজ দু' রাকাত পড়েছেন।

—বুখারী ও মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَنَمَةِ فِي الْمَسَافَةِ لِأَدَاءِ النُّصْرِ নামাজ কসর করার জন্য সফরের দূরত্ব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে তিন দিনের দূরত্বের সফরে নামাজ কসর করতে হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দু' দিনের পথ এবং ইমাম আহমদ ও মালেক বলেন, আটচল্লিশ মাইল। বক্তৃত ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী যে তিন দিন ও দুই দিনের দূরত্বের কথা বলেছেন, এতে মাইলের হিসাবে সে আটচল্লিশ মাইল হয়। উক্ত তিন দিন বা দুই দিনের পথ বলতে সমভূমিতে উট সওয়ারী যোগে এবং পাহাড় ও টিলাময় এলাকায় পদব্রজে অতিক্রম করা যায় তাকে বুঝায়। আর পানি পথে মধ্যম বাতাসে তিন দিনে নৌকা যোগে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। কিন্তু জাহেয়ী সম্প্রদায়ের মতে সফর দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক কসর পড়া জায়েজ আছে। হজুর ﷺ যুল হলাইফায় আসরের নামাজ দু'রাকাত পড়েছেন, এ হাদীসই তাদের দলিল। যুল হলাইফা মদীনা থেকে মক্কার পথে ৫/৬ মাইল দূরে অবস্থিত। মদীনায়ে জোহরের নামাজ চার রাকাত পড়ায় বুখা গেল যে, সফর আরম্ভ করা কালে বাসস্থান থেকে কিছু দূরে না যাওয়া পর্যন্ত মুসাফিরের পক্ষে কসর পড়া জায়েজ নয়। এটা ছিল হজুরের হজের উদ্দেশ্যে মক্কার সফর।

عَنْ ١٢٥٦ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ الْخَزَائِمِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ صَلَّى يَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمْنَهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৬. অনুবাদ : হযরত হারেছা ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায়ে আমাদেরকে দু' দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন, অথচ তখন আমরা ইতঃপূর্বকর সমস্ত জনসংখ্যার তুলনায় অধিক ছিলাম এবং অধিক নিরাপদে ছিলাম।—বুখারী ও মুসলিম।

وَعَنْ ۱۲۵۷ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (رَض) قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَض) إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ أَنْ تَقْضُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِذَا خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ وَمَا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৫৭. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “যদি তোমরা ভয় কর যে, তোমরা তোমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলবে, তবে তোমরা তোমাদের নামাজ কসর করতে পার।” কিন্তু এখন মানুষ নিরাপদ হয়েছে [ভয় দূরীভূত হয়েছে]। অতএব নামাজে কসর করার কি প্রয়োজন আছে?। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি যে রূপ এতে বিশ্বয়বোধ করছেন, আমিও এরূপ বিশ্বয়বোধ করেছিলাম। আমি এ বিষয়ে একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এটা একটি দান বিশেষ, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা আল্লাহ তা'আলা এ [দয়ার] দানকে গ্রহণ কর। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কসরের বিধান : কসর ওয়াজিব, না ঐচ্ছিক? ফরজ নামাজ চার রাকাতের স্থানে দু' রাকাত পড়াকে 'কসর' (قَصْر) বলে। মুসাফিরের জন্য নামাজ কসর পড়া ওয়াজিব, না ইচ্ছাধীন- এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ আছে।

※ ইমাম আবু হানীফা (র.) নামাজে কসর করা ওয়াজিব মনে করেন, যদিও সে সফর গুনাহের উদ্দেশ্যে হয়। পথমধ্যে তার কোনো ভীতি থাকুক বা নির্ভয়ে চলতে সমর্থ হোক, তাকে কসর পড়তেই হবে। পূর্ণ নামাজ পড়া মাকরুহ হবে, তবে নামাজ আদায় হবে। তিনি উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। এতে 'কসর' করাকে সদকা বলা হয়েছে। **نَاقِلُوا** নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা সদকা কবুল করতে বলা হয়েছে যা ওয়াজিব হওয়ার দলিল। এ ছাড়া হযরত হাফসা (রা.)-এর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মহানবী ﷺ হযরত আবু বকর, ওমর ও উসমান কখনও সফর করে দু' রাকাতের বেশি ফরজ পড়তেন না। মিরকাতে উল্লেখ আছে যে, ছজুর ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদার এই আমল হানাফীদের মাযহাবকে সমর্থন করে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী ﷺ সফর অবস্থায় কখনও দু' রাকাতের বেশি পড়তেন না। সুতরাং আমাদের কথা হলো যদি তা ওয়াজিব না হতো তবে জায়েজ প্রমাণ করার জন্য হলেও তিনি মাঝে মধ্যে কখনো পুরা চার রাকতই আদায় করতেন। ফতোয়ার কিতাবে হানাফীদের মাযহাব সন্দেহ উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় কসর না করে পুরা নামাজ পড়ল সে সুনুতের বরখেলাফ করায় গুনাহগার হবে এবং যদি দু' রাকতের পর না বসে এবং প্রথম দু' রাকতকে কেবল পাঠ না করে, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

※ ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, সফর অবস্থায় নামাজ কসর করা **رُخِصَتْ** অর্থাৎ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। অর্থাৎ- 'কসর' করা না করা উভয়টি জায়েয আছে। তাঁরা আরও বলেন, কোনো পাপ কাজের উদ্দেশ্যে সফর করলে তখন আর এই **رُخِصَتْ** অর্থাৎ কসরের সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাঁরা বলেন, হাদীসে কসরকে 'সদকা' বলা হয়েছে। অথচ 'সদকা' বস্তুত নফল বা ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী 'সদকার' অর্থ রোখসত বা এখতিয়ার বলেছেন। এতদ্ভিন্ন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, মহানবী ﷺ মক্কা সফর কালে কসর ও পূর্ণ উভয়ভাবেই নামাজ পড়েছেন। হযরত উসমান (রা.) সন্দেহ এ কথা

প্রসিদ্ধ যে, তিনি মক্কায়, মিনায় নামাজ পূর্ণ চার রাকাতই পড়তেন। অবশেষে তাদের কথা কুরআনের আয়াত- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ এটাই একতিয়ার, কিছু ওয়াজিব নয়।

صَدَقَتْ هَانَاكীদের পক্ষ হতে জবাব : হযরত ইয়া'লা (রা.) বর্ণিত হাদীসে 'সদকা' দ্বারা সর্বস্থানে শুধুমাত্র একতিয়ার বা ইচ্ছাধীন নেওয়া ঠিক হবে না। কেননা স্থান বিশেষে এটা ওয়াজিব বা ফরজ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- আত্নাহর কালাম (الآية) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ এখানে সদকা শব্দ দ্বারা ওয়াজিব সদকা তথা হাকাতকেই বুঝানো হয়েছে। আর মহানবী ﷺ মক্কা সফরে 'মুকিম' হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'কসর' পড়েছেন এবং মুকিম হওয়ার পর 'পূর্ণ' নামাজ পড়েছেন।

অথবা প্রথমে তিনি উভয়ভাবে পড়েছেন এবং পরে 'কসর' পড়াই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। অথবা তিনি চার রাকাত বিশিষ্ট যেমন- 'জোহর, আসর ও এশা' এই তিন নামাজের কসর করেছেন এবং ফজর ও মাগরিবে পূর্ণ আদায় করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) পরিবার-পরিজন সহ মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন, তাই তিনি সেখানের মুকিম হওয়ার দরুন কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত পড়তেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) মিনাতে নামাজ 'কসর' না করার দরুন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ করলেন; তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন যে, হে লোক সকল! আমি এখন মক্কাতে ষপরিবারে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো শহরে [জনপদে] ষপরিবারে বসতি স্থাপন করে সে যেন মুকিমের মতো পূর্ণ নামাজ পড়ে"। এখানে আমাদের কথা হলো সাহাবায়ে কেরামের প্রতিবাদ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, 'কসর' করা বা না করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়; বরং ওয়াজিব।

আয়াতে عَلَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ দ্বারা লোকদের অমূলক ধারণাকে দূর করাই উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু তারা ভয়-তীতির সময় কসর নামাজ পড়াকে গুনাহ মনে করত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য বলা হয়েছে, এতে কোনো গুনাহ বা দোষ নেই, অথচ তা ওয়াজিব। যেমন- জাহেলিয়াতের যুগে 'সাফা' ও মারওয়া' পাহাড়ে إِسَافٌ এসাফ্ وَنَابِئَةَ নায়েলা নামক দুটি মূর্তি রক্ষিত ছিল। তৎকালীন হজের সময় তারা সেই পাহাড়ঘরের মধ্যে গিয়ে ঐ মূর্তি দু'টিকে ভোগ্যফ করত। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মার সময় উক্ত পাহাড়ঘরের মধ্যে হাজীদের সায়ী করার হুকুম নাজিল হওয়ার পর মুসলমানরা জাহিলিয়া যুগের কাজের অনুকরণ হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত সায়ী করাকে গুনাহ মনে করতে লাগল। তখন সেই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার উদ্দেশ্যে আয়াত নাজিল করলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ مَعَ النَّبِئِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنَ الْعَذَابِ عَذَابٌ أَشَدُّ وَأَلَمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (البقرة) অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ কিংবা ওম্মা করবে তার জন্য উক্ত সাফা এবং মারওয়া (পাহাড়ে) ভোগ্যফ করার মধ্যে কোনো গুনাহ বা দোষ নেই। এখানেও جُنَاحٌ শব্দ বলা হয়েছে। অথচ ওমরাকারীর জন্য সায়ী করা ওম্মার রোকন হিসাবে ওয়াজিব, একতিয়ার বা ইচ্ছাধীন কাজ নয়। সুতরাং আমাদের আদোচা বিধের বিধানও অত্র পঃ ১৩৩-এ কসর নামাজ তীতির সাথে সম্পৃক্ত কিনা? আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কসর নামাজ ভয়-তীতির সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ ভয়ের কারণ থাকলেই শুধু কসর পড়া যাবে। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

※ কিছু সংখ্যকের মতে কসর নামাজ ভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত, যেখানে ভয়ের কারণ আছে সেখানেই কসর নামাজ পড়তে হবে। তাদের দলিল হলো-

(١) قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا حَرَسْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

(٢) ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَ أَيْمُونًا صَلَوَاتُكُمْ فِي السَّفَرِ فَقَالُوا إِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي حَرْبٍ وَكَانَ يَسَافِرُ نَهْلًا تَعَاوَنَ أُمَّتُهُ.

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইমামদের মতে জীতি ছাড়াও কসর করা বৈধ। তারা হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া বর্ণিত হাদীসসহ নিম্নোক্ত হাদীসটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন-

(১) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) قَالَ صَلَّى يَسَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَعْنُ أَكْثَرَ مَا كُنَّا نَقْرُؤُ رَأْسَهُ يَمِينِي رُكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তাদের অর্থ : যারা বলেন কসর জীতির সাথে সংযুক্ত তাদের দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত তাঁরা সে আয়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে বর্ণিত وَانْ خُفِّمْنَا দ্বারা যে শর্ত করা হয়েছে তা قَبِدَ إِحْرَارِيٍّ নয়; বরং উহা قَبِدَ إِتْفَانِيٍّ অর্থাৎ তা দ্বারা শুধু এটাই বুঝা যাবে না যে, কেবলমাত্র ভয়ের অবস্থায়ই কসর কর্তে হবে- অন্য অবস্থায় কসর করা যাবে না। বরুতপক্ষে এ শর্ত এজন্য করা হয়েছিল যে, তদানীন্তন সময় মুসাফিরগণ প্রায়শ জীতিজনক অবস্থায় পতিত হতেন।

দ্বিতীয়ত এটা সে সমস্ত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ব্যাপারে কোনো কারণবশত শরিয়তের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু সে কারণ দূরীভূত হওয়ার পরও হুকুম বাকি রয়ে গেছে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কাফেরদের সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশের জন্যই তওয়াক্ফের মধ্যে রমল বা বীরত্বপূর্ণ দৌড়ানোর হুকুম প্রবর্তিত হয়েছিল; কিন্তু সে কারণ বর্তমানে অবশিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও রমলের হুকুম বলবৎ রয়েছে। আর এরূপই সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানোর বিধান।

وَعَنْ ١٢٥٨ أَنَسِ (رض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يَصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ نَمْتَمَّ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা হতে মক্কা অভিমুখে বের হলাম, রাসূল ﷺ এ সফরে মদীনায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত (ফেরজ) নামাজ দু' দু' রাকাত করে পড়তেন। হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনারা মক্কাতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন কি? তিনি বললেন, তথায় আমরা দশদিন অবস্থান করেছিলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُساফিরের মুকীম হওয়ার সময়ের ব্যাপারে মতভেদ : মুসাফির যে সময় পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করার নিয়ত করলে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে হয় সে সময় সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আইনীতে এ সম্পর্কে বাইশটি অভিমত পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ তিনটি মত নিম্নরূপ-

- ইমাম আহমদ ও দাউদ যাহেহরীর মতে, মুসাফির যদি চার দিনের অতিরিক্ত সময় কোথাও অবস্থান করার নিয়ত করে তবে তাকে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো রাসূল ﷺ হাজার সময় চারদিন পর্যন্ত কসর নামাজ পড়তেন। সুতরাং বুঝা গেল চার দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে। এর অতিরিক্ত হলে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে হবে।
- ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের এক মতানুযায়ী মুসাফির চার দিন পর্যন্ত কোথাও অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে নামাজ পূর্ণ পড়তে হবে। চার দিনের কম হলে কসর পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো-

مَارَوْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا بَقَصُرَ مِنْ عُسْرِيَةٍ

- ইমাম আবু হানীফা, সুফয়য়ান সাওরী, লাইস, ইবনে সাদ গ্রন্থের মতে মুসাফির যদি কোথাও নূনতম পনেরো দিন অবস্থান করার নিয়ত করে তবে তাকে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে হবে। নতুবা তাকে কসর পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো-

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَأَبْنِ عُسْرٍ (رض) قَالَ إِذَا قَدِمْتَ بَلَدًا وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي نَفْسِكَ أَنْ تُقِيمَ حُسْنًا عَشْرَ بَرَّاتٍ فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ لَا تَذَرِي مَنَى نَظْمَنَ فَأَقْصِرْهَا . (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

- (২) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنِّفِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ ابْنَ عَسَرَ (رض) كَانَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرَةِ عَشْرٍ يَوْمًا أَمَّ الصَّلَاةَ .
- (৩) عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ (رض) أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَامَ الْمُسَافِرُ عَشْرَةَ عَشْرَةَ لَيْلَةً أَمَّ الصَّلَاةَ .

وَعَنْ ١٢٥٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَفْرًا فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشْرَ يَوْمًا يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَحَنَّنْ نَصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَحَنَّنْ نَصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَحَنَّنْ نَصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فَإِنَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشْرَ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقْمَنَّا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২৫৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক সফরে বের হলেন এবং তথায় উনিশ দিন যাবৎ অবস্থান করলেন, এ সময়ের মধ্যে তিনি (ফরজ) নামাজ দু' দু' রাকাত করে পড়তে থাকলেন। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন, আমরা আমাদের এখানে অর্থাৎ মদীনা ও মক্কার মধ্যে কোনো স্থানে উনিশ দিন যাবৎ অবস্থান করতাম, নামাজ দু' দু' রাকাত পড়তাম। এর বেশি যখনই অবস্থান করতাম, চার রাকাতই পড়তাম। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসের ব্যাখ্যা : মক্কা ও মদীনার মধ্যে তখনকার সময় যাতায়াতের দুটি পথ ছিল। একটি পাহাড়ী পথ, যাতে সময় কম লাগত, অপরটি মরুভূমির পথ, যাতে ১৯ দিন সময় লাগত। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোথাও ১৯ দিনের অধিক অবস্থানের নিয়ত করলে মুসাফির মুকিম হয় না। কিন্তু ইমাম তাহবী (র.) কর্তৃক বর্ণিত তার অপর হাদীসে ১৫ দিনের নিয়ত করলে মুকিম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অজিতম এটাই।

وَعَنْ ١٢٦٠ حَنْصِ بْنِ عَاصِمٍ (رح) قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عَسَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ قَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَيِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رُكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হাফস ইবনে আসে [ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব] (র.) বলেন, একবার আমি মক্কার পথে [আমার চাচা] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সহচর ছিলাম। একদা পথের মধ্যে তিনি আমাদেরকে জোহরের নামাজ দু' রাকাত পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর অবস্থান স্থলে এসে বসলেন। তিনি দেখলেন, লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এই সমস্ত লোকেরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামাজ পড়ছে? তখন তিনি বললেন, যদি [সফরে] নফলই পড়তে পারতাম তা হলে ফরজকেই পূর্ণ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছি। দেখছি তিনি সফরে দু' রাকাতের অধিক কিছু পড়তেন না। হযরত আবু বকর, ওমর, এবং উসমান (রা.)-এর ও আমি সহচর ছিলাম। দেখছি তারাও এরূপ করতেন। —[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ هَادِيَسِ الرَّبَّيَا : نَبِيَّ كَرِيْمًا ﷺ سَفَرَةَ فَرَجَ حَاقًا وَ كَيْدُ نَفَلِ نَامَاژِ پَدْذَهَنَ بَلِے اَپَرِ هَادِيَسِے اَسَعَهَے : سُوْتَارَا هَیْرَتِ اِیْبَنِے اَمَرِ (رَا.)-এর কথা অর্থ নিম্নরূপ হতে পারে-

১. অধিকাংশ সফরেই ফরজের অধিক কোনো নামাজ পড়েননি। যদি পড়ে থাকেন তা কদাচিৎ, যা হিসাবে গণ্য হয় না।
২. ফরজ নামাজ পড়তে কোথাও জমিনে অবস্থান করতে হয়, কিন্তু নফল ইত্যাদির জন্য তা করতে হয় না, বরং সওয়ারীর উপর থেকে চলা অবস্থায়ও পড়া যায়। সুতরাং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কথা অর্থ হলো জমিনে অবস্থান করে হজুর ﷺ দু' রাকাতের অধিক পড়েনি। তবে সওয়ারী অবস্থায় নফল পড়ছেন কি না, এ হাদীসে তার উল্লেখ বা নিষেধ কোনটিই নেই।
৩. হযরত ইবনে ওমর (রা.) যে সফরে হজুর ﷺ সহচর ছিলেন, সম্ভবত তিনি সেই সফরে নফল-সুন্নত পড়েননি। তাই তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ফলে যে সফরে সাথে ছিলেন না সম্ভবত সেই সফরে নফল ইত্যাদি পড়েছেন, আর ইবনে ওমর (রা.) অবগত ছিলেন না বিধায় অস্বীকার করেছেন। এ পর্যায়ে হজুর ﷺ -এর কাজের বা হাদীসের মধ্যেও বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ۱۲۶۱ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رَض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২৬১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর অবস্থায় থাকতেন তখন জোহর ও আসর নামাজকে একসাথে পড়তেন এবং একপড়াভাবে মাগরিব ও এশাকেও একত্রে পড়তেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আলোচনা পরবর্তী ১২৬৬ নং হাদীস প্রসঙ্গে আসছে।

وَعَنْ ۱۲৬২ اِبْنِ عَمْرٍ (رَض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلٰى رَاِحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ يَوْمِيْ اِیْمَاءَ صَلَاةِ الْكَيْلِ اِلَّا الْفَرَايِضَ وَتَوَتَّرَ عَلٰى رَاِحِلَتِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় ফরজ ব্যতীত রাতের [নফল] নামাজ নিজের সওয়ারীর উপরেই ইশারায় পড়তেন, তাকে নিয়ে সওয়ারী হেঁদিকেই চলত না কেন। একরূপ বিতর নামাজও তিনি আপন সওয়ারীর উপরে পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْاَخْبَارُ مِنَ الْاَخْبَارِ السَّيْفِيَّةِ السَّخَرِيَّةِ عَلٰى ظَهْرِ الدَّابَّةِ : সফর অবস্থায় সওয়ারীর উপর বসে নফল নামাজ পড়া চার ইমামের মতেই জায়েজ। যদিও বাহন জন্তুটি কেবলার দিকে মুখ না করে। উপরিউক্ত হাদীসই এর দলিল। এতদ্ব্যতীত আবু দাউদে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অপর হাদীসেও রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ সওয়ারীর ওপর নফল নামাজ পড়তেন, সওয়ারী যে দিকেই মুখ করে চলত না কেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রথম তাকবীরে তাহরীমার সময় কেবলার দিকে মুখ করা ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ ও আবু ছাওর (র.)-এর মতে, তাকবীরে তাহরীমার সময় কেবলামুখী হওয়া মোত্তাহাব। তাঁরা আবু দাউদ, আহমদ ও দারাকুতনী বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, “রাসূল ﷺ যখনই সফর অবস্থায় নফল পড়তে মনস্থ করতেন, নিজের উটকে কেবলামুখী করতেন এবং নিয়ত বাঁধতেন। স্তমতঃপর

নামাজ পড়তে থাকতেন, সওয়ারী যেদিকেই চলুক না কেন। কিন্তু হানাবী মতে কেবলামুখী হওয়া কোনো সময়ই ওয়াজিব নয়। নামাজের প্রথমে হোক বা নামাজ পাঠরত অবস্থায় হোক। কেননা, তাঁদের মতে যদি কেবলামুখী ছাড়া নামাজই পড়া যায়, তবে কেবলামুখী ছাড়া তাকবীরে তাহরীমাও করা যাবে।

مَذَهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَأَهْلِ الظَّرَافِيرِ : ইমাম আবু ইউসুফ ও আহলে যাহেরের মতে, নফল নামাজ সওয়ারীর উপরে শুধু সফর নয়, মুকিম অবস্থায়ও জায়েজ। তাঁরা বলেন, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলোতে সফরের শর্তারোপ করা হয়নি; বরং সাধারণভাবে সফরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

مَذَهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَجَمَاهُورِ الْأَئِمَّةِ : পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ ও জমহুর আলেমদের মতে নিজেসব বাসস্থানে থাকা অবস্থায় জায়েজ নেই, তবে সফর অবস্থায় জায়েজ আছে। কেননা কোনো কোনো হাদীসে সফর অবস্থায় শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন প্রসঙ্গক্রমে আন্দুল্লাহ ইবনে দীনারের হাদীস পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সফরে সওয়ারীর উপরে নামাজ পড়তেন, সওয়ারী যেদিকেই মুখ করত না কেন।

ফরজ নামাজ সওয়ারীর পিঠে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই। তীত ব্যক্তির জন্য জায়েজ আছে, তবে জয়ের কারণ ব্যতীত কারো জন্য জায়েয নেই। নৌযানে আরোহীদের হুকুম কোনো পশুর পৃষ্ঠে আরোহণের হুকুমের অনুরূপ নয়। চাই সফর অবস্থায় হোক বা মুকিম অবস্থায় হোক। নৌযান দিক পরিবর্তনে সাথে সাথে মুসল্লিকে কেবলার দিকে মুখ করতে হবে।

مَذَهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَجَمَاهُورِ الْأَئِمَّةِ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আ'তা, হাসান বসরী, ইবনে আবু রাবাহ, ইসহাক প্রমুখের মতে সওয়ারীর পিঠের উপর বিতর নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, সাহেবাইন, উরওয়া ইব্রাহীম নাখরী প্রমুখের মতে ফরজ নামাজের ন্যায় বিতরও সওয়ারী জানোয়ারের পিঠে পড়া জায়েজ নেই। তাঁরা বলেন, মহানবী ﷺ সফরে দিনের সুন্নত-নফল নামাজও সওয়ারীর উপরে পড়তেন বলে কতিপয় হাদীসে বর্ণিত আছে এবং বিতর নামাজ সওয়ারী হতে নিচে নেমে পড়তেন বলেও হাদীসে উল্লেখ আছে। কাজেই হানাফীগণ বলেন, 'বিতর' নামাজ নিচে নেমে পড়তে হবে। আসলে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীগণ 'বিতর'-কে নফল তথা সুন্নত মনে করেন। তাই অন্যান্য নফলের মতো বিতরকেও সওয়ারীর পিঠে পড়া জায়েজ বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) হানাফীদের মতো বিতরকে ওয়াজিবই বলেন। তবে সওয়ারীর পিঠে আদায় করা জায়েজ বলেছেন।

الدَّفْعُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ۱۲۶۳ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ كُلُّ ذَلِكُ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَصْرَ الصَّلَاةِ وَاتَمَّ - (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ)

১২৬৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় সব রকমের আমলই করেছেন কসরও করেছেন এবং পূর্ণ নামাজও আদায় করেছেন। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আশোচনা

الْحَدِيثُ هَادِي السَّرِّعَاتِ : হাদীসের ব্যাখ্যা : কোনো কোনো হাদীসবিদের মতে এ হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তবে আন্তর্জাতিক দারাকুতনী হাদীসটিতে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু মহানবী ﷺ সফরে সর্বদা 'কসর' করেছেন বলে ওলামাগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য হলেও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদীসের সাথে এর বিরোধ হবে না। কারণ, তিনি বলেন, হযরত আয়েশার কথার অর্থ হলো নবী ﷺ জোহর, আসর ও এশা'র নামাজে 'কসর' করেছেন এবং মাগরিব ও ফজর নামাজ পূর্ণ আদায় করেছেন।

অথবা প্রথম প্রথম উভয়ভাবে পড়েছেন এবং পরে 'কসর'কে নির্দিষ্ট করেছেন।

অথবা জায়েজ প্রমাণের জন্য পূর্ণও পড়েছেন; এ ব্যাখ্যার পরে অন্যান্য সফর সংক্রান্ত হাদীসের সাথে কোনো সমস্যা থাকে না।

وَعَنْ ١٢٦٤ **عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ** (رض) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يَصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرَبَعًا فَنَأَا سَفَرًا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২৬৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি এবং মক্কা বিজয়ের সময়েও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মক্কায় আঠারো রাত (দিন) অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি ফরজ নামাজ দু' রাকাত ছাড়া পড়েননি। তিনি শহরবাসী মুকিম-দেরকে বলতেন, হে শহরবাসীগণ! তোমরা [উঠে] চার রাকাত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফির। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুক্তাদি যদি মুকিম হয় এবং ইমাম মুসাফির, তা হলে মুক্তাদি সে ইমামের অনুসরণ করে নামাজ কসর করবে না; বরং সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর এ ক্ষেত্রে ইমামের উচিত সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদিদেরকে তাদের বাকি নামাজ পূর্ণ করার জন্য বলে দেওয়া। পক্ষান্তরে মুক্তাদি যদি মুসাফির হয় এবং ইমাম মুকিম, এমতাবস্থায় মুক্তাদির উচিত হবে ইমামের সাথে নামাজ পরিপূর্ণ করা।

وَعَنْ ١٢٦٥ **ابْنِ عَمَرَ** (رض) قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظَّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظَّهْرَ أَرَبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظَّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَكَمْ يَصَلُّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَتَرْتِيبُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১২৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সফর অবস্থায় জোহর নামাজ (ফরজ) দু' রাকাত পড়েছি এবং তারপর দু' রাকাত (সন্নত) পড়েছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে মুকিমাবস্থায় ও সফর উভয় অবস্থায়ই নামাজ পড়েছি। অতএব আমি তাঁর সাথে মুকিম অবস্থায় পড়েছি জোহর নামাজ চার রাকাত এবং তার পরে [সন্নত] দু' রাকাত। সফর অবস্থায় তাঁর সাথে জোহর পড়েছি দু' রাকাত এবং তারপর [সন্নত] দু' রাকাত। আর আসর পড়েছি দু' রাকাত। তারপর আর কোনো নামাজ রাসূল ﷺ পড়েননি এবং মাগরিব নামাজে মুকিমাবস্থা কি সফর উভয় অবস্থায় একইরূপ অর্থাৎ তিন রাকাত পড়েছেন। মুকিম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, রাসূল ﷺ তিন রাকাত হতে কিছু কমাতেন না। এটা হলো দিনের বিতর। এর পরে দু' রাকাত [সন্নত] পড়েছেন। -[তিরমিধী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি এবং মক্কা বিজয়ের সময়েও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মক্কায় আঠারো রাত (দিন) অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি ফরজ নামাজ দু' রাকাত ছাড়া পড়েননি। তিনি শহরবাসী মুকিম-দেরকে বলতেন, হে শহরবাসীগণ! তোমরা [উঠে] চার রাকাত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফির। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ۱۲۶۶ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَرَوٍ تَبَوَّكَ إِذَا رَأَتْ
الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَإِنْ أَرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي
الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ
قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ وَإِنْ أَرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيَّبَ
الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ
ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ)

১২৬৬. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ তারুকের যুদ্ধের সময় এরূপ করতেন, তার মঞ্জিল ত্যাগের পূর্বে যদি সূর্য হেলে পড়ত, তখন জোহর ও আসর নামাজকে একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি তিনি সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই রওয়ানা করতেন, তা হলে জোহরকে দেরি করতেন, যতক্ষণ না আসর নামাজের জন্য অবতরণ করতেন। অনুরূপভাবে তিনি মাগরিব নামাজেও করতেন। মনজিল তাগের পূর্বে যদি সূর্য অস্ত যেত তখন তিনি মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করতেন, যতক্ষণ না তিনি এশার নামাজের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন। অতঃপর তিনি মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন। -[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

‘নামাজের মধ্যে একত্রিকরণের প্রক্রিয়া : দুই নামাজকে একত্রিকরণ’ ব্যাপারটি দু’ ধরনের হতে পারে, (১) একটি হলো جَمَعَ حَقِيقُ অর্থাৎ প্রকৃত একত্রিকরণ। (২) দ্বিতীয়টি جَمَعَ صُورِي অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে একত্রিকরণ। যথাক্রমে- জোহর ও আসরকে একত্র করে আসর ওয়াতে উভয় নামাজকে এবং মাগরিব ও এশাকে এশার ওয়াতে উভয় নামাজকে একসাথে পড়া। এটা হলো ‘জমুয়ে হাকীকী’ বা প্রকৃত একত্রিকরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো জোহরকে বিলম্ব করে একেবারে তার শেষ ওয়াতে এবং আসরকে শীঘ্র করে একদম প্রথম ওয়াতে পড়া, একে বলা হয় (جَمَعَ صُورِي) ‘জমুয়ে সূরী’ বা আপাত দৃষ্টিতে একত্রিকরণ। এ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একত্রিকরণের মধ্যে কারো মতভেদ নেই। কেননা প্রত্যেকটি নামাজ আপন আপন ওয়াতের মধ্যেই পড়া হয়েছে। আর বিশেষ কোনো কারণে এ পদ্ধতিতে দু’ নামাজকে একত্রিকরণ জায়েজ আছে। মূলত এটা জায়েজ হওয়ার কারণ হলো এই যে, জোহর ও আসরের ওয়াতের মধ্যখানে, তদ্রূপভাবে মাগরিব ও এশার ওয়াতের মধ্যখানে কোনো একটি ওয়াতে বা সময় تَمِيزَةً বা পৃথকিকরণ নেই। কাজেই একটি শেষ করে অপরটি আপন ওয়াতে শুরু করা যেতে পারে।

আর প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রকৃত একত্রিকরণের মধ্যেও কিছু কিছু একত্রিকরণ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ আছে। যেমন- ৯ ই জিলহজ্জ তাগিহ আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আসর এবং সে দিনকার মাগরিব ও এশার নামাজ মুযদালিফায়। মহানবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত আমল ও আদেশ ঐ তারিখে উক্ত স্থানঘরের মধ্যে প্রকৃত একসাধকরণ প্রমাণিত। এটা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে, কোনো অবস্থায় দু’ ওয়াতের নামাজকে একই ওয়াতে একত্রিকরণ জায়েজ আছে কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে। একত্রিকরণ ‘সম্পর্কে ফকীহদের তিনটি অভিমত রয়েছে-

১. جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةَيْنِ وَالْإِخْلَافَ نَبِيٌّ নামাজ একত্রিকরণ ও ইমামদের মতভেদ : দু’ ওয়াতের নামাজকে ‘প্রকৃত একত্রিকরণ’ সম্পর্কে ফকীহদের তিনটি অভিমত রয়েছে-
- ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যদি সফর দ্রুততর হয়, বার বার স্থানে স্থানে অবতরণ ও অবস্থানের দরুন পথ অভিক্রমের মধ্যে বিয়ু ঘটে, এ অবস্থায় দু’ নামাজকে প্রকৃত একত্রিকরণ জায়েজ আছে। তাঁর দলিল-

(১) عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّبْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“হযরত নাফে’ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, মহানবী ﷺ যখন সফরে তড়াহুড়া করতেন অর্থাৎ- কোথায়ও তড়িৎ গতিতে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তখন মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তেন”।
-মুসলিম]

(২) عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ (رض) كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّبْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لِيَذَا جَدَّ بِهِ السَّبْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“উবাইদুল্লাহ হযরত নাফে হতে এবং তিনি ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ যখন তড়িৎ গতিতে ভ্রমণ করতেন তখন মাগরিব ও এশাকে ‘শফক’ অন্তর্গত হওয়ার পরে একত্র করে পড়তেন।” -মুসলিম]

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছল্লু দু’ নামাজকে প্রকৃত একত্রিকরণ করতেন। ‘শফক’ অর্থ- রক্তিম আভা। আর মাগরিবকে ‘শফক’ অন্তর্গত হওয়ার পরে পড়া মানে এশার ওয়াজে পড়া।

(৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ اسْتَعْيَبَتْ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّبْرُ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرَ هُمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقَعْلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّبْرُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবু সওর, ইবনে মুনিয়র, আতা, মুজাহিদ, তাউস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেরীগণের মতে সাধারণ সফরে ও সাধারণ প্রয়োজনে দু’ নামাজকে একত্রিকরণ জায়েজ আছে। চাই সেই ভ্রমণ দ্রুত গতির হোক কিংবা ধীরগতির হোক। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, রোগী বা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু’ নামাজ একত্রিকরণ জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, রোগীর জন্য জায়েজ নেই, তবে বান-বাতাস, ঝড়-তুফান এবং বৃষ্টি-বাদলের দরুন দুই নামাজ একত্রিকরণ জায়েজ আছে। এটা ইমাম আহমদ ও ইসহাকেরও অভিমত। তারা একদিকে যেমন উক্ত মুয়ায দুই নামাজের হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। অপর দিকে তাঁরা বলেন, এমন অনেক হাদীস আছে, যেখানে দ্রুত গতিতে সফর করার কোনো শর্ত পাওয়া যায় না, তবু রাসুল ﷺ নামাজকে একত্রিত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবনে মাসউদ (রা.) সহ সাহাবী ও তাবেরীদের এক বিরাট জামাত বলেন, আরাফাত ও মুযদালিফায় ৯ই জিলহজ তারিখ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে, কোনো কারণে, কোনো সময়ই দুই নামাজকে একত্রে পড়া জায়েজ নেই। ‘জায়েজ নেই’ বলতে ‘প্রকৃত একত্রিকরণ’ (جَمَعَ) বুঝানো হয়েছে। আবশ্য জমুয়ে সুন্নী বা আপাত দৃষ্টিতে একত্রিকরণ জায়েজ আছে। তাদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

- (ক) আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-مَوَاقِفَ الْقَوْمِ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا تَكُنُّ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا تَكُنُّ مَوَاقِفَ الْقَوْمِ অর্থাৎ নামাজ বিশ্বাসীদের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ। [এই সময়ের] আপো পড়া বা দেরি করা জায়েজ হবে না।
- (খ) আল্লাহ বলেছেন-حَانِطُوا عَلَى الصَّلَاةِ أَنْ أَدْرَأَ فِي أَوْقَاتِهَا অতএব কোনো নামাজকে ওয়াস্ত হতে বের করা জায়েজ হবে না।
- (গ) আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ কেননা পূর্বেকার কিছু লোক নামাজকে তার সুনির্দিষ্ট সময় হতে বিলম্ব করে পড়ত, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। এরূপ লোকদের জন্য ওয়াইল দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে। সুতরাং নামাজ বিলম্ব করা জায়েজ হবে না।
- (ঘ) মুসল্লাফে ইবনে আবু শাইবা হতে উদ্ধৃত হয়েছে-

عَنْ أَبِي مُوسَى (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُدْوٍ مِنَ الْكِبَائِرِ فَلَا يُحَاطَرُ بِعُدْوِ السَّبْرِ وَالْمَطَرِ كَسَائِرِ الْكِبَائِرِ لِمُتَابَعَةِ الْغَدْرِ

হযরত আবু মুসা আশ’আরী বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শরিয়তসম্বন্ধ কারণ ব্যতীত দু’ নামাজকে একত্র করা বড় গুনাহসমূহের অন্যতম। সুতরাং সফর জনিত এবং বর্ষা-বাদল ঘটিত কারণ অত বড় গুনাহের মোকাবিলায় শরিয়তসম্মত কারণ বলে গণ্য হবে না।

(৬) হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, **إِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَتَبَ إِلَى الْأَنْفَانِ بَيْنَهُمْ أَنْ يَحْمَرُّوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ** নবী করীম ﷺ প্রদেশসমূহের কর্মকর্তাদের দু' নামাজ একত্র করতে নিষেধ করে পত্র লেখেছেন এবং তাদেরকে এ সংবাদও জানিয়েছেন যে, দু' নামাজকে একত্র করা বড় গোনাহসমূহের অন্যতম।

(৮) বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, **يَجْتَمِعُ إِلَى صَلَاةٍ لَيْسَ مَعَهُ صَلَاةٌ لَيْسَ مَعَهُ صَلَاةٌ لَيْسَ مَعَهُ صَلَاةٌ** (রুদ) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةً لَيْسَ مَعَهُ صَلَاةٌ لَيْسَ مَعَهُ صَلَاةٌ لَيْسَ مَعَهُ صَلَاةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) كَيْ يَمْدُلِيَةً فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَجْتَمِعُ وَصَلَّى صَلَاةً الصُّبْحِ فِي الْقَدِّ قَبْلَ وَقْتِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) هَضْرَتِ إِبْنِ مَسْعُودٍ (رَأَى) بَرْنًا كَرِهْنَهُ، آمِي كَرِهْنَهُ وَنَبِي كَرِيْمٌ ﷺ -কে ওয়াক্ত ছাড়া নামাজ পড়তে দেখিনি- আরাফাত ও মুহদালিফা বাতীত। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ঐ দুই একত্রীকরণ ছাড়া কখনও নামাজকে ওয়াক্তের বাইরে নিয়ে পড়েননি।

হানাফীদের পক্ষ হতে ইমাম মালেকের পেশকৃত দলিল হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দ্রুততার সফরের সময় রাসূল ﷺ যে একত্রীকরণ করেছেন তা প্রকৃত একত্রীকরণ ছিল না; বরং আপাত দৃষ্টিতে একত্রীকরণ ছিল। আপাত দৃষ্টিতে একত্রীকরণ সকলের মতেই জায়েজ।

ইমাম মালেকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে 'শফক [রক্তিম আভা] অণ্ডিত হওয়ার পরে মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়া হয়েছে' বলে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শফক দু' প্রকার- লাল ও সাদা। সম্ভবত লাল শফক অণ্ডিত হওয়ার পরে রাসূল ﷺ দু' নামাজ একত্রে পড়েন এবং পড়েছেন। যারা সাদা শফককে শফক বলেন, তাঁদের মতে রাসূল ﷺ মাগরিবকে মাগরিবের ওয়াক্তেই পড়েছেন; যদিও শেষ সময় পড়েছেন। এজ্ঞপভাবে এশাকে এশার ওয়াক্তেই পড়েছেন। এটা তাঁদের মতে, যারা শুধু লাল শফক (شَفَقٌ)-কেই শফক মনে করেন। পরবর্তী সাদা শফককে শফক-এর মধ্যে গণ্য করেন না। এমতাবস্থায় যদিও মাগরিব ও এশাকে একই ওয়াক্তে একত্র করা হয়েছে বুঝা যায়; প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি নামাজই নিজ নিজ ওয়াক্তেই সম্পন্ন হয়েছে- শফক সম্পর্কে মতভেদ অনুসারে। সুতরাং এটা আপাত দৃষ্টিতে একত্রীকরণ; প্রকৃত একত্রীকরণ নয়। এটা ছাড়াও তাদের দলিলগুলোর একাধিক অকাটা জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ যে শর্তহীনভাবে দু' নামাজ একত্রীকরণ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন, এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত হাদীসে একত্রীকরণ অর্থে আপাতদৃষ্টিতে একত্রীকরণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ প্রথম নামাজকে তার শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন এবং দ্বিতীয় নামাজকে প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। তিনি একই ওয়াক্তে দু' নামাজকে পড়েননি।

হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীস এ অর্থের সহায়তা করে। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ জোহর ও আসরকে একত্রে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়েছেন, ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে এবং সফর ব্যতিরেকে। -[মুসলিম]। অন্য শব্দ প্রয়োগে বলেছেন, "নবী করীম ﷺ মদীনাতে অবস্থানকালে ভয়-ভীতি ও বর্ষা-বাদল ছাড়াই জোহর, আসর এবং মাগরিব, এশা একত্রে পড়েছেন"। তাই ইমাম ডাহাবী (র.) বলেন, হানাফী বা গায়ের হানাফী কোনো ইমামই মুকীম অবস্থায় দু' নামাজ একত্রীকরণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন না। এতে বুঝা যায় যে, যে সব হাদীসে একত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, তাতে جَمَعَ صَوْرَتِي আপাতদৃষ্টিতে একত্রীকরণের কথাই বলা হয়েছে।

وَعَنْ ١٢٦٧ أَنَسِ (رُضَا) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ وَارَادَ أَنْ يَطْوَعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَ رِكَابَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সফরে বের হতেন এবং নফল নামাজ পড়তে ইচ্ছা করতেন তখন তার উটনীকে কেবলামুখী করতেন, অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তারপর নামাজ পড়তে থাকতেন, সুওয়াবী তাঁকে যেদিকেই ফিরিয়ে নিক না কেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উপরি উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ীর মতে সওয়ারীর উপর নফল নামাজ পড়তে হলে তাকবীরে তাহরীমার সময় কিবলার দিকে মুখ করা ওয়াজিব। হানাফীগণ এর জওয়াবে বলেন, এ হাদীস দ্বারা তাহরীমার সময় কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব বলে; প্রমাণিত হয় না। বরং হাদীসটির বিতুদ্ধতা সাব্যস্ত হলে বলতে হবে যে, হয়তো রাসূল ﷺ উত্তমতা বা মোস্তাহাবে উপর আমল করার জন্য এরূপ করেছেন। অথবা এমনিতেই তিনি কিবলামুখী ছিলেন।

وَعَنْ ۱۲۶۸ جَابِرٍ (رض) قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمِنَى حَاجِبَهُ فَبَجِئْتُ وَهُوَ بَصُلِّي عَلَى رَأْسِهِ تَحَوُّ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوعِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২৬৮. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কোনো কাজে পাঠালেন। আমি কাজ সেয়ে এসে দেখি তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপরে পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়ছেন এবং সিজ্দাকে রুকু অপেক্ষা বেশি নিচু করছেন। -[আবু দাউদ]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : أَنْفَصُلُ الثَّلَاثِ

عَنْ ۱۲۶۹ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَمِينِي رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خَلْفَتِهِ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَخَدَهُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনার [ফরজ] নামাজ দু' রাকাত পড়তেন। তাঁরপর হযরত আবু বকর, তাঁর পর হযরত ওমর এবং তাঁর পর হযরত উসমান (রা.)-ও তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দু' দু' রাকাতই পড়তেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) চার রাকাত পড়তেন। [পরবর্তী রাবী বলেন,] হযরত ইবনে ওমর (রা.) যখন ইমামের সাথে [অর্থাৎ, ওসমানের সাথে] নামাজ পড়তেন, তখন চার রাকাতই পড়তেন এবং যখন তিনি একা একা পড়তেন তখন দু' রাকাতই পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَحَكْمُ النَّصْرِ فِي الْمَلْزُومِ (رض) -এর ব্যাপারে আপত্তি ও কসরের হুকুম : মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত উসমান (রা.) পরে চার রাকাত পড়তে থাকলে তখন লোকেরা আপত্তি তুলতেন। উত্তরে তিনি বলতেন, আমি মক্কায় এসে বিবাহ করেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো শহরে [জনপদে] শাদী করে, সে যেন মুকিমের ন্যায় নামাজ পড়ে। তাই আমি নামাজ পূর্ণ চার রাকাত পড়ছি। এ ঘটনা হতে এটাও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মুসাফিরের জন্য 'কসর' করা ওয়াজিব (যা হানাফীদের মাযহাব)। কেননা যদি তা সন্নত বা নফল হতো [যা শাফেয়ীদের মাযহাব] তা হলে হযরত উসমানের কালে লোকেরা আপত্তি তুলত না এবং ঠাণ্ডে-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হতো না।

এ ছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল থেকে এ মাসআলা প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসাফির যদি মুকিমের পেছনে একতেনা করে তবে সে ইমামের খাতিরে মুকিমের ন্যায় নামাজ পূর্ণ আদায় করবে।

وَعَنْ ۱۲۷ عَائِشَةَ (رَضَا) قَالَتْ قُرِئَتْ
 الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ فَفَرَضْتُ أَرْبَعًا وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ
 عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ
 لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تَحْتَمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ
 كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে দু'রাকাত নামাজই ফরজ করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [মদীনায়] হিজরত করলেন তখন নামাজও চার রাকাত ফরজ করা হলো। শুধু সফরের নামাজকেই প্রথম ফরজের অবস্থায় রেখে দেওয়া হলো। [তাবেয়ী] ইবনে শিহাব মুহরী (র.) বলেন, আমি [আমার উস্তাদ] ওরওয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত আয়েশা (রা.)-এর কি ব্যাপার যে, তিনি সফরে পূর্ণ নামাজ পড়তেন? ওরওয়া (রা.) বললেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি তাবীল করতেন যেমন হযরত উসমান (রা.) তাবীল করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(রَضَا)-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) সফর অবস্থায় পূর্ণ নামাজ পড়তেন। এ ব্যাপারটি তাবেয়ী ইবনে শিহাব মুহরী তাঁর উস্তাদ ওরওয়া (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এ ব্যাপারে সেই ব্যাখ্যাই করেছেন, যা হযরত উসমান (রা.) করেছিলেন। হাদীসবিশারদগণ বলেন, উভয়ের অভিমতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-

১. প্রথমত উভয়ের মতে সফর অবস্থায় কসর করা এবং পুরা নামাজ পড়া দু'টাই জায়েজ। অতএব উভয় জায়েয়ের মধ্যে তাঁরা একটি জায়েজ গ্রহণ করে নিয়েছেন যা হলো পূর্ণ নামাজ পড়া। বিশেষজ্ঞগণ একেই সঠিক মনে করেছেন।
২. দ্বিতীয়ত আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের সহজতার কারণে সফরে কসর নামাজ পড়তেন। পক্ষান্তরে তাঁরা উভয়ে এ পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিজদের উপর কাঠিন্য অর্থাৎ সফরে চার রাকাত পড়ার পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছেন।
৩. তৃতীয়ত হযরত উসমান (রা.) বলতেন, কসর মুসাফিরের জন্য। আর মুসাফির সে ব্যক্তি যিনি স্বীয় আবাসভূমি হতে কোথাও ভ্রমণে বের হন। পক্ষান্তরে আমিতো মুসাফির নই। কেননা গোটা ইসলামি রাষ্ট্র আমার দেশ। কাজেই নিজ দেশে কেউ মুসাফির হয় না। সুতরাং আমি কসর না পড়ে পুরো নামাজই পড়ি। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, আমি হলাম "উম্মুল মু'মিনীন"। সকলে আমার পুত্র সমতুল্য। অতএব মা পুত্রের আবাসস্থলে গেলে সে মুসাফির নয়, সুতরাং আমিও মুসাফির নই। আর এ কারণেই সম্ভবত তিনি সফর অবস্থায়ও পুরো নামাজ পড়তেন। বক্তৃত এটা হলো
 تَأَوَّلَتْ عَائِشَةُ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ -এর ব্যাখ্যা।
৪. অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কসরের ব্যাপারে একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দান করতেন। তিনি মনে করতেন, কারো সফরে কষ্ট না হলে তার জন্য নামাজ কসর করতে হয় না। বায়হাকী ও দারাকুতনীরা একটি সহীহ হাদীস থেকে এটা বুঝা যায়। এক সফরে হযরত আয়েশা (রা.)-কে চার রাকাত ফরজ পড়তে দেখে ওরওয়া প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এতে আমার কষ্ট হয় না।

وَعَنْ ١٢٧١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ
ﷺ فِي الْحَضْرَةِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ
رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী করীম ﷺ-এর কথার মাধ্যমে মুকিম অবস্থায় চার রাকাত, সফর অবস্থায় দু' রাকাত এবং ভীতি অবস্থায় মাত্র এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَرْفُ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে অতীতের কোনো কোনো ইমাম বলেছেন ভয় তথা خَوْفُ-এর সময় মাত্র এক রাকাত পড়তে হবে। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেন, কোনো অবস্থায়ই নামাজ এক রাকাত শরিয়ত সম্মত নয়। সুতরাং এখানে এক রাকাত অর্থ- প্রত্যেক মুক্তাদির ইমামের পিছনে এক এক রাকাত করে আদায় করা। বিস্তারিত বিবরণ সামনে صَلَاةُ الْخَوْفِ-এর অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

وَعَنْ ١٢٧٢ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ
سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرَ
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ وَالْوَرْتِ
فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২৭২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় দু' রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম চালু করেছেন। এ দু' রাকাতই [ছওয়াবের দিক দিয়ে] পূর্ণ নামাজ, অপূর্ণ নয়। এটা ছাড়াও সফরে বিতর নামাজ পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীস থেকেও সফরে কসর পড়া ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয়। আর এটিই হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত।

وَعَنْ ١٢٧٣ مَالِكٍ (رض) بَلَّغَهُ أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ (رض) كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي
مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي
مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكْتُوَعَسْفَانَ وَفِي مِثْلِ
مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجِدَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ
بُرُزٌ - (رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ)

১২৭৩. অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নিকট এ হাদীস পৌছেছে, হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) মক্কা শরীফ ও তায়েফের মতো দূরত্বের পথে নামাজ কসর করতেন, এরূপভাবে মক্কা ও উসফানের মতো দূরত্বের পথে এবং মক্কা ও জেদ্দার মতো দূরত্বের পথেও নামাজ কসর করতেন। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এটা চার ডাক পরিমাণ। -[মুয়াত্তা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَرْفُ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মক্কা হতে তায়েফের দূরত্ব তিন 'মারহালা', মক্কা হতে উসফানের দূরত্ব দুই মারহালা এবং মক্কা হতে জেদ্দার দূরত্বও দুই মারহালা। উল্লেখ্য মুসাফিরের একদিনের ভ্রমণের পথকে এক 'মারহালা' বলা হয়। بُرُزٌ শব্দটি -এর বহুবচন, অর্থ- ডাক। পোষ্ট অফিস বা ডাকঘরকে مَكْتَبُ الْبُرُزِ বলা হয়। ইমাম মালেক বলেন, মক্কা হতে জেদ্দার দূরত্ব চার বারীদ বা চার ডাক। এক বারীদ সমান দুই ফারসাখ অথবা ১২ মাইল। এ হিসেবে চার বারীদ সমান ১২ × ৪ = ৪৮ মাইল।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۲۷۶ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَهُمْ أَوْلُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْلَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمَهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ أَلَيْهَرْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ عِدِّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ نَحْنُ الْأَخْرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْنَهُمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى آخِرِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ نَحْنُ الْأَخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ .

১২৭৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী থাকব। পার্থক্য হলো এই যে, তাদেরকে আমাদের পূর্বে [আল্লাহর] কিতাব দান করা হয়েছে, আর আমাদেরকে তা দান করা হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর তাদের উপরে এ দিনটি অর্থাৎ জুমার দিনটি [ইবাদতের জন্য] ফরজ করা হয়েছিল অর্থাৎ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা ইহুদি-নাসারাগণ [এ দিনটির ব্যাপারে মতভেদ করল। আর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন, ফলে এ ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা আমাদের পিছনে থাকল। ইহুদিগণ পরের দিন [শনিবার]-কে এবং নাসারাগণ তার পরের দিন অর্থাৎ [রবিবার]-কে গ্রহণ করল। -[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হুজুর ﷺ বলেছেন- আমরা পরবর্তী আগমনকারীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী হবো। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মধ্যে আমরাই হবো প্রথম। অতঃপর বর্ণনাকারী [আবু হুরায়রা] 'তবে পার্থক্য এই যে, বাক্য হতে শেষ পর্যন্ত পূর্বনিরূপ বর্ণনা করেছেন'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা ও হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের শেখাংশে বলেছেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমরাই সর্বশেষ আগমনকারী এবং কিয়ামতের দিনে আমরাই প্রথম। যাদের জন্য [হিসাব-কিতাব ও জান্নাতে প্রবেশের] আদেশ সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱۲۷۶ -এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের بَيْنَهُمْ শব্দটির ওজন ও অর্থ غَيْرَ -এর মতোই, নাহবীদ বনীল ও কিসায়ী এই মতামতই পেশ করেন। এমতাবস্থায় হাদীসের ইবারত হবে-

نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ أَوْلُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

আল্লামা তুরেপেশভী (র.) বলেন, بَيْنَهُمْ -এর অর্থ হলো عَلَى أَنَّهُمْ

ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণিত আছে بَيْنَهُمْ অর্থ হলো مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) একে যথার্থ মনে করেছেন।

وَالسَّابِغُ هُوَ السَّابِقُ فِي النَّفْطِ لِأَنَّ كَانَهُ مَتَّاعًا فِي الرَّجْوِ -এর মর্মার্থ : এর মর্মার্থ হলো, দুনিয়াতে আমাদের আগমন সর্বশেষে ঘটলেও এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়ে থাকলেও আমরা মর্যাদার শ্রেষ্ঠিতে অগ্রগণ্য। কেননা কুরআন হলো দীনে মুহাম্মাদীর সংবিধান, যা আন্যান্য ধর্মের নাসেখ বা রহিতকারী।

আর নাসেখ বা রহিতকারীই হলো মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রগামী, যদিও তার অন্তিম পরে ঘটুক না কেন। মূলত এ অগ্রগামীতার হিসাবে উম্মতে মুহাম্মাদী আখেরাতেও অগ্রগামী হবে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, বিভিন্ন মর্যাদায় পরিপূর্ণতার কারণে উম্মতে মুহাম্মাদী অগ্রগামী। সর্বশেষ আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হওয়া পরিপূর্ণতার পরিপন্থী নয়; বরং এটা পরিপূর্ণতার পরিচায়ক।

وَنَاتَخَلَّفُوا فِيهِ فَهَدَاتَ اللَّهُ لَهُ -এর ব্যাখ্যা : পূর্ব যুগের উম্মতের ওপর জুমআ ফরজ ছিল; কিন্তু তারা তা সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি করে। ফরজ তো পালন করা অপরিহার্য, কিন্তু কি করে তারা মতবিরোধ করেছিল এ প্রশ্ন স্বভাবতই জ্ঞাত হয়। তাই হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন-

অতীত উম্মতের উপর বর্তমান পদ্ধতির ন্যায় জুমার নামাজ ফরজ ছিল না; বরং হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য তাদের উপর জুমার দিনকে ফরজ করে তাদের ইস্হার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করে। মূলত জুমার দিন কোনটি তা তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। যেমন- উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইহুদিরা শনিবার দিনকে নির্ধারণ করেছিল। কেননা তাদের যুক্তি হলো, এই দিন আল্লাহ রাক্বুল আলামীন আসমান-জমিনের সৃষ্টি সমাপ্ত করে অবসর নিয়েছিলেন। সুতরাং সব কাজকর্ম পরিহার করে মানুষের জন্য এই দিনই ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যাপৃত থাকা শ্রেয়। পক্ষান্তরে নাসারারা রবিবার দিনকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছিল। তাদের যুক্তি হলো, কেননা এ দিনই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করে। এটাই হলো তাদের পার্থক্যের ধরন।

অথবা উম্মতে মুহাম্মাদী হাদীসে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করে। এটাই হলো তাদের পার্থক্যের ধরন।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ -এর মর্মার্থ হলো : জুমার দিন সম্পর্কে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মাদীকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। জুমার দিন সম্পর্কে যুক্তি হলো, এই দিন আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনজাতিতে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এই মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই উম্মতে মুহাম্মাদী জুমার দিনটিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হিদায়েত প্রদানের অর্থ হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য তা সুস্পষ্ট করে দেওয়া।

অথবা এর মর্মার্থ হলো, উম্মতে মুহাম্মাদী ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করেছে।

وَعَبَّرَ ١٢٧٧
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ أَدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرَجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৭৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিনই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনই তাঁকে তা [জান্নাত] হতে বের করা হয়েছে এবং জুমার দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْجُمُعَةِ জুমার দিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ : জুমার দিনের অনেক ফজিলত রয়েছে। যার কিছু নিম্নরূপ- (১) এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) এ দিনে আদম (আ.)-কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। (৩) এ দিনে হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত হতে বের করা হয়েছে। (৪) এ দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে। (৫) এ দিনে জমিনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নেমেছে। (৬) এ দিনে দোয়া কবুলের একটি সময় আছে, যা অন্যদিনে নেই। (৭) এ দিনে ইউসুফ (আ.) কারাগার হতে মুক্তি পেয়েছেন। (৮) এ দিনে হযরত আইউব (আ.) রোগ হতে মুক্তি পেয়েছেন। (৯) এ দিন হচ্ছে গরিবের হাজার দিন। যেমন- হাদীসে এসেছে- **الْجُمُعَةُ حَجَّ الْمَسْكِينِ** (১০) এই দিনে মুহাম্মদ ﷺ-কে নিম্মাপ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট তাবৈই বুঝা যায় যে, জুমার দিন হলো সর্বোত্তম। অথচ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **فَأَلْأَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ** **قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ أَوْفَضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ**— অপর এক হাদীসে এসেছে— এ হাদীসদ্বয় যথাক্রমে কুরবানির এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিনকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় : এর সমাধানকল্পে হাদীসবিশারদগণ বলেন—

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে জুমার দিনকে সত্তাহের মধ্যে উত্তম বলা হয়েছে। আর অন্য দুটি হাদীসে পুরা বৎসরের তিহিত্তে কুরবানির ও আরাফার দিনকে উত্তম বলা হয়েছে।

অথবা হাদীসে বর্ণিত তিনটি দিনের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্যেকটিকে উত্তম বলা হয়েছে। এ সমাধানের পর উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে কোনো রকম দ্বন্দ্ব থাকে না।

عَنْ ١٢٧٨ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ بَصَلَى يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

১২৭৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি মুসলমান বান্দা ঐ সময়টি লাভ করে এবং ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে নিশ্চয় তা দান করেন।—[বুখারী ও মুসলিম]

কিন্তু মুসলিম এ কথাটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এটা একটি স্বল্প মুহূর্ত”। বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জুমার দিনে একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান নামাজ অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দীন ও দুনিয়ার কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً -এর ব্যাখ্যা : জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে সাহাবী, তাবয়ীন ও ইমামদের মধ্যে বহু মতপার্থক্য আছে। কারো মতে ঐ মুহূর্তটি আল্লাহ তা'আলা তুলে নিয়েছেন। আর যারা বলেন, সে মুহূর্তটি আল্লাহ তা'আলা উঠিয়ে নেননি, বরং কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে তাদের বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতামত রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. বৎসরের কোনো এক জুম'আর দিনে ঐ মুহূর্তটি রয়েছে। ২. ইমাম যখন খোতবা দেন, ৩. সূরা ফাতিহার পর 'আমিন' বলার সময়, ৪. আসন হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, ৫. মুয়াজ্জিনের আযানের সময়, ৬. সূর্য ঢলে পড়ার সময়, ৭. ইমাম মিছারে উঠার সময়, ৮. উভয় খোতবার মধ্যবর্তী বসার সময়, ৯. জুম'আর দিন ফজরের আযানের সময়, ১০. বিভিন্ন জুম'আর বিভিন্ন সময়। এভাবে ৪৩টি অভিমত রয়েছে। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত মত এই যে, দোয়া কবুলের সে মুহূর্তটি পূর্ণ দিনের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন 'লাইলাতুল কদর' রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে গোপন রাখা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, যাতে বান্দা এর অনুসন্ধানে সর্বদা ইবাদতে ও দোয়া ইস্তিগফারে মগন থাকে। বান্দার এই অবস্থাকে আদ্বাহ বেশি পছন্দ করেন।

عَنْ ١٢٧٩ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى (رض) قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৭৯. অনুবাদ : হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি জুম'আর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে বলেছেন, এটা ইমামের মিছারে বসার সময় হতে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত সময়টাই। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আবু হানীফার হাদীসের ব্যাখ্যা : সত্ত্বত হুজুর ﷺ-এর এ সময়টি নির্দিষ্ট করে বলা, কোনো এক জুম'আর দিন সম্পর্কে ছিল। অন্যথা হুজুর ﷺ হতে ঐ মুহূর্ত সম্পর্কে বহু রকমের রেওয়ামত বর্ণিত আছে, যা আমরা পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করেছি।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٨٠ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقَيْتُ كَعْبَ الْأَخْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّوَرَةِ وَحَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِيهَا حَدِيثُهُ أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبَطَ وَفِيهِ تَبَّأَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقْرَمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصَيَّحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حَيْثُ تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ

১২৮০. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি [সিরিয়ার] সিনাই পর্বতের দিকে সফরে বের হলাম এবং [তাওরাত বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী] কা'ব আহ'বাবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। তিনি আমাকে তাওরাত গ্রন্থ হতে কিছু বললেন, আমিও তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু হাদীস শুনালাম। আমি যা বর্ণনা করেছি তন্মধ্যে এটাও ছিল যে, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে উত্তম দিন হলো জুম'আর দিন, এতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে [জান্নাত হতে] বের করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এ দিনেই তিনি ইত্তেকাল করেছেন, এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এমন কোনো প্রাণী নেই যে জুম'আবাবের উষার উদয় হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের বিতীষিকার আশঙ্কায় চিৎকার করতে না থাকে, মানুষ ও জিন স্বাতীত।

سَاعَةً لَا يَصَادُقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ
 يُصَلِّيَ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
 قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ فَقُلْتُ بَلْ
 فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ
 صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَيَبِيتُ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ
 كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَمَا حَدَّثْتَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ
 لَهُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي
 كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ
 كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ
 آيَةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ
 أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضِنَّنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ
 الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ
 تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصَادُقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ
 وَهُوَ يُصَلِّيَ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 سَلَامٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ
 مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهَوَّ فِي صَلَاةٍ
 حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلَى
 قَالَ فَهَوَّ ذَلِكَ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ
 وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ إِلَى
 قَوْلِهِ صَدَقَ كَعْبٌ)

জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান বান্দা নামাজ পড়া অবস্থায় একে [মুহূর্তটিকে] পায় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট [দীন ও দুনিয়ার] কোনো বস্তু প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করেন। কা'ব আহবার এটা শুনে বললেন, এ জুমা বৎসরে একবার আসে মাত্র। আমি বললাম, না; বরং প্রত্যেক জুমাবারেই আসে। তখন কা'ব তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, [এর পর] আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং কা'ব আহবারের সাথে আমার বৈঠকের ঘটনা এবং জুমাবার সম্পর্কে তার সাথে যা আলোচনা করেছি তা তাঁর নিকট ব্যক্ত করলাম এবং বললাম, কা'ব বলেছিলেন, ঐ মুহূর্তটি প্রত্যেক বৎসরে এক জুমায় মাত্র আসে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, কা'ব মিথ্যা বলেছে। তখন আমি তাঁকে বললাম, অতঃপর কা'ব তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, না! তা প্রত্যেক জুমাবারেই আসে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, কা'ব সত্য কথা বলেছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, সে মুহূর্তটি কি তা আমি জানতে পেরেছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, তখন আমি বললাম, দয়া করে আমাকে তা জানিয়ে দিন! আমার প্রতি কার্পণ্য করবেন না। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তা জুমার দিনের শেষ সময়টি। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, জুমার দিনের শেষ ক্ষণটি কিতাবে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো মুসলমান বান্দা একে নামাজে রত অবস্থায় পায়" [অথচ আসরের পর কোনো নামাজ পড়া মাকরুহ]। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ কথা বলেননি যে, "যে ব্যক্তি নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজেই থাকে, যতক্ষণ না সে ঐ নামাজ সম্পন্ন করে?" হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- আমি বললাম, জি-হ্যা, বলেছেন। তিনি [আব্দুল্লাহ] বললেন, এটাও তাই অর্থাৎ নামাজের অপেক্ষায় থাকাকেই নামাজ অর্থে বুঝানো হয়েছে। -[মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]। ইমাম আর আহমদ "কা'ব সত্য বলেছেন" বাক্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثِ شَرَحَ হাদীসের ব্যাখ্যা : আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার উভয়ই তাওরাত বিশেষজ্ঞ ইহুদি আলেম ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম স্বয়ং মহানবী (সা.) -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর কা'ব আহবারও খ্যাতিনামা ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হযরত ওমর ফারুকের জমানায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফত কালে ইত্তেকাল করেন।

আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমাবারের দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে মহানবী ﷺ যা বর্ণনা করেছেন তার সমর্থন পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতে উল্লেখ আছে। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) -এর হাদীসে উক্ত মুহূর্তটি 'ইমামের মিথারে বসা হতে নামাজ শেষ করার মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বলা হয়েছে' এবং হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত। এতদসম্বন্ধেও মুহাদ্দেসীনে কেলাম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর বর্ণিত এ হাদীসটিকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন এবং অনেকের মতে এ মুহূর্তটি আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।

وَعَنْ ١٢٨١ أَنَسِ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تَرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبَتِ النَّبِيِّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১২৮১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমাবারের সেই সময়টি, যাতে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় তা আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তালাশ কর।
- [তিরমিথী]

وَعَنْ ١٢٨٢ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلِقَ آدَمَ وَفِيهِ قَبِضُ وَفِيهِ النَّفْحَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَكَثُرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَوْتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَعْرِضُ صَلَوَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلَيْتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

১২৮২. অনুবাদ : হযরত আওস ইবনে আওস (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুমার দিনটিই হলো শ্রেষ্ঠ। এতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং এতেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য শিকায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এ দিনেই পুনর্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিকায় ফুঁক দেওয়া হবে। এ দিন তোমরা আমার প্রতি বেশি করে দরুদ পাঠ করে। তোমাদের দরুদ নিশ্চয় আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের দরুদ আপনাদের নিকট কেমন করে উপস্থিত করা হবে অথচ আপনি তখন মাটি হয়ে যাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন, নবীদের শরীর আত্মা তা'আলা জমিনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। - [আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী এবং বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ -এর ব্যাখ্যা : দরুদ শোনা, তাঁর নিকট তা পেশ হওয়া ইত্যাদি মৃত্যুর কারণে অন্তরায় হয়। নবীদেরও সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তাঁদের কিছু শোনা বা তাঁদের নিকট কোনো কিছু উপস্থিত হওয়া একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর কথার প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ এ সংশয়ে পড়েছিলেন এটা কিভাবে সম্ভব? অতএব এটা নিরসনের জন্য তাঁরা এ প্রশ্ন করেছিলেন এবং এর জবাবেই তিনি উপরোক্ত কথাটি বলেছেন যে, নবীরা সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে মাটিতে কবরস্থ হলেও তাঁদের ব্যাপারটি অন্য রকম। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে মাটির উপর নির্দেশ। মৃত্যুর পরে দেহ-শরীর বিনষ্ট হওয়া চিরা-চরিত ও প্রকৃতগত ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম নবী-রাসূলদের শরীর বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা কোনো অবস্থাতেই বিনষ্ট হবে না। তাই হজুরের প্রতি দরুদ পেশ হওয়া এবং তাঁর তা শোনা ইত্যাদি কিছুই অসম্ভব নয়। এটাই আহলে সন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাস। অন্যান্য বহু হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে।

وَعَنْ ۱۲۸۳
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ الْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمَ الْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِينُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا آعَاذَهُ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يَغْرُبُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى مِنْ عَبِيدَةِ وَهُوَ يَضَعُّهُ) .

১২৮৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- [কুরআন মাজীদে উল্লিখিত] 'আল-ইয়াউমুল মাওউদ' বা প্রতিশ্রুত দিবস হলো কিয়ামতের দিন, 'মাশহুদ' বা মাশহুদ দিবস হলো আরাফাতের দিন এবং 'শাহেদ' দিবস হলো জুমার দিন। এমন কোনো দিনে সূর্য উদয়াস্ত হয় না, যে দিন জুমার দিন হতে উত্তম। জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মু'মিন বান্দা একে পায় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা মঞ্জুর করেন। আর যদি কোনো অকল্যাণ হতে রেহাই প্রার্থনা করে আল্লাহ রেহাই দান করেন। -[আহমদ ও তিরমিযী]

কিন্তু তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কেননা এটা মুসা ইবনে উবায়দা ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে বর্ণিত নয়। আর ইবনে উবায়দা দুর্বল রাবী বলে অভিযোগ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : 'মাওউদ' অর্থ- প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুত দিবস বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝায়। কারণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কুরআনে প্রদান করেছেন। 'মাশহুদ' অর্থ- যাকে হাজির করা হয়েছে। আরাফাতের দিনে দুনিয়ার বিভিন্ন দিক হতেই মুসলমানদেরকে হাজির করা হয়। আর 'শাহেদ' অর্থ- যে হাজির হয়। জুমার দিন নিজেই প্রতি সাতদিনে একবার মানুষের নিকট উপস্থিত হয়।

التَّائِبُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٨٤
 أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
 (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ
 عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ
 فِيهِ خَمْسُ خِلَالَ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَدَمَ وَاهْبِطَ
 اللَّهُ فِيهِ أَدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَقَّى اللَّهُ
 أَدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا
 شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَالَهُ يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيهِ
 تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلِكٍ مُقْرَبٍ وَلَا سَمَاءٍ
 وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِجَالٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ
 مُشْفَقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَعَاذٍ أَنَّ
 رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ
 أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنْ
 الْخَيْرِ قَالَ فِيهِ خَمْسُ خِلَالَ وَسَأَلَ إِلَى الْخَيْرِ
 الْحَدِيثِ .

عَنْ ١٢٨٥
 أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قِيلَ
 لِلنَّبِيِّ ﷺ لَآئِي شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 قَالَ لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ إِبْنِكَ أَدَمَ
 وَفِيهَا الصَّعَقَةُ وَالْبَعَثُ وَفِيهَا الْبَطْشَةُ
 وَفِي الْخَيْرِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ
 دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتَجِيبَ لَهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১২৮৪. অনুবাদ : হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনিয়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিন সপ্তাহের সকল দিনের সর্দার এবং তা আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্যায় দিন হতে সম্মানিত। এ দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈদুল আযহা ও ইদুল ফিতরের দিন হতেও সম্মানিত। এ দিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে- (১) এতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জমিনে প্রেরণ করেছেন। (৩) এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ওফাত দান করেছেন। (৪) এ দিনেই এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, যাতে আল্লাহর কোনো বান্দা কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করেন এবং (৫) এ দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। প্রত্যেক সম্মানিত ফেরেশতা, আকাশসমূহ, জমিন, বাতাস, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সব কিছুই জুমার দিন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। [কি জানি কোন জুমায় কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়?] -[ইবনে মাজাহ]

ইমাম আহমদ হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা আনসারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হযূর ! আমাদেরকে জুমার দিন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাত করুন, এতে কি কি কল্যাণ রয়েছে? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, এতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রয়েছে এবং হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

১২৮৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি জন্য জুমার দিনকে জুমার দিন বলে নামকরণ করা হলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, কেননা এ দিনে তোমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-এর [সৃষ্টির উদ্দেশ্যে] কাদামাটি একসাথে করা হয়েছিল [অর্থাৎ একে ষোলো হয়েছিল]। এ দিনেই বিশ্বের প্রলয় ঘটবে, সকল সৃষ্টিজীবের পুনরুত্থান ঘটবে। এ দিনে কাফিরদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, যাতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা মঞ্জুর করেন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ شرح হাদীসের ব্যাখ্যা : জুমার দিনকে জুমা হিসাবে নামকরণের কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচ্য হাদীসে তিনি এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন- (১) এ দিনে আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাদামাটি একত্র করে খামির বানানো হয়। (২) হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম শিলায় ফুৎকারের মাধ্যমে এ দিনেই বিশেষ গুরুত্ব ঘটে। (৩) এ দিনেই দ্বিতীয়বার ফুৎকারের ঘরা মুত্তাশ্রাও সকল সৃষ্টিজীবের পুনরুত্থান ঘটে। (৪) কেয়ামতের ময়দানে এ দিনেই কাফিরদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে। (৫) وَفِي آخِرِ نَفْسِكَ سَاعَاتٍ مِنْهَا وَفِي آخِرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفْسٌ سَاعَاتٍ -টি অপ্রকাশ্য রাখা হয়েছে দোয়ার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য। আর ঐ উপযুক্ত সময়গুলো হলো (এক) ইমাম যখন খোতবা দিতে বসেন; (দুই) দিবসের শেষ সময়টি এবং (তিন) আসরের পরে।

وَعَنْ ١٢٨٦
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ بِشَهَدَةِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يَصِلْ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَوَتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنْ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَحْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২৮৬. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিনে তোমরা আমার উপরে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কেননা এটা উপস্থিতির দিন। এ দিনে ফেরেশতাকুল [আল্লাহর বিশেষ রহমত নিয়ে] উপস্থিত হয়ে থাকেন। তোমাদের যে কেউই আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে নিশ্চয় তার দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দরুদ হতে অবসর না হয়। রাবী বলেন, আমি বললাম, মুত্তার পরেও [কি দরুদ আপনার সমীপে পেশ করা হবে]? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, [মুত্তার পরেও। কেননা] আল্লাহ তা'আলা নবীদের দেহ ভক্ষণ করা মাটির প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী সর্বদাই জীবিত, তাঁকে রিজিক দেওয়া হয়ে থাকে।

وَعَنْ ١٢٨٧
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَقَاهُ اللَّهُ فَنَشَنَةَ الْقَبْرِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ)

১২৮৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান জুমার দিনে কিংবা জুমার রাতে মুত্তাবরণ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখেন। -[আহমদ ও তিরমিযী। তবে তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনা সুদূর ধারাবাহিকভাবে গ্রথিত [মুত্তাসিল] নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং শীরাযী ও বর্ণনা করেছেন। এখানে ফিতনা অর্থ মুনকার নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ অথবা কবরের আজাবকে বুঝানো হয়েছে। আবু নুআইম তার হিলায়া নামক গ্রন্থে হযরত জাবের (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে কবরের আজাবের কথা সুশ্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

وَعَنْ ١٢٨٨
 ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ
 قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ دِينَكُمْ (الآيَةَ)
 وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
 عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِبَادًا فَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي
 يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
 وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

১২৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
 (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা **النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ دِينَكُمْ** আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন তাঁর নিকটে এক
 ইহুদি ছিল। সে বলে উঠল যদি এই আয়াত আমাদের
 উপর নাজিল হতো তবে আমরা নাজিলের দিনকে ঈদের
 দিন বানিয়ে নিতাম। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)
 বললেন, এটা নাজিলই হয়েছে এমন একদিনে, যেদিন
 একসঙ্গে দু' ঈদ ছিল। [অর্থাৎ একদিকে ছিল] জুমার দিন
 এবং [অপরদিকে ছিল] আরাফার দিন। -[তিরমিযী। কিন্তু
 তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

وَعَنْ ١٢٨٩
 أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبَ قَالَ اللَّهُمَّ
 بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا
 رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
 لَيْلَةٌ أَعْرُ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ - (رَوَاهُ
 الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

১২৮৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, যখন রজব মাস আসত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ
 বলতেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদেরকে রজব ও শাবান
 মাসে বরকত দান কর এবং আমাদেরকে রমজান মাস
 পর্যন্ত পৌছাও [অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখ]। রাবী বলেন, হজুর
 আরও বলতেন, জুমার রাতটি সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত এবং
 জুমার দিনটি সবচেয়ে জ্যোতির্ময় দিন। -[বায়হাকী।
 দাওয়াতুল কাবীর গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

بَابُ وَجُوبِهَا

পরিচ্ছেদ : জুমার নামাজ ফরজ হওয়া

জুমার নামাজ ফরজ কি না? এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

- * কিছু সংখ্যকের মতে এটা জানাযার নামাজের ন্যায় ফরজে কেফায়া। আদ্বা মা তীবী (র.) কোনো কোনো আলিমের অভিমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন, তবে এ মত বিতর্ক নয়।
- * জমহূর ওলামায়ে কেেরাম এ কথা'র উপর একমত পোষণ করেছেন যে, জুমার নামাজ ফরজে আইন। এমনকি এটাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, সমস্ত উম্মত এর ফরযিয়াতের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। এর অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ الْخ.

এ আয়াতে ذِكْرٌ ঘারা জুমার নামাজ ও তার খোতবাকে বুঝানো হয়েছে, এতে সকলেই একমত।

(٢) عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) وَأَيُّسَ سَعِيدٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ الْحَدِيثُ رَبِّنَا إِنْ أَلَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

(ب) وَعَنْ حَفْصَةَ (رَضِيَ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مَحْتَلِمٍ. (رَوَّاهُ النَّسَائِيُّ)

- * ইজমা ঘারাও জুমার ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকলেই এর ফরযিয়াতের উপর একমত পোষণ করেছেন।
- * কিয়াস ঘারাও এর ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়। জোহরের পরিবর্তে জুমার নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জোহর হলো ফরজ, আর এক ফরজ ব্যতীত অন্য ফরজ তাগ করা বৈধ হতে পারে না। কাজেই জুমার নামাজ ফরজই হবে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٩
ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ) وَأَيُّسَ
حُرَيْرَةَ (رَضِيَ) أَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَىٰ أَعْوَادٍ مِنْبِرِهِ
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ
لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ
مِنَ الْغَافِلِينَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৯০. অনুবাদ : হযরত ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষারের কাঠের উপরে [দাঁড়িয়ে] বলছেন, মানুষ জুমার নামাজকে পরিত্যাগ করা হতে ফিরবে, নতুবা আদ্বা হা'আলা তাদের অন্তরে মোহরাক্কিত করে দেবেন, অতঃপর তারা নিশ্চয় গাফিল বা অমনোযোগীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٢٩ - এর ব্যাখ্যা : জুমার নামাজ পরিত্যাগকারীর অন্তরকে আদ্বা হা মোহরাক্কিত করে দেবেন এই কথার ব্যাখ্যা : আদ্বা হা মোহরাক্কিত করে দেবেন। (১) কারো মতে এর দ্বারা আদ্বা হা রহমত উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমা পরিত্যাগ করবে সে আদ্বা হা অনুকম্পা হতে দূরে সরে যাবে। (২) আরেক দলের মতে আদ্বা হা তাদের অন্তরে কুফর সৃষ্টি করে দেবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَصْلُ الثَّانِي

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الصَّمِيرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جَمِيعٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّرِمِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ وَاحْمَدٌ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ)

১২৯১. অনুবাদ : হযরত আবুল জা'দ জুমাইরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলা বশত পর পর তিন জুম্মা ত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর অঙ্কিত করে দেন। -[আবু দাউদ, তিরমিধী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

ইমাম মালেক এটা হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম হতে এবং ইমাম আহমদ [তাবেয়ী] হযরত আবু কাতাদা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الصَّمِيرِيِّ - এর ব্যাখ্যা : আত্তামা তুরেপেশতী (র.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত طَبَعَ অর্থ- বা পর্দা আরবণ। অর্থাৎ জুম্মার নামাজ অনাদায়ী ব্যক্তির অন্তর এমন একটি আবরণে আচ্ছাদিত করা হয় যার ফলশ্রুতিতে সে সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

অথবা বলা যেতে পারে, طَبَعَ অর্থ- دَسَّنَ বা অপবিত্রতা। অর্থাৎ জুম্মার নামাজ পরিত্যাগকারী এটা পরিত্যাগ করার কারণে তার অন্তর অপবিত্র করে দেওয়াই আলোচ্য হাদীসংশের উদ্দেশ্য।

عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيُنِصِفْ دِينَارٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১২৯২. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুম্মার নামাজ ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি সে এতটুকু না পারে তবে সে যেন অর্ধ দীনার দান করে। -[আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ (رض) হাদীসের কাফফারা হওয়ার মধ্যে মতভেদ : কোনো কোনো বর্ণনার আছে, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুম্মার নামাজ ত্যাগ করে, কেয়ামতের দিন ছাড়া তার কোনো কাফফরা হবে না। অথচ উপরে বর্ণিত সামুরার হাদীসে সদকা করার নির্দেশ রয়েছে। এর সমাধানে মোস্তা আলী কারী (র.) ইবনে হাজার আসকালানী (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তার কোনো কাফফারাই হবে না। এ কথাটির সঠিক অর্থ হলো, তার উপর জুম্মা তরক করার পাপ থেকেই যাবে, যার ফয়সালা কেয়ামতের দিনই হবে। আর যে হাদীসে সদকার নির্দেশ রয়েছে তার অর্থ এই যে; ওনাই কিছুটা লঘু হতে পারে। সমস্ত ওনাই হতে অব্যাহতি পাবে এমন কিছু নয়। মোটকথা, সদকা দ্বারা শান্তি কিছুটা লঘু হবে বলে আশা করা যায়।

وَعَنْ ۱۲۹۳ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى
مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১২৯৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন
যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- জুমার নামাজ তার উপর
ফরজ যে জুমার আযান শুনে। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া কার জন্য ওয়াজিব : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আযান শুনে একমাত্র তার
ওপরই জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে মতনৈকা রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও মালেক (র.)-এর মতে যারা আযান শুনে তাদের জন্যই জুমায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।
তাঁরা উপরে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন।

হানাফীদের অভিমত যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.), আনাস (রা.), ইবনে ওমর (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত এবং
নাফে, হাসান বসরী, ইকরামা, হাকাম, ইমাম নাখরী, আতা, আওযায়ীরও অভিমত; তাঁদের মতে সেই ব্যক্তির উপর জুমার
নামাজে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পর রাত হওয়ার পূর্বে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে, আযান
শ্রবণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। দলিল হলো নিম্নের হাদীস-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَّاهَ اللَّيْلَ إِلَى أَهْلِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তাঁদের জবাব : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখ ইমামগণ হাদীস হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ
করেছেন এর উত্তর হলো, এ হাদীস সম্পর্কে আবু দাউদ (র.) বলেন, হাদীসটি সুফইয়ান সাওরী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
(রা.) হতে মাওকুফ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। আর মাওকুফ হাদীস সর্বক্ষেত্রে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
অথবা যারা শহরে মসজিদের কাছাকাছি থাকেন অনেক সময় দেখা যায়, তারাও আযান শুনে পান না। আর আযান না শোনার
কারণে তাদের উপর কি জুমার নামাজ ফরজ নয়? সুতরাং আযান শ্রবণের সাথে জামাতে উপস্থিত হওয়াকে সম্পূর্ণ করা কোনো
ক্রমেই সমীচীন হতে পারে না।

وَعَنْ ۱۲۹৪ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَّاهَ
اللَّيْلَ إِلَى أَهْلِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا
حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

১২৯৪. অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ
বলেছেন, জুমার নামাজ সে ব্যক্তির উপর ফরজ, যে ব্যক্তি
রাত্তে নিজ পরিবারে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ মুকিম।
-[তিরমিযী]। তবে তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসের
বর্ণনাসূত্র দুর্বল।

وَعَنْ ۱۲৯৫ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رض)
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةُ حَقٌّ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا
عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبِيدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ أَمْرَأَةٍ أَوْ
صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبَنَى
شُرْحُ السُّنَنِ يَلْفِظُ الْمَصَابِيحَ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ بَنِي وَائِلٍ) .

১২৯৫. অনুবাদ : হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার
নামাজ যথার্থভাবেই প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতের
সাথে ফরজ। কিন্তু চার ব্যক্তি ব্যতীত- ক্রীতদাস,
স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও রুগণব্যক্তি। -[আবু দাউদ।
কিন্তু শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে মাসাবীহের অনুরূপ বাক্য বর্ণনা
করা হয়েছে। তবে রাবী তারেক ইবনে শিহাবের স্থলে
'বনী ওয়াইলের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত' কথাটি রয়েছে।]

وَعَنْ ١٢٩٨ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِلَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ
 الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ
 صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ فَمَنْ اسْتَفْنَى بِلَهْوٍ
 أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَفْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ - (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ)

১২৯৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি
 আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান আনয়ন করেছে
 তার উপর জুমার নামাজ ফরজ। তবে রুগ্ন ব্যক্তি,
 মুসাফির, মহিলা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, পাগল কিংবা
 ক্রীতদাস ব্যতীত। এদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়।
 যে ব্যক্তি জুমার নামাজ হতে বিমুখ থাকে এবং খেলাধুলা
 ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার
 থেকে বিমুখ থাকেন। আল্লাহ স্বয়ং সমৃদ্ধ ও অধিক
 প্রশংসিত। -[দারাকুত্নী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هُوَ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসংশে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা পার্শ্বিক
 কোনো কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রেখে জুমার নামাজ হতে বিমুখ থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তার থেকে বিমুখ থাকেন,
 অর্থাৎ সে ব্যক্তির কোনো ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। আলোচ্য হাদীসটি সূরায় জুমার নিম্নোক্ত
 আয়াতের দিকে ইস্তিবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا - قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ - وَاللَّهُ
 خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

অর্থাৎ আর যখন তারা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিভিন্ন কর্মে মগ্ন হওয়ার মতো (বস্তু) দেখতে পায়, তখন তার প্রতি ধাবিত
 হওয়ার জন্য ছাড়িয়ে পড়ে, আর আপনাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে যায়। আপনি বলে দিন, যে বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে,
 [অর্থাৎ, ছুওয়াব ও নৈকট্য লাভ] তা এরূপ মগ্নতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। কেননা মহান আল্লাহ সর্বাপেক্ষা
 উত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيرِ

পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে গমন

اَلتَّنْظِيفُ শব্দটি বাবে تَغْيِيلُ-এর মাসদার, نَظْفُ মূলধাতু হতে নিগত, শাস্তিক অর্থ হলো- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজির পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীর ময়লা ও অপবিত্রতা হতে পরিষ্কার করা, এমনিভাবে শরীরে তেল, আতর লাগানো, বিশেষভাবে জুমার দিনে এটা ব্যবহার সুন্নত।

اَلتَّبْكِيْرُ শব্দটি বাবে تَغْيِيلُ-এর মাসদার, অর্থ হলো اَوَّلُ وَقْتِهَا নিত্য صَلَاةٍ فِي اَوَّلِ وَقْتِهَا প্রথম ওয়াক্তে নামাজের জন্য গমন করা। এ কথাটির দিকে পবিত্র কুরআনেও فَاسَّرْنَا দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۲۹۹ سَلْمَانَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَذُنُّ مِنْ دُهْنِهِ وَيَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يَصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ اَلْاِمَامُ اِلَّا غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ (اَلْاٰخِرَى - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২৯৯. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিচ্ছন্নতা লাভ করে। অতঃপর নিজের সক্ষিত তেল হতে নিজের শরীরে কিছু তেল মাখে, তারপর ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর মসজিদের দিকে রওয়ানা করে এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করে না, তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফল-সুন্নত নামাজ পড়ে। অতঃপর ইমাম যখন খোতাবা দিতে থাকেন তখন সে চুপ করে শুনে। নিশ্চয়ই তার এই জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত [সগীরা] গুনাহ মাফ করা হয়। - [বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَسْأَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ প্রাসঙ্গিক মাসআলা : আলোচ্য হাদীস হতে যে সমস্ত শরয়ী মাসআলা অনুসৃত হয় তা হলো- (১) জুমার দিন গোসল করা, (২) পাক-পবিত্রে হওয়া, (৩) জামা-কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করা, (৪) গোফ কাটা, (৫) শুষ্কত্বের অব্যঞ্জিত পশম দূর করা, (৬) বগলের নিচের পশম দূর করা, (৭) নখ কাটা ইত্যাদি সুন্নতে যায়েদা। আর (১) গায়ে তেল মাখা, (২) সুগন্ধি জিনিস ব্যবহার করা, (৩) সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, (৪) সািরির মধ্যে যেখানেই স্থান খালি পাওয়া যায় সেখানে বসা মোস্তাহাব। 'দু' ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে মধ্যখানে বসা মাকরুহ। খোতাবা ও ফরাজ নামাজের পূর্বে নফল-সুন্নত পড়া সুন্নত। খোতাবার সময় চুপ করে বসে থাকা এবং মনোযোগ সহকারে খোতাবা শোনা ওয়াজিব।

اَلْمَسْأَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ 'দু' ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক না করা : যথা- পিতা ও পুত্রের মধ্যে অথবা 'দু' বন্ধুর মাঝে ফাঁক করে বসা। এমনও হতে পারে এতে তাদের মধ্যে অন্তত মানসিক দুঃখও ঘটতে পারে। আদ্যুমা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা সকাল সকাল মসজিদে যাওয়াই বুঝানো হয়েছে। যেন পরে এসে মানুষের ঘাড়ের উপর পা দিয়ে সামনে যেতে না হয়। এ পর্যায়ে আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লিখিত শব্দ 'তানবীফ ও তাব্কীর' উভয়টির সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمِثْلَ الْمُهْجِرِ كَمِثْلِ الَّذِي يَهْدِي بُدْنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةَ ثُمَّ كَبِشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَرُوا صُحُفَهُمْ وَسَتَمِعُونَ الذِّكْرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩০২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন জুমার দিন হয়, ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ান (এবং) যার পূর্বে যে আসে তা লিপিবদ্ধ করেন। [অর্থাৎ মসজিদে আগমনকারীদের হাজিরা গ্রহণ করেন যারা প্রথমে আসেন তাদের নাম প্রথমে লিপিবদ্ধ করেন [আর যারা পরে আসেন তাদের নাম পরে লিপিবদ্ধ করেন]। যে ব্যক্তি জুমার নামাজে আগেভাগে আসে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে [মক্কা শরীফে] কুরবানির জন্য বুদনা [কুরবানির চিহ্ন দেওয়া উট] প্রেরণ করে। অতঃপর [দ্বিতীয় নম্বরে] যে আসে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তি, যে [মক্কা শরীফে] কুরবানির জন্য গাভী প্রেরণ করে। অতঃপর যে আসে সে যেন একটি দুগ্ধ, তার পরবর্তী জন একটি মুরগি এবং তারপরে আগমনকারী একটি ডিম প্রেরণ করল। স্বশন ইমাম খোতবার জন্য বের হন, ফেরেশতাগণ তাদের কাগজসমূহ ভাঁজ করে নেন এবং খোতবা শ্রবণ করতে থাকেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে জুমার দিনে মসজিদে গমনকারীদের পর্যায়ক্রমিক মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আগে মসজিদে যাবে সে বেশি ছুওয়াব পাবে তারপর প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে ছুওয়াবের অধিকারী হবে। কোন সময় হতে আগমনকারীদের পূর্বাপরের হিসাব ধরা হবে সে ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) এবং তাঁর অনুসারীদের মতে এ উত্তম সময়ের সূচনা দ্বি-প্রহরের পর হতে শুরু হয়। অর্থাৎ দ্বি-প্রহরের পরপর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে সবচেয়ে বেশি ছুওয়াবের অধিকারী হবে। তাঁরা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করে বলেন, হাদীসে **الْمُهْجِرِ** শব্দের উল্লেখ রয়েছে। 'মুহাজ্জির' ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর মসজিদে গমন করেন। কেননা দ্বি-প্রহরের পরবর্তী সময়কে 'তাহজীর' বলা হয়। কাজী হোসাইন এবং ইমামুল হারামাইন এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে জমহুর ওলামার মতে দিবসের প্রথমাংশে ফজর উদয়ের সময় হতে এ উত্তম সময়ের সূচনা হয়। অর্থাৎ জুমার দিনে এই সময় সর্বপ্রথম যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ছুওয়াবের অধিকারী হবে।

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩০৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিনে যখন ইমাম খোতবা দান করতে থাকেন তখন যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে বল 'চুপ কর' তবে তুমি অযথা কথা বললে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার খোতবা শ্রবণের গুরুত্ব : ইমাম আবু হানীফার মতে খুতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব এবং কথা বলা হারাম, যদিও তা উত্তম কথা হোক না কেন? এমনকি সংক্ষেপে 'চুপ কর' এটুকু কথা বলাও গুনাহ। আদ্যুত তাহারানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, ইমাম মিথ্যারে বসার পর যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে সে যেন কোনো নামাজ না পড়ে এবং কোনো কথা না বলে যতক্ষণ না ইমাম খুতবা দান সমাপ্ত করেন। মুয়াত্তা ইমাম মালেকও একরূপ রেওয়াজেতে রয়েছে। ইমামের খুতবা দান কালে 'কাজা নামাজ' ব্যতীত সন্নত নফল পড়াও জায়েজ নেই। অবশ্য খোতবা আরম্ভ করার পূর্বে সন্নত-নফলের নিয়ত করে থাকলে তখন রাকাতের জোড় পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।

وَعَنْ ۱۳.۴ جَابِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ آخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَخَالِفُ إِلَى مَفْعِدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : الْفَضْلُ الثَّانِي

عَنْ ۱۳.۵ أَبِي سَعِيدٍ (رض) وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَوَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ إِلَى قَبْلِهَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

وَعَنْ ۱۳.۶ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَى مِنَ الْإِمَامِ وَأَسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةِ أَجْرٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩০৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- জুমার দিনে তোমাদের কেউ যেন তাঁর কোনো মুসলমান ভাইকে নিজ স্থান হতে উঠিয়ে না দেয়, অতঃপর তার স্থলে গিয়ে নিজে বসে; বরং সে যেন [অদ্রভাবে] বলে, একটু সরে বসুন। -[মুসলিম]

১৩০৫. অনুবাদ : হযরত আবু সাদ্দ খুদরী (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করে, ভালো পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধি লাগায়, যদি তার নিকট সুগন্ধি দ্রব্য থাকে, অতঃপর মসজিদে জুমার নামাজে আসে। আর [সম্মুখে যাওয়ার জন্য] মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে না টপকায়, অতঃপর তাকে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দেন নফল নামাজ পড়ে, অতঃপর ইমাম খোতবার জন্য বের হলে চূপচাপ বসে থাকে [এবং খোতবা শুনে] যতক্ষণ না ইমাম [খোতবা দান শেষে] নামাজ সম্পন্ন করেন, তবে এটা তার এই জুমা পূর্ববর্তী জুমার মধ্যবর্তী পাপসমূহের জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে। -[আবু দাউদ]

১৩০৬. অনুবাদ : হযরত আওস ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি জুমার দিনে [নিজ স্ত্রীকে সঙ্গমাত্তে] গোসল করা এবং নিজেও গোসল করে তারপর তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয় এবং আগেভাগে মসজিদে যায় এবং কোনো কিছুতে আরোহণ না করে পদব্রজে গমন করে এবং ইমামের কাছাকাছি বসে, ইমামের খোতবা [মনোযোগের সাথে] শ্রবণ করে এবং কোনো অযথা কাজ করে না, সে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসর দিনের রোজা ও রাতের [নফল] নামাজের ছওয়াব পাবে। -[তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে গাস্‌সালা (غَسَلَ) শব্দটি এসেছে। এটা তাশদীদ ও তাবফীফ উভয় অবস্থাতে ইমামগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। সংক্ষেপে তা নিয়ে বর্ণিত হলো-

ইমাম ভূরেপেশতী (র.) বলেন যে, অধিকাংশ হাদীসবিদই তাশ্দীদসহ 'গাসসালা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাশ্দীদ অবস্থায় কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেন—

(১) উত্তমরূপে গোসল করার তাকিদের জন্য শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (২) কারো মতে এর অর্থ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। প্রকৃত বাক্যটি হবে **غَسَلَ امْرَأَتَهُ** 'নিজ স্ত্রীকে গোসল করা' অর্থাৎ সহবাসের মাধ্যমে গোসল করতে বাধ্য করল। কারণ জুমার দিনে বহু নর-নারীর সাথে মিলিত হতে হয়, এমতাবস্থায় নিজের দৃষ্টি সংযত করার উদ্দেশ্যে এবং মনকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে পূর্বেই নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা প্রয়োজন। (৩) অথবা এর অর্থ প্রথমে সহবাসের কারণে গোসল করা, অতঃপর জুমার নামাজের জন্য দ্বিতীয়বার গোসল করা।

আরেক দল তাফসীফ করে 'গাসসালা' ব্যবহার করেছেন। ইমাম নববী (র.) বলেন, এটাই হাদীসবিশারদদের মতে বেশি পদ্ধতি। তাফসীফের অবস্থায়ও এর একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে— (১) শব্দটিকে দু'বার ব্যবহার করে গোসলের প্রতি তাকিদ বুঝানো হয়েছে। (২) অথবা অর্থ হবে "মাথা ধুইবে এবং জুমার জন্য গোসল করবে"। কেননা আবু দাউদের অন্য বর্ণনায় এ অর্থের সমর্থন রয়েছে। তাতে মাথা ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। সবকিছুর পূর্বে মাথা ধোয়ার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আরবগণ সাধারণত মাথায় তেল ও খেতমী ইত্যাদি লাগাত। অনেক কিছুতে উৎকট পদ্ধতি থাকত, অথবা মাথায় ব্যবহারের কোনো কোনো প্রব্য শরিয়ত নিষিদ্ধ নানাবিধ দ্রব্য কিংবা হারাম প্রাণীর চর্বি হতেও প্রভুত হতো। এ জন্য প্রথমে মাথা ধোয়া প্রয়োজন ছিল। (৩) কারো মতে প্রথমে অঙ্গ ধোয়া অতঃপর গোসল করা। (৪) আল্লামা ইরাকী বলেন, প্রথমত কাপড়-চোপড় ধোয়া অতঃপর নিজের শরীর ধোওয়া। (৫) অথবা নামাজে বের হওয়ার পূর্বে নিজ স্ত্রীর সাথে দৈহিক মেলা-মেশা করে তাকে গোসল করাবে। এতে অনভিপ্রেত দৃষ্টি হতে নিজেই সংযত করা যায়।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ (رَضِيَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ
إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ
رَسُولِيْ مَهْنَتِهِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ
رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ)

১৩০৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো উপরে কোনো দোষ বর্তাবে না, যদি সে নিজের কাজের কাপড় ব্যতীত সামর্থ্য থাকলে আরও দুটি পৃথক কাপড় জুমার নামাজের জন্য বানিয়ে নেয়। -[ইবনে মাজাহ]। কিন্তু ইমাম মালেক এটা [তাবেয়ী] ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَسَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ হাদীসের ব্যাখ্যা : সামর্থ্য থাকলে ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করাকে ইসরাফ বা অপচয় মনে করা ঠিক হবে না। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়েই রাসূলে করীম ﷺ ইঙ্গিত করেছেন।

وَعَنْ سَمْرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ (رَضِيَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْضُرُوا الذِّكْرَ
وَادْتَسُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ
يَتَّبَاعِدُ حَتَّى يُزَحَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ
دَخَلَهَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩০৮. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- প্রথম হতেই খোতবায় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছাকাছি গিয়ে বসবে। কেননা, মানুষ বরাবরই উত্তম বাধ্য হতে দূরে সরতে থাকে, ফলে তাকে জান্নাত দানেও বিলম্ব করা হয়। যদিও সে পরে জান্নাতে প্রবেশ করে বটে। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَسَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ বলেন, **فَانْتَبِهُوا الْمَخِيَرَاتِ** অর্থাৎ উত্তম কাজ প্রতিযোগিতামূলক আশে-ভাগে করতে থাক। এ হাদীসও এর সমর্থন করে, অর্থাৎ নেকী অর্জনে বিলম্ব করা উচিত নয়। বিশেষ করে স্তম্ভআর দিন। কেননা যতই আশে-ভাগে যাবে, ততই অধিক ছুওয়ার অর্জন করবে। এ হাদীস হতে এটোও বুঝা যায় যে, খোতবা পূর্ণভাবে না শুনেও তার স্তম্ভ পড়া আদায় হয়ে যায় এবং এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে বটে, তবে অনেক পরে।

وَعَنْ ۱۳۰۹ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ (رض) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১৩০৯. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা হযরত আনাস (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- জুমার দিনে যে ব্যক্তি মানুষের কাঁধে পা রেখে সামনে যায় [হাশরের দিন] তাকে জাহান্নামে যাওয়ার পুল বানানো হবে। -[তিরমিযী]। তবে তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱৩১০ هَادِيَسِ الرَّبَّاعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত 'اتَّخَذَ' শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায় এবং তখন অর্থও ভিন্ন হবে। প্রথমত কে মারুফ বা কর্তৃবাচ্য হিসাবে। এ অবস্থায় হাদীসাত্মকের অর্থ হবে, জুমার দিনে কোনো ব্যক্তির মানুষের কাঁধে টপকিয়ে সামনে যাওয়া- এ গর্হিত কাজটিই তাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে। কেননা এ কাজে রয়েছে মানুষকে কষ্ট প্রদান এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা। অর্থাৎ এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এ গর্হিত কাজটিকে পুলস্বরূপ গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত 'اتَّخَذَ' মাজহুল বা কর্মবাচ্য হিসাবে পড়া যেতে পারে। তখন এর অর্থ হবে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুল বানানো হবে, যে পুল পার হয়ে জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যেমনিভাবে সে ব্যক্তি জুমার দিন মুসল্লিদের কাঁধে টপকিয়ে সম্মুখের কাতারে গমন করত।

وَعَنْ ۱৩১০ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

১৩১০. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- জুমার দিন ইমাম যখন খোতবা দিতে থাকেন, তখন 'হাব'ওয়া' বৈঠকে বসতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন। -[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱৩১১ هَادِيَسِ الرَّبَّاعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : দুই হাটু উপরের দিকে খাড়া করে পেট ও বুকুর সাথে মিলিয়ে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে দু'হাত দ্বারা নলা জড়িয়ে বসাকে 'হাবওয়া' বসা বলে। জুমার দিন মসজিদে একুশ বসাকে নিষেধ করা হলেও অন্য সময়ের জন্য নিষেধ নয়। কেননা হুজর ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মুখে এভাবে বসেছেন বলে অন্য হাদীসে প্রমাণ আছে। অতএব এখানে নিষেধ অর্থ মারুফে তান্বীহী অর্থাৎ, উত্তমতার খেলাফ, হারাম নয়। বস্তুত এটা মসজিদের শিষ্টাচারিতার বিপরীত।

وَعَنْ ۱৩১১ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৩১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো জুমার দিন মসজিদে তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন নিজ বসার স্থান পরিবর্তন করে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱৩১২ هَادِيَسِ الرَّبَّاعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

হাদীসের ব্যাখ্যা : বস্তুত তন্দ্রা দ্বারা অজ্ঞ নষ্ট হয় না, কিন্তু তন্দ্রা দূর করার জন্য স্থান পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যিক। আর অন্য স্থানে খালি জায়গা না পেলে যে কোনো উপায়ে তন্দ্রা দূর করার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যিক।

التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۳۱۲ نَافِعٍ (رَحِمَهُ اللهُ) قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَفْعِدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ قَبِيلَ لِنَافِعٍ فِي الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩১২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে বসা হতে উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে নিজে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু জুমার দিনের জন্যই? জবাবে তিনি বললেন, জুমা বা বে-জুমা সব দিনের জন্যই। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱৩১৩ هَادِيسِ الْبِشْرِ : নামাজের সারিতে বসা অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে নিজে বসা অত্যন্ত বিবেক বর্জিত কাজ; এটা শরিয়ত সমর্থন করে না। এমনকি অন্য কোনো বৈঠক হতেও উঠিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

عَنْ ۱۳۱۳ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلُغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهُ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- জুমার নামাজে সাধারণত তিন প্রকারের লোক উপস্থিত হয়ে থাকে। এক প্রকারের লোক অনর্থক কাজ সহকারে উপস্থিত হয় [অর্থৎ খোতবার সময় সে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে ও অযথা কাজ করে।] জুমা হতে সে তাই লাভ করে [অর্থৎ তার জুমায় উপস্থিতি বৃথা যায়]। আর এক প্রকারের লোক আছে, যে দোয়া সহকারে উপস্থিত হয়। সে আল্লাহর নিকট কোনো অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করে, আল্লাহ চাইলে তাকে তা দান করেন, আর না চাইলে বঞ্চিত রাখেন। আর এক প্রকারের লোক আছে, যে উপস্থিত হয় সন্তুর্ণণে নীরবতার সাথে [শুধু জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে] এবং সম্মুখে যাওয়ার জন্য কোনো মুসলমানের ঘাড় টপকায় না, আর কাউকেও কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। তার এ কাজ তার এ জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সময়ের সকল [সগীরা] গুনাহের কাফফারা হয় এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের জন্য। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করে, তার জন্য তার দশগুণ বিনিময় রয়েছে'। -[আবু দাউদ]

عَنْ ۱۳۱۴ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصَتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১৩১৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে মসজিদে কথাবার্তা বলে, অথচ ইমাম খোতবা দান করছেন। সে ব্যক্তি গাধার মতো, যে শুধু বোঝা বহন করে [অথচ তা হতে উপকৃত হয় না] এবং যে লোক তাকে বলে 'হুপ করুন', তার জন্যও জুমা নেই [অর্থৎ তারও জুমা হয়নি, অথবা জুমার উদ্দেশ্যে সফল হয়নি। কারণ সে নিজেও হুপ থাকল না]। -[আইহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَمَرَّ كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَبْعِلُ أَسْفَارًا -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি জুমার দিনে মনোযোগ সহকারে ইমামের খোতবা শ্রবণ হতে বিরত থাকে, আলোচ্য হাদীসে তাকে সেই গাধার সাথে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, যে গাধা শুধুমাত্র নিজ পৃষ্ঠদেশে কিতাবের বোঝাই বহন করে চলছে। গাধা যেমন তার পিঠে বহনকৃত বোঝা সম্পর্কে বোঝাভূম, অঙ্গপভাবে সে ব্যক্তির জুমার নামাজ অন্তঃস্মারশূন্য যে, ইমামের খোতবার সময় অহেতুক কথাবার্তা বলে তা শ্রবণ হতে নিজেকে বিরত রেখেছে। গাধার ন্যায় এ নামাজ তার বোঝাধরূপই হবে। এটা 'আমলহীন ইলমের' সাথেও তুলনীয়।

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جُمُعَةٍ مِنْ
الْجُمُعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا
يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاتَّغَسِلُوا وَمَنْ
كَانَ عِنْدَهُ طَيْبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ
وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَتَّصِلًا) .

১৩১৫. অনবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওবায়দ ইবনে সাব্বাক (র.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক জুমার দিনে বলেছেন— হে মুসলিম সম্প্রদায়! এটা এমন একটি দিন, একে আল্লাহ তা'আলা [মুসলমানদের জন্য] খুশির দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা এ দিনে গোসল কর, যার সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না [অর্থাৎ সুগন্ধি ব্যবহার কর] এবং মেসুওয়াক করাকে আবশ্যিক মনে কর।—[মালেক আর ইবনে মাজাহ। উবায়দ ইবনে সাব্বাকের মাধ্যমে হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَبِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। কেননা, মানুষ বছরে যে ঈদ দু' দিনে একত্র হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করে এবং পরস্পরের মধ্যে কুশলাদি ও ভাব বিনিময় করে তেমনি সপ্তাহে একবার জুমার দিনেও মানুষ একত্র হয়ে জুমার নামাজ আদায় করে এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে, এ জন্য একে ঈদ বা আনন্দের দিন বলা হয়েছে।

وَعَنْ الْبَرَاءِ (رَضًا) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِيَمَسَّ
أَحَدُهُمْ مِنْ طَيْبٍ أَهْلِهِ فَيَنْ لَمْ يَجِدْ
فَأَنْسَاءَ لَهُ طَيْبٍ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)

১৩১৬. অনবাদ : হযরত বারাহ ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— মুসলমানদের উপর কর্তব্য যে তারা জুমার দিন গোসল করবে এবং নিজ পরিবারে যদি সুগন্ধি থাকে তবে প্রত্যেকে সুগন্ধি লাগাবে, আর যদি তা [সুগন্ধি] না পায়, তবে [গোসলের] পানিই তার জন্য সুগন্ধি।—[আহমদ ও তিরমিধী।] আর তিরমিধী বলেন, হাদীসটি হাসান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَبِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : জুমার দিন গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত, সুগন্ধি ব্যবহার করতে যারা সক্ষম শুধু তাদের জন্যই তা সুন্নত; কিন্তু যারা তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়; তাদের জন্য গোসলই সুন্নত।

بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : খোতবা ও নামাজ

خُطْبَةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো خُطَبَاتٌ শব্দিক অর্থ হলো- বক্তৃতা বা ভাষণ। শরিয়তের পরিভাষায় খোতবা হলো এমন বক্তৃতা যাতে আল্লাহর প্রশংসা, গুণ-কীর্তন, তাওহীদের ঘোষণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ এবং উপস্থিত মুসল্লিদের প্রতি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নসিহত ও মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের প্রার্থনা বিদ্যমান থাকে।

জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খোতবা পূর্বশর্ত। খোতবা ব্যতীত জুমার নামাজ আদায় হবে না। জুমার জন্য পরপর দু'টি খোতবা দিতে হবে, উভয় খোতবার মাঝখানে কিছু সময় বসে সুনুত। ইমাম সাহেব মিশ্বারে বা উঁচু কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে শ্রোতাবৃন্দের দিকে মুখ করে খোতবা প্রদান করবেন। অবশ্য লাঠি বা কিছুর উপর ভর করে দাঁড়ানোও প্রমাণিত।

খোতবা আরবি ভাষায় প্রদান করা সুনুত। নিজ মাতৃভাষায় খোতবা প্রদান করা শুদ্ধ নয়। খোলাফায় রাশেদীনের আমলে মিশরের কিবতীভাষী এবং ইরানের ফারসীভাষীদের মধ্যে আরবিতেই খোতবা প্রদান করা হতো। সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছে। সূতরাং খুতবা আরবিতে হওয়াই উচিত। কেননা, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। বিশ্ব-রাষ্ট্রে গঠন করা, বিশ্ব-স্রাতুত্ব গড়ে তোলা এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে এক কেন্দ্রিক রাখা ইসলামের কাম্য। এজন্য ভাষার ন্যায্য একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় বন্ধন আবশ্যিক। এ ছাড়া ইসলাম পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধী। ইসলাম চায় মুসলমানরা ইসলামকে তার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরিভাবে গ্রহণ করুক। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আরবি জানা একান্ত আবশ্যিক। আর কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সোনালী যুগে আরবে যে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠেছিল তা সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত হওয়া ইসলামের উদ্দেশ্য। আর এটা একমাত্র আরবির মাধ্যমেই সম্ভব। মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানই আরবি জানুক, তা ইসলামের কাম্য। এতেই তাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত। সত্য তথা এই যে, আরবি খোতবা, মুসলমানদের আরবি নাম এবং মুসলমানদের আরবি অভিধান তথা সালাম-একটি বিষয় সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করেছে।

তবুও খতীবের উচিত তিনি যেন মুসল্লিদের বোধগম্যের জন্য খোতবা দানের পূর্বে বা পরে এমনকি খোতবার মধ্যে হলেও খোতবার উপদেশমূলক অংশটি উপস্থিত মুসল্লিদের মাতৃভাষায় বুম্বিয়ে দেওয়া।

أَفْضَلُ الْأَوَّلِ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩১৭. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ জুমার নামাজ পড়তেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত।

—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جُمَارُ الْإِخْلَافِ جুমার নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে মতভেদ : জুমার নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءَ : ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আতা (র.)-এর মতে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বেই জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন—

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْدَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) فَكَانَ خُطْبَتُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ . وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ تَعْرُوهُ . (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ)

مَذْعَبِ اَبْنِ حَبِيْبَةَ وَمَالِكِ الرَّسْحَانِ وَالْاَزْرَاعِي وَغَيْرِهِمْ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইসহাক, আওয়ায়ী, আবু সওর ও ইবনুল মুনিযির (র.) প্রসূরের অভিমত হলো জুমার নামাজের জন্য শুধুমাত্র একটি খোতবা প্রদান করা ওয়াজিব। এটাই অধিক সংখ্যক আলোচনের অভিমত। এর অনুকূলে ইমাম আহমদেরও একটি অভিমত রয়েছে। তাঁদের মুক্তি হলো, খোতবার উদ্দেশ্য হলো উপদেশাবলি প্রদান করা, যা একটিমাত্র খোতবা দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে, দ্বিতীয় খোতবাবাটি উপসংহার মাত্র। এর অপরিহার্যতা প্রথম খোতবার অনুরূপ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মুক্তির জবাবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর শুধু نِعْلُ বা কর্ম দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। কাজেই উক্ত দলিল দ্বারা দু'টি খোতবাকে ওয়াজিব প্রমাণিত করা যথার্থ নয়।

দুই খোতবার মধ্যে উপবেশন সম্পর্কে মতভেদ: আইনী, ফতহুল মুহিম ও বজলুল মাজহদ গ্রন্থে রয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম ইয়াহুইয়া (র.)-এর মতে দু' খোতবার মধ্যে কিছুরূপ বসা ওয়াজিব। রাসূল ﷺ সব সময় দু' খোতবার মাঝখানে বসতেন, এটাই তাঁদের দলিল। এ ছাড়াও তিনি রাসূল ﷺ -এর উক্তি رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي صَلًّا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي صَلًّا দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), এমনকি জমহুর আলিমদের মতে দু' খোতবার মাঝে বসা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। তাঁদের মুক্তি হলো এ বসাবস্থায় কিছু আলোচনা করা শরিয়তে নির্ধারিত নেই। অতএব তা ওয়াজিব হতে পারে না। এ ছাড়া তাঁরা তাবেয়ী আবু ইসহাকের একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন-

رَأَيْتُ عَلِيًّا (رض) يَخْطُبُ عَلَى النَّبِيِّ فَلَمْ يَخْلِسْ حَتَّى فَرَغَ

তাঁদের জবাব: ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর মতে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে না। তা ছাড়া তিনি رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي صَلًّا হাদীস নিয়েছেন; এর উত্তরে বলা যায়, খোতবার বিষয়টি আলোচ্য হাদীসের দৃকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

مَدَائِدِ فِي الْإِخْلَافِ فِي النَّبِيِّ لِلْخُطْبَةِ দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদঃ দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

مَذْعَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন-

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا.
(٢) عَنْ عَدَائِي قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا وَأَبْوَيْكُو (رض) وَعَسْرُ (رض) وَعُفْمَانُ (رض) وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى النَّبِيِّ مَعَاوِيَةُ (رض) وَقَبِي رَوَاةُ الشَّافِعِيِّ جَلَسَ مَعَاوِيَةُ (رض) نَسًا كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ وَتَلَعَهُ.
(٣) رَوَى الْأَيْمِيُّ مُسْلِمًا أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْعَكْمِ يَخْطُبُ قَائِمًا فَقَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا الْأَخْبِيثَ يَخْطُبُ قَائِمًا -

مَذْعَبِ الْإِمَامِ اَبْنِ حَبِيْبَةَ: ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করা সুন্নত। তাঁর দলিল হলো-

رَوَى عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا جِيْرًا وَآسَنَ وَكَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ .

কিন্তু যেহেতু দাঁড়িয়ে শুতবা প্রদান করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই এটা সুন্নত।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে বলা যায় যে, শুধুমাত্র نِعْلُ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য দলিল দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না, বরং সুন্নত সাব্যস্ত হয়।

وَعَنْ ١٣٢٢ عَمَّارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ طَوْلَ صَلْوَةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فَهْمِهِ فَاطْبِقُوا الصَّلْوَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ سَعْرًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২২. অনুবাদ: হযরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- কোনো ব্যক্তির নামাজ দীর্ঘ করে পড়া এবং তার খোতবা সংক্ষেপ করা তার শরিয়ত সম্পর্কে সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা নামাজকে দীর্ঘ করো এবং খোতবা সংক্ষিপ্ত করো। নিশ্চয় কোনো কোনো বক্তৃতা জাদু স্বরূপ। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَنَادَا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ .

হাদীসের ব্যাখ্যা : নামাজকে দীর্ঘ করার অর্থ খোতবা হতে কিছুটা দীর্ঘ, প্রকৃত দীর্ঘ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই মধ্যমভাবে নামাজ পড়তেন। বক্তৃতা জাদুরূপ মানে বক্তৃতা জাদুর মতো কাজ করে। সুতরাং খোতবা সংক্ষেপ এবং জ্ঞানগর্ভ ও তথাপূর্ণ কথায় দেবে।

عَنْ ۱۳۲۳ جَابِرِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَتْهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وَيَقُولُ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اضْغَعِيبِ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى . (رواه مسلم)

১৩২৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা দান করতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ চরমে পৌঁছত। যেন তিনি নিজ সৈন্যদেরকে শত্রুর আক্রমণ হতে একরূপ সতর্ককারী, যে বলে, এই ভোরেই তোমাদের উপর [শত্রুদল] আক্রমণ করবে, এই সন্ধ্যায়ই তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তিনি আর তিনি বলতেন, আমি কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছি, যেমন এ দু'টি অঙ্গুলি রয়েছে। এ সময় তিনি নিজ তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্র করে দেখাতেন।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ۱۳২৪ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَنَادَا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ . (متفق عليه)

এর ব্যাখ্যা : তার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে যেত ইত্যাদি, অর্থাৎ, তিনি অতিশুদ্ধ সহকারে লোকদের সম্বোধন করতেন এবং খোতবা দান করতেন। আজকাল যেমন কোনো কোনো ইমাম সুর করে খোতবা পাঠ করেন তার খোতবা সেরূপ হতো না।

عَنْ ۱৩২৫ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَنَادَا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ . (متفق عليه)

১৩২৪. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে মিশ্বারে উঠে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরী মালিককে ডেকে বলবে, হে মালিক! তুমি তোমার প্রভুকে বল, যেন তিনি আমাদের মৃত্যু প্রদান করেন [নবী করীম ﷺ এভাবে জাহান্নামের ভয়াবহতা বর্ণনা করতেন]।—[বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ ۱৩২৬ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَنَادَا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ . (متفق عليه)

১৩২৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে হিশাম বিন্তে হারেসা ইবনে নো'মান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরায় 'কাফ' ওয়াল কুরআনিল মাজীদ কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি এ সূরাটি প্রত্যেক জুমায় মিশ্বারে উঠে জনতার উদ্দেশ্যে খোতবা দান কালে পাঠ করতেন।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيسٍ رَوَاهُ الرَّاحِبِيُّ : এখানে সূরা ক্বাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে সূরার প্রথমংশ। কেননা রাসূল ﷺ একই জুমার খোতবায় পুরা সূরা পাঠ করতেন না, অথবা বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন অংশ পাঠ করতেন, অথবা উম্মে হিশাম যে কয় জুমায় উপস্থিত ছিলেন সে কয় জুমায় রাসূল ﷺ সূরা ক্বাফ দ্বারা খোতবা প্রদান করেছেন, এটাই তিনি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ۱۳۲۶۰ عَنُورِ بْنِ حُرَيْثٍ (رَضًا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২৬. অনুবাদ : হযরত আমার ইবনে হুরাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমার দিন খোতবা দান করতেন তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি থাকত। তার [পাগড়ির] দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের মধ্যখানে ঝুলে থাকত। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيسٍ رَوَاهُ الرَّاحِبِيُّ : আলোচ্য হাদীসের আলোকে আত্তামা তীহী (র.) বলেন, জুমার দিনে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, মাথায় পাগড়ি বাঁধা এবং পাগড়ির দুই প্রান্ত দুই কাঁধে মধ্যখানে ঝুলিয়ে দেওয়া সুন্নত। কেননা, রাসূল ﷺ এরূপ করতেন।

وَعَنْ ۱۳২৭۰ عَنُورِ بْنِ حُرَيْثٍ (رَضًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা দানকালে বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার দিনে মসজিদে আসে আর ইমাম খোতবা দান করছেন, তখন সে যেন দু' রাকাত নামাজ পড়ে এবং তাতে যেন সূরা কেরাত সংক্ষেপ করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيسٍ رَوَاهُ الرَّاحِبِيُّ : আগন্তুক ব্যক্তির নাম : উক্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরত সুলাইক গিভফানী ; নাসাঈর বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন একজন গরিব লোক, সাধারণ ধরনের জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থায় তিনি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন এবং কিছুক্ষণ সদ্কা চাইলেন। অতঃপর হুজুর ﷺ তাকে মসজিদে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। হুজুর ﷺ মিথারে বসে তাকে দু' রাকাত নফল পড়তে আদেশ করেছেন, যেন লোকেরা তার দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে নেয় এবং পরে তার জন্য সদ্কা আদায় করতে অসুবিধা না হয়। অবশ্য হুজুর ﷺ তাই করেছেন।

عَنْ هَادِيسٍ رَوَاهُ الرَّاحِبِيُّ : খোতবার সময় কথাবার্তা বলা ও নামাজ পড়ার বিধান : ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, খোতবা শুরু হওয়ার পরে সুন্নত বা নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই, বরং হারাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জুমার দিন 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দুই রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব, তাই তা পড়তে হবে। যদিও খোতবা পড়া শুরু হয়ে যায়। তাঁরা হাদীসের শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন, ইমাম আহমদও এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসের শব্দ ছাড়াও অন্য হাদীসে সু-স্পষ্টভাবে দু' রাকাত পড়ার নির্দেশও রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী ও তাবয়ীগণ বলেন, 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দু' রাকাত নামাজ পড়া মোত্তাহাব এবং খোতবার সময় তা পড়া নিষিদ্ধ। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ-এর বাণী كَلَّمَ وَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ -এর বাণী إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য বের হলে তখন কোনো নামাজ বা কথা বলার অনুমতি নেই। ফাটাওয়া শাযীতে আছে খোতবা আরম্ভ হয়ে গেলে এ সময় কথাবার্তা বলা মাকরুহে তাহরীমী। বলার অনুমতি নেই কারো মতে ইমামের মিথারে উঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জিকির ও তাসবীহ পড়া জায়েজ আছে। সাহেবাইনের মতে দীন কথাবার্তা বলা জায়েজ আছে।

ভাঁদের দলিলের জবাব: ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের দলিলের জবাবে হানাফীশণ বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত **وَالْإِسَامُ يَخْتَلِفُ** বাক্যের অর্থ হলো **وَالْإِسَامُ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَلِبَ** বা **وَالْإِسَامُ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَلِبَ** অর্থাৎ ইমাম যখন খোতবা দানের ইচ্ছা করেন অথবা খুতবা শুনার নিকটবর্তী হন তখন দু' রাকাত নামাজ সংক্ষিপ্তাকারে পড়বে।

অথবা **يَخْتَلِبُ** শব্দটিকে **إِسْتِغْبَالَ** ধরলে এর অর্থ হবে, "ইমাম খোতবা দান করবেন" কলে এতে আর কোনো সমস্যা থাকে না। অথবা এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য হাদীসটি খোতবাহ্বায় নামাজ হারাম হওয়ার পূর্বকাল, পরে এ হাদীসটি অপর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ۱۳۲۸
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩২৮. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজের এক রাকাত পেল, সে পূর্ণ নামাজই পেল। [অর্থাৎ পূর্ণ জামাতের ছওয়াব পেল।] -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَخْبَلَاتُ الْأَيْتَةِ فَيَمَنَ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً: যে ব্যক্তি জুম্মার নামাজ এক রাকাত পেল তার সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ: যে ব্যক্তি জুম্মার নামাজ এক রাকাতের কম পেয়েছে তার হুকুম কি? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَنْدَعِبُ الْإِسَامِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاللَيْثِيُّ: ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও লাইছের মতে যে ব্যক্তি জুম্মার নামাজের এক রাকাতের কম পেয়েছে সে জোহরের চার রাকাত নামাজ আদায় করবে, সে জুম্মা পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

- (১) مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا . (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبٌ)
- (২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَا) مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرُّكْعَتَانِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ . (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبٌ)
- (৩) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ لَمْ يَمْلِكِ الرُّكْعَةَ مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيَصِلِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا . (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبٌ)

ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি কেউ ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমী বৈধে নামাজে শরিক হতে পারে, তবে ধরে নিতে হবে সে জুম্মার নামাজ পেয়েছে এবং সে বাকি নামাজ আদায় করবে। ইব্রাহীম নাখরী, হাকাম, হাফাদ এবং দাউদ হাফেয়ী এ অভিমতই বাস্তব করেছে। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন—

- (১) إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَا أَدْرَكْتُمْ فَمَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا)
- (২) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رَضَا) أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الشُّهُدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
- (৩) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رَضَا) أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ السَّلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ .
- (৪) عَنِ الشَّعْبَانِيِّ (رَضَا) إِذَا أَدْرَكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى رُكْعَتَيْنِ .

فَيَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا: ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমামগণ প্রথমত **فَيَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا** দ্বারা যে দলিল উপস্থাপন করেছেন এর উদ্ভব বলা যায় যে, সেই হাদীসে **جُلُوسًا** বা বৈঠক দ্বারা জুম্মার নামাজের পরিসমাপ্তির পরের বৈঠক উদ্দেশ্য, তাশাহুদে বৈঠক উদ্দেশ্য নয়। যেমন— অপর হাদীসের বলা হয়েছে,

وَمَنْ فَاتَتْهُ الرُّكْعَتَانِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا

- ※ দ্বিতীয় দলিলে যে বলা হয়েছে، وَمَنْ قَاتَنَهُ الرَّكْعَتَانِ فَلَيْبَسَ أَرْبَعًا এর উত্তরে বলা যায় যে, এটা ইমাম আবু হানীফা: (র.)-এর অভিমতের পরিপন্থি নয়। কেননা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'রাকাতের কিছুই না পাওয়া।
- ※ আর তৃতীয় দলিলে যে, وَيُؤْمَرُ مَنْ كَمَّ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنْ كَمٍّ هَيَّجًا هَيَّجًا এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এখানে কক্ষু না পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় রাকাত না পাওয়া। এছাড়া এ হাদীসের রাবী সুলায়মান ইবনে আবী দাউদ হাররানী-কে আবু হাতিম যযীফ স্বাক্ষর করেছেন; ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না।

الدَّلِيلُ الثَّانِي : دِثِيْثِيْ اَنُوْجْهَد

عَنْ ۱۳۲۹
ابْنِ عُمَرَ (رَض) قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ حُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ
إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ آرَاهُ الْمُؤَدِّنُ
ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ
ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩২৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'টি খুতবা দান করতেন। তিনি মিম্বরে উঠে প্রথমে বসতেন। অতঃপর যখন -[রাবী বলেন, আমার ধারণা মতে,] মুয়াজ্জিন আযান হতে অবসর হতেন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং খোতবা দান করতেন, অতঃপর [এক খোতবার পরে] বসতেন এবং কোনো কথাবার্তা বলতেন না। অতঃপর আবার দাঁড়াতেন এবং [দ্বিতীয়] খোতবা দান করতেন : -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ۱۳৩০
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ)

১৩৩০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মিম্বরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখন আমরা তাঁর দিকে মুখ করে বসতাম। -[তিরমিথী]। তবে তিনি বলেন, আমরা এ হাদীসটি একমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ফজলের মাধ্যমে জেনেছি, অথচ তিনি ছিলেন যযীফ, তাঁর হাদীস ঋণ্য থাকত না।

الدَّلِيلُ الثَّلَاثِي : تْثِيْثِيْ اَنُوْجْهَد

عَنْ ۱৳৳১
جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৩১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন, অতঃপর [প্রথম খোতবা শেষ করে] বসতেন, তারপর পুনরায় দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়েই খোতবা দান করতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে এই সংবাদ দেয় যে, হুজুর ﷺ বসে বসে খোতবা দান করতেন সে মিথ্যা বলেছে। আন্বাহর কসম! আমি মহানবী ﷺ-এর সাথে দুই হাজার নামাজেরও বেশি পড়েছি। [কখনও তাঁকে বসে খোতবা দান করতে দেখিনি।] -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَلَاةِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পরে-

১. দু' হাজার নামাজ ঘারা পাঁচ ওয়াত্‌সহ বুঝানো উদ্দেশ্য, জুমা উদ্দেশ্য নয়। কেননা জুমার নামাজ প্রবর্তন হয় হিজরতের পরে, আর রাসুলের মাদানী জীবনে পাঁচশতের বেশি জুমার নামাজ হবে না।

২. অথবা এর ঘারা সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ۱۳۳۰ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رَضًا) أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبَدَ الرَّحْمَنَ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا الْحَبِيثَ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৩২. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত : একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, [দেখলেন] আব্দুর রহমান ইবনে উখুল হাকাম [বনী উমাইয়ার গভর্নর] বসে বসে খোতবা দান করছেন। এটা দেখে কা'ব বললেন, এই কলুষ আত্মসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে দেখ, সে বসে খোতবা দিচ্ছে। অথচ আত্মাহ তা'আলা বলেছেন- الآية - যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেলাধুলা দেখে তখন সেই দিকে দৌড়ায় আর আপনাকে [খোতবা দানরত] দাঁড়ান অবস্থায় ফেলে যায়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : জুমা ফরজ হওয়ার প্রথম যুগে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা দান করছিলেন। এমন সময় সিরিয়ার এক বাণিজ্য-কাফেলা মদীনায় উপস্থিত হয়। কাফেলার কথা শুনে খোতবা শ্রবণেরত অনেকে সেদিকে দৌড়ে যায়। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এরূপ কাজ থেকে সতর্ক করে দেন। উক্ত আয়াতে হুজুর ﷺ-এর খোতবার সময় দাঁড়ানো থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ۱۳৩৩ عَمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (رَضًا) أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبِعِهِ الْمَسْحَةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৩৩. অনুবাদ : হযরত উমারাহ ইবনে রুওয়াইবা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি একদা বিশর ইবনে মারওয়ানকে মিন্বারের উপরে দু' হাত উঠিয়ে [ও বক্তাদের মতো হাত নাড়িয়ে] খোতবা দান করতে দেখলেন। তখন বললেন, আল্লাহ তার এই দু' হাতকে বিশ্রী করুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি এ থেকে বেশি কিছু করতেন না, এই বলে উমারাহ (রা.) নিজের তজ্জী অঙ্গুলি ঘারা ইশারা করলেন। [অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত নাড়াতে না, প্রয়োজনে অঙ্গুলি ঘারা ইশারা করতেন।]-[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث হাদীসের ব্যাখ্যা : খুতবার সময় সাধারণ বক্তৃতার ন্যায় হাত নেড়ে খোতবা প্রদান করা অনুচিত, এতে খোতবার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। রাসূল ﷺ এরূপ কখনো করেননি, তিনি প্রয়োজন বোধে শুধু অঙ্গুলি ঘারা ইশারা করতেন, এ জন্য উমারাহ ইবনে রুওয়াইবা বিশর ইবনে মারওয়ানের কাজেল আপত্তি করেছেন।

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَمَّا
 اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ
 مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَرَأَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ
 بِنَ مَسْعُودٍ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩৩৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, একদা জুমার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন
 মিম্বারে সোজা হয়ে বসলেন, [জনতাকে লক্ষ্য করে]
 বললেন, তোমরা বস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
 (রা.) এটা শুনলেন, আর মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন
 [যেখানে তিনি তখন দাঁড়ানো ছিলেন]। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা
 দেখে বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ! তুমি
 এদিকে আস [অর্থাৎ এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বসো।]
 -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, খোতবা বসে বসে শুনতে হয়। রাসূল ﷺ মিম্বারে
 বসে খোতবা প্রদান করার পূর্বে সবাইকে বসতে আদেশ করেন। এ ছাড়া উক্ত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর
 বিশেষ মর্যাদাও ফুটে উঠে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ
 رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ
 الرَّكْعَتَانِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا وَقَالَ الظَّهْرُ -
 (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)

১৩৩৫. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি
 জুমার নামাজ এক রাকাত পেয়েছে সে যেন এর সাথে
 আর এক রাকাত মিলিয়ে দু' রাকাত পড়ে নেয়। আর যে
 ব্যক্তি দু' রাকাতই ফুট করেছিল সে যেন চার রাকাত
 পড়ে নেয় অথবা [রাবীর সন্দেহ] হজুর বলেছেন সে যেন
 জোহর নামাজ পড়ে নেয়। -[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হানাফীদের মতে যদি কোনো ব্যক্তি ইমামকে তাশাহুদ পড়া কিংবা সাহু সেক্সদায় পায়
 তবে সে যেন জামাতে শরিক হয়ে বাকি নামাজ আদায় করে। অর্থাৎ তার জন্য জুমার নামাজ পড়া আবশ্যিক হয়ে যাবে, অন্যথা
 জোহরের নামাজ পড়তে হবে।

আর অন্যান্যদের মতে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পেলে জুমা পড়বে, অন্যথা জোহর পড়তে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَخَبْنِ سَرْبِطٍ تَرَى تِيزِيْرَ نَامَاْجِ پِذْنِ : رَأَى رَأَى ﷺ :
 সর্বপ্রথম কখন সর্বপ্রথম তর-তীতির নামাজ পড়েন : রাসূল্লাহ ﷺ :
 সর্বপ্রথম কখন সর্বপ্রথম পড়েন এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ- রাসূল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম 'যাতুর বেরকা'
 যুদ্ধে ষাওফ বা তীতির নামাজ আদায় করেন। বিভিন্ন বর্ণনা মতে এই যুদ্ধ ৪ অথবা ৫ অথবা ৬ অথবা ৭ হিজরিতে অনুষ্ঠিত
 হয়েছিল। ইবনুল কায়্যিম এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম এই নামাজ উসকানে আদায়
 করেছিলেন। কারো মতে এ নামাজ সর্বপ্রথম পড়া হয়েছিল বনী নাজীর যুদ্ধের সময়।

رَأَى رَأَى ﷺ : رَأَى رَأَى ﷺ :
 এর ইস্তিকালের পর তর-তীতির নামাজের
 বিধান অবশিষ্ট আছে কি না : রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর সালাতুল ষাওফের বিধান বাকি আছে কি না, এ ব্যাপারে
 মতনৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশিষ্ট সাগরেন্দ মুযানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর ইস্তিকালের পর এর বিধান
 আর অবশিষ্ট নেই। এটা মনসুখ হয়ে গেছে।

এরপড়াবো আবু ইউসুফ (র.)-এর এক এক অভিমত মুতাবিক এবং হাসান ইবনে মিয়াদ ও ইবরাহীম ইবনে উলাইয়্যার মতে
 রাসূল ﷺ -এর পরে এর বৈধতার বিধান বাকি নেই। তাঁরা দলিল হিসাবে আন্নাহর বাণী رَأَى رَأَى ﷺ :
 رَأَى رَأَى ﷺ :
 (الاية) উল্লেখ করে বলেন, সালাতুল ষাওফের বিধান রাসূল ﷺ -এর উপস্থিতিতে শর্তে প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং
 তাঁর অনুপস্থিতিতে এর বিধান আর বাকি নেই।

অবশ্য ইমাম চতুর্থ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতে রাসূল ﷺ -এর ইস্তিকালের পরও সালাতুল ষাওফের বিধান বাকি
 রয়েছে। দলিল হলো رَأَى رَأَى ﷺ :
 رَأَى رَأَى ﷺ :
 -এর হুকুমের ব্যাপকতার মধ্যে সালাতুল ষাওফও
 অন্তর্ভুক্ত। এটা ছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহাবীগণ সালাতুল ষাওফের নামাজ আদায় করতেন।

رَأَى رَأَى ﷺ : رَأَى رَأَى ﷺ :
 সালাতুল ষাওফ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবু
 হানীফা, আওয়যায়ী, মুহাম্মদ (র.) প্রমুখগণ বলেন, ভয়কালীন নামাজের পদ্ধতি হবে, ইমাম লোকদেরকে দু' ভাগে ভাগ
 করবেন। একদল শত্রুর সন্মুখীন থাকবে আর একদল ইমামের পিছনে। ইমাম তাঁর সন্নয় মুজাদিদদেরকে নিয়ে এক রুকু ও
 দুই সিজনদায় এক রাকাত পড়বেন, ইমাম দ্বিতীয় সিজনা হতে মাথা উঠালে যারা তাঁর সাথে এক রাকাত পড়ল তারা গিয়ে শত্রুর
 সামনে দাঁড়াবে এবং দ্বিতীয় দল যারা এতকণ শত্রুর মোকাবেলায় ছিল, তারা এসে ইমামের পিছনে একতেন্দা করবে। ইমাম
 এ দ্বিতীয় দলকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজনদায় এক রাকাত পড়বেন এবং তাশাহুদ পড়ে একাকী সালাম ফিরাবেন। কিন্তু এ
 দ্বিতীয় দল সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে।

আর প্রথম দল যারা ইমামের সাথে প্রথম এক রাকাত পড়ে গিয়েছিল তারা নামাজের স্থানে এসে অবশিষ্ট এক রাকাত কেব্রাত
 ব্যতীত পৃথক পৃথকভাবে আদায় করবে। তারা কেব্রাত এ জন্য পড়বে না যে, এরা ছিল 'লাহেক'। তারপর একা একাই
 তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এভাবে তারা নিজ নিজ নামাজ সম্পন্ন করে পুনরায় শত্রুর সন্মুখে দাঁড়াবে।

এবার দ্বিতীয় দল যারা ইমামের সাথে শেষ রাকাত পড়েছিল তারাও অনুরূপভাবে নামাজের স্থানে এসে নিজেদের এক রাকাত
 কেব্রাতসহ আদায় করবে। এরা কেব্রাত এ জন্য পড়তে হবে যে, তারা 'মাসবুক'। অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করে সালাম
 ফিরাবে। এ পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করার বর্ণনা কুরআনের নির্দেশের সাথে সর্বাধিক মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে বিধায় ইমাম
 আবু হানীফা (র.) একে উত্তম পদ্ধতি বলেন। এটাই উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হলো সালাতুল ষাওফের প্রথম
 পদ্ধতি। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখগণ যে পদ্ধতিকে উত্তম বলেন, তা পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ۱۳۲۷۰
 بَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ (رَحِمَهُ
 عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ (رَحِمَهُ) عَمَّنْ صَلَّى
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ
 صَلَاةَ الْخُرُوفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ
 وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعُدُوَّ فَصَلَّى بِالنِّسِيِّ مَعَهُ
 رَكْعَةً ثُمَّ تَبَّتْ قَائِمًا وَاتَّمَرُوا لَا نَفْسِيَهُمْ
 ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعُدُوَّ وَجَاءَتِ
 الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ
 التِّيَّ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ تَبَّتْ جَالِسًا
 وَاتَّمَرُوا لِأَنْفُسِيَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِطَرْنِيٍّ آخَرَ عَنْ
 الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ
 بْنِ أَبِي حَنَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)

১৩৩৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ইয়াযীদ ইবনে রুমান
 [অপর তাবেয়ী] সালেহ ইবনে খাওয়্যাত হতে বর্ণনা করেন,
 সালেহও এমন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি 'যাতুর
 রেকা' যুদ্ধে রাসূলুয়্যাহ ﷺ-এর সাথে ভয়ভীতিকালীন
 নামাজ পড়েছেন। তিনি বলেন, একদল নবী করীম
 ﷺ-এর সাথে নামাজে সারিবদ্ধ হলো দ্বিতীয় দল শত্রুর
 সম্মুখীন থাকল। রাসূল ﷺ সসীয়া লোকদেরকে নিয়ে এক
 রাকাত নামাজ পড়লেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকলেন।
 লোকেরা তাদের অবশিষ্ট এক রাকাত একা একা পড়ে
 নিজ নিজ নামাজ সম্পন্ন করল এবং ফিরে গিয়ে শত্রুর
 সম্মুখে সারিবদ্ধ হলো। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসল। রাসূল
 ﷺ তাদেরসহ নিজের অবশিষ্ট এক রাকাত পড়লেন,
 অতঃপর বসে থাকলেন। লোকেরা একা একা তাদের
 বাকি রাকাত নামাজ আদায় করল। অতঃপর রাসূল
 তাদেরসহ সালাম ফিরাবেন। [বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু
 বুখারী অন্য এক সূত্রে হাদীসটি কাসেম ইবনে মুহাম্মদ
 হতে, তিনি সালেহ ইবনে খাওয়্যাত হতে, তিনি সাহল
 ইবনে আবু হাসমা হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে
 বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভয়-ভীতিকালীন নামাজের দ্বিতীয় পদ্ধতি : 'সালাতুল খাওফ' আদায়ের দ্বিতীয়
 পদ্ধতি। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবু সওর প্রমুখগণ এ পদ্ধতিকে সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করেন। এর কারণ,
 তাঁরা বলেন, এ পদ্ধতির বর্ণনাসূত্র বেশি শক্তিশালি, আর এতে নামাজের পরিপন্থি কার্যাবলিও কম। এই পদ্ধতিতে ইমাম
 একদলের সাথে এক রাকাত নামাজ পড়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর লোকেরা তাদের অবশিষ্ট নামাজ একা একা শেষ
 করে শত্রুর মোকাবেলায় গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ হবে। ইমাম এ দলের সাথে তাঁর
 অবশিষ্ট রাকাত শেষ করবেন এবং তাশাহুদদের বৈঠকে বসে তাদের নামাজ শেষ করার অপেক্ষা করতে থাকবেন। দ্বিতীয় দল
 তাদের বাকি এক রাকাত একা একা আদায় করবে। তাদের তাশাহুদ পড়া শেষ হলে ইমাম তাদের সহ সালাম ফিরাবেন।
 ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ পদ্ধতি জায়েজ আছে বটে, তবে উত্তম হতে পারে না। কারণ মুক্তাদির জন্য ইমামের
 নামাজের মধ্যে অপেক্ষা করা এক দিকে যেমন অযৌক্তিক, অপর দিকে ইমামতের বিপরীত কার্যক্রম, একে বলা হয় نَلْبُ
 مَوْضُوعُ আর প্রথম পদ্ধতিতে লোকদের নামাজের পরিপন্থি কিছু কাজ হলেও অবশ্য বিশেষে তার অনুমতি দেওয়া যেতে
 পারে। একে বলা হয় رُخْصَتٌ كُرْخَسَاتٌ।

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ أَقْبَلْنَا
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ
 الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ
 ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
 فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسِيفُ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَآخَذَ سِيفَ نَبِيِّ
 اللَّهِ ﷺ فَآخَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 اتَّخَفَنْتَنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي
 قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ
 أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَمَدَ السِّيفَ
 وَعَلَّقَهُ قَالَ فَتَوَدَّى بِالصَّلْوَةِ فَصَلَّى
 بِطَائِفَةٍ وَرَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى
 بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى وَرَكَعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ
 لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلقَوْمِ
 رَكَعَتَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৩৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত ।
 তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধাভিযানে
 অগ্রসর হলাম। যখন 'যাতুর রেকা' নামক স্থানে
 পৌঁছলাম, রাবী বলেন, তথায় আমরা একটা ছায়াদার
 বৃক্ষের কাছে আসলাম, যথারীতি আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-
 -এর বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিলাম। রাবী বলেন, [রাসূলুল্লাহ
 ﷺ বৃক্ষের ছায়ায় আরাম করছিলেন] এমন সময়
 মুশরিকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ
 ﷺ-এর তরবারি গাছের সাথে ঝুলানো ছিল। সে নবী
 করীম ﷺ-এর তরবারি হাতে নিল এবং তাড়াতাড়ি
 কোষযুক্ত করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, তুমি কি
 আমাকে ভয় কর? রাসূল ﷺ বললেন, না। লোকটি বলল,
 এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?
 রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলাই আমাকে তোমার
 হাত থেকে রক্ষা করবে। রাবী জাবের বলেন- এতে
 রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাকে ভয় দেখাল, ফলে
 সে তরবারি কোষবদ্ধ করে একে পূর্ববৎ ঝুলিয়ে রাখল।
 রাবী বলেন, অতঃপর নামাজের আযান দেওয়া হলো এবং
 রাসূল ﷺ একদল লোককে নিয়ে দু' রাকাত নামাজ
 পড়ালেন। অতঃপর এদল পিছনে সরে গেল [অপর দল
 সম্মুখে এগিয়ে এলো] রাসূলুল্লাহ দ্বিতীয় দলকেও দু' রাকাত
 নামাজ পড়ালেন। রাবী হযরত জাবের (রা.) বলেন, এতে
 রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোট চার রাকাত হয়েছিল, আর
 লোকদের দু' রাকাত করে হয়েছিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- الرِّقَاعِ নামে নামকরণের কারণ : উক্ত যুদ্ধকে الرِّقَاعِ নামে নামকরণের কয়েকটি কারণ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-
- এ যুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে খালি পায়ে ছিলেন তাদের পায়ে কোনো জুতা ছিল না, ফলে তাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং নখ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল, সৈনিকগণ ক্ষতস্থানে কাপড়ের পটি বেঁধেছিল। উল্লেখ্য যে, 'রেকা' কাপড়ের টুকরাকে বলা হয়। এ কাপড়ের টুকরা দিয়ে পায়ে পটি বাঁধার কারণে এ যুদ্ধকে 'যাতুর-রেকা' বা পটি বিশিষ্ট যুদ্ধ বলা হয়।
 - যে স্থানে এ যুদ্ধ বা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এ স্থানটির মাটি ছিল বিভিন্ন বর্ণের, এক স্থানের মাটির রং আরেক স্থানের রং -এর সাথে কোনো মিল ছিল না, কোনো অংশের বর্ণ ছিল সাদা, আবার কোনো অংশের বর্ণ ছিল লাল, আর কোনো অংশের বর্ণ ছিল কালো। এ বিচিত্র বর্ণের টুকরার জন্য একে যাতুর-রেকা নামকরণ করা হয়েছে।
 - আবার কারো মতে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিচিত্র বর্ণের কাগা ছিল, এ জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে।
 - ইমাম দাউদী বলেন, এ যুদ্ধে ভয়-ভীতির দরুন মুসলমানরা ৪০ ৪০ জামাতে 'সলাতুর খাওফ' আদায় করেছিলেন তাই 'যাতুর-রেকা' নামে নামকরণ করা হয়েছে ইত্যাদি। তবে প্রথম কারণটিকেই অনেকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।

হাদীসসমূহের মধ্যে ষড়্দের সমাধানঃ পূর্বেদ্বিখিত দু'টি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ভয়ভীতির নামাজ রাসূল ﷺ দু' রাকাত পড়েছেন এবং এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি চার রাকাত পড়েছেন। এর সমাধান নিম্নরূপ—

- কিছু সংখ্যাকের মতে এ সফরে মহানবী ﷺ ও সাহাবীগণ তাঁরা কেউই মুসাফির ছিলেন না। তাই সকলেই চার চার রাকাত নামাজ আদায় করেছেন।
- আবার কারো মতে মহানবী ﷺ চার রাকাত পড়লেও সাহাবীগণ হযুরের সাথে দু' রাকাত এবং নিজেরা একা একা আরও দু' রাকাত পড়েছেন। ফলে সকলের চার চার রাকাতই হয়েছে।
- কিছু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাঁরা সকলেই মুসাফির ছিলেন। মহানবী ﷺ এক দলকে ফরজের নিয়তে দুই রাকাত এবং অপর দলকে নফলের নিয়তে দু' রাকাত পড়িয়েছেন। তাঁর মতে **غَلْفَ الْمُنْفَلِّ جَانِبَهُ** অর্থাৎ ফরজ নামাজ পাঠকারীর নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে একতেন্দা করা জায়েজ আছে। সুতরাং মহানবী ﷺ দ্বিতীয় দলের জন্য নফল আদায়কারী হলেও তাদের নামাজ জায়েজ হয়েছে।
- ইমাম ডাহাবী (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে একই ফরজ নামাজ একাধিক বার পড়া জায়েজ ছিল। 'যাতুর-রেকা'-এর যুক্ত সেই সময়কার। এ প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, মহানবী ﷺ দু'বার উভয় দলকে একই নামাজ পৃথক পৃথকভাবে ফরজের নিয়তেই পড়িয়েছেন। কাজেই ইমাম শাফেয়ী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।
- আবার কেউ কেউ বলেন, মহানবী ﷺ-এর 'সালাতুল খাওফ' চার রাকাত পড়া তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যাতে প্রত্যেক দলই তাঁর সাথে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে পারে, তজ্জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মহানবী ﷺ-এর চার রাকাত পড়া অন্যান্য হাদীসের বিপরীত হলেও এ বিশেষ কারণে তা বৈপরীত্যের আওতায় পড়ে না। এটা সালাতুল খাওফের তৃতীয় পদ্ধতি।

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَّيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَأَعْدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ أَنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ أَنْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الْمَقْدَمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ

১৩৩৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ভয়-ভীতিকালীন নামাজ পড়ালেন। আমরা তাঁর পিছনে দু' সারিতে সারিবদ্ধ হলাম। শত্রুরা তখন আমাদের ও কেবলার মধ্যখানে [অর্থাৎ কেবলার দিকে] ছিল। তখন নবী করীম ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বললেন, আমরাও সকলে তাকবীর বললাম [অর্থাৎ উভয় সারির লোকেরাই তাকবীর বললাম] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করলেন আমরাও সকলে [অর্থাৎ উভয় সারির লোক] রুকু করলাম। তারপর রাসূল ﷺ রুকু হতে মাথা উঠালেন, আমরাও সকলে মাথা উঠলাম। অতঃপর তিনি এবং যে সারি তাঁর নিকটে ছিল তারা সেজদায় গেলেন আর দ্বিতীয় সারি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যখন নবী করীম ﷺ সিঁজদা সম্পন্ন করলেন, তাঁর নিকটবর্তী সারির লোকেরা উঠে দাঁড়াল, দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিঁজদায় গেল এবং সিঁজদা সম্পন্ন করে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর দ্বিতীয় সারি সামনের দিকে অর্থাৎ সারিতে অগ্রসর হয়ে গেল এবং সামনের সারির লোকেরা পিছনের সারিতে সরে গেল, অতঃপর

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ
 انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ
 الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ
 الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا
 قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفِّ الَّذِي
 يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ بِالسُّجُودِ
 فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا
 جَمِيعًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

[কেরাআত পাঠ শেষে] রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় রুকুতে
 গেলেন, আমরাও সকলে [উভয় সারি] রুকুতে গেলাম
 তারপর রাসূল ﷺ রুকু হতে মাথা উঠালেন, আমরাও
 সকলে মাথা উঠলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ এবং যে সারি
 তাঁর নিকটে ছিল অর্থাৎ যে সারি প্রথম রাকাততে দ্বিতীয়
 সারিতে ছিল সিজদাতে গেলেন আর দ্বিতীয় সারি [অর্থাৎ
 প্রথম রাকাততে প্রথম সারি] শত্রুর মুখোমুখি হয়ে রইল।
 নবী করীম ﷺ ও তাঁর নিকটের সারির লোকেরা যখন
 সিজদা সম্পন্ন করলেন তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা
 সিজদায় নত হলেন এবং সিজদা সম্পন্ন করলেন। অতঃপর
 নবী করীম ﷺ সালাম ফিরালেন। আমরাও সকলে [উভয়
 সারির লোক] একত্রে সালাম ফিরালাম। [এটা সালাতুল
 খাওফের চতুর্থ পক্ষতি]-[মুসলিম]

الفصل الثاني: দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٤ جَابِرِ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 كَانَ يَصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي
 الْخَوْفِ يَسْطِنُ نَحْلَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ
 رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى
 بِهِمْ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

১৩৪০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, মহানবী ﷺ নাখল নামক স্থানে ভয়ের
 অবস্থায় মানুষকে জোহরের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। তিনি
 একদল লোকসহ দু' রাকাত নামাজ পড়লেন এবং সালাম
 ফিরালেন। অতঃপর আরেক দল আসল তিনি তাদের
 নিয়েও দু' রাকাত নামাজ পড়লেন অতঃপর সালাম
 ফিরালেন। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক দলের সাথে পৃথক পৃথক
 সালাম ফিরিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এটা রাসূল ﷺ-এর জন্য সালাতুল খাওফের বৈশিষ্ট্য ছিল। কারো
 মতে শেষ দু' রাকাতও ফরজ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফরজ পুনঃ পড়া জায়েজ ছিল বলেই রাসূল ﷺ একপ
 করেছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর শেষ দুই রাকাত ছিল নফল। তাঁর মতে নফল পাঠকারীর পিছনে ফরজ পাঠকারীর
 একত্বদা করা জায়েজ। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে যে পক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে এটা ভয়ভীতিকালীন নামাজের পঞ্চম পক্ষতি।

التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٤١
أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ عَنْهُ)
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ بِمَنْ ضَعْفَانَ
وَعَسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَهُؤُلَاءِ صَلَوَةٌ
هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَاؤِهِمْ
وَهِيَ الْعَصْرُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمَيَّلُوا
عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ
شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَيَقْرَأَ طَائِفَةً
أُخْرَى وَرَاءَهُمْ وَلِيَأْخُذُوا جِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَانِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ)

১৩৪১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দাজনান ও উসফান নামক এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে হাজির হলেন। তখন মুশরিকগণ বলল, এদের [অর্থাৎ মুসলমানদের] এমন একটি নামাজ আছে যা তাদের পিতামাতা ও সন্তানাদি হতেও তাদের নিকটে অধিক প্রিয়। তা হলো তাদের আসরের নামাজ। সুতরাং তোমরা সংঘবদ্ধ হও এবং তোমাদের সিদ্ধান্তকে পাকাপোক্ত করে নাও এবং [তাদের নামাজরত অবস্থায়] তাদের উপরে হঠাৎ এক সাথে আক্রমণ কর। এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে দু' দলে বিভক্ত করতে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি যেন এক দলকে নামাজ পড়ান এবং অপর দল তাদের পিছনের শত্রুর মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত তারা যেন সদা সতর্ক থাকে এবং সশস্ত্র প্রস্তুত থাকে। এতে তাদের এক রাকাত হবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' রাকাত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ ١٣٤١ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস ঘারা বুঝা যায় যে, মুক্তাদিদের صَلَوَةُ الْكُفْرَانِ এক রাকাত হবে, এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. নবী করীম ﷺ-এর সাথে তাদের এক রাকাত করে হবে, আর অবশিষ্ট এক রাকাত তারা একা একা পড়ে নেবে।
২. অথবা তাদের সর্বসাকুলো এক রাকাতই হবে, মূলত এক রাকাত কোনো নামাজ নেই মোটকথা, সালাতুল ষাওফ-এর এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য নামাজে নেই।

এতে ফরজ নামাজ যথাসময় আদায় করার এবং তা জামাত সহকারে পড়ার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থায় ও জামাত বা নামাজ তরক করার অনুমতি নেই। তবে صَلَوَةُ الْكُفْرَانِ-এ এক রাকাত পড়াও এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে পারে, এ হলে তবে এটা صَلَوَةُ الْكُفْرَانِ-এর ষষ্ঠ পদ্ধতি হবে।

মোটকথা, সালাতুল ষাওফ-এর এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য নামাজে নেই।

এতে ফরজ নামাজ যথা সময় আদায় করার এবং তা জামাতসহকারে পড়ার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থায় ও জামাত বা নামাজ তরক করার অনুমতি নেই।

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

পরিচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাজ

الْعِيدُ -এর সংজ্ঞা: الْعِيدُ শব্দটি الْمُرُودُ হতে নিগত। শাব্দিক অর্থ-الرُّجُوعُ তথা প্রত্যাবর্তন করা, وَارٍ -কে পূর্ববর্তী যেরের কারণে. ঈ দ্বারা পরিবর্তন করে الْعِيدُ করা হয়েছে? এর বহুবচন হলো أَعْيَادٌ -এর বহুবচন হওয়া উচিত ছিল أَعْوَادٌ কিন্তু الْمُرُودُ (কাঠ)-এর বহুবচন হতে পার্থক্য করার জন্য এর বহুবচন أَعْيَادٌ গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত আনন্দ-উৎসবের দিনকে عِيدٌ বলা হয়। তবে শরিয়তের পরিভাষায় মুসলমানগণ বছরে যে দু'টি দিবসকে আনন্দ উৎসবের দিবস হিসাবে পালন করে থাকে তাকে ঈদ বলা হয়।

ঈদকে 'ঈদ' হিসাবে নামকরণ করার কারণ : বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন শ্রেণীপটের কারণে ঈদকে ঈদ হিসাবে নামকরণ করেছেন-

1. ঈদের দিন আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ অবতীর্ণ হতে থাকে এ জন্য এ দিবসকে 'ঈদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
2. কারো মতে এ দিনটিকে এজন্য ঈদ বলা হয়, কারণ লোকেরা এ দিনটিকে বারবার খুশির দিন হিসাবে ফিরে পায়।
3. অথবা যারা ঈদ একবার পেল, পরবর্তী বছর পুনরায় তাদের জীবনে তা আবার আসবে এ আশায় একে ঈদ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।
8. অথবা ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা প্রতি বছরই নতুন করে আগমন করে।
5. অথবা ঈদের নামাজে বারবার তাকবীর বলতে হয় বিধায় একে ঈদ (عيد) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঈদের নামাজ কখন প্রবর্তিত হয়? ঈদের নামাজ প্রবর্তিত হওয়ার সময় সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়—

প্রথমত আদ-দুরুল মুখতার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম হিজরিতে ঈদের নামাজের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত অধিকাংশ আলেমদের মতে দ্বিতীয় হিজরিতে তার বিধান প্রবর্তিত হয়। এ অভিমতই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা

দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে রোজা ফরজ হয়। এ হিসাবে দ্বিতীয় হিজরিতেই ঈদের নামাজের বিধান প্রবর্তিত হয়।

الْعِيدُ فِي مَشْرُوعِيَةِ الْعِيدِ ঈদের নামাজ প্রবর্তনের তাৎপর্য : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, প্রত্যেক

সম্প্রদায়ের স্বীয় কৃষ্টকালচারকে উচ্চাসনে সমাসীন করার জন্য এমন কিছু নির্ধারিত দিন থাকে, যে দিনে তারা

সম্মিলিতভাবে আনন্দ-উৎসব উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একসাথে হয়ে থাকে। প্রাক ইসলামি যুগে 'নাইরাজ' (نَيْرُوز) ও

'মেহেরজান' (مِهْرَجَان) নামে সে ধরনের দু'টি দিবস নির্দিষ্ট ছিল। রাসূল ﷺ -এর মদীনা হিজরতের পর সাহাবীদের

হৃদয়ে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এর পরিবর্তে

আরো উত্তম দিবস দান করবেন। এর অব্যাবহিত পরেই 'ঈদ' নামক দু'টি দিবস দান করা হয়। যে দিবসে মুসলমানগণ

একই স্থানে সমবেত হয়ে পরস্পর কুশলাদি বিনিময় করে। সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তার

একত্ববাদের বার্তা ঘোষণা করা হয়। আর এ জন্যই ঈদের ময়দানে নারী শিশু আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই উপস্থিত হওয়া

মোস্তাহাব।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۳৪২
أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (رَضَا)
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوْلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ
بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مَقَابِلَ
النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ
فَيَعْظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ
يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ
أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪২. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর বা
ঈদুল আজহার দিনে ইদগাহে যেতেন তারপর প্রথম কাজ
তিনি যা করতেন তা হলো নামাজ [অর্থাৎ তিনি প্রথম
নামাজ পড়াতেন]। অতঃপর নামাজ হতে অবসর হয়ে
তিনি জনতার সম্মুখে দাঁড়াতেন, জনতা তখন নিজ নিজ
সারিতে বসা থাকত। রাসূল ﷺ তখন তাদেরকে উপদেশ
দিতেন, নসিহত করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারি
করতেন। যদি কোথাও সৈন্য শেরণের ইচ্ছা করতেন,
তাদেরকে বাছাই করতেন অথবা যদি কাউকেও কোনো
বিশেষ নির্দেশ দেওয়ার থাকত নির্দেশ দিতেন। [এটাই ছিল
রাসূলের খোতাবা] অতঃপর বাড়ি ফিরতেন। -[বুখারী ও
মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْلَافَاتُ الْاَلِيْمَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيْدِ ঈদের নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে
ঈদের নামাজ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী মালেক ও জমছর আলিমদের মতে উভয় ঈদের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম
আহমদ (র.) বলেন, ফরজে কেফায়া। যারা ফরজ বা ওয়াজিব বলেন, তাদের দলিল আল্লাহর কলাম, فَضَّلَ لِرَبِّكَ وَأَنْتَ
আয়াতে ঈদের নামাজ ও কুরবানির হুকুম আদেশমূলক শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কুরবানি যেমন ওয়াজিব,
নামাজও তেমনি ওয়াজিব। এতদ্বিন্নি হিজরতের পর মহানবী ﷺ এর এটা নিয়মিত পড়া এবং কোনো সময়েও তা তরক না
করাও এটা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। মিরকাত, হিদায়া ও ফতওয়ার কিতাবে একপই বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ঈদের নামাজ
হিজরি দ্বিতীয় সনে হজুর ﷺ পড়েছেন।

عَنْ ۱৩৪৩
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رَضَا) قَالَ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ
وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৪৩. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর
সাথে দুই ঈদের নামাজ একবার নয়, দু'বার নয়; বরং
বহুবার পড়েছি আযান ও একামত ব্যতীত। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَمْرَةَ هَادِيَةِ الْبَشَايَا : আযান ও একামত দেওয়া হয় যেন তা শুনে মানুষ জামাতে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে
পারে। পক্ষান্তরে ঈদের নামাজের দিন তারিখ পূর্ব হতে নির্ধারিত থাকার কারণে আযান ও একামতের মাধ্যমে মানুষকে নতুন
করে সতর্ক করার প্রয়োজন পড়ে না।

وَعَنْ ۱۳৪৪
 ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (رض)
 يَصْلُونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ -
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর
 (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর
 ও ওমর (রা.) সকলেই দু' ঈদের নামাজ খোতবা দানের
 পূর্বেই পড়তেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুই ঈদের খোতবা নামাজের পূর্বে না পরে : আলামা ইবনুল মুনিয়র বলেন, সকল ফিকহশাফরিদগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, দুই ঈদের খোতবা নামাজের পরেই দিতে হবে- নামাজের পূর্বে দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য যদি কেউ নামাজের পূর্বেই খোতবা প্রদান করে থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে হযরত উসমান (রা.) একবার ঈদের নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদান করেছিলেন এ তথ্য যদি সঠিক হয় তবে বলা যাবে, তিনি তা বৈধ জ্ঞান করে দিয়েছিলেন।

অথবা তিনি তুলবশত জুমার নামাজের মত মনে করে তা প্রদান করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ হতে নির্বাচিত তদানীন্তন মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকাম নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদানের প্রচলন স্থায়ীভাবে চালু করেন। এতে তখনকার জীবিত সাহাবীগণ ক্ষুব্ধ হন এবং চরম বিরোধিতা করতে থাকেন। সুতরাং এ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ঈদের খোতবা নামাজের পরেই দিতে হবে।

জুমার এবং ঈদের খোতবার মধ্যে পার্থক্যের কারণ : জুমার খোতবা প্রদান করা হয় নামাজের পূর্বে, আর ঈদের খোতবা প্রদান করা হয় নামাজের পরে। বিশেষজ্ঞগণ এর মধ্যকার কয়েকটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন—

১. জুমার নামাজ ফরজ, আর ঈদের নামাজ সুন্নত মতান্তরে ওয়াজিব। হুকুমের এই পার্থক্য নিরূপণের জন্যই উক্ত নিয়ম করা হয়েছে।
২. কারো মতে জুমার খোতবা নামাজ শুধু হওয়ার শর্ত, যা ঈদের জন্য নয়। আর এ কারণেই জুমার নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।
৩. আরেক দল বলেন, ঈদের নামাজের সময় জুমার নামাজের সময়ের চাইতে ব্যাপকতর, আর এ কারণেই ঈদের খোতবা পরে এবং জুমার খোতবা পূর্বে প্রদান করা হয়ে থাকে।
৪. আবার কেউ কেউ বলেন, জুমার খোতবা প্রদান করা ফরজ এবং তা শ্রবণ করাও অপরিহার্য, কিন্তু যদি জুমার খোতবা নামাজের পরে দেওয়া হয়, তা হলে অনেক মানুষ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে তারা গুনাহগার হবে, এ জন্যই জুমার খোতবা পূর্বে প্রদান করা হয়ে থাকে।

وَعَنْ ۱৩৪৫
 وَسَيِّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 (رض) أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 الْعِيدَ قَالَ نَعَمَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا نَا وَلَا
 إِقَامَةَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَ

১৩৪৫. অনুবাদ : একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
 (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
 সাথে কোনো ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন,
 হ্যাঁ উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহের উদ্দেশ্যে ঘর
 হতে বের হলেন এবং নামাজ পড়ালেন, তারপর খোতবা দান
 করলেন। [পরবর্তী রাবী বলেন,] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)
 আযান ও একামতের কথা উল্লেখ করেননি। অতঃপর রাসূল
 ﷺ মহিলাদের দিকে আসলেন এবং তাদের প্রতি উপদেশ দান

ذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَاتِ فَرَأَيْتَهُنَّ
يُهَوِّنْنَ إِلَىٰ أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ
إِلَىٰ يَلَالٍ ثُمَّ أَرْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٍ إِلَىٰ
بَيْتِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

করলেন, নসিহত করলেন এবং সদুকা-খয়রাত করার জন্য
আদেশ করলেন। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন, আমি
দেখলাম, রাসুলের উপদেশ শোনার পরে মহিলাগণ নিজেদের
কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতো লাগলো এবং অলঙ্কারাদি খুলে
হযরত বেলাল (রা.)-এর হাতে দিতে লাগল। এরপর রাসুল্লাহ
ﷺ হযরত বেলালসহ তাঁর গৃহের দিকে উঠে চলে গেলেন।
[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ عَنْهُ)
النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ
لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ ঈদুল ফিতরের
দিন দু' রাকাত ঈদের নামাজ পড়লেন। কিন্তু এ দু'
রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো নামাজ পড়েননি।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের মতে
ঈদের নামাজের পূর্বে বা পরে কোনো নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল হলো—

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ عَنْهُ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَ فَمَا
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ عَنْهُ) أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عَيْدِهِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا .

ইমাম আবু হানীফা, সুফইয়ান ছাওরী, আলকামা, মালেক প্রমুখ ইমামের মতে ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো নফল নামাজ পড়া
যাবে না, কিন্তু পরে পড়া জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হলো, উল্লিখিত দু'টি হাদীসের প্রথমংশ ঈদের নামাজের পূর্বে যে নফল
পড়া জায়েজ নেই তার দলিল। এ ছাড়া নিম্নের হাদীস দু'টিও দলিল স্বরূপ পেশ করা হয়েছে :

(১) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ عَنْهُ) أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْعِيدِ صَلَاةً . (الْحَدِيثُ
(৩) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ عَنْهُ) وَحَدِيثُهُ (رَضِيَ عَنْهُمَا) كَأَنَّ ابْنَهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ .

ঈদের নামাজের পরে পড়ার দলিল :

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ عَنْهُ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى
رَكَعَتَيْنِ . (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَخْبَرَهُ بِسَعْنَاءَ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَحَسَنَةُ الْعَاقِبُ فِي الْمُنْتَقِ)

(২) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ عَنْهُ) أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِيدِ أَرَبَعَ رَكَعَاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَبْتٍ نَبْتٌ وَبِكُلِّ
وَرَقَةٍ حَسَنَةٌ .

الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِ السَّخَالِينِ : যে সব হাদীসে ঈদের নামাজের পূর্বে নফল জায়েজ নয় বলা হয়েছে তা ইমাম আবু হানীফা
(র.)-এরও দলিল। আর যে সব হাদীসে ঈদের নামাজের পরে নফল জায়েজ নয় বলা হয়েছে তার জবাব হলো, এ সব হাদীস
ধারা ঈদের মাঠে নফল পড়া জায়েজ নয়, যা ইমাম আবু হানীফা (র.) মাকরুহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

وَعَنْ ۱۳۴۷. أُمِّ عَطِيَّةَ (رَضَا) قَالَتْ
أَمَرْنَا أَنْ تَخْرُجَ الْحَيْضُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَ
ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْفِهِنَّ جَمَاعَةً
الْمُسْلِمِينَ وَ دَعَوْتَهُمْ وَتَعَزَّلَ الْحَيْضُ
عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِحْدَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لَتَلْبِسَهَا
صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়া (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল,
আমরা যেন ঋতুবতী মহিলাগণ ও পর্দানশীল মহিলাগণকে
দুই ঈদের দিনেই ঈদগাহে বের করি, যাতে তাঁরা
মুসলমানদের জামাতে হাজির হতে পারে এবং দোয়ায়
অংশগ্রহণ করতে পারে। আর যেন ঋতুবতীগণ মহিলাদের
নামাজের স্থান হতে এক পাশে সরে বসে। তখন একজন
মহিলা আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কারো
কারো কাছে বড় চাদর নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তার
সহচরী নিজের চাদর [ধার হিসাবে] তাকে পরাবে। -[বুখারী
ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদগাহে রমণীদের গমন সম্পর্কে মতানৈক্য : ঈদের ময়দানে, জুমার জামাতে প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া
বৈধ কি না-বর্তমান নৈতিক চরম অবক্ষয়ের যুগে এ প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীত ও বর্তমান সময়ের
সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিম্নে এর একটি বিশ্লেষণ প্রদান করা হলো-

ফতহুল মুলহিম এবং আইনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.), আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ
বলেন, ঈদের মাঠে মহিলাদের গমন করা শুধু বৈধই নয়; বরং কর্তব্যও। তাঁরা আলোচ্য উম্মে আতিয়া (রা.) বর্ণিত
أَمَرْنَا أَنْ تَخْرُجَ الْحَيْضُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ . (الْحَيْثُ) এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে
বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মহিলাদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে এ ধরনের একটি অভিমত মুতাবিক এবং ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, সুফিয়ান সাতুরী,
উরুওয়া, কাসেম, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদিল আনসারী (র.) প্রমুখের মতে, মহিলারা যেন ঈদগাহে এবং অন্যান্য স্থানে না যায়।
তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন।

قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضَا) كُرِرَ رَأْيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَحَدَتْ التِّسَاءَ بَعْدَهُ لَمَتَعْنَهُ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ
بَنِي إِسْرَائِيلَ .

হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ উক্তি ছিল রাসূল ﷺ-এর ইস্তিক্বালের কয়েকদিন পরের। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত
আয়েশা (রা.) যদি এ উক্তি করে থাকেন, তবে বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদ, ধর্ষণ-হাইজ্যাকের যুগে মহিলাদের ঈদগাহে ও
জুমার জামাআতে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে।

বাদায়ে প্রণেতা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসারীদের অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঈদের ময়দানে, জুমার
জামাআতে, এমনকি অন্য কোনো নামাজে যুবতী মহিলাদের উপস্থিতিকে সর্বস্বত্বিক্রমে অবৈধ। তাঁদের দলিল নিম্নোক্ত
আয়াতটি- (الاحزاب : ৩৩) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ قَرَنَ فَيَ بِيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى . (الاحزاب : ৩৩)
অর্থাৎ (নবী পত্নীদেরকে সন্ধান করে আত্মা হ বলেন) এবং তোমারা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান কর এবং পূর্বের
অজ্ঞমুগের প্রথানুযায়ী চলাফেরা করো না। [আহযাব : ৩৩]

তবে তাঁরা বৃদ্ধা রমণীদেরকে ঈদের ময়দানে গমনের অনুমতি দিয়েছেন; ইবনুল হামামও এই অভিমত পোষণ করেছেন।
মোত্তা আশী কারী (র.) একে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আদ-দুরুল মুখতার গ্রন্থে এসেছে যে, বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে যুবতী-বৃদ্ধা সব ধরনের মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা
প্রযোজ্য যে, তাদের জন্য ঈদের ময়দানে, জুমার জামাআতে কিংবা কোনো গুয়াজ মাহফিলে গমন করা উচিত নয়, যদিও তাদের
এই গমন রাতের আঁধারে হোক না কেন। আত্মা ইবনু আব্বদীন বলেন, ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন এর উপরই ফতোয়া প্রদান
করেছেন।

বিরোধীদের উত্তর : মহিলাদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার সপক্ষে যে হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এর উত্তরে বলা যায় যে,

- আল্লামা আহাবী (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অমুসলিমদের সম্মুখে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি করে দেখানোর উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে ঈদের ময়দানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বর্তমানে এর আর প্রয়োজন নেই।
- ফতহুল মুলহিম গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, তদানীন্তন সময় ফিতনা-ফাসাদ হতে মুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকায় তাদেরকে ঈদগাহে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ۱۴۸۰ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ إِنَّ
أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ
فِي آيَامٍ مِنِّي تُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَفِي
رَوَايَةٍ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ
بُعَاثَ وَالنَّبِيِّ ﷺ مُتَغَفِّسٍ بِسُورِهِ
فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ
عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعَهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ
فَإِنَّهَا آيَامٌ عِنْدِي وَفِي رَوَايَةٍ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ
لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدًا وَهَذَا عَيْدُنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মিনায় অবস্থানের দিনে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নিকট হাজির হলেন। তখন তাঁর [আয়েশার] নিকট [আনসারীদের] দু'টি বালিকা বসে দফ বাজিয়ে গান গাইতেছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, বালিকাদ্বয় সেই গান গাইতেছিল, যে গান আনসারগণ বুআস যুদ্ধে [প্রেরণা ও যুদ্ধ উদ্দাননার জন্য] গায়েছিল। তখন নবী করীম ﷺ নিজ কাপড়ে আবৃত হয়ে শুয়েছিলেন। এটা দেখে হযরত আবু বকর (রা.) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ নিজ পবিত্র মুখমণ্ডল হাতে কাপড় সরালেন এবং বললেন, হে আবু বকর! এদেরকে [তাদের কাজের উপর] ছেড়ে দাও। কারণ এটা ঈদের দিন। অপর এক বর্ণনায় এ কথা রয়েছে- হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্য আনন্দ উৎসব রয়েছে, এটা আমাদের আনন্দ উৎসবের দিন। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْفِتَا: فِي الْإِسْلَامِ ইসলামে গানের হুকুম : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, গান গাওয়া এবং দফ বাজানো জায়েজ আছে। সুতরাং আসহাবে জাওয়ায়েহে ও কোনো কোনো ইমাম একে মুবাহ মনে করেন, আবার কারো মতে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ সম্পর্কে হাদীসের বাণী, সলফে সালেহীন ও আইখ্বামে মুক্তাহেদীসীদের মতামত পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঈদ, বিবাহোৎসব, ঋণা ও অলিমার সময়ে লোকদের মাঝে জানাজানি ও প্রচারের নিয়তে 'দফ' বাজানো মুবাহ। আর গান যদি হাম্‌দ-না'ত জাতীয় হয়, দীনের প্রশংসা, জিহাদী প্রেরণামূলক হয়, এক কথায় ইসলামি সঙ্গীত হয় তবে এমন গান গাওয়াও জায়েজ আছে। কিন্তু ঢালাওভাবে যে কোনো গান গাওয়া জায়েজ নেই। শুধুমাত্র হাদি-তামাশা ও চিত্তবিনোদনের নামে বর্তমান যুগে যে সব গান গাওয়া হচ্ছে এর অধিকাংশই অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী গান। সুতরাং এগুলো গাওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

উল্লিখিত হাদীসে যে গানের উল্লেখ রয়েছে তাতে অশ্লীলতার কিছুই ছিল না, একদিকে গায়িকাদ্বয় ছিল নাবালেগ-অল্পবয়স্ক মেয়ে, অপরদিকে তাদের গানের বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যুদ্ধে তাদের সৈনিকদের বীরত্ব পূর্ণ কীর্তিগাঁথা শ্রোক। সুতরাং একে সরাসরি গানও বলা যায় না। এ জন্য মহানবী ﷺ এতে বাধা প্রদান করেননি। মোটকথা, যে গানের গায়ক বা গায়িকা অল্প বয়সের তথা নাবালেগ কচি ছেলে-মেয়ে হয় এবং তাতে ইসলামি ও জিহাদী প্রেরণা যোগায় সেই গান জায়েয হওয়ার মধ্যে কারো মতভেদ নেই।

اَتْرَأَلِ الْاَنْبِيَاءَ فِي السَّاءِ وَالطَّبْلِ গান-বাদ্য সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও ইব্রাহিমের ফিকহবিদ আদিমগণ বলেন, গান-বাদ্য হারাম। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, মাকরুহে তাহরীমী। হানাফীগণ বলেন, যে সমস্ত হাদীসে গান- বাদ্য মুবাহ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আল্লাহর কালাম الْحَدِيثِ لَهْمُ الْحَدِيثِ দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। কেননা সমস্ত মুফাসসিরীন বলেন, لَهْمُ الْحَدِيثِ দ্বারা গান-বাদ্যকেই বুঝানো হয়েছে।

اَتْرَأَلِ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيَّ الْغَنَاءِ وَالطَّبْلِ গান-বাদ্য সম্পর্কে ফকীহদের ফতোয়া : কাযী খান তার ফতওয়ার কিতাবে বলেছেন যে, গানের স্বর শোনা হারাম। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন كُنْتُ رَأَى الْغَنَاءَ وَاسْتَبْدَأَهُ كُنْتُ رَأَى الْغَنَاءَ اَرْثَاً গান শোনা হারাম, সেই আড্ডা আসরে বসা ফাসেকী এবং তা হতে স্বাদ গ্রহণ করা বা বাহ বাহ দিয়ে উৎসাহিত করা কুফরি। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, যখন মহানবী ﷺ গানের স্বর-শব্দ শুনতেন তখন তিনি অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণেয় বন্ধ করতেন। এরই প্রেক্ষিতে হিদায়ত বর্ণিত আছে, এটাই গান হারাম হওয়ার দলিল। তাফসীরে আহমদীতে আছে, গান গাওয়া ও শোনা হারাম এবং তাতে স্বাদ গ্রহণ করা কুফরি। দূররে মুখতার, গায়াতুল আওতার ও মেয়াতে মাসায়েল ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, গান-বাদ্য মানুষের মনে 'নেকাফের' জন্ম দেয়, যেমন- পানি ঘাস-ফসলকে জন্ম দেয়। এরূপভাবে তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খায়েন, মাদারেক ইত্যাদি কিতাবে গান-বাদ্য হারাম হওয়ার পক্ষে অনেক দলিল এবং বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে আমাদের কথা হলো, আলোচ্য হাদীসটিও কেন্দ্র করে অনেক গান-বাদ্য জাজেজ হওয়ার দলিল করেন বিধায় এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

উল্লেখ্য যে, হযরত আবু বকর (রা.) এ জনোই বালিকাদের গান গাইতে বাধা দিয়েছিলেন যে, তিনি জানতেন, রাসূল ﷺ গান-বাদ্য পছন্দ করেন না। আর এখন তিনি ঘুমাম্বেনে বিধায় বাধা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু হুজুর ﷺ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈদের দিন আর অন্য কোনো দিন সমান নয়। ঈদের দিন এরূপ লোকের পক্ষে এরূপ নির্দোষ গান এবং এরূপ সাদামাঠা বাজনা দৃশ্যীয় নয়। হযরত আয়েশা (রা.) এ পার্থক্য জানতেন বলে বাধা দেন নি। মোটকথা, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, গান-বাদ্যে অভ্যস্ত নয় এরূপ বালক-বালিকা যদি ঈদ-উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের আনন্দে কোনো নির্দোষ গান করে আর অন্যেরা তা উপভোগ করে তা দৃশ্যীয় নয়। তবে গানবাদ্যকে ব্যবসায় পরিণত করা বা জাতিতে তাতে অভ্যস্ত করে তোলার অনুমতি এ হাদীস থেকে কখনো পাওয়া যায় না। বুখারীর অপর রেওয়ায়াতে এ হাদীসেরই শেষের দিকে আছে, رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ آتَرَ آتَرَ آتَرَ آتَرَ آتَرَ আর তারা গায়িকা ছিল না- অর্থাৎ, গানের সুর স্তর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল না। বালিকাসুলভ মনের আনন্দে তারা যা তা করে একটি গান গাইতে ছিল।

عَنْ أَنَسٍ -এর পরিচিতি : বু'আস মদীনা হতে আনুমানিক দুই মাইল দূরে একটি স্থানের নাম। কারো মতে এটা 'আওস' সম্প্রদায়ের একটি কিল্লা বা দুর্গের নাম। আবার কারো মতে এটা বনী জুরাইযার একটি বিশেষ জায়গার নাম, যেখানে তাদের অনেক মাল-সম্পদ ছিল। ইসলামের পূর্বে মদীনার বিশেষ শক্তিশালী 'আওস ও বাযরাজ' এই দুই গোত্রের মধ্যে সেখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ফলে তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১২০ (একশতবিশ) বছর পর্যন্ত শত্রুতা ও যুদ্ধ চলতে থাকে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও সেই পুরাতন শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এরই প্রেক্ষিতে কুরআনে নাজিল হয়, فَالْتَّيَّابُ الَّذِينَ أَمْسَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بِسَيْنٍ قُلُوبِكُمْ (الآية) এতে তারা পরস্পর যুদ্ধে নিজে দলের সৈন্যদের মধ্যে উদ্দীপনা ও বীরত্বসম্ভার মূলক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং প্রতিপক্ষের কুসো ও দুর্নাম ছড়ানো কবিতা আবৃত করেছিল। অবশেষে সেই কবিতাগুলো তাদের প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। উক্ত ঈদের দিন বালিকাযয় সেই দিনের আবৃত কবিতাগুলো আবৃত করার সময় হযরত আবু বকর তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ثَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَرًّا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৪৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না; যতক্ষণ না তিনি কয়েকটি খেজুর খেতেন। তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন [অর্থাৎ তিনটি, পাঁচটি, সাতটি কিংবা নয়টি]।
-বুখারী]

وَعَنْ ۱۳৫২ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا
أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا
فَلْيَذْبَحْ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৫২. অনুবাদ : হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ
আল-বাজালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে পশু জবাই করল,
সে যেন [নামাজের পরে] এর স্থানে আর একটি পশু জবাই
করে [কারণ তার প্রথম জবাই কুরবানি হয়নি]। আর যে
ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়া পর্যন্ত জবাই করেনি, সে যেন
আল্লাহর নামে জবাই করে [কারণ তার এটা কুরবানি বলে
গ্রাহ্য হবে]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শরিহ হাদীসের ব্যাখ্যা : কুরবানি করার নিয়ম হলো ঈদের নামাজের পরে, এর পূর্বে কুরবানি করা জায়েজ নয়।

وَعَنْ ۱৩৫৩ الْبَرَاءِ (رَض) قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
فِيأَمَّا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ
الْمُسْلِمِينَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৫৩. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি
নামাজের পূর্বে জবাই করলে সে নিশ্চয়ই নিজের [খাওয়ার]
জন্যই জবাই করল এবং যে নামাজের পরে জবাই করে
তার কুরবানি সম্পন্ন হবে এবং সে মুসলমানদের নীতি
পালন করল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির সময় নিয়ে ইমামদের মতভেদ : এই মতের উপর সকল ইমাম একমত যে, 'ইয়াওমুন নাহর' অর্থাৎ দশ
তারিখের সুবাহে সাদেকের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করা জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সূর্য ঘখন এক তীত্র
পরিমাণ উপরে উঠে তখন কুরবানির ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু' রাকাত নামাজ ও সংক্ষিপ্ত দু'টি খোতাবা দান করা পরিমাণ সময়
অতিক্রম হয়ে গেলে কুরবানি করতে পারে, চাই এ সময়ের মধ্যে ইমাম নামাজ আদায় করুন বা না করুন। এ পরিমাণ সময়
অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি জবাই করে তবে কুরবানি হবে না। চাই সে শহরবাসী হোক কিংবা মফঃ্বলের অধিবাসী হোক।
কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, কুরবানি সহীহ হওয়ার জন্য ইমামের নামাজ পড়া ও খোতাবা প্রদান
সমাপ্ত করা শর্ত। এর পূর্বে জবাই করলে কুরবানি আদায় হবে না। কেননা, হাদীসের মধ্যে الصَّلَاةِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ
পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এ হাদীস ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

وَعَنْ ۱৩৫৪ ابْنِ عَمْرٍ (رَض) قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৫৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে
জবাই করতেন এবং নহর করতেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শরিহ হাদীসের ব্যাখ্যা : কষ্ট ও স্বাস নাদীর মধ্যস্থলে কাটাকে 'জবাই বলে। এটা গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিতে
করতে হয়। দুই হাতের মধ্যস্থলে সিনায়া ছুরি ঝারাকে 'নহর' বলে। উটকে নহর করতে হয়। অবশ্য উটকে জবাই করাও
জায়েজ আছে। মদীনার ঈদগাহে হজুর ﷺ-এর হজুরা শরীফের অতি নিকটে ছিল বিধায় তিনি সেখানে কুরবানি করতেন।

الثَّانِي : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٥٥ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَا الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায়া আগমন করলেন, তখন তাদের অর্থাৎ মদীনাবাসীদের এমন দুটি দিন নির্ধারিত ছিল, যে দিনগুলোতে তারা খেলাধুলা ও রং-তামাশা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের এ দুটি দিন কিরূপ? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা ও রং-তামাশা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঐ দিনদ্বয়ের পরিবর্তে এর চাইতে ভাল দুটি দিন দান করেছেন— ঈদুল আজহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। সুতরাং তোমরা জাহেলিয়াত যুগের সে দুই দিনকে ত্যাগ করে এ দুই দিনকে পালন কর। —[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هاشمীসের ব্যাখ্যা : এতে বুঝা গেল যে, জাহিলিয়াত যুগের কোনো জাহেলী নিদর্শনকে রক্ষা করা এবং কাফির-মুশরিকদের উৎসবে-পার্বনে যোগদান করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। আর মুসলমানদের কোনো উৎসবেই আত্মাহর সঞ্চরণ ছাড়া হওয়া উচিত নয়। তাই মুসলমানদের ঈদের দিন ইবাদতের দিনও বটে।

وَعَنْ ١٣٥٦ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَصَلِّيَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِمِيُّ)

১৩৫৬. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন নামাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি কিছু খেতেন। আর ঈদুল আযহার দিন কিছুই খেতেন না যে পর্যন্ত ঈদের নামাজ আদায় করতেন। —[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির ঈদে সকাল বেলায় কিছু না খেয়ে থাকা এবং নামাজের পর সকাল সকাল কুরবানি করে আত্মাহর বেয়াকফত অর্থাৎ কুরবানির গোশত ঘারা খাদ্য গ্রহণ করা ঈদুল আযহার সন্নত এবং আত্মাহর তাহীমের নিদর্শন।

وَعَنْ ١٣٥٧ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأَوَّلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِمِيُّ)

১৩৫৭. অনুবাদ : হযরত কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ হতে, তিনি তাঁর পিতামহ [আমর ইবনে আওফ মুযানী] হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ উভয় ঈদের নামাজেই প্রথম রাকাতে কেরাত পাঠের পূর্বে সাতবার তাকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী রাকাতে কেরাত পাঠের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন। —[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ঈদের নামাজে মোট কয় তাকবীর বলতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, তা নিম্নরূপ-

مَذْعَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ وَعَبِيدُ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, ইসহাক, মদীনার সাত ফকীহ, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, যুহরী, হযরত আয়েশা (রা.), যারুদ ইবনে সাবেত (রা.), আবু আইয়্যুব (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ওমর (রা.) প্রমুখের মতে ঈদের দু' রাকাতের প্রথম রাকাতে কেবরাতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেবরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতে হবে। তাঁরা আলোচ্য হাদীসটিসহ নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন।

- (১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّصَّاءِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَابِيهَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
- (২) عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِي خَمْسًا -

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.), সুফইয়ান সওরী (র.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবু মাসউদ আনসারী (রা.) আবু মুসা আশআরী (রা.) প্রমুখের মতে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর কেবরাত পাঠের পূর্বে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেবরাতের পরে তিন তাকবীর অর্থাৎ দুই রাকাতে ছয় তাকবীর বলতে হবে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

- (১) حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحَدِيثَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حَدِيثُهُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أَكْبِرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ - (الْحَدِيثُ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ)

- (২) أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى أَرْبَعَةِ تَعْرُوفٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ فَقَالُوا سَنَانٌ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ سِيرِينَ فَقَالَ صَدَقَ الْحَدِيثُ -

- (৩) عَنِ النَّعَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ عِيدِ تَكْبِيرِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِرُوحِهِمْ حِينَ أَنْصَرَفَ فَقَالَ لَا تَنْسُوا كَتَّابِي الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَقَبَضَ بِهَا مَهْمًا - (رَوَاهُ الطَّعَالِيُّ)

উক্ত হাদীসসমূহ আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসসমূহ যথেষ্ট দুর্বল বা দলিল যোগ্য নয়, অথবা পরবর্তী হাদীস দ্বারা সেগুলো মনসুখ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١٣٥٨ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِقْبَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ - (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

১৩৫৮. অনুবাদ : হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম করে বলেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) দুই ঈদের নামাজে এবং ইত্তিস্কার নামাজে সাতবার ও পাঁচবার তাকবীর বলেছেন, খোতাবার পূর্বে নামাজ পড়েছেন এবং কেবরাত সশব্দে পাঠ করেছেন। -[শাফেয়ী]

وَعَنْ ۱۳৫৭ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحَدِيثَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يَكْبُرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حَدِيثُهُ صَدَقَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩৫৯. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল আ'স (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত আবু মুসা আশ'আরী ও হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আজহায় ও ঈদুল ফিতরে কিভাবে [কতবার] তাকবীর বলতেন? তখন হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) বললেন, তিনি চারবার তাকবীর বলতেন, যেক্ষণ তিনি জানাযার তাকবীর বলতেন। এটা শুনে হযরত হুযাইফা (রা.) এর সমর্থন করে বললেন যে, তিনি সত্য কথা বলেছেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحديث هাদীসের ব্যাখ্যা : 'চার তাকবীরের' মধ্যে প্রথম রাকাতের তাকবীরে তাহরীমা এবং দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরে রুকুও शामिल রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতি রাকাতে তিনটি করে অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক গ্রন্থে সহীহ সনদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ দ্বিতীয় রাকাতে কেবল পাঠের পরই তাকবীর বলেছেন। মোট কথা, হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ বিভিন্ন সময় ঈদের নামাজে বিভিন্ন সংখ্যায় তাকবীর বলেছেন। এর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র.) চার তাকবীর বিশিষ্ট হাদীস এবং অপর তিন ইমাম সাত ও পাঁচ তাকবীর বিশিষ্ট হাদীসকে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকে নিজেদের অভিমতের সপক্ষে দলিলও পেশ করেছেন।

وَعَنْ ۱৩৬০ الْبَرَاءِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৩৬০. অনুবাদ : হযরত বার্বা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে ঈদের দিনে একটি ধনুক প্রদান করা হলো রাসূল এর উপর ভর দিয়ে খোতবা দান করলেন। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ ۱৩৬১ عَطَاءٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَغْتَمِدُ عَلَى عَنَتِهِ إِعْتِمَادًا . (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

১৩৬১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা (র.) মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ﷺ যখন খোতবা দান করতেন, তখন নিজের নেযা বা বল্গমতুল্যা লাঠির উপর ভর দিতেন। -[ইমাম শাফেয়ী]

وَعَنْ ۱৩৬২ جَابِرِ (رض) قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ

১৩৬২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজে হাজির ছিলাম। দেখলাম তিনি আযান ও একাঘত ছাড়া খোতবা প্রদানের আগে প্রথমে নামাজ পড়লেন এবং যখন নামাজ সমাপ্ত করলেন, তিনি হযরত বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর লোকদেরকে উপদেশ

مَكَّنَا عَلَىٰ يَلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأُنْسَىٰ
عَلَيْهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَحَثُّهُمْ
عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَمَضَىٰ إِلَى النَّسَاءِ وَمَعَهُ
يَلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعظَهُنَّ وَ
ذَكَرَهُنَّ. (رواهُ التَّسَائِيُّ)

দিলেন, [পরকাশের শান্তি ও পুরস্কারের কথা] স্মরণ করিয়ে
দিলেন এবং আত্মাহ তা'আলার অনুগত থাকার জন্য
অনুপ্রেরণা দান করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে
গেলেন তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলেন হযরত
বেলাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে আত্মাহ তাবারাকা
ও তা'আলাকে ভয় করতে আদেশ [পরামর্শ] দিলেন, কিছু
উপদেশ দিলেন এবং [পরকালের শান্তি ও পুরস্কারের কথা]
স্মরণ করিয়ে দিলেন। -[নাসায়ী]

وَعَنْ ۱۳۶۳. أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ
رَجَعِ فِي غَيْرِهِ. (رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

১৩৬৩. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ঈদের দিন এক
রাস্তায় ঈদিগাহের দিকে) বের হতেন তখন অপর রাস্তায়
প্রত্যাবর্তন করতেন। -[তিরমিযী ও দারেমী]

وَعَنْ ۱۳۶৪. أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ
عِيدِ فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ
فِي الْمَسْجِدِ. (رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৬৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন তাদেরকে
বৃষ্টিতে পেল। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে মসজিদের
মধ্যে ঈদের নামাজ পড়ালেন। -[আবু দাউদ ও ইবনে
মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী ও ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ সহ কতিপয় ইমামগণ
বলেন, সর্বাবস্থায় ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা উত্তম। যেমন- অন্যান্য নামাজ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহে নামাজ মসজিদে
পড়াকে উত্তম বলা হয়েছে। কাজেই ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা উত্তম হবে না কেন?

কিন্তু হানাফী মায়হাবের নির্ভরযোগ্য ফাযাতওয়ার কিতাব **الدُّرُ الْمُنْتَخَرُ** -এ উল্লেখ রয়েছে যে, ঈদের নামাজ খোলা
মাঠে-ময়াদনে আদায় করা রাসূল ﷺ -এর সুন্নত।

এরূপভাবে ইমাম মালেক (র.), রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আওলাদগণ এবং মদীনাবাসীরা ঈদের নামাজ ময়াদনে পড়াকে উত্তম
মনে করেন। কারণ মহানবী ﷺ কোনো ওজর ব্যতীত ঈদের নামাজ ময়াদন ছাড়া আদায় করতেন না। হাদীসে এরই প্রমাণ
পওয়া যায়। ইবনে মালেক হতে বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ ঈদের নামাজ মুক্ত ময়াদনে আদায় করতেন তবে যদি বৃষ্টি আসত
তখন মসজিদে আদায় করতেন। তাই হানাফীগণ বলেন, প্রত্যেক শহরে নগরে বা উপকণ্ঠে সর্বত্র ঈদের নামাজ ময়াদনে পড়াই
সুন্নত। বিনা ওজরে ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা মাকরুহ। আত্মামা শাওকানী (র.) বলেন, বিভিন্ন হাদীস হতে বুঝা যায়
বৃষ্টি-বাদলের সময় ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা মাকরুহ নয়।

তবে মক্কাতে ঈদের নামাজ মাসজিদুল হারামে পড়া হতো। মহানবী ﷺ একে পরিবর্তন করেননি। এমনকি সাহাবী,
তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের যুগেও সখানিত ব্যক্তির এ বরখোলাফ করেননি। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী ঈদের নামাজকে
অন্যান্য নামাজের সাথে তুলনা করে মসজিদে আদায় করার যে ধারণা বা কিয়াস করেছেন তা স্পষ্ট হাদীসের খেলাফ হওয়ার
দরুন গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ۱۳۶۵ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ
بِنَجْرَانَ عَجَلِ الْأَضْحَىٰ وَآخِرِ الْفِطْرِ وَ
ذَكَرَ النَّاسُ - (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

১৩৬৫. অনুবাদ : হযরত আবুল হুয়াইরিছ (রা.)
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবনে হায়ম (রা.)-এর
নিকট লেখলেন যে, তখন তিনি নজরানের কর্মকর্তা
ছিলেন, ঈদুল আজহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ে এবং ঈদুল
ফিতরের নামাজ দেরি করে পড়ে আর লোকদেরকে
উপদেশ প্রদান করে। -[শাফেয়ী]

وَعَنْ ۱۳৬৬ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ
عُزْمَةَ لَهٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ
رُكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ
أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَلَالَ بِالْأَمْسِ فَامْرَهُمْ أَنْ
يُنْفِطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَفْدُوا إِلَى
مُصَلَّاهُمْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৩৬৬. অনুবাদ : হযরত আবু উমাইর ইবনে আনাস
তাঁর এক চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, একবার একদল
আরোহী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং এ বলে
সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁরা গতকাল [শাওয়ালের] নতুন চাঁদ
দেখেছেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে আদেশ
করলেন যেন তাঁরা রোজা ভেঙ্গে ফেলে এবং আগামী দিন
সকালে তাঁরা ঈদগাহের দিকে ঈদের নামাজের জন্য
আসে। -[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

التَّالِيَةُ : التَّالِيَةُ

عَنْ ۱۳৬৭ ابْنِ جُرَيْجٍ (رَحِمَهُ) قَالَ
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ
وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَىٰ ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِي عَطَاءٌ
بَعْدَ حِينٍ عَنِ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ
أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ لَأَذَانَ
لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ
وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةً لَا نِدَاءً وَلَا شَيْءَ
وَلَا نِدَاءً يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৬৭. অনুবাদ : [তাবে তাবেয়ী] হযরত ইবনে
জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [তাবেয়ী] হযরত
আতা (র.) আমার কাছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
ও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা
করেছেন যে, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ঈদুল ফিতর
ও ঈদুল আজহার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আযান
দেওয়া হতো না। ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, অতঃপর
আমি তাঁকে [অর্থাৎ আতাকে] এ বিষয়ে কিছুদিন পরে
আবার জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন
যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) আমাকে
বলেছেন যে, ঈদুল ফিতরের জন্য আযান, একামত বা
ডাকাডাকি বা অন্য কিছু নেই, যখন ইমাম নামাজের জন্য
বের হয়, এমনকি নামাজের পরে খোতবার জন্য বের হয়।
মোটকথা সে দিন এলান ও একামত কিছুই নেই।
-[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۳۶۸ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَوَتَهُ قَامَ فَاقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَغْيِرُ ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرَوَانَ بْنَ الْحَكِيمِ فَخَرَجَتْ مُخَاصِرًا مَرَوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرٌ بِنُ الصَّلَاتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلِبْنٍ فَإِذَا مَرَوَانَ يِنَازِعُنِي يَدُهُ كَأَنَّهُ يَجْرُنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أُجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تَرَكْتُ مَا تَعَلَّمْتُ قُلْتُ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بَخِيرٍ وَمَا أَعْلَمْتُ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সর্বপ্রথম কে নামাজের পূর্বে খোতবা শুরু করে : এ কথা বীকৃত যে, উমাইয়া শাসকদের যুগে সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবনে হাকামই ঈদের নামাজের খোতবা নামাজের শুরুতে প্রদান করেছেন, সম্ভবত নামাজের পর জনগণ তা গুনতে অস্বীকারী হতো না। এ জন্যই সে একরূপ করতো, যা সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি তিনি রাজ শক্তি পরেয়াও করেনি।

১৩৬৮. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আজহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন [ঈদগাহের দিকে] বের হতেন, প্রথমে নামাজ পড়তেন। যখন নামাজ সম্পন্ন করে উঠে দাঁড়াতেন এবং জনতার দিকে [খোতবার উদ্দেশ্যে] ফিরতেন আর জনতা নিজ নিজ নামাজের স্থানে বসা থাকত। যদি তাঁর কোনো স্থানে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন থাকত, লোকদেরকে তা বলতেন, অথবা এটা ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে তাও আদেশ করতেন। খোতবাতে তিনি এটাও বলতেন যে, সদকা করো! খয়রাত করো!! দান করো!!! আর দানকারীদের অধিকাংশই হতো মহিলা, অতঃপর তিনি [নিজ বাড়িতে] প্রত্যাবর্তন করতেন।

নিয়ম-পদ্ধতি এভাবেই চলে আসছিল যাবৎ না [খলিফা হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে] মারওয়ান ইবনে হাকাম [মদীনার] প্রশাসক হন। এক ঈদে আমি ও মারওয়ান হাত ধরাধরি করে [ঈদগাহের দিকে] বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে পৌছলাম, দেখলাম কাছীর ইবনে সালুত কাদামাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিষ্কার তৈরি করে রেখেছেন। অতঃপর এমন সময় মারওয়ান আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল যেন সে আমাকে মিষ্কারের দিকে টানছে [খোতবা দানের জন্য] আমি তাকে টানছিলাম নামাজের জন্য। আমি যখন তার এই অবস্থা দেখলাম [অর্থাৎ সে নামাজের পূর্বে খোতবা পাঠ করতে চাচ্ছে] আমি বললাম, ঈদের নামাজ প্রথমে পড়ার কথা কোথায় গেল? তখন সে বলল, হে আবু সাঈদ! আপনি যা জানেন তা এখন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আমি বললাম, কখনও না! সেই আদ্বাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যা জানি তা হতে উত্তম কিছু তোমরা কখনও করতে পারবে না। [পরবর্তী রাবী বলেন] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) একরূপ তিনবার বললেন এবং [ঈদগাহ হতে] চলে আসলেন। —[মুসলিম]

بَابٌ فِي الْأَضْحِيَّةِ

পরিচ্ছেদ : কুরবানি

أَضْحِيَّةٌ -এর সংজ্ঞা : উল্লেখ্য যে, أَضْحِيَّةٌ শব্দটি চারভাবে পড়া যায়, এর প্রথম অক্ষর পেশ অথবা ঘের যোগে। যেমন-
أَضْحِيَّةٌ -এর বহুবচন হলো أَضْحِيَّةٌ وَ أَضْحِيَّةٌ -এর বহুবচন হবে ضَحَايَا যেমন أَضْحِيَّةٌ -এর
বহুবচন أَضْحِيَّةٌ আর চতুর্থত أَضْحَاةٌ -এর বহুবচন أَضْحَى যেমন-أَرْطَى -এর বহুবচন أَرْطَى

এর শাবিক অর্থ হলো- পশু কুরবানি করা। কেননা ضَحَى দুপুর-পূর্বকালীন সময় এ কুরবানি করা হয়। আর শরিয়তের
পরিচাযায় আদ্রাহর নৈকটা লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রাণী, নির্দিষ্ট শর্তনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জবাই করাকে أَضْحِيَّةٌ বলা হয়।
আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٦٩
أَنَسِ (رض) قَالَ قَالَ ضَحَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَيْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ
قَالَ رَأَيْتَهُ وَاضْعًا قَدَّمَهُ عَلَى
صَفَاحِيهِمَا وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৬৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানির ঈদে দুসর
বর্ণের শিংবিশিষ্ট দু'টি দুধা নিজ হাতে কুরবানি করলেন।
[জবাই করার সময়] বিসমিল্লাহ ও আদ্রাহ আকবার
বললেন। রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দেখেছি,
তিনি তাঁর পা [জবাই করার সময়] দুধাঘয়ের পাজরের উপর
রেখেছেন এবং “বিসমিল্লাহ ওয়াদ্রাহ আকবার” বলছেন।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرُّ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে চারটি বিষয় জানা যায়-

১. পশু নিজের হাতে কুরবানি করাই উত্তম।
২. কোনো লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে জবাই করলে নিজের পা দ্বারা চেপে ধরা জায়েজ।
৩. কুরবানির পশুকে জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ ওয়াদ্রাহ আকবার' মুখে বলা সুন্নত। যদিও তা আদ্রাহর উদ্দেশ্যেই কুরবানি করা হয়।
৪. দুধা ভেড়া কুরবানি বা 'দম' ইত্যাদির ক্ষেত্রে বকরির সমতুল্য। বকরি দ্বারা যা আদায় করা যায় দুধা ও ভেড়া দ্বারাও তা আদায় হয়।

وَعَنْ ۱۳۷ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي
سَوَادٍ وَبَبْرُكٍ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ
فَأَتَى بِهِ لِيَضْحَى بِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ
هَلِمِي الْمُدْبِيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا
بِحَجْرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ
فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ دَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ
اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٌ
مُحَمَّدٌ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ -
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি দুধা আনতে আদেশ
করলেন যার শিং আছে, যা কালোতে হাঁটে অর্থাৎ যার পা
কালো, কালোতে বাসে অর্থাৎ যার পেট ও পঁজর কালো,
কালোতে দেখে অর্থাৎ যার চোখ কালো। সুতরাং কুরবানির
জন্য এরূপ একটি দুধা আনা হলো। তখন তিনি বললেন, হে
আয়েশা! ছুরিটা দাও। তারপর বললেন, পাথরের উপরে একে
ধারাল কর। তখন আমি তাই করলাম। অতঃপর তিনি তা
নিলেন এবং দুধাটিকে ধরলেন এবং কাত করে শোয়ালেন।
অতঃপর একে জবাই করলেন, তারপর বললেন- بِسْمِ اللّٰهِ
اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٌ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ,
আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মদ,
মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন ও মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ হতে
গ্রহণ কর। অতঃপর তা দ্বারা তিনি সকলকে খানা খাওয়ালেন।
-[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۳۷ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ
عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الصَّانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৭১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-
তোমরা 'মুসিন্না' ব্যতীত জবাই করো না। কিন্তু যদি
মুসিন্না যোগাড় করতে অসুবিধা হয়, তবে মেঘের
মধ্যে 'জায়আ' গুলো জবাই করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

۱۳۷-এর পরিচয় : الْمُسِنَّةُ বলতে সে সব জন্তুকে বুঝায়, যেগুলো সানা বয়সে পৌছেছে। এরূপ জন্তুর দ্বারা কুরবানি
জায়েজ, তবে এর প্রত্যেক জাতের মুসিন্নার বয়স ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- গরুর মুসিন্না হলো দু' বছর পূর্ণ হয়ে তিন বৎসরে
পড়েছে আর বকরি এবং মেঘের মুসিন্না হলো যেগুলো এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে, আর উটের মুসিন্না হলো পাঁচ
বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পড়েছে।

۱۳۷-এর পরিচয় : الْمُسِنَّةُ বলতে সে সব জন্তুকে বুঝায়, যেগুলো সানা বয়সে পৌছেছে। এরূপ জন্তুর দ্বারা কুরবানি
জায়েজ, তবে এর প্রত্যেক জাতের মুসিন্নার বয়স ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- গরুর মুসিন্না হলো দু' বছর পূর্ণ হয়ে তিন বৎসরে
পড়েছে আর বকরি এবং মেঘের মুসিন্না হলো যেগুলো এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে, আর উটের মুসিন্না হলো পাঁচ
বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পড়েছে।

۱۳৭-এর পরিচয় : الْمُسِنَّةُ বলতে সে সব জন্তুকে বুঝায়, যেগুলো সানা বয়সে পৌছেছে। এরূপ জন্তুর দ্বারা কুরবানি
জায়েজ, তবে এর প্রত্যেক জাতের মুসিন্নার বয়স ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- গরুর মুসিন্না হলো দু' বছর পূর্ণ হয়ে তিন বৎসরে
পড়েছে আর বকরি এবং মেঘের মুসিন্না হলো যেগুলো এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে, আর উটের মুসিন্না হলো পাঁচ
বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পড়েছে।

۱৩৭১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-
তোমরা 'মুসিন্না' ব্যতীত জবাই করো না। কিন্তু যদি মুসিন্না যোগাড় করতে অসুবিধা হয়, তবে মেঘের
মধ্যে 'জায়আ' গুলো জবাই করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

۱৩৭-এর পরিচয় : الْمُسِنَّةُ বলতে সে সব জন্তুকে বুঝায়, যেগুলো সানা বয়সে পৌছেছে। এরূপ জন্তুর দ্বারা কুরবানি
জায়েজ, তবে এর প্রত্যেক জাতের মুসিন্নার বয়স ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- গরুর মুসিন্না হলো দু' বছর পূর্ণ হয়ে তিন বৎসরে
পড়েছে আর বকরি এবং মেঘের মুসিন্না হলো যেগুলো এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে, আর উটের মুসিন্না হলো পাঁচ
বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পড়েছে।

১) প্রকাশ করেন। কারণ হাদীসে মুসিন্না না পাওয়া গেলেই মাত্র মেঘের জায়আ দ্বারা কুরবানি করার হুকুম দেওয়া হয়েছে; কিন্তু
ইমাম নব্বী (র.) বলেন যে, সকল ইমামের মাযহাব এই যে, মেঘের জায়আ সব সময়ের জন্যই যথেষ্ট- অন্য জন্তু পাওয়া
যাক বা না যাক। কেননা হযরত মুজায়েব ইবনে সুলাইম (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম ﷺ বললেন- 'জায়আ'
দ্বারা সেই কাজই সম্পন্ন হয়, যা মুসিন্না দ্বারা সম্পন্ন হয় -[আবু দাউদ]। আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মেঘের জায়আ
[সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, এতে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসের

জবাবে বলা হয়েছে যে, এ হাদীসে মোক্তাহাব বা উস্তমতার জন্য মুসিন্নার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যে, তোমরা মুসিন্না জবাই করবে। তবে হ্যাঁ, যদি মুসিন্না না পাও তবে মেঘের জায়গাই যথেষ্ট। এতে মেঘের কথা প্রকাশে নিষেধ করা হয়নি। যাতে মুসিন্না পাওয়া গেলেই মেঘের জায়গা দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে না, কিন্তু কেউ কেউ এই শর্তরূপে করেছেন যে, ছয় মাস বয়সের হলেও মেঘটি এতটুকু বলিষ্ট হতে হবে যে, দেখতে একে এক বছরের মতোই দেখায়।

وَعَنْ ۱۳۷۲ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رَض) أَن النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا بِقَسِيمِهَا عَلَى صَحَابَتِهِمْ صَحَابًا فَبَيَّعْتِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَحَّ بِهِ أَنْتَ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي جَذَعٌ قَالَ صَحَّ بِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৭২. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানির পশু হিসাবে বক্টনের জন্য তাকে [উকবা-কে] কতকগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। অতঃপর [বক্টন শেষে] একটি এক বৎসরের বাচ্চা বাকি থাকল। তখন তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানি কর। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, [উকবাহ বলেন,] আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগে তো মাত্র একটি 'জায়গা' অর্থাৎ ছয় মাসের বাচ্চা পড়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এটা দ্বারাই কুরবানি করো। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ۱৩৭৩ عِبْنِ عُمَرَ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمِصْلِيِّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

এর পরিচয় : 'الْعَتُودُ' 'আল-আতুদ' অর্থ- বকরির এক বছর বয়সের বাচ্চা। আবার কারো মতে বছরের অধিকঃশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও একে 'আতুদ' বলা হয়, যদিও পূর্ণ এক বৎসর বয়স নাও হয়। আমাদের নিকট সাধারণত এমন বকরি দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয়। তবে এখানে যে, বছরের অধিকাংশ সময় অতিক্রম না হওয়ার পরও উত্বাকে কুরবানি করার অনুমতি প্রদান করেছেন, এটা তার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্বরূপ ছিল। যেমন এক হাদীসে আবু বুরদাকে অনুমতি দিয়েছেন। فَمِنْ جَزَعِ الْمَعَزِ إِذْ بَحَثَهَا وَلَنْ تَجْزَأَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

وَعَنْ ۱৩৭৩ عِبْنِ عُمَرَ (رَض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمِصْلِيِّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৭৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ ঈদগাহেই জবাই ও নহর উভয়টি করতেন।

وَعَنْ ۱৩৭৪ جَابِرِ (رَض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعِيهِ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعِيهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ)

১৩৭৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন- গরু বা গাভী সাত জনের পক্ষ হতে এবং উট সাত জনের পক্ষ হতে কুরবানির জন্য যথেষ্ট। -[মুসলিম ও আবু দাউদ। তবে হাদীসটির উল্লিখিত পাঠ আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।]

وَعَنْ ۱৩৭৫ أُمِّ سَلَمَةَ (رَض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا

১৩৭৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ তারিখ শুরু হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, সে যেন নিজের চুল বা শরীরের কোনো অংশ স্পর্শ না করে। অপর

يَاخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظَفْرًا وَفِي رِوَايَةٍ مَنِ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَارَادَ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এক বর্ণনায় আছে যে, সে যেন চুল না কাটে এবং নখ না কাটে। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি মিলহজের নতুন চাঁদ দেখে এবং কুরবানি করার ইচ্ছা করে, সে যেন নিজের চুল না ছাঁটায় এবং নখসমূহ না কাটে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يَضْحَى أَنْ كُرْبَانِيں কুরবানির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : প্রকাশ্য হাদীসের শব্দ يَضْحَى কুরবানি করা বা না করার ব্যাপার ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো বাধা-নাধিকতা নেই। এতদসত্ত্বেও ইমাম মালেক, আহমদ, শাফেয়ী ও হানাফীদের মধ্য হতে সাহেবাইন বলেন, কুরবানি সন্নত মুয়াক্কাদ। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, সামর্থ্যবান মুকিম নেসাভের মালিকের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার দলিল নিম্নরূপ। যেমন—

১. এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না ঘেঁষে'। কোনো সন্নত তরক্কজনিত কাজের জন্য এত কঠোর নির্দেশ হতে পারে না।
২. সালাতুল ঈদাইনের অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করে তাকে পুনরায় কুরবানি করতে বলা হয়েছে'। যদি কুরবানি বাধ্যতামূলক না হতো তবে এ ধরনের নির্দেশ বাণী থাকত না।
৩. এ ছাড়া কুরবানির আদেশ করে মহান আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْتَ حَرٌّ কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানি ওয়াজিব।
৪. মহানবী ﷺ মদীনায় অবস্থানকালীন দশ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছরই কুরবানি করেছেন, কখনও তরক্ক করেননি। মোটকথা, কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে হাদীস ছাড়া কুরআন ও ইজমা ইত্যাদিতে অনেক প্রমাণই বিন্যাসন রয়েছে। আর যারা يَضْحَى কুরবানি করে না, বরং ইচ্ছাধীন ব্যাপার বলে ধারণা করেছেন, এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে إِرَادَةُ ইরাদা দ্বারা স্বাধীন অর্থতিরায় নয়, বরং অভিশ্রায় ও চেষ্টা বুঝানো হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানি ওয়াজিব।

وَعَنْ ۱۳۷۶ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৭৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই যাতে কোনো উত্তম কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দশদিন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। সাহাবীপণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয় কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে [আল্লাহর পথে জিহাদে] বের হয়েছে। আর এর কিছু নিয়ে ফিরেনি [অর্থাৎ নিজে শহীদ হয়েছে এবং মাল কুরবানি করেছে তার কথা ভিন্ন]। তার আমল এ দশ দিনের আমলের চেয়ে উত্তম বটে।। -[বুখারী]

সহশ্রিষ্ট আলোচনা

العَشْرَةَ مِنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ -এর ব্যাখ্যা : এর দ্বারা কোন মাসের কোন দশ দিন বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা জুলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে; আবার কারো মতে এর দ্বারা রমজানের শেষ দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে। আবার এর উত্তমতার মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন উত্তম। কেননা এর মধ্যে আরাফার দিন রয়েছে। কারো মতে রমজানের শেষ দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর মাঝেই রয়েছে লাইলাতুল কদরের মতো মহামহিমান্বিত রাত। এর সমাধানে বলা যায় যে, দিবসের উত্তমতার প্রেক্ষিতে বৎসরের মধ্যে আরাফার দিন উত্তম এবং রাতের উত্তমতার দিক দিয়ে কদরের রাত উত্তম।

بِالْفَضْلِ الثَّانِي: বিত্তীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) قَالَ ذَبَحَ
التَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ مُوجُوتَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ عَلَى مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَيَذَلِكُ أَمْرُكَ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ
وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِمِيُّ)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِي ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَا
يُضَعُّ مِنْ أُمَّتِي -

১৩৭৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক কুরবানির দিনে দু'টি শিং বিশিষ্ট ধূসর রংয়ের খাসী দু'খা জবাই করলেন। যখন তিনি দু'শাধ্বয়কে কেবলামুখী করলেন, তখন তিনি বললেন, إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَوَاتِ "আমি আমার মুখমণ্ডলকে সেই সত্তার দিকে ফিরালাম যিনি আকাশসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সকল দিক হতে বিমুখ হয়ে ও নিজেকে হযরত ইব্রাহীম দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই। উপরন্তু আমার নামাজ, আমার কুরবানি আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে; যিনি দু' জাহানের প্রতিপালক। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি এরই জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! এটা তোমারই নিকট হতে প্রাপ্ত, তোমারই জন্য উৎসর্গীকৃত, [এটা গ্রহণ কর] মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতগণের পক্ষ হতে 'বিসমিলাহি ওয়াল্লাহু আকবার'। অতঃপর তিনি এটা জবাই করলেন। -[আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ নিজের হাতে জবাই করলেন এবং বললেন, অর্থাৎ বিসমিলাহি ওয়াল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কুরবানি করতে পারেনি, তাদের পক্ষ হতে গ্রহণ কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبِيِّ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 নবুয়তের পূর্বে নবী করীম ﷺ কোন ধর্মের উপর ছিলেন : আমাদের মহানবী
 ﷺ নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে কোন ধর্মে থেকে ইবাদত করেছেন? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তিনি
 হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর শরিয়তের উপর ছিলেন। কারো মতে হযরত মুসার দীনে, আবার কেউ বলেন, হযরত ইসার
 দীনের উপর ছিলেন। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হুজুর ﷺ সাবেক কোনো দীন-শরিয়তের অনুগত ছিলেন না; বরং
 সরাসরি একত্ববাদ ও আল্লাহর উপরে ঈমান রেখেছেন। জীবনে কোনোদিন মূর্তিপূজা করেননি। আর তিনি কী ধরনের ইবাদত
 করতেন তা কোনো মানুষের অবগতির বহির্ভূত। ইবনে বোরহান বলেছেন, হুজুর ﷺ-এর ঈমান ও ইবাদত প্রকৃতি আল্লাহ
 তা'আলা তাঁর অন্যান্য মু'জিয়ার ন্যায় একে গোপন রেখেছেন। সুতরাং নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি ছিলেন ওলী, চল্লিশ বছর পর
 হয়েছেন নবী। সুরায়ে মুন্সাসির নাজেল হওয়ার পর হয়েছেন 'রাসূল'। শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী (র.)
 বলেছেন, তিনি দীনে ফিতরাতেই উপর থেকে দীনে ইবরাহীমের অনুসারী ছিলেন। আর সে দীন মনসুখ বা রহিতও হয়নি।
 কেননা হযরত মুসা ও ঈসা (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী; ইবরাহীমের পুত্র তথা ইসমাইলের দীনের বা শরিয়তের নবী
 ছিলেন না। কাজেই বনী ইসরাঈলের নবীদের দীন রহিত হয়ে গেলেও ইসমাইলের বা ইবরাহীমের দীন রহিত বা মনসুখ
 হয়নি। সুতরাং মহানবী ﷺ মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর থেকে চল্লিশ বছর ইবাদত করলে কোনো মনসুখ দীনের উপর আমল
 করার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

وَعَنْ ۱۳۷۸ حَنِيشٍ (رحم) قَالَ رَأَيْتُ
 عَلِيًّا يَضْحَى بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ
 مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَانِي
 أَنْ أُضْحِيَ عَنْهُ فَإِنَّا أُضْحَى عَنْهُ. (رَوَاهُ
 أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

১৩৭৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হানাশ (র.)
 বলেন, একবার আমি হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি দুধা
 কুবানি করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি?
 [অর্থাৎ দু'টি কেন?] আপনার জন্য তো একটাই যথেষ্ট?
 তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসিয়ত
 করেছেন, যেন আমি তাঁর পক্ষ হতে কুরবানি করি।
 সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে [একটি] কুরবানি করছি।
 -আবু দাউদ। আর তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ۱۳۷۹ عَلِيٍّ (رض) قَالَ أَمَرَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنِ
 وَالْأَذْنَ وَأَنْ لَا نَضْحَى بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ
 وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو
 دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ
 وَأَنَّهَتْ رِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَالْأَذْنَ)

১৩৭৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন,
 যেন আমরা [কুরবানির পশুর] চোখ ও কান ভালোভাবে
 দেখে নিই [যেন তাতে কোনো ত্রুটি না থাকে]। আমরা
 যেন জবাই না করি এমন পশু যার কানের অগ্রভাগ কাটা,
 অথবা পিছন দিক হতে কাটা এবং এমন পশুও না, যার
 কান দৈর্ঘ্যে চিরে গেছে অথবা গোলাকার ছিদ্র হয়ে গেছে।
 -[তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]
 কিন্তু ইবনে মাজাহ তাঁর বর্ণনা ওয়াল উয়ন অর্থাৎ "কান
 দেখে নিই" পর্যন্ত শেষ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُحَابَلَةً مُدَابِرَةً مُزَقًّا. وَعَزَقًا:

مُحَابَلَةً: এটা ঐ পক্ষকে বলা হয় যার কানের অগ্রভাগের কিছু অংশ কাটা গেছে এবং অবশিষ্টাংশ খুলে রয়েছে।

مُدَابِرَةً: যে জন্তুর কানের পশ্চাৎভাগ কিছুটা কাটা গেছে আর অবশিষ্টাংশ লটকে রয়েছে।

مُزَقًّا: এটি مُزَقُّن হতে নির্গত, শাদিক অর্থ দ্বিখণ্ডিত আর যে জন্তুর কান দৈর্ঘ্যে কেটে গেছে তাকে বলে।

عَزَقًا: যে জন্তুর কান আড়াআড়িভাবে কাটা গেছে অথবা বৃত্তাকারে ছিদ্র হয়েছে তাকে বলে।

কান কাটার পরিমাণ সম্পর্কে ইয়ামদের মতভেদ: কি পরিমাণ কান কাটা গেলে তার দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয় এ বিষয়ে ইয়ামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

ইয়াম শাফেয়ী (র.) বলেন, এমন ধরনের বকরি দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই, যার কানের কিছু অংশ কাটা গেছে। এমনকি সামান্য কাটাও জায়েজ হবে না। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়েছে, মহানবী ﷺ এমন বকরি বা জন্তু দ্বারা কুরবানি করতে নিষেধ করছেন। যার কানের অগ্রভাগ কিংবা পশ্চাৎভাগ কণ্ডিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কানের সামান্য কিছু কাটা হলেও কুরবানি জায়েজ হবে না।

ইয়াম আবু হানীফা (র.) বলেন, যদি কানের অর্ধেক হতে কম কাটা হয় তবে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে। তিনি হযরত কাভাদা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। হযরত কাভাদা (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে কুলাইবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ 'শিং ও কান-আযবা' জন্তু দ্বারা কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত কাভাদা (রা.) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কানের 'আযবা' কি? তিনি জবাবে বলেছেন, যদি কানের অর্ধেক বা এর বেশি কাটা থাকে তবে তাকে 'আযবা' বলে। এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, যে জানোয়ারের কানের অর্ধেক বা এর বেশি কাটা থাকে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, কানের অর্ধেকের কম কাটা হলে এর দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে। এটাই হানাফীদের মাহযাব।

ইয়াম শাফেয়ী তথা হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের জবাবে হানাফীদের পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে, হাদীসের শব্দ 'মোকাবালা ও মোদাবারা' দ্বারা অর্ধেকের বেশি কাটা গেছে বুঝতে হবে। তা হলে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়ে যাবে। আর যদি কিছু অংশ কণ্ডিত ধরে নেওয়া হয় তখন তা মাকরুহে তানযীহীর জন্য বুঝতে হবে।

وَعَنْ ۱۳۸ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُضَجِّي بِأَعْصَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩৮০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা জন্তু দ্বারা কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ۱۳۸ البراء بن عازب (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا فَأَسَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْسَعَاءُ الْعَرَجَاءِ الْبَيْنِ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنِ عَوْرُهَا وَالْمَرْنِضَةُ الْبَيْنِ مَرْنِضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِي. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّرِمِيُّ)

১৩৮১. অনুবাদ: হযরত বরা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কুরবানির ব্যাপারে কোন ধরনের জন্তু হতে বেঁচে থাকতে হবে? রাসূল ﷺ হাতের দ্বারা [অর্থাৎ চার আঙ্গুল দেখিয়ে] বললেন, চার রকমের পশু হতে— (১) খোঁড়া— যার খোঁড়ামি স্পষ্ট, (২) কানা— যার কানামি স্পষ্ট, (৩) রোগা— যার রোগ স্পষ্ট এবং (৪) দুর্বল— যার হাড়ে মজ্জা নেই।—[মালেক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ عَنْ هَادِيَسَرِ الْبَاثِيَا : হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যা হলেন যে, যেহেতু কান ও লেজ খাদ্য বস্তু, সুতরাং এর বেশির ভাগ কটা গেলে অর্থাৎ না থাকলে কুরবানি হবে না। শিং খাদ্য বস্তু নয়, সুতরাং শিং ভেঙ্গে গেলেও এর দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে। রাসূল ﷺ এর এক্ষেত্রে নিষেধ অনুত্তমতার জন্য। দুর্বল ও ঝোড়া বলতে এরূপ দুর্বল বা ঝোড়া যা কুরবানির স্থান পর্যন্ত যেতে অক্ষম। কানা বলতে যে জন্তুর চক্ষুর জ্যোতি সম্পূর্ণই নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَى بِكَنْشٍ أَقْرَنَ فَحَيْلٌ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْسِي فِي سَوَادٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِي وَأَبْنُ مَاجَةَ)

১৩৮২. অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিং বিশিষ্ট খুব তাজা দুগা দ্বারা কুরবানি করতেন, যা কালো দ্বারা দেখতো, কালোতে খেতো এবং কালোতে হাঁটতে। [অর্থাৎ এর চোখ, মুখ ও পা কালো ছিল।] - [তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ مُجَائِشٍ (رَضِيَ) مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذْعَ يُوقِي مِمَّا يُوقِي مِنْهُ الثِّيَابُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِي وَأَبْنُ مَاجَةَ)

১৩৮৩. অনুবাদ : বনী সুলাইম গোত্রের সাহাবী হযরত মুজাশে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, জায়আ [অর্থাৎ, ছয় মাস বয়সের মোটাতাজা ভেড়া] দ্বারা সেই কাজ সাধিত হবে, যা মুসিন্না [পূর্ণ এক বছরের বকরি] দ্বারা সাধিত হয়। - [আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ عَنْ هَادِيَسَرِ الْبَاثِيَا : ছয়মাস বয়সের ভেড়াকে জঁজ বলা হয়, এ রকম ভেড়াকে যদি দেখতে এক বছরের ভেড়ার মতো মোটাতাজা দেখা যায় তবে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ কিন্তু ছয়মাসের ছাগল মোটাতাজা দেখা গেলেও তার দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَنْعَمُ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّانِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৩৮৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন— ভেড়ার ছয় মাস পূর্ণ বয়সের বাচ্চা কতই না উত্তম কুরবানি? [অর্থাৎ, এরূপ জন্তু দ্বারা কুরবানি জায়েজ।] - [তিরমিযী]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَعَصَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِي وَأَبْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১৩৮৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তখন কুরবানির সময় উপস্থিত হলো। আমরা একটা গাভীতে সাতগন এবং একটি উটে দশগন করে অংশগ্রহণ করলাম। - [তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ] তবে তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

صَلَوْتِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَصَاحِي
 قَدْ دُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْ صَلَوْتِهِ فَقَالَ
 مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ
 فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ
 صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَطَبَ ثُمَّ
 ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
 فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ
 فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখনই তিনি কিছু কুরবানির গোশত দেখতে পেলেন, যা রাসুলের নামাজ হতে অবসর গ্রহণের পূর্বেই জবাই করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে পশু কুরবানি করেছে অথবা রাবীর [সন্দেহ] আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে পশু কুরবানি করেছে, সে যেন এর পরিবর্তে আর একটি জবাই করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত জুনদুব (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানির দিন প্রথমে নামাজ পড়লেন, অতঃপর খোতবা দান করলেন তারপর [পশু] জবাই করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পূর্বে জবাই করেছে অথবা তিনি বলেছেন, আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করেছে সে যেন এর স্থলে আর একটি পশু জবাই করে। আর যে ব্যক্তি জবাই করেনি, সে যেন আন্ডাহর নামে জবাই করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ۱۳۸۹ نَافِعٍ (رحم) أَنَّ ابْنَ عَمَرَ
 (رض) قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ
 الْأَضْحَى (رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَالَ بَلَّغْتَنِي عَنْ
 عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ)

১৩৮৯. অনুবাদ : হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, কুরবানি ঈদুল আযহার দিনের পরও দু' দিন। [অর্থাৎ ১১তম ও ১২তম জিলহজ্জ]-।-মালেক।
 আর তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) হতেও আমার নিকট এরূপ হাদীস পৌছেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির দিন নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ, সুফিয়ান ছাওরী ও সাহেবাব্বিনদের মতে ঈদের দিন ও এর পরে আরও দুই দিন হলো ঈদুল আজহা তথা কুরবানির দিন। অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত কুরবানি করা জায়েজ আছে। তারা ওপরে বর্ণিত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে দলিল গ্রহণ করেন, যেখানে ঈদের দিন ছাড়াও পরের দুই দিন অর্থাৎ ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ তারিখও ঈদুল আজহা হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম কারশীর মুখতাসার গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস, যথা- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, **أَيَّامُ الْأَضْحَى ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ** কুরবানির দিন তিন দিন, তন্মধ্যে প্রথম দিনই সবচেয়ে উত্তম। এছাড়াও হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আকাস (রা.) সহ অনেক সাহাবী ও তাবয়ীগণ এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী, আওযায়ী, হাসান বসরী, আতা এবং আবু সাওরের মতে চার দিন পর্যন্ত কুরবানি করা জায়েজ আছে। (অর্থাৎ কুরবানীর দিনসহ এর পরে তিন দিন ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ পর্যন্ত)। এটাই হযরত আলী এবং ইবনে আকাসের উক্তি ছিল। তারা হযরত জুবাইর ইবনে মুত্যিম (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। তাতে কুরবানির দিনের সাথে আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিনেরও উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি এই-

(۱) عَنْ مُبَيْرِ بْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُلُّ نَجَاحٍ أَى طَرَبِنٍ مَسَى مَخْرُوقِي كُلِّ أَيَّامِ النَّشْرِتِ ذَبْحٌ - (رَوَاهُ ابْنُ جِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ)

এ ছাড়া হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীকের সব কয়টি দিনই জবাইর দিন।

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَبَامُ الْخَثِرِيِّ كُلَّمَا دَبَحَ (أَخْرَجَهُ) ابْنُ عُمَرَ رِيسَ الْكَيْمَلِ

ইবনে সীরীন (র.), হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ও ইবনে আবু সুলাইমান প্রমুখের মতে কুরবানির দিন শুধুমাত্র এক দিন, অর্থাৎ ১০ তারিখের ঈদের দিন। তাঁরা হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। উক্ত হাদীসে আছে, হুজুর ﷺ বিদায় হজের ভাষণে কুরবানির জন্য শুধু ইয়াওমুন নহর উল্লেখ করেছেন।

তাঁদের দলিলের জবাব: ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে ইবনে সীরীন প্রমুখের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের হাদীস অস্বীকার্য। বাবুকা তাঁরা-এর জন্য মনে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলে বুঝা যাবে যে, ঈদুল আজহার দিন হলো পরিপূর্ণ কুরবানির দিন। কুরতুবী (র.) বলেন, কুরআন মাজীদেও আইয়াযে মা লুমা বহবচন দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সুতরাং একদিন হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, তিনি যে হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িমের হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন বাযযার (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি মুনকাতে। হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান ইবনে হুসাইনের সাথে যুবাইরের সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিলে উল্লিখিত হাদীসকেও নাসায়ী, ইবনে মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাদীন দুর্বল বলেছেন।

وَعَنْ ۱۳۹. ابْنِ عَمْرٍ (رض) قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يَضَعِي. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৩৯০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছরই কুরবানি করেছেন।

وَعَنْ ۱۳৯. زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ (رض) قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِذِهِ الْأَضَاحِي قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالضُّرُوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৯১. অনুবাদ: হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কুরবানি কি? রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সন্নত [রীতিনীতি]। তাঁকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে আমাদের কি [পূণ্য রয়েছে]? রাসূল ﷺ বললেন, [কুরবানির জন্তুর] প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। তাঁরা আবারও বললেন, পশম বিশিষ্ট পশুর বেলায় কি হবে? [এদের তো পশম অনেক বেশি]। রাসূল ﷺ বলেছেন, পশমওয়াল পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রয়েছে।-[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: একবার সাহাবীগণ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, مَا هِذِهِ الْأَضَاحِي এই কুরবানি কি? এটা কি আমাদের শরিয়তের বিধান নাকি অতীত কোনো শরিয়তের বিধান? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন যে, سُنَّةُ أَبِيكُمْ ইব্রাহীম এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর সন্নত। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল যে, এতে কি কোনো ছওয়াব রয়েছে? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন যে, এর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে ছওয়াব রয়েছে, কাজেই প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উচিত কুরবানি করে ছওয়াব অর্জন করা।

بَابُ الْعَتِيرَةِ

পরিচ্ছেদ : রজব মাসের কুরবানি

জাহিলিয়া যুগে আরবগণ রজব, জিলকাদ, জিলহজ ও মুহাররম এ চার মাসকে বিশেষভাবে মর্যাদা প্রদান করত, এই চার মাসের প্রথম রজব মাসের সম্মানার্থে তারা একটি জবাই করত, আর একেই **عَتِيرَةٌ** বলা হতো। ইমাম খাত্তাবী এ মতই ব্যক্ত করেছেন। অপর একদলের মতে **الْمَعْتِيرَةُ** সেই জবাইকৃত পশুকে বলা হয়, যা প্রাক ইসলামী যুগে আরব তাদের বিভিন্ন দেব- দেবীর নামে উৎসর্গ করত এবং তার রক্ত সেই সব দেব-দেবীর মাথায় ঢেলে দিত।

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ রজব মাসে আঞ্জাহর নামে ছাগল ভেড়া কুরবানি করতো, আর একে রজবিয়াও বলা হতো, কিন্তু পরবর্তীতে এটা মনসূখ বা রহিত হয়ে যায়। এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الفصل الأول : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ أَوْلُ رَيْلَجٍ كَانَ يَنْتَجِعُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاعِيهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯২. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এখন আর ফারাও নেই এবং 'আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন, 'ফারা' হলো গবাদি পশু তথা ছাগল, ভেড়া ও উটের প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের তাওতের [অর্থাৎ ঠাকুর-দেবতার] নামে উসর্গ করত। আর 'আতীরা' হলো যা তারা রজব মাসে উৎসর্গ করত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফারা ও আতীরা -এর অর্থ : উল্লেখ্য যে, **الْفَرَعُ** -এর অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ফারা জন্তু-জানোয়ারের সেই প্রথম বাচ্চাকে বলা হয়, যা এই নিয়তে জবাই করা হয় যেন এর মা'র মধ্যে বরকত হয় এবং অধিক বাচ্চা-প্রসব হয়। অধিকাংশ ভাষাবিদ এবং ইমাম শাফেয়ী (রা.) ও তাঁর অনুসারীরা এ মতই ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে **الْفَرَعُ** উটের প্রথম বাচ্চাকে বলা হয়। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে এ ধরনের ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আবু দাউদে আরো একটি দীর্ঘ করে বলা হয়েছে যে, **الْفَرَعُ** হলো উটের সেই প্রথম বাচ্চা যা দেবদেবীর নামে জবাই করে এর গোশত ভক্ষণ করে এবং তার চামড়া গাছের উপর রেখে দেওয়া হয়। আবার কেউ বলেন, উট একশত বাচ্চা দেওয়ার পর যে বাচ্চাটি প্রসব করত জাহিলিয়া যুগের লোকেরা সেই বাচ্চাটিকে জবাই করত, একে তারা **فَرَعٌ** হিসাবে আখ্যায়িত করত।

الفصل الثاني : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ (رَضًا) قَالَ كُنَّا وَكُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً هَلْ تَذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تَسْمُونَهَا الرَّحِيَّةُ.

১৩৯৩. অনুবাদ : হযরত মুখান্নাফ ইবনে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান করছিলাম। তাঁকে বলতে শুনলাম—হে লোক সকল! প্রত্যেক গৃহবাসীর উপর প্রত্যেক বছর এক কুরবানি ও এক আতীরা ওয়াজিব। তোমরা জান আতীরা কি? এটা সেই জিনিসই যাকে তোমরা রজবিয়া বলে

بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ

পরিচ্ছেদ : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ

এই মহাবিশ্বের বিশাল রহস্যরাজির মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র মহাকুদরতের দু'টি নিদর্শন, এদের গ্রহণও এক রহস্যময় ব্যাপার, প্রত্যেকটি গ্রহ ও উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে অবিরতভাবে পরিভ্রমণ করে, এই ক্রমাবর্তনকালে সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী নিজ কক্ষপথে একই সরল রেখায় যখন মিলিত হয় এবং চন্দ্র উভয়ের মধ্যখানে থাকে তখন সূর্যগ্রহণ হয়; আর যখন পৃথিবী মধ্যখানে থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়; আর এই দুই সময়ে যে নামাজ পড়া হয় তাকে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ বলে। আরবিতে একে বলা হয়, **صَلَاةُ الْخُسُوفِ وَالْكَسُوفِ** তবে খুসুফ ও কুসুফ কোনটি দ্বারা কোন নামাজ বুঝানো হয়, এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ফকীহদের মতে **كُسُوفٌ** সূর্যের সাথে এবং **خُسُوفٌ** চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত।

আর কারো মতে **كُسُوفٌ** ও **خُسُوفٌ** শব্দ দু'টি চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আরেক দল বলেন, **كُسُوفٌ** দ্বারা চন্দ্র গ্রহণ আর **خُسُوفٌ** দ্বারা সূর্যগ্রহণকে বুঝায়। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۳۹۵ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعَتْ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدَتْ سَجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন মহানবী ﷺ একজন ঘোষণক [আহবানকারী] পাঠালেন। সে লোকদেরকে ডেকে বলল, **الصَّلَاةَ جَامِعَةً** নামাজের জামাত প্রস্তুত। লোকজন সমবেত হলো। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং চার রুকু ও চার সেজদাতে দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি কখনও এমন রুকু সেজদা করিনি, যা এই নামাজের রুকু ও সেজদা হতে দীর্ঘতর ছিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুসুফের নামাজের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ : হযরত কাতাদা, আতা, ইবনে আবী রাবাহ, ইসহাক ও ইবনুল মুনিযিরের মতে কুসুফের নামাজ দু' রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে তিন তিনটি রুকুসহ মোট ছয় রুকুতে তা সমাপন করতে হয়। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীস— (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (۱)

(۲) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) أَنَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِيَّتْ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

আল্লামা তাউস, হাবীব ইবনে আবী সাবেত, আব্দুল মালেক ইবনে জুরাইজ প্রমুখের মতে কুসুফের নামাজ প্রত্যেক রাকাতে চারটি করে মোট আট রুকুর মাধ্যমে সমাপন করতে হয়। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীস—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِينَ رَكَعَاتٍ أَوْ رُكُوعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবু হুরাইর ও লাইস ইবনে সা'দ (র.)-এর মতে কুসুফের নামাজের প্রত্যেক রাকাতে দু'টি রুকু করে মোট চারটি রুকুর মাধ্যমে দু' রাকাত নামাজ সমাপ্ত করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীস—

- (১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ الشَّمْسَ خَفَّتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ سَادِيًا الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (أَبَى رُكُوعًا) فِي رُكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
- (২) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِخْسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى وَالنَّاسُ مَعَهُ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِيَامَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُو الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইমাম আবু হানীফা, সুফইয়ান সওরী, সাহেবাইন, ইব্রাহীম নাখরী (র.) প্রমুখের মতে কুসুফের অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের নামাজও স্বাভাবিক নামাজের ন্যায়। অর্থাৎ দু' রাকাত দু' রুকুতে সমাপন করতে হবে। তাঁদের দলিলসমূহ হলো-

- (১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ إِخْسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّيْسَانِيُّ)
- (২) عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَزَمُنْ غَرْضَيْنِ لَنَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدَرُ رُكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَمِنَ النَّاطِرِ مِنَ الْأَمِينِ فَأَذَا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَارَزَ فَصَلَّى قِيَامًا يَنَا كَمَا طَوَّلُوا مَا قَامَ يَنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ رَكَعَ يَنَا كَمَا طَوَّلُوا مَا رَكَعَ يَنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ سَجَدَ يَنَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْسَانِيُّ)
- (৩) عَنِ التَّمِيمِ بْنِ بَخِيرٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ أَيْ الْخُسُوفَ فَصَلُّوا كَأَحَدِ صَلَاةِ صَلَاتِكُمْ مَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ . (رَوَاهُ التَّيْسَانِيُّ)

মোটকথা, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তাঁর মতের অনুসারী অন্যান্যদের মতে কুসুফের নামাজ অন্যান্য নামাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ব্যতিক্রমের জন্য সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ প্রমাণ আবশ্যিক। অথচ ব্যতিক্রমের হাদীসসমূহ নিঃসন্দেহ নয়। একাধিক রুকুর হাদীসগুলো মুখতারিবে। কোনোটিতে দুই, কোনোটিতে তিন, কোনোটিতে চার, আবার কোনোটিতে পাঁচ রুকুর কথা রয়েছে। অথচ ঘটনা বিভিন্ন ছিল বলেও কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম নববী (র.) এ দাবি করলেও মোস্তা আলী কারী দশ বছরে পাঁচ-ছয়বার সূর্য গ্রহণের দাবিকে অস্বীকার করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ রুকু আসলে একটাই করেছিলেন। কিন্তু বিশাল সমাবেশে স্বাভাবিক দীর্ঘ রুকু হওয়ায় পেছনের মুসল্লীদের বিভ্রান্তি হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বালক হওয়ার কারণে এবং হযরত আয়েশা (রা.) নারী হওয়ায় সারির পেছনে ছিলেন।

وَعَنْهَا ۱۳۹۶ قَالَتْ جَهْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَةِ تَبَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণকালীন নামাজে কেবল সশব্দে পাঠ করেছিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আপোচনা

কুসুফ ও বুসুফের নামাজে কেবল সশব্দে কুরআন পাঠ করা হয়। ইমাম আহমদ, ইসহাক, সাহেবাইন, ইবনে খুযাইমা প্রমুখের মতে সূর্য গ্রহণের নামাজে কেবল সশব্দে পড়তে হয়। তাঁদের দলিল হলো-

- (১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَهْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَةِ تَبَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
- (২) وَرِيسَ الْفَخَاوَرِيِّ أَنَّهُ عَلِيٌّ (رض) جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ .

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ ফকীহদের মতে সূর্যগ্রহণের নামাজের কেবল সশব্দে পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো-

(১) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ الْفَخَاوَرِيِّ عِنَّمَا أَلْتَرَادُ هُوَ الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ -

(২) عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ لَا تَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْسَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

رَأَيْتَ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ
 أَنْفَعُ وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا
 بِسْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ فَيُنْفِل
 يَكْفُرْنَ يَا لِلَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ
 وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ
 الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ
 مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আর এর অধিকাংশ অধিবাসীকেই দেখলাম নারী।
 তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, (হে আল্লাহর রাসূল! এর
 কারণ কি? হুজুর ﷺ বললেন, তাদের কুফরির কারণে।
 তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তারা কি আল্লাহর কুফরি করে?
 তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের কুফরি করে থাকে
 এবং তাদের স্বামীদের অনুগ্রহের অস্বীকার করে থাকে।
 কোনো এক মহিলাকে যদি তুমি এক দীর্ঘ সময় [একযুগ
 বা এক শতাব্দী অথবা আজীবন] এহসান বা অনুগ্রহ করে
 থাক; অতঃপর সে যদি তোমার নিকট হতে সামান্য একটু
 ক্রটি দেখতে পায় তখন সে নিঃসন্তোষে বলে উঠে, আমি
 তোমার কাছ হতে কখনও কোনো ভাল কিছু পেলাম না।
 -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজে প্রতি রাত্তরে দুই রুকু করেছেন। অথচ অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাজের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এক রুকু সহকারে রাসূল ﷺ নামাজ পড়েছেন। অনাথা নামাজ সাধারণ নিয়মে প্রতি রাত্তরে এক এক রুকু ধারাই পড়া হয়েছে, যা হানাফীগণ বলেন। তবে সে দিনকার ঘটনা হলো এই যে, নামাজ ছিল অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘতম, যে পরিমাণ কেয়াম ছিল দীর্ঘক্ষণ, অদ্রুপভাবে রুকুও ছিল খুব লম্বা। পিছন হতে কোনো কোনো নামাজি মাথা তুলে চাইতেন, ইমাম এখন কি অবস্থায় আছেন। যখন দেখতেন যে, ইমাম এখন রুকুতে আছেন তখন তিনি পুনরায় রুকুতে চলে যেতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বালক হওয়ার দরুন এবং হযরত আয়েশা (রা.) নারী হওয়ার দরুন সমস্ত সারির পিছনেই ছিলেন। তাঁরাও এরূপভাবে বারবার রুকু হতে মাথা তুলে ধারণা করে নিয়েছেন যে, এবার আর একটি রুকু হলো। এভাবে হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা.) দুই দুই বার করে চার বার, মাথা তুলে দেখেছিলেন এবং প্রত্যেক বার সম্মুখের সারির কোনো না কোনো লোককে পুনঃ পুনঃ রুকু করতে দেখে তাকে বারবার রুকু করা হয়েছে বলে প্রকাশ করেছেন।

সঠিক উত্তর এই যে, সালাতুল কুসুফের রুকুর সংখ্যা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফিল্মী হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী। কেননা, ঐ সকল রেওয়াজে প্রতি রাত্তরে এক থেকে পাঁচ রুকু পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রুকুর সংখ্যা নির্ণয়ে এ হাদীসগুলো থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। কাজেই এক্ষেত্রে কাওলী হাদীসগুলোকে গ্রহণ করা উচিত। কেননা, সেগুলো এরূপ পরস্পর বিরোধী বর্ণনা নেই। এ ছাড়া কাওলী হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কাওলী হাদীস প্রধান পায়। সুতরাং কাওলী রেওয়াজের উপর ভিত্তি করে প্রতি রাত্তরে এক রুকু প্রমাণিত হবে, যা পূর্বে বর্ণনা হয়েছে।

لَا تَحْسَبُ لَبَنًا لَبَنًا وَرَأَيْتَ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ -এর ব্যাখ্যা : জাহেলিয়া যুগে আরবদের এই ধারণা বদ্ধমূলভাবে চলে আসছিল যে, কোনো মহাপুরুষের মৃত্যুর কারণে মানুষ যেমন শোকে মুহাম্মাল হয়ে পড়ে, চন্দ্র-সূর্যও অদ্রুপভাবে শোকাভূত হয়ে পড়ে এবং তা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের আকারে প্রকাশ পায়। ঘটনাচক্রে দশম হিজরিতে জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু দিবসে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে হুজুর ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীও তাদের পূর্বকার ধারণা অনুযায়ী এমন কিছু ভাবতে লাগলেন যে, আল্লাহর নবীর পুত্রের মৃত্যুর কারণে এই মহাঘটনা ঘটছে। তখন আল্লাহর নবী তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বললেন, 'গ্রহণ' কারও মৃত্যুর বা জন্মের কারণে হয় না বরং এটা নভোমণ্ডলীয় কারণে হয়ে থাকে, আল্লাহর বিশেষ কুদরতে এটা ঘটে।

চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জামাত সম্পর্কে মতানৈক্য : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবু সাওরের মতে সূর্যগ্রহণের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণের নামাজও জামাতে পড়তে হয়। তাঁদের দলিল হলো-

(১) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (رحم) قَالَ خَصَفَ الْقَمَرُ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ يَا بَصْرَةَ فَصَلَّى بِنَا رَمَعْتَيْنِ فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَنَا . (الْحَدِيثُ)

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى كُسُوفَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِ رَمَعَاتٍ . (الْحَدِيثُ)

ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.) বলেন, চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য জামাতের প্রয়োজন নেই। তাঁদের দলিল হলো-

(১) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ صَلَاةٍ لَمْ يَنْبَغِ فِيهَا الْمَكْتُوبَةُ

(২) قَالَ سَأَلَ لَمْ يَبْتِغْنَا وَلَا أَهْلَ بَلَدِنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمَعَ لِكُسُوفِ الْقَمَرِ وَمَا يُقَالُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدُ . এ ছাড়াও তাঁরা বলেন, চন্দ্রগ্রহণ রাতে হয়ে থাকে। অতএব রাতে মানুষের একসাথে হয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পরে। এ জন্য এর জামাতের প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ١٣٩٨ عَائِشَةَ (رض) نَحَوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ اِنْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فِإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنَى عَبْدَهُ أَوْ تَزِنَى أُمَّتَهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, অতঃপর হুজুর ﷺ সিজদা করলেন এবং সিজদাকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলেন। ততক্ষণে সূর্য দ্বীপ্তিমান হয়ে গেছে। তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দান করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে বা কারো হায়াতের কারণে গ্রহগ্রহণ হয় না। সুতরাং তোমরা যখন এটা [সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ] দেখ তখন আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা কর এবং আল্লাহ আকবার বল, নামাজ পড় এবং দান-সদকা কর। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদের উম্মতগণ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ অপেক্ষা ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তিনি ঘৃণা করেন যে, তাঁর কোনো বান্দা যেনা করবে অথবা তাঁর কোনো বান্দী যেনা করবে। যে জেনা করে। হে মুহাম্মদের উম্মতগণ, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা নির্ধাত কম হাসতে এবং নির্ধাত বেশি বেশি কাঁদতে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْقَيْرُ -এর অর্থ : 'গায়রত' অর্থ- সক্রোধ ঘৃণা। এ শব্দটি সাধারণত মানুষের পারিবারিক মানসঙ্কমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে : কারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষভাবে মা-বোনের ইচ্ছাকৃত নিয়ে ছিনিমিনি করা হলে যে ঘৃণা ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় একে আরবি পরিভাষায় 'গায়রত' বলা হয়। এরূপ বিশেষ অর্থে গায়রত শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। সামাজিকভাবে এর উদাহরণ হলো, যেমন নিজের স্ত্রীর সাথে অব্যক্তিক কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পেলে তখন নিজের মনে যে ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মে একে 'গায়রত' বলা যায়। কোনো বান্দা বা বান্দী জেনায় লিপ্ত হলে আল্লাহও এরূপ ঘৃণা ও রাগের সাথে তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

কুসুফের নামাজে খোতবা প্রদান সম্পর্কে মতানৈক্য : ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে কুসুফের নামাজে খোতবা প্রদান করা মোত্তাহাব। উপরে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীসটিই তাঁদের দলিল।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, এতে খোতবা প্রদান করতে হয় না। তাঁদের দলিল হলো সূর্যগ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে, ডাকবীর বলতে এবং সদকা প্রদান করতে বলেছেন; কিন্তু তিনি খোতবা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেননি। খোতবা প্রদান করা যদি সুলত হতো তবে অবশ্যই তিনি এর নির্দেশ দিয়ে যেতেন। এটা ছাড়াও তারা বলেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামাজ ঝীয় গৃহে একাকী পড়া বৈধ। যার প্রেক্ষাপটে এর জন্য খোতবার প্রয়োজন নেই।

إِنَّ الشَّمْسَ كَيْفَ لَمَرَتْ إِبْرَاهِيمَ (রা.) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসে যদিও কুসুফের নামাজের পরে খোতবা প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে, এটা মূলত খোতবার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়নি; বরং كَيْفَ لَمَرَتْ إِبْرَاهِيمَ এ অভিব্যক্তি রহিত করার জন্য প্রদান করা হয়েছিল।

আল্লামা বাজী (র.) বলেন, এর দ্বারা মিথ্যার উঠে যে খোতবা প্রদান করা হয় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা আল্লাহর স্বরণ ও তাঁর গুণ-প্রশংসা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। কেননা, সালাতুল কুসূফ হলো নফল নামাজ। সুতরাং অন্যান্য নফল নামাজে যেমন খোতবা পাঠ সুলত নয়, তেমনি কুসুফের নামাজেও খোতবা পাঠ সুলত নয়।

وَعَنْ ۱۳۹۹ أَبِي مُوسَى (رَضِيَ) قَالَ
خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَعَا
يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ
فَصَلَّى بِأَطْرَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا
رَأَيْتَهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي
يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَمْرٍ أَحَدٍ وَلَا
لِعِبَادِيهِ وَلَكِنْ يَخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ
فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَاقْرَءُوا
إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَأَسْتَغْفِرْهُ -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৯. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো তখন নবী করীম ﷺ কিয়ামত হয়ে যায় নাকি, এ ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মসজিদে আসলেন। তখন দীর্ঘ কেয়াম, রুকু ও সিজ্জাদা সহকারে নামাজ পড়লেন। আমি তাঁকে এরূপ করতে কখনও দেখিনি। অতঃপর বললেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন, যা তিনি দেখিয়ে থাকেন। এটা কারো মৃত্যুর কারণে বা হায়াতের কারণে হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এর কিছু [চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ] দেখ, তখন আল্লাহর স্বরণ, দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনার প্রতি শশব্যস্ত হয়ে ধাবিত হয়ো।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-এর ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন হয় যে, মহানবী ﷺ খুব ডালভাবে অবগত ছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘটিত হবে না। তথাপি কেয়ামত কায়ম হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত লক্ষণ ও নিদর্শন তিনি বর্ণনা করেছেন এর কোনোটিই তখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন- পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া, খারেজীদের বিদ্রোহ, বিচরণকারী জন্তুর আবির্ভাব, ধোয়া প্রকাশ হওয়া এবং বিভিন্ন শহর নগর মুসলমানদের হস্তগত হওয়া ইত্যাদি। তবু কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এর জবাবে ওলামায়ে কেয়ামত বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন— (১) সমস্ত ঐ সমস্ত আলামত ও নিদর্শন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বেই তিনি কেয়ামতের আশঙ্কা করেছিলেন এবং তিনি প্রতি মুহূর্তেই কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ধারণা করতেন; (২) অথবা বর্ণনাকারীর এটা ধারণামাত্র, হজুরের বাস্তবিক বাস্তবতা দেখেই তাঁর এই

ধারণা জন্মেছিল যে, বোধহয় হুজুর ﷺ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় এভাবে করছেন। সুতরাং একজন প্রত্যক্ষকারীর ধারণার দরুন এটা নির্দিষ্টায় বলা যায় না যে, মহানবী ﷺ প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের আশঙ্কায় এরূপ করেছিলেন। (৩) অথবা যা ভবিষ্যতে নির্ঘাত সংঘটিত হবে তা তখনই সংঘটিত হচ্ছে বুঝানোর জন্য এভাবে প্রকাশ করেছেন। যেন লোকেরা এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে সাধারণ বিষয় বলে ধারণা না করে। কেননা, চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি বিলুপ্ত হওয়াই কেয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। (৪) অথবা এ সময় যে নামাজ, দোয়া ও ইস্তিগফার করতে হয় এবং জীত-সন্নত অবস্থায় আল্লাহর স্বরণে মশগুল হতে হয় এ কথা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ব্যতীত প্রকাশ করেছিলেন।

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ بِارْتِعِ سَجْدَاتٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪০০. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীম মারা যাওয়ার দিন সূর্যগ্রহণ হলো। তখন হুজুর ﷺ লোকজনসহ [দু' রাকাত] নামাজ পড়লেন ছয় রুকু ও চার সিজদা সহকারে। [অর্থাৎ প্রতি রাকাতে তিন তিনবার রুকু করলেন।] -[মুসলিম]

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي اَرْبَعِ سَجْدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূর্যগ্রহণ হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [দু' রাকাত] নামাজ আদায় করলেন যাতে আট রুকু ও চার সিজদা ছিল। হযরত আলী (রা.) হতেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ۱۴.۲. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ ارْتَمَيْ بِاسْتِهِمْ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَانظُرَنَّ اِلَى مَا حَدَّثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَهْلِلُ وَيَكْبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُو حَتَّى حَسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حَسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ صَلَّى

১৪০২. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একদিন মদীনাতে আমি আমার তীরসমূহ নিক্ষেপ করছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। তখন আমি আমার তীরসমূহ ছুড়ে ফেললাম এবং মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই দেখব যে, সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কি অবস্থা হয় [অর্থাৎ তিনি এ সময় কি করেন]? রাবী [আবদুর রহমান] বলেন, তখন আমি তাঁর নিকট আসলাম, রাসূল ﷺ নামাজে রত ছিলেন, নিজের দুই হাত উঠালেন এবং তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও হামদ করতে লাগলেন [অর্থাৎ সুবহানালাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করলেন।] এবং দোয়া করতে থাকলেন, যতরূপ না সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল। যখন সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল তখন রাসূল ﷺ দুটি সূরা পাঠ করলেন এবং দু'

رَكَعَتَيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ وَكَذَا فِي
شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ وَفِي نَسَخِ الْمَصَابِيحِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمْرَةَ) .

রাকাত নামাজ পড়লেন [অর্থাৎ দু'টি সূরা দ্বারা দু' রাকাত নামাজ পড়লেন]। মুসলিম তাঁর সহীহে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। শরহে সুন্নাহতেও তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মাসাবীহ গ্রন্থে হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ هَادِيَةَ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে সুশ্লিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় দোয়া-দরুদ পড়তেন এবং সূর্যগ্রহণ শেষ হলে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। অথচ ইতঃপূর্বের সকল বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সূর্যগ্রহণের সময়ই নামাজ পড়তেন।

এর সমাধানে আলামা জীবী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাসবীহ-তাহলীল এতই দীর্ঘ করতেন যে, তা পাঠ করতে করতেই সূর্যগ্রহণের সমাপ্তি ঘটত। রাসূল ﷺ যখন নামাজ শেষ করতেন তখন আর তা অবশিষ্ট থাকত না। রাবী একেই এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সূর্যগ্রহণের অবসানের পর রাসূল ﷺ দু' রাকাত নামাজ আদায় করতেন। মূলত এ জাতীয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ ١٤٠٣
قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي
كُسُوفِ الشَّمْسِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَض))

১৪০৩. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে সূর্য গ্রহণকালে দাস মুক্ত করতে আদেশ করেছেন।
-[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ هَادِيَةَ هَادِيَةَ হাদীসের ব্যাখ্যা : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকালীন সময়টা মানুষের জন্য একটা চরম বিপর্যয় ও মহাবিপদ, আর দান-সদকা দ্বারা এ সব মসিবত তিরোহিত হয়ে যায়; এ জন্য রাসূল ﷺ এ সময়ে দাস মুক্ত করতে আদেশ করেছেন।

الدِّعْوَةُ الثَّانِيَّةُ : الدِّعْوَةُ الثَّانِيَّةُ

عَنْ ١٤٠٤
قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي
كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا - (رَوَاهُ
الْبُرَيْدِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৪০৪. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন, অথচ আমরা তাঁর কেবল পাঠের শব্দ শুনলাম না।
-[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٤٠٥
عَبَّاسٍ مَاتَتْ فَلَانَةٌ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
فَحَرَّ سَاجِدًا فَوَقِيلَ لَهُ تَسْجُدْ فِي

১৪০৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইক্রিমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলা হলো যে, নবী করীম ﷺ-এর বিবিদের মধ্যে অমুক [অর্থাৎ হযরত সুফিয়া (রা.)] ইন্তেকাল করেছেন। [সংবাদ শুনে] তিনি সিঁজদায় লুটিয়ে

هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا وَإِيَّايَ اعْظَمُ مِنْ
ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ)

পড়লেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি এ সময়
সিজ্দা করছেন? [অর্থাৎ অকারণে কেন সিজ্দা করছেন?]।
জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন
তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোনো নিদর্শন দেখতে পাও
তখন সিজ্দাদায় অবনত হও। আর নবী করীম ﷺ-এর
কোনো বিবির ইত্তেকাল অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে
পারে? -[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُحْرُ الْحَوِينِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত فَلَانَةَ দ্বারা হয়তো হযরত সুফিয়া (রা.)-কে অথবা হযরত হাফসা (রা.)-কে
বুঝানো হয়েছে। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলের কোনো এক বিবির ইত্তেকালের সংবাদ পেয়ে একে
মাহিপর্যয় মনে করে সিজ্দাদায় অবনত হয়ে গেলেন। এটা দেখে কেউ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোনো নিদর্শন দেখতে পাও তখন সেজদায় অবনত হও। মূলত রাসূল ﷺ-এর
বিবিরের তিরোধান সত্যিই এক বিপর্যয়ের কারণ। কেননা, তাঁরা হলেন রাসূল ﷺ-এর বাণীর ব্যতীয়াবাহক। তাঁদের
অনুপস্থিতিতে দীনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুদঘাটিতও থেকে যেতে পারে। আলোচ্য হাদীসের আলোকে একটি প্রশ্ন জন্মত হতে
পারে যে, يَا বা নিদর্শন দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কথা বুঝানো হয়েছে। অথচ এটা দ্বারা এখানে রাসূল ﷺ-এর বিবিরের
ইত্তেকালের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, يَا শব্দটি ব্যাণ্ডার্থবোধক। তবে সাধারণত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের
অর্থ নেওয়া হয়ে থাকে।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رَضًا) قَالَ
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَرَأَى بِسُورَةَ مِنَ الطُّورِ
وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَرَأَى بِسُورَةَ مِنَ الطُّورِ
ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَدْعُو
حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৪০৬. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায়
একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন হুজুর ﷺ তাদেরকে
[সাহাবীদেরকে] নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাজে
তিনি সাতটি দীর্ঘ সূরাসমূহ হতে একটি সূরা পাঠ করলেন
এবং [প্রথম রাকাতে] পাঁচটি রুকু ও দু'টি সেজদা করলেন
অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা
সপ্তক সূরা হতে একটি পাঠ করলেন। অতঃপর পাঁচটি
রুকু ও দু'টি সিজ্দা করলেন। তারপর নামাজ শেষে
কেবলার দিকে মুখ করে বসে থাকলেন, আর যতক্ষণ না
সূর্য গ্রহণ ছেড়ে আলোকিত হলো ততক্ষণ দোয়া করতে
থাকলেন। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসে "সাতটি দীর্ঘ সূরা" অথবা "দীর্ঘ সূরাসপ্তক" বলে পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব অবস্থিত সাতটি দীর্ঘ সূরা বুঝানো
হয়েছে, যেগুলো السَّبْعُ الطُّوْرَاتُ বলা হয়। এ হাদীসে কুসুফের নামাজের এক রাকাতে পাঁচটি করে রুকু করার কথা বলা
হয়েছে যার উত্তর ও ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
 كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ فَجَعَلَ يَصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ
 وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّىٰ انْجَلَتِ الشَّمْسُ .
 (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّ
 النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جِنِينَ أَنْكَسَفَتِ
 الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلَهُ
 فِي أُخْرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا
 مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ أَنْكَسَفَتِ
 الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّىٰ انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ
 أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ
 مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا
 لِحَبَابَتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ
 يُخَوِّدُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا
 انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ أَوْ يُخَوِّدَ
 اللَّهُ أَمْرًا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১৪০৭. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.)
 হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
 যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূল ﷺ দু' রাকাত করে
 নামাজ পড়তে থাকলেন এবং [নামাজের স্থানে থেকে] সূর্য
 গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, যতক্ষণ না সূর্য
 উজ্জ্বল হয়ে উঠল। -[আবু দাউদ]

নাসায়ীর এক বর্ণনায় আছে যে, যখন সূর্যগ্রহণ হলো
 তখন নবী করীম ﷺ আমাদের নামাজের মতো [স্বাভাবিক]
 নামাজ পড়লেন। নাসায়ীর অপর এক বর্ণনায় এ কথাগুলো
 রয়েছে [নো'মান ইবনে বশীর বলেন,] নবী করীম ﷺ
 একদিন তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে বের হলেন, তখন
 সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রাসূল ﷺ নামাজ পড়তে থাকলেন
 যতক্ষণ না সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি
 বললেন, জাহেলিয়া যুগের লোকেরা বলত, নিশ্চয় সূর্য ও
 চন্দ্র দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত
 গ্রহণগ্রস্ত হয় না। অথচ সূর্য ও চন্দ্র কোনো [মহান] ব্যক্তি
 মৃত্যুর বা হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না; বরং এ দু'টি
 আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতের দু'টি সৃষ্টি। আল্লাহ তাঁর
 সৃষ্টি জগতে যা ইচ্ছা পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।
 সুতরাং এদের মধ্যে যেটিই গ্রহণগ্রস্ত হয়, তোমরা নামাজ
 পড়তে থাকবে; যতক্ষণ না তা আলোকোজ্জ্বল হয় কিংবা
 আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো ঘটনার সৃষ্টি করেন।
 -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুসূফ ও খুসূফের অর্থ : উক্ত হাদীসে 'কুসূফ' ও 'খুসূফ' উভয় শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত
 হয়েছে। ফিকহবিদগণ বলেন, 'কুসূফ' শব্দটির ব্যবহার সূর্যগ্রহণের সাথে এবং 'খুসূফ' শব্দটির ব্যবহার চন্দ্রগ্রহণের সাথে
 সম্পৃক্ত। আবার কেউ কেউ বলেন যে, উভয় শব্দ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের সাথে ব্যবহৃত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, উভয়ের
 যে কোনো একটি 'গ্রহণগ্রস্ত' হতে আরম্ভ করলে সেই প্রাথমিক অবস্থাকে 'কুসূফ' এবং তা ছেড়ে আলোকিত হতে আরম্ভ
 করলে সেই অবস্থাকে 'খুসূফ' বলে। হযরত লাইস ইবনে সা'দ বলেন, পূর্ণগ্রহণ হলে 'খুসূফ' এবং আংশিক গ্রহণগ্রস্ত হলে
 'কুসূফ' বলা হয়।

بَابٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

পরিচ্ছেদ : কৃতজ্ঞতার সিজদা

আল্লাহ তা'আলার কোনো অনুগ্রহ লাভ করা বা কোনো বিপদ-আপদ কিংবা মসিবত হতে নাজাত পেলে যে সিজদা করা হয় তাকে সিজদায়ে শোকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদা বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, নামাজের বাইরে চার প্রকারের সিজদা হতে পারে। যথা- (১) সিজদায়ে সাহ, (২) সিজদায়ে তেলাওয়াত, (৩) নামাজের শেষে সিজদায়ে মুনাযাত এবং (৪) সিজদায়ে শোকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদা। আলোচ্য অধ্যায়ে এই চতুর্থ প্রকারের সিজদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অনয়ন করা হয়েছে।

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ
এ অধ্যায়ে প্রথম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই

الْفَصْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤٠٨
أَبِي بَكْرَةَ (رَض) قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورًا أَوْ بَسْرًا
بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرِمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

১৪০৮. অনুবাদ : হযরত আবু বাক্‌রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ বা এমন কিছু পৌঁছত যার দ্বারা তিনি খুশি হতেন, তখনই তিনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। -[আবু দাউদ, তিরমিযী। তবে ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

وَعَنْ ١٤٠٩
أَبِي جَعْفَرٍ (رَض) أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا مِنَ النُّفَثَانِيْنَ
فَخَرَّ سَاجِدًا - (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ مَرْسَلًا
وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ)

১৪০৯. অনুবাদ : হযরত আবু জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী ﷺ এক বামন [বেঁটে] ব্যক্তিকে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এ হাদীসটি দারাকুতনী মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন আর শরহে সুন্নাহর মাসাবীহে বর্ণিত ভাষা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٤١٠
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
(رَض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ
مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا
مِنْ عَزْرَوَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا
اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَتْ
طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ
خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَتْ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ

১৪১০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা হতে মদীনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন গাযওয়াযা নামক স্থানের নিকটবর্তী হলাম, রাসূল ﷺ উদ্বীর্ণ পিঠ হতে অবতরণ করলেন, অতঃপর নিজের দু' হাত উত্তোলন করে কিছু সময় ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, অতঃপর সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, আর দীর্ঘ সময় সিজদায় থাকলেন। অতঃপর আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দু' হাত কিছু সময় উত্তোলন করে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, তারপর পুনরায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং সিজদায় দীর্ঘ সময় থাকলেন, অতঃপর পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দু' হাত কিছু সময় ধরে উত্তোলন করে রাখলেন, তারপর [আবারও] সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। [সিজদা শেষে]

إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي
فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَّرْتُ
سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ
رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي
فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَّرْتُ
سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ
رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي
فَاعْطَانِي ثُلُثَ الْأَخْرَجِ فَخَرَّرْتُ
سَاجِدًا لِرَبِّي
شُكْرًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ)

বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন [অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের গুনাহ মার্জনা করলেন]। তাই আমি আমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। তারপর মাথা উঠালাম এবং আমার উম্মতের জন্য [আবারও] আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের [আরও] এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন, তখন আমি আমার প্রভুর শোকরিয়ার উদ্দেশ্যে আবারও সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। অতঃপর [তৃতীয়াবার] মাথা উঠালাম এবং আমার প্রতিপালকের নিকট আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশও দান করলেন। তখন আমি আমার প্রতিপালকের দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আবারও সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। -[আহমদ ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কৃতজ্ঞতার সিজদা সম্পর্কে মতানৈক্য : সিজদায়ে শোকর সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ أَبِي دَاوُدَ (رحا) وَأَحْمَدُ (ر.)-এর অভিমতও একরূপই। তাদের দলিল নিম্নরূপ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (رَضَا) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سَرَّوْهُ أَوْ يَسْرِبُهُ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) (۲) رَدَّ فِي الْعِدْوَةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَرَى مِنْ جَهْلِلٍ خَرَّ سَاجِدًا وَهُكذَا سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ (رَضَا) يَقْتُلُ مُسَيِّمَةَ الْكُذَّابِ وَسَجَدَ عَلِيُّ (رَضَا) يَقْتُلُ ذِي الرَّيْبِ الْخَارِجِيَّ وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِبِشَارَةَ قَبُولِ تَرْبَتِهِ -

তবে রুগ্ন বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তাকে না জানিয়ে শোকরিয়া আদায় করতে হবে। রুগ্ন বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানলে তার মনরকট বৃদ্ধি পেতে পারে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) وَمَالِكٍ (رحا) : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে সিজদায়ে শোকর করা মাকরুহ। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত অগণিত ও অসংখ্য। যদি সন্নত বা মোত্তাহাব হিসাবে প্রতিটি নিয়ামতের জন্য সিজদা করা হয় তবে জীবনভর প্রতিটি মুহূর্ত সিজদা করতে থাকলেও সকল নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না। অথচ এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ (رحا) لَوْ زَمَّ الْعَبْدُ السُّجُودَ عِنْدَ كُلِّ نِعْمَةٍ مُتَّحِدَةً لَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَقْتُلَ عَنِ السُّجُودِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لِأَنَّهُ لَا يَغْلُو عَنْهَا أَذْنَى سَاعَةٍ فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ نِعَمَ الْإِيمَانِ وَاللَّهُ يَكْفِيكَ اللَّهُ تَعَالَى نِعْمَةَ الْحَيَاةِ وَذَلِكَ يَسْتَجِدُّ عَلَيْهِ يَسْتَجِدُّ الْأَنْفَاسُ - وَمَذَا الْقَوْلُ نَسَبَ الْمُحْسِنِينَ فِي حَاشِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى مُعْتَدٍ مِنَ الْحَسَنِ الثُّبَاتِيِّ (رحا) -

يَسْتَجِدُّ عَلَيْهِ يَسْتَجِدُّ الْأَنْفَاسُ - وَمَذَا الْقَوْلُ نَسَبَ الْمُحْسِنِينَ فِي حَاشِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى مُعْتَدٍ مِنَ الْحَسَنِ الثُّبَاتِيِّ : যে সব হাদীসে সিজদার কথা উল্লিখিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাতে অংশ বিশেষকে উপস্থাপন করে গেটা বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে সিজদা শব্দ দ্বারা পুরো নামাজকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

কাজেই এখানেও সিজদা দ্বারা নফল নামাজ উদ্দেশ্য। কিছু সংখ্যকের মতে সিজদায়ে শোকরের হাদীস মনসুখ হয়ে গেছে।

سَعَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي -এর ব্যাখ্যা : এ হাদীসংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, গুনাহের কারণে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো উম্মতীর পাকড়াও হবে না। অথবা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও বহু হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কবীর গুনাহে লিপ্তদের পাকড়াও হবে। এর জবাবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াবী শান্তি যেমন ভূমিকম্প ও চেহারাণের আকৃতি বিকৃতি করণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। সুতরাং তা নৃহীত হয়েছে। অথবা তূরেপেশতী বলেন, পূর্বকার উম্মতের গুনাহের শাস্তি ছিল চিরস্থায়ী জাহান্নাম এবং শাফায়াত থেকে বঞ্চিত ও অশিল্প হওয়া। রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল এ উম্মতকে এ থেকে রক্ষা করা।

بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ

পরিচ্ছেদ : বৃষ্টি প্রার্থনা করা

إِسْتِسْقَاءُ শব্দটি বাবে رَسَعَ قَالَ خَرَجَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো- বৃষ্টি প্রার্থনা করা বা পানি অন্বেষণ করা। আর পরিভাষায় দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে মানুষের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টি বা পানির জন্য যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয় তাকে رَسَعَ قَالَ বলে।

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইতিহাস নামাজের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে যথা-

১. একাকী অথবা সমষ্টিগতভাবে শুধু দোয়া করা।
২. ইতিহাস নামাজ আদায় করে দোয়া করা।
৩. নামাজ আদায় করে খোতবা প্রদান করা এবং দোয়া করা। এটা হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِصْلِيِّ يَسْتَسْقِيْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ جَهْرًا فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوْلَ رِدَائِهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকজন নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের সহ দু' রাকত নামাজ আদায় করলেন। এ দু' রাকাতে কেবল সশব্দে পাঠ করলেন। এই সময় তিনি কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। কেবলামুখী হওয়ার সময় তিনি নিজের চাদরকে ঘুরিয়ে দিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِسْتِسْقَاءُ ইতিহাস নামাজ সন্নত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য : সাহেবাইন, ইমাম মালেক, শাফে'ই, আহমদ প্রমুখের মতে ঈদের দু' রাকআত নামাজের ন্যায় ইতিহাস নামাজ পড়তে হয়- এটা সন্নত। তাঁদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস-

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِصْلِيِّ يَسْتَسْقِيْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(۲) عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ (رَضِيَ) فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكَعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

মতানৈক্য : হেদায়া প্রণেতা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত উল্লেখ করে বলেন, তাঁর মতে ইতিহাস নামাজ জামাতে পড়া সন্নত নয়। হ্যাঁ, যদি কেউ একাকী উক্ত নামাজ আদায় করে, তবে তা বৈধ হবে। এর কারণ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ইতিহাস অর্থই হলো দোয়া করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইব্রাহীম নাখরী এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতেও এ ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। ইতিহাস নামাজ যে জামাতে পড়া সন্নত নয়, তার দলিল নিম্নরূপ-

(۱) قَوْلُهُ تَعَالَى اسْتَسْقِيْنَا وَرَكَعًا وَأَنَّكَ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.

আলোচ্য আয়াতে বৃষ্টি বর্ষণকে শুধুমাত্র ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, নামাজের সাথে নয়।

(২) عَنْ أَنَسٍ (رض) يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بِمَوَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمًا يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَضَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيََنَا فَرَقَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْفِئْنَا ثَلَاثًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৩) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقَى اللَّهَ فَرَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اسْقَيْنَا غَيْثًا مُرِينًا طَبَقًا عَابِلًا غَيْرَ رَائِي نَاعِمًا غَيْرَ صَارٍ - (الْحَدِيثُ)

(৪) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جِرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ غَيْثًا مُغِيثًا مُرِينًا تَوَسَّعَ بِهِ لِعِبَادِكَ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) .

(৫) عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ - وَمَهَائِمَكَ وَأَنْتَرِ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

ইস্তিকার নামাজ সুনুতের পক্ষে যে সব দলিল আনয়ন করা হয়েছে তার উত্তর হলো উক্ত হাদীস দ্বারা সুনুত সাব্যস্ত হয় না। কেননা রাসূল ﷺ কখনও ইস্তিকার জন্য নামাজ পড়েছেন আবার কখনও পড়েননি শুধু দোয়া করেছেন। আদ্যমা ইবনুল আবেদীন বলেন, রাসূল ﷺ সর্বদা যেই আমল করেছেন কেবলমাত্র তা দ্বারা ই সুনুত সাব্যস্ত হয়। আর যে আমল মাঝে মাঝে করেছেন আবার মাঝে মাঝে পরিত্যাগও করেছেন তা দ্বারা মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয়।

চাদর ঘুরানোর ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : চাদর ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য আছে। জমহুর ইমামগণ বলেন যে, চাদর ঘুরিয়ে দেওয়া সুনুত। তারা উক্ত হাদীসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসকেও দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। কারণ আবু দাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আযম, কতিপয় মালেকী মতাবলম্বী আলেম ও প্রাচীন আলেম ইবনে সালাম (রা.)-এর মতে চাদর ঘুরানো সুনুত নয়। কেননা সহীহ গ্রন্থেই এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে শুধু দোয়া ও ইস্তিগফারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, চাদর ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি, এরূপ হাদীসও রয়েছে। এমনিভাবে ইমাম বুখারী (র.)-ও চাদর ঘুরানোকে জায়েজ বলেছেন, সুনুত বলেননি।

وَعَنْ ١٤١٠ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইস্তিকা ব্যতীত তার কোনো দোয়াতেই দু' হাত উঠাতেন না। এতে তিনি এতটুকু হাত উঠাতেন যে, যাতে তাঁর বগলদ্বয়ের গুত্রতা দেখা যেত।
-বুখারী ও মুসলিম।

وَعَنْ ١٤١٣ أَنِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِهِ كَفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪১৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একবার মহানবী ﷺ আলাহ তা'আলার কাছে পানি চাইলেন এবং উভয় হাতের পিঠ আকাশের দিকে রাখলেন। -মুসলিম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইস্তিকার হাদীসের ব্যাখ্যা : হাতের পিঠ উপরের দিকে রাখার তাৎপর্য হলো, যখন হাত উপুড় করা হয় তখন হাতের যাবতীয় বস্তু নিচের দিকে পড়ে যায় তেমনি মেঘমালার বৃষ্টিও যেন নিচের দিকে পড়ে যায় এটা বুঝানোই উদ্দেশ্য।

ইমাম আহমদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যখন কোনো বাল্য-মসিবত হতে মুক্তি চাইতেন তখন হাত উপুড় করে দোয়া করতেন, আর যখন কোনো কিছু প্রার্থনা করতেন তখন হাতের তালু আকাশের দিকে করে দোয়া করতেন।

عَنْ ١٤١٤ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪১৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, অর্থাৎ যে আত্মাহ! মুষণ ধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।-[বুখারী]

عَنْ ١٤١٥ أَنَسِ (رَض) قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِرَبِّيهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। ফলে বৃষ্টির পানিতে তার পবিত্র দেহ ভিজে গেল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এই কাজ করলেন কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বৃষ্টির পানি এখনই নিজ প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। [অর্থাৎ এ পানি এখন আত্মাহ তা'আলার আদেশে দুনিয়াতে আসল। এখনও এ পানি দূষিত হয়নি।-[মুসলিম]

الدِّوَانِيُّ : ١٤١٦ : الدِّوَانِيُّ

عَنْ ١٤١٦ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (رَض) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْفَى وَحَوْلَ رِجَالِهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৪১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদাগাহের দিকে বের হলেন এবং পানি প্রার্থনা [করার উদ্দেশ্যে নামাজ আদায়] করলেন। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হলেন এবং নিজের চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ চাদরের ডান প্রান্তকে তার বাম কাঁধের উপরে বাম প্রান্তকে তার ডান কাঁধের উপরে রাখলেন, অতঃপর আত্মাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন।-[আবু দাউদ]

عَنْ ١٤١٧ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ حِمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ اسْفَلَهَا فَبَجَعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقَلَتْ قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقِيهِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

১৪১৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁর গায়ে চতুষ্কোণবিশিষ্ট কাশো চাদর ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছা করলেন যে, চাদরের নিচের প্রান্ত উঠিয়ে উপরে করে দেবেন, যখন তা ভারি বোধ তখন তিনি একে শুধু নিজ কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন।-[আহমদ ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : চাদরের ভিতরের দিক বাইরে উপরের দিকের নিচে ডানের দিক বামে এবং বামের দিক ডানে পিঠের পিছন হতে ঘুরাতে ইচ্ছা করলেন। জমহুর ইমামদের মতে পানি প্রার্থনার সময় এরূপ করা সুন্নত।

وَعَنْ ١٤١٨ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْبَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزُّورَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَأْفًا يَدِيهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) .

১৪১৮. অনুবাদ : হযরত আবুল লাহামের মুক্ত করা গোলাম হযরত উমাইর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা যাওরা নামক স্থানের কাছাকাছি আহজারুয-যায় নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-কে [আল্লাহ তা'আলার নিকট] পানি প্রার্থনা করতে দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আপন দু' হাত মুখমণ্ডলের নিকট উঠিয়ে পানি প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর পবিত্র শির অতিক্রম করেনি। -[আবু দাউদ। এ ছাড়া তিরমিযী এবং নাসায়ীও একরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٤١٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فِي الْإِسْتِسْقَاءِ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَحَاشِعًا مُتَضَرِّعًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

১৪১৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বের হলেন সাধারণ পোশাকে, বিনয় সহকারে ভয়-বিহবল অবস্থায়, কাতরভাবে ফরিয়াদ করতে করতে। -[তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মেলা-মকলিসে যাওয়ার মত উত্তম লেবাস পোশাক ত্যাগ করে নিত্যব্যবহার্য কাপড় পরে ইস্তিকাম বের হওয়া উচিত।

وَعَنْ ١٤٢٠ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَكَ وَهَيْمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

১৪২০. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতামহ বলেছেন- নবী করীম ﷺ যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন তখন বলতেন, অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকেও, তোমার পশুদেরকে পানি পান করাও, তোমার অনুগ্রহ ছড়িয়ে দাও এবং তোমার মৃত জনপদকে প্রাণবন্ত কর। -[মালেক ও আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ এই সনদের ব্যাখ্যা : এই সনদের বিবরণ দু' প্রকারের হতে পারে। কিন্তু উভয় অবস্থাতে হাদীসটি 'মুরসাল' হয়। এ কারণে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহে শُعَيْبِ بْنِ عَمْرُو بْنِ -এর হাদীস বর্ণনা করেননি। পূর্ণ সনদ হলো-عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَكَ وَهَيْمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ) অর্থাৎ আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণনা করেন তাঁর পিতা শুয়াইব হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে।

(ক) যদি 'তাঁর দাদা' দ্বারা আমরের দাদা নেওয়া হয় তখন হবেন 'মুহাম্মদ'। অর্থাৎ আমর বর্ণনা করেন পিতা শুয়াইব হতে এবং শুয়াইব বর্ণনা করেন 'আমরের দাদা' অর্থ 'মুহাম্মদ' হতে এবং মুহাম্মদ বর্ণনা করেন মহানবী ﷺ হতে। এ পর্যায়ে হাদীসটি এ কারণে মুরসাল যে, মুহাম্মদ-এর সাক্ষাৎ মহানবী ﷺ-এর সাথে হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

(খ) অর যদি 'তাঁর দাদা' দ্বারা শুয়াইবের দাদা 'আব্দুল্লাহকে' বুঝানো হয়, আর আব্দুল্লাহ মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, এ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ রাসূলের সাহাবী, এর মধ্যে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুয়াইবের সাথে তাঁর দাদা আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। এ পর্যায়ে হাদীসটি 'মুনকাতি' বা মুরসাল হয়ে পড়ে। ফলে উভয় পদ্ধতিতে উক্ত সনদটি 'মুত্তাসিল' নয়।

وَعَنْ ۱۴۲۱ جَابِرِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوَكِّمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ
اسْقِنَا غَيْثًا مُؤَمِّنًا مَرِينًا مَرِينًا نَافِعًا
غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجِيلٍ قَالَ فَاطْبَقْتُ
عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

১৪২১ অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিকায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে এই দোয়া পাঠ করতে দেখছি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করো, যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, ক্ষতিকর নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়। তিনি [রাবী হযরত জাবের] বলেন, এটা বলার সাথে সাথেই তাদের উপর মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষিতে লাগল। [আবু দাউদ]

التَّفْصِيلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ۱۴২২ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَكَى
النَّاسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُحُوطَ الْمَطَرِ
فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوَضَعَ لَهُ فِي الْمِصْلَى وَ
وَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ
عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَدَأَ
حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ
وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَذَبَ
دِيَارِكُمْ وَأَسْتِيخَارَ الْمَطَرِ عَنْ آبَانِ زَمَانِهِ
عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ
أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِكِ يَوْمَ
الَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ
الْفُقَرَاءُ أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَأَجْعَلَ مَا
أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حَيْثُ نُمِرُّعُ
يَذِيوُ فَلَمْ يَتْرِكِ الرَّفْعَ حَتَّى بَدَأَ بَيَاضَ

১৪২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে মানুষ অনাবৃষ্টির ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন রাসূল ﷺ একটি মিন্বার নির্মাণ করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাঁর জন্য ঈদগাহে মিন্বার রাখা হলো আর রাসূল ﷺ লোকদের নিকট হতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তারা একদিন ঈদগাহের দিকে সকলে বের হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সূর্যের কিনারা উদয় হতেই [ঈদগাহের দিকে] বের হলেন এবং মিন্বারের উপরে বসলেন, তারপর আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা [আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট] তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টির মৌসুম অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বৃষ্টি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন তোমরা আল্লাহকে ডাক, আর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি দু' জাহানের প্রতিপালক, দয়াময়-দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী; আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী ফকির। আমাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আর যা বর্ষণ করবে তা আমাদের জন্য শক্তি ও কল্যাণের কারণ বানাও, যাতে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এর ঘারা উপকৃত হই। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজের হস্তদ্বয়

إِبْطِيوُ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ
 حَسَوَلٌ رِدَاءٌ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى
 النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ
 سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ
 اللّٰهِ فَلَمَّ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَأَلَتْ
 السُّيُورُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ
 ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ
 اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّي عَبْدُ اللّٰهِ وَ
 رَسُولُهُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

উত্তোলন করলেন, এতটা উত্তোলন করলেন যে, তাঁর
 বগলদ্বয়ের গুহ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তারপর জনতার
 দিকে পিঠ ঘুরালেন এবং নিচের চাদর উল্টিয়ে দিলেন,
 তখনও তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলিত ছিল। তারপর জনতার
 দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিথার হতে নামলেন, অতঃপর
 দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তখন আত্মাহ তা'আলা
 একথাও মেঘ সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল, বিদ্যুত
 চমকাল, অতঃপর আত্মাহর আদেশে বৃষ্টি হলো। রাসূল ﷺ
 তাঁর মসজিদে আসতে না আসতেই বৃষ্টির পানির ঢল
 নামল। যখন রাসূল ﷺ লোকদেরকে নিজেদের আশ্রয়ের
 দিকে তাড়াহুড়া করে দৌড়াতে দেখলেন, হেসে উঠলেন,
 এমনকি সম্মুখের দাঁতসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি
 বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আত্মাহ তা'আলা সবকিছুর
 উপরে ক্ষমতাবান এবং আমি আত্মাহর বান্দা ও তাঁর
 রাসূল। - [আবু দাউদ]

وَعَنْ ١٤٢٣ أَنَسِ (رضد) أَنَّ عُمَرَ بْنَ
 الْخَطَّابِ (رضد) كَانَ إِذَا قَحِطُوا
 اسْتَسْقَى بِأَلْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ
 بِنَسِينَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ
 بِعَمِّ نَسِينَا فَاسْقِنَا فَيَسْقُون - (رَوَاهُ
 الْبُخَارِيُّ)

১৪২৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
 লোকেরা যখন অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হতো তখন হযরত
 ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত
 আক্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের অসিলায় বৃষ্টির জন্য
 প্রার্থনা করতেন। তখন তিনি বলতেন, হে আত্মাহ! আমরা
 তোমার কাছে আমাদের প্রিয় নবীর অসিলায় বৃষ্টির জন্য
 প্রার্থনা করতাম। তখন তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করত। আর এখন
 আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচা [হযরত আক্বাস
 (রা.)]-এর অসিলায় বৃষ্টির প্রার্থনা করছি। সুতরাং তুমি
 আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। রাবী বলেন, এই দোয়ার ফলে
 তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হতো। - [বুখারী]

وَعَنْ ١٤٢٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضد) قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ خَرَجَ نَبِيٌّ
 مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَيَأْتِي هُوَ
 بِنَمَلَةٍ رَافِعَةٍ بَغْضٍ قَوَائِمِهَا إِلَى
 السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ اسْتَجِيبَ
 لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّمَلَةِ - (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

১৪২৪. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে
 শুনেছি- নবীদের মধ্যে কোনো এক নবী জনতাকে সাথে
 নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনায় বের হলে, হঠাৎ দেখলেন, একটি
 পিপড়া নিজের সম্মুখের পা দুটি [বৃষ্টির জন্য] আকাশের
 দিকে উঠিয়ে রেখেছে তখন এ দেখে মহানবী ﷺ
 বললেন, তোমরা বাড়িতে ফিরে চল। তোমাদের প্রার্থনা
 এই পিপড়াটির কারণে মঞ্জুর করা হয়েছে। - [দারাকুতনী]

بَابٌ فِي الرِّيَّاحِ

পরিচ্ছেদ : ঝড় তুফানে করণীয়

মানুষের জীবন বাঁচানোর সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো বাতাস, এটা বাতীত কোনো প্রাণীই সামান্যতম সময়ও বেঁচে থাকতে পারে না, তবে এটা যখন অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে তখন মানুষের জান-মাল প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়, মুহূর্তের মধ্যে শহর-নদর-নগর মিসমার হয়ে যায়। বাতাস যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে তখন রাসূল ﷺ-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে যেত - ফলে তিনি এর সমূহ ক্ষতি হতে আত্মাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَصْرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَتْ عَادًا بِالدُّبُورِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৫. অনুবাদ : যহরত আদুগ্লাহ ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি পূবালী হাওয়া দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, আর আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়া দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْأَدْبُورُ এবং الصَّبَا -এর ব্যাখ্যা : 'الصَّبَا' সাবা' ও 'الدُّبُورُ' 'আদ দাবূর' এ শব্দ দুয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ— (১) জাওহরী বলেন, 'সাবা' হলো রাতের শেষ দিকের প্রথম ভাগের শীতল বাতাস। আর দাবূর হলো দিনের শেষে বিকালের বাতাস। এটা সাবা'র বিপরীত। (২) অথবা সাবা ঐ বাতাস, যা কেবলমুখী হয়ে দাঁড়ালে পিছনের দিক হতে গিয়ে স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে দাবূর যে বাতাস সম্মুখ দিক হতে মুখমুগল স্পর্শ করে। (৩) অথবা সাবা পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, আর দাবূর পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস। (৪) অথবা সাবা শীতকালীন বাতাস এবং দাবূর গ্রীষ্মকালীন বাতাস। (৫) অথবা সাবা উপকারী বাতাস, আর দাবূর বালা-মসিবতপূর্ণ বাতাস ইত্যাদি।

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আত্মা ইবনে হাজার (র.) বলেন, হাদীসের বাক্য نَصْرْتُ بِالصَّبَا দ্বারা কুরআনের সেই আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা আত্মাহর তা'আলা খন্দকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাজিল করেছেন। আত্মাহর বাণী-فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا অর্থ- 'তখন আমি তাদের উপরে তুফান ও ফৌজ পাঠালাম যা তোমাদের চোখে অদৃশ্য ছিল।' উক্ত আয়াত ও বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, বাতাসের দ্বারা মহানবী ﷺ তথা মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধে প্রায় মাসাধিক কাল যাবৎ মক্তার কুদাইশ ও অন্যান্য মিত্র গোত্রের দশ হাজার সৈন্যদল মদীনা শহর অবরোধ করে রেখেছিল। অবরুদ্ধ মুসলমানগণ পানি ও খাদ্য সংকট ও ভয় ভীতিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিল। শীতের প্রকোপও ছিল প্রচণ্ড। মক্তার মুশরিক বাহিনী পরিধার বাইরে অবস্থান করছিল। হঠাৎ একরাত্রে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে তাদের মালপত্র, তাঁবু-শিবির ইত্যাদি লও-ভও ও তছনছ হয়ে গেল। সাথে সাথে তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। এতে শত্রুগণ মনোবল হারিয়ে পলায়ন করতে শুরু করল। এছাড়া তুফানের তুফল গর্জনের মধ্যে অজ্ঞাত সহস্র কঠোর তাক্বীরি ধ্বনি মুসলমান কাফের নির্বিশেষে সকলেই শুনতে পেল। ফলে এই তাক্বীরি ধ্বনিতে ভীত হয়ে কাফের বাহিনী দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। এটিই ছিল আত্মাহর ফৌজ ফেরেশতাদের ধ্বনি। এ ভাবে আত্মাহর নবী ও মুসলমানগণ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হলেন।

وَعَبَّ ١٤٢٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَاحِبًا حَتَّى أَرَى
مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِثْمًا كَمَا يَتَبَسَّمُ فَكَانَ إِذَا
رَأَى غَنِيمًا أَوْ رِنَحًا عَرَفَ فِي وَجْهِهِ -
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো
এরূপ হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আল-জিত দেখতে
পাই। বরং তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি
মেঘ বা প্রবল বাতাস বইতে দেখতেন তখন চিন্তার ছাপ
তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠত। [অর্থাৎ তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে
যেত] -[বুখারী, মুসলিম]

وَعَنْهَا ١٤٢٧ قَالَتْ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ
مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ
مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا
تَخَلَّيْتَ السَّمَاءَ تَغْيِيرَ لَوْنِهِ وَخَرَجَ وَ
دَخَلَ وَأَقْبَلَ وَادْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ
فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةَ (رض) فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ
عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ
أَوْبَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرُنَا
وَفِي رِوَايَةٍ وَسَقُولُ إِذَا رَأَى النَّمْطَرَ
رَحْمَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন প্রবল ঝড়ে, হাওয়া বইত
[তখন] নবী করীম ﷺ বলতেন, অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি
তোমার নিকট এর ভাল দিকটি, এতে যে কল্যাণ রয়েছে
তা এবং একে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তার ভাল
দিকটি প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট মন্দ দিকটি
হতে, এতে যে অকল্যাণ রয়েছে, তা হতে এবং এটা যে
উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তার মন্দ দিক হতে পানাহ
চাচ্ছি”। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,] যখন আকাশ
মেঘাম্বন হত তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত।
[ভয়-বিস্মল চিত্তে] তিনি একবার ঘর হতে বের হতেন,
আবার ঘরে প্রবেশ করতেন, একবার সামনে অগ্রসর
হতেন, আবার পিছনে সরে আসতেন। আর যখন স্বাভাবিক
বৃষ্টি হতো [তাঁর ভয়-বিস্মলতা দূর হয়ে যেত] তাঁর চেহারা
খুশিতে জরে উঠত। রাবী বলেন, একবার হযরত আয়েশা
(রা.) তাঁর এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারলেন এবং
তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন,
হে আয়েশা! এই মেঘ এমনও তো হতে পারে, যে মেঘ
দেখে আদ সশ্রুদায় বলেছে- আল্লাহ কুরআনে বলেন,
“যখন তারা একে তাদের নালা-প্রান্তরসমূহের দিকে
আসতে দেখল, বলল, এটা তো মেঘ, এটা আমাদের
উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করবে।” অপর এক বর্ণনায় আছে যে,
রাসূল যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন- এটা
[আল্লাহর] রহমত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে উল্লিখিত আয়াতটির বাকী অংশ এই : بِئِنَّهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ [আল্লাহ বলেন, না, না]
বরং এটা তাই, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাইছিলে। এতে [তোমাদের জন্য] কঠিন শাস্তি রয়েছে। [সূরা আহকাফ, আয়াত : ২৪]

وَعَنْ ١٤٣١ **ابْنِ عَبَّاسٍ** (رض) أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১৪৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মহানবী (রা.)-এর সম্মুখে বাতাসকে লানত করল। তখন মহানবী (রা.) বললেন, তোমরা বাতাসকে অভিসম্পাত করো না। কেননা, এটা আদেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি এমন কোনো কিছুকে অভিসম্পাত করে যা অভিশাপের যোগ্য নয়, সে অভিশাপ তার নিজের দিকেই ফিরে আসে। -[তিরমিযী। তবে তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

وَعَنْ ١٤٣٢ **أَبِي بِنِ كَعْبٍ** (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ تَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمْرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمْرَتْ بِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৪৩২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। আর যদি তোমরা একে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেখতে পাও, তবে বলবে, "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই বাতাসের ভাল দিক, এতে যে কল্যাণ রয়েছে তা এবং যে উদ্দেশ্যে তা নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে তার উত্তম দিকটি প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট এর খারাপ দিক হতে, এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে এবং এটা যে উদ্দেশ্যে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে তার মন্দ দিক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٤٣٣ **ابْنِ عَبَّاسٍ** (رض) قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ وَأَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مَبْشُرَاتٍ - (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتَّبَهِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

১৪৩৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো ঝড়ো-বাতাস বইতে শুরু করলে নবী করীম (সা.) নিজের দু' হাঁটু পেতে বসে যেতেন এবং বলতেন, অর্থাৎ "হে আল্লাহ! একে করুণাধরূপ কর, শাস্তিধরূপ করো না। হে আল্লাহ! একে [মুদু] বাতাসে পরিণত কর, ঝড়-তুফানে পরিণত করো না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আছে যে, "আমি তাদের প্রতি [শাস্তিরূপে] প্রবল বাতাসকে পাঠালাম, আমি তাদের প্রতি [শাস্তিধরূপ] বন্ধ্যা বাতাস পাঠালাম, আমার তাদের প্রতি [অনুগ্রহধরূপ] গর্ভিনী বা ফলদায়িনী বাতাস পাঠালাম এবং তিনি [আল্লাহ] সুসংবাদ বহনকারী বাতাস পাঠালেন।" -[শাফেয়ী ও বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীর গ্রন্থে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَحَ الْحَدِيثَ হাদীসের ব্যাখ্যা : বাতাসের মূল আরবি শব্দ رِيحٌ এবং এর বহুবচন رِيَاحٌ কিন্তু আরবরা সাধারণত একবচন رِيحٌ কে ক্ষতির ঝড়ের জন্য এবং বহুবচন رِيَاحٌ কে মুখকর বাতাসের জন্য ব্যবহার করে থাকে। হাদীসের শেহাংশে হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) কুরআনের চারটি উদ্ধৃতি দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

وَعَنْ ١٤٣٤ عَائِشَةَ (رَضًا) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَبْصَرَ نَاشِئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللَّهُ وَإِنْ مَطَّرْتَ قَالَ اللَّهُمَّ سَقِيَا نَافِعًا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ)

১৪৩৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন নিজের কাজকর্ম ছেড়ে দিতেন এবং এর দিকেই নিবিশ্ট হয়ে যেতেন এবং বলতেন, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এতে যা কিছু অকল্যাণ রয়েছে আমি তা হতে তোমার কাছে পানাহ চাই। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি হতো তিনি বলতেন, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান কর। -[আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও শাফেয়ী। তবে হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা শাফেয়ী (র.) কর্তৃক বর্ণিত।]

وَعَنْ ١٤٣٥ ابْنِ عُمَرَ (رَضًا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّرَاعِي قَالَهُ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

১৪৩৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনতে পেতেন তখন বলতেন, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার রাগের দ্বারা হত্যা করো না; তোমার শাস্তির দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না; বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে প্রশান্তি দান করো। -[আহমদ, তিরমিযী। তবে তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَوْ كَسَبِيٍّ أَوْ كَسَبِيٍّ এর ব্যাখ্যা : الرَّعْدُ শব্দের শাস্তিক অর্থ হলো- গর্জন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, رَعْدًا وَبَرْقًا تَبَعَهُ السَّمَاءُ فَيُؤْهِلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (১) ইবনুল মালিক বলেন رعد হলো সেই ফেরেশতার নাম, যিনি মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। (২) ইমাম শাফেয়ী (র.) নির্ভরযোগ্য একসূত্রে মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, রাদ হলো একজন ফেরেশতা, আর বারক হলো সেই ফেরেশতার পাখা, যার দ্বারা সে মেঘমালা পরিচালনা করেন। (৩) ইমাম বাগাবী (র.) অধিকাংশ তাকসীরকারক হতে বর্ণনা করেন যে, الرعد হলো মেঘমালা পরিচালনাকারী ফেরেশতা, আর যে শব্দ শোনা যায় তা হলো তার তাসবীহ। পবিত্র কুরআনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন: رَعْدًا وَبَرْقًا يَحْمَدُ الْخ- (৪) এক হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ

বলেন. الرَّعْدُ হলো মেঘমালার বাক্য, আর اللَّيْرُ হলো তার হাসি। (৬) দার্শনিকদের মতে الرَّعْدُ হলো মেঘমালার সংঘর্ষের শব্দ। আর اللَّيْرُ হলো সেই সংঘর্ষের আলো।

الصَّوَاعِقُ -এর পরিচিতি : صَاعِقَةٌ শব্দটি الصَّوَاعِقُ -এর বহুবচন; শাব্দিক অর্থ হলো- বজ্রধ্বনি। এর ব্যাখ্যা নিয়েও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যেমন- (১) কিছু সংখ্যকের মতে মেঘমালার ঘর্ষণের ফলে যে আগুনের সৃষ্টি হয় এবং নিচের দিকে চলে আসে তাকে صَاعِقَةٌ বলে। (২) আল্লামা তীবী (র.) বলেন صَاعِقَةٌ ঐ বিদ্যুতের গর্জনকে বলে, যার সাথে অগ্নিকুলিস নির্গত হয়। (৩) অপর এক দলের মতে শান্তির আওয়াজকে صَاعِقَةٌ বলা হয়।

التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤٢٦
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
(رضد) أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ
الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ
الرَّعْدُ بِحَمِيدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ -
(رَوَاهُ مَالِكٌ)

১৪৩৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথাবার্তা ছেড়ে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করতেন, যার অর্থ- আমি সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি যার পবিত্রতা ঘোষণা করে মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসার সাথে। আর ফেরেশতাকুল পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ভয়ে। -[মালেক]

قَدَّمَ كِتَابَ الصَّلَاةِ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ وَعَوْنِهِ قَلِيلِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكِتَابِهِ وَلِنَايِبِهِ وَلِمَنْ سَعَى فِيهِ)